ইসলামের ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড

মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী

ইসলামের ইতিহাস

তৃতীয় (শেষ) খণ্ড

মূল

মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী

অনুবাদক

মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী

ও

মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনায়

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় (শেষ) খণ্ড
মাওলানা আকবর শাহ্ খান নজিবাবাদী
মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও
মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত
দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনায়
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৫২
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ২৩৮/১
ইফাবা প্রকাশনা : ২১৫৮
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭০৯
ISBN : 984-06-1230-1.
প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৪
দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৮
আষাঢ় ১৪১৫
জমাদিউস সানি ১৪২৯
মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান
প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪
প্রুফ সংশোধন
মোঃ আবদুল বারেক মল্লিক
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১
প্রচ্ছদ শিল্পী : জসিমউদ্দিন
মূল্য : ২২২.০০ (দুইশত বাইশ) টাকা

ISLAMER ITIHAS (The History of Islam Vol-3) : written by Maulana Akbar Shah Khan Najibabadi in Urdu and translated by Maulana Abdul Matin Jalalabadi & Maulana Abdullah bin Sayeed Jalalabadi into Bangla, Published by Director, Translation and Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394 June 2008
Price : Tk 222.00; US Dollar : 7.50
Website : www islamicfoundation.org.bd
E-mail : islamicfoundation.@yahoo.com

প্রকাশকের কথা

কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, আকায়িদ প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদের সাথে সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম এবং আল্লামা ইব্ন কাছীরের মত জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের বিরচিত ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্য বহু গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

এরই ধারাক্রমে ২০০৪ সালে প্রকাশ করা হয় বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী প্রণীত 'তারীখে ইসলাম' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'ইসলামের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ড।

ইতিহাস হলো জাতির দর্পণস্বরূপ। এর মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে বিগত দিনের সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিকথা। আর জানতে পারে এর কারণসমূহ। তাই মানুষ ইতিহাস পাঠে সাবধানী হয়, ভবিষ্যত পরিকল্পনায় বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। ইতিহাসকে জাতির বিবেক বলা চলে। এটা একটা জাতির দিকদর্শন যন্ত্রের মতও কাজ করে।

ঐতিহাসিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী তাঁর গ্রন্থের প্রথমদিকে ইতিহাসের সংজ্ঞা, ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের ইতিহাস ও সাধারণ ইতিহাস সংক্রান্ত পর্যালোচনা করেছেন। এরপর আরবদেশ, আরবদেশের অবস্থান, প্রকৃতি ও এর অধিবাসী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্ম হতে ওফাত পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে।

এ কিতাবের প্রথম খণ্ডে রাসূল (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদার সময়কাল, দ্বিতীয় খণ্ডে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতকাল এবং তৃতীয় খণ্ডে মুসলমানদের বিভিন্ন দেশ বিজয়ের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থখানি খুলাফায়ে রাশেদার আমলে ইসলাম প্রচার, দেশ বিজয় ও রাজ্য শাসন ইত্যাদি বিষয়ের নিখুঁত, নির্ভুল ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করা হয়েছে। যার ফলে গ্রন্থখানি প্রাণবন্ত, অনবদ্য ও অনিন্দ্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। এ ধরনের একখানি মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি।

বিজ্ঞ গ্রন্থকার ঐতিহাসিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনুবাদক জনাব মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদীকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এক্ষণে পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে পুনঃসম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী। তাঁকে এবং প্রুফ রীডার জনাব মোঃ আবদুল বারেক মল্লিকসহ গ্রন্থখানি প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত অন্য সকলকেও জানাই মুবারকবাদ।

গ্রন্থখানি নির্ভুলভাবে প্রকাশ করার প্রচেষ্টায় কিংবা আন্তরিকতায় কোন ইচ্ছাকৃত ত্রুটি করা হয়নি। তবু সুধীজনের নজরে কোন প্রমাদ পরিলক্ষিত হলে তা অনুগ্রহ করে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার ব্যবস্থা করা হবে ইন্শা আল্লাহ্।

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বিষয় **পৃষ্ঠা**

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয় | পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয় **পৃষ্ঠা**

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিষয় | **পৃষ্ঠা**

চতুর্দশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

প্রাক-মুসলিম যুগে স্পেন

স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থান

ইউরোপের মানচিত্রে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি উপদ্বীপ রয়েছে যার মাধ্যমে ইউরোপ মহাদেশ আফ্রিকা মহাদেশের সাথে সম্মিলিত হতো। অর্থাৎ এ উপদ্বীপের দক্ষিণকোণ মরক্কোর উত্তরকোণের সাথে সম্মিলিত হয়ে যেন একটি যোজক নির্মাণ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ভূমধ্যসাগর আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে করমর্দনের জন্য এগিয়ে আসে। ফলে ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে প্রায় দশ মাইলের ব্যবধান থেকে যায়। অপরদিকে ভূমধ্যসাগর ও বিস্ক উপসাগর একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে এ উপদ্বীপটিকে একটি দ্বীপে পরিণত করতে যাচ্ছিল, কিন্তু জাবালুল বারতাত বা পিরেনীজ পর্বতমালা একটি প্রাচীর তুলে উপদ্বীপটিকে ফ্রান্স থেকে তো আলাদা করে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একে একটি দ্বীপে পরিণত হতে দেয় নি। ইউরোপের এই দক্ষিণ-পশ্চিম উপদ্বীপটিকে আইবেরিয়া, স্পেন, হিস্পানিয়া, আন্দালুস প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। স্পেনের আয়তন দুই লাখ বর্গমাইলেরও অধিক।

উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও আবহাওয়া

এ দেশটির আবহাওয়া ইউরোপের অন্য সমস্ত দেশের তুলনায় উত্তম অর্থাৎ মধ্যম। ভূমি কৃষির জন্যে সমধিক উপযুক্ত এবং উর্বর। শস্য-শ্যামল ও অধিক ফসল উৎপন্নের দিক থেকে দেশটি সিরিয়া ও মিসরের সাথে তুলনীয়। রৌপ্য খনির জন্য বিশেষভাবে এর খ্যাতি আছে। অন্যান্য মূল্যবান ধাতুও এ দেশে পাওয়া যায়।

ওয়াদিউল কবীর ও টেগস এ দেশের দুটি বিখ্যাত নদী। এ দুটি নদী, এগুলোর শাখা নদী ও উপনদীসমূহ দেশটিকে একটি বাগানে পরিণত করেছে। এ উপদ্বীপটির উত্তর সীমানায় রয়েছে বিস্ক উপসাগর ও পিরেনীজ পর্বতমালা, পূর্বে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, জিব্রাল্টার প্রণালী ও আটলান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর।

প্রদেশসমূহের বিবরণ

এ উপদ্বীপের বিখ্যাত প্রদেশ ও অঞ্চলসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ উত্তর-পশ্চিম কোণে পর্তুগাল, দক্ষিণ-পশ্চিমে জালীকিয়া প্রদেশ। উত্তরে আস্তুরিয়া, কাস্তালা, আরবুনিয়া ও আরগাওয়ান প্রদেশসমূহ। উত্তর-পূর্ব প্রান্তে কাৎলুনিয়া, পূর্বাঞ্চলে আন্দালুসিয়া প্রদেশ।

টলেডো আন্দালুস বা হিস্পানিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। কর্ডোভা ও গ্রানাডা শহর দুটি আন্দালুসিয়া অর্থাৎ উপদ্বীপটির দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এ উপদ্বীপটির সর্বাধিক উর্বর ও মূল্যবান দক্ষিণাঞ্চল বা আন্দালুসিয়া প্রদেশ আর দক্ষিণাঞ্চলই অধিককাল ধরে মুসলিম অধিকারে ছিল যার বর্ণনা পরে আসছে।

ফিনিশিয়া, কার্তাজেনা, রোমক ও গথদের রাজত্ব

ফিনিশিয়া রাজত্ব

ফিনিশিয়া বা ফুনীশিয়া বা কিনআন হচ্ছে সেই দেশটির নাম যা সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল বলে সুপরিচিত। এটা হচ্ছে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল। হযরত মূসা আলায়হিস সালামের কয়েকশ বছর পূর্বে দেশটির ঐ অঞ্চলে একটি দুর্ধর্ষ ও বণিক সম্প্রদায় বসবাস করতো। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে তাদেরকে ফুনীশিয়াবাসী বলে অভিহিত করে থাকে। ফুনীশিয়াবাসীদের নৌবহর সর্বদা ব্যবসাপণ্য নিয়ে সমগ্র ভূমধ্যসাগর জুড়ে বিচরণ করতো। সম্পদের বৈভব ও প্রাচুর্য তাদেরকে একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতির অধিকারী করে তোলে। ফিলিস্তীন অধিকার করে এরা লোহিত সাগরের পথ বেয়ে হিন্দুস্থান ও চীন পর্যন্ত এবং অপরদিকে জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে বৃটেন ও উত্তর সাগর পর্যন্ত নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা প্রতিষ্ঠিত করে। ভূমধ্যসাগরের উত্তর ও দক্ষিণ উপকূলের বন্দরসমূহ তাদেরই দখলে ছিল। তাদের নৌশক্তি ছিল পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী নৌশক্তি। তারা বিভিন্ন দেশে তাদের উপনিবেশসমূহ গড়ে তুলেছিল। এসব উপনিবেশের একটি হচ্ছে উত্তর আফ্রিকার (তিউনিসিয়া) কার্তাজেনা শহর– যা পরবর্তীকালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও রাজবংশের রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল।

সে সব উপনিবেশের মধ্যে ছিল আন্দালুসের সাগর উপকূলে তাদেরই আবাদ করা অনেক নগর-বন্দর-জনপদ। ধীরে ধীরে আন্দালুস বা স্পেন দেশ তাদের রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয় এবং ফুনিশীয়রা ঐ দেশে রাজত্ব করতে থাকে। ফিনিশীয়দের শক্তি স্তিমিত হয়ে আসলে তাদেরই একাংশ কার্তাজেনা অর্থাৎ তিউনিসিয়ায় একটি শক্তিশালী রাজত্বের গোড়াপত্তন করে। তখন আন্দালুসও কার্তাজেনার একটি প্রদেশে পরিণত হয়। কার্তাজেনাবাসীরা বহু শতাব্দী ধরে এ রাজ্যে তাদের বিজয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলে। এরা ছিল অগ্নিউপাসক ও নক্ষত্রপূজারী। তাদের সংস্কৃতি তাদের সমকালের অন্য সংস্কৃতি বলে গণ্য হতো। স্পেনে ফুনিশীয়দের তুলনায় কার্তাজেনীয়দের প্রভাব বেশি পড়েছিল। কেননা, সিরীয় উপকূলের তুলনায় কার্তাজেনা আন্দালুসের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী এলাকা ছিল।

স্পেনে রোমান রাজত্ব

ইতালীর রোম শহরকে কেন্দ্র করে বায়যানটাইন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কার্তাজেনীয় ও রোমানদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের এক অবিচ্ছিন্ন ধারার সূত্রপাত হয়। অবশেষে রোমানরা কার্তাজেনীয়দেরকে উচ্ছেদ করে সেখানে তাদের নিজ রাজত্ব গড়ে তোলে। রোমানরা দীর্ঘ পাঁচশ বছর ধরে সেখানে রাজত্ব করে। রোম শহর থেকে ভাইসরয় নিযুক্ত হয়ে স্পেনে

আসতেন। তিনি বার্ষিক রাজস্ব আদায় করে কেন্দ্রে অর্থাৎ রোমে প্রেরণ করতেন। যেভাবে ভূমধ্যসাগর ও তার উপকূলবর্তী রাজ্যসমূহের রাজত্ব ফিনিশীয়দের হাত থেকে কার্তাজেনীয়দের করতলগত হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে তা কার্তাজেনীয়দের হাত থেকে রোমানদের হস্তগত হয়।

গথ রাজত্ব

রোমানদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর ৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাঁদের ওপর দু'দুটি বিপদ আপতিত হয়। প্রথম বিপদ হচ্ছে, মোগলদের সাথে তুল্য গথ সম্প্রদায় মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ থেকে উত্থিত হয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। বিলাসপ্রিয় রোমানরা পরিশ্রমী গথ সম্প্রদায়ের মুকাবিলার সামর্থ্য রাখতো না। তাই এই লুটেরা সম্প্রদায়টি রোমানদেরকে তাড়িয়ে ফিরতে থাকে। এমনি অবস্থায় রোমক সাম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এর একই অংশের রাজধানী রোমেই থাকে। অপর অংশ অর্থাৎ সাম্রাজ্যের পূর্বভাগের রাজধানী হয় কনসটান্টিনোপল। লুটেরা গথ সম্প্রদায় ঠিক তেমনিভাবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে বসে যেমনটি হয়েছিল তুর্কী সালজুকদের ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে। সালজুকীরা যেভাবে ইসলাম গ্রহণের পর স্বল্পকালের মধ্যেই নিজেদের রাজত্ব গড়ে তুলেছিল। ঠিক তেমনি গথরাও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর পিরেনীজ পর্বত ডিঙিয়ে ফ্রান্সের দিক থেকে অগ্রসর হয়ে স্পেন উপদ্বীপটি দখল করে বসে। গথদের একাংশ পূর্বাঞ্চলে তাদের নিজেদের রাজত্ব গড়ে তোলে। অপর অংশ পশ্চিমাঞ্চলে আন্দালুসে নিজেদের রাজত্ব গড়ে তোলে।

রোমান সাম্রাজ্য যেভাবে দুভাগে বিভক্ত হয়ে পূর্বরোম এবং পশ্চিমরোমে দুটি ভিন্ন ভিন্ন রাজত্ব গড়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি গথদেরও দুটি রাজ্য পূর্বাঞ্চলীয় গথ রাজ্য এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় গথ রাজ্যরূপে গড়ে উঠেছিল। পশ্চিম গথ রাজ্যে যেহেতু ধর্ম ও রাজনীতি যুগপৎভাবে পাশাপাশি চলেছিল, তাই তাঁরা ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণের পরও নিজেদেরকে রোমের ঈসায়ী ধর্মগুরু পোপের অধীন করে রাখেনি বরং আন্দালুসের ঈসায়ী পোপ রোমের অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখে।

গথ রাজারা ধর্মের তেমন একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন না। তাঁরা ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণই করেছিল রাজনৈতিক গরজে। কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত আন্দালুসেও ধর্মনেতাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত এমনও এক সময় আসে যখন পাদ্রীরা সম্রাট নির্বাচন ও অভিষেক অনুষ্ঠানেও অত্যন্ত গুরুত্ববহ ভূমিকার অধিকারী হয়ে ওঠে। তাঁদের সে প্রভাবকে খর্ব করা রাজা-বাদশাহদের জন্য রীতিমত দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। গথ রাজত্ব আন্দালুসে ৫০০ খৃস্টাব্দের দিকে পূর্ণ দাপটে কায়েম হয় এবং দু'শ' বছর ধরে তা আন্দালুসে প্রতিষ্ঠিত থাকে। দুশ' বছরের এই ব্যবধানে গথদের যুদ্ধপ্রিয়তা ও দুর্ধর্ষতার স্থলে তাদের মধ্যে বিলাসিতা ও সৌন্দর্যপ্রীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। ফুনিশীয় ও কার্তাজেনীয়রা উভয় সম্প্রদায়ই ছিল অগ্নিউপাসক ও নক্ষত্রপূজারী। উভয় সম্প্রদায়ই বিলাসিতা ও সৌন্দর্যপ্রীতিতে মত্ত ছিল। তাই স্পেনবাসীরা তাদের শাসকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং তাদের মধ্যেও এগুলোর সঞ্চার হয়। তারপর রোমান রাজত্বের সময় বিলাস প্রবণতার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। গথ রাজারা তাদের সাথে যদিও সৈনিক

জীবনের দুর্ধর্ষতাসহ স্পেনের ঘাঁটিতে আবির্ভূত হয়েছিল, কিন্তু দেশবাসীর বিলাসপ্রবণতা স্বল্পকালের মধ্যেই শাসকদেরকেও গ্রাস করে এবং তাদেরকেও বিলাসপ্রিয় করে তোলে। গথদের নিজেদের কোন উন্নত কৃষ্টি-সংস্কৃতি বা উন্নত জীবন-যাপন প্রণালী ছিল না বিধায় তারা স্পেনবাসীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে বিলাস-বসন থেকেও আর দূরে রইল না। মোটকথা, স্পেন ছিল অনেক সভ্যতার মিলনকেন্দ্র। সাথে সাথে সর্বপ্রকার উন্নতি অগ্রগতি এবং সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকেও তা বঞ্চিত ছিল না। খ্রিস্টধর্মের প্রচার-প্রসার ও তার বিরাট প্রভাব দেশের উপর বিস্তার করে।

৭০০ খ্রিস্টাব্দের পর গথ রাজত্বেরও ঐ দেশে অবসান ঘটে। অপর এক প্রাচ্য সম্প্রদায় ইরানী, রোমান, সিরীয়, মিসরীয় এবং গ্রীক রাজত্বসমূহেরই কেবল নয় বরং ঐসব দেশের বিখ্যাত কৃষ্টি-সভ্যতা ও ধর্মসমূহকে পর্যন্ত চুরমার করে দিয়ে যেখানে প্রবেশ করে মূর্তিপূজা ও খ্রিস্টধর্মের স্থলে একত্ববাদের পতাকাকে সমুন্নত করে এবং ইসলামী রাজত্বের গোড়াপত্তন করে যার বিশদ বিবরণ দেয়া হবে।

গথ রাজত্বের অবসান

যুগ পরিক্রমার সাথে সাথে গথ রাজত্বে ধর্মীয় প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেখানে পৃথক ধর্মীয় কেন্দ্র অর্থাৎ চার্চ কায়েম ছিল। রাষ্ট্রীয় আইনে খ্রিস্টধর্মীয় সংকীর্ণতার অনুপ্রবেশ বহুল পরিমাণ ঘটে। ফলশ্রুতিতে স্পেনের ইহুদীরা অহরহ নিপীড়িত হতে থাকে। ঈসায়ীরা ইহুদীদেরকে তাদের সেবাদাস মনে করতো। তাদের সহায়-সম্পদ তারা নির্বিচারে লুটেপুটে খেত। তাদের সর্বপ্রকার সেবা বলপূর্বক আদায় করে নেয়া হতো। তাদের অধিকার অনেকটা চতুষ্পদ পশুর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। অথচ গথ রাজত্বের সূচনালগ্নে ইহুদীদের অবস্থা এতটা শোচনীয় ছিল না। মূর্তিপূজার সমস্ত কুসংস্কারপূর্ণ আকীদা-বিশ্বাস স্পেনের খ্রিস্টান সমাজে প্রচলিত ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইহুদীরা ছিল খ্রিস্টানদের তুলনায় প্রাগ্রসর। খ্রিস্টানরা সাধারণভাবে আরামপ্রিয় এবং কর্মবিমুখ ছিল। পক্ষান্তরে ইহুদীরা ছিল পরিশ্রমী। কিন্তু ইহুদীরা যেহেতু সংখ্যায় কম ছিল আর রাজশক্তি ছিল খ্রিস্টানদের হাতে, তাই তারা নিস্কৃতির কোন উদ্যোগ গ্রহণেও সক্ষম ছিল না। পাদ্রীরা বাক্য শাসনের ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ এতই বাড়িয়ে তোলে যে, বাদশাহরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পেতেন না। বড় বড় জায়গীর ও উর্বর এলাকা ছিল পাদ্রীদের দখলভুক্ত। স্বয়ং পাদ্রীদের বাসভবনসমূহ ছিল পরীস্থান তুল্য। সর্বপ্রকার বিলাস-বসন এবং মাতালপনার দৃশ্য পাদ্রীদের মজলিসসমূহে পরিলক্ষিত হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে কারো টু শব্দটি করার উপায় ছিল না। পাদ্রীদের ফতওয়া ও ডিক্রির সম্মুখে বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিরাও মাথা নত করতে বাধ্য হতেন। এক একজন পাদ্রীর ঘরে শ' দু'শ' করে বর্বর সম্প্রদায়ের দাস থাকা ছিল একটা মামুলী ব্যাপার। তাদের বিধানের বিরুদ্ধে কারো আপীল করার উপায় ছিল না। গথদের রাজধানী ছিল টলেডোতে। স্পেনীয় চার্চের প্রধান ধর্মগুরু এই টলেডোতেই বাস করতেন। প্রধান পুরোহিতের মর্যাদা ও অধিকার এত দূর উন্নীত হয়েছিল যে, তিনি বাদশাহকে পদচ্যুতির ফরমানও জারি করতে পারতেন। অন্য কথায় বলা চলে, স্পেনে নির্ভেজাল খ্রিস্ট ধর্মীয় রাজত্ব কায়েম ছিল।

লারযীকের সিংহাসনারোহণ

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের শেষ দশকে শান-শওকত ও রাজ্যের পরিধির দিক থেকে গথ রাজত্ব ছিল তার উন্নতির চরমে। সমস্ত ভূমধ্যসাগর জোড়া তাদের আধিপত্য ছিল সর্বজন-স্বীকৃত। স্পেন উপদ্বীপ ছাড়াও ভূমধ্যসাগরের অধিকাংশ দ্বীপেও তাদের আধিপত্য ও রাজত্ব কায়েম ছিল। আফ্রিকার উত্তর উপকূলের কোন কোন স্থানেও তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে বায়যানটাইন অর্থাৎ রোমান সাম্রাজ্য অত্যন্ত শান-শওকত ও দাপটের সাথে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে যুগে মুসলমানরা রোমানদেরকে সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিসর থেকে বের করে দেয়, সে যুগে গথ সম্প্রদায়ের বাদশাহ্ ওটিজা টলেডোতে রাজত্ব করছিলেন। ওটিজা যখন লক্ষ্য করলেন যে, পাদ্রীরা গোটা রাজ্য কুক্ষিগত করে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে তাদের নির্যাতন মানবতার সীমালংঘন করে যাচ্ছে, তখন তিনি খ্রিস্টানদের অর্থাৎ খ্রিস্টান পাদ্রীদের ক্ষমতা খর্ব করার প্রয়াস পান। পাদ্রীরা তা আঁচ করতে পেরে ওটিজাকে পদচ্যুত করতে সংকল্পবদ্ধ হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদী প্রীতির অভিযোগ উত্থাপন করে। ইহুদী প্রীতি-দয়ার্দ্র আচরণ এমনি এক অমার্জনীয় অপরাধ ছিল যে, এ অভিযোগে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে তাদের তেমন বেগ পেতে হয়নি। তারা ওটিজাকে পদচ্যুত করে জনৈক ফৌজী সর্দার রডারিককে সিংহাসনে বসায়। এভাবে গথ রাজত্বের অবসান ঘটে এবং খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের শুরুর দিকে রডারিকের রাজত্ব কায়েম হয়। রডারিক ছিলেন সত্তর-আশি বছরের একজন অভিজ্ঞ ফৌজী সর্দার বা সিপাহ্সালার। যেহেতু পাদ্রীরা তাঁর পেছনে সক্রিয় ছিল, তাই প্রাচীন রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করে রডারিকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় কোন প্রকার বেগই পেতে হয়নি। রডারিক সিংহাসনে আরোহণ করে নির্বিঘ্নে এবং কঠোর হস্তে রাজত্ব পরিচালনা করতে থাকেন। পাদ্রীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও এভাবে অক্ষুণ্ন থাকে।

স্পেনে মুসলিম হামলার পটভূমি

আফ্রিকা তথা মরক্কোর উত্তর উপকূলে সিউটা বা সাওতা দুর্গ তখনো ছিল ঈসায়ীদের অধিকারে। কাউন্ট জুলিয়ান নামক এক ব্যক্তি ছিল এ দুর্গের অধিপতি। আরব ঐতিহাসিকগণ একে বালিয়ান নামে অভিহিত করে থাকেন। জুলিয়ান ছিলেন একজন গ্রীক সর্দার। তিনি কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়েছিলেন। উক্ত সম্রাটের সমগ্র আফ্রিকান রাজ্য মুসলিম অধিকারে চলে এসেছিল। একমাত্র ঐ দুর্গটি একটি চুক্তির বলে জুলিয়ানের অধিকারে অবশিষ্ট ছিল। জুলিয়ান সম্রাটের ইঙ্গিত অনুসারে স্পেনের খ্রিস্টান রাজার সাথে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। কেননা, কনসটান্টিনোপলের তুলনায় স্পেন সিউটার নিকটবর্তী এলাকা ছিল আর স্পেনের সমর্থনপুষ্ট থাকলে এ খ্রিস্টান ঘাঁটিটির অস্তিত্ব নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারতো। এভাবে কাউন্ট জুলিয়ান স্পেনের গভর্নররূপে গণ্য হতেন আর

সিউটা দুর্গটি স্পেনের একটি দেশীয় রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের সাথে এর নামেমাত্র সম্পর্ক ছিল। স্পেনের শেষ গথ রাজা ওটিজা উক্ত জুলিয়ানের সাথে তাঁর নিজ কন্যার বিবাহ দেন। তাই ওটিজাকে সিংহাসনচ্যুত করা হলে স্বাভাবিকভাবেই জুলিয়ান ওটিজার সিংহাসনচ্যুতি ও রডারিকের সিংহাসন আরোহণে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হন। কিন্তু যেহেতু তা পাদ্রীদেরই ইচ্ছা অনুসারে হয়েছিল তাই অগত্যা জুলিয়ানকেও তা মাথা পেতে মেনে নিতে হয়। জুলিয়ানের এক কন্যা ছিলেন ফ্লোরিডা। তিনি ছিলেন প্রাক্তন রাজা ওটিজার দৌহিত্রী। গথ রাজত্বের সময় রীতি প্রচলিত ছিল, আমীর, গভর্নর, সিপাহসালার এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের কনিষ্ঠ সন্তান রাজার খিদমতে উপস্থিত থেকে দরবারের আদব-কায়দা ও প্রথা-পদ্ধতির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। রাজাও নিজ পুত্রের মত এদের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং তারা যখন যৌবনে পদার্পণ করতো, তখন তিনি তাদেরকে তাদের পিতা-মাতার নিকট ফিরে যেতে অনুমতি দিতেন। অনুরূপভাবে আমীর-উমারাদের কন্যাদেরকেও রাজমহিষীদের খিদমতে পাঠিয়ে দেয়া হতো এবং তারাও রাণীদের সাথে একই মহলে অবস্থান করে লালিত-পালিত হতো। রাজা এবং রাণী তাদেরকে আপন কন্যার মত মনে করতেন এবং সেই দৃষ্টিতে দেখতেন। এই প্রাচীন রীতি অনুসারে কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা ফ্লোরিডাও রাজপ্রাসাদে ছিলেন। এ বালিকাটি ততদিনে যৌবনপ্রাপ্তা হয়ে পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাবার বয়সে উপনীত হয়েছিল। কিন্তু স্পেনের নতুন রাজা রডারিক বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হওয়া সত্ত্বেও বলপূর্বক উক্ত বালিকার সতীত্ব হরণ করেন। বালিকা অতি কষ্টে তার এ অপমান ও সতীত্ব হরণের সংবাদ তার পিতার কর্ণগোচরে পৌঁছান। এ সংবাদ পেয়ে জুলিয়ানের অন্তরে প্রতিশোধ বহ্নি জ্বলে ওঠে। গথ সম্প্রদায়ের যার কানেই এ সংবাদটি পৌঁছালো প্রাক্তন রাজবংশের এ নিয়ম ও আপন জাতির এ অপমানের সংবাদ তাকেই ব্যথিত করে তুললো। কিন্তু কাউন্ট জুলিয়ান তাঁর সে রাগের কথা গোপন রাখলেন। তিনি কালবিলম্ব না করে টলেডোয় গিয়ে পৌঁছলেন। রাজদরবারে পৌঁছে তিনি তাঁর স্ত্রীর অর্থাৎ ফ্লোরিডার মায়ের অন্তিম শয্যায় থাকার এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কন্যাদর্শনের অন্তিম অভিপ্রায়ের কথা রাজাকে জানিয়ে ফ্লোরিডাকে ফেরত নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা জানালেন। এ ছিল এমনি এক কৌশল যা রডারিক কোন মতেই অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। এভাবে জুলিয়ান তাঁর কন্যাসহ সিউটা প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হলেন। প্রাক্তন রাজ-পরিবারের সমর্থকদের মধ্যে আশবেলিয়ার (সেভিলের) প্রধান ধর্মযাজকও জুলিয়ানের কাছে আসলেন এবং রডারিকের রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্যে উভয়েই সক্রিয়ভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন।

মূসা ইবন নুসায়র

সে যুগে খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে কায়রোয়ান শহরে মূসা ইব্‌ন নুসায়র ছিলেন খলীফার রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের ভাইসরয়। মূসা ইব্‌ন নুসায়রের পক্ষ থেকে তাঁর জনৈক বার্বার বংশোদ্ভূত ক্রীতদাস তারিক ইব্‌ন যিয়াদ ছিলেন তাঞ্জা শহরের

শাসক এবং মরক্কোর সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। তারিক যদিও দূরত্বের দিক থেকে মূসা ইব্‌ন নুসায়রের তুলনায় জুলিয়ানের নিকটবর্তী স্থানে ছিলেন, তবুও তাঁর পরিবর্তে জুলিয়ান তাঁর মনের কথা মূসা ইব্‌ন নুসায়রের কাছে ব্যক্ত করাই অধিকতর সমীচীন বিবেচনা করলেন। তিনি আশবেলিয়ার (সেভিলের) প্রধান ধর্মযাজক এবং কয়েকজন খ্রিস্টান সর্দারকে সাথে নিয়ে কায়রোয়ান পৌঁছে মূসা ইব্‌ন নুসায়রের কাছে তাঁর আগমন-বার্তা পৌঁছালেন। মূসা ইব্‌ন নুসায়র এই খ্রিস্টান ব্যক্তিটিকে সসম্মানে গ্রহণ করলেন। জুলিয়ান ও তাঁর সহচরগণ তখন আরয করলেন যে, আপনি স্পেন আক্রমণ করুন। বিজয় অবশ্যই আপনার পদচুম্বন করবে। এ কথা শুনে মূসা চিন্তামগ্ন হলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তার কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলেন না। তখন জুলিয়ান এবং সেভিলের প্রধান-পাদ্রী তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আজকাল স্পেনে একজন জোরদখলকারীর রাজত্ব চলছে। বর্তমান সরকার স্পেনবাসীদের জন্য আল্লাহ্‌র গযবস্বরূপ। মানব জাতির প্রতি একজন মানুষ হিসেবে আপনার যে মানবিক দায়িত্ব রয়েছে, সেই পবিত্র দায়িত্ব পালনে আপনি এগিয়ে আসুন এবং স্পেনবাসীদেরকে এই নারকীয় অত্যাচার থেকে মুক্ত করুন। আপনি ছাড়া এ বিশ্বে এমন কেউ নেই যার কাছে আমরা এ ফরিয়াদ নিয়ে যেতে পারি এবং যার মাধ্যমে আমরা এ আপদ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি। মূসা ইব্‌ন নুসায়র জুলিয়ানের এ পৌনঃপুনিক আবেদন শ্রবণে স্পেনের অবস্থা এবং তার সামরিক শক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি এ ব্যাপারে দামেশকের খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের অনুমতি লাভ জরুরী বিবেচনা করে খলীফার দরবারে একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করলেন।

তারীফের নেতৃত্বে স্পেনীয় উপকূলে প্রথম মুসলিম অভিযান

এদিকে জুলিয়ানের সাথে জনৈক সর্দার তারীফ বা তারীফের নেতৃত্বে পাঁচশ জনের একটি দলকে জুলিয়ানেরই জাহাজে করে স্পেনে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁরা যেন স্পেনীয় উপকূলে অবতরণ করে সেখানকার অবস্থা সরেজমীনে পর্যবেক্ষণ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফিরে আসে। সত্যি সত্যি তারীফ তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে ৯২ হিজরীতে (৭১১ খ্রি.) স্পেনীয় উপকূলে অর্থাৎ তার দক্ষিণ অন্তরীপে অবস্থিত জাযীরা বন্দরে অবতরণ করেন এবং যৎসামান্য লুপপাট করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই খলীফার দরবার থেকে অনুমতি আসে। খলীফা অত্যন্ত ধৈর্য-স্থৈর্য ও সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণের তাকীদ দেন।

তারিক ইব্‌ন যিয়াদের প্রতি স্পেন আক্রমণের নির্দেশ

মূসা ইব্‌ন নুসায়র যখন তারীফের বর্ণনার মাধ্যমে জুলিয়ান ও তাঁর সাথীদের বক্তব্য সঠিক বলে নিশ্চিত হলেন, তখন তিনি তাঞ্জার গভর্নর তারিক ইব্‌ন যিয়াদকে সসৈন্যে স্পেনে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিলেন। তারিক সাত হাজার সৈন্য নিয়ে চারটি জাহাজযোগে

জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনের দক্ষিণ অন্তরীপে অবতরণ করলেন। সে যুগের জাহাজগুলো যে কত বিশাল আকৃতির হতো এ থেকেই তা আঁচ করা যায়। অরিকের বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই ছিল বার্বার বংশোদ্ভূত ও নওমুসলিম এবং তাতে স্বল্প সংখ্যক আরব সৈন্যও ছিল। মুগীস রূমী নামক জনৈক বিখ্যাত সেনাপতিও এ বাহিনীতে ছিলেন। তিনি তারিকের সহসেনাপতি বা নায়েব বলে গণ্য হতেন। তারিক মধ্যপ্রণালীতে থাকা অবস্থায়ই অর্থাৎ স্পেন উপকূলে পৌঁছবার আগেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি বলছেন, তোমার হাতেই স্পেন বিজিত হবে। সাথে সাথে তাঁর তন্দ্রা টুটে যায় এবং তিনি নিশ্চিত হন যে, এ অভিযানে অবশ্যই তাঁর বিজয় হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্পেনে ইসলামী শাসন

স্পেন উপকূলে তারিকের এক বিস্ময়কর নির্দেশ

তারিক তাঁর সহযাত্রীদেরকে নিয়ে স্পেনের উপকূলে অবতরণ করলেন আর সর্বপ্রথম তিনি যে কাজটি করলেন তা হলো যে সব জাহাজে করে তারা স্পেনে এসেছিলেন, সেগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে সাগরে ডুবিয়ে দিলেন। তারিকের এ কাজ অত্যন্ত অদ্ভুত বলে মনে হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে তা যে তাঁর পরম বীরত্ব এবং একজন সুদক্ষ সেনাপতির পরিচায়ক তা বোঝা যায়। তারিক এ কথা সম্যকভাবে অবগত ছিলেন যে, একটি বিশাল সাম্রাজ্যের বিশাল সৈন্যবাহিনীর তুলনায় তাঁর মুষ্টিমেয় সৈন্য একেবারেই নগণ্য। তাঁর বাহিনীর বার্বার বংশোদ্ভূত নওমুসলিম সৈন্যদের বাড়িঘরের কথা তাদের স্মৃতিপটে জাগরূক হয়ে তাদেরকে দুর্বল করে তুলতে পারে। তাঁর অধীনস্থ ফৌজী অফিসাররা হয়তো বা দেশ থেকে নতুন বিশাল বাহিনী না আসা পর্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে সাহসী হবেন না, বরং তাঁরা তাঞ্জারে ফিরে যেতেই মনস্থ করবেন। এমতাবস্থায়, এই প্রথম অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং তারিকের স্বপ্নের ব্যাখ্যা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়বে। তারিক তাঁর স্বপ্নের প্রতি এতই আস্থাশীল ছিলেন যে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ যাত্রায়ই এবং এ বাহিনীর সাহায্যেই তিনি স্পেন জয় করবেন। জাহাজগুলো নিমজ্জিত করে তিনি সহযাত্রীদের জানিয়ে দিলেন যে, এখন আর ফিরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। তিনি বললেন, এখন আমাদের পশ্চাতে উত্তাল সমুদ্র আর সম্মুখে শত্রুরাজ্য। শত্রুরাজ্য জয় করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া এবং শত্রুসৈন্যদের পিছু হটিয়ে দেয়া ছাড়া আমাদের সম্মুখে বাঁচার আর কোন পথ নেই। এ কাজ আমরা যত দ্রুত, যত সাহসিকতার সাথে এবং যত দক্ষতা ও পরিশ্রমের সাথে সম্পন্ন করবো, ততই উত্তম। অলসতা, ভীরুতা এবং নিষ্ক্রিয়তা নিজেদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই ডেকে আনবে না।

ইসলামী বাহিনীর প্রথম অবতরণস্থল

তারিক যে স্থানে অবতরণ করেছিলেন তার নাম ছিল লাইনজরাক। তারপর থেকে তা জাবালুত তারিক নামে খ্যাতি লাভ করে। আজ পর্যন্ত তা জাবালুত তারিক বা জিব্রাল্টার নামেই খ্যাত।

ঈসায়ী জেনারেল তাদমীরের প্রথম হামলা ও পরাজয়

ঘটনাচক্রে সম্রাট লারযীকের (রডারিক) সিপাহ্সালার তাদমীর একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ঐ সময় ঐ এলাকায় মওজুদ ছিলেন। তারিকের সঙ্গী-সাথীরা নতুন দেশের পরিস্থিতি

বুঝে উঠতে না উঠতেই তাদমীর এ নবাগতদের খবর পাওয়া মাত্র তাদের উপর আক্রমণ করে বসলেন। তাদমীর ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান সিপাহ্সালার। তিনি ইতিপূর্বে অনেক যুদ্ধেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাদমীর অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে হামলা চালালেন কিন্তু তারিক তাকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে পলায়ন করতে বাধ্য করলেন। তাদমীর তারিকের হাতে পরাজয়বরণ করে এক নিরাপদ স্থানে পৌঁছে সম্রাট লারযীক (রডারিক)-কে লক্ষ্য করে লিখলেন ঃ

"বাদশাহ্ জাঁহাপনা! বিদেশী বিজাতীয়রা আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। আমি পূর্ণ বীরত্বের সাথে তাদের সাথে যুঝেছি, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা তাদেরকে ঠেকানোর প্রয়াসে ব্যর্থ হয়েছি। আমার বাহিনী তাদের সম্মুখে টিকতে পারেনি। শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে আপনার নিজের তাদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হওয়ার দরকার। এই আক্রমণকারী যে কারা এবং কোথাকার লোক তা আমার জানা নেই। তারা কি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হলো, নাকি এ মাটি ভেদ করে উদ্গত হলো তা আমি বলতে পারবো না।"

স্পেনরাজ রডারিকের যুদ্ধ প্রস্তুতি

এ ভয়ঙ্কর সংবাদ শ্রবণে লারযীক (রডারিক) তার সমস্ত শক্তি সৈন্য সংগ্রহে নিয়োগ করেন। তিনি টলেডো থেকে রওয়ানা হয়ে কর্ডোভায় আসেন। সমস্ত রাজ্যের সৈন্যরা এখানে এসে তাঁর সাথে যোগদান করতে থাকে। রডারিক তার অর্থভাণ্ডার উন্মুক্ত করে অকৃপণ হস্তে অর্থ বিলাতে থাকেন। ফলে এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী সর্বপ্রকার প্রস্তুতি নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তিনি তারিকের অবস্থান অভিমুখে রওয়ানা হতে সমর্থ হলেন। তাদমীরও তাঁর বাহিনীসহ তাদের সাথে সাথে চললেন। এ সময় তারিকও কিন্তু বসে ছিলেন না। তিনি শহর-বন্দর ও গ্রামসমূহ দখল করে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি আল-জাযায়ের ও শাদূনা এলাকাসমূহ অধিকার করে লুকতা উপত্যকা পর্যন্ত উপনীত হলেন। রডারিকের বাহিনীতে এক লাখ সৈন্য ছাড়াও গোটা স্পেনের বাছাই করা অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ সিপাহ্-সালারমণ্ডলী এবং প্রতিটি প্রদেশের বিখ্যাত সর্দাররাও ছিলেন।

প্রথম যুদ্ধ

শাদূনা শহরের অদূরে লাজ্জিন্ডা হ্রদের নিকট একটি ছোট নদীর তীরে ৯২ হিজরীর ২৮শে রমযান মুতাবিক ৭১১ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ হয়। মূসা ইব্ন নুসায়র তারিকের রওয়ানা হওয়ার পর আরও পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তাঁর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছিলেন। যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই তাঁরাও তারিকের সৈন্যবাহিনীর সাথে এসে যোগ দিলেন। তাই এবার তারিকের সৈন্যসংখ্যা বার হাজারে উপনীত হলো। একদিকে নতুন দেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অপরিচিত বার হাজার মুসলিম সৈন্য, অপরদিকে স্বদেশের সুপরিচিত ভূমিতে নিজেদের রাজত্ব রক্ষার সংকল্পে অগ্রসর এক লক্ষ ঈসায়ী সৈন্যের বিশাল বাহিনী। একদিকে ইসলামী বাহিনীর সেনাপতি হচ্ছেন আফ্রিকার গভর্নর মূসা ইব্ন নুসায়রের আযাদকৃত ক্রীতদাস তারিক ইব্ন যিয়াদ– কাউকে তেমন উল্লেখযোগ্য পুরস্কারে

পুরস্কৃত করারও ক্ষমতা যার ছিল না। অপর দিকে স্বয়ং স্পেন সম্রাট ঈসায়ী বাহিনীর সেনাপতিরূপে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ। গোটা রাজ্যের ধনভাণ্ডার এবং সর্বপ্রকার সম্মানে সম্মানিত করার ক্ষমতায় তিনি ক্ষমতাবান। একদিকে অধিকাংশ সৈন্যই হচ্ছে নওমুসলিম বার্বার। অপর দিকে ভক্ত ঈসায়ী সৈন্যের দল যাদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্দীপ্ত করার নিমিত্তে বড় বড় ও বিখ্যাত পাদ্রী-পুরোহিতের সকলেই রণক্ষেত্রে উপস্থিত। এ যুদ্ধে তারিকের মুষ্টিমেয় সৈন্যের সংখ্যা তাদের প্রতিপক্ষের এক-অষ্টমাংশের চাইতেও কম ছিল। তারা যদি পরাজয়বরণ করতো, তাহলে তা কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় হতো না। কিন্তু যেহেতু মাত্র বার হাজার সৈন্যের এ বাহিনী সর্বপ্রকার সমরাস্ত্রে সজ্জিত এক লাখ দুর্ধর্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে, তাই এ যুদ্ধ ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ বলে গণ্য হয়ে থাকে। এরূপ কৃতিত্বময় যুদ্ধের নজীর বিশ্ব ইতিহাসে খুবই বিরল এবং হাতেগোনা কয়েকটিই মাত্র। এক সপ্তাহকাল ধরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি অবস্থায় নিজ নিজ শিবিরে দিন কাটায়। তারিক যখন স্পেন সম্রাট রডারিকের বিশাল সৈন্যবাহিনীর মুকাবিলায় আপন মুষ্টিমেয় সৈন্যের বাহিনীকে বিন্যস্ত করেছিলেন, তখন তিনি এক জ্বালাময়ী ভাষণ তাঁর বাহিনীর লোকদের সম্মুখে প্রদান করেন। তাঁর এ ভাষণটি ছিল আল্লাহ্র প্রতি ঈমানকে দৃঢ়তা প্রদানকারী এবং আল্লাহ্র রাহে অটল থাকার প্রেরণায় ভরপুর। তারিকের এ জ্বালাময়ী ভাষণ মুসলিম বীরদের রক্তের গতি-প্রবাহ বৃদ্ধি করেছিল। তারা শাহাদাতের নেশায় উদ্দীপ্ত ও পাগলপারা হয়ে উঠলো। পার্থিব ভোগ-বিলাস ও স্ত্রী-পুত্রের কথা তারা বেমালুম ভুলে গেল। উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো। ঈসায়ীপক্ষে হা-হুতাশ ও আর্তচীৎকার এবং মুসলিম বাহিনীর মুহুর্মুহু তাকবির ধ্বনি রণভূমিতে অনুরণিত হচ্ছিল। তাঁদের এ তাকবীর ধ্বনি শত্রুদের অন্তরকে প্রকম্পিত এবং মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি করে চলেছিল। ফার্সী কবির ভাষায়—

ব-পায়কারে কারীকা তকবীর কার্দ
নে শমশীর কার্দ ও নে তীর কার্দ

'অর্থাৎ 'তীর ও তরবারি যে কাজ করতে পারেনি শুধু তাকবির ধ্বনিই সে কাজ সম্পন্ন করেছে।'

ঈসায়ী বাহিনীর সিংহভাগই ছিল বর্ম পরিহিত অশ্বারোহী সৈন্য। পক্ষান্তরে মুসলিম বাহিনীর সকলেই ছিল পদাতিক। ঈসায়ী অশ্বারোহী সৈন্যদের সারিগুলো যখন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের তরঙ্গমালার মত আক্রমণ করতে এগিয়ে আসতো তখন হস্তীতুল্য সে সব অশ্ব এবং দৈত্য বংশোদ্ভূত সে সব অশ্বারোহী মুসলমান সৈন্যদেরকে পদদলিত করে তাদের লাশগুলোকে অশ্বখুরের চাপে একেবারে ধ্বংস করে তাদের উপর দিয়ে চলে যেতে পারতো। তাদের বল্লম ও তরবারি ব্যবহারের বুঝি আর প্রয়োজনই হবে না। কিন্তু যখন সেই লৌহবর্ম পরিহিত তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সৈন্য সমুদ্র ইসলামী বাহিনীরূপ পর্বতের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো, তখন মনে হচ্ছিল প্রচুর সংখ্যক মেষ যেন স্বল্পসংখ্যক সিংহের উপর বিজয়ের নেশায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ইসলামী তরবারিসমূহের বিদ্যুৎ প্রভায় চমকে উঠতেই ঈসায়ী বাহিনীর মেঘমালার

একাংশই রক্তাপ্লুত শবদেহরূপে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লো আর তাদের অধিকাংশই মেঘ-খণ্ডের মতো টুকরো টুকরো হয়ে দিক-বিদিক উড়ে যেতে লাগলো। মুহুর্মুহু তাকবিরের ভীতিপ্রদ হুঙ্কার রণক্ষেত্রের সকল কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠছিল। তরবারিধারীদের ক্ষিপ্রতা এবং বল্লমধারীদের চাতুর্য এ যুদ্ধকে বিশ্বের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে এমনি মহিমান্বিত করে তুলেছে যে, গোটা বিশ্বের তাবৎ অঞ্চল ও সর্বদেশে সর্বজাতির লোকজন মুসলমানদের ইসলামী জোশের এ বিস্ময়কর দৃশ্য সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রডারিকের পলায়ন

শাহানশাহ্ রডারিক অর্থাৎ ঈসায়ী বাহিনীর প্রধান সিপাহ্সালার তারিক বাহিনীর উপর তার দৈত্যাকৃতির অশ্বরাজির প্রাধান্য বহাল রাখতে না পেরে সমস্ত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, শৌর্যবীর্য ও সুনামকে ঈসায়ী সৈন্যদের লাশের সাথে ভূলুণ্ঠিত করে নিজের প্রাণকে মানমর্যাদার চাইতে অধিকতর মূল্যবান বিবেচনা করে রণক্ষেত্রের পশ্চাৎপদ হয়ে হতবুদ্ধি অবস্থায় পলায়ন করলেন। তার পলায়নের দৃশ্য ছিল এরূপ যে, অপর সব পলাতককে পিছনে ফেলে তিনি সর্বাগ্রে পলায়নে সচেষ্ট ছিলেন। পলায়নের তাড়াহুড়োর মধ্যে কারো এতটুকু হুঁশ ছিল না যে, নিজেদের শাহানশাহর পলায়নের পথ একটু সুগম করে দেবে।

খ্রিস্টান বাহিনীর পরাজয়ের কারণসমূহ

মোটকথা, খ্রিস্টান বাহিনী পরাস্ত হয় এবং স্বল্পসংখ্যক মুসলিম সৈন্যের বাহিনী সুস্পষ্ট বিজয়ের অধিকারী হয়। এ শোচনীয় পরাজয়কে খ্রিস্টান সৈন্যদের কাপুরুষতার ফল বলে ভাববার কোন কারণ নেই। আসলে মুসলমান সৈন্যদের অসাধারণ ও বিস্ময়কর বীরত্ব এবং তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্যই তাঁরা জয়ী হয়েছিল। খ্রিস্টান সৈন্যদের কাপুরুষতা এর জন্য দায়ী হলে নিহতদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক সেনাপতি, শাহযাদা ও পাদ্রীর লাশ পরিদৃষ্ট হতো না। যুদ্ধের তাড়াহুড়া শেষ হতেই দেখা গেল, সমস্ত রণাঙ্গন শবদেহে একাকার হয়ে রয়েছে। এ যুদ্ধে কত খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হয়েছিল তার সঠিক সংখ্যা তো বলা যাবে না, তবে এ কথা সত্য যে, যে সব মুসলিম সৈন্য পদাতিক সৈন্যরূপে যুদ্ধে এসেছিল যুদ্ধ শেষে তাদের সকলেই ছিল অশ্বের মালিক। তাদের গোটা পদাতিক বাহিনী রীতিমত একটি অশ্বারোহী বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এ সব অশ্ব যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত খ্রিস্টান সৈন্যদের ছিল তা বলাই বাহুল্য। সে সব খ্রিস্টান অশ্বারোহী যদি পালাতে চাইত, তবে মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়ার পূর্বেই অনায়াসেই তারা তা পারতো। এক সপ্তাহব্যাপী শিবিরে অবস্থানকালে মুসলমান সৈন্যদের স্বল্পতার কথা খ্রিস্টান বাহিনীর কাছে গোপন ছিল না। এ সময় ঈসায়ী সৈন্যদের কাছে আরো রণসম্ভার এসে পৌঁছেছিল। তাদের সৈন্য সংখ্যাও ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। পক্ষান্তরে এ নতুন দেশে নবাগত মুসলমানদের অবস্থা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতা নিশ্চয়ই খ্রিস্টান বাহিনীর মনোবল বাড়িয়ে তুলেছিল। এ লড়াই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলেছিল। এ সময় উভয়পক্ষই বীরত্ব প্রদর্শনের পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল পরিষ্কার বলে দিল, যেভাবে

মুসলমানরা তাদের আটগুণ বেশি শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তিধর প্রমাণিত হয়েছে তেমনি তারা তাদের চাইতে দশগুণ বেশি শত্রুকেও শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করতে সমর্থ।

اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ .

'যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দুশ শত্রুর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবে আর যদি তোমাদের একশ জন থাকে, তবে কাফিরদের এক হাজারের বিরুদ্ধে তারা জয়যুক্ত হবে– কেননা, তাঁরা নির্বোধ সম্প্রদায়।' (৮ঃ ৬৫)।

স্পেনের গথ রাজরা একদিকে ফ্রান্সকে এবং অপরদিকে রোমান সাম্রাজ্যকে যুদ্ধবিগ্রহে হেয় প্রতিপন্ন করতো। গোটা ইউরোপ মহাদেশ তাদের দাপটে অস্থির ছিল। স্পেনের সেনাপতিরা সর্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব ও বিজয়ের ঘোড়া দৌড়িয়েছে। কিন্তু মুসলিম গাযীদের হাতে তারা ঠিক সেইরূপ পরাজয়ই বরণ করলো যেমনটি পরাস্ত ও বিপর্যস্ত তাদের স্বজাতীয়রা হয়েছিল ইয়ারমুকের যুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের হাতে।

মুসলমানদের এ বিরাট বিজয়টি হয়েছিল ৯২ হিজরীর ৫ই শাওয়াল মুতাবিক ৭১১ খ্রিস্টাব্দে। সেদিন থেকেই স্পেনে ইসলামী শাসনের সূচনা হয়। তারিক সেদিনই বিজয়ের সুসংবাদসহ আমীর মূসা ইব্‌ন নুসায়রের উদ্দেশে দূত রওয়ানা করলেন এবং নিজে মুসলিম বাহিনীসমূহকে আশেপাশের এলাকার দিকে পাঠিয়ে গোটা স্পেন বিজয়ের আয়োজনে লিপ্ত হলেন। মূসা ইব্‌ন নুসায়র এ বিরাট বিজয়ের সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি দামেশকে খলীফার দরবারে এ সুসংবাদসহ দূত পাঠিয়ে নিজে স্পেন অভিমুখে রওয়ানা হতে মনস্থ করলেন। তারিক ইব্‌ন যিয়াদের নামে লিখিত পত্রে তিনি লিখে পাঠালেন যে, এ পর্যন্ত যতটুকু এলাকা বিজিত হয়েছে তা'ই দখল করে থাক, তুমি আপাতত আর অগ্রসর হয়ো না। তারপর মূসা ইব্‌ন নুসায়র আঠার হাজার সৈন্য নিয়ে কায়রোয়ান থেকে যাত্রা করলেন। কায়রোয়ানে তিনি তাঁর পুত্রকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। তারিকের হাতে যখন এ পত্রখানা গিয়ে পৌঁছল তখন তিনি উপদ্বীপটির দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ আন্দালুসিয়া প্রদেশের বিজয় সুসম্পন্ন করে ফেলেছেন। তবে উপদ্বীপের বড় বড় কেন্দ্রীয় শহর এবং রাজধানী টলেডো তখনো বিজিত হয়নি। ওগুলো তখন খ্রিস্টান সৈন্যদের ছাউনির রূপ পরিগ্রহ করেছে। আশংকা করা হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে ঈসায়ী সর্দাররা সম্মিলিতভাবে তারিকের বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাতে পারে। তারিকের জন্যে তখন সর্বাধিক জরুরী কাজ ছিল নির্দ্বিধায় উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে একের পর এক শহর জয় করে তাঁর সে প্রভাব ও দাপটকে অক্ষুণ্ন রাখা যা লুকতা প্রান্তরের যুদ্ধের পর খ্রিস্টানদের মনে অঙ্কিত হয়েছিল। তারিক তাঁর সেনাপতিদেরকে ডেকে আমীর মূসার নির্দেশের কথা তাদেরকে অবহিত করলেন। তাঁরা একবাক্যে বললেন, আমীর মূসার নির্দেশ পালন করতে গেলে চতুর্দিক থেকে একযোগে মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে তারা স্পেন বিজয়ের কাজকে সুকঠিন করে তুলতে পারে। কাউন্ট জুলিয়ান তখন তারিকের কাছেই ছিলেন। তিনিও বললেন, এ মুহূর্তে বিজয়

অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে একটু সময়ক্ষেপণ করলে পরে স্পেন বিজয়ের কাজ সুকঠিন হয়ে উঠবে।

তারিকের কর্ডোভা অভিযানে যাত্রা

সে মতে, তারিক কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কর্ডোভার শাসক ছিলেন স্পেনের শাহী খান্দানেরই জনৈক ব্যক্তি। লুকতা প্রান্তরের যুদ্ধে পরাস্ত ও ক্ষতিগ্রস্তরাও সেখানে এসে তাঁর কাছে সমবেত হয়েছিল। এ শহরের দুর্গ ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং অজেয়। তারিক এসেই প্রথমে শহরবাসীদের কাছে এ মর্মে পয়গাম পাঠালেন যে, তোমরা সন্ধির মাধ্যমে শহরে আমাদের অধিকার স্বীকার করে নাও। যখন তারা তাতে অসম্মতি জানাল, তখন তিনি শহর অবরোধ করলেন। এ অবরোধে অধিক কালক্ষেপণ সমীচীন হবে না ভেবে তিনি মুগীস রূমীকে কর্ডোভা অবরোধের দায়িত্বে রেখে নিজে টলেডোর দিকে অগ্রসর হলেন।

টলেডো বিজয়

তারিক অনায়াসেই ৯৩ হিজরীর রবিউস সানী মাসে (জানুয়ারী ৭১২ খ্রিস্টাব্দে) টলেডো দখল করেন। টলেডোর রাজকোষে গথ রাজাদের পঁচিশটি মুকুট তিনি প্রাপ্ত হন। প্রত্যেকটি রাজমুকুটে রাজার নাম এবং রাজত্বকালের কথা উৎকীর্ণ ছিল। অর্থাৎ একে একে পঁচিশ জন গথ বংশীয় রাজা স্পেনে এ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। প্রত্যেক রাজার জন্যে নতুন করে মুকুট নির্মিত হতো এবং বিগত রাজার মুকুট রাজকোষে সংরক্ষণ করা হতো। তারিক টলেডো নগরীতেও অবস্থান করলেন না বরং তিনি স্পেনের সর্বউত্তরের প্রদেশ পর্যন্ত জয় করতে করতে অগ্রসর হলেন। এদিকে মুগীস রূমীও স্বল্পকালের অবরোধের পর কর্ডোভা এবং তার আশেপাশের এলাকাসমূহ দখল করে নেন। এভাবে তারিক উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত স্পেনের মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ দখল করে নেন। পূর্ব ও পশ্চিম দিকের প্রদেশগুলো তখনো বিজিত হওয়া বাকি ছিল।

মূসা ইব্‌ন নুসায়রের স্পেনে পদার্পণ

এমনি সময় আমীর ইব্‌ন নুসায়র সসৈন্যে স্পেনে প্রবেশ করেন। কাউন্ট জুলিয়ানকে আন্দালুসিয়া প্রদেশের শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তারিক অর্পণ করে রেখেছিলেন। সর্বপ্রথম কাউন্ট জুলিয়ানই আমীর মূসাকে স্পেনের মাটিতে স্বাগতম জানান। তারিক তাঁর নির্দেশ অমান্য করে কেন জয়যাত্রা অব্যাহত রাখলেন এজন্যে তারিকের প্রতি তাঁকে ক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করে কাউন্ট জুলিয়ান অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিবেদন করলেন যে, এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ জয় করা বাকি আছে। আপনি টলেডো যাত্রার জন্য পশ্চিমের পথ ধরে পথের উভয়পার্শ্বের নগরী ও জনপদসমূহ জয় করতে করতে অগ্রসর হোন। তাহলে সকল সঙ্কট দূরীভূত হবে। মূসা ইব্‌ন নুসায়র সেমতে কাজ করলেন। তিনি টলেডো পর্যন্ত সমস্ত এলাকা জয় করে রাজধানী নগরীতে গিয়ে উপনীত হলেন। আমীর মূসার স্পেন আগমনের সংবাদ পেয়ে তারিকও টলেডো নগরীতে ফিরে এসে মূসার সাথে মিলিত হলেন। মূসা তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করে অগ্রসর হওয়ার জন্যে তারিককে ভর্ৎসনা

করলেন এবং কয়েকদিনের জন্যে তাঁকে বন্দী করেও রাখলেন। অধীনস্থ অফিসারদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মান্য করে চলা যে কত বেশি জরুরী ও বাধ্যতামূলক অন্যান্য সেনাপতির কাছেও তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তারপর তারিককে মুক্ত করে তিনি একটি দুর্ধর্ষ বাহিনীসহ বিজয় অভিযান প্রেরণ করলেন এবং নিজেও তাঁর পিছে পিছে রওয়ানা হলেন। আমীর মূসা তারিকের সম্পাদিত সন্ধি ও চুক্তিসমূহ অনুমোদন দিয়ে যেতে থাকেন। তারিক ও মূসা স্পেনের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম এলাকার শহরসমূহ বিজয়ে এবং মূসার পুত্র আবদুল আযীয দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এলাকার জনপদসমূহ জয়ে আত্মনিয়োগ করল। সম্রাট রডারিকের সেনাপতি তাদমীর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে সৈন্যদেরকে সমবেত করে আবদুল আযীযের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলো। বেশ ক'টি লড়াইও তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়। কিন্তু তাদমীর উন্মুক্ত রণাঙ্গনে আবদুল আযীযের মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হন। তিনি পার্বত্য এলাকাসমূহে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন এবং সময় ও সুযোগ বুঝে চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আবদুল আযীয ও তাদমীরের মধ্যে সন্ধি হয়। আবদুল আযীয একটি ক্ষুদ্র এলাকা তাদমীরের হাতে ছেড়ে দেন। তাদমীর সে এলাকায় তাঁর শাসনকার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু সন্ধির শর্ত ছিল এই যে, তাদমীর তাঁর শাসিত এলাকায় মুসলমানদের কোন শত্রুকে আশ্রয় দিতে পারবেন না এবং প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না। এদিকে তারিক এবং মূসাও অত্যন্ত সহজ শর্তে বিজিতদের সাথে সন্ধি করল। এসব শর্তের মোদ্দাকথা ছিল, ঈসায়ীরা ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে। তাদের গির্জাসমূহের কোনরূপ অনিষ্ট করা হবে না। ঈসায়ী ও ইহুদীদের যাবতীয় ব্যাপারে তাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে আদালতের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হবে। কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে ঈসায়ীরা তাতে বাদ সাধতে পারবে না। ঈসায়ীদের জানমাল ও সহায়-সম্পদের হিফাজত করা হবে। তারিক ও মূসা তাঁদের সৈন্যদের প্রতি এ মর্মে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দিলেন যে, যুদ্ধে যারা অবতীর্ণ হবে না তাদেরকে যেন কোনভাবে বিব্রত করা না হয়। বৃদ্ধ, শিশু ও নারীদেরকে কোনমতেই হত্যা করা চলবে না। কেবল যারা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে এবং মুসলমানদের মুকাবিলা করবে, তাদেরকেই হত্যা করা চলবে।

তারিক ও মূসা উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশসমূহ অধিকার করতে করতে পিরেনীজ পর্বত ডিঙিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করেন। ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চল জয় করে মুসলিম বাহিনী শীতের মওসুমের প্রচণ্ড শীত এবং রসদের স্বল্পতার জন্যে পিরেনীজ পর্বতে ফিরে আসল। মূসা ইব্ন নুসায়র পরবর্তী বছর গোটা ফ্রান্স অধিকার করে অস্ট্রিয়া, ইতালী ও বলকানসহ কনসটান্টিনোপল জয় করতে মনস্থ করেন। ফিরে এসে তারা এ পর্যন্ত পরাস্ত খ্রিস্টান সৈন্যদের আশ্রয়স্থলরূপে বিবেচিত উত্তর ও পশ্চিমের প্রদেশ জালীকিয়া বা গ্লোশিয়াও জয় করে নেন।

স্পেনে মুসলিম বিজয়ের পূর্ণতা

মূসা ইব্ন নুসায়র স্পেনে অবতরণ করেই টলেডো থেকে উত্তর দিকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মুগীস রূমীকে উপঢৌকনসামগ্রীসহ স্পেন দখলের সুসংবাদ দিয়ে রাজধানী

দামেশকের উদ্দেশে পাঠিয়ে দেন। মুগীস রূমী যখন রাজধানী থেকে ফিরে আসলেন তখন মূসা ইব্ন নুসায়রের জালীকিয়া প্রদেশ বিজয়ও সম্পন্ন হয়ে গেছে। স্পেন বিজয় সম্পন্ন করে ইউরোপের অবশিষ্ট রাজ্যসমূহ জয়ের পরিকল্পনায় মগ্ন ছিলেন। মুগীস রূমী খলীফার দরবার থেকে যে নির্দেশ বয়ে আনলেন তা মূসা ইব্ন নুসায়রের উচ্চাভিলাষ ও বিজয়ের দুঃসাহসিক স্বপ্নকে মুহূর্তের মধ্যে গভীর হতাশায় রূপান্তরিত করলো।

খলীফা ওয়ালীদের নির্দেশ ঃ মূসা ইব্ন নুসায়রকে খলীফা তলব করলেন

খলীফা মূসা ইব্ন নুসায়রকে ইউরোপ জয় থেকে বিরত করলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে খলীফার দরবারে হাযির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। সে নির্দেশ তামিল করতে আমীর মূসা ইব্ন নুসায়র স্পেনের শাসনভার তাঁর পুত্র আবদুল আযীযের হাতে ন্যস্ত করে তারিক ও মুগীস রূমী সমভিব্যাহারে প্রচুর ধন-সম্পদসহ স্পেন থেকে রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে তখন স্পেনের রাজকোষের অর্থভাণ্ডার, স্বর্ণের বাসনকোসন ও অলংকারাদি অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ এবং প্রচুর সংখ্যক ক্রীতদাস ও দাসী। স্পেন থেকে মূসা মরক্কো হয়ে কায়রোয়ান গিয়ে পৌঁছেন। তারপর সেখান থেকে মিসর হয়ে রাজধানী দামেশকের নগরপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হন। খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক তখন মৃত্যু শয্যায় মৃত্যুর প্রহর গুণছিলেন। মূসা ইব্ন নুসায়র দুই বছরকাল আন্দালুসে ছিলেন। তিনি ৯৬ হিজরীর জুমাদাল আখির (৭১৫ খ্রি জানুয়ারী) মাসের প্রথম দিকে সিরিয়া সীমানায় প্রবেশ করেন। ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের পর তাঁর ভাই সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথা নির্ধারিত ছিল। সুলায়মান যখন জানতে পারলেন যে, ওয়ালীদের প্রাণে বাঁচার আশা সুদূর পরাহত এবং মূসা ইব্ন নুসায়র রাজধানীতে প্রবেশের পথে তখন তিনি মূসার কাছে এ মর্মে পয়গাম পাঠালেন যে, তিনি যেন আপাতত রাজধানীতে প্রবেশ না করেন। সম্ভবত ভাবী খলীফার উদ্দেশ্য ছিল, ওয়ালীদের মৃত্যুর পর তাঁর নিজের খলীফা পদে অভিষিক্ত হওয়ার প্রারম্ভ যেন গৌরবময় ও জাঁকজমকপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ভাবী খলীফার এ সাধ পূর্ণ করা মূসার জন্যে তেমন কোন ক্ষতিকর ব্যাপারও ছিল না। কেননা, মূসার এ প্রতীক্ষায় যদি খলীফার অসুখ সেরে তিনি নিরাময় হয়ে উঠতেন, তা হলে খলীফার সুস্থাবস্থায় তাঁর খিদমতে হাযির হওয়াটা বেশি উপাদেয় হতো, আর যদি খলীফা ওয়ালীদের মৃত্যু হয়ে যেত তা হলে সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক তাঁর সাধ পূর্ণ করার জন্যে মূসার প্রতি প্রসন্ন হতেন। এমতাবস্থায় নতুন খলীফার কাছে তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মূসা ইব্ন নুসায়র ভাবী খলীফার পয়গামের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে যত শীঘ্র সম্ভব দামেশকে প্রবেশ করে খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের খিদমতে উপস্থিত হলেন। কিন্তু অন্তিম শয্যায় খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক উপঢৌকনাদি ও যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার লাভে তেমনটা উল্লসিত হলেন না— যেমনটা মূসা প্রত্যাশা করেছিলেন। বর্তমান খলীফার অবস্থা আশঙ্কাজনক লক্ষ্য করে আমীর-উমারা ও মন্ত্রী-মুসাহিবগণ ভাবী খলীফার কাছে অধিকতর প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তাই মূসা ইব্ন নুসায়রের এ

ব্যাপারটিকে মূসার শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীরা একটা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে থাকবে। তাঁরা হয়তো তিলকে তাল করে নতুন খলীফার মনকে মূসার প্রতি বিষিয়ে তুলেছিলেন। ফলে সুলায়মানের হয়তো মূসার প্রতি ক্রোধের পরিমাণ আরো বেড়ে গিয়ে থাকবে।

সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের অভিষেক ঃ রাজরোষে মূসা ইব্ন নুসায়র

অবশেষে ঐ সপ্তাহেই খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের ইন্তিকাল হয়। ৯৬ হিজরীর ১৬ই জুমাদাস সানী (ফেব্রুয়ারী ৭১৫ খ্রি) খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক খলীফার মসনদে আরোহণ করলেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি মূসা ইব্ন নুসায়রের প্রতি কঠোরতা আরোপ করতে শুরু করলেন। খিলাফতের পশ্চিমাঞ্চলের বকেয়া খারাজ আদায়ে মূসা ইব্ন নুসায়রের ব্যর্থতার জন্য তিনি খলীফার রোষানলের শিকার হলেন। খলীফা তাঁর সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলেন এবং তাঁর কাছে পাওনা দু'লক্ষ আশরাফী পরিশোধে অসমর্থ হওয়ার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। স্পেন বিজয়ে মূসার প্রধান সহযোগী ও সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি তারিক এবং মুগীস রূমীকেও দুঃসহ পরিণতি বরণ করতে হলো। স্পেনে অভিযান পরিচালনার কোন নির্দেশ খলীফার দরবার থেকে দেয়া হয়নি বরং মূসার আবেদনের প্রেক্ষিতে খলীফা স্পেন অভিযানের অনুমতি দিয়েছিলেন মাত্র। সুতরাং স্পেন বিজয়ের কৃতিত্ব ছিল মূসারই এবং এ জন্যই এ বিজয় মূসা এবং তারিকেরই খ্যাতির কারণ হয়েছিল।

তারিকের পরিণাম

খলীফা সুলায়মান যখন মূসার প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে তাঁকে গ্রেফতার করলেন তখন মূসারই ক্রীতদাস এবং তাঁরই হাতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাপতি তারিকের উপর স্বভাবত তার প্রভাব পড়লো। তারিকের কৃতিত্বের জন্যে তেমন কোন স্বীকৃতি বা সম্মান তাঁর ভাগ্যেও জুটলো না। তাঁকে স্পেন বা মরক্কোর শাসন ক্ষমতায়ও ফিরিয়ে দেয়া হলো না। কেননা, গোটা পশ্চিমাঞ্চল ছিল মূসা ইব্ন নুসায়রের পুত্রদের শাসনাধীনে। স্পেনে আবদুল আযীয ইব্ন মূসা, কায়রোতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মূসা এবং মরক্কোয় মারওয়ান ইব্ন মূসা গভর্নররূপে দায়িত্ব পালন করছিলেন। খলীফা সুলায়মান মূসার পরিবারের লোকজন সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তারিক যেহেতু মূসার পরিবারেরই একজন বলে বিবেচিত হতেন তাই তাঁকে কোনরূপ গুরু-দায়িত্বে আসীন করাটা তিনি নিরাপদ বিবেচনা করতেন না। তিনি তাঁকে একটি সঙ্গত পরিমাণ অবসর ভাতা দিয়ে সিরিয়ায় কোন শহরে বসবাস করার ফরমান জারি করলেন। মূসাকে গ্রেফতার করা হলো। অবশেষে আমীর ইবনুল মুহাল্লাবের সুপারিশক্রমে সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক মূসাকে কারামুক্ত করে সম্ভাব্য পরিমাণ অর্থ তাঁর নিকট থেকে আদায় করে তাঁকে ওয়াদিউল কুরায় বসবাস করার নির্দেশ প্রদান করলেন।

মূসা ইব্ন নুসায়রের ইন্তিকাল

মূসা ইব্ন নুসায়র এ ব্যর্থতা ও গ্লানিকর অবস্থায় পরবর্তী বছর অর্থাৎ ৯৭ হিজরীতে (৭১৫ খ্রি) আটাত্তর বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি আফ্রিকার গভর্নর হয়েছিলেন ৭৯ হিজরী (৬৯৮ খ্রি) সনে।

ঐতিহাসিকগণ এ প্রসঙ্গে মূসা ও তারিকের এ গ্লানিকর পরিণতির জন্য খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের সমালোচনায় মুখর। তাঁরা বলেন যে, সুলায়মান এমন দিগ্বিজয়ী ও কৃতী সেনাপতিদ্বয়ের কৃতিত্বের যথাযোগ্য কদর করেন নি। কিন্তু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যায়, এ ব্যাপারে তিনি ততটা দোষী নন যতটা সাধারণত তাঁকে মনে করা হয়ে থাকে। দিগ্বিজয় যেমন একটা কৃতিত্ব ও সম্মানের ব্যাপার, শাসন-শৃঙ্খলাও তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, বরং তা ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক যা করেছেন তা ছিল শাসন-শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজনীয়। পৃথিবীতে সাধারণত দিগ্বিজয়ী ও বীর সেনাপতিরা অনৈতিক ব্যাপারে দুর্বল এবং অনেকটা বেপরোয়া মনোভাবের হয়ে থাকেন। এ বেপরোয়া মনোভাবের জন্যেই হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর এ পদক্ষেপ মোটেই সমালোচনাযোগ্য ছিল না। বরং তাঁর এ পদক্ষেপ ছিল পুরোপুরি সঠিক ও সঙ্গত। মূসা ইব্‌ন নুসায়রের ব্যাপারটিও ছিল ঠিক তাই। মূসা ষোল-সতের বছর ধরে আফ্রিকার গভর্নর ছিলেন। তাঁর কাছে আফ্রিকার খারাজের যে বকেয়া পড়েছিল এবং তিনি বায়তুল মালের কাছে যে পরিমাণ ঋণী ছিলেন, তা যদি কেবল তাঁর তত্ত্বাবধানে কৃতিত্বের জন্যে মওকুফ করে দেয়া হতো, তা হলে অন্যান্য প্রাদেশিক গভর্নরের জন্য তা হতো একটা মন্দ দৃষ্টান্ত এবং মূসা ইব্‌ন নুসায়রের স্পর্ধা, গাফলতি ও অবিশ্বস্ততা তাতে আরো বৃদ্ধি পেত।

তারপর এ বিষয়টিও উপেক্ষণীয় নয় যে, মূসা ইব্‌ন নুসায়র এবং তারিকের ব্যাপারে সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের মন্ত্রীবর্গ, উপদেষ্টাবর্গ এবং মুসাহিববর্গের কেউই তাঁর ওফাতের পর তাঁর সমালোচনায় একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন নি। মুসলিম ঐতিহাসিকদের কেউই এ জন্যে কোনরূপ বিস্ময় বা আক্ষেপ প্রকাশ করেন নি। এতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মূসা ইব্‌ন নুসায়রের সাথে কোনরূপ অন্যায় আচরণ করা হয়নি। যা করা হয়েছে তা ছিল একান্তই ন্যায্য এবং সমীচীন। বনূ উমাইয়াদের আপদের কথা বর্ণনাকারী এবং তাদের প্রতিটি কাজকে অসঙ্গত প্রতিপন্ন করার জন্য সবচাইতে বেশি সচেষ্ট ছিলেন বনূ আব্বাস। কিন্তু এই আব্বাসীয়রাও ঐ বিশেষ ব্যাপারটিতে সুলায়মানের দুর্ণাম করেন নি বা কোনদিন তাঁকে এ জন্য একজন কৃতী পুরুষের কদর না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন নি।

আমাদের এ যুগে যখন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের রচনাবলী মুসলমান পাঠকদের নাগালে এসেছে, তখন বিভ্রান্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ স্পেন বিজয়ের ইতিহাস আলোচনায় তাকে তো একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, রডারিকের সাম্রাজ্য অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তারপর কোন প্রমাণ ছাড়াই তাঁরা এ কথা বলে থাকেন যে, রডারিকের প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে মুসলমানদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল। অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মুসলমানদের রাজ্য শাসনের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে স্পেনের প্রজাসাধারণ অবশ্যই মুসলিম বিজেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিল এবং তারা রীতিমত তাঁদের অনুরক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একমাত্র কাউন্ট জুলিয়ানের ব্যক্তিগত প্রতিশোধ স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ

হয়ে মুসলমানদেরকে স্পেন আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করে এবং এ ব্যাপারে জনৈক পাদ্রী তাঁকে সমর্থন জানানো ছাড়া সাধারণভাবে স্পেনের প্রজাসাধারণ মুসলমানদেরকে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা দেয়নি। অধিকন্তু মুসলমানরা তাঁদের ঈমানী শক্তি এবং হৃদয়ের বলে এতই বলীয়ান ছিলেন যে, এমন ষড়যন্ত্রকারী এবং বিদ্রোহীদের সাহায্যের কোন দরকারই তাঁদের ছিল না। ঈসায়ী ঐতিহাসিকগণ মুসলমানদের এ অসাধারণ বীরত্বের মহিমাকে ক্ষুণ্ন করার মতলবে অদ্ভুত কল্প-কাহিনীর অবতারণা করে থাকেন। অবশেষে তাঁরা তারিক, মূসা ও সুলায়মানের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে তাদের অন্তরের উত্তাপকে কিছুটা প্রশমিত করার প্রয়াস পেয়ে থাকেন।

একটি মনগড়া কাহিনী ও তার সমালোচনা

তারা এ মর্মে একটি কল্পিত কাহিনী রচনা করে তাতে রঙ চড়ান যে, তারিক যখন টলেডো থেকে উত্তরদিকে অগ্রসর হলেন তখন টলেডোর পলায়নকারীদের একটি দলের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। ওদের কাছে হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামের ব্যবহৃত একটি টেবিল বা খাট দেখতে পান। উক্ত টেবিল বা খাটখানা বহুমূল্য স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের কারুকার্যে খচিত ছিল। তার মূল্য ছিল কোটি কোটি টাকা। তারিক তা তাদের নিকট থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেন। মূসা যখন স্পেনে উপনীত হলেন তখন তিনি উক্ত খাটখানা তারিকের নিকট থেকে তলব করেন। তারিক খাটখানির একটি পায়া খুলে নিজের কাছে গোপনে রেখে দেন এবং তিনটি পায়া সমেত খাট মূসার হাতে তুলে দিয়ে বলেন যে, এ অবস্থায়ই খাটখানি তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মূসা আরেকটি পায়া স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করিয়ে খাটখানিতে তা সংযোজন করেন, কিন্তু তা আর আসল তিনটি পায়ার মতো হয়নি। যখন মূসা খলীফা ওয়ালীদ বা সুলায়মানের খিদমতে তা পেশ করলেন তখন তিনি বলেন যে, এ খাটখানি আমি যুদ্ধলব্ধ গনীমতের সাথে পেয়েছিলাম। খলীফা ত্রুটিপূর্ণ পায়াখানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, ঐ পায়াখানি অবশিষ্ট তিনটি পায়ার মত নয় কেন? মূসা জবাব দেন যে, তিনি ঈসায়ীদের নিকট থেকে এ অবস্থায়ই খাটখানা পেয়েছিলেন। এ সময় তারিকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বগলের তলা থেকে চতুর্থ পায়াখানা বের করে খলীফার সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন যে, এই যে তার আসল পায়াখানা আমার কাছে রয়েছে। খলীফা যখন হাতেনাতে প্রমাণ পেয়ে গেলেন যে, মূসা ইব্‌ন নুসায়র তারিকের কৃতিত্বকে তাঁর নিজের কৃতিত্ব বলে খলীফার কাছে জাহির করেছেন তখন তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে মূসাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং এত অধিক পরিমাণে অর্থদণ্ড তাঁর প্রতি নির্ধারণ করেন যে, মূসার পক্ষে সে অর্থদণ্ড প্রদান করা কোনমতেই সম্ভবপর ছিল না। এ ধরনের আরো অনেক অলীক কাহিনী ঈসায়ী ঐতিহাসিকগণ নিজেরা রচনা করেন। আক্ষেপ হয় আমাদের যুগের ঐতিহাসিকদের জন্য যারা স্পেনের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, অথচ এহেন আজেবাজে কল্প-কাহিনীর স্বরূপ উদঘাটন করেন নি। তারিকের এত ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তা ও মনিবের এরূপ চাতুর্য ও প্রতারণাপূর্ণ আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া আর কয়েক বছর পূর্বেই

মূসাকে সমুচিত শিক্ষাদানের এরূপ পরিকল্পনা এঁটে রাখার কথা কোন মতেই বোধগম্য হয় না। তারপর তাজ্জবের ব্যাপার হলো যে, মূসাকে চতুর্থ পায়াখানা নতুন করে বানাতে হলো অথচ কেউ একটি পায়ার জন্য তাঁকে বললো না যে, এ টেবিলখানা যখন আমরা ঈসায়ী পলাতকদের নিকট থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম তখন তার চারখানি পায়াই ঠিক ছিল। আপনি তার চতুর্থ পায়াখানা খুঁজে বের করুন। অথচ তখন সে খাটখানা অধিকারের পর তিন তিনটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, আর মূসা তা ঘূণাক্ষরেও টের পেলেন না যে, আসলে তা ঠিকঠাকই ছিল। তিনি তখনও বুঝে ছিলেন যে, খাটখানা এ অবস্থায়ই খ্রিস্টানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। যে মূসা গোটা ইউরোপ জয় করে কনসটান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছবার স্বপ্ন দেখছিলেন, তাঁর মত বীরপুরুষ কেমন করে এ নীচতা প্রদর্শন করতে পারেন যে, অপরের কৃতিত্বকে তিনি খলীফার দরবারে নিজের কৃতিত্ব বলে জাহির করবেন? তাও আবার স্বয়ং খলীফার নিকট ডাহা মিথ্যা কথা বলে! তারপর মজার কথা হলো, যুদ্ধে পরাস্ত ও মারখাওয়া খ্রিস্টানদের কাছ থেকে উক্ত খাটখানা ছিনিয়ে নেয়া কোন বীরত্বব্যঞ্জক ব্যাপার ছিল না। যে কেউই তা ছিনিয়ে নিত, শেষ পর্যন্ত তাকে তা খলীফার দরবারে পেশ করতেই হতো, তারপর দামেশকে খলীফার দরবারে তারিকের খাটের পায়া বগলদাবা করে হাযির হওয়া আরও বিস্ময়ের ব্যাপার। তারিক ও মূসার এ হাস্য উদ্রেককারী ঘটনার পর খলীফা সুলায়মান কর্তৃক তাঁদের এরূপ শাস্তি বিধানের ব্যাপারটিও কোনক্রমেই বোধগম্য হয় না। স্পেন ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের ইতিহাস রচনার ব্যাপারে আমাদের সর্বাধিক আস্থা স্থাপন করতে হয় ইব্‌ন খালদূনের উপর। কিন্তু তিনি তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে এরূপ কোন ঘটনার উল্লেখমাত্র করেন নি। ইব্‌ন খালদূনের বর্ণনায় আছে, মূসা ইব্‌ন নুসায়র যখন গোটা ইউরোপ জয় করে তার কনসটান্টিনোপল বিজয়ের সংকল্পের কথা খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের দরবারে ব্যক্ত করলেন, তখন খলীফা এ কথা ভেবে তাতে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেন যে, এভাবে মূসা মুসলিম জাতিকে সঙ্কট ও ধ্বংসের পথে এগিয়ে নেবার দুঃসাহস পোষণ করল। উপরন্তু,খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক এ সংবাদ পেয়েই তারিককে স্পেন থেকে দরবারে তলব করেছিলেন যে, তিনি ইতোমধ্যেই গোটা ইউরোপ আক্রমণের সঙ্কল্প খলীফার অনুমতি না নিয়েই করে বসেছেন। আর এ জন্যই খলীফা সুলায়মানও মূসা ইব্‌ন নুসায়রের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন যে, তুমি নিজের ইচ্ছামত মুসলিম সৈন্যদেরকে এরূপ সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেয়ার দুঃসাহস কেন করেছিলে? ইব্‌ন খালদূনের এ বর্ণনা সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য ও যুক্তিসঙ্গত। এখানে সে খাটের ঘটনার কোন উল্লেখ নেই।

মূসা ইব্‌ন নুসায়র স্পেনের শাসনভার তাঁর পুত্র আবদুল আযীযকে এবং আফ্রিকা ও মরক্কোর শাসনভার তাঁর অপর দুই পুত্র আবদুল্লাহ্ ও মারওয়ানের হাতে অর্পণ করে এসেছিলেন। অন্য কথায় পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সবকটাই ছিল মূসার পুত্রদের শাসনাধীনে। এ জন্যে মূসা ইব্‌ন নুসায়রের সাথে কঠোরতা প্রদর্শন খলীফার জন্য আপদমুক্ত বা ঝুঁকিমুক্ত ছিল না। আর এজন্য পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের কোনরূপ অসন্তোষ পরিলক্ষিত হয়নি।

এ ব্যাপারটিও উপেক্ষণীয় নয় যে, একদিকে মূসা ইব্‌ন নুসায়রের প্রতি তো খলীফা কঠোরতা প্রদর্শন করলেন, অপর দিকে তাঁর সন্তানদের হাতেই পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের শাসনভার ছেড়ে দিয়ে রাখলেন। তিনি তাদেরকে পদচ্যুত করার কোনরূপ চিন্তা-ভাবনাই করলেন না। অবশ্য, কিছুকাল পরে খলীফা সুলায়মান মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদকে সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলের ভাইসরয় নিযুক্ত করে কায়রোয়ানে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু স্পেনের শাসনভার তখনো তিনি পূর্বের মতোই মূসার পুত্র আবদুল আযীযের হাতেই ছেড়ে রেখেছিলেন।

স্পেনের প্রথম মুসলিম শাসক

তারিক এবং মূসা উভয়েই ছিলেন স্পেন বিজেতা। এ দু'জন সমরনেতা যতদিন স্পেনে ছিলেন ততদিন বিভিন্ন দেশ শহর জনপদ ও দুর্গসমূহ দখল এবং ঈসায়ী নেতাদের চুক্তিপত্র লেখানো ও ইসলামী রাষ্ট্রের আধিপত্যের স্বীকৃতি আদায়েই তাঁরা সময় অতিবাহিত করেন।

তাঁদের দু'জনকেই স্পেন বিজয়ী বলে অভিহিত করা চলে। স্পেনের সর্বপ্রথম নিয়মিত শাসক ছিলেন আবদুল আযীয ইব্‌ন মূসা। তারপর একে একে অনেকেই স্পেনের শাসক হয়ে আসেন। এঁদের নিয়োগ কখনো খলীফার দরবার থেকে, কখনো পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকার্যে কায়রোয়ানে নিযুক্ত খলীফার ভাইসরয়ের পক্ষ থেকে, আবার কখনো স্পেনীয় মুসলমানদের পছন্দের ভিত্তিতে হতো। স্পেনের সে শাসকদেরকে আমীরানে আন্দালুস বা স্পেনের আমীরবর্গ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

আমীরানে আন্দালুস

আবদুল আযীয ইব্‌ন মূসা

মূসা ইব্‌ন নুসায়রের স্পেন থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর আনুগত্য প্রকাশকারী অধিকাংশ শহরই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ সব বিদ্রোহ দমন করে ঈসায়ীদেরকে পুনরায় অনুগত ও বাধ্য করার ব্যাপারে আমীর আবদুল আযীয ইব্‌ন মূসা অত্যন্ত যোগ্যতা ও সতর্কতার পরিচয় দেন। মুসলমান ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হাতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক বাহিনী ছিল না। এজন্যই ঐ খ্রিস্টানদের বিদ্রোহ ঘোষণার সাহস হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদেরকে স্পেন থেকে বহিষ্কার করা যে সহজ কাজ নয় তা তারা অচিরেই টের পেয়েছিল। সাথে সাথে একথাও তাদের বুঝতে বাকি ছিল না যে, মুসলিম প্রশাসন পূর্ববর্তী গথ-রাজাদের প্রশাসনের চাইতে বহুগুণে উত্তম এবং আল্লাহ্‌র রহমত স্বরূপ।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

মুসলমানগণ সর্বপ্রথমেই ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করে ঈসায়ী প্রজাদের সর্বপ্রকার ধর্মীয় ও বৈষয়িক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। তবে শর্ত ছিল, তারা ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। আমীর আবদুল আযীয এ ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, যে ক্রীতদাস ইসলাম গ্রহণ করবে সে তার অমুসলিম মনিবের অধীনতা বন্ধন থেকে মুক্ত ও স্বাধীন বলে বিবেচিত হবে। ঈসায়ীদের কাছে প্রচুর ক্রীতদাস বিদ্যমান ছিল। তারা ঐ ক্রীতদাসদের সেবা গ্রহণের ব্যাপারে তাদেরকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে রেখেছিল। আমীর আবদুল আযীযের উক্ত ঘোষণার ফলে হাজার হাজার ক্রীতদাস মুক্ত হয়ে স্বাধীন মানবীয় জীবনের স্বাদ লাভ করে। এভাবে মানবজাতির এক মহাকল্যাণ সাধিত হয় এবং মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতার সমস্যারও সমাধান হয়।

আমীর আবদুল আযীয রডারিকের বিধবা স্ত্রী এজিওলোনাকে বিয়ে করেন এবং তাকে তাঁর স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেন। আমীরের অনুকরণে অন্যান্য মুসলমানও ঈসায়ী রমণীদেরকে বিয়ে করতে শুরু করেন। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পলাতক ঈসায়ীদের পরিত্যক্ত বাড়িঘরে মুসলমানরা ঈসায়ীদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে শুরু করেন। আমীর আবদুল আযীয কেবল ঈসায়ীদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাদেরকে শহর ও পল্লীসমূহের নাযিমও নিয়োগ করেন। রডারিকের সাবেক সিপাহসালার তাদমীরকে মারসিয়া প্রদেশের শাসনক্ষমতা তিনি পূর্বেই দিয়ে রেখেছিলেন। আবদুল আযীযের ঈসায়ী

স্ত্রী এজিওলোনা– যিনি উম্মে আসিম নামেও পরিচিত ছিলেন, স্বল্পকালের মধ্যেই আমীর আবদুল আযীযের মনমর্জি বুঝে নিয়ে শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন। এটা আরব সর্দারদের তেমন মনঃপূত না হলেও আমীরের আনুগত্য তাদের করতেই হতো। ফলে পরাজিত ও অধীনস্থ খ্রিস্টানদেরকে নিজেদের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখে তারা মর্মপীড়ায় ভুগতেন কিন্তু তাদের করণীয় কিছুই ছিল না।

এমনি পরিস্থিতিতে খবর পৌছলো যে, খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক মূসা ইব্‌ন নুসায়রকে বকেয়া খারাজ প্রদান না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন এবং নতুন দিগ্বিজয়ের জন্যে তাঁর কোন মূল্যায়নই করেন নি। আবদুল আযীযের অন্তরে এ সংবাদের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা বলাইবাহুল্য। কিন্তু খলীফার বিরুদ্ধে তাঁর টু শব্দটি করার উপায় ছিল না। এজিওলোনা এবং অন্যান্য ঈসায়ী কর্মকর্তা এ পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। আবদুল আযীযের সাথে তখন তাদের ঘনিষ্ঠতা ও তাঁর প্রতি তাদের সহানুভূতি বৃদ্ধি পেল। আবদুল আযীয যেহেতু তাঁর পিতার সংবাদে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই তিনি এজিওলোনার মাধ্যমে ঈসায়ীদেরকে শক্তিশালী করে তুলে দামেশকের খলীফার কবল থেকে স্পেনকে মুক্ত করার তদবিরে লিপ্ত হলেন। আমীর আবদুল আযীয খলীফা সুলায়মানকে তাঁর পক্ষ থেকে আশ্বস্ত রাখার উদ্দেশ্যে স্পেনের খারাজ বা ভূমি রাজস্বের এক বিরাট অংক ও উপঢৌকনাদি দামেশকের উদ্দেশে রওয়ানা করেন। খলীফা তাঁর নিজস্ব প্রতিবেদকদের মাধ্যমে আবদুল আযীযের মনোভাব সম্পর্কে যথাসময়েই অবহিত হয়েছিলেন। এবার যারা খারাজ ও উপঢৌকনাদি নিয়ে দামেশকে গেল, তারাও খলীফাকে আমীর আবদুল আযীযের মারাত্মক দুরভিসন্ধি ও অসংগত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করলো।

আমীর আবদুল আযীয নিহত

বিদ্রোহের এ অপরাধে খলীফার দরবার থেকে যে ফরমান জারি হওয়ার ছিল তাই হলো। খলীফা সুলায়মান তাঁর নিকট রাজস্ব ও উপঢৌকনাদি প্রেরণের জন্যে ব্যবহৃত লোকদের মাধ্যমেই স্পেনের পাঁচজন মুসলমান সর্দারের নামে নির্দেশ প্রেরণ করলেন যে, আবদুল আযীযের দুর্মতির কথা যথার্থ হলে কালবিলম্ব না করে তাকে হত্যা কর। আমীর আবদুল আযীয তাঁর রাজধানী আশবেলিয়ায় (সেভিলে) স্থানান্তরিত করেছিলেন। খলীফার উক্ত নির্দেশ সর্বপ্রথম হাবীব ইব্‌ন উবায়দার কাছে পৌছলে তিনি অন্য চারজনকেও এ ব্যাপারে সলাপরামর্শের উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠালেন। অবশেষে পাঁচজন সর্দারই আমীর আবদুল আযীযকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হলেন। তারা সত্যি সত্যি খলীফার নির্দেশ অনুসারে আবদুল আযীযকে গ্রেফতার করে হত্যা করলেন এবং শবদেহ আশবেলিয়ায় (সেভিলে) দাফন করে তাঁর শির দামেশকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা মূসা ইব্‌ন নুসায়রের ভাগিনেয় অর্থাৎ আমীর আবদুল আযীযের ফুফাতো ভাই আইয়ুব ইব্‌ন হাবীব লাযমীকে স্পেনের নতুন আমীরের আসনে বসালেন। খলীফা সুলায়মান যেহেতু আমীর আবদুল আযীযের দোষী বা নির্দোষ হওয়ার তদন্তের ভার স্পেনের উক্ত পাঁচ সর্দারের উপরই ছেড়ে

দিয়েছিলেন তাই আমীর আবদুল আযীয সত্যিই দোষী প্রতিপন্ন হয়ে নিহত হলেন কিনা সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। এ জন্যেই তিনি দামেশককে আবদুল আযীযের পরবর্তী আমীর কে হবেন তা নির্ধারণ করে দেন নি। বরং উক্ত পাঁচ সর্দারকেই তিনি এ মর্মে অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন যে, তাঁরা যাকে সঙ্গত মনে করেন, তাঁকেই যেন নিজেদের আমীর রূপে বেছে নেন। করাও হয়েছিল তাই। স্পেনের ঐ পাঁচজন সর্দার যদি আবদুল আযীযের দোষ না পেতেন, তবে তাঁরা কস্মিনকালেও তাকে হত্যা করতেন না। খলীফা সুলায়মান আবদুল আযীযকে হত্যার ব্যাপারে যে দৃঢ়তা ও সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, তার চাইতে অধিক সতর্কতা অবলম্বনের কোন অবকাশ ছিল না। এ জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্দারদের সংখ্যাও এমন ছিল যে, এত লোকের একত্রে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আশংকা ছিল না। এছাড়া এর চাইতে বেশি নির্ভরযোগ্য তদন্তের আর কোন মাধ্যমও ছিল না। এ সর্দাররা যে এ ব্যাপারে কতটুকু নিঃস্বার্থ ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন, তার প্রমাণ হলো, তাঁরা আবদুল আযীযকে হত্যার পর তাঁরই বংশের একজনকে, যিনি শুধু তাঁর ফুফাত ভাইই নন, চাচাত ভাইও ছিলেন, তাঁকেই তাঁরা স্পেনের পরবর্তী আমীর রূপে নির্বাচন করলেন। এই নবনির্বাচিত আমীর আইয়ুব ইব্ন হাবীবের পিতা মূসা ইব্ন নুসায়রের চাচাত ভাই ছিলেন। উক্ত সর্দারগণ যদি কোনরূপ ব্যক্তিগত শত্রুতাবশে আমীর আবদুল আযীযকে হত্যা করতেন তা হলে তাঁরই খান্দানের মধ্যে স্পেনের আমীর পদ তাঁরা থাকতে দিতেন না। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা ব্যাপারটিকে এমনভাবে চিত্রিত করেন যে, তাঁদের বিবরণ পড়লে খলীফা সুলায়মানের একটি অত্যাচারী চেহারা চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। তাঁরা আবদুল আযীয ইব্ন মূসার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, যা পাঠে মুসলমান পাঠক উল্লসিত হয়ে ওঠেন। তারপর যখন এহেন নির্দোষ ও নিরপরাধ ব্যক্তিটির নির্মমভাবে নিহত হওয়ার বিবরণ তাঁরা পাঠ করেন তখন খলীফা সুলায়মানের প্রতি ঘৃণায় তাঁদের মন বিষিয়ে ওঠে। আর ঈসায়ী ঐতিহাসিকগণের উদ্দেশ্যও তাই।

আইয়ুব ইব্ন হাবীব

খলীফার নির্দেশ পালনকারী পাঁচজন সর্দার আবদুল আযীযকে হত্যা করার পর সমস্ত ফৌজী ও প্রশাসনিক সর্দারদের একত্র করে তাঁদের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন পরিষদ গঠন করে আইয়ুব ইব্ন হাবীবের নাম পরবর্তী আমীররূপে পেশ করেন। সকলেই এ শর্তে তা মঞ্জুর করেন যে, কায়রোয়ানে নিযুক্ত খলীফার ভাইসরয় মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ এবং খলীফাতুল মুসলিমীন মঞ্জুর করলে তিনিই স্পেনের পরবর্তী আমীর হবেন। অন্যথায় তাঁরা যাকে আমীর মনোনীত করলেন তিনিই আমীর হবেন।

কর্ডোভায় রাজধানী স্থানান্তর

আইয়ুব ইব্ন হাবীব যখন লক্ষ্য করলেন যে, আশবেলিয়ায় (সেভিলে) ঈসায়ী ও ইহুদী অধিবাসীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য এবং আমীর আবদুল আযীযের অনুসৃত বিশেষ কর্মনীতির ফলে সেখানে তাদের প্রভাবটি সমধিক কার্যকরী তখন তিনি আশবেলিয়ার পরিবর্তে

কর্ডোভায় রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। কর্ডোভাতে রাজধানী স্থানান্তর আমীর আইয়ুবের অন্যতম প্রধান ও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বলে গণ্য হওয়ার কারণ, এরপর সুদীর্ঘকাল মুসলমানদের প্রাদেশিক রাজধানী এবং পরে দারুল খিলাফত বা কেন্দ্রীয় রাজধানীরূপে গণ্য হয়ে পৃথিবীব্যাপী বিখ্যাত হয়ে ওঠে। তারপর আমীর আইয়ুব আফ্রিকা ও মরক্কো থেকে বার্বার ও আরব গোত্রসমূহকে স্পেনে এসে বসবাস করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাঁর সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে অনেক মুসলমান স্পেনে আগমন করেন এবং আমীর আইয়ুব তাদেরকে স্পেনের বিভিন্ন শহর ও জনপদে পুনর্বাসিত করেন। এভাবে ঈসায়ীদের বিদ্রোহের আশংকা অনেকটা প্রশমিত হয়। সীমান্ত এলাকাসমূহে দুর্গ নির্মিত হয় এবং সে সব দুর্গে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে মওজুদ রাখা হয়। আমীর আইয়ুবের শাসনকাল ছয় মাস পূর্ণ হতেই তাঁকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে হার্‌ব ইবন আবদুর রহমান ছাকাফীকে স্পেনের শাসক করে পাঠানো হয়। ঘটনা হলো, আমীর আইয়ুবের অসাধারণ যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার কথা জ্ঞাত হয়ে কায়রোয়ানে নিযুক্ত খলীফার ভাইসরয় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদের সন্দেহ হয় যে, আইয়ুব আমীর আবদুল আযীয ও মূসা খান্দানেরই লোক। যে কোন সময় তিনি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারেন। তাই তিনি নিজের অধিকার প্রয়োগ করেই হার্‌ব ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন উসমানকে গভর্নরীর সনদ দিয়ে স্পেনে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁকে এ মর্মে নির্দেশ পাঠালেন যে, আইয়ুবকে পদচ্যুত করে স্পেনের গভর্নর পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর খলীফার দরবার থেকে তার অনুমোদনও গ্রহণ করেন।

হার্‌ব ইব্‌ন আবদুর রহমান ছাকাফী

হার্‌ব ইব্‌ন আবদুর রহমান স্পেনে পৌঁছে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নেন এবং মূসা আবদুল আযীয ও আইয়ুবের আমলের সমস্ত আমলাকে সন্দেহ করে তাঁদের প্রতি কঠোর আচরণ করতে শুরু করেন। তাছাড়া ঈসায়ী এবং ইহুদীদের সাথেও একই আচরণ করতে থাকেন। ঈসায়ী ও ইহুদীরা ইতিপূর্বে মুসলমান শাসকদেরকে অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীলরূপে দেখেছে। তারা তাদের একটি প্রতিনিধিদলকে কায়রোয়ানে প্রেরণ করে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদের প্রতি তাঁর স্পেনে প্রেরিত নতুন গভর্নরকে বদলী করার আবেদন জানান। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ সে আবেদনে কর্ণপাত করলেন না। কারণ, হার্‌ব ইব্‌ন আবদুর রহমানকে তিনিই মনোনীত করে পাঠিয়েছিলেন। প্রতিনিধিদল তখন সাহস করে দামেশকে খলীফার দরবারে উপনীত হলেন। সৌভাগ্যক্রমে, দামেশকে তখন খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের রাজত্বের অবসান ঘটেছে এবং খলীফা হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের খিলাফতের যুগ শুরু হয়েছে। প্রতিনিধিদলটি খলীফাতুল মুসলিমীনের দরবারে উপনীত হয়ে হার্‌ব ইবন আবদুর রহমানের স্থলে স্পেনে কোন দয়ালু ও প্রজাবৎসল আমীর নিয়োগ করার আবেদন জ্ঞাপন করেন। হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয হারব ইব্‌ন আবদুর রহমানকে স্পেনের গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করে আফ্রিকিয়া প্রদেশের প্রধান সেনাপতি সামাহ্ ইব্‌ন মালিক খাওলানীকে স্পেনের গভর্নর রূপে নিযুক্তি প্রদান করেন।

সামাহ্ ইব্ন মালিক স্পেনে উপনীত হয়ে হার্‌ব ইব্ন আবদুর রহমানকে পদচ্যুত করে নিজে শাসনভার গ্রহণ করেন। হার্‌ব ইব্ন আবদুর রহমান ছাকাফী স্পেনে দুবছর আট মাসকাল রাজত্ব করেছিলেন।

সামাহ্ ইব্ন মালিক

আমীর সামাহ্ ইব্ন মালিক খাওলানী যদিও একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব এবং তারিক ইব্ন যিয়াদের স্পেন অভিযানের সহযাত্রী ছিলেন, কিন্তু তিনি স্পেনের শাসনভার হাতে নিয়েই সর্বপ্রথম সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দিকে মনোনিবেশ করলেন। আমীর সামাহ্‌র শাসন ছিল হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের শাসনেরই প্রতিচ্ছবি।

স্পেনে আদমশুমারী

হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের নির্দেশক্রমে আমীর সামাহ্ স্পেনে আদমশুমারী করান। ফলে প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক গোত্র এবং প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী লোকদের সংখ্যা নির্ণীত হয়। বার্বারী লোক আমীর সামাহ্ বার্বারদেরকে জনহীন এলাকাসমূহে পুনর্বাসিত করে তাদেরকে কৃষি ও শিল্পকর্মে উৎসাহ প্রদান করেন। এ ব্যাপারে তিনি সাফল্য লাভ করেন। স্পেনের একটি ভৌগোলিক বর্ণনা প্রস্তুত করান, যাতে প্রতিটি শহর ও জনপদের জনসংখ্যা, অবস্থান এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদি সন্নিবেশিত ছিল। এক শহর থেকে আরেক শহরের দূরত্ব, নদনদী, পাহাড়-পর্বত সব কিছুর বিবরণও তাতে লিপিবদ্ধ ছিল। দেশের ব্যবসাপণ্যসমূহের তালিকা, বন্দরসমূহের বিবরণ, খনিজ দ্রব্যাদির অবস্থাসহ স্পেন দেশের একটি বিশদ ভূগোল প্রণয়ন করে তিনি তা খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন। সাথে সাথে স্পেন দেশের একটি মানচিত্র প্রস্তুত করিয়ে তাও তিনি খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য সহজ করে তোলেন। জিযিয়া, উশর, খুমুস ও ভূমি রাজস্বের পাকা আইন-কানুনও তিনি চালু করেন। তিনি সারাকস্তা শহরে একটি মসজিদ এবং কর্ডোভায় ওয়াদিউল কবীর নদীর উপর বিখ্যাত পুল নির্মাণ করান। এছাড়াও স্থানে স্থানে তিনি আরও অনেক মসজিদ ও পুল নির্মাণ করান। মোটকথা, মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই তিনি স্পেনকে একটি শান্তি ও ন্যায়ের রাজ্যে পরিণত করেন। আমীর সামাহ্‌কে স্পেনের আমীরদের মধ্যে ঠিক সেই মর্যাদার আসনই দেয়া হয়ে থাকে, যা বনূ উমাইয়া বংশীয় খলীফাদের তুলনায় হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের ছিল।

দক্ষিণ ফ্রান্সে অগ্রাভিযান

আমীর সামাহ্‌র শাসনকালের প্রথম দিক দেখে কোনদিন মনেও হয়নি যে, তিনি একজন কুশলী সমরবিদ ও সুদক্ষ সিপাহসালারও হতে পারেন। স্পেনের অভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলাকে সংহত করে খলীফার অনুমতিক্রমে আমীর সামাহ্ সসৈন্যে জাবলে আলবুর্তাত অভিমুখে অগ্রসর হন। এই পাহাড়ের উপত্যকাসমূহ অতিক্রম করে তিনি যে এলাকায়

উপনীত হন তা বর্তমানে দক্ষিণ ফ্রান্স বলে পরিচিত। তিনি ফ্রান্সের এ এলাকায় দুটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন। এর একটি ছিল স্পেন থেকে পালিয়ে আসা গথদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এ রাজ্যটির রাজধানী ছিল নার্বুন শহর। যেহেতু স্পেনের যে পরিমাণ ধন-সম্পদ ও রত্নভাণ্ডার বয়ে আনা সম্ভবপর ছিল তা তারা নিয়ে এসেছিল এবং মুসলমানদের যারা শত্রু ছিল তারাই এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তাই এ রাজ্যটি ছিল খুবই শক্তিশালী। একে দুর্জেয় মনে করা হতো আর তার ভৌগোলিক অবস্থানও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপর শক্তিশালী রাজ্যটি ছিল গল সম্প্রদায়ের, যার রাজধানী ছিল তুলুয। আমীর সামাহ্ জাবলে আলবুর্তাত বা পিরেনীজ পর্বত অতিক্রম করে নার্বুনের ওপর হামলা করে শহরটি অধিকার করে নেন। গোটা রাজ্যটিই তখন মুসলমানদের দখলে চলে আসে। মুসলিম বাহিনী এ শহরে প্রচুর গনীমত লাভ করেন। নার্বুন জয় শেষে তুলুযেও আক্রমণ চালানো হয়। এখানে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। অবশেষে মুসলমানরা শহরটি অবরোধ করে ফেলে। মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। পক্ষান্তরে ঈসায়ী সৈন্যদের সংখ্যা পরবর্তী প্রতিটি যুদ্ধেই অনেক বেশি বর্ধিত কলেবরে সম্মুখে আসতে থাকে। তুলুষ শহর বিজিত হওয়ার মুখে ডিউক অব একিউটিন নামক জনৈক খ্রিস্টান শাসক এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সমরক্ষেত্রে উপনীত হন। আমীর সামাহ্র সাথে যে সব সৈন্য অভিযানে বেরিয়েছিলেন তাদের একাংশকে বিজিত নার্বুন প্রভৃতি বিজিত অঞ্চলে রেখে আসতে হয়েছিল। এজন্য তাঁর সাথে শেষ পর্যন্ত অতিনগণ্য সংখ্যক মুসলমানই ছিলেন। মুসলিম সৈন্যদের সঠিক সংখ্যা বলা মুশকিল। তবে একথা নিশ্চিত যে, যখন বিপুল সংখ্যক ফরাসী যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ব্যূহ রচনা করলো তখন হতবুদ্ধি না হয়ে আমীর সামাহ্ সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করে মুসলিম সৈন্যদের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধির জন্য তাদের এক উদ্দীপনাময় ভাষণ প্রদান করলেন। অপরদিকে খ্রিস্টান পাদ্রী পুরোহিতরা ও ফরাসী বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করে ভাষণ দিল। তারপর যুদ্ধ শুরু হলে, তারিক ও রডারিকের যুদ্ধের চিত্রই দক্ষিণ ফ্রান্সে পুনরায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত তীর ও তরবারি ও বল্লমের বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হলো। বিশাল ফরাসী বাহিনী মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্যের হাতে লাশের স্তূপ ফেলে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার এবং গোটা ফ্রান্স মুসলিম বাহিনীর পদতলে দলিত হওয়ার উপক্রম হয়।

আমীর সামাহ্র শাহাদাত

ঠিক যে সময় মুসলমানরা ঈসায়ী সৈন্যদেরকে ধাওয়া করে অগ্রসর হচ্ছিল, এমনি সময় অকস্মাৎ একটি তীর এসে আমীর সামাহ্র গলদেশের ঠিক মধ্যভাগে লাগে এবং তার অর্ধেক অংশ তাঁর গলা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। আপন আমীরকে এমন শোচনীয় শাহাদাতবরণ করতে দেখে মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ে। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে তারা হতবুদ্ধি হলেন না, যেমনটি সাধারণত এ অবস্থায় হওয়ার কথা। মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতি থেমে যায়। চোখের পলকে খ্রিস্টানরা প্রবল হয়ে উঠলো। মুসলমানরা কালবিলম্ব না করে আমীর সামাহ্র স্থলে আবদুর রহমান গাফিকীকে নিজেদের সিপাহসালার ও আমীর নির্বাচিত করলেন। আবদুর রহমান গাফিকী অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং ধৈর্যের সাথে

মুসলিম বাহিনী নিয়ে পিছু হটে আসলেন। কিন্তু ইসলামী বাহিনীকে ধাওয়া করার সাহস ঈসায়ীদের হলো না। রণক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান শহীদ হলেন। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশকে নিয়ে আবদুর রহমান গাফিকী পশ্চাদপসরণ করলেন।

আবদুর রহমান ইবন্ আবদুল্লাহ্ গাফিকী

আবদুর রহমান গাফিকী যে বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাথে আপন বাহিনীকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচিয়ে নার্বুনে ফিরিয়ে আনলেন, তাতে সাধারণভাবে ঐতিহাসিকরা তাঁর প্রশংসাই করে থাকেন। তুলুযের যে যুদ্ধে আমীর সামাহ্ শাহাদাতবরণ করেন তা ১০২ হিজরীতে (৭২০ খ্রি) সংঘটিত হয়। তুলুয রণভূমি থেকে নার্বুন আসার পথে ঈসায়ী প্রজারা স্থানে স্থানে এ বাহিনীকে লুটপাট করতে প্রয়াস পায়। তারা ভেবেছিল, যেভাবে পরাস্ত বিপর্যস্ত বাহিনী বা কাফেলাকে গ্রাম্য লোকজন লুটেপুটে নিতে পারে, সেরূপ আমরাও বুঝি এদেরকে ধ্বংস করে দিতে সমর্থ হবো। কিন্তু তাদের জানা ছিল না যে, ফরাসী দশগুণ ভারী দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীও তাদের উপর হামলা পরিচালনার বা পশ্চাদ্ধাবনের সাহস পায়নি। পথে কয়েক স্থানে ঈসায়ীদের সাথে তাঁদের লড়াই হয় এবং প্রত্যেক স্থানেই ঈসায়ীরা পরাস্ত হয়ে পালাতে বাধ্য হয়। নার্বুন শহরে পৌঁছে আমীর আবদুর রহমান গাফিকী নিজের বাহিনীর প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করেন এবং এ প্রদেশ থেকে খারাজ ও গনীমতের মাল আদায় করেন। তারপর জাবলে আল-বুরতাত বা পিরেনীজ পর্বতের সে সব গোত্রের বিদ্রোহ দমন করেন, যারা আমীর সামাহ্র শাহাদাত এবং তুলুষ থেকে মুসলমানদের ফিরে আসার কথা শুনে বিদ্রোহ এবং মুসলমানদের অনিষ্ট-সাধনের প্রয়াস পেয়েছিল। এ পার্বত্য গোত্র কয়টিকে শায়েস্তা করে আমীর আবদুর রহমান স্পেনে ফিরে আসেন।

আমীর সামাহ্ ফ্রান্স অভিযানে যাওয়ার প্রাক্কালে আম্বাসা ইব্ন সুহায়ম কালবীকে স্পেনে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। আম্বাসা যখন খবর পেলেন যে, আবদুর রহমানকে পার্বত্য উপজাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে তখন তিনি স্পেন থেকে সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু ঐ সাহায্যকারী বাহিনী ঐ এলাকায় পৌঁছার পূর্বেই আবদুর রহমানের যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তাঁদের স্পেনে প্রত্যাবর্তনের পর ফৌজী নির্বাচন অনুসারে আবদুর রহমান গাফিকীকেই স্পেনের পরবর্তী আমীররূপে নির্বাচিত করা হয়।

আবদুর রহমানের পদচ্যুতি

কিন্তু কয়েক দিন পরেই যখন আফ্রিকার গভর্নর বাশার ইব্ন হানযালা আবদুর রহমান গাফিকীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলেন যে, তিনি সামরিক বাহিনীর লোকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন তখন তিনি আবদুর রহমানকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে আম্বাসা ইব্ন সুহায়ম কালবীকে স্পেনের আমীর রূপে নিযুক্তি প্রদান করেন। আবদুর রহমান তাঁর এ নিযুক্তিকে অম্লান বদনে মেনে নেন। আমীর আম্বাসা ইব্ন সুহায়ম কালবীর হাতে তিনি যথারীতি বায়আত হলেন। নবনিযুক্ত আমীর আবদুর রহমানকে তাঁকে তার পূর্ববর্তী কর্মস্থল পূর্ব স্পেনের আমীর পদে পুনর্বহাল করলেন।

আম্বাসা ইবন্ সুহায়ম কালবী

আম্বাসা আমীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েই অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে দেশ শাসন শুরু করেন এবং প্রজাসাধারণের নানারূপ হিতসাধন করতে থাকেন। আমীর-আম্বাসার শাসনামলের শুরুর দিকে বালাই নামক জনৈক খ্রিস্টান একটি পার্বত্য এলাকায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং অনেক খ্রিস্টান তার সাথে মিলিত হয়। ইংরেজীতে তাকে পলিও নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তার বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে ইসলামী বাহিনী বিদ্রোহদমনে মনোনিবেশ করে। তারা এই বিদ্রোহী খ্রিস্টানদেরকে হত্যা ও বন্দী করে এ বিদ্রোহের অবসান ঘটান। পলিও ফেরার হয়ে ত্রিশজন সঙ্গীসহ পার্বত্য এলাকায় গিয়ে আত্মগোপন করে। মুসলমানরা মাত্র ত্রিশজনের এ ক্ষুদ্রদলকে তুচ্ছ বিবেচনা করে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি। মুসলমানরা সক্রিয় হলে যেখানেই তারা যাক না কেন পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে গ্রেফতার করে হত্যা করতে পারতো। কিন্তু এ ফিৎনা নির্মূল করাকে তারা ততটা জরুরী বিবেচনা করেনি। এ ত্রিশ ব্যক্তি সর্বদা লুপপাট করে পার্বত্য এলাকায় আত্মগোপন করে থাকে। তাদের লুটপাটের ফলে কোন কোন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। মুসলমানরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করায় বা এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এরা ক্রমেই শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ লাভ করে। ঈসায়ীরা ক্রমান্বয়ে এসে তাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের দল ভারী করতে থাকে। এভাবে স্পেনে একটি ঈসায়ী রাষ্ট্রের গোড়পত্তন হয়। ইনশাআল্লাহ্ পরে এর বিবরণ দেয়া হবে।

দক্ষিণ ফ্রান্স বিজয়

আমীর আম্বাসা শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করে ফ্রান্স আক্রমণ করেন। নার্বুন এলাকা পূর্ব থেকেই মুসলিম অধিকারে ছিল। এজন্যে পিরেনীজ পর্বত অতিক্রম করতে তাদের বেগ পেতে হয়নি। আমীর আম্বাসা গোটা দক্ষিণ ফ্রান্স অধিকার করে ফেলেন এবং মধ্যফ্রান্সে উপনীত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে সৈন্যবাহিনীকে ছড়িয়ে দেন। এ পর্যায়ে গনীমতের মালের প্রাচুর্যে মুসলিম বাহিনীর বোঝা বেড়ে ওঠে। ফরাসীরা তাদের সমস্ত সামরিক শক্তিকে সংঘবদ্ধ করেও তাদের দেশের অর্ধেকেরও বেশি অংশের মুসলিম বাহিনীর পদতলে পিষ্ট হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করতে থাকে। অবশেষে এক দুর্বল মুহূর্তে তারা সুযোগমত মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং তাতে তাদের পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করে। কিন্তু এবারও মুসলমানরা বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন এবং ফরাসীদেরকে দাঁত ভাঙা জবাব দেন।

আমীর আম্বাসার শাহাদাত

আমীর আম্বাসা অসতর্কতার জন্যে নিজের বিপদ ডেকে আনলেন। তিনি তাঁর বাহিনীর সারি অতিক্রম করে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে ঈসায়ীদের ওপর হামলা চালালেন। তিনি ঈসায়ী বাহিনীর সারিসমূহ ভেদ করে একেবারে তাদের মধ্যস্থলে ঢুকে শাহাদাতবরণ করেন।

ফলশ্রুতিতে তুলুযের যুদ্ধের মত এবারও মুসলমানদের পশ্চাদপসরণ করতে হয়। আমীর আম্বাসা তাঁর শাহাদাতবরণের প্রাক্কালে উরওয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ ফাহরীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। তাই আমীর সামাহর শাহাদাতবরণের পর যেভাবে আবদুর রহমান গাফিকী মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন ঠিক সেভাবেই উরওয়া ইবন আবদুল্লাহ ফাহরী মুসলিম বাহিনীকে স্পেনে ফিরিয়ে আনেন। এটি ১০৭ হিজরীর (৭২৫-২৬ খ্রি) ঘটনা।

উরওয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ ফাহরী

উরওয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ স্পেনের মশহুর সর্দারদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর সম্প্রদায় ও খান্দানের প্রচুর লোক স্পেনে বাস করতেন। তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত, সাহসী এবং ধীরস্থির মেযাজের মানুষ ছিলেন। কিন্তু স্পেনের কিছু লোক তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আফ্রিকার গভর্নর বাশার ইব্‌ন হানযালা ইব্‌ন সারওয়ানের নিকট অভিযোগ করে। তিনি উরওয়ার স্থলে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সালমাকে স্পেনের আমীর নিযুক্ত করেন। উরওয়া কয়েক মাস মাত্র স্পেনের আমীর ছিলেন।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সালমা

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সালমা কালবী ১০৭ হিজরীর (৭২৫-২৬ খ্রি.) শেষ দিকে স্পেনের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর মেযাজে রুক্ষতা ও জিদ ছিল অত্যন্ত বেশি। এজন্যে স্পেনের প্রজাসাধারণ তাঁর প্রতিও অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। আফ্রিকার গভর্নরের কাছে তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ফলে দু'বছর কয়েক মাস পর তিনিও পদচ্যুত হন এবং তাঁর স্থলে আমীর উসমান ইব্‌ন আবূ উবায়দা লাখমী স্পেনের শাসক নিযুক্ত হন।

উসমান

আমীর উসমানকে ১১০ হিজরীতে (এপ্রিল ৭২৮-মার্চ ২৯ খ্রি) আফ্রিকার গভর্নর আবদুর রহমান স্পেনের আমীররূপে নিয়োগ করে প্রেরণ করেন। বাশার ইব্‌ন হানযালার পর উবায়দা ইব্‌ন আবদুর রহমান আফ্রিকার গভর্নর হয়েছিলেন। আমীর উসমান মাত্র পাঁচ মাসকাল স্পেন শাসন করার পরই হুযায়ফা ইবনুল আহ্‌ওয়াস কায়সীকে আমীর নিযুক্ত করে পাঠানো হয়।

হুযায়ফা ইবনুল আহ্‌ওয়াস

আমীর হুযায়ফা ইবনুল আহ্‌ওয়াস ১১০ হিজরীর (এপ্রিল ৭২৮-মার্চ ২৯ খ্রি) শেষ নাগাদ স্পেন শাসন করেন। তারপর ১১১ হিজরীর মুহাররম (৭২৯ খ্রি-এর মার্চ) মাসে আফ্রিকার গভর্নর হুযায়ফার স্থলে হাশীম ইব্‌ন উবায়দ কিলাবীকে স্পেনের শাসক নিযুক্ত করে পাঠান। কোন কোন বর্ণনায় প্রমাণিত হয় যে, দামেশকের খলীফা নিজেই হাশীমকে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন।

হাশীম ইব্ন উবায়দ

হাশীম ইব্ন উবায়দ কিলাবী ছিলেন শামী বংশোদ্ভূত। তাঁর মধ্যে কঠোরতার আধিক্য ছিল বিধায় স্পেনবাসীদের কাছে তাঁর কার্যকলাপ ভাল ঠেকেনি। স্পেনের মুসলমান ও খ্রিস্টান সকলেই হাশীমের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এর ফলে পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে একটি প্রতিনিধিদল অভিযোগ নিয়ে আফ্রিকায় গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু আফ্রিকার গভর্নর এ প্রতিনিধিদলের কথায় কর্ণপাত করলেন না বা স্পেনের আমীরকে পদচ্যুতও করলেন না। হাশীম যেহেতু স্বয়ং দামেশকের খলীফার মনোনীত ও প্রেরিত আমীর ছিলেন, তাই আফ্রিকার গভর্নর তাকে পদচ্যুত করার সাহস করেননি। মোদ্দা কথা, আফ্রিকা অর্থাৎ কায়রোয়ানে স্পেনের আমীরের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী প্রতিনিধিদল তাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে দামেশকে খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিকের দরবারে গিয়ে উপনীত হন। তাঁরা তাদের শাসকের বিরুদ্ধে কঠোর আচরণের অভিযোগ করলে খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আশজাঈকে স্পেন অভিমুখে রওয়ানা করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আশজাঈকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন স্পেন গিয়ে হাশীমের কার্যকলাপ তদন্ত করে দেখেন এবং প্রথমে ছদ্মবেশে থেকে পূর্ণ মনোযোগের সাথে তন্ন তন্ন করে এ তদন্ত কার্য চালান। তদন্তে যদি সত্যিই হাশীমের অপরাধ প্রমাণিত হয়, তবে কাল-বিলম্ব না করে তাকে পদচ্যুত করে নিজের হাতে শাসনভার গ্রহণ করবেন। আর যদি দেখা যায় যে, তাঁর কোন কার্যকলাপ খিলাফত ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ-বিরোধী নয়, তবে তাঁকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে অর্থাৎ স্পেনের আমীররূপে থাকতে দিয়ে ফিরে আসবে।

হাশীমের পদচ্যুতি

হাশীম ইব্ন উবায়দ মাকরেশায় জিহাদ করেন এবং সে এলাকা জয় করে সেখানে দশ মাসকাল অবস্থান করেন। দু'বছরকাল স্পেন শাসন করার পর হাশীম পদচ্যুত হন।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আশজাঈ

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ আশজাঈ স্পেনে উপনীত হয়েই তদন্তকার্যে মনোনিবেশ করেন এবং খুব দ্রুত তদন্তকার্য সম্পন্ন করেন। তদন্তে মুহাম্মাদ ইব্ন হাশীমের অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলে তিনি তাঁর পরিচয় দেন এবং খলীফার নির্দেশের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি হাশীমকে গ্রেফতার করে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় দামেশকে খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন এবং নিজে কয়েক মাস স্পেনে অবস্থান করে সেখানকার শাসন-শৃঙখলার অব্যবস্থা দূর করেন। তারপর আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ গাফিকীকে পুনরায় স্পেনের আমীর পদে বসিয়ে নিজে দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। এটা ১১৩ হিজরীর (৭৩২ খ্রি.) ঘটনা।

দ্বিতীয়বারের মত আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ্ গাফিকী

আবদুল রহমান ইবন আবদুল্লাহ গাফিকী স্পেনের শাসনভার হাতে নিয়ে সর্বপ্রথম রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থাসমূহ দূর করেন। স্পেনের অধিকাংশ শহর ও জনপদে তিনি মাদ্রাসা, মসজিদ ও পুল নির্মাণ করে পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফ্রান্স আক্রমণ করার এবং এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ব্যর্থতাসমূহের প্রতিবিধানে মনোনিবেশ করেন।

উসমান লাখমীর বিদ্রোহ

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার পাঁচ মাসকাল উসমান লাখমী আমীর রূপে স্পেন শাসন করেন। তারপর তাঁকে পদচ্যুত করে স্পেনের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশের শাসনকর্তার পদদান করা হয়। এই প্রদেশেই ছিল জাবাল আল-বুরতাত বা পিরেনীজ পর্বত এবং তার উত্তরস্থ সেই ভূখণ্ডটি যা মুসলমানরা ইতিপূর্বে জয় করে নিয়েছিলেন। উসমান যেহেতু গোটা স্পেন রাজ্যের শাসকরূপে ইতিপূর্বে গোটা দেশ শাসন করেছিলেন আর এখন তাঁরই একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের শাসক, তাই তাঁর মনে গভীর অসন্তোষ বিরাজ করছিল। এজন্যে তিনি অহরহ স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তায় বিভোর থাকতেন। উসমান যেহেতু বার্বার বংশোদ্ভূত ছিলেন, তাই তার আরব বা সিরীয়দের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি ছিল না এবং তিনি তাদের প্রতি অনেকটা বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাবই অন্তরে পোষণ করতেন। ডিউক অব একিউটিন যেহেতু ফ্রান্সের এক বিরাট অংশ জুড়ে রাজত্ব করছিলেন আর তিনি ছিলেন গথ বংশের রাজা, তুলুয যুদ্ধের পর ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের রাজা চার্লস মার্টিলের মুকাবিলায় নিজেকে শক্তিশালী প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিবেশী মুসলমান আমীরকে নিজের পক্ষে টেনে ও তার সহানুভূতি অর্জন করে মার্টিলকে তার নিজের তুলনায় হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সক্রিয় ও তৎপর হলেন। সেমতে ডিউক অব একিউটিন উসমানের সাথে পত্রযোগাযোগ স্থাপন ও উপঢৌকনাদি বিনিময়ের মাধ্যমে সখ্যতা স্থাপন করলেন এবং তাদের এ সখ্যতা এতদূর পর্যন্ত গড়ালো যে, ডিউক অব একিউটিন তাঁর নিজের সুন্দরী তন্বী কন্যাকে এ শর্তে উসমানের বিবাহবন্ধনে দান করলেন যে, সে তার পিতৃধর্মে টিকে থাকতে পারবে, উসমান তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে না। কন্যা সম্প্রদানের বিনিময়ে ডিউক অব একিউটিন উসমানের নিকট থেকে এ মর্মে লিখিত সন্ধিনামা হাসিল করলেন যে, উসমান কখনো তাঁর বাহিনীকে ডিউকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে না।

উসমান লাখমী নিহত হলেন

এবার যখন স্পেনের আমীর আবদুর রহমান গাফিকী ফ্রান্সের ওপর হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে জাবালে আল-বুরতাত অতিক্রম করতে মনস্থ করলেন তখন তিনি উসমানকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন তাঁর অধীনস্থ বাহিনীকে আমীরের বাহিনীর অধীনে সমর্পণ করেন এবং সর্বপ্রকার যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত

থাকেন। উসমান সে নির্দেশ পালনে তাঁর অসুবিধা আছে বলে জানালো এবং নানা টালবাহানা করে সময় কাটাতে থাকেন। কিন্তু আবদুর রহমান সসৈন্যে এসে পৌঁছলে স্বয়ং উসমানই মুসলিম বাহিনীকে জাবালে আল-বুরতাতের গিরিপথে বাধা দেয়ার এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তখন আবদুর রহমান এক সর্দারকে স্বল্প সংখ্যক সৈন্যসহ উসমানকে দমনের জন্য প্রেরণ করলেন। উসমান পরাস্ত হয়ে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যান। সেই সর্দার তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করেন এবং তার ঈসায়ী স্ত্রীকে গ্রেফতার করে আবদুর রহমানের কাছে নিয়ে আসেন।

এভাবে জাবালে আল-বুরতাতের এ বাধা অপসারণ করে ইসলামী বাহিনী পর্বত ডিঙিয়ে ফ্রান্সের সমভূমিতে গিয়ে পদার্পণ করে। তখন নার্বুন শহর ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা। এ শহর থেকে অগ্রসর হয়ে ইসলামী বাহিনী ফ্রান্সের শহরসমূহ অধিকার করে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত বন্দর ও উল্লেখযোগ্য শহর বোর্ডিওও মুসলিম অধিকারে চলে আসলো। এ পর্যায়ে ডিউক অব একিউটিন বাধ্য হয়ে চার্লস মার্টিলের আধিপত্য স্বীকার করে নেন। তিনি তাঁর সমস্ত বাহিনী নিয়ে চার্লস মার্টিলের কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামী বাহিনীর সয়লাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তাঁকে উৎসাহিত করেন। চার্লস মার্টিল অত্যন্ত যোগ্যতা ও সতর্কতার সাথে সম্ভাব্য বেশি পরিমাণ সৈন্য ও যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহ করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ঈসায়ী সৈন্যদের এক বিরাট বাহিনী বিখ্যাত সেনাপতিদের নেতৃত্বে তাঁর পতাকাতলে এসে সমবেত হয় এবং এ যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধরূপে চিত্রিত করে ঈসায়ী পাদ্রীরা উত্তেজনাকর বক্তৃতার মাধ্যমে ঈসায়ীদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। মুসলমানরা গরূন নদী অতিক্রম করে ওয়ার্দুন নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হন। এখানে ঈসায়ী সৈন্যরা মুসলমানদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়, কিন্তু মুসলমানদের হাতে তারা শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। মুসলমানরা পাইটেরাস শহর অধিকার করে নেন।

তুরস শহরে যুদ্ধ

পাইটেরাস শহর অধিকার করে মুসলিম বাহিনী তুরস শহর অভিমুখে যাত্রা করে। শহরটি ফ্রান্সের সমতল এলাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তুরস শহরের নিকটবর্তী একটি প্রান্তরে সম্মিলিত ঈসায়ী বাহিনী ইসলামী বাহিনীর মুকাবিলা করে। এ প্রান্তরে উপনীত হয়ে উভয় বাহিনী এক সপ্তাহকাল পর্যন্ত মুখোমুখি শিবির স্থাপন করে অবস্থান করে। কোন বাহিনী অপর বাহিনীকে হামলা করতে সাহসী হয়নি। মুসলমানদের জন্য এটা ছিল সম্পূর্ণ এক নতুন ও অপরিচিত স্থান। পক্ষান্তরে, ঈসায়ীরা তাদের স্বদেশ ভূমির হিফাজতের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিল। চার্লস মার্টিল এবং ডিউক অব একিউটিনের মত খ্যাতনামা ও অভিজ্ঞ সিপাহসালারদের ছাড়াও এরূপ উচ্চ পর্যায়ের আরো কয়েকজন ঈসায়ী সেনাপতি ঈসায়ী বাহিনীর বিভিন্ন অংশের সেনাপতিত্ব করছিলেন। চতুর্দিক থেকে অসংখ্য ঈসায়ী সৈন্য এসে যুদ্ধে যোগ দিচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল। পাদ্রীদের ধর্মীয় উত্তেজনাকর ভাষণে ঈসায়ী সৈন্যদের যুদ্ধোন্মাদনা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। এই দফা

মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় সম্ভবত বেশিই ছিল। কিন্তু যেহেতু ঈসায়ী সৈন্যদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল এবং ফ্রান্স ভূমির হিফাজতের জন্য তারা বদ্ধপরিকর ও মরিয়া হয়ে উঠেছিল তাই তাদের সংখ্যা মুসলিম বাহিনীর তুলনায় পূর্বের মতই অনেক বেশি ছিল। অর্থাৎ মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ঈসায়ীদের এক-দশমাংশেরও কম। এ দফায় মুসলমানরা গনীমতের মালের প্রাচুর্যের জন্যে অনেক ভারাক্রান্ত ছিলেন। আপন মাতৃভূমি থেকে তাঁরা অনেক দূর-দেশে চলে এসেছিলেন। চারদিকেই তাঁরা দুশমন বাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। অবশেষে অষ্টম দিনে মুসলমানদের আমীর আবদুর রহমান গাফিকী আর অপেক্ষা করা সমীচীনবোধ করলেন না। তিনি তাঁর বাহিনীকে হামলা পরিচালনার নির্দেশ দিলেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধ বেঁধে গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত এ লড়াই চললো। রাতের অন্ধকার অন্তরাল হয়ে যুদ্ধের ফায়সালাকে মুলতবি করে দিল। রাতের বেলা মুসলমান সৈন্যরা ঈসায়ী বাহিনীর সংখ্যাধিক্যের কথা ভেবে এবং ঈসায়ীরা মুসলমানদের যে বীরত্ব প্রত্যক্ষ করেছে সে অভিজ্ঞতার আলোকে খুবই চিন্তামগ্ন হলো। পরদিন ভোরে আবার আক্রমণ প্রতি আক্রমণের পালা শুরু হলো। এদিন ডিউক একুইটিন যার ইতিপূর্বেও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল—এক চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর বাহিনীসহ একটি রাত গোপন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। ঠিক যে মুহূর্তে ঈসায়ী বাহিনী মুসলমানদের মুকাবিলায় ময়দানে টিকতে না পেরে পলায়ন করতে উদ্যত হলো, ঠিক সে মুহূর্তে ডিউক অব একুইটিন পেছন থেকে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এ অপ্রত্যাশিত হামলার ফলে সম্মুখবর্তী সারিসমূহ পেছন দিক থেকে আক্রমণকারী শত্রু সৈন্যদের দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য হলো– এ সুযোগে সম্মুখের পলায়নপর বিশাল ঈসায়ী বাহিনী নিজেদেরকে সামলে নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালালো। মুষ্টিমেয় মুসলিম বাহিনী তাতে আর সংঘবদ্ধ থাকতে পারলো না।

আমীর আবদুর রহমানের শাহাদাত

এ প্রচণ্ড সংঘর্ষের সময় আমীর আবদুর রহমান গাফিকী তাঁর পূর্বসূরিদের পন্থা অবলম্বন করেন। তরবারি হস্তে শত্রুদের ব্যূহ অতিক্রম করে শত শত শত্রু নিধন করে অজস্র আঘাত দেহে নিয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এদিন সকাল-সন্ধ্যা যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। রাতের অন্ধকার যুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটায়। বাহ্যত আজও ঈসায়ীরা বিজয়ী ছিল। তারা মুসলিম বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে নিলেও সন্ধ্যাকালীন তরবারি যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সামলে নিয়ে একদিকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। মুসলমানদেরকে স্থানচ্যুত করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও যুদ্ধের পরিসমাপ্তি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক এবং ঈসায়ীদের জন্যে পরম আনন্দঘন ছিল। মুসলিম বাহিনী তাদের সিপাহসালারের ও আমীরের শাহাদাতবরণ করার পর যুদ্ধক্ষেত্রে আর অধিকক্ষণ অবস্থান সমীচীনবোধ করলেন না। তারা রাতের বেলাই সেখান থেকে যাত্রা করলেন। সকাল বেলা মুসলমানরা মাঠে নেই দেখে খ্রিস্টান বাহিনীও আর মাঠে অবস্থানকে সমীচীন বোধ করলেন

না। মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন করা ছিল সুকঠিন। চার্লস মার্টিল তার রাজধানীতে এ জন্য দ্রুত ফিরে যাচ্ছিলেন যে, তিনি আশঙ্কা করছিলেন মুসলমানরা আশপাশে কোথাও ঘাপটি মেরে থেকে পশ্চাৎ থেকে আক্রমণ করে খ্রিস্টান বাহিনীকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। এ যুদ্ধে ঈসায়ীদের অসংখ্য লোক নিহত হয় আর মুসলমানদের সবচাইতে বড় ক্ষতি হয় তাঁরা তাঁদের আমীরকে এ যুদ্ধে হারান। মোটকথা, এ যুদ্ধের পর এ অভিযানের সমাপ্তি ঘটে এবং মুসলমানরা আর অধিক ভূমি জয় করতে পারেন নাই। পাঠক ইচ্ছে করলে একে মুসলমানদের ব্যর্থতা বা পরাজয়ও বলতে পারেন। ইচ্ছে হলে সমানে সমান যুদ্ধও বলতে পারেন। আবার একে একদিক থেকে ঈসায়ীদের পরাজয়ও বলতে পারেন। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১১৪ হিজরীতে (৭৩২ খ্রি.)।

আবদুল মালিক ইব্ন কাতান ফাহ্‌রী

এ যুদ্ধের পরিণতি এবং আবদুর রহমানের শাহাদাতের কথা অবগত হয়ে আফ্রিকার গভর্নর উবায়দ ইবন আবদুর রহমান আবদুল মালিক ইব্ন কাতান ফাহ্‌রীকে স্পেনের আমীর নিয়োগ করেন এবং তাঁকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, ফরাসীদের নিকট থেকে যে কোন মূল্যে আমীর আবদুর রহমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে। আবদুল মালিক ইব্ন কাতান ফাহ্‌রী স্পেনে প্রবেশ করে ১১৫ হিজরীতে (৭৩৩ খ্রি.) শাসন ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তিনি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা বিধান করেই ফ্রান্স আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণে মনোযোগী হন।

আবদুল মালিক ইব্ন কাতান ছিলেন একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি তাঁর সাথে আফ্রিকা থেকেও কিছু সৈন্য নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি একটু ভুল করে ফেললেন এই যে, তিনি বর্ষা মওসুমে ফ্রান্স অভিযানে যাত্রা করেন। ফলে জাবাল আল-বুরতাত অতিক্রমকালে ভরা নদীনালা অতিক্রম করা তাঁর সৈন্যদের পক্ষে দুরূহ হয়ে ওঠে। তাদের এ দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে ফরাসী লুটেরারা তাঁর বাহিনীর ওপর হামলা চালাতে থাকে। আপন বাহিনীকে নদী-নালায় অবরুদ্ধ দেখে আবদুল মালিক ফিরে যেতে মনস্থ করেন এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে অনেক কষ্টে সসৈন্যে দেশে ফিরে আসেন। আসা-যাওয়ায় অনেক সময়ের অপচয় হয়। লোকক্ষয়ও নেহাৎ কম হয় না। অথচ কাজের কাজ কিছুই হলো না।

আবদুল মালিকের পদচ্যুতি

আবদুল মালিকের এ ব্যর্থতার জন্যে অসন্তুষ্ট হয়ে আফ্রিকার গভর্নর স্পেনের আমীরের পদ থেকে তাঁকে পদচ্যুত করলেন এবং তাঁর স্থলে উতবা ইব্ন হাজ্জাজ সলুলীকে স্পেনের আমীর মনোনীত করে পাঠালেন।

উতবা ইব্ন হাজ্জাজ সলুলী

উতবা ইব্ন হাজ্জাজ ১১৭ হিজরীতে (৭৩৫ খ্রি.) স্পেনে উপনীত হয়ে সে দেশের শাসনভার আপন হস্তে গ্রহণ করেন এবং আবদুল মালিক কাতান ফাহ্‌রীকে একটি ছোট

এলাকার শাসনভার অর্পণ করেন। এটা ছিল উতবার একটি ভুল। এমন এক ব্যক্তিকে তিনি তাঁর অধীনে আমিল হিসেবে নিয়োগ করলেন যিনি ইতিপূর্বে গোটা স্পেনের শাসকরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ জাতীয় ভুল ইতিপূর্বে উসমান নাখমীর ব্যাপারেও করা হয়েছিল। পরবর্তী আমীরের উচিত ছিল উসমান লাখমীকে হয় সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন করে রাখতে নতুবা তাঁকে স্পেনে না রেখে আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেয়া। অনুরূপভাবে উতবারও উচিত ছিল আবদুল মালিককে আফ্রিকায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়া অথবা কমপক্ষে কোন ভূখণ্ডের শাসনভার আদৌ তাঁর হাতে অর্পণ না করা। সে যাই হোক উতবা একটি রাজনৈতিক ভুলের শিকার হলেন।

উতবার কীর্তিসমূহ

উতবা অত্যন্ত প্রাজ্ঞ এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। উতবার কীর্তিসমূহের অন্যতম হলো, স্পেনের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তিনি অনেক প্রয়োজনীয় ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভাগে তিনি অশ্বারোহী ভর্তি করেন এবং তাদের দ্বারা ভ্রাম্যমাণ প্রহরার ব্যবস্থা করে রাস্তা-ঘাটের নিরাপত্তার ইন্তিজাম করেন। এটাই ছিল সর্বপ্রথম ভ্রাম্যমাণ পুলিশের ব্যবস্থা প্রবর্তন। উতবা প্রতিটি গ্রামে এবং প্রতিটি জনপদে এক একটি আদালত প্রতিষ্ঠা করেন— যাতে কেন্দ্রীয় আদালতে কাজের চাপ বেশি না থাকে এবং প্রজাসাধারণের বিচার লাভে কোনরূপ বেগ পেতে না হয়। তিনি প্রতিটি গ্রামে ও বস্তিতে কমপক্ষে একটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ সব বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্যে রাজস্বের একটি অংক নির্দিষ্ট করে দেন। যেখানে যেখানে প্রয়োজনবোধ করেন সেখানে তিনি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিটি মসজিদের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে একটি করে বিদ্যালয়েরও ব্যবস্থা করেন। স্পেনে বার্বারদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং তাদের চালচলনে বর্বরতা ও গেঁয়ো স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ অহরহ পরিদৃষ্ট হতে থাকে। উতবা তাদেরকে এমন কর্মব্যস্ত রাখেন যে তাদের মধ্যে কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও মার্জিত রুচির বিকাশ ঘটে। ভূমি রাজস্ব প্রভৃতির হার ও আদায়ের পন্থা নির্ধারণেও প্রজাদের সুযোগ-সুবিধার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হতো। এজন্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে শান্তি-সমৃদ্ধি ও সন্তোষ দৃশ্যমান হচ্ছিল। আমিল ও ওয়ালী তথা জেলা ও বিভাগ পর্যায়ের শাসকদেরকেও তিনি ন্যায়বিচার ও নিষ্ঠায় অভ্যস্ত করে স্পেনকে একটি আদর্শ রাজ্যে পরিণত করেন।

তারপর তিনি ফ্রান্সের মুসলমানদের বিজিত এলাকার দিকে মনোনিবেশ করেন যেখানে নামেমাত্র মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাবুনিয়া শহরকে তিনি সুরক্ষিত ও মজবুত করে তোলেন। রূপ নদীর তীরে বেশ কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করান, যাতে মুসলিম অধিকৃত এলাকা সংরক্ষণ করা ও ভবিষ্যতে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া এবং বিজয় অভিযান পরিচালনা সহজতর হয়। তাঁর আমলে ফরাসীদের সাথে কয়েকবারই যুদ্ধ হয় এবং প্রতিবারই ফরাসীরা মুসলমানদের হাতে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যায়।

১১২ হিজরীতে (৭৩০ খ্রি.) আফ্রিকার বার্বাররা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ বিদ্রোহ দমনে আমীর উতবার চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেউই ছিলেন না। তাই আফ্রিকার গভর্নর সে বিদ্রোহ দমনের জন্যে আমীর উতবাকেই সেখানে তলব করেন। উতবা আফ্রিকায় পৌঁছে

বার্বারদেরকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে সে বিদ্রোহ দমন করেন। আমীর উতবার অনুপস্থিতির সুযোগে এদিকে স্পেনে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। বিভিন্ন এলাকায় ষড়যন্ত্র এবং গোত্রীয় রেষারেষি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

এ দিকে জাবালে আল-বুরতাতের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন তখন ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান। সে প্রদেশের রাজধানী ছিল নার্বুন শহরে। তখন মার্সেলিস ছিল ফ্রান্সের একটি মশহুর শহর এবং শহরটি ছিল পূর্ব ফ্রান্সের রাজধানী। রাজ্যটি ছিল খুবই শক্তিশালী এবং তার শাসক- যাকে ডিউক অব মার্সেলিস নামে অভিহিত করা হতো—ছিলেন মরূন শী আস। তিনি নার্বুনের ওয়ালী ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমানের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। চার্লস মার্টিলের ভয়ে তিনি ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমানের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং মুসলমানদের করদ রাজায় পরিণত হন। এ খবর পেয়ে চার্লস মার্টিল তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালে মুসলমান সৈন্যরা মরূন শী আসের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। উভয় পক্ষে বেশ কটি যুদ্ধ হয়। স্পেনের আমীরের অনুপস্থিতিতে নার্বুনের ওয়ালীকে কোনরূপ রসদ সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। চার্লস মার্টিল মার্সিলিসে লুটপাট করে শহরটিকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেন। কিন্তু নার্বুন শহরে যখন তিনি হামলা চালান তখন তাঁকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

আমীর উতবার ওফাত

আমীর উতবা আফ্রিকার ঝামেলা চুকিয়ে ১২২ হিজরীতে (৭৪০ খ্রি.) স্পেনে ফিরে আসেন। তখন স্পেনে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি ও সংকল্পের দৃঢ়তা তুঙ্গে পৌঁছেছে। আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতাম সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, উতবা তাঁকে একটি এলাকার আমিল বানিয়েছিলেন। উতবার স্পেনে অনুপস্থিত থাকাকালে আবদুল মালিক স্পেনবাসীদের এক বিরাট অংশকে তাঁর বিদ্রোহের সমর্থক বানিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি তখন নিজেকে স্পেনের শাসক বলে দাবি করলেন। আমীর উতবা দেশে ফিরেই এ বিদ্রোহ দমনের চিন্তা-ভাবনা করছিলেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁকে সে অবকাশ দেয়নি। ১২৩ হিজরীর সফর (ডিসেম্বর ৭৪০ খ্রি) মাসে আমীর উতবা রাজধানী কর্ডোভায় ইন্তিকাল করেন এবং আবদুল মালিক ইবন কাতান অনায়াসেই গোটা স্পেনের শাসনভার স্বহস্তে তুলে নেন।

আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতান ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতান ফাহ্‌রী ছিলেন শতবর্ষের এক বৃদ্ধ ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর দেহ ছিল যুবকদের মত সুঠাম এবং বুদ্ধিশুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনায় কোনরূপ ভাটা বা শৈথিল্যের লেশমাত্র ছিল না। তিনি যুবক সুলভ দৃঢ় প্রত্যয় ও সাহসের অধিকারী ছিলেন। আবদুল মালিক ছিলেন মদীনার অধিবাসী এবং হারার ঘটনার সময় তিনি তাতে শরীক ছিলেন। তিনি মদীনা, সিরিয়া, মিসর, ইরাক, আফ্রিকিয়া এবং স্পেনের অনেক যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দেহে ছিল শত শত জখমের চিহ্ন। সিরীয় এবং হিজাযীদের মধ্যে যে

পারস্পরিক ঘৃণাভাব ছিল, হাররার যুদ্ধের কারণে আবদুল মালিকের সে ঘৃণাভাব ছিল আরো প্রকট। এ দিকে আফ্রিকা ও মরক্কোতে বার্বারদেরকে আরব বিজেতারা তাদের বর্বরতার জন্যে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো। উমাইয়া বংশীয়দের রাজত্ব ছিল নির্ভেজাল আরব বংশীয় রাজত্ব। বিজেতা আরবদের এ ঘৃণার কথা বার্বাররা সম্যক টের পেত। এ জন্যে বার্বাররা আরবদেরকে তাদের বিজেতা শাসকরূপে মেনে নিলেও ইসলামের মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পরে তারা যখন আরবদের এ বংশগত গর্ব ও উন্নাসিকতা লক্ষ্য করতো তখন তাদের মনে তা বেশ রেখাপাত করতো। এ কারণে যখনই বনূ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন শুরু হতো, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা প্রভাবান্বিত হতো এবং তারও বিদ্রোহ করতে উদ্যত হতো। এ কারণেই উবায়দী রাজত্বের ভিত্তি এই বার্বার সম্প্রদায়ের উপর অনায়াসেই স্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছিল। আর এ কারণেই আবরদের শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী প্রত্যেকেই বার্বার সম্প্রদায়কে তাদের জন্যে অত্যন্ত সহায়ক শক্তিরূপে ভেবেছে। বার্বারদের শৌর্যবীর্যের গর্ব ছিল। তারা সর্বদাই আরবদেরকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেছে। সে আমলে বার্বার বিদ্রোহ পুনরায় নতুনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আফ্রিকার গভর্নর বার্বারদের এ বিদ্রোহের দরুন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যস্ত সমস্ত ছিলেন। তাই তিনি আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়াতে কোনরূপ আপত্তি করেননি।

আফ্রিকার গভর্নর পদে কুলছুম ইব্‌ন ইয়াযের নিযুক্তি

খলীফার দরবার থেকে আমীর আবদুর রহমানের স্থলে কুলছুম ইব্‌ন ইয়ায আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসলেন। তিনি ছিলেন একজন সিরীয় সর্দার। এ দিকে মাগরিবে মায়সারা নামক জনৈক বার্বার সর্দার লুটপাট করে ভীষণ অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করে রেখেছিল। কুলছুম ইব্‌ন ইয়ায বার্বারদেরকে একটি অনুন্নত ও নীচ গোত্র ভেবে বেপরোয়াভাবে তাদের মুকাবিলা করলেন। কিন্তু যে বার্বার সম্প্রদায় শুরুতেও বিনা চ্যালেঞ্জে আরব প্রভুত্ব মেনে নিতে পারেনি তারা বিগত শতাব্দীকাল ধরে ইসলামের অনুশীলনের মাধ্যমে অনেক উন্নত হয়ে গিয়েছিল। তাদের শৌর্যবীর্য এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তারা অনেক যুদ্ধে আবরদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে নিজেদেরকে সমকক্ষ প্রতিপন্ন করেছিল। এবার বার্বাররা সিরীয়দেরকে পরাস্ত করলো।

কুলছুম ইব্‌ন ইয়ায সিউটা দুর্গে অবরুদ্ধ হলেন

কুলছুম ইব্‌ন ইয়ায তাঁর অনেক সৈন্য ক্ষয় করে অবশেষে দশ হাজার সিরীয় সৈন্যসহ সিউটা দুর্গের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ দুর্গটি জিব্রাল্টার প্রণালীর দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত ছিল। স্পেনবাসীরা চাইলে কুলছুম ইব্‌ন ইয়াযকে সাহায্য-সামগ্রী ও রসদ পৌছাতে পারতো। এ দুর্গটি জয় করা বার্বারদের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু যেহেতু দুর্গের মধ্যে কোনরূপ রসদ ছিল না, তাই অবরুদ্ধদের উপবাসে থাকতে হয়। তাদের সবচাইতে বড় সাহায্য তখন ছিল খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা। কুলছুম ইব্‌ন ইয়ায স্পেনের শাসনকর্তা

আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতানের কাছে তাঁর দুর্দশার কথা জানিয়ে খাদ্যসামগ্রীর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু আবদুল মালিক সিরীয়দের প্রতি তাঁর পূর্বের ঘৃণার কারণে কুলছুম ইব্‌ন ইয়ায এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের জন্যে কোনরূপ সাহায্যসামগ্রী পাঠালেন না। স্পেনের জনৈক আমীর সওদাগর যায়দ ইব্‌ন আমর যখন সিউটার অবরুদ্ধ সৈন্যদের দুর্দশার কথা অবগত হলেন, তখন তিনি কয়েকটি জাহাজভর্তি রসদ-সামগ্রী সিউটা দুর্গের দিকে প্রেরণ করলেন। আবদুল মালিক এ সংবাদ অবগত হয়ে যায়দ ইব্‌ন আমরকে গ্রেফতার করে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে তাঁকে হত্যা করেন।

আফ্রিকার গভর্নররূপে হানযালার নিযুক্তি

দামেশকের খলীফা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক যখন সিরীয় সৈন্যদের এ দুর্দশার কথা অবহিত হলেন তখন তিনি কালবিলম্ব না করে একটি শক্তিশালী বাহিনী সাথে দিয়ে আমীর হানযালাকে মাগরিবের দিকে রওয়ানা করে দিলেন। হানযালা সেখানে উপনীত হয়ে সিউটা কিল্লার অবরোধ ভেঙে দিয়ে অবরুদ্ধ সৈন্যদেরকে উদ্ধার করলেন। বার্বাররা তাঁর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। এমনি সময় কুলছুম ইব্‌ন ইয়াযের ইন্তিকাল হয় এবং হানযালা নিজে আফ্রিকার গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতানের হত্যা

এদিকে স্পেনে যখন আফ্রিকার বার্বারদের শোচনীয়ভাবে নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছল, তখন স্পেনের বার্বাররা সংঘবদ্ধ হয়ে আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতানের ওপর হামলা চালালো। জালীকিয়া প্রদেশ ও আরাগুনে প্রচুর সংখ্যক বার্বারের বাস ছিল। জালীকিয়া প্রদেশটি ছিল স্পেনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে। আর আরাগুন ছিল উত্তর-পূর্ব প্রান্তে। উভয় দিক থেকে বার্বাররা কর্ডোভার ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালালো। তারা আবদুল মালিককে কয়েকবার পরাস্ত করলো। বার্বারদের এ ফিতনা দমন করা যখন আমীর আবদুল মালিকের সাধ্যাতীত বলে তাঁর কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হলো, তখন তিনি অগত্যা কুলছুম ইব্‌ন ইয়াযের দশ হাজার সিরীয় সৈন্যের নতুন অধিকর্তা ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বালাজ ইব্‌ন বাশার ইব্‌ন ইয়াযের নিকট বার্বারদের দমনে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তিনি বার্বারদের দমনের জন্য তাঁকে যথাযথ পুরস্কৃত করা হবে এ কথাও জানালেন। বালাজ ইব্‌ন বাশার আফ্রিকার নতুন গভর্নর হানযালার থাকার চাইতে এ প্রস্তাব রক্ষা করে স্পেন গমনকেই শ্রেয় বিবেচনা করলেন। সেখানে পৌঁছে মাত্র কয়েক দিনেই বার্বারদের দমন করেন এবং তাদের বাহিনীসমূহকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। এবার যখন সেই সিরীয় বাহিনী স্পেনের আরবদের নিকট সিউটা দুর্গে তাদের উপবাসী থাকার এবং সে সময় আবদুল মালিকের নিষ্ঠুর আচরণের কথা ব্যক্ত করলেন তখন সাধারণভাবে সকলেই আবদুল মালিকের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠলেন। বালাজ ইব্‌ন বাশার যখন লক্ষ্য করলেন যে, স্পেনবাসীরা তাঁর সমর্থনে রয়েছে, তখন তিনি আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতানকে গ্রেফতার করলেন। বালাজ আবদুল মালিককে অন্তরীণ অবস্থায় রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সাথীরা এবং আবদুল

মালিকের শত্রুরা বালাজকে হুমকি দিয়ে অনন্যোপায় করে তুললো। অগত্যা এই শতবর্ষ বয়সের বৃদ্ধকে হত্যা করা হলো। এটি ১২৩ হিজরীর (৭৪১ খ্রি.) শেষ দিককার ঘটনা।

আত্মকলহ

বালাজ ইব্ন বিশতরী বা বালাজ ইব্ন বাশারের স্পেনের শাসনভার অধিকারের পর আবদুল মালিক ইব্ন কাতান ফাহ্রীর দুই পুত্র উমাইয়া ইব্ন আবদুল মালিক ও কাতান ইব্ন আবদুল মালিক গোপনে গোপনে তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বালাজ ইব্ন বাশারের বিরুদ্ধ সংঘবদ্ধ করতে থাকেন। নার্বুনের আমিল ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমান যাঁর কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে— আবদুল মালিকের পুত্রদ্বয়ের সাথে যোগদান করলেন। ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমানের যোগদান এবং সিরীয়দের রাজত্বের আশঙ্কাজনক ভবিষ্যতের কল্পনার ফলে যে সব বার্বার এই মাত্র ক'দিন আগেও আবদুল মালিকের বিরোধী ছিল, তারাও আবদুল মালিকের পুত্রদ্বয় এবং ফাহরীদের সাথে এসে যোগ দেয় এবং কর্ডোভা অভিমুখে অগ্রসর হয়। এদিকে বালাজ ইব্ন বাশারও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হন।

বালাজের বাহিনীতে বার হাজার সিরীয় এবং স্পেনে অবস্থানরত অধিকাংশ আরবই শামিল ছিলেন। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এখানে মুসলমানদের দু'টি শক্তিশালী বাহিনী মধ্য স্পেনে একে অপরের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, অপরদিকে ঈসায়ীরা ফ্রান্সে বসে তাদের স্বদেশভূমিকে মুসলিম অধিকার মুক্ত করার পরিকল্পনা আঁটছিল। যুদ্ধে আমীর বালাজ মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে চৈতন্য হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু সিরীয়দের এ সর্দারবিহীন বাহিনীটি শেষ পর্যন্ত শত্রুদের পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেয়। পরের দিনই আমীর বালাজ জখমের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। এটা ১২৪ হিজরীর (৭৪১-৪২ খ্রি) ঘটনা। আমীর বালাজ এগার মাসকাল স্পেন শাসন করেন। তারপর আরব ও সিরীয়রা মিলে ছা'লাবা ইব্ন সালামাকে স্পেনের আমীর রূপে নির্বাচিত করেন।

ছা'লাবা ইব্ন সালামা

ছা'লাবা ইব্ন সালামা যেহেতু ইয়ামানী ছিলেন, তাই স্পেনের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি ইয়ামানীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেন। আবদুল মালিক ইব্ন কাতানের পুত্রদ্বয় যারা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পলায়ন করেছিল— তারা ইব্ন সালামার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলো না। তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লুটপাট চালাতে লাগলো। এদিকে ইয়ামানীদের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্বে এবং অন্যান্য আরবের প্রতি অহেতুক কঠোরতা অবলম্বনের দরুন আরব গোত্রসমূহ ইব্ন সালামার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা বাধ্য হয়ে আফ্রিকার গভর্নর হানযালা ইব্ন সাফওয়ানের কাছে ইব্ন সালামার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাঁর স্থলে কোন নতুন আমীরের নিয়োগের আবেদন জানালো।

ইব্‌ন সালামার পদচ্যুতি

হানযালা ইব্‌ন সাফওয়ান আবুল খাত্তাব হুসাম ইব্‌ন যিরার কালবীকে 'ইমারতের' সনদ দিয়ে স্পেনে প্রেরণ করলেন। স্পেনবাসীরা হুসামকে অভ্যর্থনা জানালো এবং তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করলো। হুসাম ইব্‌ন সালামকে পদচ্যুত করে স্বহস্তে শাসনভার তুলে নেন। এটা ১২৫ হিজরীর (৭৪৩ খ্রি.) ঘটনা।

আবুল খাত্তাব হুসাম ইব্‌ন যেরার কালবী

আবুল খাত্তাব সর্বদিক দিয়ে রাজ্য শাসনের সুযোগ্য পাত্র ছিলেন। এদিকে মুসলিম-ঈসায়ী নির্বিশেষে স্পেনবাসীরা নিত্যদিনকার গৃহযুদ্ধ ও আত্মকলহে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সকলে অত্যন্ত ধুমধামের সাথে কর্ডোভার উপকণ্ঠে নতুন শাসককে অভ্যর্থনা জানালো এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলো। আবদুল মালিকের বিদ্রোহী পুত্রদ্বয়ও তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে আনুগত্যের বায়আত করলো। এ আমীর আত্মকলহের কারণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলেন এবং তার কারণ নিরূপণও করলেন। তারপর তিনি প্রত্যেকটি সম্প্রদায় ও প্রতিটি গোত্রের জন্যে স্পেনে ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান নির্ধারণ করে দিলেন এবং এভাবে তিনি কর্ডোভায় অবস্থানরত সিরীয়কে, যারা প্রচুর সংখ্যায় সমবেত হয়ে নানারূপ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারতো, তাদেরকেও নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন। রাজধানীতে এভাবে আমীরের শাসন-শৃঙ্খলা বিধান সহজতর হয়ে পড়লো।

আবুল খাত্তাবের একটি রাজনৈতিক ভুল

কিন্তু এ আমীরও একটি ভুল করে বসলেন। তিনি তার স্ব-দেশীয়, স্ব-গোত্রীয় ইয়ামানীদেরকে নানারূপ সুযোগ-সুবিধা ও আনুকূল্য প্রদান করলেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল। ইয়ামানীদের প্রতি আবুল খাত্তাবের আনুকূল্য প্রদর্শন তাঁকে তাদের প্রতিপক্ষ মুদারীয় গোত্রসমূহের শত্রুতে পরিণত করলো। কায়স গোত্রীয় লোকেরাও তাঁর প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। একদা আমীর আবুল খাত্তাবের চাচাত ভাই এবং জনৈক কিনানী আরবের মধ্যে বচসা হয়। আমীরের আদালতে বিচার প্রার্থনা করা হলো। আমীর তাঁর চাচাত ভাই দোষী হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিই আনুকূল্য প্রদর্শন করে বিচারের রায় তার পক্ষেই প্রদান করেন। কিনানী তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে কায়স গোত্রের সর্দার বাখার দামীল ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন শিমার যিল-জাওশানের কাছে আমীরের বিরুদ্ধে অনুযোগ করলো। দামীল ইব্‌ন হাতিম ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ সর্দার এবং আবরদের মধ্যে তাঁর প্রভূত সম্মান ও জনপ্রিয়তা ছিল। তিনি আমীর আবুল খাত্তাবের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করলেন। আমীরের উত্তর শুনে দামীল ইব্‌ন হাতিম কোন শক্ত প্রত্যুত্তর দিয়ে থাকবেন। আমীর তাঁকে দরবার থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করার নির্দেশ প্রদান করলেন। দারোয়ান তাঁকে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে দেয়ার সময় তাঁকে কয়েকটি চপেটাঘাতও করে। ফলে তার শিরস্ত্রাণ একদিকে কাত হয়ে ঝুলে পড়ে। এ অবস্থায় যখন

তিনি বেরিয়ে আসছিলেন তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে তাঁর শিরস্ত্রাণ সোজা করতে বলে। জবাবে তিনি বললেন, আমার গোত্র চাইলে এ শিরস্ত্রাণ তারাই সোজা করে দিতে পারে। দামীল ইব্‌ন হাতিম তাঁর ঘরে পৌছেই আপন গোত্রের সর্দার এবং অন্যান্য আরবকে ডেকে পাঠালেন এবং সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক তাঁদের কাছে ব্যক্ত করলেন। সকলেই দামীল ইব্‌ন হাতিমের সাহায্যের অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন।

তারপর দামীল ইব্‌ন হাতিম কর্ডোভা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সে সব এলাকার আমীরদের সাথে দেখা করে তাদের কাছে নিজের অবস্থার কথা শুনালেন। ততক্ষণে যেহেতু গোটা আরব গোত্রসমূহ আবুল খাত্তাবের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, তাই সকলেই দামীলের সাহায্যের অঙ্গীকার করলেন। দামীলের কাছে যখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, আবুল খাত্তাবের প্রতি সাধারণভাবে স্পেনের আমীর-উমারা বিক্ষুব্ধ, তখন তিনি সদুনা শহরে অবস্থান করে আপন গোত্র ও বন্ধুদেরকে সেখানে আহ্বান করলেন। সকলেই যখন সেখানে এসে সমবেত হলেন, তখন তিনি তাদের সকলকে সাথে নিয়ে কর্ডোভার দিকে অগ্রসর হলেন। স্পেনের সাবেক ইয়ামানী আমীর ছা'লাবা ইব্‌ন সালামাও সদলবলে এসে দামীলের বাহিনীর সাথে যোগ দেন। আলেকতা নদীর তীরে স্পেনের আমীর সে বাহিনীর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যুদ্ধে আবুল খাত্তাবের বাহিনী পরাস্ত হলো এবং তিনি নিজে বন্দী হলেন। দামীল আবুল খাত্তাবকে কর্ডোভায় নিয়ে গিয়ে একটি সুরক্ষিত দুর্গে বন্দী করেন। ছা'লাবা এবং দামীল উভয়েই গোটা স্পেন দখল করে নিলেন। এটা ১২৭ হিজরীর রজব (এপ্রিল ৭৪৫ খ্রি.) মাসের ঘটনা।

আবুল খাত্তাব দু'বছর রাজত্ব করার পর বন্দী হন। কিন্তু গ্রেফতার হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই আবদুর রহমান ইব্‌ন হাসান কালবীর চেষ্টায় আবুল খাত্তাব হুসাম ইব্‌ন যিয়ার কালবী অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্ত হন। তিনি কারামুক্ত হয়ে কর্ডোভা থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার স্বদেশীয় ইয়ামানী গোত্রসমূহকে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে জমায়েত করতে থাকেন। ফলে ইয়ামানী গোত্রসমূহের প্রচুর লোক স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর চুতর্দিকে এসে সমবেত হয়ে গেল। এদিকে দামীল এবং ছা'লাবা ইব্‌ন সালামাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। এটা ছিল ঐ যুগ, যখন দামেশকের খিলাফত আব্বাসীয়দের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। সর্বশেষ উমাইয়া খলীফা মারওয়ানুল হিমার আব্বাসী বাহিনীর হাতে পরাস্ত হয়ে তখন পলাতক ছিলেন। কারো তখন স্পেনের দিকে মনোনিবেশ করার মত অবস্থা ছিল না। আফ্রিকা, মিসর প্রভৃতিও তখন খলীফা বংশের ধ্বংসলীলা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিল। স্পেনে ১২৭ থেকে ১২৯ হিজরী (১৩ই অক্টোবর ৭৪৪ খ্রি - ১০ সেপ্টেম্বর ৭৪৭ খ্রি.) সনের মধ্যে দ্বিতীয় বার প্রতিপক্ষের হাতে গ্রেফতার হয়ে আবুল খাত্তাব নিহত হন। ১২৮ হিজরীতে (অক্টোবর ৭৪৫ খ্রি - ২১ সেপ্টেম্বর ৭৪৬ খ্রি) ছা'লাবা ইব্‌ন সালামা স্পেন থেকে আফ্রিকায় গভর্নর আবদুর রহমান হাবীবের খিদমতে চলে যান। আবদুর রহমান যখন আবুল খাত্তাবের নিহত হওয়ার সংবাদ পেলেন তখন তিনি ছা'লাবা ইব্‌ন সালামাকে দ্বিতীয়বারের মত স্পেনের

আমীর মনোনীত করে পাঠালেন। ১২৯ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ৭৪৬ - আগস্ট ৭৪৭ খ্রি.) ছা'লাবা ইব্‌ন সালামা স্পেনে উপনীত হন এবং সে দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

ছা'লাবা ইব্‌ন সালামা–দ্বিতীয় বার

১২৯ হিজরীর রজব (মার্চ ৭৪৭ খ্রি) মাসে ছা'লাবা ইব্‌ন সালামা স্পেনের শাসন ক্ষমতা নিজ হস্তে তুলে নেন এবং দামীল ইব্‌ন হাতিম যেহেতু তাঁরই বন্ধু এবং হাতের লোক ছিলেন তাই শাসনকার্যে তাঁর সবচাইতে বেশি দখল ছিল এবং তিনি তাঁর সবচাইতে বড় উপদেষ্টা রূপে থাকেন। ছা'লাবাও যেহেতু ইয়ামানী ছিলেন এজন্যে দামীল ইব্‌ন হাতিম অনেক চেষ্টা করে ইয়ামানী ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। এর কিছুদিন পরেই ছা'লাবা ইবন সালামার মৃত্যু হয়। স্পেনবাসীরা যেহেতু পূর্ব থেকেই নিজেদের আমীর নির্বাচনে অভ্যস্ত ছিলেন, যেমনটা উপরের বর্ণিত কয়েকজন আমীরের ব্যাপারেই হয়েছে, আর তখন কেন্দ্র দামেশকে অরাজকতা চলছিল, তাই নিজেদের আমীররূপে একজনকে বেছে নিতে তাদের কোন দ্বিধা ছিল না। তারা ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান ফাহ্‌রীকে, যার কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে, নিজেদের আমীররূপে নির্বাচন করে। ইউসুফের পুরনো পরিচিতি ও অবদান এ জন্যে সহায়ক হয়েছিল এবং এ সব কারণেই তাকে আমীররূপে নির্বাচন করতে কারো মনে কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না।

ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান ফাহরী

যেহেতু স্পেনের এখন আর কেন্দ্রের সাথে তেমন যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল না আর এখানে সকল সম্প্রদায় ও মুসলমান গোত্রের আবাদ ছিল, এজন্যে অল্পদিনের মধ্যেই স্পেনে সংঘাত ও অসন্তোষ দেখা দিল। ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান সেই দামীল ইব্‌ন হাতিমকেই টলেডো প্রদেশের শাসক নিযুক্ত করলেন, যিনি ছিলেন সর্বাধিক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব এবং ইউসুফের আমীর নির্বাচিত হওয়ায় অনেকটা মনঃক্ষুণ্ন। এদিকে ঈসায়ীরা আরবুনিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা আবদুর রহমান ইব্‌ন আলকমাকে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিল। কিন্তু আবদুর রহমান বিদ্রোহ ঘোষণার পূর্বেই নিহত হলেন। তারপর অপর প্রাদেশিক শাসনকর্তা ইবনুল ওয়ালীদকে ঈসায়ীরা বিদ্রোহের জন্য উস্কানি দেয় এবং অনেক ঈসায়ী সৈন্য তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়। ইবনুল ওয়ালীর আশবেলিয়া (সেভিল) শহর জয় করে কর্ডোভা অভিমুখে যাত্রা করেন। আমীর ইউসুফ যুদ্ধে তাকে পরাস্ত করেন এবং গ্রেফতার করে হত্যা করেন। তারপর উমর ইব্‌ন আমর নামক জনৈক সর্দার বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ মনোরথ হন।

স্পেনকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্তিকরণ

এ সব বিদ্রোহ দমন করার পর ইউসুফ দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। খাস স্পেন মুল্লুককে তিনি চারটি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং পঞ্চম

প্রদেশরূপে ঐ অংশকে ঘোষণা করেন, যা ফ্রান্স ভূমিতে মুসলিম অধিকারে ছিল। প্রদেশসমূহের নাম হলো ঃ

ক্রমিক নম্বর	প্রদেশের নাম	প্রসিদ্ধ শহরসমূহ
১.	আন্দালুসিয়া	কর্ডোভা, কারমুনা, আশবেলিয়া, শাদুনা, মালকুন, আলবীরা, জিয়ান
২.	টলেডো	উবায়দা, বীসা, মারসিয়া, ভিনিয়া, বালনেসিয়া
৩.	মারীদা (জালীকিয়া)	মারীদা, বিশুনা, বীজেন্তা, সালামনিকা
৪.	সারাকাস্তা	সারাকাস্তা, তারকুনা, বারসেলোনা, লারীদা
৫.	আরবুনিয়া (দক্ষিণ ফ্রান্স)	নার্বুন, তালুন, ইব্ন বালুনা, লিউগো, টুটী

স্পেনে কেন্দ্রের পরিবর্তনের প্রভাব

আমীর ইউসুফ আবদুর রহমান ফিহ্রী যদিও নিজে কোন পক্ষে শামিল ছিলেন না, তবুও স্পেনে যখন উমাইয়া খিলাফতের পতন এবং আব্বাসীয়দের খিলাফত প্রতিষ্ঠার সংবাদ গিয়ে পৌছাল, তখন স্থানে স্থানে সিরীয়দের এবং তাদের আমীরদের বিরুদ্ধে আব্বাসীয় পক্ষের শুভাকাঙ্ক্ষীরা সক্রিয় হয়ে উঠলেন। কেননা, সিরীয় আমীররা উমাইয়া পক্ষের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। দামীল ইব্ন হাতিমকে উমাইয়াদের শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করে চারদিক থেকে ঘেরাও করা হলো। শেষ পর্যন্ত কায়েস গোত্রের লোকজন তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো। দামীল ইব্ন হাতিম যখন আমীর ইউসুফ আবদুর রহমানের সাহায্য প্রার্থনা করলেন তখন তিনি তাঁকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানালেন। ইব্ন হাতিম কোনমতে নিজেকে শত্রুদের কবলমুক্ত করলেন। এরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেশের সর্বত্র হতে থাকে। স্পেনে উমাইয়াদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি ছিলেন খুবই উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন আবূ উসমান উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উসমান এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ। এঁরা পরস্পরের আত্মীয় ছিলেন অর্থাৎ আবূ উসমান ছিলেন শ্বশুর এবং আবদুল্লাহ ইব্ন খালিদ তাঁর জামাতা। এঁরা দু'জন আন্দালুসিয়া প্রদেশের আলবীর শহরের শাসনকর্তা ছিলেন। ঐ শহরে সিরীয়দের সংখ্যা বেশি ছিল। এছাড়াও ইউসুফ ইব্ন বখত এবং হুসাইন ইব্ন মালিক কালবীও মশহুর সর্দার ছিলেন। দামীল ইব্ন হাতিমকে যখন আমীর ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমান সাহায্য করলেন না, তখন আবূ উসমান ও আবদুল্লাহ ইব্ন খালিদ তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসলেন। এ দু'জনের পৌছার পূর্বেই আবদুর রহমান আদ-দাখিলের (যাঁর বর্ণনা পরে আসছে) ক্রীতদাস বদর তাঁর কাছে গিয়ে পৌছেছিলেন। তিনি দামীল হাতিমকে আবদুর রহমান আদ-দাখিলকে স্পেনে ডেকে পাঠানোর পক্ষে টেনে নিতে সমর্থ হন। দামীল ইব্ন হাতিম বাহ্যত ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমানের সাথে কোনরূপ বিরোধ সৃষ্টিকে অসমীচীন হবে ভেবে ইউসুফের প্রতি সহানুভূতি ও তাঁর প্রতি বন্ধুত্বভাব প্রদর্শনে কোনরূপ ত্রুটি করলেন না। দামীলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আবূ উসমান ও আবদুল্লাহ ইব্ন খালিদ উভয়ে আলবীরায় ফিরে আসেন

এবং ধীরে ধীরে নিজেদের বন্ধুমহলে গোপনে গোপনে সে ইচ্ছার কথা প্রচার করে তাঁদেরকে দলে ভিড়াতে থাকেন। পরবর্তীতে তাঁরা জানতে পারেন যে, দামীল ইব্ন হাতিম তাঁর অঙ্গীকার ও সংকল্পে অটল নন, বরং ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমানের শাসন বহাল রাখারই তিনি পক্ষপাতী। এর ফলে কায়েস ও ফিহর গোত্রের নিকট থেকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা লাভের আশা তিরোহিত হয়ে গেল। কিন্তু আবূ উসমান অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে উক্ত দু'টি গোত্রের বিরুদ্ধে ইয়ামানী গোত্রগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুললেন। ফলে ইয়ামানী সর্দাররা স্থানে স্থানে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলেন। আমীর ইউসুফ আবদুর রহমান এবং দামীল ইব্ন হাতিম তাঁদের দমনে আত্মনিয়োগ করলেন।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল ঃ স্পেনে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা

আবূ উসমান যখন লক্ষ্য করলেন যে, ইয়ামানী গোত্রসমূহ স্থানে স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে পড়েছে তখন তিনি আবদুর রহমান আদ-দাখিলের ক্রীতদাস বদরকে এগারজন সঙ্গীসহ জাহাজে তুলে দিয়ে অবিলম্বে আবদুর রহমান আদ-দাখিলকে নিয়ে আসার জন্যে আফ্রিকা অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তখন স্থায়িভাবে আফ্রিকায় অবস্থান করছিলেন। সেমতে আবদুর রহমান আদ-দাখিল ১৩৮ হিজরীতে রবিউস সানী (সেপ্টেম্বর ৭৫৫ খ্রি.) মাসে স্পেনে গিয়ে উপনীত হন। তিনি আলবীরা এলাকায় দাকাত বন্দরে জাহাজ থেকে অবতরণ করেন। আবূ উসমান ও উমাইয়া বংশের শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবূ উসমান আবদুর রহমান আদ-দাখিলকে নিজের আলবীরাস্থ বাসভবনে নিয়ে উঠান এবং লোকজনকে ডেকে এনে মোটামুটি একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমান তখন সারাকাস্তা প্রদেশে বিদ্রোহ দমনে প্রবৃত্ত ও ব্যস্ত ছিলেন। আবদুর রহমান আদ-দাখিলের স্পেনে উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে তিনি বিদ্রোহ দমন সমাপ্ত করে দ্রুত টলেডোর দিকে অগ্রসর হন। এখানে এসে তিনি দামীল ইব্ন হাতিমের সাথে মিলিত হন। এখানে তিনি একটি ভুল করেন, তাহলো ইতিপূর্বে যে সমস্ত বন্দীকে প্রাণে রক্ষার আশ্বাস দেয়া হয়েছিল তিনি তাদের সবাইকে হত্যা করলেন। ফলে তাঁর নিজের বাহিনীর অনেক সেনাপতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন এবং তারা ইউসুফের দলত্যাগ করে আলবীরায় আবদুর রহমান আদ-দাখিলের কাছে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়ে পড়লেন। এ খবরটি প্রচারিত হওয়া মাত্র স্থানে স্থানে আরব সর্দারগণ বিশেষত ইয়ামানী গোত্রসমূহ, যাঁরা ইউসুফের বিরুদ্ধে ছিল, আবদুর রহমান আদ-দাখিলের পতাকাতলে এসে সমবেত হতে লাগলো। তখন ইউসুফ ও ইব্ন হাতিম কেবল ফিহ্রী এবং কায়স গোত্রের লোকজনের সমর্থন নির্ভর হয়ে ছিলেন। সিরীয়দের সমর্থন আবদুর রহমান আদ-দাখিলের পক্ষে থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু ইয়ামানীরা যারা সাধারণত সিরীয়দের বিপক্ষেই থাকতো, তারাও ইউসুফের বিরোধিতার জন্যে আবদুর রহমান আদ-দাখিলের পক্ষে যোগদান করে। কেননা, তারা জানতো যে, আবদুর রহমান আদ-দাখিল ইউসুফের নিকট থেকে স্পেনের শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে এসেছেন। এভাবে কেবল ফাহরী এবং কায়স গোত্র ছাড়া অপর সকল আরব গোত্রই আবদুর

রহমান আদ-দাখিলের প্রতি সহানুভূতি ও একাত্মতা প্রকাশ করে। ঐ দু'টি গোত্রও কেবল ইউসুফ ও ইব্ন হাতিমের ব্যক্তিত্বের দরুন তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। নতুবা তারাও মনে মনে উমাইয়া বংশীয় শাহযাদাকে পছন্দ করতেন। আবদুর রহমান আদ-দাখিলের জনপ্রিয়তার একটি কারণ এও ছিল যে, তাঁর স্পেনে আগমনের পূর্বেই তাঁর উন্নত চরিত্রের খ্যাতি সে দেশে পৌঁছেছিল। আবদুল মালিক ইব্ন কাতানের শাসনামলে কয়েক ব্যক্তি দামেশক থেকে এসে সেখানকার যে অবস্থা বিবৃত করেন তাতে তাঁরা বলেন যে, আবদুর রহমান হচ্ছেন বনূ উমাইয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ চরিত্রবান যুবক। তাঁরা আরো বলেন যে, তিনি হিজাযী ও ইমামানীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁর সে খ্যাতি তখন খুবই কাজে লাগে। বনূ উমাইয়া ছাড়া তাদের বিরোধী অন্যরাও এজন্যে আবদুর রহমানকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখতেন।

অবশেষে ইব্ন হাতিম ও ইউসুফ দু'জনেই টলেডো থেকে কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ওদিক থেকে আবদুর রহমান আদ-দাখিল তাঁর দলবলসহ কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ওয়াদিউল কবীর নদীর তীরে কর্ডোভার উপকণ্ঠের প্রান্তরে ঈদুল আযহার দিন অর্থাৎ ১৩৮ হিজরীর দশই যিলহজ্জ মুতাবিক ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। অবশেষে আবদুর রহমান আদ-দাখিল জয়ী হন এবং আমীর ইউসুফ ইবন আবদুর রহমানের পুত্র আবদুর রহমান ও অন্যান্য সর্দার গ্রেফতার হন, কিন্তু ইব্ন হাতিম ও ইউসুফ উভয়েই প্রাণ বাঁচিয়ে চলে যেতে সক্ষম হন। ইব্ন হাতিম সাবীদায় এবং ইউসুফ জিয়ানে গিয়ে আশ্রয় নেন। আবদুর রহমান আদ-দাখিল সেই প্রান্তর থেকে সোজা গিয়ে কর্ডোভায় প্রবেশ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি আনুগত্যের অঙ্গীকার করবে, তাকে কোনরূপ কষ্ট দেওয়া হবে না। লোকজন খুশি মনে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করে। ইবন হাতিম ও ইউসুফ আবার সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, কিন্তু অবশেষে আনুগত্য অবলম্বনে সম্মত হন। আবদুর রহমান আদ-দাখিল এ শর্তে তাঁদেরকে অভয় দেন যে, তাঁরা কর্ডোভায়ই অবস্থান করবেন এবং প্রতিদিন একবার সশরীরে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে দেখা দেবেন। তারপরই স্পেনে আবদুর রহমান আদ-দাখিল এবং তাঁর বংশধরদের রাজত্বের সূচনা হয় এবং আমীরদের শাসন যুগের অবসান ঘটে।

এক নজরে স্পেনে ইসলামী শাসনের প্রথম পর্যায়

স্পেন দেশ খিলাফতের কেন্দ্র অর্থাৎ দামেশক থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। স্পেন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবার জন্যে মুসলমানদেরকে কিবতী, বর্বার প্রভৃতি কয়েকটি জাতিকে পদানত করতে হয়। দরবারে খিলাফতের কোন ফরমান স্পেনে পৌঁছতে মাসের পর মাস লেগে যেতো। অনুরূপভাবে স্পেন থেকে খলীফার দরবার পর্যন্ত কোন আর্জি পৌঁছাতেও মাসের পর মাস সময় ব্যয়িত হতো। যে যুগে মুসলমানরা স্পেন জয় করেন তখন বিখ্যাত

মুসলিম সেনাপতি ও রাজনীতি-বিশারদদের অনেক মনোযোগ ও শক্তিই আত্মকলহে ব্যয়িত হচ্ছিল। ইরাক, সিরিয়া ও ইরান প্রদেশ খিলাফতের কেন্দ্রকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। এজন্যে স্পেনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের সুযোগ কখনো হয়ে ওঠেনি। স্পেন সাধারণত আফ্রিকার গভর্নরের অধীনেই থাকতো। কিন্তু যেহেতু স্পেনের উর্বরতা, শস্য-শ্যামল ভূমি এবং সমৃদ্ধির খ্যাতি মুসলিম জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই স্পেন বিজয়ের পর হিজায, সিরিয়া ও ইরাকে যাঁদেরকে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হতো না তাঁরাই স্পেনে গিয়ে হাযির হতেন। এ নবাগত আরবদেরকে স্পেনে একটি বিজেতা জাতির সদস্য হিসেবে বেশ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো এবং এজন্যে সেখানে তাঁরা অনায়াসেই উচ্চ পদে আসীন হতে পারতেন। এজন্যেই যাঁরা একবার সেখানে যেতেন, তাঁরা চিরদিনের জন্যে সেখানকার একজন হয়েই থাকতেন। আফ্রিকার বার্বার গোত্রের লোকজন শুরু থেকেই প্রচুর সংখ্যায় সেদেশে গিয়ে হাযির হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তাদের সেখানে যাওয়া অব্যাহত গতিতে চলছিল। ফলে স্বল্পকালের মধ্যেই স্পেন একটি মুসলিম উপনিবেশে পরিণত হয়। ঈসায়ীরাই ছিল এদেশের আসল অধিবাসী, যারা মুসলমানদের আনুগত্য গ্রহণ করেছিল। বিপুল সংখ্যক ইহুদীও সে দেশে বাস করতো। এভাবে স্পেনের বাসিন্দাদের মধ্যে নানা জাতির সংমিশ্রণ ঘটে। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কুড়িজনের মত শাসক ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। শাসকদের তত দ্রুত পরিবর্তনের ফলে স্পেনের মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতা ও জিদের ভাব কায়েম থাকে এবং তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনারও উন্মেষ ঘটে। ঈসায়ী অধিবাসীদেরকে কখনও কোনরূপ নির্যাতন করা হয়নি। আনুগত্যের স্বীকৃতিই তাদের জন্যে সর্বপ্রকার আপদ থেকে রক্ষার জন্য ছিল যথেষ্ট। অর্থনৈতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা তাদের জন্যে অবারিত ছিল।

প্রথম প্রথম মুসলমানদের মধ্যে বিজয়ীসুলভ উৎসাহ-উদ্দীপনা অত্যন্ত জোরদার ছিল। তারা ফ্রান্সের মধ্যভাগ পর্যন্ত জয় করতে করতে এগিয়ে যায়। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার স্বল্পকালের মধ্যেই আত্মকলহ দেখা দেয়। এই আত্মকলহ মুসলমানদের বিজয়ের গতিকে রোধ করে দেয়। ফ্রান্সের সেই ঈসায়ীদেরকে তা আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনার সুযোগ এনে দেয় যারা সর্বদা মুসলমানদের হামলার ভয়ে তটস্থ থাকতো। এই পঞ্চাশ বছরকালের মধ্যে নানা গোত্রের, নানা যোগ্যতার এবং নানা মন-মানসিকতার লোক স্পেনের আমীর হয়ে আসেন। এতদসত্ত্বেও স্পেনের জনসংখ্যা, উৎপাদন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। সর্বোপরি মুসলমানদের অস্তিত্ব এবং তাদের উন্নত নাগরিক জীবনের নমুনাই স্পেনবাসীদের জন্যে ছিল এক বিরাট পাওয়া। তদুপরি স্পেনের প্রজাসাধারণের আরও সুবিধা হয় এই যে, বিজেতারা বিজিত-সম্প্রদায়ের রমণীদেরকে বিবাহ করে নিজেদের অন্তঃপুরে উদারভাবে ঠাঁই দেয়ার ফলে বিজিতদের প্রতি বিজয়ীদের স্বভাবসুলভ উপেক্ষার মনোভাব স্বভাবতঃই তিরোহিত হয়ে যায়। ফলে মুসলমানদের অন্তরে ঈসায়ী প্রজাদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার উদ্রেক হয়। তাঁরা তাঁদের ঈসায়ী প্রজাদেরকে শিক্ষাদীক্ষা ও উন্নত

চরিত্রের উৎসাহ দিতে থাকেন। এমন কি অবস্থা এরূপ দাঁড়ায় যে, ফ্রান্সের শাসকও যখন নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হতেন তখন তাদের কেউ কেউ প্রতিবেশী মুসলমান শাসকদের কাছে সামরিক সাহায্য চাইতেন এবং তাঁরা তা পেতেনও।

যখন প্রথম প্রথম মুসলমানরা স্পেনে প্রবেশ করলেন এবং ঈসায়ীদের গথ রাজত্বের অবসান ঘটলো, তখন অনেক পাদ্রী এবং পাদ্রীদের মত উগ্র খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সাথে মুকাবিলাকারী ফৌজী সিপাহসালার পালিয়ে উত্তর দিকে চলে যায়। স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলই ছিল উষ্ণ, উর্বর এবং সমৃদ্ধিশালী। মুসলমান বিজেতারা দক্ষিণ দিক থেকেই সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন। তাই তাঁরা বিপুল সংখ্যায় এই দক্ষিণাঞ্চলেই বসতি স্থাপন করেন। দেশের উত্তরাঞ্চল ছিল পর্বতঘেরা এবং অধিকতর শীতল। আরবদের এ উত্তরাঞ্চলের প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। এজন্যে খুব কম সংখ্যক মুসলমানই উত্তরাঞ্চলে বসবাস গড়ে তুলেন। এমনিতেই পার্বত্য এলাকা তেমন মূল্যবান বা উর্বর ছিল না। মুসলমানরা সে অঞ্চল দখল করে নিজেদের রাজত্ব তো গড়ে তোলেন, কিন্তু তারা সে এলাকাকে তেমন ভালবাসেন নি বা তেমন মূল্যবান বলে ভাবতে পারেননি। পরাস্ত ও পলাতক খ্রিস্টান সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁরা পিরেনীজ পর্বতের উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। যখন গথ সর্দাররা এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে পরাস্ত উক্ত খ্রিস্টানরা তাদেরকে পিরেনীজ পর্বতের উত্তরে অবস্থিত সমভূমিতে অর্থাৎ দক্ষিণ ফ্রান্সের ভূমিতে যুদ্ধের আমন্ত্রণ জানালো, তখন এক নতুন দেশে নতুন যুদ্ধ সিরিজের সূচনা হলো। ফলশ্রুতিতে আরবুনিয়া প্রদেশে, নার্বুন শহরে এবং তার উত্তরে সমভূমিতেও মুসলমানদের রাজত্ব গড়ে উঠলো। কিন্তু তারপর মুসলমানদের আত্মকলহ বিজয়ের এ গতিকে আর অগ্রসর হতে দিল না।

স্পেনের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে স্বায়ত্ত শাসিত ঈসায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠা

পলিও

সব কিছুই হলো, কিন্তু মুসলমানদের আক্রমণ পরিচালনা ও সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সময় একটি সামান্য ভুলের জন্যে পরিণামে মুসলমানদের বিরাট সর্বনাশও সাধিত হয়। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, আমীর আম্বাসা পলিও নামক জনৈক ঈসায়ী লুটেরাকে তুচ্ছ ভেবে জাবাল আল-বুরতাত বা পিরেনীজ পর্বতে থাকতে দিয়েছিলেন। পলিও যখন পিরেনীজ পর্বতে তার ঘাঁটি গড়ে তুললো, তখন যে সব ঈসায়ী মুসলমানদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এবং যে সব পাদ্রী স্পেনের গির্জাসমূহ থেকে মূল্যবান স্মৃতিচিহ্নসমূহ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাঁরা এসে পলিওর চতুষ্পার্শ্বে জমায়েত হতে লাগলো। এভাবে পলিওর দলবল দিনে দিনে ভারী হয়ে ওঠে। সে তখন এক দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে। আশ্চর্যের বিষয়, পলিও যে কয়েক বর্গমাইল আয়তনের রাজ্য গড়ে তোলে তার চতুষ্পার্শ্বেই ইসলামী রাজ্য বিরাজ করছিল আর সে ছিল চতুর্দিক থেকেই মুসলিম রাজ্য পরিবেষ্টিত। দক্ষিণে ও পূর্বে মুসলিম রাজ্য বর্তমান ছিল। পশ্চিম দিকেও ইসলামী রাজ্য ছিল। চারপাশ

থেকে ইসলামী রাজ্য পরিবেষ্টিত বিদ্রোহীদের এ রাজ্যটির উচ্ছেদ সাধন তেমন কোন কঠিন বা দুঃসাধ্য কাজও ছিল না। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম শাসক এবং সিপাহসালারই পর্বতশীর্ষে সৈন্যদলসহ গিয়ে আক্রমণ চালনাকে নিজেদের জন্যে অপমানজনক মনে করেছেন। তাঁরা তাকে এজন্যে ছেড়ে রাখেন যে, সে মুসলিম রাজ্যের কোন ক্ষতি কস্মিনকালেও করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষেও পলিও কোনদিন পর্বতশীর্ষ থেকে নামবার বা মুসলিম শাসিত সমতলে নামবার সাহস পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। কোন ঈসায়ীই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনরূপ দুঃসাহস দেখাতে ভরসা পেত না। কিন্তু ধর্মীয় স্মৃতিচিহ্নসমূহ নিয়ে যে সব পাদ্রী পলিওর নিকট এসে সমবেত হয়েছিল তারা তাকে একজন ধর্মীয় বীর এবং ধর্মীয় স্মৃতিচিহ্নসমূহের রক্ষকরূপে চিত্রিত করলো। বার-তের বছর পর্যন্ত সে ঐ পর্বত শীর্ষে সেই ছোট্ট এলাকায়ই অবস্থান করে এবং চতুর্দিকের ঈসায়ীরা তাকে রসদ পৌছাতে থাকে। যতই সময় যেতে থাকে ততই খ্রিস্টান মহলে পলিওর প্রতি অনুরাগ এবং তার খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেক ঈসায়ী দূর-দূরান্ত থেকে অনেক কষ্ট সহ্য করে পলিওর নিকট এসে পৌছতো এবং ধর্মীয় স্মৃতিচিহ্ন দর্শনকে অতীব পুণ্যকাজ ও জরুরী বিবেচনা করতো। মুসলমানরা সব সময় মনে করতো, স্বল্পসংখ্যক ঈসায়ী প্রাণভয়ে অস্থির হয়ে পর্বত গুহায় আশ্রয় নিয়েছে, তারা আমাদের চেহারা দর্শনেও ভয় পায়। প্রাণভয়ে তারা আমাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে সাহসী হয় না। তাদেরকে পড়ে থাকতে দাও। মুসলমানদের এ অমনোযোগিতা খ্রিস্টানদেরকে ক্রমে ক্রমে সাহসী করে তোলে এবং তারা তাদের এ পার্বত্য আশ্রয়স্থলকেই নিজেদের রাজ্য বলে ভাবতে শুরু করে দেয়। তারা পলিওকে তাদের রাজা এবং ধর্মের রক্ষক বিবেচনা করে।

আলফোন্সূ

পলিওর মৃত্যুর পর ঈসায়ীরা তার পুত্রকে নিজেদের রাজারূপে গ্রহণ করে। দুই-তিন বছর পর সেও মৃত্যুমুখে পতিত হলে তারা তার জামাতা আল-ফোন্সুকে নিজেদের হর্তাকর্তা ও রাজারূপে গ্রহণ করে। এদিকে মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ ও পারস্পরিক রক্তারক্তি তাদেরকে উত্তরের প্রদেশসমূহ এবং পিরেনীজ পর্বতের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের দিকে মনোনিবেশ করার সময় দেয়নি। এই অবকাশে আল-ফোন্সু জালীকিয়া, আরাগুয়াল ও আরবুনিয়া এলাকাসমূহ থেকে ঈসায়ীদেরকে পার্বত্য রাজ্যে আগমনের এবং সেখানে বসতি স্থাপনের জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। ঈসায়ীরা যখন তার আমন্ত্রণে সমভূমিতে অবস্থিত তাদের শস্য-শ্যামল প্রান্তরসমূহ পরিত্যাগ করে পর্বতশীর্ষের বৈরাগ্য জীবন গ্রহণে সম্মত হলো না, তখন সে আশেপাশের এলাকাসমূহে লুটপাট শুরু করে দেয়। সে তার আক্রমণকালে কেবল লুটপাট করেই ক্ষান্ত হতো না, বরং ঈসায়ী বসতিসমূহতে আক্রমণ চালিয়ে ঈসায়ী প্রজাদেরকে ধরে নিয়ে যেত এবং আপন পার্বত্য রাজ্যে বসবাসে তাদেরকে বাধ্য করতো। অন্তরীণাবদ্ধ লোকের মত সে তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও রাখতো এবং তারা কোনক্রমেই উক্ত পার্বত্য এলাকা ছেড়ে বেরিয়েও আসতে পারতো না।

স্বাধীন ঈসায়ী রাজ্যের রাজধানী শহর

এভাবে জোরজবরদস্তিমূলক ভাবে পর্বতশীর্ষে একটি জনপদ বসানো হলো। যা ঈস্টার ইয়াস নামে খ্যাতিলাভ করে। এটাই হলো আল-ফোন্সুর রাজধানী। এখানে পাদ্রীদের দিবারাত্রির ওয়ায-নসীহত গ্রেফতারকৃত ঈসায়ীদের পাহাড়ে অবস্থান করতে সম্মত করে তুলে। ক্রমে ক্রমে তাদের সংখ্যা এতই বেড়ে যায় যে, পাহাড়ের এ ক্ষুদ্র আশ্রয়স্থলটি তাদের জন্যে আর যথেষ্ট ছিল না। এবার আল-ফোন্সু জাবাল আল-বুরতাত বা পিরেনীজ পর্বতের উত্তর দিকের মুসলমান অধিকৃত এলাকায় লুটপাট শুরু করে দেয়। কিন্তু সমভূমিতে তারা মুসলমানদের সাথে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারতো না। এতদ্সত্ত্বেও তাঁরা ক্রমে ক্রমে জাবাল আল-বুরতাতের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে উত্তরপ্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র পার্বত্য এলাকা দখল করে নেয়। এভাবে তারা একটি ক্ষুদ্র ঈসায়ী রাজ্য গড়ে তুলে ঈসায়ীদের আশা-ভরসার স্থলে পরিণত হয়। মুসলমানরা যদিও আত্মকলহে লিপ্ত ছিলেন তবুও তাদের কোন সর্দার ইচ্ছে করলে পিরেনীজ পর্বতের পার্বত্য অঞ্চল থেকে অনায়াসেই কাঁটা তোলার মত তাদেরকে তুলে এলাকাটাকে নিষ্কণ্টক করে ফেলতে পারতেন। এরকম অবস্থায়ও মুসলমানরা ইচ্ছে করলে আলবুনিয়া প্রদেশের সীমা ছাড়িয়ে ফ্রান্স দেশ জয়ের স্বপ্ন দেখতে পারতেন। মধ্যখানের এ ধর্মোন্মাদ ঈসায়ীদের দলকে তারা একটুও ভ্রূক্ষেপযোগ্য বলে বিবেচনা করতেন না। এদেরকে ঈসায়ী পাদ্রীরা মুসলিম বিদ্বেষের নেশায় বুঁদ করে রাখবার জন্যে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এভাবে স্পেনে আমীরদের শাসনের আমলে সে দেশের উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় একটি স্বাধীন ঈসায়ী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়, যার রাজধানী ছিল ঈস্টার ইয়াস। এ ঈসায়ী রাষ্ট্রটির না ফ্রান্সের ঈসায়ী রাষ্ট্রের সাথে কোন যোগাযোগ ছিল, না ইতালীর পোপের সাথে এর কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল। কিন্তু তার ধর্মীয় উন্মাদনা ছিল সর্বাধিক এবং এর শাসনতন্ত্র ও আইন-কানুন পাদ্রীদের দ্বারাই রচিত ছিল। ১৩৮ হিজরীতে (৭৫৫-৫৬ খ্রি.) আবদুর রহমান আদ-দাখিল স্পেনে প্রবেশ করে সে দেশের আমীর যুগের অবসান ঘটান। ঐ বছরই ঈস্টার ইয়াসের শাসনকর্তা প্রথম আল-ফোন্সুর মৃত্যু হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

স্পেনের খিলাফত শাসন

আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া উমুবী

স্বভাব-চরিত্র

আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম ১১৩ হিজরীতে (৭৩১ খ্রি.) ভূমিষ্ঠ হন। আবদুর রহমানের পিতা মুআবিয়া পূর্ণ যৌবনে মাত্র ২১ বছর বয়সে ১১৮ হিজরীতে (৭৩৬ খ্রি.) ইন্তিকার করেন। যখন আবদুর রহমানের বয়স মাত্র পাঁচ বছর, এ সময় আবদুর রহমানের পিতামহ হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খলীফা হিশাম আপন পৌত্রের সুশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। হিশামের ইচ্ছা ছিল পৌত্র আবদুর রহমানকে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। এজন্যে আবদুর রহমান যাতে সবদিক দিয়ে উপযুক্ত হয়ে ওঠে এটা ছিল তাঁর একান্তই আকাঙ্ক্ষিত। আবদুর রহমানের বয়স যখন মাত্র বার বছর তখন হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবদুর রহমানের মধ্যে গোড়া থেকেই নেতা-সুলভ লক্ষণাদি পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। তিনি কু-অভ্যাস ও চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন ছিলেন। তাছাড়া প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষা এবং শাসন-নীতি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। জ্ঞানী-গুণী এবং কুশলী আমীর উমারার সাহচর্য থেকেও তিনি উপকৃত হন। যৌবনকালে তিনি যুদ্ধবিদ্যা এবং রণকুশলতা থেকেও অজ্ঞ থাকেননি। অসৎ লোকদের সাহচর্যকে তিনি সর্বদা ঘৃণার চক্ষে দেখতেন এবং সু-স্বভাব ও চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন। অমাত্যবর্গ এবং দামেশকের জ্ঞানী-গুণীগণ তাঁর মর্যাদার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন এবং তাঁকে খলীফার পরিবারের একজন উত্তম ব্যক্তিরূপে বিবেচনা করতেন।

দেশত্যাগ

১৩২ হিজরীতে (৭৪৯-৫০ খ্রি.) যখন উমাইয়া খিলাফতের অবসান এবং আব্বাসী খিলাফতের সূচনা হয় তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়ার বয়স ছিল প্রায় কুড়ি বছর। ফুরাত নদীর কোল ঘেঁষে আবদুর রহমানের একটি জায়গীর ছিল। আব্বাসী সৈন্যরা দামেশ্‌কে প্রবেশ করে যখন তা অধিকার করে এবং উমাইয়াদের হত্যা শুরু হয়, তখন আবদুর রহমান দামেশকে ছিলেন না বরং তিনি তখন জায়গীরের গ্রামসমূহে অবস্থান করছিলেন। আবদুর রহমান যখন জানতে পারেন যে, বনূ উমাইয়া এবং তাদের সমর্থকদের

বেছে বেছে হত্যা করা হচ্ছে, তখন তিনি অতি সঙ্গোপনে গ্রামের বাইরের কুঞ্জবনে তাঁবুতে বসবাস করতে লাগলেন, যাতে গ্রামে শক্ররা হানা দিলে সংকট সম্পর্কে আঁচ করতে পেরে তিনি প্রাণরক্ষার চিন্তা করতে পারেন।

একদিন তিনি যখন তাঁর তাঁবুতে উপবিষ্ট এমন সময় তাঁর তিন-চার বছরের একটি শিশু সন্তান তাঁবুর বাইরে খেলছিল। হঠাৎ শিশুটি ভয়ে জড়সড় হয়ে তাঁবুতে এসে প্রবেশ করলো। ব্যাপার কি দেখার জন্যে বের হলে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আব্বাসীদের কৃষ্ণবর্ণ পতাকা বাতাসে পত পত করে উড়ছে আর ক্রমেই তা তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সমগ্র গ্রামে লোকের কলরব। আব্বাসী সৈন্যরা উমাইয়াদেরকে হত্যা করার জন্যে এসে পৌঁছে গেছে দেখে তিনি তাঁর শিশু সন্তানটিকে কোলে করে নদী তীরের দিকে দৌড় দিলেন। নদী তীরে তাঁর পৌঁছার পূর্বেই শক্ররা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলো। তাঁরা চিৎকার করে বলল, পালিয়ো না, পালিয়ো না, আমরা তোমাদের কোনই অনিষ্ট-সাধন করবো না বরং সর্বপ্রকারে তোমাদেরকে সাহায্য করবো। আবদুর রহমানের পিছে পিছে তাঁর ভাইও ছিলেন। আবদুর রহমান শক্র সৈন্যদের এরূপ চিৎকারের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করলেন না। তিনি নদী তীর পর্যন্ত পৌঁছেই নদীতে ঝাঁপ দিলেন। আবদুর রহমানের ভাই শক্রর কথায় ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কি যেন ভেবে তিনি পেছনের দিকে তাকালেন। শক্ররা দ্রুত তাঁর নিকটে পৌঁছে তরবারি দ্বারা তাঁর শিরশ্ছেদ করে। আবদুর রহমান সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে আপন শিশুপুত্রকে বক্ষে ধরে সাঁতরাতে সাঁতরাতে নদীর অপর তীরে গিয়ে ওঠেন। শক্র সৈন্যরা নদী অবতরণের সাহস করলো না। তারা নদীর এপারে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিল।

আবদুর রহমান আফ্রিকায়

আবদুর রহমান প্রাণ বাঁচিয়ে আত্মগোপন করে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কখনও গ্রামে মুসাফিরের ছদ্মবেশে থাকতেন, আবার কখনো বনে-জঙ্গলে রাত্রিযাপন করতেন। মোটকথা, ছদ্মবেশে তিনি পুত্রকে নিয়ে বড় বড় মঞ্জিল অতিক্রম করে ফিলিস্তীন এলাকায় গিয়ে উপনীত হন। ঘটনাচক্রে সেখানে তাঁর পিতার বদর নামক একজন ক্রীতদাসের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। সেও তখন অনুরূপভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে মিসরের দিকে ছুটে চলেছিল। বদরের কাছে আবদুর রহমানের বোনের কিছু অলঙ্কার এবং নগদ অর্থ গচ্ছিত ছিল। সে তা আবদুর রহমানের হাতে প্রত্যর্পণ করলো। এভাবে আবদুর রহমানের প্রবল অর্থসংকট দূরীভূত হলো। এবার তিনি বেশ পরিবর্তন করে একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর বেশে বদরের সহযাত্রী রূপে সফর শুরু করলেন। মিসরে উপনীত হয়ে তিনি বনূ উমাইয়ার সমর্থকদের সাথে সাক্ষাত করেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে তিনি আফ্রিকিয়া (তিউনিসিয়া) অভিমুখে যাত্রা করেন।

আবদুর রহমানের আফ্রিকায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এবং পলায়ন

আফ্রিকিয়ার গভর্নর আবদুর রহমানের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁর সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেন। কিন্তু কয়েকদিন পরই তিনি আঁচ করতে পারেন যে, আবদুর রহমান সেখানে তাঁর রাজত্ব গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর। এদিকে তিনি আব্বাসীয়দের

খিলাফত সুসংহত হওয়ার সংবাদও পান। তিনি আবদুর রহমানকে গ্রেফতার করে অব্বাসী খলীফা সাফ্ফাহ্‌র কাছে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আবদুর রহমান সময়মত টের পেয়ে যান। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আত্মগোপন করে ক্রীতদাস বদর ও শিশু সন্তানটিকে নিয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। আফ্রিকার গভর্নর আবদুর রহমানকে গ্রেফতার করার জন্য একটি বহুমূল্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। স্থানে স্থানে আবদুর রহমানকে খোঁজা শুরু হলো। এবার প্রাণ রক্ষার্থে আবদুর রহমানকে অনেক কষ্টবরণ করতে হয়। তিনি উপর্যুপরি কয়েকদিন পর্যন্ত উপবাস থাকতেন। মরুভূমির ধু-ধু বালু প্রান্তরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস ধরে তাঁকে আত্মগোপন করে থাকতে হতো।

একদা আবদুর রহমান জনৈকা বার্বার রমণীর কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গ্রেফতারকারী অনুসন্ধানী দল সেখানে গিয়ে পৌঁছলে উক্ত বৃদ্ধা আবদুর রহমানকে ঘরের এক কোণে বসিয়ে রেখে তাঁর শরীরের উপর অনেক কাপড়-চোপড় চাপিয়ে দেয়। দেখে মনে হচ্ছিল যেন পুরাতন কাপড়-চোপড়ের একটি স্তূপ পড়ে রয়েছে। অনুসন্ধানকারীরা তা দেখে ঘরময় তাঁকে খুঁজে না পেয়ে চলে যায়। এমন কি অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, খাবার এবং পরিধেয় সংগ্রহও তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্ঠকর হয়ে ওঠে। এরূপ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে আবদুর রহমান ৪-৫ বছর অতিবাহিত করে অবশেষে তিনি বার্বার সম্প্রদায়ের যানানা গোত্রের একটি শাখা গোত্র বনূ নাফূসায় গিয়ে পৌঁছেন। তাঁরা যখন জানতে পারলো যে, আবদুর রহমানের মা তাদেরই বংশের মহিলা ছিলেন, তখন তারা তাদের আপনজনের মত আতিথ্য প্রদান করলো এবং সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দিল। আবদুর রহমান বনূ নাফূস গোত্রের লোকজনের আধিক্য সম্বলিত সাবৃত নামক স্থানে অবস্থান করেন। এ চার-পাঁচ বছরে আফ্রিকায় অবস্থানের অভিজ্ঞতায় আবদুর রহমান সম্যক আঁচ করতে পারেন যে, আফ্রিকার গভর্নরের হাত থেকে এ দেশটি জয় করে নেয়া বা এখানে কোন নতুন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা সুকঠিন। সাবতায় আসার পর তিনি স্পেন সম্পর্কে অধিকতর অবহিত হওয়ার সুযোগ পান। কেননা, এ স্থানটি ছিল স্পেনের খুবই নিকটবর্তী। এ ছাড়া স্পেনের সাথে এলাকার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও ছিল। আবদুর রহমান যখন জানতে পারলেন যে, স্পেনে অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধ চলছে এবং সেখানকার শাসনকর্তা ইউসুফ বিদ্রোহীদেরকে দমনে ব্যস্ত এবং অত্যন্ত বিব্রতকর পরিস্থিতিতে রয়েছেন, তখন তাঁর সংকল্প ও সাহস বেড়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর ক্রীতদাস বদরকে স্পেনের উদ্দেশে রওয়ানা করলেন। তিনি তার মাধ্যমে উমাইয়া শাসনামলে যারা সর্দারী ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বনূ উমাইয়ার প্রতি যাঁরা সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন তাঁদের নামে পত্র পাঠালেন।

আবদুর রহমান স্পেনে

বদর স্পেনে উপনীত হয়ে আবূ উসমান ও আবদুল্লাহ্ উব্‌ন খালিদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার সাথে তাঁদেরকে স্ব-মতে আনয়ন করেন। আবূ উসমান সিরীয় ও আরব সর্দারদের একত্র করে তাঁদের সম্মুখে এ নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁরা একবাক্যে শাহযাদা আবদুর রহমানকে স্পেনে আমন্ত্রণ জানানোর এবং তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতাদানের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেন। তাঁরা নিজেদের এগারজন

লোককে জাহাজযোগে সাবতায় আবদুর রহমানের নিকট প্রেরণ করেন এবং বাহকদের বলে দেন যে, তোমরা গিয়ে শাহ্যাদা আবদুর রহমানকে আমাদের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব এখানে নিয়ে এসো। এটা ছিল একটা সৌভাগ্যজনক ঘটনা যে, যারা বনূ উমাইয়ার সমর্থক ও সহযোগী হবেন সেই সব সর্দারের প্রায় সকলেই স্পেনের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে বসবাস করতেন। এজন্যে আবদুর রহমানের স্পেনে অবতরণ সহজ ও সুগম হয়। স্পেন থেকে আগত জাহাজটি যখন বদরসহ এগারজন স্পেনবাসীকে নিয়ে সাবতার উপকূলে এসে ভিড়ল, ঘটনাচক্রে আবদুর রহমান তখন নামায আদায় করছিলেন। ঐ ব্যক্তিরা জাহাজ থেকে অবতরণ করে বদরের পিছু পিছু আবদুর রহমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সর্বপ্রথম স্পেনের এগার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের নেতা আবূ তামাম আবদুর রহমানের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি আরয করলেন, স্পেনবাসীরা আপনার অপেক্ষায় আছে। আবদুর রহমান তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করলেন। ঐ ব্যক্তি তার নাম বললে আবদুর রহমান উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমরা নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হবো। তারপর আবদুর রহমানের আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবে জাহাজে আরোহণ করলেন। তিনি সঙ্গে নিলেন তাঁর কয়েকজন জানবাজ সঙ্গী-সাথীকে যারা সাবতায় তাঁর সঙ্গে মওজুদ ছিলেন এবং তাঁর সাথে প্রীতি ও সহানুভূতির সম্পর্ক রাখতেন। তারপর এক শুভক্ষণে গিয়ে তারা স্পেনের উপকূলে অবতরণ করলেন। সেখানে পূর্ব থেকেই হাজার হাজার লোক তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে উপস্থিত ছিলেন।

আবদুর রহমানের কর্ডোভা অধিকার

আবদুর রহমানের স্পেনে উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে বনূ উমাইয়া ও সিরিয়াবাসী যে যেখানে ছিলেন, দ্রুত এসে আবদুর রহমানের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। তারপর শুরু হলো পার্শ্ববর্তী শহর-বন্দর ও গ্রাম-জনপদ অধিকারের পালা। বর্ষা মওসুম এসে পড়ায় ইউসুফ সহসা কর্ডোভায় এসে পৌঁছতে পারলেন না। এজন্যে আবদুর রহমান ইউসুফের চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্যে সাত মাস সময় হাতে পান। অবশেষে ঈদুল আযহার দিন যুদ্ধ হলো এবং রাজধানী কর্ডোভা আবদুর রহমানের অধিকারে আসলো। এ যুদ্ধে জয়লাভের পর আবুস সাবাহ্ নামক জনৈক ইয়ামানী সর্দার আপন গ্রোত্রের লোকজনকে লক্ষ্য করে বললো ঃ ইউসুফের নিকট থেকে আমরা আমাদের প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছি, এবার এ যুবক অর্থাৎ আবদুর রহমানকে হত্যা করে উমাইয়া রাজত্বের স্থলে এখানে নিজেদের রাজত্ব গড়ে তোল। কিন্তু আবদুর রহমানের বাহিনীতে সিরীয় ও বার্বারদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর, এজন্যে ইয়ামানীরা প্রকাশ্যে বিরোধিতা বা বিদ্রোহও করতে পারলো না। তাঁরা ঘাপটি মেরে থেকে গোপনে আবদুর রহমানের ওপর হামলার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। ঘটনাচক্রে আবদুর রহমানও তাদের ষড়যন্ত্রের কথা আঁচ করতে পারলেন। তিনি নিজের একটি প্রহরী দল গঠন করে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। বাহ্যত তিনি এ ব্যাপারে কিছুই না জানার ভান করলেন এবং এজন্যে কাউকে কোনরূপ দোষারোপও করলেন না। কয়েক মাস পরে তিনি আবুস সাবাহ্কে তার ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করালেন।

আবদুর রহমানের আমলাবর্গ

আবদুর রহমান ইব্‌ন উমাইয়া যেহেতু বয়সে নবীন এবং স্পেন দেশে একজন নবাগত ছিলেন, তাই এখানকার আমীর-উমারা, আমলা, প্রজাবর্গ, গোত্রসমূহ এবং তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন না। আবদুর রহমানের রাজত্ব শুরু হতেই রাজকার্য এবং বড় বড় পদে যারা অধিষ্ঠিত হলেন তাদের কেউ কেউ এমনও ছিলেন যাদের প্রতি স্পেনবাসীরা নানা কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন। সেখানে এমনও অনেকে ছিলেন, যাদের প্রত্যাশা ছিল তাঁরা বড় বড় পদ লাভ করবেন, কিন্তু কার্যত তাঁরা সেরূপ উচ্চপদ লাভ করতে পারেন নি। এভাবে দেশে এমন এক বিরাট সংখ্যক লোকের সৃষ্টি হলো, যারা আবদুর রহমানের প্রতি অসন্তুষ্ট ও অপ্রসন্ন ছিলেন। এছাড়া স্পেনের সাবেক আমীর ইউসুফ ফিহ্‌রী এবং দামীল ইব্‌ন হাতিমের বন্ধু-বান্ধবরা তো তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেনই।

বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ

আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া যদিও কোন গোষ্ঠী বা দল-উপদলের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন না এবং তিনি সকলের প্রতি সমান আচরণের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু যারা আগে থেকেই স্পেনে বিশেষ সুবিধাদি ভোগ করে আসছিলেন তাদের প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, আবদুর রহমান তাঁর শাসনামলের শুরুর দিকেই অনেক বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। একথার ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যায় ঃ স্পেনের সাবেক আমীর ইউসুফ ফিহ্‌রী চুক্তির শর্ত মুতাবিক কর্ডোভায় অবস্থানরত বা অন্য কথায় নজরবন্দী ছিলেন। আবদুর রহমানের কর্ডোভা অধিকারের পর দীর্ঘ দু'বছরকাল তাঁর বিভিন্ন প্রদেশে নিজ শাসন-শৃঙ্খলা কায়েমে এবং বিদ্রোহ দমনে বা তাদেরকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করতে ব্যয়িত হয়। এ সময় তিনি তাঁর স্ববংশের যারা আব্বাসীয়দের তলোয়ারের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন, তাদেরকে খুঁজে খুঁজে নিজের কাছে টেনে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এছাড়া তাঁর সমর্থক ও সহানুভূতিশীল বার্বারদের একটি বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেন যাতে প্রয়োজনের সময় তাদেরকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বনূ উমাইয়ার এক ব্যক্তি আবদুল মালিক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম এবং তাঁর পুত্র আমর ইব্‌ন আবদুল মালিক আব্বাসীয়দের তরবারি থেকে আত্মরক্ষা করে তখনো মিসরে অবস্থান করছিলেন। স্পেন অধিকৃত হওয়ার সংবাদ পেয়ে তারা মিসর থেকে স্পেনের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনকারী আরও দশ ব্যক্তি তাদের সহযাত্রী হয়। এভাবে বার ব্যক্তির কাফেলাটি একদিন স্পেনে গিয়ে আবদুর রহমানের দরবারে উপনীত হয়। আবদুর রহমান তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে কাছে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি আবদুল মালিক ইব্‌ন আমরকে আশবেলিয়ার (সেভিলের) এবং আমর ইব্‌ন আবদুল মালিককে শুরার-এর শাসনভার অর্পণ করেন।

এ অপরিচিত দেশে আবদুর রহমান ছিলেন একেবারেই একাকী। স্পেনের মুসলমানদের বিভিন্ন ফের্কা এবং উপদলের প্রতি তিনি এতটা আস্থাশীল ছিলেন না যে, তাদের সকলে

মিলে আব্বাসীয়দের মুকাবিলায় তাঁর সাথে থাকবে। এজন্যে তিনি শুরুর দিকে নিজেকে স্পেনের একজন সাবেক আমীরের অবস্থানে রাখেন এবং খুতবায় আব্বাসীয় খলীফার নামই পাঠ করতেন। অথচ অন্তরে অন্তরে তিনি আব্বাসীয়দের শত্রু ছিলেন এবং নিজেও তাদেরকে শত্রু ভাবতেন। এমতাবস্থায় তাঁর নিকটাত্মীয়দের আগমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগরূপে গণ্য করেন এবং তাদেরকে নির্দ্বিধায় বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত করেন। স্পেনে আবদুর রহমানের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এমন অনেক লোকের উদ্ভব হয় যারা অন্তরে অন্তরে আবদুর রহমানের শাসনকে পছন্দ করতো না। এখন ১৪১ হিজরীতে (৭৫৮-৫৯ খ্রি) আবদুল মালিক এবং তাঁর পুত্র আমরকে আশবেলিয়া (সেভিল) প্রভৃতি স্থানের শাসনভার অর্পণের পর তাদের বিরুদ্ধবাদী গুঞ্জরণের সুযোগ আরও বৃষ্টি পেল। চতুর্দিকে বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের ভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং তা এক মারাত্মক সংকটের আকার ধারণ করলো।

স্পেনের সাবেক আমীর ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমানের হত্যাকাণ্ড

স্পেনের সাবেক আমীর ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমানকে লোকজন প্ররোচিত করতে লাগলো। তিনি কর্ডোভা থেকে গোপনে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর দুই পুত্র আবূ যায়দ আবদুর রহমান এবং আবুল আসওয়াদ কর্ডোভা থেকে বের হতে সক্ষম হলেন না। তাঁরা কর্ডোভায়ই রয়ে গেলেন। ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমানের উযীর দামীল ইব্ন হাতিমও কার্ডোভা থেকে বের হতে সক্ষম হলেন না। তাঁরা তিনজনেই গ্রেফতার এবং নজরবন্দী হন। ইউসুফ ফাহ্‌রী কর্ডোভা থেকে পলায়ন করে টলেডো গিয়ে পৌঁছলেন। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চতুর্দিক থেকে লোকজন এসে তাঁর কাছে সমবেত হলো। দেখতে দেখতে টলেডোতে বিশ হাজার লোক এসে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হলো। ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমান এ বাহিনীকে নিয়ে আশবেলিয়া (সেভিল) আক্রমণ করলেন এবং আবদুল মালিক ইব্ন আমরকে অবরোধ করলেন। আবদুল মালিক প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য উদ্যত হলেন। ইউসুফ আশবেলিয়া (সেভিল) জয়ে অধিক কালক্ষেপণ সঙ্গত হবে না ভেবে আশবেলিয়ার অবরোধ প্রত্যাহার করে কর্ডোভা অভিমুখে যাত্রা করলেন। এদিকে আবদুল মালিকের পুত্র আমর তাঁর পিতার অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ পেয়ে আশবেলিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে পড়েন। পিতাপুত্র উভয়ে মিলে ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমানের বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করেন। এদিকে আমীর আবদুর রহমান যখন জানতে পারলেন যে, ইউসুফ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে কর্ডোভার দিকে এগিয়ে আসছে তখন তিনি কর্ডোভা থেকে বের হয়ে ইউসুফের উদ্দেশে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হলো। সম্মুখ দিক থেকে আবদুর রহমান হামলা করলেন। পিছন দিক থেকে আবদুল মালিক ও আমর এসে পৌঁছলেন। এ সাঁড়াশি আক্রমণে ইউসুফের পক্ষের অনেক লোক হতাহত হয়। পরাস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে ইউসুফ টলেডোর দিকে পলায়ন করেন। তিনি টলেডোর নিকটবর্তী হলে তাঁর বাহিনীর ইয়ামানী সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো যে, আমরা যদি নিজেরাই ইউসুফকে হত্যা করে তার শির আমীর আবদুর রহমানের দরবারে পৌঁছিয়ে দেই, তা হলে তিনি খুশি হয়ে আমাদের বিদ্রোহজনিত অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। সত্যি সত্যি ইয়ামানীরা সে মতে কাজ করলো এবং তাঁর টলেডোয়

প্রবেশের পূর্বেই তাঁকে হত্যা করে এবং তাঁর শির নিয়ে আবদুর রহমানের সমীপে উপস্থিত হয়।

ইউসুফ ফাহ্‌রী অত্যন্ত বীর পুরুষ এবং খ্যাতনামা সিপাহ্‌সালার ছিলেন। তিনি ইতিপূর্বে স্পেনের আমীর ছিলেন। তাঁর চরিত্রে বদান্যতা ও শিষ্টতার কোন কমতি ছিল না। কিন্তু তিনি সহজেই মানুষের প্রতারণা জালে ধরা দিতেন। এবারও তিনি প্রতারিত হলেন এবং লোকের কথায় ভুলে অঘোরে প্রাণ দিলেন। এ তিক্ত অভিজ্ঞতা আমীর আবদুর রহমানকে দামীল ইব্‌ন হাতিম এবং ইউসুফের পুত্রদেরকে হত্যার বৈধতা এনে দেয়। তাই ইব্‌ন হাতিম এবং আবূ যাদ ইব্‌ন ইউসুফকে হত্যা করা হয়, কিন্তু স্বল্প বয়সের বিবেচনায় ইউসুফের অপর পুত্র আবুল আসওয়াদকে হত্যা না করে কর্ডোভার নিকটবর্তী একটি পার্বত্য দুর্গে নজরবন্দী করে রাখা হয়। ইউসুফের বিদ্রোহ দমনের পর অন্যান্য বিদ্রোহীর সাহস উবে যায় এবং ব্যাহ্যত আমীর আবদুর রহমানের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আমীর আবদুর রহমান ফাহ্‌রী বংশের বিদ্রোহীদের শবদেহগুলোকে অন্যদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে কর্ডোভার উপকণ্ঠে প্রকাশ্যে শূলিতে ঝুলিয়ে রাখেন। বাহ্যত মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হলেও ভেতরে ভেতরে ফাহ্‌রীদের প্রতি তাদের সহানুভূতি বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা

ইউসুফ ফাহ্‌রীর বিদ্রোহ দমন করার পর আমীর আবদুর রহমান রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসন শৃঙ্খলার দিকে মনোনিবেশ করেন। সর্বপ্রকার শাহী নিদর্শন হস্তগত করার পর ১৪৬ হিজরীতে (৭৬৩ খ্রি.) নিজের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দিয়ে আব্বাসী খলীফার নাম তিনি খুতবা থেকে বাদ দিয়ে দেন। আব্বাসীদের খিলাফত রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখনো পূর্বাঞ্চলের বাকি ঝামেলা থেকে তাঁরা মুক্ত হন নি। তজ্জন্য আবদুর রহমানের স্পেন অধিকারের সংবাদে তাঁরা ব্যথিত হলেও এত দূরবর্তী অঞ্চলে কোন অভিযান প্রেরণে তাঁরা সমর্থ হন নি। তবে এ কথা ভেবে অনেকটা আশ্বস্ত ছিলেন যে, আবদুর রহমানকে দমন করা যেহেতু সহজসাধ্য নয় তাই আমাদের নাম যে খুতবায় সেখানে পড়া হয় সেটাও কম কথা নয়।

আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে আব্বাসীয় খলীফাদের পদক্ষেপ

এবার যখন জানা গেল যে, আমীর আবদুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করে খুতবা থেকে খলীফার নাম খারিজ করে দিয়েছেন তখন আব্বাসীয় খলীফা মানসূর অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তিনি আফ্রিকার সিপাহ্‌সালার আলা ইব্‌ন মুগীছ ইয়াহ্‌সূবীকে পত্র লিলখেন এবং তাঁর কাছে একটি কৃষ্ণ পতাকা প্রেরণ করে তাঁকে সসৈন্য স্পেন আক্রমণের নির্দেশ করলেন। আলা ইব্‌ন মুগীছ খলীফার পত্র পেয়ে আফ্রিকা থেকে স্পেন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। এদিকে স্পেনে ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান ফাহ্‌রীর জনৈক আত্মীয় হাশিম ইব্‌ন আবদে রাব্বাই ফাহ্‌রী টলেডোর রঈস বলে গণ্য হতেন। ফাহ্‌রীদের শোচনীয় পরাজয় ও ধ্বংসের জন্য তিনি মর্মজ্বালায় ভুগছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী প্রচুর সংখ্যক বার্বারীকে

প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর সমর্থক বানিয়ে ফেলেন। এছাড়া ফাহ্রীদের শোচনীয় পরিণতির জন্যে মর্মাহত আরও অনেকে এসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাশিমের পার্শ্বে সমবেত হতে থাকে।

হাশিম ফাহ্রী আফ্রিকায় আলা ইব্ন মুগীছের কাছে এমর্মে পয়গাম প্রেরণ করেন যে, আপনি কালবিলম্ব না করে স্পেন আক্রমণ করেন। এদিক থেকে আমরা পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে হামলা করবো। এ বার্তা আলা ইব্ন মুগীছের সাহস আরো বৃদ্ধি করে তোলে। আবদুর রহমান আফ্রিকার দিক থেকে আসন্ন হামলার কথা মোটেই অবগত ছিলেন না। ১৪৬ হিজরীতে (৭৬৩ খ্রি) হাশিম বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলেন এবং উত্তর স্পেন অধিকার করে নিলেন। তিনি টলেডোকে মজবুত করে গড়ে তুলেন। আমীর আবদুর রহমান কর্ডোভা থেকে সসৈন্যে এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং জাগীর টলেডো অবরোধ করেন। টলেডোর বিদ্রোহীরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এ অবরোধ দীর্ঘ কয়েকমাস পর্যন্ত চলে। কিন্তু কোন ফলোদয় হলো না। এদিকে আলা ইব্ন মুগীছ তাঁর বাহিনী নিয়ে নৌপথে বাজায় অবতরণ করেন। তাঁর কাছে খলীফা মানসূর আব্বাসীর প্রেরিত কৃষ্ণ পতাকা এবং ফরমান ছিল।

স্পেনের প্রজাসাধারণ আলা ইব্ন মুগীছকে খলীফাতুল মুসলিমীনের প্রতিনিধি জেনে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে। তাঁরা আবদুর রহমানকে বিদ্রোহী বলে গণ্য করতে শুরু করে। আমীর আবদুর রহমান এ সংবাদ জ্ঞাত হয়ে অত্যন্ত বিব্রতবোধ করেন। এটা ছিল অত্যন্ত নাজুক অবস্থা। কেননা, উত্তর স্পেনের বিদ্রোহীরা তখনো কাবু হয়ে সারেনি। এমনি সময়ে দক্ষিণ স্পেনে এমন একটি শক্তিশালী শত্রুর আবির্ভাব হলো এবং প্রজাসাধারণ তার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। আমীর আবদুর রহমান টলেডো থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে নবাগত শত্রুর মুখোমুখি হলেন। তিনি আশবেলিয়ার সন্নিকটস্থ কারমূনা নামক স্থানে উপনীতি হতেই আলা ইব্ন মুগীছ তাঁর দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্যে উপস্থিত হলো। আলার নিকটবর্তী হতেই স্বয়ং আবদুর রহমানের বাহিনীর বেশ কিছু লোক আলা ইব্ন মুগীছের বাহিনীতে যোগ দেয়। এদিকে টলেডোর অবরুদ্ধ বিদ্রোহীরা অবরোধ মুক্ত হতেই আলা ইব্ন মুগীছের বাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে তাদের একাংশ সৈন্য পাঠিয়ে দিল এবং তাঁকে তাদের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিল। অগত্যা আবদুর রহমানকে কারমূনা দুর্গে অবরুদ্ধ হতে হলো।

আবদুর রহমানের সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ

আলা ইব্ন মুগীছ নিজে কারমূনা অবরোধ করলেন এবং তার বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটকে লুটপাট চালানোর জন্যে বিভিন্ন দিকে রওয়ানা করে দিলেন। স্পেনের বার্বারী ও অন্যরা এ অবস্থা লক্ষ্য করে নিজেরাও লুটপাটে মত্ত হলো। গোটা স্পেনদেশের সর্বত্র লুটপাট ও অরাজকতা শুরু হলো। আমীর আবদুর রহমান দু'মাস ধরে কারমূনা দুর্গে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকেন। রসদপত্র শেষ হয়ে গেলে ক্ষুৎপিপাসায় লোকজন মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে লাগলো। উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনই পথ আর বাকি রইল না। এ পরম হতাশার মুহূর্তে আমীর আবদুর রহমান তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

"আমাদের এখন ক্ষুধার প্রাবল্যে মৃত্যুবরণ করা বা জীবিত অবস্থায় শত্রুর হাতে বন্দী হওয়ার চাইতে যুদ্ধ করে বীরের মত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা এবং কাপুরুষের জীবনের চাইতে বীরের মৃত্যুকে প্রাধান্য দেয়ার সময় এসেছে।"

তাঁর কথা মত তক্ষুণি একটি বিরাট চুল্লী ধরিয়ে সাতশ লোক তাদের সাতশ তলোয়ারের খাপ তাতে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে দিলেন, যার তাৎপর্য হলো, হয় যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দেব, নতুবা জয়যুক্ত হব। তারপর দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে আকস্মিকভাবে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবরোধকারী বাহিনী দীর্ঘ দু'মাস ধরে দুর্গ অবরোধ করে রয়েছিল। তারা জানতো যে, দুর্গে স্বল্প সংখ্যক সৈন্যই রয়েছে। এজন্যে এদের ব্যাপারে এরা অনেকটা নিশ্চিন্তই ছিল। আকস্মিকভাবে এ সাতশ ক্ষুধার্ত সিংহ দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে এমনিভাবে হত্যাযজ্ঞ শুরু করলো যে, অবরোধকারী শত্রুবাহিনী তাদের সাত হাজার শবদেহ দুর্গের সম্মুখে ফেলে পলায়ন করলো। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে গোটা স্পেনদেশে আবার আমীর আবদুর রহমানের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। তাঁর হৃত রাজ্য তিনি ফিরে পেলেন।

অদ্ভুত উপহাস

এ সময় আবদুর রহমান মানসূর আব্বাসীর সাথে এক অদ্ভুত উপহাস করেন। তিনি আলা ইব্‌ন মুগীছ এবং আব্বাসীয় বাহিনীর বড় বড় সর্দারের শিরশ্ছেদ করে এবং তাদের কান ছিদ্র করে প্রত্যেকের শিরের সাথে তার নাম-ধাম ও পদবী সম্বলিত এক একটি চিরকুট বেঁধে দিয়ে শিরগুলোকে পরম যত্নসহকারে বাক্সবন্দী করে হাজীদের কাফেলার সাথে করে মক্কা অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে জনৈক হিজাযী তা খলীফা মানসূরের খিদমতে পেশ করেন। খলীফা মানসূর যখন সিন্দুক খুলে আলা ইব্‌ন মুগীছের শির দেখতে পেলেন, সাথে সাথে তাঁর কৃষ্ণপতাকার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলো দেখতে পেলেন, তখন বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র শোকর! আমার এবং আবদুর রহমানের মধ্যে সমুদ্র অন্তরায় হয়ে আছে। তারপর আরেক দিন তিনি বললেন, আবদুর রহমানের সাহসকিতা, বিচক্ষণতা এবং কর্মকুশলতার জন্যে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। কী নিঃস্বভাবেই না সে এত দূর-দূরান্তের রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়ে আপন রাজত্ব গড়ে তুলেছে। কারমূনার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৪৬ হিজরীর (৭৬৪ খ্রি.-এর প্রথমার্ধে) শেষার্ধে।

বিদ্রোহীদের উৎখাত

কারমূনার বিজয়ের পর আমীর আবদুর রহমান তাঁর ভৃত্য বদর এবং তামাম ইব্‌ন আলকামাকে সৈন্যসামন্ত দিয়ে টলেডো অভিমুখে প্রেরণ করলেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বদর ও তামাম টলেডোর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিরাট বিজয় লাভ করেন। হিশাম ইব্‌ন আবদে রাব্বিহী ফাহ্‌রী, হায়াত ইব্‌ন ওয়ালীদ ইয়াহসূবী, উসমান ইব্‌ন হামযা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খাত্তাব প্রমুখ বড় বড় বিদ্রোহী সর্দার বন্দী হলেন। এ সর্দারদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যখন তাঁরা কর্ডোভার সন্নিকটে উপনীত হলেন, তখন নগরীর উপকণ্ঠেই তাদের শির ও শ্মশ্রু মুণ্ডিত করে অত্যন্ত অপমানজনক অবস্থায় গাধায়

চড়িয়ে নগরীতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমীর আবদুর রহমানের নির্দেশে সেখানে তাদেরকে হত্যা করা হয়।

আলা ইব্ন মুগীছের সাথে অনেক ইয়ামানী গোত্র শামিল হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই কারমূনার যুদ্ধে আবদুর রহমান ও তাঁর সহচরদের হাতে নিহত হয়। ইয়ামানীরা তাদের সে সব সঙ্গী-সাথীর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর ছিল। সে মতে ঐ বছরই অর্থাৎ ১৪৭ হিজরীতে (৭৬৪ খ্রি.) সাঈদ ওরফে মাতারী বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন এবং লাবলা শহরে ফৌজ সংগ্রহ করে আশবেলিয়া দখল করে বসেন। এ সংবাদ পেয়ে আমীর আবদুর রহমান কর্ডোভা থেকে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মাতারীকে দমনের উদ্দেশ্যে আশবেলিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। মাতারী আশবেলিয়ার একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে সেখান থেকে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করলেন। আবদুর রহমান আশবেলিয়া অবরোধ করে বসলেন। আত্তাব আলকামী শাদূনা শহরে অবস্থান করছিলেন। তিনি মাতারীর সাথে এ বিদ্রোহে অংশগ্রহণের অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিলেন। তাই মাতারীর অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ পেয়ে আত্তাব ইব্ন আলকামী শাদূনা থেকে সসৈন্যে আশবেলিয়া অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

এ সংবাদ অবগত হয়ে আমীর আবদুর রহমান তাঁর ভৃত্য বদরকে একদল সৈন্য দিয়ে আত্তাবকে মাতারী পর্যন্ত পৌছার পথে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। এদিকে সাঈদ ওরফে মাতারী নিহত হলেন। দুর্গবাসীরা খলীফা ইব্ন মারওয়ান নামক এক ব্যক্তিকে তাদের নেতা নির্বাচিত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভয় প্রার্থনা করে আবেদন জানাতে বাধ্য হলো। আবদুর রহমান তাদের সে আবেদন মঞ্জুর করে সে দুর্গটি ধ্বংস করে দিলেন এবং নিজে কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তার অব্যবহিত পরেই জিয়ান এলাকায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন খারাশা আসাদী বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন এবং আমীর আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেন। আমীর আবদুর রহমান তাৎক্ষণিকভাবে একটি সৈন্যবাহিনী সে দিকে পাঠিয়ে দেন। আবদুল্লাহ্র বাহিনীর লোকজন যখন জানতে পারলো যে, আবদুর রহমানের বাহিনী এসে পড়েছে তখন তারা আবদুল্লাহ্র দলত্যাগ করে। আবদুল্লাহ্ আসাদী আমীর আবদুর রহমানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আমীর তাঁকে ক্ষমা করে দেন। ১৫০ হিজরীতে (৭৬৭ খ্রি.) গিয়াস ইব্ন মীর আসাদী বিদ্রোহ করেন। বাজা অঞ্চলের শাসক সৈন্য সংগ্রহ করে তার মুকাবিলা করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াস নিহত হন। তাঁর পরাজিত সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বাজার আমিল গিয়াসের শিরশ্ছেদ করে যুদ্ধ জয়ের সুসংবাদসহ তাঁর শিরও আমীর আবদুর রহমানের দরবারে প্রেরণ করলেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৫০ হিজরীতে (৭৬৭ খ্রি.) আমীর আবদুর রহমান কর্ডোভা নগরীর প্রাচীরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

১৫১ হিজরীতে (৭৬৮ খ্রি.) বার্বারীদের মাকনাসা গোত্রের জনৈক শাকনা ইব্ন আবদুল ওয়াহিদের আবির্ভাব ঘটে। ঐ ব্যক্তি শিক্ষকতা করতো। সে নিজেকে হযরত হুসাইন ইব্ন আলীর বংশধর বলে দাবি করে এবং তার নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ বলে ব্যক্ত করে। সে ব্যক্তি আব্বাসীয়দের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে এবং তাতে তাদের সাফল্যের ব্যাপারে অবগত ছিল। এছাড়া উলুভী বা আলীপন্থী প্রচারকরা যে প্রায়ই মাকনাসা এবং বার্বারদের এলাকায় আসতেন তাও তার জানা ছিল। তাই স্পেনের শাসন-শৃঙ্খলাকে লণ্ডভণ্ড

করে দেয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণে সে সাহসী হয়। তার এ দুঃসাহস কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না। দেখতে দেখতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বার্বাররা তার চতুষ্পার্শ্বে এসে জমায়েত হতে থাকে। বার্বারদের ছাড়া আরো অনেক লোকও তার ভক্তদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়ে। ইবনুল ওয়াহিদ তার অলৌকিক ক্ষমতার কথাও তাদের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে তার নিজের প্রতি আস্থাশীল করে তোলে। তার ভক্ত সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেলে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো এবং স্পেনের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ বালানসিয়ার অন্তর্ভুক্ত শায়তারান নামক স্থান অধিকার করে নিল। আমীর আবদুর রহমান এ সংবাদ অবগত হয়ে তাকে দমনের উদ্দেশ্যে সসৈন্য কর্ডোভা থেকে রওয়ানা হলেন।

ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ আমীর আবদুর রহমানের আগমন সংবাদ পেয়ে দলবলসহ পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। সে তাঁর সাথে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলো না। আমীর আবদুর রহমান কর্ডোভায় ফিরে আসেন। টলেডোর শাসনভার হাবীব ইব্‌ন আবদুল মালিকের হাতে অর্পণ করে তাঁকেই তিনি ইব্‌নুল ওয়াহিদকে দমনের দায়িত্ব প্রদান করেন। হাবীব ইব্‌ন আবদুল মালিক তাঁর পক্ষ থেকে সুলায়মান ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আবাস ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আফফানকে ইবনুল ওয়াহিদকে গ্রেফতার করার এবং তার সমুচিত শাস্তি বিধানের জন্য প্রেরণ করলেন। সুলায়মান সসৈন্য ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ যুদ্ধে সুলায়মানকে পরাস্ত ও গ্রেফতার করে তাকে হত্যা করে এবং কাউরিয়া অঞ্চল অধিকার করে নেয়।

এ সংবাদ অবগত হয়ে ১৫২ হিজরীতে (৭৬৯ খ্রি.) আমীর আবদুর রহমান স্বয়ং একটি বাহিনী নিয়ে কর্ডোভা থেকে যাত্রা করেন। ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ আমীরের আগমন সংবাদ জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যায়। অগত্যা বিব্রত অবস্থায় আমীর আবদুর রহমান কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৫৩ হিজরীতে (৭৭০ খ্রি.) আমীর আবদুর রহমান তাঁর ভৃত্য বদরকে একটি বাহিনীসহ প্রেরণ করলেন। বদর শায়তারানের দুর্গের নিকটবর্তী হতেই ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ শায়তারান ছেড়ে পার্বত্য এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৫৪ হিজরীতে (৭৭১ খ্রি.) আমীর আবদুর রহমান পুনরায় নিজে যান কিন্তু পূর্বের মতোই শাকনা ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ তাঁর নাগালের বাইরেই রয়ে যায়।

১৫৫ হিজরীতে (৭৭২ খ্রি.) আমীর আবদুর রহমান আবূ উসমান উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমানকে একটি বিরাট বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু এবারও আশাব্যঞ্জক কোন ফলোদয় হলো না। বরং ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ আবূ উসমানকে তাঁর বাহিনীর এক বিরাট অংশকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করতে সমর্থ হয়। সে কয়েকটি শহরেও লুটপাট চালায়। অগত্যা ১৫৬ হিজরীতে (৭৭৩ খ্রি.) আমীর আবদুর রহমান পুনরায় সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কর্ডোভা থেকে যাত্রা করলেন, কর্ডোভায় তখন তিনি তার পুত্র সুলায়মানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। যখন তিনি শায়তারান দুর্গের সন্নিকটে গিয়ে পৌছলেন তখন সংবাদ পেলেন যে, ইয়ামানী গোত্রসমূহ এবং আশবেলিয়াবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। অগত্যা আমীর আবদুর রহমান শায়তারান ও ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদকে পূর্বাবস্থায় পরিত্যাগ করে আশবেলিয়া

অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং আবদুল মালিক ইব্‌ন উমরকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আশবেলিয়া আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

আবদুল মালিক আশবেলিয়ার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে আপন পুত্র উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল মালিককে আশবেলিয়াবাসীদের ওপর নৈশ আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী দলরূপে প্রেরণ করলেন। উমাইয়া যখন লক্ষ্য করলেন যে, আশবেলিয়াবাসীরা সদাসতর্ক তখন তিনি হামলা করা থেকে বিরত রইলেন। তিনি তাঁর পিতার কাছে ফিরে আসলেন। আবদুল মালিক তাঁর প্রত্যাবর্তনের কারণ কি জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন যে, আশবেলিয়াবাসীরা অপ্রস্তুত ছিল না বিধায় তিনি হামলা করতে পারেন নি। আবদুল মালিক গর্জে উঠলেন, 'কী? মৃত্যুভয়ে তুই আক্রমণ করা থেকে বিরত থেকেছিস ? আমি কোন কাপুরুষকে পছন্দ করি না'—এ কথা বলেই তিনি তৎক্ষণাৎ আপন পুত্র উমাইয়ার গর্দান উড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সহযাত্রীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমরা কি নৃশংসভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি, তা কি তোমরা অবগত আছ ? আমরা রাজ্যহারা হয়ে অতিকষ্টে মাতৃভূমি থেকে দূরের এ ভূমিখণ্ডটি হস্তগত করেছি, যা বড় জোর আমাদের জীবন-যাপনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। কাপুরুষতার দ্বারা এ ভূখণ্ডটিও আর হাতছাড়া করা আমাদের জন্যে কোনক্রমেই উচিত হবে না। এখন আর জীবনকে মৃত্যুর উপর প্রাধান্য দেয়ার কোনই অর্থ হয় না। বীরদর্পে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করাই আমাদের জন্যে শ্রেয়।" সকলে এক বাক্যে তাঁর বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানালেন এবং তাঁরা মরতে ও মারতে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলেন। আশবেলিয়ার ইয়ামানী গোত্রসমূহের প্রচুর সৈন্য ছিল। আর এরাই ছিল এদের শক্তি ও বলবীর্যের সর্বশেষ প্রকাশ। তাই আশবেলিয়া জয় করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। আবদুল মালিক ইব্‌ন উমর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। তাঁর গোটা বাহিনী তাঁর সাথে এ আক্রমণে যোগ দিল। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে আশবেলিয়াবাসীরা পরাস্ত হলো। আবদুল মালিকের দেহে কয়েকটি আঘাত লাগলো এবং যখম হলো, কিন্তু শত্রু হত্যায় তিনি বিস্ময়কর বীরত্ব এবং ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিলেন। যুদ্ধ শেষে যখন আবদুল মালিক তরবারি হাত থেকে রাখতে চাইলেন তখন তাঁর মুষ্টিবদ্ধ অঙ্গুলিসমূহ খুলছিল না। তা তরবারি আঁকড়েই রইল। এমনি সময় আমীর আবদুর রহমান এসে সেখানে উপনীত হলেন। আবদুল মালিকের রক্তাপ্লুত মুষ্টিতে আবদ্ধ তরবারি দেখে এবং যুদ্ধের বিবরণ শুনে তিনি বলে উঠলেন, ভাই আবদুল মালিক! আমি আমার পুত্র হিশামের বিবাহ আপনার কন্যার সাথে করাতে আগ্রহী। তারপর আমীর আবদুর রহমান আবদুল মালিককে তাঁর প্রধান মন্ত্রীর পদে বরণ করে নেন।

ইয়ামানী গোত্রসমূহের অর্থাৎ আশবেলিয়াবাসীদের দু'জন সর্দার বানীলা শহরের শাসক আবদুল গাফ্ফার ইব্‌ন হামিদ, আশবেলিয়ার শাসক হায়াত ইব্‌ন কালাকশ এবং বীজার শাসক আমর এ যুদ্ধ থেকে পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হন। তাঁরা আবার তাঁদের চতুস্পার্শ্বে আরব গোত্রগুলোকে সমবেত করলেন। ১৫৭ হিজরীতে (৭৭৪ খ্রি.) আমীর আবদুর রহমান তাঁদের উপর হামলা করলেন এবং তাদেরকে এবং তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে পরাস্ত করে হত্যা করেন। এ সব ঘটনার ফলশ্রুতিতে আবদুর রহমান আরব গোত্রসমূহের প্রতি বীতরাগ হন এবং তাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। তাই তিনি অনারব এবং ক্রীতদাসদেরকে ভর্তি করতে শুরু করেন যাতে আরবদের বিদ্রোহের কারণে বিব্রতকর

পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। একই কারণে সম্ভবত আব্বাসীয় খলীফাগণও নিজেরা আরব হয়েও আরবদের ওপর অনারব শক্তিদের প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং আরবদের বিশ্বাসঘাতকতাকে সারা জীবন ভীতির চোখে দেখেছেন।

১৬০ হিজরীতে (৭৭৭ খ্রি.) আবদুর রহমান একটি বাহিনী ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এ বাহিনী শায়তারানে গিয়ে সেখানকার কেল্লা অবরোধ করে। দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত কেল্লা অবরোধ করে থাকার পর অবশেষে তারাও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসে। অবশেষে ১৬২ হিজরীতে (অক্টোবর ৭৭৮-সেপ্টেম্বর ৭৯ খ্রি.) ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ শায়তারান দুর্গ থেকে বের হয়ে শাতাৎবারিয়া এলাকার একটি গ্রামে আসেন। তাঁর দুজন সঙ্গী আবূ সাঈদ এবং আবূ হুরায়ম তাঁকে হত্যা করে এবং তার শিরশ্ছেদ করে সে কর্তিত শির নিয়ে আমীর আবদুর রহমানের খিদমতে উপস্থিত হয়। এভাবে সুদীর্ঘকাল জ্বালাতন করার পর এ আপদের অবসান ঘটে।

ইবনুল ওয়াহিদ নিহত হতে না হতেই ১৬১ হিজরীতে (৭৭৭-৭৮ খ্রি.) আবদুর রহমান ফিহ্‌রী ওরফে সাকলবী আফ্রিকায় সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী তৈরি করে স্পেন দখলের অভিলাষে হামলা চালান। তিনি তাদমীরের প্রান্তরে এসে শিবির স্থাপন করেন। এখানে স্পেনের বার্বারদের অনেকে এসে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়। আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীব বারসেলোনার ওয়ালী সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াক্জাযার নিকট এ মর্মে বার্তা পাঠালেন যে, তুমি আব্বাসী খলীফার আনুগত্য গ্রহণ কর। নতুবা আমাকে তোমার মাথার উপর খড়্গহস্তে দেখতে পাবে। কিন্তু সুলায়মান তাতে অসম্মত হন। ফলে আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীব সুলায়মানের উপর হামলা করেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে সুলায়মান আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীব ফিহ্‌রীকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীব তাদমীর প্রান্তরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। আমীর আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া এ সংবাদ অবগত হয়ে কর্ডোভা থেকে সসৈন্য তাদমীর অভিমুখে যাত্রা করেন। আমীর আবদুর রহমানের আগমন সংবাদে আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীব বালানসিয়ার পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। আমীর এবার আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীবের কর্তিত শিরের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেন। পুরস্কারের লোভে আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীবের জনৈক বার্বারী সহচর তাঁর শিরশ্ছেদ করে কর্তিত শির আমীর আবদুর রহমানের দরবারে এনে উপস্থিত করে। ওয়াদা অনুসারে আমীর উক্ত বার্বারীকে পুরস্কৃত করে বিদায় করেন। এ বছরই অর্থাৎ ১৬২ হিজরীতে (অক্টোবর ৭৭৮-সেপ্টেম্বর '৭৯ খ্রি) আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীবের হত্যার মাধ্যমে এ অভিযানের সমাপ্তি ঘটে। আমীর আবদুর রহমান কর্ডোভা অভিমুখে ফিরে আসেন।

এর কয়েকদিন পরে ১৬২ হিজরীতে (অক্টোবর ৭৭৮-সেপ্টেম্বর ৭৯) দাহিয়া গাস্‌সানী আলবীরা অঞ্চলের একটি দুর্গে আশ্রয় নিয়ে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। আমীর আবদুর রহমান শহীদ ইবন ঈসাকে তাকে দমনের জন্যে দাযিত্ব প্রদান করেন। শহীদ ইব্‌ন ঈসা এ বিদ্রোহীকে পরাস্ত করে বধ করেন। তার কিছুদিন পর বার্বারীরা ইবরাহীম ইব্‌ন সাজরার নেতৃত্বে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। আমীর আবদুর রহমান তাদের দমনের উদ্দেশ্যে বদরকে প্রেরণ করেন। বদর ইবরাহীমকে বধ করে বার্বারদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। ঐ সময়েই সালমা নামক জনৈক সেনাপতি কর্ডোভা থেকে ফেরারী হয়ে টলেডো

অভিমুখে যাত্রা করেন। ঐ ব্যক্তি টলেডো অধিকার করে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। আমীর আবদুর রহমান হাবীব ইব্ন আবদুল মালিককে তাকে দমনের নির্দেশ দেন। হাবীব গিয়ে টলেডো অবরোধ করেন। এ অবরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। অবশেষে অবরুদ্ধ অবস্থায়ই বিদ্রোহী সেনাপতি সালমার মৃত্যু হয়। তার সঙ্গী-সাথীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

বিদ্রোহের কারণসমূহ

স্পেনের এ উপর্যুপরি বিদ্রোহের কোন বিশেষ কারণ ছিল কিনা তা আমাদের খুঁজে দেখতে হবে। কেননা, এ বিদ্রোহীরা কোন দিনই আমীর আবদুর রহমানকে শান্তিতে রাজত্ব করতে দেয়নি। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, স্পেনে এমন কিছু লোকের সমাবেশ ঘটেছিল এবং মুসলিম স্পেনের লোকদের মেযাজ-প্রকৃতি এমনি ছিল যে, তারা পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সাথে সাথে কারো অধীনে বসবাস করা ছিল তাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। বর্তমান শাসক আমীর আবদুর রহমান যেহেতু ছিলেন একজন পরদেশী, যার বংশে রাজত্ব ও প্রতাপ পূর্বাঞ্চলে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, তাই আমীর আবদুর রহমানের রাজত্বকেও দীর্ঘদিন টিকতে দেয়ার তারা পক্ষপাতী ছিল না। এ কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে এবং যা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ছাড়াও আরেকটি বিশেষ কারণও ছিল। আর আমীর আবদুর রহমানের সমস্ত পেরেশানীর মূলে ছিল সে কারণটিই। যে আব্বাসীয় খলীফারা বাগদাদকে তাদের রাজধানী করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন আমীর আবদুর রহমান থেকে অনেক দূরে। তাঁদের রাজ্য আর আমীর আবদুর রহমানের রাজ্যের মধ্যে সমুদ্র অন্তরায় ছিল।

তাঁরা আবদুর রহমানের রাজত্ব আর প্রতাপের কথা তো লোকমুখে শুনতেন, কিন্তু এত দূরের রাজ্যে তাঁর কোনরূপ অনিষ্ট সাধনের ক্ষমতা তাদের ছিল না। আব্বাসীয়রা দু'দু'বার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেছেন ঠিক, কিন্তু উভয়বারই তাদের সেনাপতির মৃত্যু এবং তাঁদের বাহিনীর অপমানজনক পরাজয়ই তাদের ললাট লিপি হয়ে ধরা দিয়েছে। আলবীদের ষড়যন্ত্রসমূহ এবং পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের জটিলতার কারণে তাদের সামরিক অভিযান পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জনের আর সুযোগ হয়ে ওঠেনি এবং এ ব্যাপারে তাদের মনোবলও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবে তাঁরা আবদুর রহমান ইব্ন মুআবিয়ার বিরুদ্ধে সেই ষড়যন্ত্রমূলক পন্থা অবলম্বনে ত্রুটি করেননি, যা বনূ উমাইয়ার পতন ও দামেশকের খিলাফত ধ্বংস করার ব্যাপারে তাঁরা ইতিপূর্বে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁরা গোপন আঁতাতের মাধ্যমে স্পেনের আরব গোত্রসমূহ এবং ষড়যন্ত্রে অভ্যস্ত বার্বারদের মধ্যে আব্বাসীয়দের সমর্থন ও আব্বাসীয় খিলাফতের সাহায্য-সহযোগিতার স্বপক্ষে প্রচার অভিযান অব্যাহত রাখে। আব্বাসী প্রচারকরা এমনভাবে স্পেনে আসা-যাওয়া ও প্রচারকার্য চালাতো যে কেউ তা ঘুণাক্ষরেও টের পেত না বা তা অনুভব করতে পারতো না। এভাবে অধিকাংশ আরব সর্দার এবং বার্বার নওমুসলিম আমীর আবদুর রহমানের শাসনের অবসান ঘটানো এবং আব্বাসীয় খলীফার দৃষ্টিতে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। এরা বারবার বিদ্রোহ করে এবং নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা, বাগদাদ দরবার থেকে বিদ্রোহীদের জন্যে কোনরূপ সাহায্য প্রেরণ সম্ভবপর ছিল না।

স্পেনের সে সব অপরিণামদর্শী বিদ্রোহী এবং অবাধ্য সর্দাররা একদিকে আমীর আবদুর রহমানকে বিদ্রোহ দমনের কাজে ব্যতিব্যস্ত রাখে, অপরদিকে ঈস্টার ইয়াসের যে ঈসায়ীরা যাদের কথা উপরে আলোচিত হয়েছে, যারা জাবলে আল-বুরতাত বা পিরেনীজ পর্বতে একটি ক্ষুদ্র ঈসায়ী রাজ্য গড়ে তুলেছিল, এ অবসরে তারা তাদের শক্তিবৃদ্ধি এবং পর্বতের পাদদেশে তাদের রাজ্যের সীমানা প্রশস্ত করার বিস্তর সুযোগ পেয়ে যায়। উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, যে বছর আবদুর রহমান ইব্ন মুআবিয়া স্পেনে পদার্পণ করেন, ঐ বছরই ঈসায়ী রাজ্যের শাসক আলফোনসূর মৃত্যু হয়। আলফোনসূর স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র ফার্ডিনান্ড, বা ফার্দ বা আলী রায়। ফার্ডিনান্ড ঈসায়ীদেরকে তার দলে ভিড়াবার বা তার প্রতি তাদের সমর্থন ও সহানুভূতি বৃদ্ধির বা ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। এ দিকে দক্ষিণ ফ্রান্সের যে প্রদেশটি মুসলিম অধিকারে ছিল, সেদিকে মনোনিবেশ করার বা সেখানকার মুসলমানদেরকে সাহায্য করার কোন সুযোগই হলো না কর্ডোভা দরবারের। কেননা, সেদিকে সৈন্য প্রেরণ করলে ফরাসীদের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হলে স্পেনের রাজত্ব রক্ষা করা আমীর আবদুর রহমানের পক্ষে সম্ভবপর হতো না।

এবার যখন আব্বাসীদের সমর্থক ও সহানুভূতিশীলরা অহরহ বিদ্রোহ করতে রইলেন তখন সুযোগ বুঝে ফরাসীরা নার্বুন শহরে হামলা চালিয়ে শহরটি অবরোধ করে বসে। দীর্ঘ দু'বছরকাল ধরে বাইরের কোনরূপ সাহায্য ব্যতিরেকেই নার্বুনের মুসলমানরা ফরাসী সৈন্যদের মুকাবিলা চালিয়ে যায়। কিন্তু শেষফল দাঁড়ায় এই যে, যে দক্ষিণ ফ্রান্স দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে মুসলিম শাসনাধীনে ছিল, তা আবার ফরাসী দখলে চলে যায়।

বাগদাদের খলীফার সেনাপতি আবদুর রহমান ইব্ন হাবীবের নিহত হওয়ার পর ফ্রান্সে যারা আব্বাসী ষড়যন্ত্রের সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিলেন, তাদের মধ্যে হুসাইন ইব্ন আসী এবং সুলায়মান ইব্ন ইয়াকযান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দুজন সারাকসতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার শাসক ছিলেন। সারাকসতা শহরটি পিরেনীজ পর্বতের দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে অবস্থিত ছিল। উপরোক্ত দু'জন আব্বাসী খলীফা মাহদীর সাথে পত্র যোগাযোগ স্থাপন করেন। খলীফা মাহদী অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ খলীফা ছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মানবীয় দুর্বলতা বশত অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি উমাইয়াদের প্রতি বিদ্বিষ্ট এবং স্পেনে আবদুর রহমানের শাসনাধীনে থাকায় দুঃখিত ও বিমর্ষ ছিলেন। বাগদাদ দরবার থেকে উক্ত সর্দারদ্বয়কে উৎসাহিত করা হয়। উক্ত দু'জন ফরাসী সম্রাট শার্লিমেনের সাথে পত্র যোগাযোগ করে তাঁকে স্পেন আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। তারা তাঁকে জানায় যে, বিশ্বমুসলিমের পার্থিব ও পারলৌকিক নেতা খলীফাতুল মুসলিমীন মাহ্দী আব্বাসীরও মনোবাঞ্ছা হচ্ছে এই যে, আবদুর রহমান এবং তার রাজত্বের চির অবসান হোক। সুতরাং আমরা এবং স্পেনের অধিকাংশ মুসলমান সমর্থক ও সাহায্যকারী রূপে আপনার সঙ্গে থাকবো। শার্লিমেনের জন্যে স্পেন বিজয়ের এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কিছুই হতে পারতো না আর স্পেন বিজয়ের চাইতে অধিকতর সুনাম সুখ্যাতির ব্যাপারও তাঁর জন্যে আর কিছুই হতে পারতো না। কিন্তু নার্বুন শহরের মুষ্টিমেয় অসহায় মুসলমানের দুঃসাহসিকতা ও বীরত্ব সম্পর্কে তিনি অবগত

ছিলেন। তাই তিনি স্পেন আক্রমণে তাড়াহুড়া করলেন না বরং উত্তমরূপে সে জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সাথে সাথে স্পেনের উক্ত বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদের সাথে পত্র যোগাযোগ রক্ষা করে সর্বপ্রকার সংবাদাদি সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকতে লাগলেন। এ ব্যাপ্যারে স্পেনের সাবেক শাসক আমীর ইউসুফ ফাহরীর কর্ডোভা সন্নিহিত একটি দুর্গে বন্দী পুত্র আবুল আসওয়াদকে মুক্ত করে আমীর আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে স্পেনের মুসলমানদের অধিকতর সহানুভূতি অর্জন করা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হলো। আবুল আসওয়াদের মুক্তির বিবরণ উপরে এসেছে যে, নিজেকে অন্ধ বলে জাহির করে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। উক্ত আবুল আসওয়াদও ১৬৪ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ৭৮০-আগস্ট '৮১ খ্রি) মুক্ত ও ফেরারী হয়ে সারাকসতার বিদ্রোহীদের সাথে এসে যোগ দেন। এদিকে ফ্রান্স সম্রাট শার্লিমন লাখ লাখ সৈন্য সংগ্রহ করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠেন। তিনি তার অভিযানের উদ্দেশ্যে স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে বহিষ্কার করা এবং ঈসায়ী হুকুমত কায়েম করা বলে ঘোষণা করেন। ফলে তিনি সর্বপ্রকার সাহায্য লাভ করেন এবং গোটা ঈসায়ী মহলে আমীর আবদুর রহমান বিরোধী উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। শার্লিমেন নিজে আক্রমণ করার পূর্বে সারাকসতার বিদ্রোহীরা বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। আমীর আবদুর রহমানের জন্যে এটা ছিল সবচাইতে নাজুক ও বিপজ্জনক সময় যে, বাগদাদের খলীফার প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্পেনের মুসলমানদের সবচাইতে বড় ষড়যন্ত্র এবং বিশাল ঈসায়ী সৈন্যবাহিনীর শক্তি সমবেতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল। আবদুর রহমান সে সঙ্কট সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন না। তিনি তাঁর জনৈক সেনাপতি ছা'লাবা ইব্‌ন উবায়দকে সারাকসতার বিদ্রোহীদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হওয়ার পর ছা'লাবাকে সুলায়মান গ্রেফতার করে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের প্রমাণ ও নিজেদের শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ তাকে শার্লিমেনের দরবারে বন্দী অবস্থায় প্রেরণ করলেন। ছা'লাবার গ্রেফতারীর পর তাঁর অবশিষ্ট বাহিনী পলায়ন করে কর্ডোভার আবদুর রহমানের নিকট গিয়ে ওঠে। তারা তাঁকে বিদ্রোহীদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে অবহিত করে।

ছা'লাবার গ্রেফতারীর অব্যবহিত পরে অসংখ্য সৈন্যসহ পিরেনীজ পর্বতের ঐ পাশে দক্ষিণ ফ্রান্সে আক্রমণের জন্যে অপেক্ষারত শার্লিমেন যাত্রা শুরু করেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, পিরেনীজ পর্বতের একটি গিরিপথ দিয়ে সকলের অতিক্রম করা ছিল অসম্ভব, তাই দুই ভিন্ন ভিন্ন গিরিপথে পিরেনীজ অতিক্রম করে দু'দিক থেকে তারা সারাকসতা শহরের প্রাচীরের পাদদেশে সমবেত হয়। এ ঈসায়ী সৈন্যদের আধিক্য এবং স্পেন থেকে মুসলিম শক্তিকে নির্মূল করার তাদের অঙ্গীকারের কথা অবগত হয়ে সারাকসতার মুসলমানরা সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াকযানকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো। বিশেষত হুসাইন ইব্‌ন আসীও এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে বলে আঁচ করলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সারাকসতা শহরের ফটক বন্ধ করে দিলেন। শার্লিমেন যখন টের পেলেন যে, সারাকসতা শহরের মুসলমানরা তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে কুণ্ঠিত এবং আমীর আবদুর রহমান এসে পড়লে তার পক্ষই অবলম্বন করার সম্ভাবনাই প্রবল তখন তিনি ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সারাকসতা থেকে প্রস্থান করে ফ্রান্স অভিমুখে রওয়ানা হন।

শার্লিমেনের আগমনকালে ঈস্টার ইয়াসের ঈসায়ী রাজ্যও তাঁর সহযোগী হয়ে উঠেছিল। পার্বত্য অঞ্চলের ঈসায়ী বাসিন্দারা শার্লিমেনকে ঈসায়ী জাতির মুক্তিদাতা মনে করে তাঁকে ও তাঁর বাহিনীকে পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রমে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছিল। কিন্তু যখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফিরে যাচ্ছিল, তখন ঐ পার্বত্য ঈসায়ীরা তাঁর সৈন্যবাহিনীর ওপর পিছন থেকে আক্রমণ চালাতে শুরু করে। উত্তরের সমভূমিতে পৌছার পূর্বেই শার্লিমেন বাহিনীর এক বিরাট অংশ এবং কয়েকজন সেনাপতি তাদের হাতে নিহত হন। পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাসকারী এবং ক্রমেই নিজেদের শক্তি বর্ধনকারী ঐ ঈসায়ীরা যেন শার্লিমেনকে এজন্যে শাস্তি দিল যে, কেন তিনি মুসলমানদের ভয়ে পালিয়ে আসলেন।

শার্লিমেনের প্রত্যাবর্তনের পর হুসাইন ইব্‌ন আসী সুলায়মান ইয়াকযানকে হত্যা করে নিজ হাতে সারাকসতার শাসনভার এবং বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃত্ব তুলে নিলেন। তারপর আমীর আবদুর রহমানও কর্ডোভা থেকে সসৈন্য এসে সারাকসতায় উপনীত হলেন। তিনি কালবিলম্ব না করেই সারাকসতা অবরোধ করলেন। হুসাইন ইব্‌ন আসী আনুগত্য প্রকাশ করে সন্ধির আবেদন জানালেন। আমীর আবদুর রহমান তাঁর সে আবেদনে সাড়া দিলেন এবং তা মঞ্জুর করলেন।

সারাকসতার ঝামেলা চুকিয়ে দিয়ে আমীর আবদুর রহমান ফ্রান্সের রাজার স্পেন অভিমুখে আগমনের জবাব স্বরূপ ফ্রান্স অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করলেন। তিনি অনায়াসেই পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে ফ্রান্সের সমভূমিতে পদার্পণ করলেন। এ সময় ঈস্টার ইয়াসের ঈসায়ীরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পর্বত গুহায় বসে বসে তা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা এটাকেই তাদের সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করছিল যে, আমীর আবদুর রহমান আমাদের দিকে দৃকপাত করছেন না, যেমনটি ইতিপূর্বেও কোন আমীর তাদের দিকে ফিরেও তাকাননি। যেহেতু ইতিমধ্যেই সেই ঈসায়ীরা, যাদেরকে পার্বত্য লুটেরা দস্যু বলে বিবেচনা করা হতো, শার্লিমেনের অনেক রসদপত্র লুটেপুটে নিয়েছিল এবং তাঁর বাহিনীকে পর্যুদস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, সেজন্যে আমীর আবদুর রহমান তাদের প্রতি দৃকপাত করার বা তাদের অনিষ্ট সাধনের কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা করেন নি বরং তাদের অস্তিত্বকে তিনি অনেকটা তাঁর সহায়কই মনে করলেন, যারা ইতিপূর্বে কোনদিন স্পেনের শাহী ফৌজের কোন অনিষ্ট সাধন করেনি।

ফ্রান্সের সমভূমিতে পদার্পণ করে আমীর আবদুর রহমান দক্ষিণ ফ্রান্সের অর্ধেক অংশকে কঠোরভাবে পদদলিত করেন। অনেক দুর্গ এবং অনেক শহরের বেষ্টনী প্রাচীর ধ্বংস করে দেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে দ্রুতই তিনি সেদেশ থেকে সরে আসেন। শার্লিমেন দেশের উত্তর প্রান্তের দিকে সরে যান। তিনি দক্ষিণাংশের এ ধ্বংসযজ্ঞের কবল থেকে একটুও রক্ষা করতে সমর্থ হলেন না। আমীর আবদুর রহমানেরও ফ্রান্সে দীর্ঘকাল অবস্থানের সুযোগ ছিল না, কেননা, তাঁর স্বদেশের এ অবস্থা উত্তমরূপেই জানা ছিল যে, সেখানে বিদ্রোহ ও অরাজকতার কত উপাদান বিদ্যমান। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব না করে ফ্রান্স থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর কর্ডোভা উপস্থিতির কয়েক মাস যেতে না যেতেই ১৬৫

হিজরীতে (৭৮১ খ্রি) সারাকসতা থেকে হুসাইন ইব্‌ন আসীর বিদ্রোহ ঘোষণার সংবাদ এলো। আবদুর রহমান সে বিদ্রোহ দমনের জন্য গালিব ইব্‌ন তামামা ইব্‌ন আলকামাকে প্রেরণ করলেন। গালিব ও হুসাইনের মধ্যকার এ লড়াই প্রায় এক বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কিন্তু সে বিদ্রোহ প্রশমিত হলো না। অগত্যা ১৬৬ হিজরীতে (আগস্ট ৭৮২-জুলাই ৮৩ খ্রি) আবদুর রহমান নিজে সারাকসতা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি হুসাইন ইব্‌ন আসীকে গ্রেফতার করে তাকে হত্যা করেন। এ সময় তিনি সারাকসতার শত শত বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড বিধান করেন এবং বাহ্যত এ বিদ্রোহ প্রশমিত করেন। দীর্ঘ কয়েক বছর স্থায়ী এ হাঙ্গামাকালে আবুল আসওয়াদ তার অনভিজ্ঞতার জন্যে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব লাভে ব্যর্থ হয়। সে কোন মতে আত্মরক্ষা করে গোপনে অবস্থান করে এবং শাহী রোষানল থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে সমর্থ হয়। বিদ্রোহ ঘোষণার মত কোন সর্দার যদিও বাহ্যত অবশিষ্ট ছিল না, আর আব্বাসী ষড়যন্ত্র পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, তবুও যাদের আত্মীয়-স্বজন বিদ্রোহের অপরাধে আবদুর রহমানের হাতে নিহত হয়েছিলেন, তাদের বুকে স্বজন হারানোর ব্যথা এবং প্রতিশোধ-স্পৃহা তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল। কিছু করিৎকর্মা লোক কাৎলুনায় আত্মগোপনকারী আবুল আসওয়াদকে বিদ্রোহের জন্যে উস্কানি দিতে লাগলো। ১৬৮ হিজরীতে (৭৮৪-৮৫ খ্রি) তার চুতর্দিকে এমন অনেক যুদ্ধপ্রিয় লোকের সমাবেশ ঘটলো। আবদুর রহমান তাদেরকে ওয়াদিয়া আহমর বা লোহিত উপত্যকার যুদ্ধে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। তাঁরা তখন পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। ১৬৯ হিজরীতে (৭৮৫-৮৬ খ্রি) আবুল আসওয়াদ পুনরায় ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং আবদুর রহমানের মুকাবিলায় বার হাজার অনুচরকে মৃত্যুবরণে বাধ্য করে শেষ পর্যন্ত পলায়ন করে। পরবর্তী বছর ১৭০ হিজরীতে (৭৮৬-৮৭ খ্রি) আবুল আসওয়াদ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার সঙ্গী-সাথীরা যারা দস্যু-লুটেরার জীবন যাপন করছিল তার ভাই কাসিম ইব্‌ন ইউসুফকে তাদের নেতারূপে মনোনীত করে এবং স্বল্পকালের মধ্যে এক বিশাল বাহিনী তার পতাকাতলে সমবেত হয়। আমীর আবদুর রহমান তার ওপর আক্রমণ চালান। তুমুল যুদ্ধের পর তিনি কাসিম ইব্‌ন ইউসুফকে গ্রেফতার করে হত্যা করতে সমর্থ হন।

ঐ বছরই অর্থাৎ ১৭০ হিজরীতে (৭৮৬-৮৭ খ্রি) খলীফা হারূনুর রশীদ বাগদাদের খলীফার সিংহাসনে আরোহণ করেন। শার্লিমেন আমীর আবদুর রহমানের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর দরবারে সন্ধির আবেদন করেন এবং তাঁর কাছে আপন কন্যাকে বিবাহ দানের প্রস্তাব দেন। আবদুর রহমান তাঁর সন্ধি প্রস্তাব মঞ্জুর করেন, কিন্তু তাঁর কন্যাকে তাঁর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করাতে শুকরিয়ার সাথে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। শার্লিমেনের কন্যা তাঁর রূপলাবণ্যের জন্যে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। আমীর আবদুর রহমান সম্ভবত এজন্যে তাঁকে তাঁর রাজপ্রাসাদে স্থান দিতে অসম্মত হন যে, ইতিপূর্বে রডারিকের স্ত্রী রাণী এজিওলোনা যেভাবে আমীর আবদুল আযীযের হেরেমে ঢুকে ইসলামী হুকুমতের অনিষ্টের কারণ হয়েছিলেন, শার্লিমেন তনয়াও তেমনিভাবে তাঁর হেরেমে ঢুকে সঙ্কটের হেতু হয়ে উঠতে পারেন বলে তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল। আমীর আবদুর রহমানের বয়সও তখন প্রায় ৫৭ বছর ছিল। এ বয়সে আমীর আবদুর রহমানের মত দিগ্বিজয়ী ও রাজ্য শাসনে ব্যস্ত শাসকের

নতুন নতুন বিবাহের শখ থাকার কথাও নয়। সম্ভবত কোন কোন ঐতিহাসিকের এ অভিমতও যথার্থ ছিল যে, সারাকসতার যুদ্ধের সময় আবদুর রহমানের উরুদেশে এমন একটি আঘাত লেগেছিল যে, তিনি স্ত্রী সঙ্গমের যোগ্যতা চিরতরে হারিয়ে ফেলেছিলেন। যাই হোক, আবদুর রহমান শার্লিমেনের অপরাধ ক্ষমা করে দেন এবং তাঁর সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হন। শার্লিমেন এ কথাও সম্যক জানতেন যে, বাগদাদের খলীফা আবদুর রহমানের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন। এজন্যে বাগদাদের খলীফার নিকট থেকে তাঁর কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা বা প্রত্যাশা না থাকলেও একথাও তাঁর সম্যক জানা ছিল যে, বাগদাদের খলীফা যে কোন সময় আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করতে পারেন। সুতরাং বাগদাদের নতুন খলীফার দরবারে দূত পাঠিয়ে তিনি তাঁর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হন। তাঁর সাথে তাঁর সখ্যতা প্রতিষ্ঠা এজন্যেও সহজ হবে বলে তিনি মনে করতেন যে, ইতিপূর্বে নতুন খলীফার পিতা মাহদীর মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী তিনি স্পেনে সসৈন্য অভিযান চালিয়েছিলেন, তিনি জানতেন হারূনুর রশীদ অবশ্যই আমার প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবেন। শার্লিমেনের এ অনুমান যথার্থ প্রতিপন্ন হয়। খলীফা হারূনুর রশীদ শার্লিমেনের দূতদেরকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে তাঁদেরকে আপ্যায়িত করেন এবং শার্লিমেনের জন্যে তিনি উপঢৌকনস্বরূপ একটি ঘড়ি প্রেরণ করেন। শার্লিমেন কিন্তু তেমন বন্ধুবৎসল ছিলেন না। তাই তাঁর নিকট-প্রতিবেশী ইউরোপের ঈসায়ী রাজাদের সাথে তাঁর তেমন সুসম্পর্ক বা বন্ধুত্ব ছিল না। তিনি যদি প্রকৃতই বন্ধুবৎসল ও সম্প্রীতি সৃষ্টিকারী রাজা হতেন তা হলে ইউরোপের প্রতিবেশী খ্রিস্টান রাজাদের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক থাকতো। কিন্তু বাগদাদের মত এত দূর-দূরান্তের দেশে দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল স্পেনের বিরুদ্ধে কী করে একটা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অনুরূপভাবে হারূনুর রশীদও কেবল স্পেনের সালতানাতের বিরোধিতার স্বার্থেই শার্লিমেনের সাথে বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কারোই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়নি। আবদুর রহমান বা তাঁর বংশধরদের কোন অনিষ্টই হারূনুর রশীদ বা শার্লিমেন করে উঠতে পারেন নি।

আবদুর রহমানের ওফাত

শার্লিমেনের সাথে সখ্যতা স্থাপিত হওয়ার পর আবদুর রহমানের আর কিছুই করণীয় ছিল না। কেননা, দেশব্যাপী তাঁর শাসন ও দাপট সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহীদেরকে পূর্ণভাবে দমন করা হয়েছিল। কারো আর মাথা তোলার উপায় ছিল না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন আবদুর রহমানের ভাগ্যে ছিল না। ১৭১ হিজরীতে (৭৮৭-৮৮ খ্রি) তাঁর ভৃত্য বদর এবং তার কতিপয় আত্মীয়-স্বজন এবং তার স্বগোত্রের লোকজন তাঁর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তাঁর হাত থেকে রাজত্ব কেড়ে নিতে উঠে পড়ে লাগে। এমনও হতে পারে যে, আব্বাসীয়দের কোন গোপন তৎপরতার প্রভাবে এমনটি হয়েছিল। আবার স্পেনের প্রাচীন ঐতিহ্যও এসব অকপট বন্ধুকে কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে থাকতে পারে। সে যাই হোক, আমীল আবদুর রহমান তাদেরকে স্পেন থেকে বহিষ্কার করে আফ্রিকায় দেশান্তরিত করাই সমীচীনবোধ করেন। এরপর আর আবদুর

রহমানের করণীয় বলতে কিছু ছিল না। তেত্রিশ বছর চার মাস কাল রাজত্ব করার পর ১৭২ হিজরীর রবিউসসানী (সেপ্টেম্বর ৭৮৮ খ্রি) মাসে ৫৮ বা ৫৯ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে তাঁর পুত্র হিশাম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

আবদুর রহমানের জীবন সম্পর্কে পর্যালোচনা

আবদুর রহমান ইব্ন উমাইয়ার জীবন-বৃত্তান্ত অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়কর এ মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়ার জন্যে এ আলোচনা যথেষ্ট নয়। জীবনের কুড়ি বছর বয়ঃকাল পর্যন্ত তাঁর প্রধান ব্রত ছিল গ্রন্থপাঠ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের একাডেমিক আলোচনা-পর্যালোচনা। সৈনিক জীবনের কলাকৌশল রপ্ত করা সেকালে জরুরী বলে বিবেচিত হতো। কুড়ি বছরের শান্তিপূর্ণ জীবনের পর তাঁর জীবনে এমন এক সময়ও এলো যখন তিনি চোর-ডাকাতের মত আত্মগোপন করে এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন যে, আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় যাকেই তিনি দেখতেন তাকেই তাঁর কাছে রক্তপিপাসু জল্লাদ বলে ধারণা হতো। তাঁর কাছে তখন আহার্য বা পরিধেয় পর্যন্ত ছিল না। উপর্যুপরি কয়েকটি বছর এরূপ অসহায় জীবন-যাপন এবং বনে-বাদাড়ে, মরুপ্রান্তরে ও দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর পর অবশেষে তিনি একটি রাজ্যের অধীশ্বর হলেন। কিন্তু সে রাজত্বও তাঁর কাছে কোন সহজলভ্য গ্রাস বা শরবতের ঢোক ছিল না, বরং তা ছিল একটি আপদের পুঁটলী স্বরূপ– যা তাঁর মস্তকে তুলে দেয়া হয়েছিল। আবদুর রহমানের স্থলে অন্য কেউ হলে শুরুতেই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আবদুর রহমান ছিলেন এক অদ্ভুত প্রাণ-শক্তির অধিকারী এবং দুর্বিনীত সাহসের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি স্পেনে একজন নির্বান্ধব ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সাথে কোন গোত্র বা সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ সম্পর্ক বা সখ্যতা ছিল না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি যে বিপুল প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন তা কেবল তাঁরই পক্ষে সম্ভব ছিল।

সাথে সাথে তিনি একজন উঁচুদরের সিপাহসালার ও তরবারি চালকও ছিলেন। অথচ স্পেনে পদার্পণের পূর্বে কোনদিন তাঁর সেনাপতিত্বের বা তরবারি চালনার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগও হয়নি। তিনি কোন যুদ্ধে বা রণক্ষেত্রে এমন কোন ত্রুটিও কোনদিন করেন নি, যার ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞ সেনাপতি কোন আপত্তি বা সমালোচনা করতে পারেন। যে সমস্ত যুদ্ধে তাঁর অভিজ্ঞ সেনাপতিরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসতেন, সে সব যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নিজে উপস্থিত হয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধ জয় করতেন। কোন ক্ষেত্রেই তিনি হতোদ্যম বা হতবুদ্ধি হন নি। অথচ বার বার তাঁর ওপর বিপদ-আপদ এসেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে অহরহ এমন সব ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ হয়েছে যে, তাঁর স্থলে অন্য কেউ হলে তার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেত এবং ধর্মীয় অনুশাসনের গণ্ডির মধ্যে থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠতো না। অথবা নির্বোধের মত সে ব্যক্তি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতো অথবা লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হতো। কিন্তু আবদুর রহমান সে মওকাই কোনদিন কাউকে দেন নি যে, তাঁর সাহসের শেষ সীমা বা তাঁর ধৈর্যের বাঁধ সম্পর্কে কেউ কোন ধারণায় উপনীত হতে পারে। তিনি সর্বক্ষেত্রে পরম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু তাঁর পরম ধৈর্যশীল আচরণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ কার্যধারা দেখে দর্শকের মনে

এ প্রতীতিই জন্মাতো যে, ইচ্ছে করলে তিনি এর চাইতেও অনেক বেশি বীরত্বের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ।

তিনি জীবনে এমন কোন কাজ করেন নি, যদ্দ্বারা তাঁর মূর্খতা বা অজ্ঞতার অভিব্যক্তি ঘটেছে বরং তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে এমনই প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় ফুটে উঠেছে, যার চাইতে বেশি প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা কল্পনা করা যেতে পারে না।

তাঁর গোটা জীবন আমরা যুদ্ধবিগ্রহে পূর্ণ দেখতে পাই। তাঁর এ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবন দেখে কেউ একথা কল্পনাও করতে পারে না যে, আবদুর রহমান স্পেন দেশে এমন কোন কাজ করতে পারেন বা এমন কোন কীর্তি স্থাপন করতে পারেন যা কোন শান্তিপূর্ণ রাজ্যের সুলতানের দ্বারা সাধিত হওয়ার কথা কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু যখন জানতে পারা যায় যে, আমীর আবদুর রহমান স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে বিরাট কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন এবং তাঁর বংশধরদের রাজত্বকে স্থায়ী করার জন্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার এবং দেশব্যাপী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকেই সবচাইতে জরুরী জ্ঞান করেছেন, তখন বিস্ময়ের অবধি থাকে না। মানুষ তখন এ গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী দূরদর্শী শাসকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

আমীর আবদুর রহমান কর্ডোভা ও অন্যান্য শহরের বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করান। স্পেনের অনেক শহরে-বন্দরে এবং গ্রামে-গঞ্জে তিনি অনেক মসজিদ নির্মাণ করে দেন। কর্ডোভা শহরে তিনি এমনি একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন যে, যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তার কাজ তিনি সম্পন্ন করে যেতে পারেননি, তা অপূর্ণ রেখেই তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যখন তার কাজ সমাপ্ত হলো, তখন তা তার পরিকল্পনাকারীর মাহাত্ম্য ও গগনস্পর্শী দৃষ্টিভঙ্গিরই সাক্ষ্য দিচ্ছিল। কর্ডোভার মসজিদের সৌন্দর্য ও অভূতপূর্ব স্থাপত্যকৌশল অনেক দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী মুসলমানের দৃষ্টিতে তাকে খানা কা'বার মত পবিত্র ও মাহাত্ম্যপূর্ণ প্রতিপন্ন করেছিল। যদিও প্রকৃত পক্ষে দুনিয়ার তাবৎ মসজিদই সমমর্যাদাসম্পন্ন। স্থাপত্যবিলাসে আবদুর রহমানের স্থান যেমন ভারতবর্ষের সম্রাট শাহজাহানেরও উর্ধ্বে, তেমনি কর্মকুশলতা ও পরিস্থিতি সামাল দেয়ার ব্যাপারে তিনি এরিস্টটলের সমকক্ষ প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন বলে প্রতিভাত হয়। স্পেনের মত দেশে নিজ রাজত্ব গড়ে তোলা তৈমুর ও নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ের চাইতে অধিক কৃতিত্বের ব্যাপার।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে তিনি হারূনুর রশীদ ও মামূনুর রশীদের চাইতে কোন অংশেই কম ছিলেন না বরং হারূন ও মামূনের পর আব্বাসীয়দের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ কোন বিদ্যোৎসাহী খলীফার আবির্ভাব হয়নি। পক্ষান্তরে আবদুর রহমানের বংশধরদের মধ্যে এমন অনেকেরই জন্ম হয়েছে যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে হারূন-মামূনের চাইতে বেশি অবদান রেখেছেন আর এজন্যেই কর্ডোভার খ্যাতি বাগদাদকেও ছাড়িয়ে যায়।

ইব্‌ন হাইয়ান লিখেন ঃ "আবদুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত দয়ার্দ্র হৃদয় এবং মার্জিত রুচির অধিকারী। তাঁর বক্তৃতা ছিল অলংকারসমৃদ্ধ ও প্রাঞ্জল। তাঁর অনুভূতি ছিল অত্যন্ত তীব্র ও শাণিত। কোন ব্যাপারে তিনি তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। কিন্তু একবার কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তা সম্পন্ন করতেন। কোন কিছুই তাঁর সে সিদ্ধান্তকে টলাতে পারতো না। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দেখা দিলে তিনি সে ব্যাপারে তাঁর

উপদেষ্টা ও আমলাদের সাথে পরামর্শ করতেন। আবদুর রহমান অত্যন্ত জানবাজ, সাহসী এবং বীরপুরুষ ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বপ্রথম তিনিই শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালাতেন। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের ওপরই তাঁর চেহারার গাম্ভীর্যের প্রভাব পড়তো। জুমুআর দিন তিনি নিজে জামে মসজিদে খুতবা দিতেন। রোগীদের কুশলবার্তা জানবার জন্যে নিজে তাদের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং বিবাহ-শাদী ও আনন্দ অনুষ্ঠানসমূহে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যোগদান করতেন।"

আমীর আবদুর রহমানের আমলে একে একে যাঁরা কাযীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১. তামাম ইব্‌ন আলকামা
২. ইউসুফ ইব্‌ন বখ্‌ত
৩. আবদুল করীম ইব্‌ন মাহরান
৪. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুগীছ
৫. মানসূর খাজাসরা

আবদুর রহমান কোন কোন ব্যক্তিকে উযীর পদে মনোনীত করেছেন, কিন্তু কোন উযীরই কোনদিন এমন পর্যায়ে পৌঁছেন নি যে, তিনি কেবল তাঁর কথামতই কাজ করে গেছেন বা তাঁর পরামর্শের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। তিনি একটি মজলিসে ওমারা বা পরামর্শ-পরিষদ গঠন করে রেখেছিলেন, যাদের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাঁর সে পরামর্শ পরিষদের সদস্যরা ছিলেন ঃ

১. আবূ উসমান্
২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন খালিদ
৩. আবূ উবায়দা
৪. শাহীদ ইব্‌ন ঈসা
৫. ছা'লাবা ইব্‌ন উবায়দ
৬. আসিম ইব্‌ন মুসলিম।

দৈহিক অবয়ব এবং সন্তান-সন্ততি

আবদুর রহমান অত্যন্ত সুদর্শন, দীর্ঘদেহী ও একহারা গঠনের লোক ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল অত্যন্ত ফর্সা এবং কেশ ছিল ঈষৎ লালিমা মিশ্রিত কাল। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর ঘ্রাণশক্তি কম ছিল বলে লিখেছেন। মৃত্যুকালে তিনি নয়টি পুত্র এবং এগারটি কন্যা সন্তান রেখে যান। তাঁর সন্তানদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন সুলায়মান– যাকে তিনি ফুরাত নদীর তীর থেকে বগলদাবা করে পালিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হিশামকে। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, যে শিশুপুত্রটিকে কোলে নিয়ে আবদুর রহমান দেশত্যাগ করে পালিয়েছিলেন, সে সন্তানটি তাঁর স্পেনে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সে যাই হোক, তাঁর মৃত্যুকালে উপস্থিত সন্তানদের মধ্যে সুলায়মান ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। কিন্তু হিশাম

তাঁর ভাই সুলায়মানের চাইতে সিংহাসন ও রাজ্য পরিচালনায় যোগ্যতর পাত্র ছিলেন। এজন্যে আবদুর রহমান তাঁকেই তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে মনোনীত করেন।

শাসন-শৃঙ্খলা

জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন, আমীর আবদুর রহমানের চরিত্র মাহাত্ম্য ও বদান্যতার প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ও বিদ্রোহীরা তাঁকে কঠোর হতে বাধ্য করে। তাঁর স্বভাবগত ঝোঁক ছিল জ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার দিকে, কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে তাঁকে হতে হয় একজন কুশলী ও অভিজ্ঞ সিপাহসালার। আবদুর রহমানের প্রথম জীবন কাটে দামেশকের রাজপ্রাসাদে অত্যন্ত জাঁকজমক ও আরাম-আয়েশের মধ্যে। কিন্তু যখন বিপদাপদ এবং দারিদ্র ও নিঃস্বতার পালা এলো, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন মুখে ও সাহসিকতার সাথে তা বরণ করে নিলেন। তাঁর রাজ্য কায়েম হতে না হতেই তিনি পূর্বাঞ্চলের দূর-দূরান্তের এলাকা থেকে নিজ ব্যয়ে আত্মীয়-স্বজন ও বনূ উমাইয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে স্পেনে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের প্রত্যেককেই তাঁদের যোগ্যতা অনুসারে উচ্চপদে আসীন করেন। আবদুর রহমানের প্রতিভা, পরিণামদর্শিতা ও প্রখর বুদ্ধির প্রশংসা তাঁর শত্রুরাও করতো। তিনি সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে নীরবে বরণ করে নিতেন।

আবদুর রহমান তাঁর বিজিত রাজ্যকে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক প্রদেশে একজন সেনাপ্রধান থাকতেন। সেনাপ্রধানের অধীনে দুজন করে আমিল এবং ছয়জন করে উযীর থাকতেন। কাযী এবং অন্যান্য আমলারা তাদেরকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন। রাজ্যের সদর দফতর কর্ডোভায় তাঁরা প্রয়োজনীয় সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করতেন। আবদুর রহমান সর্বদা তাঁর প্রজাসাধারণের হিতসাধনে ব্রতী থাকতেন। তিনি এমনি শাসন-নীতি প্রবর্তন করেন যে, প্রজাসাধারণ সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল এবং বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই তারা তাদের ধন-সম্পদ অবাধে ভোগ করতে পারতো।

আবদুর রহমান শিক্ষা-দীক্ষা এবং কলা ও সাহিত্যের প্রচার-প্রসারে অত্যন্ত উৎসাহী ও অনুরাগী ছিলেন। গোটা স্পেনদেশে তিনি সড়কজাল বিস্তার ও ডাকের প্রচলন করেন। প্রত্যেকটি মঞ্জিলে তিনি ঘোড়া রাখতেন যাতে স্বল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যের দূরবর্তী স্থানের সংবাদও রাজধানী কর্ডোভায় পৌছাতে পারে।

আবদুর রহমান পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে দস্যুবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করেন। যে বার্বাররা কোনদিন তাদের স্বভাবজাত দস্যুবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হতো না, তারাও সর্বপ্রথম আবদুর রহমানের আমলেই দস্যুবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হয়ে হাত গুটিয়ে বসতে বাধ্য হয়। আবদুর রহমান সর্বদা তাঁর বিজিত রাজ্যসমূহে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে তাঁর আমিলরা প্রজাসাধারণের সাথে কী আচরণ করে তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যেখানেই আমীর যেতেন, সেখানেই তিনি অভাব-অনটনগ্রস্ত লোকের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করতেন এবং লোকজনের চরিত্র সংশোধন এবং তাদের কল্যাণমূলক কার্যাদি করতেন।

আমীর আবদুর রহমানের বদান্যতার দ্বার সবার জন্যে উন্মুক্ত ছিল। সকলেই তাঁর বদান্যতা থেকে উপকৃত হতো। যদিও তিনি রাজ্যের সর্বত্র মসজিদ ও সমাজকল্যাণমূলক

প্রাসাদাদি নির্মাণ করিয়েছিলেন, কিন্তু রাজধানী কর্ডোভার শানশওকত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সুদৃশ্য প্রাসাদাদি নির্মাণের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করেন। শাহী প্রাসাদের সম্মুখে তিনি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করেন। স্পেন দেশের এটাই ছিল সর্বপ্রথম খেজুর বৃক্ষ। কর্ডোভার উপকণ্ঠে তিনি তাঁর পিতামহের রুসাফা নামক বাগিচার নামে রুসাফা নামক একটি কুঞ্জবন নির্মাণ করেন। তিনি কর্ডোভায় একটি টাকশাল নির্মাণ করেন, যেখানে সিরিয়ায় প্রচলিত ও দামেশকে ঢালাই করা দীনার ও দিরহামের অনুরূপ দীনার দিরহাম ঢালাই করা হতো। তিনি পৃথিবীর নানা দেশ থেকে জ্ঞানী-গুণীদের কর্ডোভায় আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁদের জ্ঞান-গরিমার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করেন। গবেষণা ও দার্শনিক আলোচনা-পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক মজলিস-সেমিনার অনুষ্ঠান করেন। আপন পুত্রদেরকে তিনি সর্বোচ্চ পন্থায় শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করেন এবং তাঁদেরকে শাহী দফতরসমূহে এবং কাযীদের বিচারসভায় উপস্থিত হয়ে রাজকার্যাদি প্রত্যক্ষ করার নির্দেশ দেন। গুরুত্বপূর্ণ বিচারসমূহের রায় এবং রাজকীয় দলীল-দস্তাবেজ শাহযাদাদেরকে দেখবার জন্যে দেয়া হতো।

জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কবি-সভা ও বিতর্ক সভার আয়োজন করা হতো। উচ্চাঙ্গের কবিতা এবং বিতর্কের জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে পুরস্কৃত করা হতো। স্পেনের বিলাসিতাপূর্ণ আবহাওয়া এবং প্রাচুর্যের আধিক্য আমীর আবদুর রহমানের সৈনিকসুলভ চরিত্রের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়নি। তাঁর তাকওয়া-পরহিযগারী ও ধর্মপরায়ণতায় কোনদিন সামান্যতম ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়নি। কর্ডোভায় বিশ্ববিখ্যাত মসজিদটির জন্য যে স্থানটি সবচাইতে শোভনীয় ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়, ঐ স্থানটি ছিল খ্রিস্টানদের মালিকানাধীন। আমীর আবদুর রহমান তা জবরদখল বা হুকুমদখল করাটাকে সঙ্গতবোধ করেননি। যখন ঈসায়ীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তা বিক্রি করতে উদ্যত হয়, কেবল তখনই আমীর তা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে ক্রয় করেন এবং শহরের একাধিক স্থানে তাদের গির্জা নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন।

আমীর আবদুর রহমানের চরিত্রে সে সব গুণ-গরিমাই বিদ্যমান ছিল, যা একজন বুদ্ধিমান, প্রাজ্ঞ-রাজনীতিক এবং প্রগতিশীল চিন্তাসম্পন্ন শাসকের মধ্যে থাকাটা বাঞ্ছনীয়। যে তারিখে আমীর আবদুর রহমান স্পেনে পদার্পণ করেন, ঠিক সে তারিখটি থেকেই স্পেন দেশ পূর্বাঞ্চলীয় ইসলামী খিলাফতের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমীর আবদুর রহমান অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার সাথে নিজেকে 'আমীর' বলেই অভিহিত করেন, খিলাফতের বা নিজে খলীফা হওয়ার ঘোষণা দেন নি। দীর্ঘ দশ বছর পর তিনি খুতবায় নিজ নাম পাঠ করেন। আবদুর রহমান এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, স্পেনে এমনও অনেক লোক রয়েছে যারা উমাইয়া বংশের লোকজনকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। তাঁরা আব্বাসীয়দেরকে মনে মনে ভালবাসে। তাঁরা সাধারণভাবে মুসলিম রাজ্যসমূহের কেন্দ্র একটিই বলে মনে করে আর তা হচ্ছে, পূর্বের ইসলামী খিলাফতের কেন্দ্র বাগদাদ। আমীর আবদুর রহমান যদি নিজেকে খলীফা বলে ঘোষণা করতেন, তাহলে সমস্ত মুসলমান নিশ্চয়ই অসি হস্তে তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো। আর তখন আবদুর রহমানকে তাঁরা এক উদ্ধত

যুবক বলে ধারণা করতো। স্পেনে মুসলমানদের সে মনোভাবকে ক্রমান্বয়ে তিনি শুধরে নেন। অবশেষে তৃতীয় আবদুর রহমান যথাযথ সময়ে নিজেকে আমীরুল মু'মিনীন ও খলীফাতুল মুসলিমীন বলে আখ্যায়িত করেন।

অন্য এক ঐতিহাসিক লিখেন : আবদুর রহমানের ভাষণ ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং চিত্তাকর্ষক। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন, সমঝদার এবং সমন্বিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত গোছানো, পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত। কোন কাজে তিনি তড়িঘড়ি করতেন না। কিন্তু যে কাজ করতে একবার মনস্থির করে ফেলতেন, তা তিনি সমাপ্ত না করে ছাড়তেন না। ক্রীড়াকৌতুক এবং অপ্রয়োজনীয় আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতাকে তিনি কাছেও ঘেঁষতে দিতেন না। অধিকাংশ সময়ই শুভ্র পোশাক পরতেন। অভাব-অনটনগ্রস্ত লোকদের সহজে ও অবাধে তাঁর দরবারে আসার সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে তিনি দ্বাররক্ষী তুলে দিয়েছিলেন। কোন ব্যক্তি তাঁর আহার্য গ্রহণকালে কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছে এলে তিনি তাকেও দস্তরখানে বসিয়ে একত্রে আহার্য গ্রহণ করতেন।

আবদুর রহমান ইব্ন মুআবিয়া পৃথিবীর সেই সব মহান ব্যক্তির অন্যতম যাঁরা জাতিসমূহকে উজ্জীবিত করার, সাম্রাজ্য গড়ে তোলার এবং পৃথিবীর বুকে বিরাট পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য ক্ষমতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এ বিস্ময়কর ক্ষমতার জন্যে সুখ্যাতির গগনে তিনি একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত দেদীপ্যমান ও চির অমর হয়ে আছেন। আবদুর রহমান ইব্ন মুআবিয়ার উপরোক্ত জীবন-কাহিনী সম্পর্কে একটু ভেবে দেখুন, কি অসাধারণ মেধা ও মন-মস্তিষ্কেরই না তিনি অধিকারী ছিলেন। তাঁর সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য ও প্রশংসনীয় গুণ ছিল তাঁর সৈনিকসুলভ জীবন। কর্ডোভার মসজিদ নির্মাণকালে তিনি স্পেনের আমীর হওয়া সত্ত্বেও একজন সাধারণ দীন মজুরের মত তাদের সাথে কাজ করাকে এবং পাথর বহন করাকে মোটেই দোষের মনে করেননি।

হিশাম ইব্ন আবদুর রহমান

আমীর আবদুর রহমান ইবন মুআবিয়া ওরফে আবদুর রহমান আদ-দাখিল যদিও নিজেকে আমীর বলেই অভিহিত করতেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন স্পেনের প্রথম খলীফা। একজন খলীফার চরিত্রে যে সব গুণ ও শর্তাবলী থাকা দরকার তার সবটাই তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। তাঁর বংশধরদের একজন অর্থাৎ তৃতীয় আবদুর রহমানই সর্বপ্রথম খলীফা উপাধি ব্যবহার করেন। কিন্তু আমাদের উচিত হিশাম এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদেরকে সুলতান বা খলীফা হিসেবে আখ্যায়িত করা।

জন্ম

সুলতান হিশাম ইবন আবদুর রহমান তাঁর পিতার স্পেনে পদার্পণের পর ১৩৯ হিজরীর শাওয়াল (৭৫৭ খ্রি এপ্রিল) মাসে ভূমিষ্ঠ হন। হিশামের মা উম্মে হিলাল স্পেনের সাবেক আমীর ইউসুফ ফাহরীর সাথে আবদুর রহমানের সন্ধিকালে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরিত

হয়েছিলেন। আবদুর রহমান তাঁকে স্বাধীনতা প্রদান করে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। তিনি উক্ত মহিলাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

অভিষেক

৩২ অথবা ৩৩ বছর বয়ঃক্রমকালে হিশাম তাঁর পিতার ওসীয়ত অনুসারে ১৭২ হিজরীতে (৭৮৮-৮৯ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবদুর রহমানের ইন্তিকালের সময় তিনি মারীদা শহরে তথাকার গভর্নররূপে অবস্থান করছিলেন। সেখানেই পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোটা স্পেন দেশে তাঁর নামে খুতবা পঠিত হয়। কর্ডোভায় তাঁর সহোদর আবদুল্লাহ্ও ছিলেন। তিনি হিশামের বিরোধীরূপে রাজপ্রাসাদ ও কর্ডোভা শহরে নিজ দখল কায়েম করেন। ওদিকে টলেডোতে তাঁর অপর সহোদর সুলায়মান গভর্নর ছিলেন। হিশাম মারীদা শহর থেকে কর্ডোভা অভিমুখে যাত্রা করলেন। ছোটখাট যুদ্ধের পর তিনি আবদুল্লাহ্কে গ্রেফতার করে কর্ডোভা অধিকার করেন এবং পুনরায় যথারীতি অভিষেক অনুষ্ঠান করেন। এ উপলক্ষে তিনি তাঁর সহোদর আবদুল্লাহ্কে ক্ষমা করে তাঁকেও তাঁর মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং তাঁকে একটি বড় জায়গীরও প্রদান করেন।

ভাইদের বিদ্রোহ ঘোষণা

স্পেনে পরস্পর বিরোধী ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী লোকের বাস ছিল। বিশেষ করে আমীর আবদুর রহমানের ইন্তিকালের সময় দেশে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিতে পারতো। কিন্তু আমীর আবদুর রহমান তাঁর জীবদ্দশায় বিদ্রোহীদেরকে এমনভাবে পরাস্ত করেছিলেন যে, তাদের আর মাথা চাড়া দেয়ার অবকাশ ছিল না। কিন্তু বাইরের সে শত্রুদের পরিবর্তে স্বয়ং হিশামের ভাইয়েরাই ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে উঠলেন। তাঁরা তাঁর শাসনের প্রারম্ভেই তাঁর জন্যে নানা সমস্যার সৃষ্টি করলেন। অচিরেই লোকজন উপলব্ধি করতে পারলো যে, আমীর আবদুর রহমান উত্তরাধিকারী মনোনয়নে একটুও ভুল করেননি। টলেডোর গভর্নর সুলায়মান বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। এদিকে আবদুল্লাহ্ও কর্ডোভা থেকে পলায়ন করে অগ্রজ সুলায়মানের কাছে গিয়ে উঠলেন। সুলতান হিশাম ভ্রাতৃদ্বয়ের বিদ্রোহের কথা অবগত হয়েও তাঁদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর আচরণ করলেন। তিনি ভাবলেন, দু'দিন পরে তাঁরা নিজেরাই তাদের ভুল বুঝতে পেরে শুধরে যাবেন।

ভাইদের সাথে যুদ্ধ

টলেডোতে সুলায়মানের উযীর গালিব ছাকাফী ছিলেন আমীর আবদুর রহমানের একজন অতি অনুগত সর্দার। তিনি উক্ত দু'ভাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে হিশামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। কিন্তু সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্ উল্টা বুঝলেন। তাঁরা গালিব ছাকাফীকে উযীর পদ থেকে বরখাস্ত করে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তাঁর বন্দীত্বের সংবাদ পেয়ে হিশাম কর্ডোভা থেকে দূত মারফত টলেডোতে ভাইদের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করলেন। তাতে তিনি লিখলেন যে, পিতার এরূপ একজন বিশ্বস্ত ও চির-অনুগত

ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা কোনমতেই সমীচীন হয়নি। সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্ এতে উত্তেজিত হয়ে দূতের সম্মুখেই কারাগার থেকে আনিয়ে গালিব ছাকাফীকে হত্যা করলেন এবং দূতকে লক্ষ্য করে বললেন, যাও, এটাই হচ্ছে পত্রের জবাব। সুলতান হিশাম দূতমুখে পত্রের এহেন জবাবের কথা অবগত হয়ে কর্ডোভা থেকে বিশ হাজার সৈন্যসহ টলেডো অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। এদিকে সুলায়মান এবং আবদুল্লাহ্ও এক বিরাট বাহিনী নিয়ে কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। টলেডোর অদূরেই উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হলো। সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্ পরাস্ত হয়ে টলেডোতে ফিরে গিয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। টলেডোর দুর্গটি একটি সুরক্ষিত দুর্গরূপে বিখ্যাত ছিল। এটা জয় করা ছিল সুকঠিন। হিশাম টলেডো অবরোধ করলেন। সুলায়মান তাঁর পুত্র এবং ভাই আবদুল্লাহ্কে টলেডোতে রেখে নিজে একদল সৈন্য নিয়ে কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। কর্ডোভায় তখন গভর্নর ছিলেন আবদুল মালিক। সুলায়মানের আগমন সংবাদ পেয়ে তিনি কর্ডোভার অদূরেই তীর ও শমশের দিয়ে সুলায়মানকে অভ্যর্থনা জানালেন। পরাজিত হয়ে সুলায়মান মারসিয়ার দিকে পালিয়ে যান। তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লুটপাট করে ফিরতে থাকেন। এ অবস্থা লক্ষ্যে সুলতান হিশাম টলেডো অবরোধে একজন সর্দারকে রেখে নিজে রাজধানী কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হলেন, যাতে সেখানে বসে সুলায়মানের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সহজেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

ভাইদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

দীর্ঘ অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে আবদুল্লাহ বিনা শর্তে এবং প্রাণ ভিক্ষা বা নিরাপত্তা প্রার্থনা না করেই হিশামের কাছে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয় বিবেচনা করলেন। তিনি অবরোধকারী জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কর্ডোভায় এসে সুলতানের দরবারে হাযির হন। সুলতান হিশাম ভাইয়ের অপরাধ মার্জনা করেন এবং তাঁর সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করেন। আবদুল্লাহ্র প্রতি তাঁর মনে যে আর কোন কালিমা নেই, তাঁর প্রমাণ স্বরূপ তিনি তাঁকে টলেডোতেই জায়গীর দিয়ে বিদায় করেন।

সুলায়মান মারসিয়াতে অনেক লোকের একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। সুলতান তাঁর কিশোরপুত্র হাকামকে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করে তার মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করলেন। উভয়পক্ষের মুকাবিলা হলে সুলায়মান হাকামের হাতে পরাস্ত হয়ে পলায়ন করেন। তাঁর গোটা বাহিনী নিহত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তারপর দু'বছর কাল ধরে দ্বারে দ্বারে ঘুরে শেষ পর্যন্ত অগত্যা ১৭৪ হিজরীতে (৭৯০-৯১ খ্রি.) সুলায়মান সুলতান হিশামের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেদন জানান। সুলতান হিশাম তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর আবেদনে সাড়া দেন এবং ভাইকে নিজ দরবারে সসম্মানে বরণ করেন। সুলায়মান জানান যে, স্পেনে থাকাটা আর তাঁর মনঃপূত নয়, তাই তিনি আফ্রিকায় চলে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। হিশাম প্রসন্ন মনে তাঁকে সে অনুমতি দান করেন এবং স্পেনে তাঁর নামে যে জায়গীর ছিল তা সত্তর হাজার মিছকাল মূল্যে তার নিকট থেকে ক্রয় করে নেন। সুলায়মান আফ্রিকায় গিয়ে স্থানীয়ভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানে আব্বাসীয়দের এজেন্টরূপে কাজ করেন। তিনি সর্বদা পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে স্পেনবাসীদেরকে বিদ্রোহের উস্কানি দিতেন।

ফ্রান্স আক্রমণ

ভাইদের দিক থেকে ঝামেলামুক্ত হয়ে সুলতান হিশাম চল্লিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তৈরি করে ফ্রান্স আক্রমণ করেন এবং আমীর আবদুর রহমানের আমলে মুসলমানদের গৃহবিবাদের সুযোগে ফরাসীদের কেড়ে নেয়া দক্ষিণ ফ্রান্স এবং আরবুনিয়া প্রদেশের রাজধানী নার্বুন শহর পুনর্দখল করেন। এখানে অকল্পনীয় ধনভাণ্ডার মুসলমানদের দখলে আসে। দেশে প্রত্যাবর্তনকালে পিরেনীজ পর্বতের অধিবাসী খ্রিস্টানদের ঔদ্ধত্যের নমুনা তিনি প্রত্যক্ষ করেন। ঐ ঈসায়ী রাজ্যটি মুসলমানদের অনবধান ও গাফলতি এবং খ্রিস্টানদের চাতুর্যের বদৌলতে পর্বতের পাদদেশে গড়ে উঠেছিল। আজ পর্যন্ত এ ঈসায়ী রাজ্যটি কোনদিন মুসলিম বাহিনীর সাথে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়নি। এজন্যে মুসলমানরা এ রাজ্যটির অস্তিত্বকে ক্ষতিকর বলে ভাবেননি। তাই তাঁরা একে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলতে দেন। ইসলামী বাহিনী যখন ফ্রান্স জয় করে এবং শার্লিমেনকে তাড়িয়ে দিয়ে বিজয়লব্ধ গনীমত সম্ভার নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন ঈস্টার ইয়াসের খ্রিস্টানগণ মুসলিম সৈন্যদের পশ্চাৎভাগে হামলা চালিয়ে ঠিক সেরূপ লুটপাট করতে উদ্যত হয় যেমনটি ইতিপূর্বে তারা শার্লিমেনের বাহিনীর সাথে পিরেনীজ পর্বতে করেছিল এবং তার একট বিরাট অংশের ধ্বংস সাধন করেছিল। কিন্তু শার্লিমেন ও হিশামের বাহিনীর মধ্যে একটা বড় পার্থক্য ছিল।

পার্বত্য ঈসায়ীদের উৎখাত

সুলতান হিশাম কর্ডোভা পৌঁছেই ১৭৫ হিজরীতে (৭৯১-৯২ খ্রি.) তার উযীর ইউসুফ ইব্‌ন বখতকে এ পার্বত্য ঈসায়ীদের দমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। ইউসুফ ইব্‌ন বখত ঈস্টার ইয়াস রাজ্য আক্রমণ করে তা ধূলিসাৎ করে দেন। ঈস্টার ইয়াসের খ্রিস্টানদের এটাই ছিল মুসলমানদের সাথে মুকাবিলার প্রথম অভিজ্ঞতা। তারা শোচনীয়ভাবে ধ্বংস হয় এবং তাদের নেতা বরমিউডর গ্রেফতার হয়। জয়ের পর মুসলমানরা যখন লক্ষ্য করলেন যে, এ অনুর্বর পার্বত্য রাজ্যটি তাদের বসবাসের উপযোগী নয়, তখন তারা তা পুনরায় ঐ খ্রিস্টান শাসকের হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে তার নিকট থেকে আনুগত্য ও কর প্রদানের অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

দক্ষিণ ফ্রান্সের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের খুমুস দিয়ে কর্ডোভা মসজিদ নির্মাণ

দক্ষিণ ফ্রান্স এবং ঈসায়ী প্রদেশসমূহ থেকে মুসলমানরা যে বিপুল গনীমত সম্ভার লাভ করেন তার এক-পঞ্চমাংশ বা খুমুসরূপে ৪৫,০০০ স্বর্ণমুদ্রা সুলতান হিশামের হস্তে অর্পণ করা হলো। সুলতান হিশাম তার সম্পূর্ণটাই কর্ডোভার মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্যে ব্যয় করেন।

আরবুনিয়া প্রদেশের বিদ্রোহ দমন

আবদুল মালিক এ অভিযানকালে এক অদ্ভুত কাণ্ড করেন। তিনি জালীকিয়া, ঈস্টার ইয়াস, আরবুনিয়া ও দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে যুদ্ধকালে গ্রেফতার কৃত খ্রিস্টানদেরকে নার্বুন শহরে

এ ফরমান শুনিয়ে দেন যে, তোমাদের মুক্তিপণ হচ্ছে, তোমরা নার্বুন শহরের বেষ্টনী প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে তার পাথর কর্ডোভায় পৌঁছিয়ে দেবে। সত্যি সত্যি ঐ খ্রিস্টান বন্দীরা নার্বুন শহরের বেষ্টনী প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে তার পাথর কর্ডোভায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। কর্ডোভা এবং নার্বুন শহরের দূরত্ব ছিল কয়েকশ ক্রোশের। পথে অনেক নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত এবং দুর্গম ঘাঁটি অতিক্রম করতে হয়। এক একজন বন্দী এক একটি ছোট পাথর খণ্ড নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নেয়। যে সব প্রস্তর খণ্ড আকারে বড় ছিল সেগুলোকে গাড়িতে রেখে কয়েদীরা তা টেনে নেয়। মধ্যম আকারের পাথরগুলো দু'জন কয়েদী ডুলির মত করে বেঁধে বাঁশ বা কাষ্ঠ খণ্ডের সাথে লটকিয়ে বহন করে নিলো। এভাবে নার্বুন শহরের বেষ্টনী প্রাচীরের যে পরিমাণ পাথর উক্ত কয়েদীদের পক্ষে বহন করা সম্ভবপর ছিল, তা তারা বহন করে নিয়ে যায়। বিভিন্ন মঞ্জিলে থেমে থেমে শাহী ফৌজের একটি বাহিনীর তত্ত্বাবধানে তারা তা কর্ডোভা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। এ পাথর দিয়ে কর্ডোভা মসজিদের পূর্ব প্রাচীরের একটি অংশ নির্মিত হয়। আবদুল মালিক তাদের নিকট থেকে এ শ্রম আদায় করে নিয়ে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে সত্যি সত্যি তাদেরকে মুক্ত করে দেন। শাস্তি প্রদানের পর ঈসায়ী রাজ্যগুলোর আনুগত্যের শপথ নিয়ে আবার ঈসায়ীদের হাতেই ফিরিয়ে দেয়া হয়। কেননা উত্তরের এ পার্বত্য এলাকা শীতল আবহাওয়ার জন্যে আরব সর্দারদের কাছে মনঃপূত বা আকর্ষণীয় ছিল না। তারা এগুলোকে মূল্যবান ভূখণ্ড বলেও বিবেচনা করতো না। এ কারণেই উত্তরের এ সব অঞ্চলে মুসলিম বাসিন্দাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। পক্ষান্তরে দক্ষিণ স্পেনে মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। আর এ অঞ্চলের ঈসায়ী অধিবাসীদের মধ্য থেকে ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিমের সংখ্যাও বেশি ছিল।

কর্ডোভা মসজিদের কাজের পূর্ণতা বিধান এবং ওয়াদিউল কবীরে পুল পুনর্নির্মাণ

সুলতান হিশাম তাঁর পিতা আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়ার কর্ডোভা মসজিদের কাজ সম্পন্ন করার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হন। ১৭৫ হিজরীতে (৭৯১-৯২ খ্রি.) তিনি তার পুত্র হাকামকে টলেডোর গভর্নররূপে নিযুক্ত করেন। ১৭৬ হিজরীতে (৭৯২ খ্রি) তিনি কর্ডোভার ওয়াদিউল কবীর নদীর সেতু পুনর্নির্মাণ করেন। এ সেতুটি আমীর সামাহ্ হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের আমলে সর্বপ্রথম নির্মাণ করেছিলেন। এবার সুলতান হিশাম সেতুটিকে আরো প্রশস্ত, মজবুত ও সুন্দরভাবে পুনর্নির্মাণ করালেন। এ পুল নির্মাণ সমাপ্ত হলে তাঁর কানে এ আওয়াজটি এলো যে, সুলতান তাঁর নিজের সাত্তায় যাওয়া-আসার সুবিধার জন্যে এ পুলটি নির্মাণ করিয়েছেন। এ কথা শুনে সুলতান জীবনেও কোনদিন এ পুলের ওপর পা রাখেন নি। যেহেতু আব্বাসী এজেন্টরা গোপনে গোপনে স্পেনে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেত, এদিকে স্বয়ং সুলতান হিশামের ভাই সুলায়মান আফ্রিকা অর্থাৎ মরক্কোতে বসে বসে মুসলমান ও ঈসায়ীদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন, উত্তর দিকে হারূনুর রশীদের সাথে সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ শার্লিমেন এ জাতীয় প্রচেষ্টায় অহরহ লিপ্ত ছিলেন। ফলশ্রুতিতে জালীকিয়া প্রদেশের নবজাত ঈসায়ী, ফরাসী এবং স্পেনীয়

উস্কানিদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। সুলতান হিশাম একটুও কালবিলম্ব না করে আবদুল করীম ইব্ন আবদুল ওয়াহি ইব্ন মুগীছকে ডেকে পাঠিয়ে জালীকিয়ার দিকে প্রেরণ করলেন। ইসলামী বাহিনী জালীকিয়ায় উপনীত হয়ে বিদ্রোহীদেরকে অবনত করে এবং তাদের নিকট থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার আদায় করে ফিরে আসে। এ বিদ্রোহ দমন হতে না হতেই বার্বাররা সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সুলতান হিশাম তাদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে হযরত আমীর মুআবিয়ার খাদিম আবদুল্লাহ্র পৌত্র আবদুল কাদির ইব্ন আবানকে প্রেরণ করেন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আবদুল কাদির বার্বারদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন এবং হাজার হাজার বিদ্রোহীকে হতাহত করেন। এটা ১৭৮ হিজরীর (এপ্রিল ৭৯৪-মার্চ '৯৫ খ্রি) ঘটনা। ১৭৯ হিজরীতে (এপ্রিল ৭৯৫-মার্চ '৯৬ খ্রি.) ফরাসীদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে জালীকিয়াবাসীরা পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সুলতান তাদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে আবদুল মালিক ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন মুগীছকে সসৈন্য সেদিকে রওয়ানা করেন এবং তাঁকে আদেশ দেন যে, জালীকিয়া এলাকার মধ্য দিয়ে তাঁরা যেন ফ্রান্সে ঢুকে পড়েন এবং অপর পার্শ্ব দিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশকারী বাহিনীর সাথে যেন তারা গিয়ে মিলিত হন। সে মতে আরেকটি বাহিনীকে অন্য পথে ফ্রান্সে প্রেরণ করা হয়। মুসলিম বাহিনীর আগমন সংবাদ অবগত হয়ে জালীকিয়ার ঈসায়ী নেতা উফুনুশ সমস্ত পথঘাট ও শহর ছেড়ে ইসলামী বাহিনীর অগ্রে অগ্রে পাহাড়ে পর্বতে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। আবদুল মালিক যেহেতু বেশি দিন জালীকিয়ায় অবস্থানের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই বিদ্রোহী নেতাকে পালাতে দেখে তিনি ফ্রান্সের সীমানায় ঢুকে পড়েন এবং ফ্রান্সের অধিকাংশ শহর এবং দুর্গ জয় করে সেগুলোকে ধূলিসাৎ করেন এবং জয়যুক্ত হয়ে কর্ডোভায় ফিরে আসেন।

ওফাত

১৮০ হিজরীর সফর (এপ্রিল ৭৯৬ খ্রি) মাসে সুলতান হিশাম ইব্ন আবদুর রহমান সাত বছর কয়েক মাস রাজত্ব করার পর চল্লিশ বছর চার মাস বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হিশামের জীবনী পর্যালোচনা

কর্ডোভার মসজিদ নির্মাণে আমীর আবদুর রহমান আশি হাজার দীনার ব্যয় করেন। সুলতান হিশাম এ কাজ সম্পন্ন করতে ব্যয় করেন এক লক্ষ ষাট হাজার দীনার। সুলতান হিশাম তাঁর পিতারই মত সাদা রঙের কিন্তু অত্যন্ত সাদাসিধা এবং স্বল্পমূল্যের পোশাক পরতেন। তাঁর শিকারের বেজায় শখ ছিল। কিন্তু তাঁর এ শখ ততটা ছিল না, যতটা রাজকার্য এবং ধর্ম কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। শেষ বয়সে তাও তিনি ছেড়ে দেন। অভাবগ্রস্তদের জন্য সর্বদা তাঁর দ্বার অবারিত ছিল। অত্যাচারিত ব্যক্তিরা তাদের ফরিয়াদ জানাবার পথে কোনরূপ বাধার সম্মুখীন হতো না। অনটনগ্রস্তদের খোঁজখবর নেবার জন্যে তিনি রাতের আরামকে হারাম করতেন। পথিক মুসাফিরদেরকে নিজে ডেকে নিয়ে আহার্য প্রদান করতেন। আঁধার রাতে শহরের অলিগলিতে তিনি ঘুরে বেড়াতেন এবং অভাবগ্রস্ত বিধবা ও

নিঃস্বদের সাহায্য করে বড়ই তৃপ্তি অনুভব করতেন। চোর, ডাকাত ও অপরাধীদের নিকট থেকে আদায়কৃত জরিমানার অর্থ রাজকোষে জমা করার পরিবর্তে প্রজাসাধারণের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হতো। যুদ্ধবিগ্রহে ঘটনাচক্রে যারা ঈসায়ীদের হাতে বন্দী হয়ে পড়তেন, তাদেরকে সরকারী তহবিল থেকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে আনা হতো।

সুলতান হিশাম কোন একটি মুসলমান বন্দীকেও ঈসায়ীদের হাতে বন্দী থাকতে দেননি। তন্ন তন্ন করে খুঁজে তিনি সকলকেই আযাদ করে দেন। একবার স্পেনের জনৈক মুসলমান ব্যক্তি মৃত্যুকালে ওসীয়ত করেন যে, তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে যেন একজন মুসলমান কয়েদীকে খ্রিস্টানদের হাত থেকে মুক্ত করা হয়। কিন্তু সমস্ত ঈসায়ী রাজ্য খুঁজে কোথাও একজন মুসলমান কয়েদী পাওয়া গেল না। কেননা, সুলতান হিশাম নিজেই ইতিপূর্বে সকল মুসলমান কয়েদীকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। একদা সুলতান হিশাম একটি বাড়ি ক্রয় করবার উদ্দেশ্যে বাড়ির মালিকের সাথে দামদর করছিলেন। এমন সময় তিনি জানতে পারলেন যে, ঐ বাড়িটির নিকটেই বসবাসকারী অন্য এক ব্যক্তি ঐ বাড়িটি কেনার জন্য আগ্রহী। কিন্তু যেহেতু নিজে ঐ বাড়িটি কেনার জন্যে দামদস্তুর করছেন, তাই ঐ ব্যক্তি সুলতানের ভয়ে তা কেনার ইচ্ছা ছেড়ে দিয়েছে। এ কথা শুনতে পেয়ে সুলতান গোটা রাজ্যে অভিজ্ঞ ও ধর্মপ্রাণ এমন কিছু লোক নিয়োগ করলেন, যারা প্রদেশসমূহের গভর্নরদের শাসন পদ্ধতি, তাদের বিচার-ইনসাফ এবং দফতরসমূহের কার্যকলাপ যাচাই করতেন এবং প্রতিটি প্রদেশে সরেজমিনে গিয়ে সে সব প্রদেশের জনগণের নিকট থেকে শাসকদের ব্যাপারে অভিযোগাদি শ্রবণ করতেন।

সুলতান হিশামের রাজত্বকালে কর্ডোভা নগরীতে সেখানকার আমীর-উমারা এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বড় বড় মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করে শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। আর জ্ঞান-চর্চার মজলিসসমূহ অনুষ্ঠান তো আমীর আবদুর রহমানের যুগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুলতান হিশামের যুগে তার আরও অনেক উন্নতি সাধিত হয়। সর্বোপরি তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আরবী ভাষা বাধ্যতামূলক করেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই স্পেনের ঈসায়ীরা আরবী ভাষা রপ্ত করে কুরআন শরীফ ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। এদের অনেকেই পরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমানদের প্রতি তাদের পর পর ভাব এবং ঘৃণা অনেকটা দূরীভূত হয়ে যায়। মুসলমান ও ঈসায়ীদের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আরবী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ায় তা ইসলামের প্রচার-প্রসারে বেশ সহায়ক হয়। ঈসায়ীদের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি সম্ভ্রমবোধ সৃষ্টি হয়। তারা তাদের নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের ত্রুটিসমূহ নিজেরাই অনুভব করতে সমর্থ হয়। মুসলমান ও ঈসায়ী উভয় জাতির লোকেরা একে অপরকে রেয়াত করতে শুরু করে এবং অবস্থা এতদূর গড়ায় যে, সাধারণভাবে মুসলমানরা ঈসায়ী রমণীদেরকে বিবাহ করতে শুরু করে। ঈসায়ীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে শুরু করে দেয়। সুলতান হিশামের চরিত্র ও জীবন পদ্ধতিতে হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের সাথে অনেকটা সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। স্পেনের প্রজাসাধারণ তাঁকে 'ন্যায়পরায়ণ সুলতান' বলে অভিহিত করে এবং এ নামেই সর্বত্র তিনি আলোচিত হতেন।

সুলতান হিশাম তাঁর পিতা আবদুর রহমানের চাইতেও অধিকতর আবেদ-যাহেদ ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। আমীর আবদুর রহমানের প্রতিপত্তি এবং তাঁর রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতারূপে তিনি ইসলামী পণ্ডিত এবং ইসলামী পণ্ডিত ধরনের লোকদের শাহী দরবারে একটি বিশেষ মর্যাদার আসন ও প্রতিপত্তি অর্জনের সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান হিশামের রাজত্বকালে শাস্ত্রজ্ঞ ফকীহ্‌দের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল সবার ওপরে।

ঐ আমলে ফকীহ্‌গণের ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের ভিত্তি রাখা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। হযরত ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র)-এর মদীনায় খুব খ্যাতি ছিল। হিজাযবাসীরা সাধারণভাবে মালিকী ফিকাহ্ অনুসরণ করছিল। স্পেনের কিছু মুসলমান মদীনায় এসে হযরত মালিক (র)-এর খিদমতে অবস্থান করে আবার স্পেন দেশে ফিরে যান। হযরত ইমাম মালিক (র) সুলতান হিশামের কথা অবগত হয়ে তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীতি, সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'পৃথিবীতে কেউ যদি খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়ার যোগ্যতা রাখে তবে তিনি হচ্ছেন হিশাম ইব্‌ন আবদুর রহমান।' ইমাম মালিক (র)-এর এ ধারণা যথার্থই ছিল। কেননা, হিশাম আবেদ-যাহেদ হওয়া ছাড়াও অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত, কুশলী ও বীর পুরুষ ছিলেন। বীরত্ব ও সেনাপতিত্বের যোগ্যতার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পিতার সমকক্ষ এবং যুহদ ও ইবাদতে তাঁর পিতার চাইতেও অগ্রবর্তী ছিলেন।

ইমাম মালিকের উক্ত প্রশংসা বাক্যসমূহ আব্বাসীয়দের কাছে অত্যন্ত অসহনীয় ঠেকে এবং এজন্যে আব্বাসীয়দের হাতে তাঁকে অনেক নিপীড়ন সইতে হয়। হিশামের রাজত্বের প্রারম্ভের দিকে স্পেন দেশের বিখ্যাত ফকীহ্ ও আলিম ফিরআওন ইব্‌ন আব্বাস, ঈসা ইব্‌ন দীনার এবং সাঈদ ইব্‌ন আবী হিন্দ হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়ায্‌যমার পানে রওয়ানা হন। তাঁদের সাথে আরো অনেক বড় বড় আলিম-উলামা ছিলেন। ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র)-এর সাথে তাঁদের সাক্ষাত হলে তাঁরা তাঁর দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত হন। কিছুদিন তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করে তাঁরা স্পেন দেশে ফিরে যান এবং সেখানে ইমাম মালিকের মতাদর্শ প্রচারে ব্রতী হন। তাঁদের তাবলীগে প্রভাবান্বিত হয়ে স্পেনের কাযীউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতিও মালিকী মাযহাব গ্রহণ করেন। সুলতান হিশামের দৃষ্টিতে এদের মর্যাদাই ছিল সর্বাধিক এবং তিনি এদেরকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে রাখতেন। ফলে সুলতান হিশামও মালিকী মাযহাবের অনুসারী হয়ে ওঠেন। তিনি এ মর্মে ফরমান জারি করেন যে, যারা ইমাম মালিকের খিদমতে উপস্থিত হয়ে ফিকাহ্ ও হাদীসের জ্ঞানার্জন করতে চান তাদের ব্যয়ভার সরকার বহন করবে। নওমুসলিম ঈসায়ীরা এবং নওমুসলিমদের সন্তানরা এ সুযোগ গ্রহণে সর্বাধিক এগিয়ে আসে। প্রকৃত পক্ষে এসব নওমুসলিমের মধ্যেই ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার এবং ইবাদত-বন্দেগীর নিষ্ঠা অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। সুলতান হিশাম এবং শায়খুল ইসলাম আবূ আবদুল্লাহ্ মালিকী মাযহাব গ্রহণ করায় মালিকী মাযহাব রাষ্ট্রীয় মাযহাবে পরিণত হয় এবং রাজ্যজোড়া মালিকী মাযহাব অনুসারে কাযীদের রায় লিপিবদ্ধ হতে থাকে। হিশামের শাসনামলে সাদাকা যাকাত সম্পূর্ণ ইসলামী বিধান অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের বিধি মুতাবিক উসুল করা হতো।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

সুলতান হিশাম তাঁর জীবদ্দশায়ই তাঁর পুত্র হাকামকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং অমাত্য ও আমলাবর্গের নিকট থেকে তাঁর পক্ষে বায়আত নেন। এ উপলক্ষে হাকামকে লক্ষ্য করে তিনি ওসীয়তস্বরূপ নিম্নলিখিত কথাগুলো বলেন ঃ

"ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম রাখার ব্যাপারে আমীর-গরীব তথা ধনী-নির্ধনের কোন পার্থক্য করবে না। অধীনস্থদের প্রতি বদান্যতা ও দয়ার্দ্র আচরণ প্রদর্শন করবে। বিভিন্ন প্রদেশ ও শহরের শাসনভার বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ লোকদের হাতে অর্পণ করবে। যে সমস্ত আমিল অহেতুক প্রজাদেরকে উৎপীড়ন করে, তাদের কঠোর শাস্তি বিধান করবে। সামরিক বাহিনীর ওপর নিজ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিপত্তি কঠোরভাবে এবং ভারসাম্যপূর্ণভাবে রক্ষা করবে আর এ কথা খেয়াল রাখবে যে, ফৌজের কাজ হচ্ছে দেশের হিফাজত করা, ধ্বংস করা নয়। ফৌজের বেতনভাতা সর্বদা সময়মত প্রদান করবে এবং যে প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার করবে, তা অবশ্যই পূরণ করবে। সর্বদা এদিকে লক্ষ্য রাখবে যেন প্রজাসাধারণ তোমাকে ভালবাসার চোখে দেখে। প্রজাদেরকে তটস্থ করে রাখা রাজত্বের স্থায়িত্বের পক্ষে ক্ষতিকর। অনুরূপ প্রজাসাধারণের বাদশাহকে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

"কৃষককুলের ব্যাপারে কখনো অজ্ঞ বা অনবহিত থাকবে না, সর্বদা তাদের খোঁজখবর নেবে। ফসল হানি বা চারণক্ষেত্র যেন বিনষ্ট হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। তোমার সামগ্রিক কার্যপদ্ধতি যেন এমন হয় যে, তোমার প্রজাকুল তোমার ছায়াতলে সুখ-সমৃদ্ধির জীবন যাপন করতে পারে। এ কথাগুলো মেনে চলতে পারলে কীর্তিমান বাদশাহদের তালিকায় তোমার নামটিও স্থান পাবে।"

সুলতান হিশামের গোটা জীবন যুদ্ধবিগ্রহ এবং আক্রমণ পরিচালনায় অতিবাহিত হয়। কিন্তু যখন তাঁর ধর্মীয় খিদমতসমূহ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতিনৈতিকতা ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল অবদানের কথা চিন্তা করা হয় তখন তিনি যে সামরিক ক্ষেত্রেও গৌরবময় কীর্তি রেখে গিয়ে অনেক বিদ্রোহী দমনকারী ও দিগ্বিজয়ী কীর্তিমান বিদ্যোৎসাহী বাদশাহদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন, তা কল্পনা করতেও অবাক লাগে।

মোটকথা, স্পেন দেশে বনী উমাইয়ার খিলাফত কায়েম হয়ে তিনশ বছর পর্যন্ত তা স্থায়ী থাকার পেছনে একটি বড় কারণ ছিল উক্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আমীর আবদুর রহমানের পর হিশামের মত সর্বগুণে গুণান্বিত সুলতান স্পেনের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা। সুলতান হিশামের স্থলে অন্য কেউ সুলতান হলে বনূ উমাইয়া বংশের হাতে রাজত্ব থাকা অত্যন্ত দুষ্কর হতো। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, সুলতান হিশামের রাজত্বকাল ছিল খুবই স্বল্পকাল স্থায়ী - মাত্র সাত বছর আটমাসকাল তিনি রাজত্ব করেন। তবে এ ক্ষতি পূরণ হয়ে গিয়েছিল এভাবে যে, হিশামের পর হাকামও একজন সুযোগ্য শাসকরূপে প্রতিপন্ন হন।

হাকাম ইব্‌ন হিশাম

হাকাম ইব্‌ন হিশাম তদীয় পিতার ইন্তিকালের পর ১৮০ হিজরীতে (৭৯৬ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে অনেক বড় বিদ্রোহ দেখা দেয়।

হাকামের চাচা সুলায়মান ও আবদুল্লাহর বিদ্রোহ ঘোষণা

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে, সুলতান হিশামের ভাই সুলায়মান আফ্রিকা অর্থাৎ মরক্কোতে অবস্থান করছিলেন, যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। সুলায়মান চিঠিপত্রের মাধ্যমে স্পেনের অভ্যন্তরেও বিদ্রোহের মনোভাব প্রজাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলার জন্যে তৎপর ছিলেন। হিশামের অপর ভাই আবদুল্লাহ্ টলেডো সংলগ্ন তাঁর জায়গীরে অবস্থান করছিলেন। সুলতান হিশামের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র টলেডো থেকে পালিয়ে তাঁর ভাই সুলায়মানের কাছে গিয়ে উপনীত হন, যিনি মরক্কোর তানযীর শহরে অবস্থান করছিলেন। তাঁর কাছে তখন বার্বার দস্যুদের এক বিরাট দল ছিল। সে এলাকাকে তারা ডাকাতি-রাহাজানির শিকার বানিয়ে রেখেছিল। তানযীরে বসে উভয় ভাই রাজ্য দখলের ফন্দী আঁটলেন। ফরাসী সম্রাট শার্লিমেন এবং অন্যান্য সীমানায় অবস্থিত রঈসদের সাথে সুলায়মান ইতিপূর্বেই সলাপরামর্শ করে রেখেছিলেন। এবার স্থির হলো যে, আবদুল্লাহ্ স্বয়ং ফ্রান্সে শার্লিমনের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে ফ্রান্সের বাদশাহকে স্পেন আক্রমণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং এভাবে দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্ট বিদ্রোহকে তিনি সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবেন। সে মতে আবদুল্লাহ্ শার্লিমেনের দরবারে গিয়ে উপনীত হলেন। শার্লিমেন তাঁর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন এবং আপন পুত্রের অধীনে একটি দুর্ধর্ষ বাহিনীকে স্পেন সীমান্তের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ্ সেখান থেকে ফিরে এসে টলেডোর আমিলকে বিদ্রোহের উস্কানি দিয়ে নিজে টলেডো দখল করে বসলেন।

টলেডো ছিল স্পেনের প্রাচীন রাজধানী শহর ও যীগাতম সম্রাটদের এটি রাজধানী ছিল। এখানে খ্রিস্টান অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং মুসলমানরাও ছিল এমন যে, তারা তাদের খ্রিস্টান পূর্বপুরুষ এবং প্রাচীন খ্রিস্টান রাজ-রাজড়াদের বীরত্বগাথা গর্বের সাথে বর্ণনা ও তার স্মৃতিচারণে অভ্যস্ত ছিল। এজন্যে টলেডোর খ্রিস্টানদেরকে এবং তাদেরই সমগোত্রীয় নওমুসলিমদেরকে বিদ্রোহী করে তোলাটা ছিল অত্যন্ত সহজ। এখানে আমীর আবদুর রহমানকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হতো। তাই আবদুর রহমানের পুত্র আবদুল্লাহ্ এদের কাছে ছিলেন আবদুর রহমানের পৌত্র হাকামের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য। মোটকথা এরূপ অনেক কারণে আবদুল্লাহ্ সহজেই টলেডো অধিকারে সমর্থ হন। এদিকে সুলায়মান ইবন আবদুর রহমান মরক্কো থেকে স্পেনের বালানসায় উপনীত হয়ে খলীফার খান্দানের যোগ্যতম ও জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি হওয়ার দাবিতে নিজেকেই খিলাফত ও ইমারতের সবচাইতে বেশি হকদার বলে অভিহিত করে ঐ প্রদেশে তিনি তাঁর আপন শাসন কায়েম করেন।

সুলায়মান ও আবদুল্লাহর বিদ্রোহ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই পূর্ব পরিকল্পনা মুতাবিক শার্লিমেন তনয় পিরেনীজ পর্বত ডিঙিয়ে স্পেনের ভূমিতে পদার্পণ করেন। কয়েকটি শহর দখল করার পর তিনি বার্সেলোনা অবরোধ করলেন। বার্সেলোনার আমিল যায়েদ শার্লিমেনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন, তবে ফরাসীদের তিনি তাঁর দুর্গ মধ্যে প্রবেশও করতে দিলেন না। এদিকে একুইটিন রাজ্যের রাজা লুই পিরেনীজ পর্বতের পশ্চিম অংশ

ডিঙিয়ে স্পেনের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় ব্যাপক লুটতরাজ চালিয়ে লারদা ও দাশকা দখল করে নেন। দেশের অভ্যন্তরে সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্ দেশের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় মর্যাদার শহর ও প্রদেশসমূহ দখল করে নেন। উত্তর দিক থেকে ঈসায়ীরা প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে উত্তর স্পেনকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এসব সংকট মোটেই মামুলী ছিল না। এভাবে স্পেন হাতছাড়া হওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা দেখা দেয়।

হাকামের প্রতিরোধ

সুলতান হাকাম ইব্ন হিশাম সর্বপ্রথম টলেডোতে বিদ্রোহের কথা শুনতে পেয়ে অবিলম্বে সসৈন্য টলেডো পৌঁছলেন এবং শহর অবরোধ করলেন। সেখানে আবদুল্লাহ্ ত্বরিত প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। সে অবরোধ ফলবতী না হতেই উত্তর স্পেন হাতছাড়া হওয়ার এবং ঈসায়ীদের আক্রমণের সংবাদ এসে পৌঁছল। সুলতান হাকাম ঈসায়ীদের হামলাকে তাঁর চাচাদের বিদ্রোহের চাইতে বেশি সঙ্কটজনক ও তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনা করে টলেডোর অবরোধ উঠিয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। হাকামের আগমন সংবাদ পেয়ে শার্লিমেন বাহিনী ত্বরিত গতিতে বার্সেলোনা এবং তার আশেপাশের অঞ্চল থেকে এমনভাবে পলায়ন করলো যে, তারা পথে কোথাও যাত্রাবিরতি করাও নিরাপদ ভাবলো না। সরাসরি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেই তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। তারপর সুলতান হাকাম ওশকা এবং লারদার দিকে মনোনিবেশ করলেন। সেখানকার খ্রিস্টান বাহিনীও ব্যাপক লুটপাট চালায়। সুলতান হাকামের সেখানে এসে পৌঁছার সংবাদ পেয়ে তারা দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে পলায়ন করলো এবং একেবারে একুইটিন রাজ্যে পৌঁছে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সুলতান হাকাম স্পেনকে ঈসায়ী দখলমুক্ত করে পিরেনীজ পর্বতের উত্তরাঞ্চলে পৌঁছে দক্ষিণ ফ্রান্সে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান এবং নার্বুন শহর ঈসায়ীদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেন। এদিকে হাকাম ঈসায়ীদের পশ্চাদ্ধাবন করে ফ্রান্সে উপনীত হন। ওদিকে স্পেন থেকে হাকামের অনুপস্থিতির সুযোগে আবদুল্লাহ্ ও সুলায়মান স্পেনের শহরসমূহ দখল করে সুলতান হাকামের আমিলদেরকে বে-দখল করতে লাগলেন। দু'ভাই অঞ্চলের পর অঞ্চল দখল করে টেগ্স নদীর তীরে এসে একে অপরের সাথে মিলিত হন। কিন্তু তারপর আর তাঁরা অগ্রসর হননি বরং ফ্রান্সে হাকামের পরিণতি কি হয়, তা দেখার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। তাঁদের দু'জনের একান্ত কাম্য ছিল যেন হাকাম ফরাসীদের হাতে পরাজয়বরণ করেন এবং সেখানেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে যাতে তাঁরা গোটা স্পেনে তাঁদের রাজত্বের সূচনা করতে পারেন। এদিকে হাকামের আমিলরাও এই ভেবে অধীর অপেক্ষায় দিন গুণ-ছিলেন যে, হাকামের এ ত্বরিত আক্রমণের ফলাফল কি দাঁড়ায়। আল্লাহ্ না করুন যদি ফ্রান্সে হাকামের জীবনাবসান ঘটতো, তাহলে তারা সবাই খুশি মনে সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্র আনুগত্য করতো। কেননা, তারা দু'জনই ছিলেন আবদুর রহমানের পুত্র। কিন্তু হাকাম ফ্রান্সের ভূমিতে পদার্পণ করা মাত্র ফরাসী বাহিনী এমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, সর্বত্র তারা হাকামের আগে আগে পালাতে লাগলো। হাকাম তখন ফ্রান্স দখল করে সে দেশে কিছুদিন বসবাস করতে পারতেন এবং সে দেশে রীতিমত তাঁর আমিলদেরকে বসিয়ে দেয়ার

জন্যে যত্নবান হতে পারতেন। কিন্তু তিনি সম্যক জানতেন যে, দেশে তিনি কত শক্তিশালী শত্রু রেখে গেছেন এবং তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁরা ভীষণ ক্ষতি করতে পারে। তাই ঈসায়ীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেই তিনি অচিরেই স্পেনে ফিরে আসেন।

সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্র পরিণতি

সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্ নিজেদের পক্ষ থেকে উবায়দা ইব্ন উমারকে টলেডোর গভর্নর নিযুক্ত করে নিজেরা সৈন্য-সামন্তসহ হাকামকে বাধা দেয়ার জন্যে অগ্রসর হলেন। হাকামের বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তনের ফলে তাঁদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল। যুদ্ধে তাঁরা উভয়ে পরাজিত হলেন এবং পালিয়ে স্পেনের পূর্বদিকের পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সুলতান হাকাম তাঁর জনৈক সর্দার আমর ইব্ন ইউসুফকে টলেডো অবরোধের নির্দেশ দিয়ে নিজে সুলায়মান ও আবদুল্লাহর পশ্চাদ্ধাবন করেন। কয়েক মাস পর্যন্ত সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্ হাকামকে পার্বত্য এলাকায় পেরেশান করে ছুটে বেড়াতে থাকেন। কোথাও তাঁর সাথে তাঁদের সংঘর্ষ বাধেনি। অবশেষে তিনি মারসিয়ার সেই প্রান্তরে গিয়ে উপনীত হন যেখানে এই মাত্র কিছুদিন আগে শাহযাদারূপে হাকাম সুলায়মানকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করেছিলেন। এদিকে সুলায়মানও সেখানে এসে পৌঁছলেন। উভয়পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। অবশেষে আকস্মিক এক তীরের আঘাতে সুলায়মানের ভবলীলা সাঙ্গ হয়। সুলায়মানের নিহত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। আবদুল্লাহ্ পলায়ন করে বালানসিয়ায় গিয়ে উপনীত হন এবং সেখান থেকে সুলতান হাকামের কাছে ক্ষমার আবেদন প্রেরণ করেন। হাকাম চাচার এ আবেদন তাৎক্ষণিকভাবে মঞ্জুর করে তাঁর উপর শর্ত আরোপ করলেন যে, আপনি আপনার পুত্রদ্বয় আসবাহ্ ও কাসিমকে মুচলিকা স্বরূপ আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়ে নিজে অবিলম্বে স্পেন ত্যাগ করে মরক্কোর তাবখিয়ায় গিয়ে বসবাস করুন। হাকাম তাঁর পিতৃব্য তনয়দ্বয়ের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতে থাকেন। তাঁদের দু'জনের কনিষ্ঠ জনকে মারীদা শহরের আমিল নিযুক্ত করে জ্যেষ্ঠজনের সাথে আপন কন্যার বিবাহ দিয়ে দেন।

এদিকে সুলতান হাকাম যখন সুলায়মান ও আবদুল্লাহর পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন উমর ইব্ন ইউসুফ টলেডো শহর দখল এবং উবায়দা ইব্ন উমরকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন এবং নিজ পুত্র ইউসুফ ইব্ন উমরকে টলেডোর শাসক নিযুক্ত করেন। নিজে উবায়দার কর্তিত শির নিয়ে সুলতানের খিদমতে উপস্থিত হন। তারপর সারাকসতাতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। উমর ইব্ন ইউসুফ সেদিকে গমন করে বিদ্রোহ দমন করে বিদ্রোহীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেন। এসব ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের ধারা ১৮১ হিজরীতে (৭৯৭ খ্রি.) শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ তিন বছর পর ১৮৪ হিজরীতে (৮০০ খ্রি.) তার অবসান ঘটে। সমস্ত স্পেনে আবার শান্তি ফিরে আসে।

খ্রিস্টানদের একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত

উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব বিদ্রোহের শুরুতে আমীর হাকাম ঈসায়ীদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে ফ্রান্সে পদার্পণ করেন এবং ফরাসীরা তাঁর সম্মুখে টিকতে পারেনি। এ

তিন বছরে গির্জাসমূহে তাদের নিজেদের দৈন্যদশার কথা উপলব্ধি করে মুসলমানদের বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত কার্যকর চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত হয়। তারা পিরেনীজ পর্বতের পশ্চিম অংশে যেখানে বিস্কে উপসাগর, জালীকিয়া প্রদেশ এবং ফ্রান্সের সীমানা একত্রে মিলিত হয়েছে সেখানে ঈস্টার ইয়াস নামক একটি ঈসায়ী রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এ রাজ্যটি আগের তুলনায় প্রসারিত হয়ে জালীকিয়া প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। স্পেন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গথ জাতির নেতারা পিরেনীজ পর্বতের পূর্বাঞ্চলের উত্তর এবং ফ্রান্সের দক্ষিণে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এ রাজ্যটি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং একুইটিন রাজ্য নামে খ্যাত ছিল। এদিকে বিশাল ফ্রান্স দেশে একটি প্রাচীন রাজবংশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, যার সম্রাট ছিলেন শার্লিমেন। তাছাড়াও বার্সেলোনা, আরাগুন, আরবুনিয়া প্রদেশ এবং বিস্কে উপসাগরের দক্ষিণ উপকূলে অর্থাৎ জালীকিয়ায় প্রচুর সংখ্যক বিদ্রোহী খ্রিস্টানের বাস ছিল। ঐ সব অঞ্চলে কোথাও কোথাও মুসলমানদের বাস ছিল নামেমাত্র। নিতান্ত স্বল্প সংখ্যায় উত্তরে ঐসব অঞ্চলে মুসলিম শাসন সর্বদা সঙ্কটের মুখে থাকতো। ঈসায়ী প্রজারা যখনই মুসলিম শাসকদের একটু দুর্বল দেখতে পেত, তখনই তারা বিদ্রোহ ঘোষণায় উদ্যত হতো বা বিদ্রোহের জন্যে উদ্যত করা হতো।

সুলতান হাকামকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত দেখে ঈসায়ীরা টুলূয শহরে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে। উক্ত পরামর্শ সভায় প্রতিটি রাজ্যের সর্দার ও স্পেনের উত্তরাঞ্চলের সমস্ত ঈসায়ী আমীর-উমারা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তোলে। একুইটিন রাজ এবং ফ্রান্সের সম্রাটের মধ্যে সন্ধি হয়। ঈস্টার ইলাস্ট্রিয়াসের ইয়াসের যে ঈসায়ী রাজ্যটি এতকাল সকল দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল সেটিও এবার খ্রিস্টান ঐক্যফ্রন্টে যোগদান করে। পিরেনীজ পর্বতের দক্ষিণ এবং স্পেনের উত্তরের যে এলাকাটিতে যুদ্ধবাজ উগ্র খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল প্রচুর সেখানে ঈসায়ী একাধিক রাজ্য গড়ে তোলার প্রস্তাব বিবেচিত হয়। মুসলমানরা অনেক বারই পিরেনীজ পর্বত ডিঙ্গিয়ে ফ্রান্সে আক্রমণ চালিয়েছে এবং সেখানকার মাঠ-ঘাট-প্রান্তর তাঁদের অশ্ব পদতলে পিষ্ট করেছে। কিন্তু ফরাসীদের জন্য পিরেনীজ অতিক্রম করা সবসময়ই কঠিন এবং ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হয়েছে।

মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য একটি নতুন খ্রিস্টান রাজ্য গঠন

ফ্রান্স সম্রাট শার্লিমেন পিরেনীজ পর্বত সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডকে তাঁর রাজ্য থেকে পৃথক করে দিয়ে একটি স্বতন্ত্র খ্রিস্টান রাজ্যের পত্তন করলেন। জনৈক ফরাসী রঈস বোরেলকে তার শাসক নিযুক্ত করা হয়। এ রাজ্যটির নামকরণ করা হয় 'গথিক মার্চ' বলে। এ শাসককে স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করে তার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয় যেন তিনি পিরেনীজ পর্বতকে মুসলমানদের জন্যে দুর্লঙ্ঘ্য করে তোলেন এবং মুসলমানদেরকে বাধা দেয়ার জন্যে সদা প্রস্তুত থাকেন। এ রাজ্যটিকে একুইটিন রাজ্যের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেয়া হয়। পিরেনীজ পর্বতের কোল ঘেঁষে স্থানে স্থানে কতকগুলো দুর্গ নির্মিত হলো। স্পেনের উত্তরাঞ্চলের মুসলিম আমিলদের সাথে তাদেরকে প্রয়োজনে বিদ্রোহী করে তোলার স্বার্থে সখ্যতা গড়ে তোলা হলো। এসব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির কথা বাগদাদের

খলীফা রশীদকেও অবহিত করা হলো। হারূনুর রশীদ তাদেরকে উপঢৌকনাদি দিয়ে এবং সখ্যতা স্থাপনের জন্যে হস্ত প্রসারিত করে উৎসাহিত করলেন। নতুন গঠিত গথিক মার্চ রাজ্যটি পিরেনীজ পর্বতের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল অধিকার করে নেয়। উত্তর স্পেনের ঈসায়ীরা সর্বপ্রকারে তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। মোটকথা, এই নতুন রাজ্যটি আরেকটি পার্বত্য ইলাস্ট্রিয়াস রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। ইতিপূর্বে ইলাস্ট্রিয়া রাজ্যকে গড়ে তোলার জন্যে পাদ্রীরা যেরূপ সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল, এ নতুন রাজ্যটিকে একটি শক্তিশালী রাজ্য রূপে গড়ে তোলাকে তারা তাদের পবিত্র ধর্মীয় দায়িত্ব রূপে গ্রহণ করে। যে সব খ্রিস্টান একুইটিন, ইলাস্ট্রিয়াস অথবা ফ্রান্সের সরকার বা সরকার প্রধানদের ওপরে কোন কারণে অসন্তুষ্ট ছিল, তারা মুসলমানদের রাজ্যে এসে বসত করার পরিবর্তে এ নতুন রাষ্ট্রে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে এবং এভাবে একটি বিরান পাহাড়ী এলাকা একটি আবাদ ও সমৃদ্ধ এলাকা হওয়ার সাথে সাথে একটি শক্তিশালী রাজ্যেও পরিণত হয়।

বিশ্বাসঘাতক মুসলিম আমিলদেরকে ঈসায়ীদের উৎসাহ প্রদান

১৮৪ হিজরীর (৮০০ খ্রি.) শেষ নাগাদ হাকাম একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সমর্থ হন। কিন্তু ১৮৫ হিজরীতে (৮০১ খ্রি) ঈসায়ীরা উত্তর স্পেনে আবার হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেয়। কোন কোন উত্তরাঞ্চলীয় শহরের আমিল শার্লিমেনকে বাগদাদের খলীফা হারূনুর রশীদের বন্ধু ও এজেন্ট মনে করে তার সাহায্য-সহযোগিতাকে জায়েয মনে করে এবং সুলতান হাকামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোকেই পুণ্যের কাজ বলে ধারণা করে নেয়। কেননা, সুলতান হাকামের ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে জনমনে অনেক সন্দেহ ছিল এবং প্রায়ই তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হতে শোনা যেত। এ সুযোগে বাগদাদের খলীফার স্পেনে নিযুক্ত গোয়েন্দারা সক্রিয় হবার সুযোগ পায়। ফলে ওশকা, গীরুন, লূন, লারীদা ও তারকূনা প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলীয় শহরসমূহের আমিলগণ ফ্রান্সের সম্রাটকে তাদের নিজেদের সম্রাটরূপে গ্রহণ করে সুলতান হাকামের নির্দেশাদি পালনে অস্বীকৃতি এবং শার্লিমেনের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। এভাবে রাতারাতি 'গথ মার্চ' রাজ্য স্পেনের উত্তরাঞ্চলীয় সমভূমিতে বিস্তৃত হয় এবং সেখানকার মুসলমানদেরকে অনুগত পেয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

অনুরূপভাবে জালীকিয়া এবং বিস্কে উপকূলের আমিলরা, যাদের মধ্যে সারাকস্তার শাসকও ছিলেন, ঈসায়ী রাজাদের আনুগত্য ও সুলতান হাকামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এ নতুন বিপদের মুকাবিলায় হাকাম নিজে কর্ডোভা থেকে এ জন্যে সরতে পারলেন না যে, এখানে রাজধানীর হাওয়ায়ও পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। এজন্যে রাজধানীতে অবস্থান করে বিদ্রোহের এ জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, যা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং স্বয়ং মুসলমানরাও সুলতানের আত্মীয়-স্বজনরাই তাতে শক্তি যোগাচ্ছিল। দেশের উত্তরাঞ্চলকে রক্ষা এবং ঈসায়ীদের কবল থেকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তিনি সিপাহসালার ইবরাহীমকে প্রেরণ করেন। ইবরাহীম প্রথমে জালীকিয়া ও সারাকস্তার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন এবং অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তক্ষয়ের পর ঈসায়ীদের কবল থেকে এ এলাকা পুনরুদ্ধার করেন।

বিদ্রোহী আমিলরা ঈসায়ী ফৌজ এবং ঈসায়ী বাসিন্দাদের সাথে পালিয়ে ফ্রান্সে শার্লিমেনের কাছে চলে যায়। তাঁরা তাকে স্পেন আক্রমণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। ইবরাহীমও জালীকিয়া ও সারাকস্তা প্রভৃতি শহরের দিকে এমনি ব্যতিব্যস্ত থাকেন যে, স্পেনের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের দিকে তিনি ফিরেও তাকাতে পারেন নি। শার্লিমেনের কাছে পালিয়ে যাওয়া মুসলমান আমিলরা তাঁকে এ মর্মে পরামর্শ দান করে যে, স্পেনের প্রাচীন গথ-রাজধানী আপনি অনায়াসেই দখল করে নিতে পারেন। আমরা এ কাজে আপনাকে পথ প্রদর্শন ও সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছি। মুসলমান আমিলদের এ উৎসাহ দান ঈসায়ীদের সাহস ও মনোবল অনেকগুণে বৃদ্ধি করে। সেমতে ফ্রান্সে একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বার্সেলোনা বন্দরকেও গথিক মার্চ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। বার্সেলোনার আমিল যায়দও শার্লিমেন এবং কোন্ট লুঈর সাথে পত্র যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এবং তাদের পক্ষে থাকার অঙ্গীকার করে রেখেছিলেন। সেমতে ১৮৮ হিজরীর (৮০৪ খ্রি.) শেষ দিকে ঈসায়ী সৈন্যরা গথিক মার্চের ফৌজদের সাথে মিলিত হয়ে স্পেনের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ পদদলিত করে বার্সেলোনা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এখানকার আমিল যায়দ এ ফৌজের আগমনে বার্সেলোনা শহরের ফটক বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে শহরে প্রবেশ করতে দিতে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ঈসায়ী বাহিনী বার্সেলোনা শহর অবরোধ করে বসে। তারা বার্সেলোনার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে অবরোধের কঠোরতা বৃদ্ধি করে। যায়দ কোনদিক থেকেই কোনরূপ সাহায্য পেলেন না। অবশেষে এই শর্তে তাদেরকে বার্সেলোনার দখল দিয়ে দেয়া হয় যে, তারা মুসলমানদেরকে তাদের অস্থাবর সম্পত্তিসহ শহর থেকে বেরিয়ে যেতে দেবে। মুসলমানরা বার্সেলোনা খালি করে দেয়। ঈসায়ী সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করে। একুইটিনের রাজা বার্সেলোনা কেল্লাকে শক্ত করে তাঁর পক্ষ থেকে সেখানে একজন গভর্নর নিয়োগ করেন। নতুনভাবে বিজিত এ গোটা এলাকাকে গথিক মার্চ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুসলিম সৈন্যদের বিরুদ্ধে এখন উত্তর স্পেনে দু'টি যুদ্ধফ্রন্ট কায়েম হয়ে গেল। একটি হলো ইলাস্ট্রিয়াস রাজ্য ও জালীকিয়া প্রদেশের বিদ্রোহী ঈসায়ীদের ফ্রন্ট, যারা রীতিমত ফ্রান্স থেকে সাহায্য পেয়ে আসছিল। দ্বিতীয় ফ্রন্টটি হলো গথিক মার্চ এবং বার্সেলোনা এলাকার বিদ্রোহী ঈসায়ী প্রজাবৃন্দ, যারা এখন ফ্রান্সের পক্ষ থেকে সাহায্য পাচ্ছিল। এদিকে দক্ষিণাঞ্চলে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত ছিল এবং মুসলিম ধর্মবেত্তারা জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে প্রেরিত বাহিনী কোন একটি ফ্রন্টে ঈসায়ীদের মুকাবিলা করতে পারতো। তাই তারা জালীকিয়া প্রদেশের দিকে গিয়ে ঈসায়ীদেরকে পরাজিত করে। কিন্তু অপর ফ্রন্টটি খোলাই রয়ে গেল। ফলে বার্সেলোনা মুসলমানদের কব্জা থেকে বেরিয়ে গেল। তারা যদি বার্সেলোনার দিকে মনোনিবেশ করতেন তবে সারাকস্তা ও জালীকিয়া অঞ্চল ঈসায়ীদের দখলে থেকে যেত এবং তারা তারপর আরো অগ্রসর হতো।

১৮৯ হিজরীতে (৮০৫ খ্রি.) মুসলমান বিদ্রোহী আমিলরা ঈসায়ীদেরকে উৎসাহ দিয়ে টলেডোতে হামলা করায়। ঈসায়ীরা বার্সেলোনা ও উত্তরাঞ্চলীয় শহরগুলো থেকে টলেডোতে আক্রমণ চালায়। এদিকে ইউসুফ ইব্‌ন উমর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। অবশেষে

ঈসায়ীরা টলেডো অবরোধ করলো। টলেডো এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঈসায়ী অধিবাসীরা আক্রমণকারীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করায় ইউসুফ ইবন উমর টলেডোর ঈসায়ীদের হাতে বন্দী হন। তারা টলেডো ঈসায়ী সৈন্যদের দ্বারা দখল করিয়ে নেয়। ঈসায়ীরা ইউসুফ ইব্‌ন উমরকে কায়েস মরুভূমিতে বন্দী করে এবং স্পেনের প্রাচীন রাজধানী অধিকার করে সীমাহীন উৎফুল্লিত হয়। টলেডোর খবর ইউসুফ ইব্‌ন উমরের পিতা উমর ইব্‌ন ইউসুফের কর্ণগোচর হলে তিনি সারাকস্‌তা থেকে একদল দুর্ধর্ষ সৈন্য নিয়ে টলেডো অভিমুখে যাত্রা করলেন। এখানে পৌঁছে এক বিরাট যুদ্ধের পর তিনি টলেডো জয় করেন, ইউসুফ ইব্‌ন উমরকে মুক্ত করেন এবং ঈসায়ীদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। টলেডোতে ঈসায়ী দখল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সেখানে বসবাসকারী সংখ্যাগুরু ঈসায়ী প্রজারাই কার্যকর সাহায্য করেছিল। তাই টলেডোর ঈসায়ী প্রজারাই সর্বাধিক শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত ছিল যারা টলেডোর হুকুমতকে ভীষণ সঙ্কটাপন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু উমর ইব্‌ন ইউসুফ অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে তাদের ব্যাপারে চুপ থাকেন এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে একটি শব্দও বলেন নি। তারা যেসব ওযর পেশ করে তা তিনি গ্রহণ করে নিয়ে বাহ্যত তাদেরকে নিশ্চিন্ত করে দেন।

হাকামের বিরোধিকার কারণসমূহ

সুলতান হাকাম ব্যক্তিগতভাবে একজন বীরপুরুষ হলেও তাঁর রাজত্বের সূচনালগ্ন থেকেই যুদ্ধবিগ্রহের সিলসিলা চলতেই থাকে এবং স্পেন দেশের বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত হয়ে একে একে খ্রিস্টানদের দখলে চলে যাচ্ছিল। ঈসায়ীরা দিন দিন শক্তিশালী এবং মুসলমানগণ দিন দিন হতবল হয়ে চলেছিল। এর সব চাইতে বড় কারণ হচ্ছে স্বয়ং মুসলমানদের আত্মকলহ ও অপরিণামদর্শিতা। হাকামের আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর বিরোধিতা এবং তাঁদের নিজেদের ক্ষমতা লাভের প্রয়াসে তীর-তলোয়ারের আশ্রয় নিতে যেমন একটুও কুণ্ঠাবোধ করেন নি, তেমনি তাঁরা গোপন ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাতেও একটুও দ্বিধাবোধ করেননি। এতটুকু করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, বরং তাঁরা প্রতিপক্ষ ঈসায়ীদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে গেছেন। দ্বিতীয় হচ্ছে দুশমন ঈসায়ীরা, যারা মুসলমানদের অনিষ্ট সাধন এবং আন্দালুসের ইসলামী সালতানাতকে দুর্বল করার জন্যে পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ ছিল।

তৃতীয় শত্রু ছিল আব্বাসীয়রা, যাদের পক্ষ থেকে হাকামের আত্মীয়-স্বজন এবং ঈসায়ীরা উৎসাহ পেয়েছে। খোদ স্পেন দেশে তাদের সমর্থকরা মওজুদ ছিল, যারা হাকামের অনিষ্ট সাধন এবং তাঁর রাজত্ব ধ্বংস করার জন্যে সচেষ্ট ছিল। এ তিন শত্রু ছাড়াও এক চতুর্থ শক্তিশালী শত্রুর উদ্ভব হয়। তাঁরা হচ্ছেন মালিকী মাযহাবের ফকীহ্ ও আলিমগণ– সুলতান হিশামের আমলে সালতানাত ও হুকুমতের ওপর যাঁদের অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁরাই ছিলেন সুলতান হিশামের উযীর ও উপদেষ্টা এবং সকল বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপক। তাঁরা যেহেতু ধর্মীয় নেতা ছিলেন তাই জনসাধারণের ওপর তাঁদের প্রভাব ছিল আরও বেশি। সুলতান হাকাম সিংহাসনে আরোহণ করেই এদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে খর্ব করতে সচেষ্ট হন এবং তাদের সাহায্যকে নিজের জন্যে প্রয়োজনবোধ করেন নি।

সুলতানের এ স্ব-নির্ভরতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা তাঁদের অত্যন্ত অপছন্দ হয়। তাঁরা সুলতানের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও তাঁর দোষচর্চায় লিপ্ত হন। ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়াকে কর্ডোভার প্রধান বিচারপতি এবং শায়খুল ইসলাম বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি যখন লক্ষ্য করলেন, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি, সম্মান ও অধিকার খর্ব করে দেয়া হয়েছে, তখন তিনি সুলতানের আরও বেশি সমালোচনায় লিপ্ত হলেন। এ পর্যায়ের সকল প্রধান ও বিখ্যাত মালিকী মাযহাবভুক্ত আলিম, যারা সুলতান হিশামের আমলে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে দখলদার ও অধিকার সম্পন্ন ছিলেন, তাঁরা ফতওয়াবাজীতে অবতীর্ণ হলেন। স্পেন দেশে এ মাযহাব নতুন প্রবর্তিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে সেখানকার মুসলমানরা ফিকাহভিত্তিক মাযহাবসমূহের কার কি বৈশিষ্ট্য এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কি পার্থক্য তা জানতো না। সুতরাং বিশেষত মালিকী মাযহাবভুক্ত লোকেরা সুলতান হিশামের শত্রু এবং বিরোধী হয়ে যায়। এ চতুর্থ পর্যায়ের শত্রুদের শত্রুতার ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূর-প্রসারী এবং সবচাইতে মারাত্মক আর এদের জন্যেই সুলতান হিশাম প্রথমোক্ত তিন শ্রেণীর শত্রুদের উচ্ছেদ সাধন এবং তাদেরকে দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তিবিধান করে উঠতে পারেন নি। তাই ঈসায়ীরা শক্তিশালী হওয়ার এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে। মোটকথা, উপরোক্ত চার শ্রেণীর শত্রুরা সম্মিলিত হয়ে খ্রিস্টানদেরকে শক্তিশালী হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। এ ব্যাপারে সুলতান হাকামের অসতর্কতা ও উন্নাসিকতাকেও অনেকটা দায়ী করা চলে। তবে তিনি ততটা দায়ী ছিলেন না যতটা দোষী ঐতিহাসিকরা সাধারণত তাকে করে থাকেন।

১৯০ হিজরীতে (৮০৬ খ্রি.) মৌলভী সম্প্রদায় তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। কাযীউল কুযাত ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া এবং ফকীহ্ তালূত প্রমুখ কর্ডোভার আলিমগণ তাঁদের সমচিন্তার উলামা ও উমারাকে একটি সমাবেশে একত্র করে হাকামের পদচ্যুতির পরামর্শ করেন এবং ইয়াহইয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল হাকামের চাচাত ভাই ও জামাতা কাসিম ইব্ন আবদুল্লাহ্-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আপনাকে আমরা স্পেনের শাসন ক্ষমতায় বসাতে চাই। কাসিম বললেন, প্রথমে আমার জানতে হবে, কে কে এই কাজের পক্ষপাতী। যদি তাদের সংঘ ও শক্তি সুলতান হাকামকে পদচ্যুত করার জন্যে যথেষ্ট হয়, তা হলে আমি খুশিমনে আপনাদের পরামর্শে যোগ দেব। সুতরাং আগামীকাল আপনারা সে সব নামের তালিকা আমার কাছে নিয়ে আসুন। কাযী ইয়াহইয়া নামের তালিকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিনের মত চলে আসেন। পরদিন কথামত নামের তালিকা নিয়ে তাঁর পৌঁছবার পূর্বেই কাসিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ সুলতান হাকামকে তাঁর ঘরে আনিয়ে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে বসিয়ে রাখলেন। কাযী ইয়াহইয়া কাসিমের মুনশীকে দিয়ে তাদের নাম লিখাতে শুরু করলেন। এদিকে পর্দার আড়াল থেকে সুলতান হাকামের মুনশীও তাঁর কাছে বসে ঐ নামগুলো লিখতে থাকলেন। হাকামের মুনশীর সন্দেহ হলো যে, পাছে ঐ তালিকায় তার নামও না উচ্চারিত হয়। এই ভেবে তিনি কাগজের ওপর এমনভাবে কলম চালাতে লাগলেন যে, কলমের খসখস আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। কলমের এ আওয়াজ শুনে কাযী ও তাঁর সঙ্গীদের সন্দেহ হলো যে, কেউ একজন পর্দার আড়াল থেকে ঐ নামগুলো লিখে নিচ্ছে। এ সন্দেহ হতেই তাঁরা সেখান থেকে উঠে পালাতে লাগলো। কেউ কেউ তো

বেরিয়ে যেতে সমর্থ হলো, অবশিষ্টরা ঐ ঘরেই বন্দী হয়ে নিহত হলো। এঁদের সংখ্যা ছিল ৭২ জন। তারপর প্রকাশ্যেই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করা হলো। দক্ষিণ কর্ডোভায় ওয়াদিউল কবীর নদীর তীর ঘেঁষে একটি মহল্লা ছিল। ঐ মহল্লায় প্রধানত উক্ত ধর্মবেত্তাদের ভক্ত-অনুরক্ত ঈসায়ী নওমুসলিমরা বসবাস করতো। তারা সংঘবদ্ধভাবে সুলতান হাকামের প্রাসাদ ঘেরাও করে তাকে অবরোধ করে বসে। সুলতান হাকাম তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন এবং মামুলী রক্তপাতের পর এ হাঙ্গামা প্রশমিত হয়।

ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯০ হিজরীতে (৮০৬ খ্রি.) সুলতান হাকাম মরক্কোর নবগঠিত স্বাধীন ইদরিসিয়া রাজ্যের সাথে সখ্যতা স্থাপন করেন। মরক্কোর ইদরিসিয়া রাজ্যের বাগদাদের খিলাফত থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা ঘোষণা করাটা স্পেনের জন্যে বেশ সহায়ক হয়। এভাবে স্পেন রাজ্য আব্বাসীয়দের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা থেকে অনেকটা নিরাপদ হয়ে যায়। স্পেনের সালতানাতের জন্যে মরক্কোর স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল একটি আশীর্বাদ স্বরূপ। সুলতান হাকামও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মরক্কোর সাথে সখ্যতা স্থাপনে একটুও বিলম্ব করেন নি। ১৯১ হিজরী (৮০৭ খ্রি.) পর্যন্ত কর্ডোভার বিদ্রোহী আলিমদের প্রভাব খর্ব করা এবং মরক্কোর সাথে সখ্যতা স্থাপন করে সুলতান হাকাম অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তারপর তিনি উত্তরের প্রদেশসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করে সে সমস্যা সমাধানে ব্রতী হন।

টলেডোর বিদ্রোহীদের উৎখাত

১৯১ হিজরীতে (৮০৬-৭ খ্রি) হাকাম উদ্ভূত পরিস্থিতি গভীরভাবে নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ঈসায়ী ষড়যন্ত্রকে সফল করার সর্বাধিক উপাদান রয়েছে টলেডোতে। সেখানকার ঈসায়ীরা অধিক মাত্রায় উপদ্রবপ্রিয়, হাঙ্গামাবাজ এবং শক্তিশালী বিধায় মুসলমান ও ঈসায়ী উভয় সম্প্রদায়ের চক্রান্তকারীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। টলেডোর এ আবর্জনা থেকে মুক্ত করে বিদ্রোহের এ কেন্দ্রটি ভেঙ্গে দিলে উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সহজ হয়ে যাবে। ঐ ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পাল্টা একটি ষড়যন্ত্র করা হলো।

হাকাম উমর ইব্ন ইউসুফকে ডেকে পরামর্শ করলেন এবং সে পরামর্শ অনুসারে তাঁর পুত্র ইউসুফ ইব্ন উমরের পরিবর্তে তাঁকেই টলেডোর শাসক নিযুক্ত করা হলো। উমর ইব্ন ইউসুফ টলেডো পৌঁছেই সেখানকার অধিবাসীদের সাথে অত্যন্ত বিনম্র ও সহৃদয় আচরণ করতে লাগলেন। তিনি সেখানকার কিছু সংখ্যক আমীর-উমারার কাছে এ মত প্রকাশ করলেন যে, বর্তমান শাসক বংশ অর্থাৎ বনূ উমাইয়াকে উচ্ছেদ করে নতুন শাসনের পত্তন করতে হবে। একথায় টলেডোবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হলো এবং অচিরেই তাঁরা তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করলো। তাদের মনের কথা অবগত হয়ে উমর ইব্ন ইউসুফ বললেন, এজন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন টলেডো উপকণ্ঠে একটি দুর্জয় দুর্গ গড়ে তোলা, যাতে বাহির থেকে এসে কারো পক্ষে টলেডো অবরোধ করাটা সহজসাধ্য না হয়। টলেডোবাসীরা এ দুর্গ নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার নিজেরাই বহনের অঙ্গীকার করলো এবং সত্যি সত্যি তাঁরা নিজেরাই চাঁদা দিয়ে যথেষ্ট অর্থ উমর ইব্ন ইউসুফের হাতে তুলে

দিল। দেখতে দেখতে একটি সুদৃঢ় কেল্লা নির্মিত হলো। তারপর পূর্ব পরামর্শ অনুসারে সীমান্তবর্তী আমিল ঈসায়ী হামলার ধুয়া তুলে সুলতান হাকামের কাছে সামরিক সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। সুলতান হাকাম তাঁর পুত্র আবদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী সেদিকে প্রেরণ করলেন। এ বাহিনী টলেডোর পথ দিয়ে অগ্রসর হলো। ঐ বাহিনীটি টলেডোর নিকট পৌঁছতেই টলেডোর আমিল উমর ইব্‌ন ইউসুফ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আতিথ্যের আনুষ্ঠানিকতাসমূহ যথারীতি পালন করলেন। তিনি আবদুর রহমানকে ঐ নবনির্মিত দুর্গে এনে উঠালেন এবং টলেডোবাসীকে বললেন, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহযাদা আবদুর রহমানকে রাজোচিত অভ্যর্থনা ও আতিথ্য দিয়ে তাঁর মন জয় করে নিতে হবে, যাতে তিনি তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক থাকেন। টলেডোবাসীরা তাঁর এ পরামর্শকে অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত বলে গ্রহণ করলো। বিদ্রোহী ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনকামী নেতৃস্থানীয় লোকদের সকলেই শাহযাদার খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদনের অনুমতি প্রার্থনা করলো। শাহযাদা সানন্দে তাদেরকে সে অনুমতি দান করলেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাদের সকলকে দরবারে তলব করলেন। এভাবে টলেডো নগরীর গোটা বিদ্রোহী সংঘ দুর্গে সমবেত হলো। এই সুযোগে তাদের সকলকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হলো এবং দুর্গের মধ্যেই একটি বিশাল গর্ত খুঁড়ে তাদের শবদেহসমূহ সেখানে মাটিচাপা দেয়া হলো। এভাবে টলেডোর বিদ্রোহীরা নির্মূল হলো। অবশিষ্টরা তাদের এ শোচনীয় পরিণাম দেখে সংযত হয়ে গেল। তারপর আর কেউ বিদ্রোহ করতে সাহসী হয়নি।

ঈসায়ীদের সাথে সংঘর্ষ

নিত্যনৈমিত্তিক বিদ্রোহ ও হাঙ্গামা লক্ষ্য করে টলেডোর বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করার পর সুলতান হাকাম উত্তরাঞ্চলের ঈসায়ীদের দিকে মনোনিবেশ করলেন। ঐ ঈসায়ীরা পিরেনীজ পর্বতের পাদদেশ থেকে বার্সেলোনা পর্যন্ত গোটা উত্তর স্পেন অধিকার করে রেখেছিল। তিনি তাদের বিরুদ্ধে একটি মামুলী বাহিনী প্রেরণ করলেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করা সমীচীনবোধ করলেন না। ফলে উত্তরাঞ্চলে সংঘর্ষ অব্যাহত রইল। কখনো মুসলমানরা খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করতেন, আবার কখনো তাঁরা খ্রিস্টানদের হাতে পরাস্ত হতেন। সাত-আট বছর পর্যন্ত এরূপই চললো। যেহেতু মুসলমানদের বড় শক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়নি বরং কেবল তাদের অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে সামান্য সংখ্যক সৈন্য পাঠানো হয়েছিল তাই সে সব সংঘর্ষের ফলাফল খ্রিস্টানদের জন্য অনেক সহায়ক প্রতিপন্ন হয়। তাদের অন্তর থেকে মুসলমানদের ভয় তিরোহিত হয়ে যায় এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমেই তারা যুদ্ধবিগ্রহে অভ্যস্ত এবং ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে। অন্য কথায় বলা যায়, সুলতান হাকামের সামরিক এ অভিযানগুলো ঈসায়ী রাজ্য গথিক মার্চ, ইলাস্ট্রিয়ান এবং জালীকিয়ার বিদ্রোহীদেরকে অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধের অনুশীলন করিয়ে এবং হাতেকলমে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে একটি জবরদস্ত সামরিক শক্তিতে পরিণত করে। কিন্তু সুলতান হাকামের এছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। কেননা, স্পেনবাসীদের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিলেন।

নতুন সৈন্য ভর্তি

ঐ সময়টাতে তিনি রাজধানী কর্ডোভায় অবস্থান করে একটি নতুন বাহিনী গঠনের প্রয়াস পান। তিনি অত্যন্ত সন্তর্পণে কেবল ঐ খ্রিস্টানদেরকেই সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করেন যারা স্পেনের দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসী ছিল এবং কোনভাবেই উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহভাবাপন্ন খ্রিস্টানদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। উপরন্তু তারা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং সুখী-সমৃদ্ধিশালী জীবন যাপন করছিল যেন ঐ ঈসায়ীদেরকে সন্দেহযুক্ত মুসলমানদের তুলনায় তদানীন্তন সরকার অধিকতর বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করছিল। ঈসায়ী সৈনদের দ্বারা গঠিত ঐ বাহিনীটি গোটা স্পেনকে দখলে রাখতে এবং সর্বপ্রকার বিদ্রোহীদেরকে দমনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই সুলতান ইথিওপিয়া, মধ্য-আফ্রিকা, এশিয়া-মাইনর এবং এশীয় দেশসমূহের ক্রীতদাস এবং যুদ্ধবন্দীদেরকে ক্রয় করতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর আমলাদের মাধ্যমে দূর-দূরান্তের দেশসমূহ থেকে গোলাম ক্রয় করে আনাতে লাগলেন। ঐ সব ক্রীতদাস দ্বারা একটি বিরাট বাহিনী গড়ে উঠলো। এরা যেহেতু আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, তাই তাদেরকে আযমী বলা হতো এবং আপন মনিব হাকামের হিফাজত করা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করা ছাড়া আর কিছুই তারা বুঝতো না বা কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কারো সাথে সখ্যতা ও হৃদ্যতা স্থাপনও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই দাস-বাহিনীকে উচ্চ পর্যায়ের ফৌজী প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। হাকাম নিজে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের তত্ত্বাবধান করতেন। প্রকৃতপক্ষে হাকামই এরূপ ক্রীতদাসদের দ্বারা বাহিনী গঠন এবং তাদের সাহায্যে রাজত্ব রক্ষার এ ব্যবস্থার প্রবর্তক। মিসরের আইয়ুবী বংশের সুলতানরা তাঁরই অনুকরণ করেন। ক্রীতদাসদের বাহিনী মিসরে কায়েম হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরা রাজত্বের মালিক হয়েছিল।

সুলতান হাকাম যখন তাঁর খ্রিস্টান ও আযমী ফৌজের দ্বারা গঠিত বাহিনী গঠন করে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন, তখনই তাঁর উত্তরাঞ্চলীয় ঈসায়ী বিদ্রোহীদেরকে দমন এবং ফরাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সুযোগ আসে। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে তখনো শান্তি লিখিত ছিল না, তাই অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহসমূহ তখনো তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

মারীদার শাসক আসবাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ একটি ভুল বোঝাবুঝির দরুন বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। তাই বাধ্য হয়েই সুলতানকে সেদিকে মনোনিবেশ করতে হয়। আসবাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ছিলেন সুলতান হাকামের চাচাত ভাই এবং ভগ্নিপতি। শেষ পর্যন্ত আসবাহ্ অবরুদ্ধ এবং গ্রেফতার হন। সুলতানের বোন মধ্যস্থতা করে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটান। সুলতান হাকাম আসবাহকে মুক্তি দেন এবং তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তিনি তাঁকে রাজধানী কর্ডোভায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। এই বিদ্রোহ দমন করতে না করতেই এমন এক গুরুতর সঙ্কট দেখা দেয় যে, তাতে রাজ্য হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়।

মালিকীদের বিরোধিতা

১৯৮ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ৮১৩ - অগাস্ট ১৪ খ্রি.) মালিকীরা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইতোপূর্বে একবার তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার

যখন ঈসায়ী ও আযমী বাহিনী তৈরি হলো, তখন পুনরায় তারা সুলতানের বিরুদ্ধে ফতওয়াবাজী শুরু করে দিল। তারা আযমীদের অস্তিত্বকে কর্ডোভার জন্যে একটি অভিশাপ বলে আখ্যায়িত করে। বিগত বিদ্রোহী কাযী ইয়াহ্ইয়া ছিলেন সর্বাগ্রে। স্পেনবাসীরা তাঁর বেজায় ভক্ত ছিল এবং তারা তাঁকে একজন কামিল ওলী বলে জ্ঞান করতো। এজন্যে হাকাম তাঁকে অভিযুক্ত করেন নি। তাঁর প্রত্যেকটি রাজদ্রোহিতামূলক আচরণকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এবারও তাঁরই মাধ্যমে আলিম মহলে এবং তাঁদের ভক্তদের মধ্যে ঘৃণার ভাব ছড়িয়ে পড়ে। কর্ডোভাবাসীরা এতই বিরূপ হয়ে ওঠে যে, তারা একাকী কোন আযমীকে পেলে তাকে খুন করতো। এজন্যে কখনো একাকী বের হতো না। তারা কয়েকজন একত্রিত হয়েই শহরে বের হতো, নতুবা ফৌজী ব্যারাকেই অবস্থান করতো।

শাহী প্রাসাদে পর্যন্ত বিরোধিতার অগ্নিশিখা

একদা একজন আযমী এবং জনৈক মালিকী শান-মিস্ত্রীর মধ্যে বাদানুবাদ এবং হাতাহাতি হয়ে যায়। নগরবাসীরা বিশেষত নগরের দক্ষিণাংশে ওয়াদিউল কবীর নদীর ওপারের বসতির সকলেই ছিল মালিকী মাযহাবের অনুসারী। তারা সকলে একত্রিত হয়ে শাহী প্রাসাদে এসে হামলা চালালো এবং সুলতান হাকামের পদচ্যুতির ঘোষণা দিল। তাদের সাথে আরো অনেক গোলমেলে লোক এসে যোগ দেয়। এমনকি তারা রাজপ্রাসাদের ফটক ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়ে। প্রাসাদ রক্ষীদেরকে হত্যা করে এবং পিছু হটিয়ে দিয়ে তারা দ্বিতীয় দেউড়ী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। গোটা রাজপ্রাসাদ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সুলতান হাকাম তাঁর খিদমতগার ভৃত্য হাসানকে ডেকে বললেন, মাথায় মাখবার সুগন্ধি তেল নিয়ে এসো। খিদমতগার তেল এনে হাযির করলে সুলতান মাথায় তেল মাখলেন। হাসান সাহস করে জিজ্ঞেস করলো, এ সংকটময় মুহূর্তে আপনি সুগন্ধি তেল মাখছেন। অথচ এদিকে বিদ্রোহীরা সুলতানী প্রাসাদের ফটকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, তারা আমাদের লোকজনকে হত্যা করে এবং তাদেরকে মারধর করে এগিয়ে আসছে। জবাবে সুলতান বললেন, আহম্মক কোথাকার! আমি যদি মাথায় সুগন্ধি তেল না মাখি, তবে তাঁরা মাথা কাটার সময় কি করে বুঝতে পারবে যে এটা সুলতানেরই মাথা ?

সুলতান হাকামের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

ঐতিহাসিকরা এ কাহিনীটিকে এ কথার প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন যে, যে কোন বিব্রতকর পরিস্থিতিতেও তিনি ঘাবড়ে যেতেন না বা হতবুদ্ধি হতেন না।

তারপর সুলতান তাঁর চাচাত ভাই আসবাহকে ডেকে নির্দেশ দিলেন যে, যে কোন প্রকারে তুমি বিদ্রোহীদের এ অবরোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নাও এবং ওয়াদিউল কবীর নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে দক্ষিণের মহল্লায় আগুন ধরিয়ে দাও। আসবাহ্ সে নির্দেশ পালন করল। তিনি একটি গোপন দরজা দিয়ে নিজেকে বিদ্রোহীদের অবরোধ থেকে মুক্ত করে নিতে সমর্থ হন। তারপর কয়েকজন সঙ্গীসহ বের হয়ে কর্ডোভার উপকণ্ঠের এক সেনাছাউনিতে খবর পাঠালেন যে, তারা যেন তাৎক্ষণিকভাবে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দক্ষিণের মহল্লায় পৌঁছে যায়। তিনি নিজে সেখানে পৌঁছে একাধিক ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলেন।

রাজপ্রাসাদ অবরোধকারী বিদ্রোহীরা যখন তাদেরই বাসস্থান দক্ষিণের মহল্লা থেকে আগুনের লেলিহান শিখা এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠতে দেখলো তখন তারা নিজ বাড়িঘর রক্ষার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ সেদিকে ছুটলো। দেখতে দেখতে রাজপ্রাসাদ বিদ্রোহীমুক্ত হয়ে গেল। সুলতান হাকাম উদ্ভূত পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে একটুও বিলম্ব করলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর রক্ষীবাহিনীকে নিয়ে বিদ্রোহীদের পেছনে পেছনে রাজপ্রাসাদ থেকে বের হলেন। ওদিক থেকে আসবাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আর এদিক থেকে সুলতান হাকাম একযোগে বিদ্রোহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে বিদ্রোহীদের অনেকেই বেঘোরে প্রাণ দিল। তারপর সুলতান হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করে বিদ্রোহীদেরকে গ্রেফতার করার নির্দেশ জারি করলেন। স্বল্পক্ষণের মধ্যে ছাউনি থেকে সৈন্যরাও এসে পৌঁছে গেল এবং হাজার হাজার বিদ্রোহী তাদের হাতে গ্রেফতার হলো।

মালিকীদের দেশান্তরিতকরণ

এবার অনন্যোপায় হয়ে সুলতান হাকাম কর্ডোভা শহরে বসবাসকারী মালিকী মাযহাবের সমস্ত অনুসারীকে দেশান্তরিত করার ফরমান জারি করলেন। অবশ্য, এ ফরমানটি তাদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য ছিল– যারা জ্ঞানী-গুণী ছিলেন না। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ঈসায়ী নওমুসলিম। কাযী ইয়াহ্ইয়া এবং অন্যান্য আলিম-উলামাকে তাঁদের ইল্‌মী মর্যাদার কারণে ক্ষমা করে দেয়া হলো, যদিও তাঁরাই ছিলেন হাঙ্গামার মূল উৎস। সুলতান হাকাম তাঁদের ভক্ত-অনুরক্তদেরকে দেশান্তরিত করে তাঁদের শক্তি চূর্ণ করে দেয়াকেই যথেষ্ট বিবেচনা করলেন। তাঁর নিকট এঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি থেকে নিজেদের উপকৃত হওয়াই অধিকতর বিজ্ঞজনোচিত বলে মনে হলো। এ কথা জেনে বিস্মিত হতে হয় যে, ঐ কাযী ইয়াহ্ইয়াই মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সুলতান হাকামের বিশিষ্ট উপদেষ্টা এবং তাঁর মুসাহেব হয়েছিলেন। মালিকীদের দেশান্তরিত করার নির্দেশটি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো। এরা যখন স্পেনের উপকূলে এসে পৌঁছল, তখন তাঁদের মধ্যকার আট হাজার যাদের সাথে তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনও ছিল– মরক্কো যেতে উদ্যোগী হলো, মরক্কোর শাসক ইদরীস তাদের আগমনকে এই ভেবে স্বাগত জানান যে, এবার তাঁর রাজধানী ফয়েয শহর বা তাবখীরের জনসংখ্যা ও জৌলুস বৃদ্ধি পাবে। তারা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সেখানে গিয়ে আবাদ হলো। পনের হাজার মালিকী জাহাজে সওয়ার হয়ে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে উপনীত হলো। তাঁরা সে শহরটি অধিকার করে নিল। অবশেষে তারা সেখান থেকেও বহিষ্কৃত হয়ে অবশেষে তিকরীত দ্বীপে পৌঁছে সে দ্বীপটি দখল করে নেয়। সেখানে তারা নিজেদের রাজত্ব গড়ে তোলে এবং দীর্ঘ এক শতাব্দীকাল ধরে সেখানে তাদের বংশধরদের রাজত্ব স্থায়ী হয়। এ পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

এর অব্যবহিত পরেই হায্‌ম ইব্‌ন ওহাব বাজা নামক স্থানে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন। পরিণামে হাযম সুলতানী বাহিনীর হাতে পরাস্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সুলতান তাকে ক্ষমা করে দেন। এখন একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাজ্যের অবস্থা এখনো আশঙ্কামুক্ত নয়। বিদ্রোহের জীবাণু বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

ফ্রান্স আক্রমণ

সুলতান হাকামের সিংহাসন আরোহণের পর প্রায় কুড়ি বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। এ কুড়িটি বছরই তাঁকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং ঈসায়ীদের বহিরাগত হামলার মুকাবিলা করেই কাটাতে হয়। ঈসায়ীদের ওপর আক্রমণ করার সুযোগ তাঁর এতকাল হয়ে ওঠেনি। এখন রাজ্যের অবস্থা অনেকটা শান্ত দেখে হাকাম একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী তৈরি করলেন এবং তাঁর হাজিব আবদুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে তাদেরকে উত্তরে ঈসায়ীদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। হাজিব আবদুল করীম ইলাস্ট্রিয়াস রাজ্যের বশ্যতা ও আনুগত্য প্রকাশকেই যথেষ্ট বিবেচনা করে পিরেনীজ পর্বত অতিক্রম করে সরাসরি ফ্রান্সে গিয়ে উপনীত হলেন এবং সেখানে লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ চালালেন। এ অভিযানটি ফ্রান্সের দিকে পরিচালিত হয় ২০০ হিজরীতে (৮১৫ খ্রি)। ২০৩ হিজরী (৮১৮-১৯ খ্রি.) পর্যন্ত আবদুল করীম ফ্রান্স দেশে তাঁর যুদ্ধবিগ্রহ অব্যাহত রাখেন। সুলতান হাকাম ও তাঁর সেনাপতিদের ভুল ছিল এই যে, তাঁরা কেবল ফরাসী সম্রাট শার্লিমেনকেই তাদের প্রতিপক্ষ ভেবেছেন এবং তাঁর রাজত্বের সীমানায় অবস্থিত শহর বন্দরগুলোই জয় করছিলেন, পিরেজীন পর্বত থেকে দক্ষিণ পশ্চিমের সমভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত গথিক মার্চ রাজ্যকে তাঁরা হিসাবের মধ্যেই রাখেননি। এ জাতীয় ক্ষুদ্র খ্রিস্টান রাজ্যগুলোকে না নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছেন আর না সেগুলোর আয়তন হ্রাস করতে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা শুধু এতটুকুতেই সন্তুষ্ট রয়েছেন যে, এ ঈসায়ী রাজ্যগুলো আমাদের আনুগত্য করার কথা স্বীকার করে যাবে আর সেখানকার ঈসায়ী অধিবাসীদের উপর তারাই রাজত্ব করবে। ফ্রান্সের উপর তাঁরা এজন্যে আক্রমণ করতেন যে, ঐ রাজ্যের যদি পতন ঘটে, তবে আর কোন সঙ্কটের কারণ থাকবে না, আর ঐ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈসায়ী রাজ্য ফ্রান্সের সম্রাটের সাথে যোগসাজশ করে আমাদের জন্যে কোন সমস্যার সৃষ্টির সুযোগ পাবে না। কিন্তু সুলতান হাকাম যদি ঐ দু'টি সীমান্তবর্তী পার্বত্য রাজ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে পিরেনীজ পর্বতে সশস্ত্র ফৌজী প্রহরা মোতায়েন করতেন এবং সেখানে রীতিমত শক্তিশালী ফাঁড়িসমূহ নির্মাণ করতেন তা হলে ভবিষ্যতের জন্যে স্পেন রাজ্যটি সমস্ত সঙ্কট থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে যেত। এভাবে হয়তো কোন সময় ফ্রান্স এবং ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যও মুসলমানরা স্থায়িভাবে জয় করে নিতে পারতো। ঐ পার্বত্য সীমান্তবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের যে ক্ষয়ক্ষতি সময় সময় করেছে, তার বর্ণনা পরে আসছে।

সুলতান হাকামেরই শাসনামলে ইলাস্ট্রিয়াসের জনৈক পাদ্রী ঐ রাজ্যে এবং জালীকিয়া প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমানার এক জঙ্গলে সেন্ট জেম্স প্রেরিতের কবর রয়েছে। ফেরেশতারা নাকি স্বপ্নে তাকে এ কবরের সন্ধান দিয়েছেন। ইলাস্ট্রিয়াসের রাজা সেমতে ওখানে একটি গির্জা নির্মাণ করে দেন যা কেবল ইলাস্ট্রিয়াস এবং জালীকিয়ারই নয়, ইউরোপের দূর-দূরান্তের তীর্থযাত্রীরা পর্যন্ত দলে দলে অত্যন্ত পুণ্যজ্ঞানে সে কবর যিয়ারত করতে আসতেন। ক্রমে ক্রমে সেখানে বিপুল জনপদ গড়ে ওঠে। দেখতে দেখতে তা ঈস্টার ইয়াস রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। ভৌগোলিক অবস্থানগত গুরুত্বের জন্যে গোটা জালীকিয়া প্রদেশও যেন তার আওতাধীনে চলে আসে।

সিপাহ্সালার আবদুল করীম কয়েক বছর পর ২০৩ হিজরীতে (৮১৮-১৯ খ্রি.) নিরাপদে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার নিয়ে ফ্রান্স থেকে স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর অভিযানটি অত্যন্ত সফল অভিযান বলে গণ্য হয় এ জন্যে যে, ফরাসীদেরকে তাঁদের ঔদ্ধত্যের উচিত শিক্ষাই দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ইলাস্ট্রিয়াস এবং গথিক মার্চ রাজ্যের নাম-নিশানা মুছে ফেলার দিকে তাঁরা একটুও মনোযোগী হলেন না বরং উল্টো ঐ দুটো ঈসায়ী রাজ্যের অস্তিত্বকে এজন্যে বেশ উপাদেয় বলেই গণ্য করা হলো যে, মুসলমানরা যেখানে গিয়ে বসত করতে পর্যন্ত রাযী নয়, সেখানে যে তাঁদের মাধ্যমে হুকুমত চালু রয়েছে এটাই বড় কথা। এমন কি ফরাসী দেশে পর্যন্ত কোন মুসলমান ও আরব সর্দার সম্মত হতেন না। এ জন্যেই মুসলমানরা বার বার ফ্রান্স জয় করলেও তার শীতল আবহাওয়ার জন্যে মুসলমানরা তার মূল্য অনুধাবন করেন নি। সেখান থেকে গনীমতের মাল লাভ এবং তাদের নিকট থেকে খারাজ বা রাজস্ব উশুল করাকেই তাঁরা যথেষ্ট বিবেচনা করতেন। কোন আরব বংশোদ্ভূত সর্দারকে যখন নার্বুন, জালীকিয়া বা পিরেনীজ পর্বত সন্নিহিত শীতল এলাকায় আমিল নিযুক্ত করে পাঠানো হতো, তখন তিনি তাতে মনঃক্ষুণ্নই হতেন। অপর পক্ষে, দক্ষিণের উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ ও সমভূমি এলাকায় বসবাসের সুযোগ পেলে বা তার আমিল নিযুক্ত হতে পারলে তাঁরা একে সৌভাগ্য বলেই গণ্য করতেন।

দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি

২০৩ হিজরীর (৮১৮-১৯ খ্রি.) পরে স্পেন দেশে হাকামের জন্যে শান্তি যুগের সূচনা হয়। কেননা, তখন দেশে না ছিল কোন বিদ্রোহ আর না ছিল কোন ঈসায়ী বহিরাগত হামলার মুকাবিলার ব্যাপার। আর কোন বহিরাক্রমণের আশঙ্কাও তখন ছিল না। কিন্তু ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এবং ব্যস্ততাপূর্ণ রাজত্বকালই ছিল হাকামের ভাগ্যলিপি। তাই সকল বিদ্রোহের যখন অবসান হলো, তখন স্বয়ং প্রকৃতি তাঁর প্রতি বিরূপ হলো এবং রাজ্যব্যাপী খরা ও দুর্ভিক্ষের হামলা হলো। এ দুর্ভিক্ষ ছিল বড় আকারের, যার ফলে দেশে চুরি-ডাকাতির প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। হাকাম এ যাবত যেরূপ দৃঢ়চেতা ও সাহসী বলে সর্বপরিস্থিতিতে নিজের পরিচয় দিয়ে আসছিলেন, এ মহাদুর্ভিক্ষের সময়ও তিনি সেরূপ সাহসী চরিত্রের পরিচয়ই দিলেন। তিনি মোটেই ভেঙে বা মুষড়ে পড়লেন না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের জন্যে প্রতিটি শহর-জনপদে লঙরখানার ব্যবস্থা করলেন। বাইরে থেকে শস্য আমদানীর ব্যবস্থা করলেন। স্থানে স্থানে পথঘাট ও জনপদের হিফাযতের জন্যে অতিরিক্ত প্রহরা পুলিশের ব্যবস্থা করলেন। এ অবস্থায় যেখানেই তিনি কোন অরাজকতার সংবাদ পান সেখানেই সসৈন্য গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শান্তি স্থাপন করেন। মোটকথা, তাঁর প্রজাকুলের দুর্ভিক্ষের অনটনের সময় তাদের এমনি সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন যে, সর্বশ্রেণীর নাগরিক তাঁকে অন্তর থেকে ভালবাসতে থাকে এবং এর আগে মৌলভী বা মৌলভী মেযাজের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ছড়িয়েছিলেন, তা দূরীভূত হয়ে যায়। ইতিপূর্বে যারা স্বাধীনচেতা চরিত্রের জন্যে তাঁর কঠোর সমালোচনা করতেন, এবার তাঁরাও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

সুলতান হাকামের ওফাত ও সন্তান-সন্ততি

সুলতান হাকামকে একজন রক্তপিপাসু শাসক বলে অনেকেই তাঁর সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে আসল তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় যে, যদিও তিনি অনেক লোককে হত্যা করিয়েছেন, কিন্তু তারা সত্যি সত্যি হত্যাযোগ্য ছিলেন, নাকি কেবল মনের স্ফূর্তির জন্যে তিনি এ হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটিয়েছিলেন।

সুলতান হাকাম ২০৬ হিজরীর ২৫ যিলকদ (এপ্রিল ৮২২ খ্রি.) বৃহস্পতিবার ৫২ বছর কয়েক মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি কুড়িজন পুত্রসন্তান এবং সমসংখ্যক কন্যা সন্তান রেখে যান। সুলতান হাকামের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আবদুর রহমান পিতার স্থলাভিষিক্তরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

হাকামের চরিত্র পর্যালোচনা

সুলতান হাকাম ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, বদান্য এবং পরিণামদর্শী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন প্রতারক ও ষড়যন্ত্রকারীদের শত্রু এবং আপন বন্ধুদের প্রতি অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ও সমব্যথী। তিনি আলিম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের অত্যন্ত গুণগ্রাহী এবং কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্থির বুদ্ধির লোক। যেখানেই ক্ষমার দ্বারা কার্যসিদ্ধি হবে বলে মনে করতেন সেখানেই তিনি অকুণ্ঠচিত্তে অপরাধীকে ক্ষমা করতেন। তিনি স্পেনের একজন মহান ও অতি উঁচুদরের শাসক ছিলেন। সুলতান হাকাম যে কীরূপ ধর্মপ্রাণ ও আল্লাহ্ ওয়ালা চরিত্রের লোক ছিলেন তার প্রমাণ মিলে এ ঘটনা থেকে যে, একদা তিনি কোন এক ভৃত্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। এমন সময় যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ নামক একজন আলিমের সেখানে আবির্ভাব ঘটে। তিনি সুলতানকে লক্ষ্য করে বললেন, মালিক ইব্ন আনাস (র) মরফু' সনদে রিওয়ায়েত করেন যে, 'যে ব্যক্তি শাস্তিদানের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আপন ক্রোধ সংবরণ করবে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার অন্তরকে অভয় দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন।' তাঁর কথা শেষ হওয়া মাত্র বাদশাহর ক্রোধ প্রশমিত হলো এবং তিনি ভৃত্যটিকে ক্ষমা করে দিলেন।

সুলতান হাকামের ২৭ বছরব্যাপী রাজত্বকালের পুরোটাই অতিবাহিত হয় হাঙ্গামা আর অশান্তির মধ্যে। এ অশান্তি ও হাঙ্গামা তিনি নিজে সৃষ্টি করেন নি বরং এগুলো ছিল স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত। এ সময় যদি তাঁর চাইতে কম ধৈর্যের কোন ব্যক্তি স্পেনের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই স্পেনে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটতো আর তাতে সেখানকার মুসলমানদের পরিণাম হতো ভয়াবহ। স্বয়ং আল্লাহ্ সুলতান হাকামের পরীক্ষা নিয়েছেন এবং সে পরীক্ষায় বাহ্যত তিনি সাফল্যের সাথেই উত্তীর্ণ হয়েছেন।

আবদুর রহমান ছানী

সুলতান আবদুর রহমান ছানী বা দ্বিতীয় আবদুর রহমান ১৭৬ হিজরীর শাবান (ডিসেম্বর ৭৯২ খ্রি) মাসে টলেডোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৬ হিজরীতে (৮২১-২২ খ্রি.) পিতা হাকামের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময়

বাহ্যত শান্তি বিরাজমান ছিল। অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সকল ফিতনা তখন দমন করা হয়েছে। কিন্তু এ সুলতানের সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে তাঁকে তাঁর নিজ বংশের লোকদের বিদ্রোহের মুকাবিলা করতে হয়।

খান্দানের লোকদের বিরোধিতা

উপরেই বর্ণিত হয়েছে, সুলতান হাকামের চাচা আবদুল্লাহ্ স্পেন থেকে মরক্কোর তাবখীরে বসবাস শুরু করেন। আবদুল্লাহ্ তখন বৃদ্ধ এবং দুর্বল। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান হাকামের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি তাবখীর থেকে রওয়ানা হন এবং স্পেনে উপনীত হয়ে নিজেকে স্পেনের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। আবদুল্লাহ্র তিন পুত্র তখন স্পেনে ছিলেন এবং তাঁরা তিনজনই তিনটি প্রদেশের গভর্নররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আবদুল্লাহ্র আশা ছিল, তাঁর পুত্ররা নিশ্চয়ই তাঁর বাদশাহ্ হওয়াকে সমর্থন জানাবেন, কিন্তু এটা ছিল আবদুল্লাহ্র নির্বুদ্ধিতা। বলা চলে, বুড়ো বয়সে তাঁকে ভীমরতিতে ধরেছিল। শাহী ফৌজ কাল বিলম্ব না করে তাঁর মুকাবিলা করে এবং তিনি পরাজিত হয়ে বালানসিয়ায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্ররা পিতার সমর্থন ও সহযোগিতা করে বিদ্রোহে তাঁর সাথে শামিল হওয়ার পরিবর্তে আবদুর রহমান ছানীর প্রতিই তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করে জ্ঞান-বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতার পরিচয় দেন। তাঁরা তাদের পিতাকে এ খামখেয়ালী থেকে নিবৃত্ত থাকার পরামর্শ দেন এবং বিদ্রোহের দাবানল ছড়াতে বারণ করেন। ফলে তিনি তাঁর পৌত্র আবদুর রহমান ছানীর কাছে ক্ষমার আবেদন জানান। আবদুর রহমান যে কেবল সে দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন তাই নয়, বরং আবদুল্লাহ্কে তিনি মারসিয়া প্রদেশের ওয়ালী বা গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করলেন। সেখানে তিনি তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত দুই-তিন বছর ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ আলী ইব্ন নাফির সমাদর

তাঁর সিংহাসনে আরোহণের প্রথম বছরেই অর্থাৎ ২০৬ হিজরীতে (৮২১-২২ খ্রি.) ইবরাহীম মুসেলীর শিষ্য আলী ইব্ন নাফি ওরফে ফারিয়ার স্পেনে পদার্পণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতের উস্তাদ। প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কোন কোন পাশ্চাত্য বিদ্যায়ও তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। ইরাক ও সিরিয়ায় তিনি তাঁর যোগ্যতানুসারে সম্মান পাননি শুনে সুলতান হাকাম তাঁকে স্পেন দেশে তলব করেন।

কিন্তু তাঁর স্পেন পৌঁছবার পূর্বেই সুলতান হাকাম ইন্তিকাল করেন। সুলতান আবদুর রহমান যখন উক্ত দার্শনিক সঙ্গীতজ্ঞের স্পেনে পৌঁছার সংবাদ অবগত হলেন তখন তিনি প্রত্যেকটি শহরের ওয়ালীর কাছে এ মর্মে ফরমান পাঠালেন যে, আলী ইব্ন নাফির কর্ডোভা পৌঁছবার পথে যে সব শহর পড়বে সেগুলোর আমিলরা যেন তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা প্রদান করেন এবং উপঢৌকনস্বরূপ তাঁকে ক্রীতদাস ও অশ্বাদি প্রদান করেন। মোটকথা, অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে আলী ইব্ন নাফি কর্ডোভায় উপনীত হন এবং বাদশাহর বিশিষ্ট মুসাহেব ও পারিষদের উচ্চ মর্যাদায় আসীন হন।

আলী ইব্ন নাফির সামাজিক সংস্কারসমূহ

আলী ইব্ন নাফি স্পেনে অনেক বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সমাজ সংস্কারমূলক কাজ করেন। তিনি সৌন্দর্য ও প্রসাধনের অনেক চমৎকার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যা সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁরই উদ্যোগে কর্ডোভায় পানির নল লাগানোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। শীঘ্রই এ পদ্ধতি স্পেনের অন্যান্য শহরেও প্রবর্তিত হয়। নতুন নতুন সুস্বাদু, পুষ্টিকর উপাদেয় খাবার এবং মনোরম পোশাক-পরিচ্ছদ তাঁরই আবিষ্কার। মোটকথা, ঐ একটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত আবিষ্কারসমূহ কেবল স্পেন দেশেই নয়, গোটা ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করে। ছুরি কাঁটা বা কাঁটা চামচ দিয়ে আহার্য গ্রহণের পদ্ধতিও তিনিই আবিষ্কার করেন। আলী ইব্ন নাফি সুলতান আবদুর রহমান ছানীর মেযাজ-মর্জি এবং রুচি সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। সুলতানও তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। কিন্তু তিনি কোনদিন কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে সামান্যতম হস্তক্ষেপও করেন নি বরং নিজের পূর্ণ মেধাকে তিনি সমাজ সংস্কারমূলক কাজেই সর্বদা নিয়োজিত রাখেন। এজন্যে গোটা স্পেনেই তিনি সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর কোন শত্রু ছিল না। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। স্পেনবাসীরা যেখানে তাঁর কাছ থেকে পেল খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও গৃহ-সরঞ্জামাদি সংক্রান্ত সুন্দর সুন্দর শিক্ষা, সেখানে তারা তাঁরই কাছে পেল সঙ্গীতের অনুপ্রেরণা। অন্য কথায় বলা যায়, আলী ইব্ন নাফি স্পেন দেশে পৌঁছে সেখানকার সৈনিক পেশার মুসলমানদেরকে বিলাসপ্রিয় ও শিল্পকলায় অভ্যস্ত, সূক্ষ্ম মেযাজ সম্পন্ন করে তোলার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

স্পেনে মালিকী মাযহাবের প্রসার

কাযী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া মালিকীর কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে। ঐ কাযী সাহেবেরই নেতৃত্বে সুলতান হাকামের শাসনামলে কর্ডোভায় একটি মারাত্মক বিদ্রোহ দেখা দেয়, যার ফলে কর্ডাভার মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ নদীর অপর তীরের জনপদের সমস্ত অধিবাসী দেশান্তরিত হন। বিশ-পঁচিশ হাজার লোকের একই সময়ে দেশান্তরিত হওয়ায় এ এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উক্ত কাযী সাহেব সুলতান হাকামের মুসাহেব ও উপদেষ্টাদের অন্তর্ভুক্ত হন। এবার সুলতান আবদুর রহমান সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি এই নতুন সুলতানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি সুলতান আবদুর রহমানের আমলেই কাযীউল কুযাত এবং শায়খুল ইসলাম পদের প্রস্তাব পান, কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তিনি কাযীউল কুযাতেরও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলে গণ্য হন। জনসাধারণ ছিল তাঁর বেজায় ভক্ত। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর ফায়সালাই ছিল চূড়ান্ত। কাযী সাহেব ছিলেন একজন বড় গ্রন্থকার। তিনি ছিলেন ইমাম মালিকের একজন বিশিষ্ট শাগরিদ। দীর্ঘ কয়েক বছর পর্যন্ত ইমাম মালিক (র)-এর খিদমতে অবস্থান করে ইল্মে দীনের শিক্ষা হাসিল করেছিলেন। এবার সুলতান আবদুর রহমানের আমলে এসে তিনি তাঁর কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে একটি বিরাট পরিবর্তন সাধন করেন। এখন থেকে তিনি তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাচ্ছিলেন। বিচার বিভাগে তিনি কারো জন্যে সুপারিশ করলে তা কখনো অগ্রাহ্য হতো না। তাই কোন আলিম

কোন শহর বা প্রদেশের কাযীপদ প্রার্থী হলে আগে মালিকী মাযহাব গ্রহণ করে তারপর তাঁর কাছে সুপারিশের জন্যে আসতেন। এভাবে কাযী ইয়াহ্ইয়ার চোখে মর্যাদার অধিকারী হয়ে এবং তাঁর স্নেহভাজন হয়ে অনেকেই কাযী হলেন। দেখা গেল, এভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে এ কার্যপদ্ধতির ফলে গোটা স্পেনেই মালিকী মাযহারের অনুসারী হয়ে উঠলো। সুলতান আবদুর রহমান ছানী তাঁর পিতার রাজত্বকালেই রাজকার্যে প্রবেশ করেন। সুতরাং তিনি দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত ও অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চলতেন যেন মৌলভী বা মৌলভী গোষ্ঠের লোকদের তাঁর বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপাবার কোন সুযোগ না থাকে।

বিদ্রোহ দমন

আবদুর রহমানের সিংহাসনে আরোহণকালে স্পেনের গোটা উত্তরাঞ্চল যাতে বিস্কে উপসাগরের দক্ষিণ উপকূল এবং পিরেনীজ পর্বতের দক্ষিণ প্রান্ত শামিল ছিল এবং তা ঈসায়ীদেরই অধিকারে ছিল। কিন্তু এ সব এলাকার ঈসায়ী রঈসরা মুসলিম খিলাফতের করদরাজ্য ছিল এবং তারা কর্ডোভা দরবারে আধিপত্য স্বীকার করতো। কর্ডোভা দরবারও স্পেনের উত্তরাঞ্চল থেকে এর চাইতে বেশি আর কিছুই প্রত্যাশা করতো না। বার্সেলোনা অঞ্চলও বহু পূর্বেই খ্রিস্টান অধিকারে চলে গিয়েছিল। গথিক মার্চ রাজ্যের পক্ষ থেকে সেখানে একজন শাসক তাদের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত থাকতেন। অনুরূপ স্পেনের পূর্ব ও উত্তর উপকূলের একাংশও ঈসায়ী শাসনাধীনে ছিল। ইলাস্ট্রিয়াস রাজ্য লিওন ও জালীকিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। তার নতুন শহর বাস্টিল বা কাস্তিলা তার রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। মুসলমানরা এ উত্তরাঞ্চলীয় খ্রিস্টান রাজ্যগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তাদের শক্তি ও দাপটের দ্বারা কেবল এজন্যে এ খ্রিস্টান রাজ্যগুলোকে সন্ত্রস্ত রাখতে চাইতেন যেন এরা তাদের সমধর্মীয় ফ্রান্সের রাজা বা অন্য কারো দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে এবং তাদের সাথে যোগসাজশ করে স্পেনে বহিরাক্রমণের পথ করে না দেয়। এ উদ্দেশ্যেই মাঝে মাঝে তাঁরা বিস্কে উপসাগর পার হয়ে বা পিরেনীজ পর্বত ডিঙিয়ে ফ্রান্স আক্রমণ করতেন যেন উত্তরাঞ্চলের ঈসায়ীরা স্পেনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহস দেখাতে না পারে। স্পেনের উত্তর সীমান্তবর্তী শহর ছিল আলবীরা। কর্ডোভা দরবারের পক্ষ থেকে এ শহরে রীতিমত আমিল নিযুক্ত থাকতেন।

উক্ত আলবীরার সীমান্তবর্তী আমিল সেখানকার প্রজাসাধারণের উপর নিপীড়ন চালান এবং ঈসায়ীদের সাথে যোগসাজশ করেন। এ অপরাধে সুলতান হাকাম তাকে হত্যা করিয়ে তার যাবতীয় ধন-সম্পদ রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করেন। এর মাত্র কিছুদিন পরেই সুলতান হাকামের ইন্তিকাল হয়। নতুন সুলতানের অভিষেককালে সীমান্তবর্তী ঈসায়ীরা একটা সুযোগ পেল। তারা আলবীরার ফৌজ ও প্রজাসাধারণকে উস্কানি দিয়ে কর্ডোভায় পাঠালো এই বলে যে, নিহত আমিলের বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ যেন আলবীরায় ফেরত পাঠানো হয়। কেননা, আসলে এ সম্পদ জনগণেরই। নিহত আমিল তা বলপূর্বক জনগণের নিকট থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। এ প্রতিবাদী লোকজন ২০৭ হিজরীতে (৮২২-২৩ খ্রি.) কর্ডোভাতে উপনীত

হয়ে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ঔদ্ধত্যপূর্ণ হাঙ্গামা সৃষ্টি করে। তাদের শায়েস্তা করার জন্যে সুলতানের রক্ষী বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হলো। উভয়পক্ষে রীতিমত সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষে অনেকে নিহত হয় এবং অনেকে পালিয়ে যায়। ফলে সীমান্তবর্তী খ্রিস্টানদের হাতে গোলযোগ সৃষ্টির নতুন সুযোগ আসে।

ঐ বছরই অর্থাৎ ২০৭ হিজরীতে (৮২২-২৩ খ্রি.) তাদমীর অঞ্চলে আরবদের মধ্যকার মুদার ও ইয়ামানী গোত্রসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এ আত্মকলহ দূর করার উদ্দেশ্যে শাহী ফৌজ পাঠান হলো। ফলে আত্মকলহ থেমে যায়। কিন্তু শাহী ফৌজ চলে আসতেই উক্ত গোত্রগুলো পুনরায় আত্মকলহে লিপ্ত হয়। আবারও শাহী ফৌজ সেখানে যায়। এভাবে দীর্ঘ সাতটি বছর এ আত্মকলহে অতিবাহিত হয় এবং অভ্যন্তরে আরব গোত্রসমূহ আরব জাহিলিয়াতের প্রবণতা ও চরিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

২০৮ হিজরীতে (৮২৩-২৪ খ্রি.) ঈস্টার ইয়াস অথবা জালীকিয়া রাজ্য রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় প্রবেশ করে শহর-বন্দরে লুটপাট চালায়। এ সংবাদ অবগত হয়ে সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি আবদুল করীম ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন মুগীছকে সসৈন্য সেদিকে প্রেরণ করলেন। উক্ত বীর সেনাপতি সেখানে উপনীত হয়ে ২০৮ হিজরীর জুমাদাল উখরা (অক্টোবর ৮২৩ খ্রি) মাসে ঈসায়ীদেরকে উপর্যুপরি যুদ্ধে পরাস্ত করে পার্বত্য এলাকায় পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। আবদুল করীম ঈসায়ীদের সীমান্তবর্তী দুর্গসমূহকে ধূলিসাৎ করে ঈসায়ী শাসকদেরকে রাজস্ব আদায় এবং ভবিষ্যতে অনুগত থাকার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করেন। এ সকল অভিযান সমাপ্ত করে আবদুল করীম প্রত্যাবর্তন করা মাত্র পুনরায় এ বাহিনীকে উক্ত সেনাপতিরই নেতৃত্বে তাৎক্ষণিকভাবে বার্সেলোনা অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। কেননা, সেখান থেকে বিদ্রোহ ও যুদ্ধের প্রস্তুতির সংবাদ এসেছিল। শাহী ফৌজ বার্সেলোনা পৌঁছেই গোটা এলাকা জয় করে ঈসায়ী সৈন্যদেরকে পার্বত্য এলাকায় আত্মগোপন করতে বাধ্য করে। জালীকিয়াবাসীদের মতো তাদের নিকট থেকেও আনুগত্যের অঙ্গীকার আদায় করে সমস্ত বিজিত এলাকা তাদেরই হাতে প্রত্যর্পণ করা হয়।

কনসটান্টিনোপলের দূতের আগমন

২০৯ হিজরীতে (মে ৮২৪-২৫ খ্রি.) কনসটান্টিনোপলের রাজ দরবার থেকে দ্বিতীয় আবদুর রহমানের খিদমতে একটি কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করেন এবং স্পেনের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাগদাদ দরবার ইতিপূর্বেই ফ্রান্সের সম্রাটের সাথে সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছিলেন। মূল্যবান উপঢৌকনসামগ্রী রীতিমত ফরাসী দরবারে পৌঁছতো। বাগদাদ দরবার সবসময়ই স্পেন আক্রমণের জন্যে ফরাসীদেরকে উৎসাহিত করতো। কর্ডোভা দরবার তা সম্যক অবগত ছিল।

এদিকে বাগদাদ সর্বদাই কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের ওপর চড়াও হতো। তাই কনসটান্টিনোপল দরবার সর্বদাই নিজেকে সংকটাপন্ন বলে ভাবতো। এবার যখন তাঁরা

দেখলেন যে, স্পেনের সুলতান অত্যন্ত বীরপুরুষ এবং সেখানকার মুসলমানরাও অত্যন্ত শক্তিশালী বলে খ্যাত তখন তাঁরা কর্ডোভা দরবারকে তাঁদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করার প্রয়াস পেলেন। কর্ডোভা বাগদাদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন বিধায় স্পেনের সুলতানের অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কনসটান্টিনোপল সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়ার কথা। আবদুর রহমান তাঁর দূতকে পরম সমাদরে বরণ ও আপ্যায়িত করলেন। দূতও সুলতানের দরবারে বহুমূল্য উপঢৌকনাদি পেশ করলেন এবং কনসটান্টিনোপল সম্রাটের বিপুল শক্তি-সামর্থ্য এবং তাঁর সামরিক বাহিনীর প্রচণ্ড শক্তির কথা অতিশয়োক্তির সাথে বর্ণনা করে তাঁকে এ মর্মে আশ্বস্ত করেন যে, আপনি যদি আমাদের কনসটান্টিনোপল সম্রাটের সাথে সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ হন তাহলে অনায়াসেই আপনার পিতৃরাজ্য সিরিয়া, আরব ও ইরাক প্রভৃতি রাষ্ট্রের খিলাফত আব্বাসীয়দের নিকট থেকে পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হবেন। আবদুর রহমান এসময় অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও পরিণামদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি শুধু এতটুকু আশ্বাস দিয়েই ক্ষান্ত হন যে, যদি আমার দেশের পরিস্থিতি শান্ত হয় তাহলে আমি আপনাদের সম্রাটকে সাহায্য করার চেষ্টা করবো। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি আমার দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে খুবই ব্যস্ত আছি। তারপর তিনি সম্রাটের উপঢৌকনের জবাবে বহুমূল্য উপঢৌকনসামগ্রী দূতের সাথে দিয়ে তাঁর নিজ দূত ইয়াহ্ইয়া গাযালকে সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করলেন।

আমীর আবদুর রহমানের ইসলামী চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ

ইয়াহ্ইয়া আল-গাযাল কনসটান্টিনোপলে পদার্পণ করে সর্বপ্রথম সেখানকার পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তারপর সম্রাটকে তাঁর সুলতানের বন্ধুত্বের পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সুলতান আবদুর রহমান একজন অমুসলিম ঈসায়ী সম্রাটকে তাঁর শত্রু আব্বাসীয় খলীফা যেহেতু মুসলমান তাই তাঁর বিরুদ্ধে অর্থ বা সৈন্য সাহায্য দেয়া সমীচীন বোধ করেননি। তাই তিনি মৌখিক আশ্বাস দিয়েই ক্ষান্ত হন। নতুবা আবদুর রহমানের সম্রাটের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁকে সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। সম্রাট তাঁর কাছে অর্থ ও সৈন্য সাহায্যই চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। আবদুর রহমানের পক্ষে এক হাজার বা কয়েক হাজার সৈন্য এবং এক লক্ষ বা কয়েক লক্ষ দীনার সাহায্য সম্রাটের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া ছিল একটি মামুলী ব্যাপার। এতে তাঁর সৈন্যবাহিনী বা রাজকোষের ওপর তেমন কোন প্রভাবই পড়তো না। কিন্তু আবদুর রহমানের ইসলামী চেতনাবোধ তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে।

পর্তুগীজদের বিদ্রোহ

আজকাল পর্তুগাল বলে পরিচিত স্পেনের দক্ষিণ পশ্চিমের এলাকার খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকা সেখানকার মারীদাবাসীদের নেতৃত্বে সেই বছর বিদ্রোহ করে। এ ফিতনা দমনের জন্যে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্কে প্রেরণ করা হয়। ভীষণ যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা পরাস্ত হয়। শহরের বেষ্টনী প্রাচীর ধূলিসাৎ করে ২১০ হিজরীতে (মে ৮২৫ খ্রি-এপ্রিল '২৬ খ্রি) তিনি কর্ডোভায় ফিরে আসেন। কয়েকদিন পর বিদ্রোহীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উবায়দুল্লাহকে আবারও সেখানে যেতে হয়। এবারও বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।

এ বিদ্রোহের মূলে ছিল সেইসব পাদ্রী যারা জালীকিয়া এবং কিসতা থেকে ঐ এলাকায় গিয়ে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিচ্ছিল। কেননা উত্তরাঞ্চলীয়, বিশেষত জালীকিয়ার ঈসায়ীরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে যে, মুসলমানদের আত্মকলহ এবং তাদের মধ্যকার বিদ্রোহজনিত ব্যস্ততাই আমাদের উন্নতি ও সফলতার পথ প্রশস্ত করতে পারে। আর যতদিন পর্যন্ত আমরা দক্ষিণাঞ্চলে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে না পারবো, ততদিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ সমীচীন হবে না।

মারীদাবাসীদের ঔদ্ধত্যের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। কেননা, তারা বিদ্রোহী হয়ে তাদের আমিলকে শহর থেকে বের করে দেয়। তারা দু-দু'বার শাহী ফৌজের সাথে মুকাবিলা করে। তাই ২১০ হিজরীতে (মে ৮২৫ খ্রি-এপ্রিল '২৬ খ্রি) সুলতান আবদুর রহমান মারীদা শহরের ধ্বংসকৃত বেষ্টনী প্রাচীরের পাথর নদীতে নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন। সে শহরের আমিল যখন এ নির্দেশ কার্যকরী করতে উদ্যত হলেন, তখন শহরবাসীরা পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা আবারও শহর দখল করে নেয়। অগত্যা আমিলকে সেখান থেকে চলে যেতে হয়। শহরবাসীরা শহরের ভগ্নপ্রাচীরের পাথর দিয়ে পুনরায় প্রাচীর নির্মাণ করে এবং মুকাবিলার জন্যে মযবুত হয়ে বসে। শুনে অবাক হতে হয় যে, এ বিদ্রোহে কেবল ঈসায়ীরাই ছিল না, মুসলমানদের এক বিরাট অংশও তাতে শামিল ছিল এবং বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মাহমূদ ইব্‌ন আবদুল জব্বার নামক একজন মুসলিম সন্তানই। এ মুসলমানরা কেন ঈসায়ীদের প্ররোচনায় বিদ্রোহ করতে উদ্যত হতো, তার কারণ পরে বলা হচ্ছে। মোটকথা, ২১৭ হিজরী (৮৩২ খ্রি.) পর্যন্ত শাহী সিপাহ্‌সালার মারীদাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধলিপ্ত থাকেন কিন্তু কোন ফলোদয় হয়নি।

অবশেষে ২১৮ হিজরীতে (৮৩৩ খ্রি.) স্বয়ং সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান মারীদায় অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু এবারও শহর জয় না করেই কোন এক কারণে অবরোধ প্রত্যাহার করে তাঁকে কর্ডোভায় ফিরে যেতে হয়। ২২১ হিজরীতে (৮৩৬ খ্রি.) পুনরায় পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে হামলা করা হলো। দীর্ঘ সাতটি বছর পর্যন্ত মধ্য স্পেনের এ শহরটি স্বাধীন থাকার পর পুনরায় সুলতানের পদানত হলো। সুলতান সেখানে যথারীতি আমিল নিযুক্ত করলেন। মারীদাবাসীদের এ মারাত্মক বিদ্রোহের চাইতে বড় বিদ্রোহ স্পেনে ইতিপূর্বে আর দেখা দেয়নি। শহরবাসীদের কাছে চল্লিশ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্য মওজুদ ছিল। ইলাস্ট্রিয়াস এবং জালীকিয়া থেকে তাদের জন্য সর্বপ্রকার গোপন সাহায্য অহরহ পৌঁছে ছিল। অবশেষে ২২০ হিজরীতে (৮৩৫ খ্রি) যখন এ শহরটি বিজিত হলো এবং বিদ্রোহের অবসান ঘটলো তখন বিদ্রোহী নেতা মাহমূদ ইব্‌ন আবদুল জব্বার মারীদা থেকে সোজা ইলাস্ট্রিয়াসে গিয়ে হাযির হলো। সেখানে তাকে একটি দুর্গের দুর্গাধিপতি বানানো হয়। সেখানে সে পাঁচ বছরকাল জীবিত ছিল।

খ্রিস্টানদের পক্ষে মুসলমানদেরকে বিদ্রোহী করে তোলা দু'টি কারণে অত্যন্ত সহজ হয়েছিল। প্রথম কারণ হলো, স্পেনের সর্বত্র মুসলমানদের ঘরে খ্রিস্টান রমণীরা ছিল। মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার দিকে লক্ষ্য রেখে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বধূদেরকে তাদের

ধর্মত্যাগে বাধ্য করতেন না। উত্তরের মুসলিম বিদ্বেষী উগ্র খ্রিস্টান রাজ্যগুলো ছাড়া অবশিষ্ট সমগ্র স্পেনের খ্রিস্টানদের মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত সম্প্রীতি ও সহানুভূতির সম্পর্ক ছিল। ঐ সব ঈসায়ীর মাধ্যমে উত্তরের ঈসায়ীরা অনায়াসেই মুসলমানদের মধ্যে যে কোন চিন্তা-ধারার প্রসার ঘটাতে পারতো। একবার রটিয়ে দেয়া হলো যে, সুলতান আবদুর রহমান যাকাত ছাড়া অন্য যে কর ধার্য করেছেন তা হলো প্রজাদের সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর অবৈধভাবে কেড়ে নেয়ার জুলুমের সূচনা মাত্র। এটা ছিল এমনি এক প্রচারণা যার কারণে সর্বপ্রথম মুসলমানরা তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়। এ মামুলী বিষয়টা দানা বাঁধতে বাঁধতে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায় তা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

টলেডোতে বিদ্রোহ

মারীদার বিদ্রোহ যেহেতু শীঘ্রই প্রশমিত হওয়ার ছিল না এবং মুসলিম বিদ্রোহীদের বীরত্ব শাহী ফৌজের জন্যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করছিল, তাই দেশের অভ্যন্তরের বিদ্রোহীদের সাহস আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। অধিক সংখ্যক খ্রিস্টান অধিবাসী অধ্যুষিত টলেডো নগরীতে খ্রিস্টান এবং মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে হাশিম দার্রাব নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে সেখানকার আমিলকে বহিষ্কার করে এবং নিজেরা টলেডো নগরীতে মজবুত হয়ে বসে। প্রতিবেশী গথিক মার্চ রাজ্য এবং আশেপাশের লোকেরা হাশিম দার্রাবকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা পৌঁছাতে থাকে। দুষ্ট ও অনাচারী লোকেরা দলে দলে এসে টলেডোতে প্রবেশ করতে এবং বিদ্রোহী দলে ভিড়তে থাকে। টলেডো পূর্ব থেকেই একটা মজবুত এবং দুর্জয় নগরী ছিল। এবার হাশিম প্রতিরোধ সামগ্রী এবং বিপুল সৈন্যসংখ্যা দিয়ে নগরীটিকে আরো মজবুত, অজেয় ও অপ্রতিরোধ্য করে তুললো। তা দেখে সীমান্তবর্তী আমিল মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াসীমও হাশিমের বিদ্রোহী দলে ভিড়ে পড়লেন।

এদিকে সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান তাঁর পুত্র উমাইয়াকে একটি বিরাট বাহিনীসহ টলেডো অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। উমাইয়া চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু কোন ফলোদয় হলো না। শেষ পর্যন্ত উমাইয়া সসৈন্যে ফিরে এলেন। হাশিম টলেডো থেকে বের হয়ে শাহী ফৌজের পশ্চাদ্ধাবন করলো। শাহী ফৌজ একটি স্থানে ঘাপটি মেরে রইল এবং টলেডোবাসীরা নাগালের মধ্যে আসতেই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এ হামলায় টলেডোদের ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয়, কিন্তু তারা পালিয়ে টলেডো ফিরে যেতে সমর্থ হয়। তারা নগরীতে ফিরে নগরীর ফটক বন্ধ করে দেয়। বার বার এ নগরীটি অবরোধ করার জন্যে সৈন্য প্রেরিত হয়, কিন্তু নগরীটি অজেয়ই রয়ে যায়। একবার হাশিম টলেডো থেকে বের হয়ে শান্ত বারিয়্যায় লুটপাট চালায় এবং তা দখল করে নেয়। অবশেষে সুলতান আবদুর রহমান তাঁর ভাই ওয়ালীদকে ২২২ হিজরীতে (৮৩৬-৩৭ খ্রি) এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সাথে দিয়ে টলেডো অভিমুখে প্রেরণ করলেন। ওয়ালীদ টলেডোর চতুর্দিকে সৈন্য মোতায়েন করে সবদিক থেকে রসদ আসার পথ কড়াকড়িভাবে বন্ধ করে দেন। তিনি তাঁর প্রচেষ্টা অবিরাম চালিয়ে যান। ফলে টলেডোবাসীরা নিরুপায় হয়ে পড়ে। ২২৩ হিজরীতে (৮৩৭-৩৮ খ্রি)

ওয়ালীদ টলেডো পুনরুদ্ধার করেন। হাশিম দার্রাব যুদ্ধে নিহত হয়। মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসীম সেখান থেকে পালিয়ে সিবন শহরে চলে যায়। সেখানে সে বিদ্রোহীদেরকে সংগঠিত করে এবং কিছুদিন পর আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে টলেডো দখল করে নেয়।

২২৪ হিজরীতে (৮৩৯ খ্রি.) সুলতান আবদুর রহমান নিজে চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ টলেডো আক্রমণ করে তা পুনরুদ্ধার করেন এবং বিদ্রোহীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে সেখানে শান্তি স্থাপন করেন। সেখান থেকেই তিনি একদল সৈন্য সাথে দিয়ে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহকে আলবা ও কিলা নামক স্থানের দিকে রওয়ানা করেন। উবায়দুল্লাহ্ সেখানে পৌঁছে বিদ্রোহ উদ্যত ঈসায়ীদেরকে উপর্যুপরি কয়েকটি যুদ্ধে পরাস্ত করে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন।

উক্ত বাহিনী উত্তর সীমান্তে তাদের কাজ শেষ করতে না করতেই ফরাসীরা মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সুযোগে সীমান্তে হামলা চালায়। তারা দীর্ঘকাল ধরে স্পেন সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে যাচ্ছিল এবং সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। এবার তারা সীমান্তবর্তী শহর সালেমে প্রবেশ করে লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। উবায়দুল্লাহ্ সেখানকার আমিল ইব্‌ন মূসাকে সঙ্গে করে ঈসায়ী ফৌজদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের সেনাপতি ফ্রান্সের রাজা লারযীককে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন।

২২৫ হিজরীতে (৮৪০ খ্রি.) সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান নিজে জালীকিয়ায় হামলা চালিয়ে সেখানকার বিদ্রোহী ঈসায়ীদের শাস্তিবিধান করে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন। ইলাস্ট্রিয়াস রাজ্যের শাসকের নিকট থেকে খারাজ ও কর উসুল করে তার আনুগত্যের অঙ্গীকার আদায় করে সে রাজ্যে তাঁর নিজস্ব সেনাছাউনি স্থাপন করেন। তারপর স্থলপথে ও সমুদ্রপথে ফ্রান্স অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন। এ অভিযানের ফলে প্রচুর গনীমত ও যুদ্ধবন্দী মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়। সুলতান আবদুর রহমান নিরাপদে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার নিয়ে কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন।

কনসটান্টিনোপল সম্রাটের দ্বিতীয় কূটনৈতিক মিশন

ঐ বছরই কনসটান্টিনোপলের সম্রাট টুকিল্‌স-এর পক্ষ থেকে একটি কূটনৈতিক মিশন কর্ডোভায় আগমন করে যেমন ইতিপূর্বে সেখানকার সম্রাট মীকাঈলের পক্ষ থেকে একটি কূটনৈতিক মিশন কর্ডোভায় এসেছিল। আবদুর রহমান এবারও পূর্বের মতো সম্রাটের দূতকে সাদর সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এবার কনসটান্টিনোপল সম্রাট বাগদাদের খলীফার হাতে বড্ড বেশি কাবু হয়ে পড়েছিলেন। তাই পূর্ববর্তী সম্রাটের তুলনায় নতুন সম্রাট আরও বেশি কাকুতি-মিনতির সাথে আবদুর রহমানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং প্রথমবারের তুলনায় এবার বড় বড় আশার কথাও তাঁকে শুনিয়েছিলেন। হয়তো বা বাগদাদের খলীফার বিরোধিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি ফরাসীদের কাছেও বড় বড় উপঢৌকনাদি প্রেরণের ধারাও অব্যাহত রেখেছিলেন। আবার ফরাসীরাও তাদের প্রতিবার স্পেনে হামলার উৎসাহ ও ইঙ্গিত বাগদাদ থেকেই পেত। এবার হয়তো সত্যি সত্যি আবদুর রহমান কনসটান্টিনোপল সম্রাটের সাহায্যার্থে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিতেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠিক ঐ সময়েই

ইউরোপের উত্তরাঞ্চলীয় পৌত্তলিক নর্মান জাতি, যারা তখনও খ্রিস্টানদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতো, জার্মানী ও স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে জাহাজে আরোহণ করে ইংলিশ চ্যানেলের পথ ধরে স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবতরণ করে আকস্মিকভাবে তথাকার গ্রাম ও শহরগুলোতে লুটপাট চালায়। তারা কাদিস শহরে লুটপাট করে আশবেলিয়ার উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এটা ছিল একটা অজ্ঞাত পরিচয় ও অখ্যাত সম্প্রদায়ের স্পেনের ওপর হামলা যেমনটা মুসলমানদের প্রথম হামলা তারিক ইব্‌ন যিয়াদের নেতৃত্বে হয়েছিল। এ বিব্রতকর সংবাদ পেয়ে আমীর আবদুর রহমান স্থলপথে তাদের মুকাবিলায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। অপরদিকে তিনি স্পেনের পূর্ব উপকূলের বন্দরসমূহে এ মর্মে নির্দেশ প্রেরণ করলেন যে, সব জাহাজ জিব্রালটার প্রণালীর দিকে পাঠিয়ে দাও যাতে আক্রমণকারীদের জাহাজসমূহ দখল করে নিয়ে তাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করে দেয়া যায়। আক্রমণকারীরা যখন অবগত হলো যে, তাদের পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পনেরটি অস্ত্রসজ্জিত জাহাজ রওয়ানা হয়েছে, তখন তারা দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে তড়িঘড়ি করে উপকূলের দিকে পালিয়ে যায় এবং নিজেদের নৌকায় চড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর বহুকাল পর্যন্ত আর তাদের স্পেনে অতর্কিত হামলা চালাবার দুঃসাহস হয়নি।

সেনাপতি মূসা ইব্‌ন মূসার বিদ্রোহ

এই বিদ্রোহ দমিত হতে না হতেই উত্তর দিক থেকে খবর পৌঁছল আবদুর রহমান ছানীর মশহুর সিপাহসালার মূসা ইব্‌ন মূসা বিদ্রোহী হয়ে ঈসায়ীদের সাথে মিলিত হয়েছেন। এই মূসাকেই উত্তর সীমান্ত সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। তাকে দমনের জন্য হারিস ইব্‌ন বাদীকে প্রেরণ করা হলো। মূসা তার ঈসায়ী বন্ধুদেরকে নিয়ে মুকাবিলা করতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু হারিস তাকে পরাজিত করে পালাতে বাধ্য করে। মূসা টলেডোতে অবস্থান করেন আর হারিস সারাকসতায় ফিরে গিয়ে অবস্থান করতে থাকেন। দীর্ঘকাল ধরে উভয় পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মূসা টলেডো ছেড়ে রাবেত নামক স্থানে চলে যান আর টলেডো হারিসের দখলে আসে। শেষ পর্যন্ত ঈসায়ী রাজা গারসিয়া সৈন্যদল নিয়ে মূসার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। ফলে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। আলবা নামক স্থানে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে মূসা হারিসকে গ্রেফতার করিয়ে ২১৮ হিজরীতে (৮৩৬ খ্রি.) ফ্রান্সের সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেন। আবদুর রহমান এ সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি তাঁর পুত্র মুনযিরকে একটি বিরাট বাহিনী দিয়ে মূসাকে দমন করার জন্যে প্রেরণ করেন। ততক্ষণে মূসা টলেডো দখল করে নিয়েছিলেন। মুনযির ২১৯ হিজরীতে (৮৩৪ খ্রি) মূসার সাহায্যার্থে আগত নাব্বালুনার ওয়ালী গারসিয়াকে এক যুদ্ধে হত্যা করেন। মূসা যিম্মীস্বরূপ তাঁর পুত্রকে মুনযিরের নিকট প্রেরণ করে সন্ধির প্রস্তাব মেনে নেন। মূসাকে টলেডোর শাসনভার অর্পণ করা হয়।

স্পেনের উত্তর সীমান্তের ঈসায়ীদের বিদ্রোহ

এদিকে উত্তর সীমান্তে যখন এ হাঙ্গামা চলছিল তখন উত্তরপূর্ব দিকের ঈসায়ীরা বিদ্রোহের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ২৩০ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ৮৪৪-আগস্ট

৮৪৫ খ্রি) বার্সেলোনাবাসীরা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় প্রবেশ করে লুটপাট শুরু করে দেয়। তারা সেখানকার মুসলিম সেনাদেরকে হত্যা করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সুলতান আবদুর রহমান তাঁর মশহুর সিপাহ্সালার আবদুল করীম ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন মুগীছকে ২৩১ হিজরীতে (৮৪৫ খ্রি) বার্সেলোনার দিকে রওয়ানা করেন। আবদুল করীম বার্সেলোনা ও তার আশেপাশের বিদ্রোহীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে গথিক মার্চ রাজ্যকে লণ্ডভণ্ড করে দেন। তারপর আনুগত্যের অঙ্গীকার আদায় করে রাজ্য তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ফ্রান্স সীমানায় প্রবেশ করে ফরাসী শহর জারিন্দা পর্যন্ত ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যান। ইসলামী সৈন্যরা অধিককাল ফ্রান্সে অবস্থান করেনি, বরং নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ও শৌর্যবীর্য দেখিয়ে তারা শীঘ্রই স্বদেশে ফিরে আসে।

ঈসায়ীরা এবং বনু উমাইয়ার শত্রুরা এ পর্যন্ত যত চেষ্টা-চরিত্র ও ষড়যন্ত্র করে তার সব ক'টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যখন সমস্ত হাঙ্গামা শান্ত এবং সকল বিদ্রোহই অবদমিত হলো তখন ফ্রান্স এবং স্পেনের উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের ঈসায়ীরা একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হলো। দীর্ঘকাল পর্যন্ত কর্ডোভার সীমান্তে হানা দেয়া থেকে সকলকে বিরত রাখার দায়িত্ব জালীকিয়ার পাদ্রীরা গ্রহণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, এ দীর্ঘ সময়টাতে তারা ঈসায়ী শক্তিগুলো সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে এবং নতুন নতুন দুর্গ গড়ে তুলতে পারবে। উত্তরাঞ্চলের আমিলদেরকে তারা নিজেদের সাথে যুক্ত করবে। ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর শেষ পর্যন্ত তেমনি এক আঘাত হানবার জন্যে তৈরি হবে যে, তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না। তারপর সেই গথিক রাজত্বের যুগ ফিরে আসবে। এ চেষ্টাকে তারা নিখাদ ধর্মীয় ইবাদত বলে অভিহিত করলো। জালীকিয়ার পাদ্রীরা একজন উদ্যমী ও উৎসাহী পাদ্রীকে শুধু এ উদ্দেশ্যে রাজধানী কর্ডোভার জন্যে দায়িত্ব প্রদান করে যে, তিনি খাস কর্ডোভা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরে পাদ্রীদেরকে এবং খ্রিস্টান জনসাধারণকে খ্রিস্ট ধর্মের জন্যে সর্বস্ব উৎসর্গ করার এমন কি প্রাণ পর্যন্ত দেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করবেন। স্পেনে মুসলমানদের পক্ষ থেকে ঈসায়ীরা সর্বপ্রকার ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতো। তারা তাদের গির্জায় রীতিমত ঘণ্টা বাজাতো এবং শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম পালন করতো। লেনদেন ও মামলা-মকদ্দমায় সাধারণত ঈসায়ী বিচারকরা রায় দিতেন। গির্জাসূহের ব্যয়নির্বাহের জন্যে রাজসরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হতো। মুসলমান ও ঈসায়ীরা একে অপরের ধর্মীয় উৎসব পর্বে শরীক হতো। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষিকাজ প্রভৃতিতে উভয় সম্প্রদায়ের লোক নির্বিশেষে সমান অধিকার ভোগ করতো। এমন কোন সঙ্গত কারণ ছিল না যাকে কেন্দ্র করে ঈসায়ীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মের দোহাই দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলা যেতে পারে। বেচারাদের মুসলমানদের আসল চরিত্র অবলোকনের সুযোগও হয়নি। কেননা ঐ সব এলাকায় অধিকাংশই এমন লোক এসে উঠেছিল, যারা ছিল গথ-রাজত্বের আমলা-কর্মচারী আর যারা মুসলমানদের আগমনকে তাদের জন্যে অপমানজনক বলে বিবেচনা করতো। এ জাতীয় পাদ্রীদের বক্তৃতা ও ওয়ায়েজের মাধ্যমে বিরোধিতার অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হতো আর মুসলমানরাও বার বার এ এলাকায় আক্রমণ করার এবং লুটপাট ও হাঙ্গামা বাধাবার সুযোগ লাভ করতো।

উত্তর ও দক্ষিণ স্পেনের ঈসায়ীদের নতুন ফিতনা

এ সব সত্ত্বেও উত্তর স্পেনের নিবেদিত ঈসায়ীরা দক্ষিণ স্পেনে ছড়িয়ে পড়ে। তারা এ নীতি গ্রহণ করে যে, প্রকাশ্যে হাটে-বাজারে ও সমাবেশে দাঁড়িয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নাম ধরে গালিগালাজ করতো। কুরআনুল করীমের অবমাননা করতো এবং মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করতো। প্রথমে খ্রিস্টান কুৎসাবাজদের গ্রেফতার করে কাযীর আদালতে সোপর্দ করা হয়। সেখানেও তাঁরা তাদের অশ্রাব্য উক্তিসমূহের পুনরাবৃত্তি করে। কাযী তাদের প্রাণদণ্ডাদেশ দেন। এভাবে একজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতেই অপরজন এসে পূর্বের জনের মতো কাযীর দরবারে দাঁড়িয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে গালি-গালাজ করে। কাযী তাকেও প্রাণদণ্ডাদেশ দেন। এ সমস্ত উগ্র খ্রিস্টান যখন এরূপ উদ্দেশ্যমূলকভাবে একের পর এক ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি করে স্বেচ্ছায় প্রাণদণ্ডাদেশ বরণ করতে লাগলো, তখন কাযী ও সুলতানের পক্ষ থেকে ক্ষমার আচরণ করা হতে লাগলো। সাধারণ খ্রিস্টানদের মধ্যে অনায়াসেই পাদ্রীরা এ ধারণা ছড়িয়ে দিল যে যারা এভাবে প্রাণ উৎসর্গ করেছে তাঁরা আসলে এক একজন কামেল ওলী ও সাধু পুরুষ। তাই এসব নিহতের সমাধিস্থলকে তীর্থস্থানে পরিণত করা হলো। কর্ডোভা এবং অন্যান্য স্থানের বিরাট সংখ্যক মূর্খ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈসায়ী এ সব নিহত খ্রিস্টানের সমাধিসমূহকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলো। তারা এ সমস্ত সমাধি দর্শনকে পুণ্যকাজ বলে ধারণা করতো।

উত্তর স্পেনের রাজ্যগুলোর ঈসায়ীরা ঐ সব শহীদের সমাধিস্থল দর্শনে আসতো এবং তাদের পথ ধরে নিজেরাও ঐরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে গ্রেফতারীবরণ করতো। যখন ঐ সব দুষ্টের কোন ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডাদেশ দেয়া হতো এবং তাকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাওয়া হতো, তখন হাজার হাজার খ্রিস্টান তাকে সিদ্ধপুরুষ ভেবে অন্তিমবারের মত দর্শনের জন্যে সমবেত হতো। এ ধারা কয়েক বছর পর্যন্ত চালু থাকে। সুলতান এ ঔদ্ধত্য-সৃষ্ট সমস্যার সমাধানের চিন্তায় অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলেন। অবশেষে কর্ডোভা ও আশবেলিয়া প্রভৃতি স্থানের বড় বড় বিবেকবান পাদ্রী-পুরোহিতরা একটি মহাসম্মেলনে মিলিত হয়ে স্পেন দেশের বড় বড় পাদ্রীকে নিয়ে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। ঈসায়ী ধর্মের বিধান মতে ইসলামের নবীকে গালি দেয়া বা কুরআনের অবমাননা করা পুণ্য কাজ কিনা, এসর ঔদ্ধত্যমূলক আচরণের দ্বারা নিহত ব্যক্তিরা প্রকৃতই সাধু পুরুষ বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য কিনা, এগুলোই তাদের মহা-সম্মেলনের বিবেচ্য ও আলোচ্য বিষয়। এ ব্যাপারে সমবেত পাদ্রীরা দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তাঁরা এ জাতীয় কার্যকলাপকে ঈসায়ী ধর্ম বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে মত প্রকাশ করলেন। সাথে সাথে যারা এভাবে অঘোরে প্রাণ দিয়েছে তাদেরকে মহাপাতকী বলেও অভিহিত করলেন। সাথে সাথে তারা একটি অদ্ভুত রায়ও দিলেন যে, যারা এ পর্যন্ত এ পথে প্রাণ দিয়েছেন তাদেরকে শহীদ ও সাধু পুরুষ জ্ঞান করা হবে, কিন্তু এরপরও যারা এ অশোভন পন্থা গ্রহণ করবেন তাদেরকে অনাচারী বদমাশ ও মহাপাতকী বিবেচনা করা হবে। পাদ্রীদের এ কাউন্সিলের মতামত স্পেনীয় ঈসায়ীদের প্রভাবান্বিত করলো। কিন্তু উত্তর স্পেনের পাদ্রীরা, যারা এসব অশোভন কাজের মাধ্যমে সিদ্ধপুরুষ ও

কামেল ওলী বলে জনগণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতো, তারা তারপরও বিরত হলো না। একদিকে মুসলমানরা উক্ত অশোভন উক্তিকারী ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে কুণ্ঠিত-দ্বিধাগ্রস্ত সুলতানের বিরুদ্ধে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে গাফলতির অভিযোগ করতো। অপর দিকে জাহিল খ্রিস্টানরা তাদের পাদ্রীরা কেন তাদের শহীদ পাদ্রীদেরকে অনাচারী বদমাশ বলে আখ্যায়িত করলো তজ্জন্য মনঃক্ষুণ্ন ছিল। মুসলমান ও ঈসায়ীদের মধ্যে পূর্ব থেকে বিরাজমান সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন হতে লাগলো এবং ক্রমেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

ঈসায়ীদের সৃষ্ট এ ফিতনা সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমানকে তাঁর জীবনের অন্তিম পাঁচ-ছয় বছর খুবই বিব্রত রাখে। তাঁর জীবদ্দশায় এ অভূতপূর্ব ফিতনা পুরোপুরি নির্মূল হয়নি বরং অল্প-বিস্তর তা চলতেই থাকে।

আবদুর রহমানের ওফাত

অবশেষে ২৩৮ হিজরীর রবিউল আখের (অক্টোবর ৮৫২ খ্রি) মাসের শেষদিকে ৩১ বছর কয়েক মাস রাজত্ব করার পর দ্বিতীয় আবদুর রহমান ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবদুর রহমানে রাজত্বকালের পর্যালোচনা

সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান-এর রাজত্বকাল যুদ্ধ-বিগ্রহমুক্ত না থাকলেও তিনি জনকল্যাণমূলক কার্যাদি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ব্যাপারে একটুও উদাসীন ছিলেন না। আবদুর রহমান নিজে একজন উঁচুদরের বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং ধর্ম-দর্শনের একজন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। কর্ডোভা জামে মসজিদে তিনি বেশ কটি প্রকোষ্ঠ সংযোজন করেন। নতুন নতুন সড়ক বের করেন। অনেক মসজিদ, সেতু ও দুর্গ নির্মাণ করেন। পথিক ও ব্যবসায়ীদের নানারূপ সুযোগ-সুবিধা বিধান করেন। শিক্ষা বিভাগের প্রতি সর্বদাই তাঁর মনোযোগ ছিল। কোন পল্লী বা গ্রামই তিনি বিদ্যালয়হীন অবস্থায় রাখেননি। প্রত্যেকটি শহরে ও কসবায় আমিল ও ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্যে দফতর ও কাছারিস্বরূপ সুরম্য প্রাসাদাদি নির্মাণ করান। প্রত্যেকটি শহর ও কসবায় হাম্মামখানা ও শৌচাগার নির্মাণ করান।

দ্বিতীয় আবদুর রহমান অত্যন্ত শৌখিন ছিলেন। তিনি সাজসজ্জা ও শান-শওকত পছন্দ করতেন। প্রজাসাধারণের সম্মুখে কমই আত্মপ্রকাশ করতেন। সাধারণত তিনি লোক-চক্ষুর অন্তরালেই থাকতেন। তাঁর চরিত্রে দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রাবল্য ছিল। কঠোর শাস্তি এবং মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিতে তিনি খুবই চিন্তা-ভাবনা করতেন। তাঁর আমলে রাজকোষ অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তিনি পূর্বের তুলনায় সুদৃশ্য মুদ্রা ঢালাই করান। ওয়াদিউল কবীর নদীর উভয় তীরে সুদৃশ্য ফল বাগান তৈরি করেন এবং সেগুলো জনগণের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন। তিনি গ্রীক দার্শনিকদের পুস্তকাদি অনুবাদ করান। জ্ঞান-চর্চার মজলিস কায়েম করেন। একবার রাজ্যে পঙ্গপালের আক্রমণে ব্যাপক ফসলহানি ঘটে। অনাবৃষ্টির দরুন বিরাট দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ সময় তিনি প্রজাসাধারণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। তারপর রাজকোষে প্রচুর

শস্য গুদামজাত করে রাখার নিয়ম প্রবর্তন করেন যাতে কখনো এরূপ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তা প্রজাসাধারণের কাজে লাগে।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

সুলতান আবদুর রহমানের একজন প্রিয় মহিষী ছিলেন তারুব। শাহ্যাদা আবদুল্লাহ্ তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তারুব মনেপ্রাণে চাইতেন যে, সুলতান যেন তাঁর এই পুত্র আবদুল্লাহকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু শাহ্যাদা মুহাম্মাদ তাঁর ভাই আবদুল্লাহর তুলনায় রাজত্ব পরিচালনায় যোগ্যতর পাত্র ছিলেন। তারুব একবার মুহাম্মাদকে বিষ প্রয়োগে হত্যার অপচেষ্টা চালান। নসর নামক একজন খোজাকে তিনি এ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেন। নসর একজন শাহী চিকিৎসককে বড় অংকের অর্থের প্রলোভন দিয়ে তাঁর ঔষধে বিষ মিশ্রিত করতে সম্মত করেন। শাহ্যাদা মুহাম্মাদ তখন কোন এক সামান্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন এবং উক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন ছিলেন।

শাহী চিকিৎসক নসরের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কিন্তু চুপে চুপে তিনি নসরের এ ষড়যন্ত্রের কথা সুলতানকে অবহিত করলেন। তিনি জানালেন যে, আজ শাহ্যাদার জন্যে ঔষধের যে পেয়ালা তৈরি হয়ে আসবে তাতে হলাহল মিশ্রিত থাকবে। সত্যি সত্যি বিষ মিশ্রিত ঔষধের পেয়ালা শাহ্যাদার সম্মুখে পেশ করা হলো। বাদশাহ্ নসরকে লক্ষ্য করে নির্দেশ দিলেন আজকের এ ঔষধ তুমিই পান কর। অগত্যা নসরকে তাই পান করতে হলো। সাথে সাথেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। এভাবে যে কূপ সে শাহ্যাদার জন্যে খনন করেছিল, তাতে সে নিজেই নিক্ষিপ্ত হলো। এর কয়েকদিন পরেই সুলতান আবদুর রহমান ইন্তিকাল করেন। সুলতান হাকামের আমল থেকেই প্রতিষ্ঠিত শাহী রক্ষীবাহিনীর সাহায্যে শাহ্যাদা মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করলেন। আবদুল্লাহ্ ও তাঁর মাতা তারুব ব্যর্থ মনোরথ হলেন।

আবদুর রহমান ইব্ন মুআবিয়া অর্থাৎ আবদুর রহমান আদ-দাখিলের আমলে রাজ্যের রাজস্ব আয় ছিল তিন লক্ষ দীনার। সুলতান হাকামের আমলে তা ছয় লক্ষ দীনারে উন্নীত হয়। দ্বিতীয় আবদুর রহমান-এর আমলে তা দশ লক্ষ দীনারে উন্নীত হয়। সমস্ত আয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করা হতো। এক অংশ সৈন্যদের বেতন বাবদ, এক অংশ শাসক ও আমলাদের বেতনভাতা বাবদ এবং আরেক অংশ রাজকোষে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত রাখা হতো। এ অংশ দ্বারাই জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম এবং নির্মাণ কাজ প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ করা হতো। দ্বিতীয় আবদুর রহমান কোন কোন ব্যবসায়পণ্য এবং অন্যান্য বস্তুর ওপর কর ধার্য করে রাজ্যের সরকারী আয় বৃদ্ধি করেন। এ জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে জনমনে অনায়াসেই অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করা হতো। কার্যত এরূপ অনেক অসন্তুষ্টিই সৃষ্টি করা হয়েছে।

বলা হয়ে থাকে যে, আবদুর রহমানের সন্তান সংখ্যা শতাধিকে পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁর পুত্র সংখ্যাই ছিল শতাধিক আর কন্যা সংখ্যা ছিল ৫০ জনের কাছাকাছি। আবদুর রহমানের লোক চেনার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। কারো দৈহিক অবয়ব দেখেই তিনি তার মেযাজমর্জি ও

প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারতেন। প্রজারা তাকে আল-মুযাফ্ফর খিতাব দিয়েছিল। তাঁর দেহের রঙ ছিল ফর্সা, চোখ কোটরাগত, শ্মশ্রু দীর্ঘ এবং দেহ ছিল বেশ মোটাসোটা মাংসল। দাড়িতে তিনি মেহ্দীর খেযাব ব্যবহার করতেন। মৃত্যুর সময় তাঁর ৪৫ জন পুত্র জীবিত ছিলেন।

দ্বিতীয় আবদুর রহমান-এর শাসনামলে খ্রিস্টানদেরকে রাজ্যের বড় বড় পদে আসীন করা হতো। অফিস-আদালতে খ্রিস্টানদেরই আধিপত্য ছিল। তারা সাধারণত আরবীতেই কথা বলতো। মুসলমানরা প্রধানত সামরিক বিভাগের খিদমতের দিকেই মনোযোগী ছিল। অফিস-আদালতের কাজকর্ম তারা খ্রিস্টানদের জন্যেই ছেড়ে দিয়েছিল।

মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান

অভিষেক

সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান-এর আমলে শাহী দফতরসমূহে ঈসায়ীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি মুসলমান আলিম ও ফকীহ্গণ নীরবে প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিলেন। সুলতান হাকামের যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর তাঁরা একেবারে নির্বাক ছিলেন। কিন্তু ঈসায়ীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং তাদের অমার্জিত আচরণ ও ঔদ্ধত্যসমূহ প্রত্যক্ষ করে তাঁরা অত্যন্ত মর্মপীড়ায় ভুগছিলেন। এমন অবস্থায় আপন পিতার ইন্তিকালের অব্যবহিত পরেই ২৩৮ হিজরীর রবিউল আখির (৮৫২ খ্রি অক্টোবর) মাসে সুলতান মুহাম্মাদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সর্বপ্রথম কাজ

সিংহাসনে বসেই সুলতান মুহাম্মাদ গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় পদসমূহে মুসলমানদেরকে বসালেন এবং যে সমস্ত আমলা-কর্মচারী ইসলামী অনুশাসন পালনের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন তাদেরকে পদচ্যুত করলেন। সুলতান মুহাম্মাদের এ প্রথম পদক্ষেপটি আলিম-উলামাগণের অত্যন্ত মনঃপূত হলো। ঐ যুগেই হজ্জ উপলক্ষে আরব ও সিরিয়া ভ্রমণকারী কিছু সংখ্যক আলিমের মাধ্যমে স্পেনে সর্বপ্রথম হাম্বলী মাযহাব প্রবেশ করলো। তারপরই কর্ডোভায় হাম্বলী ও মালিকী মাযহাবের অনুসারী মৌলভীদের বাহাস-মুনাযারা শুরু হয় এবং মুসলমানরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে রেষারেষিতে লিপ্ত হয়। সুলতান মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান নিজে হস্তক্ষেপ করে এসব বাহাছ মুনাযারার ফায়সালা দিয়ে এই নতুন ফিতনাকে প্রশমিত করেন। মুসলমানদের দৃষ্টি পারস্পরিক বিরোধিতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে অন্যদিকে নিবদ্ধ করতে এবং নবোদ্ভূত এ সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে তিনি জিহাদের জন্যে সৈন্যবাহিনীতে নতুনভাবে লোকভর্তি শুরু করে দিলেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি বিশাল বাহিনী গঠন করে তিনি উত্তরাঞ্চলের ঈসায়ী রাজ্যগুলোর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন।

ঐ সময় ইলাস্ট্রিয়াস রাজ্য অর্থাৎ কাস্তালার শাসক ইসলামী রাষ্ট্রের বেশ ক'টি শহর দখল করে নিয়েছিল এবং একজন ঈসায়ী রঈস চতুর্দিক থেকে মুসলিম শাসিত এলাকাকে চাপের মুখে রেখেছিল। উক্ত বাহিনী সর্বপ্রথম কাস্তালার ওয়ালী শাহ উর্দুনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালান। সুলতান মুহাম্মাদ এ বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব মূসা ইব্ন মূসার হাতে

অর্পণ করলেন। এই মূসা ছিলেন গথ সম্প্রদায়ভুক্ত নওমুসলিম। তাঁর মত আরো কয়েকজন নওমুসলিম শাহী ফৌজের নেতৃত্বে ও বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরের গুরু-দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই অভিযানে তেমন কোন ফলোদয় হয়নি। সামান্য যুদ্ধ-বিগ্রহের পর এ বাহিনী ফেরত আসে। এবার এ বাহিনীকে বার্সেলোনা অভিমুখে প্রেরণ করা হলো। কেননা সেখানকার ঈসায়ীরাও আনুগত্য প্রত্যাহার করেছিল। সেখান থেকেও যৎসামান্য গনীমত নিয়ে বাহিনী ফেরত আসে।

বিদ্রোহ দমন

২৩৯ হিজরীতে (৮৫৩-৫৪ খ্রি.) টলেডোবাসীরা কর্ডোভা দরবারে আলিম ও ফকীহ্গণের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে নিজেদেরকে বিপন্ন ভেবে উত্তরের ঈসায়ীদের সমবেত সিদ্ধান্ত অনুসারে মুসলিম রাষ্ট্রকে বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পূর্বোক্ত নিবেদিতপ্রাণ ঈসায়ীদের নির্দ্বিধায় হত্যাকাণ্ড চলছে দেখেও হয়তো তারা এতটুকু বিপন্নবোধ করেছিল। উল্লেখ্য, সুলতান মুহাম্মাদ সিংহাসনে বসে যখন ঈসায়ী শহীদদের সংখ্যা নির্দ্বিধায় বৃদ্ধি করতে লাগলেন, তখন ঈসায়ীরা তাদের ঐ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ একেবারেই বন্ধ করে দেয়। তার পরিবর্তে তারা এখন টলেডোতে বিদ্রোহের প্রস্তুতির দিকেই পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে। টলেডোবাসীরা তাদের আরব বংশোদ্ভূত গভর্নরকে বন্দী করে কর্ডোভা দরবারে এ মর্মে বার্তা পাঠালো যে, সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান আমাদের যেসব লোককে জামিনরূপে কর্ডোভায় নিয়ে গিয়ে নিজের যিম্মাদারীতে রেখেছিলেন, তাদেরকে ফেরত পাঠাও, নতুবা আমরা তোমাদের গভর্নরকে হত্যা করে স্বাধীনতা ঘোষণা করবো।

সুলতান মুহাম্মাদ তাঁদের দাবি অনুসারে বন্ধকরূপে কর্ডোভায় মওজুদ ঈসায়ীদেরকে টলেডোতে পাঠিয়ে দেন। টলেডোবাসীরা তাতে সুপথে ফিরে না এসে উল্টো একে তাঁর দুর্বলতা ভেবে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। তাঁরা কর্ডোভাকে চতুর্দিক থেকে সুদৃঢ় করে উত্তরের ঈসায়ী রাজাদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালো। টলেডোবাসীরা অনেকবারই বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ পর্যন্ত কোন সুলতানই টলেডোর নগরপ্রাচীর বিধ্বস্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। এটাও মুসলমানদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে এ কারণেই তারা এ পর্যন্ত উত্তরে সীমান্তবর্তী উগ্র খ্রিস্টান রাজ্যসমূহের উচ্ছেদ সাধন করেন নি। নতুবা এ কাজটি ছিল তাঁদের জন্যে অত্যন্ত সহজসাধ্য ও মামুলী ব্যাপার।

সুলতান মুহাম্মাদ নিজে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ২৪০ হিজরীতে (৮৫৪-৫৫ খ্রি.) কর্ডোভা থেকে টলেডো অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি টলেডোতে না পৌঁছতেই ইলাস্ট্রিয়াসের দুর্ধর্ষ পার্বত্য সৈন্যরা টলেডোবাসীদের সাহায্যার্থে নগরে প্রবেশ করলো। সুলতান মুহাম্মাদ যখন লক্ষ্য করলেন, টলেডো বিজয় দুঃসাধ্য হবে, তখন তিনি ঠিক করলেন যে, নিজ বাহিনীর সিংহভাগকে পাহাড়, টিলা ও ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে আত্মগোপনরত রেখে একটি ছোট সৈন্যদল নিয়ে তিনি নিজে টিলা ও ঝোঁপঝাড় বেষ্টিত সলীত প্রান্তরে গিয়ে শিবির স্থাপন করবেন। তিনি তাই করলেন। টলেডোবাসীরা যখন লক্ষ্য করলো যে, সুলতান তাঁর সৈন্যবাহিনীর

সংখ্যা স্বল্পতার জন্যে টলেডো অবরোধ করতে সাহসী হননি, তখন তারা নিজেরা নগর থেকে বের হয়ে সুলতানের বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। যখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হলো তখন সুলতানের বাহিনীর লোকজন নিজেদের গোপন অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে চতুর্দিক থেকে একযোগে তাদের ওপর হামলা চালায়। এ অতর্কিত আক্রমণে পার্বত্য ঈসায়ী বাহিনী ও টলেডোবাসীরা দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে যে যে দিকে পারলো ছুটে পালাতে লাগলো। কিন্তু যাবে কোথায়? দেখতে দেখতে কুড়ি হাজার ঈসায়ী সৈন্য মুসলিম বীরদের তরবারির নিচে কচুকাটা হলো। এ শোচনীয় পরাজয়ে টলেডোবাসীদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। সুলতান মুহাম্মাদ অনায়াসে টলেডো পুনর্দখল করে সেখানে একটি বাহিনীকে নিয়োগ করলেন।

এ লড়াইয়ে এত বিপুল রক্তক্ষয়ের পর টলেডোবাসীদের আর কোনদিন বিদ্রোহী হওয়ার সাহস বা সম্ভাবনা অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু উত্তরের ঈসায়ীদের রাজার সাথে তাদের স্থায়ী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এদিকে মুসলিম বাহিনীতে বহু সেনাপতি এবং প্রাদেশিক গভর্নর এমনও ছিল যারা ইলাস্ট্রিয়াস, গথিক মার্চ, জালীকিয়া, নাওয়ার, একুইটিন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খ্রিস্টান রাজ্যের রাজাদের এবং ফ্রান্সের সম্রাটের সাথে গোপন পত্র যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো। তারা ওদের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। যে ভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রে মুসলমানদের আত্মকলহ তাদের রাজ্য হারা হওয়ার কারণ হয়েছিল, তেমনি স্পেনেও তাদের আত্মকলহ তাদের দুর্দিন ডেকে আনে। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং গৃহযুদ্ধ অন্যান্য দেশের তুলনায় একটু বেশি এবং সাধারণ বলেই মনে হয়। স্পেনের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে এমন কোন যুগ ছিল না, যখন মুসলমানরা এ মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ থেকে মুক্ত ছিল। সে যাই হোক ঈসায়ীদের একতা এবং মুসলমান বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতা ২৪২ হিজরীর (৮৫৬-৫৭ খ্রি.) শেষ দিকে টলেডোবাসীকে পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করে। এবারও সুলতান মুহাম্মাদ টলেডো আক্রমণ করে পুনরায় তাদেরকে অনুগত হতে বাধ্য করেন এবং তাদের শাস্তি বিধান করে কর্ডোভায় ফিরে যান। কিন্তু তিনি ফিরে যেতে না যেতেই টলেডোবাসীরা জনৈক ঈসায়ী সর্দারের নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। মোট কথা, টলেডোবাসীরা তাদের দুরাচার থেকে বিরত হলো না। ফলে সুলতান মুহাম্মাদকে পুনঃ পুনঃ তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে এবং ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। অবশেষে ২৪৮ হিজরীতে (৮৬২ খ্রি.) সুলতান মুহাম্মাদ এ শর্তে টলেডোবাসীদেরকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদানে সম্মত হন যে, তারা সুলতানের অনুগত থাকবে। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে এতটুকু অধিকার প্রদানে সম্মত হলেন যে, তারা স্বেচ্ছায় তাদের গভর্নর নির্বাচিত করবে। সে গভর্নর একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের বার্ষিক রাজস্ব প্রতিবছর কর্ডোভায় প্রেরণ করবে। অভ্যন্তরীণ সকল ব্যাপারে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে।

সুলতান মুহাম্মাদ টলেডোবাসীদের এ শর্ত মঞ্জুর করে নিয়ে কেবল যে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে নিলেন তাই নয় বরং ঐ পুরনো রাজধানী নগরীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করে দ্বিতীয়বার তিনি সেখানে খ্রিস্টান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে

দিলেন। এভাবে স্পেনের ইসলামী শাসন প্রাসাদের ভিত্তিতে তিনি একটি ছিদ্রের সূচনা করলেন, যে ছিদ্রের কারণে কিছুদিন পর স্পেন থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে যায়।

টলেডোবাসীরা নওমুসলিম মূসা ইব্‌ন মূসার পুত্র লূপকে গভর্নর বানানোর আগ্রহ প্রকাশ করে। সুলতান মুহাম্মাদ সন্তুষ্টচিত্তে তাতে সম্মতি দিলেন। তারপর উত্তরের ঈসায়ী পার্বত্য রাজ্যসমূহের যুদ্ধবাজ ঈসায়ীরা প্রচুর সংখ্যায় এসে টলেডোতে বসতি স্থাপন করতে থাকে এবং সেখানে বসবাসকারী মুসলমানদেরকে ক্রমান্বয়ে সেখান থেকে বের করতে এবং বেদখল করতে শুরু করে। শুধু টলেডো শহরেই নয়, আশেপাশের গোটা এলাকাই ইলাস্ট্রিয়াসের রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। এদিকে সারাকসতার গভর্নর মূসা ইব্‌ন মূসা ঈসায়ী রাজাদের সাথে গোপনে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। মোটকথা, এ বিশ্বাসঘাতক পরিবারটি মুসলমানদের বাহ্যাবরণে ইসলামী রাষ্ট্রকে দুর্বল করার ব্যাপারে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে।

ঐ বছরই নর্মান সম্প্রদায়ের লোকজন স্পেনের পশ্চিম উপকূলে তাদের জাহাজ নিয়ে এসে ঐ উপকূলীয় এলাকায় আকস্মিক আক্রমণ চালায়। কিন্তু উপকূলে মওজুদ সুলতান মুহাম্মাদের জাহাজসমূহ তাদের পঞ্চাশটি নৌকা আটক করে। সুতরাং কোন গুরুতর ক্ষতিসাধন ছাড়াই তাদেরকে স্পেন থেকে পালিয়ে যেতে হয়।

২৫১ হিজরীর রজব (আগস্ট ৮৬৫ খ্রি) মাসে সুলতান মুহাম্মাদ তাঁর পুত্র মুনযিরকে উত্তর সীমান্তের দিকে আলবা ও কিলা'র ঈসায়ী বিদ্রোহীদের দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তারপর তিনি নিজেও সৈন্য নিয়ে তাঁর পিছু পিছু জালীকিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। পিতা-পুত্র উভয়েই এ অভিযানে জয়যুক্ত হন। কিন্তু ঈসায়ীরা মুসলমানদের এরূপ হামলার ধরন-ধারণ সম্পর্কে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তাই যখনই তারা কোন জবরদস্ত হামলার সম্মুখীন হতো, তখনই নামেমাত্র মুকাবিলা করে পাহাড়ে-পর্বতে আত্মগোপন করতো এবং তারপর ক্ষমা প্রার্থনা করে আনুগত্যের অঙ্গীকার করতো। এভাবে আক্রমণকারীদেরকে কোনমতে বিদায় করেই আবার তাদের হৃত রাজ্য দখল করে রাজত্ব করতো। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। শাহী ফৌজ কর্ডোভায় ফিরে যেতেই ঈসায়ীরা আবার অগ্রসর হলো। ইতিপূর্বে ঈসায়ীরা কেবল লুটপাটের উদ্দেশ্যেই ইসলামী শহরসমূহে হামলা চালাতো। কিন্তু এখন তারা মুসলমানদের দুর্বলতা সম্যক টের পেয়েছিল। তাই তারা যে শহরই দখল করতো তাতেই নিজেদের প্রশাসক নিযুক্ত করতো এবং যথারীতি নিজেদের শাসন-শৃঙ্খলা কায়েম করে যথা শীঘ্র সম্ভব তাদের রাজত্বের সীমানা বর্ধন করতে লাগলো। তাই যেভাবে পূর্ব উপকূলে বার্সেলোনা পুনরুদ্ধার করার পর ঈসায়ীরা নিচে অবতরণের ফন্দি-ফিকিরে ছিল ঠিক তেমনি তারা পশ্চিম উপকূলেও তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করতে লাগলো এবং পর্তুগাল এলাকা দখল করে নিল। সুলতান মুহাম্মাদ একটি নৌ-বাহিনীকে সুসজ্জিত করে সমুদ্র পথে সৈন্য পাঠালেন যাতে তারা বিস্কে উপসাগরে উপনীত হয়ে জালীকিয়ার উত্তর দিক থেকে শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সামুদ্রিক ঝড়ে এ নৌ-অভিযানটি দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। তারপর নৌ-পথে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

টলেডোবাসীদের সাফল্য দর্শনে তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে স্থানে স্থানে বিদ্রোহী দেখা দেয়। ঈসায়ী বসতি প্রধান প্রতিটি শহরেই স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপিত হয়। এসব বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সুলতান মুহাম্মাদ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পারছিলেন না।

একটি নতুন ধর্মের উদ্ভব

বিদ্রোহের উক্ত ধারা অব্যাহত ছিল। এমন সময় মারীদার এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ান বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইতিপূর্বেও সে বিভিন্ন বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। সুলতান মুহাম্মাদের অহেতুক আনুকূল্যের বলেই সে মারীদায় একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সুলতান মুহাম্মাদ তাকে দমনের উদ্দেশ্যে সেদিকে সসৈন্য রওয়ানা হলেন। তিনমাস ব্যাপী উভয়পক্ষের যুদ্ধ হয়। তারপর সে তার ওয়াদা অনুযায়ী বাগদাদের দিকে রওয়ানা হওয়ার পরিবর্তে স্পেনেই রয়ে গিয়ে এক নতুন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটায়। সে ধর্মটি ছিল ঈসায়ী ও ইসলাম ধর্মের মূলনীতিসমূহের একটি সমন্বিত রূপ। অনেক ভবঘুরে ধরনের মুসলমান ও ঈসায়ী এ ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। যেহেতু গোটা রাজ্য জুড়েই আত্মগরিমার হাওয়া বয়ে চলেছিল, কেউ কাউকে মান্য করতে চাচ্ছিল না, তাই বহু দুষ্ট ধরনের লোক ধর্ম নির্বিশেষে তার চারপাশে এসে সমবেত হতে থাকে। এভাবে জালীকিয়া ও পর্তুগাল প্রদেশের সীমানায় আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ানের নেতৃত্বে একটি বিরাট বাহিনী সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। সুলতান মুহাম্মাদ সে সংকটের কথা অবগত হয়ে আপন উযীর হাশিম ইব্‌ন আবদুল আযীযকে তাকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবদুর রহমান হাশিমকে প্রতারিত করে তাঁর সম্মুখ থেকে পালাবার ভান করে তাঁকে তার পশ্চাদ্ধাবন করতে বাধ্য করে এমন এক স্থানে নিয়ে যায় যেখানে গোপনে তার বাহিনী অবস্থান নিয়ে পূর্ব থেকেই ওতপেতে ছিল। অতর্কিতে তারা গোপন অবস্থান থেকে বের হয়ে হাশিমের গোটা বাহিনীর লোকজনকে হত্যা করে এবং তাকে গ্রেফতার করে। ইতিপূর্বে আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ান ইলাস্ট্রিয়াসের শাসক আলফোনসূর সাথে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে সখ্যতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। এবার স্পেনের প্রধান উযীরকে গ্রেফতার করে সে তার বন্ধু আলফোনসূর কাছে পাঠিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য ছিল, এতে আলফোনসূ আবদুর রহমানের ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণায় উপনীত হবেন এবং তার বন্ধুত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। ফলে তাদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হবে।

সুলতান মুহাম্মাদ যখন তাঁর প্রধান উযীরের এ শোচনীয় পরাজয় ও গ্রেফতারী বরণের সংবাদ অবহিত হলেন, তখন তিনি আবদুর রহমান মারওয়ানের কাছে হাশিমের মুক্তিদানের কথা লিখলেন। ইব্‌ন মারওয়ান এক লক্ষ দীনার মুক্তিপণ দাবি করলো। দীর্ঘ কয়েক মাস পর্যন্ত হাশিম বন্দী অবস্থায়ই রইলেন আর সুলতান মুহাম্মাদ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ানের মধ্যে পত্র বিনিময় চললো। অবশেষে সুলতান এ ব্যাপারে তাঁর সম্মতিদান করলেন যে, বাৎলিউস শহর এবং তার আশেপাশের এলাকা আবদুর রহমানের দখলে থাকবে আর এজন্যে তার ওপর কোন কর ধার্য হবে না। সাথে সাথে সুলতান হাশিমের

মুক্তিপণও পরিশোধ করবেন। হাশিম যখন এভাবে মুক্ত হয়ে আসলেন, তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তাঁকে গ্রেফতারকারী তাঁর প্রতিপক্ষ একটি সুরক্ষিত এলাকার স্বাধীন শাসকে পরিণত হয়েছে। সর্বপ্রকার রাজস্ব বা করের বোঝা থেকেও সে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইব্‌ন খালদুন বলেন, উযীর হাশিম দীর্ঘ আড়াই বছর বন্দী থাকার পর ২৬৫ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ৮৭৮-আগস্ট ৭৯ খ্রি) মুক্তি লাভ করেছিলেন।

মোটকথা, একজন মামুলী বিদ্রোহী সর্দার আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ান এখন নিজেকে সুলতান মুহাম্মাদের সমকক্ষ ভাবতে শুরু করে। সে ইলাস্ট্রিয়াস রাজ্যের সাথে তার বন্ধুত্ব সম্পর্কের উন্নতি সাধন করে। এ অবস্থা লক্ষ্যে রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহীরা উৎসাহিতবোধ করলো। সুলতানের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দাপট একেবারে ধূলায় লুটিয়ে পড়লো।

সান্তবারিয়ার গভর্নর মূসা ইব্‌ন যিননূন বিদ্রোহী হয়ে টলেডো আক্রমণ করলেন। টলেডোতে নিজ রাজত্ব গড়ে তোলাই ছিল তার উদ্দেশ্য। টলেডোবাসীরা মুকাবিলা করে তাকে পরাস্ত করে। তিনি আবার আক্রমণ করলেন। এভাবে তাঁর শক্তি পরীক্ষার পালা চলতেই থাকে। ওদিকে আসাদ ইব্‌ন হারস ইব্‌ন বাদীও বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করলেন। সুলতান মুহাম্মাদ শাহযাদা মুনযিরকে সৈন্যদল দিয়ে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। মুনযির কয়েকটি শহর ও দুর্গ জয় করে কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন। মোটকথা, সুলতান মুহাম্মাদ একদিনের জন্যও বিদ্রোহ দমন ও সৈন্যবাহিনীসহ বিভিন্ন দিকে অভিযান প্রেরণ থেকে অবসর পান নি।

এই নাযুক সময় উমর ইব্‌ন হাফসুন নামক একজন খ্রিস্টান খাস আন্দালুসিয়া প্রদেশে অর্থাৎ স্পেন উপদ্বীপের দক্ষিণ পূর্বের পার্বত্য এলাকায় দস্যু তস্করদের একটি দলকে সংঘবদ্ধ করে। উমর ইব্‌ন হাফসুন ছিল গথ বংশের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এজন্যে সে অনায়াসেই ঈসায়ী এবং দুস্কৃতকারী লোকদের সংঘবদ্ধ করতে সমর্থ হয়। মালকা এলাকায় একটি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে একটি দুর্গ নির্মিত ছিল। উমর ইব্‌ন হাফসুন ঐ দুর্গটিকেই তার ঘাঁটিরূপে বেছে নেয় এবং সেখান থেকেই লুটপাট চালাতে থাকে। আশেপাশের শহর ও কসবাসমূহের আমিলরা পুনঃপুনঃ তার ওপর হামলা চালান কিন্তু প্রতিবারই তাঁরা তার হাতে পরাজয় বরণ করেন। অবশেষে ২৬৭ হিজরীতে (আগস্ট ৮৮০-জুলাই ৮১ খ্রি) রাজধানী কর্ডোভা থেকে একটি শক্তিশালী বাহিনী তাকে দমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। উমর ইব্‌ন হাফসুন চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ করে সন্ধির আবেদন জানায়। সাথে সাথে সে ভবিষ্যতে লুটপাট না করে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিও দেয়। এই মর্মে উক্ত পার্বত্য দুর্গটি তার হাতেই ছেড়ে দেয়া হয়। সত্যি সত্যি এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৬৮ হিজরীতে (আগস্ট ৮৮১-জুলাই ৮২ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদ শাহযাদা মুনযিরকে একটি শক্তিশালী বাহিনী দিয়ে উত্তরাঞ্চলের দিকে রওয়ানা করেন। সে দিকের ঈসায়ী বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করাই ছিল এর লক্ষ্য। উত্তরের রাজ্যগুলোর বিদ্রোহীদের অবস্থা বিবৃত হয়েছে যে, কোন শক্তিশালী বাহিনীকে আসতে দেখলেই তারা আনুগত্য প্রকাশ করতো। আবার সে বাহিনী ফিরে যেতেই পূর্বের বিদ্রোহী অবস্থায় ফিরে যেত।

শাহযাদা মুনযির সারাকসতায় পৌঁছে সেখানকার বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করেন। তারপর তিনি আলবা ও ফেলা প্রভৃতি এলাকার দিকে যাত্রা করেন। তারপর লারীদার বিশৃঙ্খলা দূর করে সেখানে ইসমাঈল ইব্‌ন মূসাকে ব্যবস্থাপক নিয়োগ করে ফিরে আসেন। মুনযির চলে আসতেই বার্সেলোনার ঈসায়ী শাসক তাঁর ওপর হামলা চালায়। ইসমাঈল পূর্ণ বীরত্বের সাথে লড়াই করে বার্সেলোনাবাসীদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন।

২৭০ হিজরীতে (৮৮৩-৮৪ খ্রি) উমর ইব্‌ন হাফসুন আবারও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এবার সে পূর্বের চাইতেও বেশি শক্তি সঞ্চয় করে মালকা অঞ্চলকে অশান্ত করে তোলে। কর্ডোভা থেকে উযীর আযম হাশিম ইব্‌ন আবদুল আযীয একটি বাহিনী নিয়ে উমর ইব্‌ন হাফসুনকে দমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত হাশিম শান্তির পয়গাম দিয়ে সুপথে আনার চেষ্টা করেন এবং ক্ষমার আশ্বাসে তাকে কর্ডোভায় তাঁর সাথে চলে আসতে সম্মত করেন। উমর ইব্‌ন হাফসুন হাশিমের সাথে সত্যি সত্যি কর্ডোভায় চলে আসে। উযীর হাশিম তার বীরত্ব দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তাই তিনি সুলতান মুহাম্মাদের কাছে তার জন্যে সুপারিশ করতেই তিনি তাকে সুলতানী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন।

তারপর ২৭১ হিজরীতে (৮৮৪-৮৫ খ্রি) উযীর হাশিম উমর ইব্‌ন হাফসুনসহ একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে উত্তরাঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে সারাকসতাবাসীরা পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ইলাস্ট্রিয়াসের রাজ্যের পক্ষ থেকেও আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। উমর ইব্‌ন হাফসুন এ সব লড়াইয়ে অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। সারাকসতাবাসীদেরকে এবং ইলাস্ট্রিয়াসের ঈসায়ীদেরকে উপর্যুপরি পরাস্ত করে এবং তাদের নিকট থেকে খারাজ উসুল করে তাঁরা দুজন ফিরে আসেন। উমর ইব্‌ন হাফসুনের কাছে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতির পদটি তেমন মনঃপূত ছিল না। কেননা, এতে তার গথিক রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নসাধ বাস্তবায়িত হতে পারতো না। তাই সে পথ থেকেই পালিয়ে এবং উযীর হাশিমের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোজা গিয়ে সেই পুরনো সুরক্ষিত দুর্গে ওঠে এবং সেখানে মযবুত হয়ে বসে। তার পুরনো বন্ধুরা আবার তার চতুষ্পার্শে এসে সমবেত হতে থাকে। এদিকে উমর ইব্‌ন হাফসুন পূর্বের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়ে মালকা এলাকায় স্বাধীন রাজত্ব কায়েম করে বসে। ওদিকে আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ান যার কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, আশবেলিয়া (সেভিল) ও তার আশেপাশে লুটপাট শুরু করে দেয়। সুলতান মুহাম্মাদ তাঁর পুত্র মুনযির এবং উযীর হাশিমকে সৈন্যবাহিনী সহ প্রেরণ করলেন। এভাবে উমর ইব্‌ন হাফসুনের স্বাধীন রাজত্ব কায়েমের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হলো। আশবেলিয়া এলাকায় দু'বছর যাবত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকে। অবশেষে ২৭২ হিজরীতে (৮৮৫-৮৬ খ্রি) আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ানকে আরও সামান্য কিছু ভূখণ্ড দিয়ে তাঁর সাথে চুক্তি করা হলো। এভাবে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তারপর উমর ইব্‌ন হাফসুনকে দমনের উদ্দেশ্যে শাহযাদা মুনযিরকে প্রেরণ করা হলো। উমর ইব্‌ন হাফসুন সেনাপতি পদ ছেড়ে আসা অবধি পূর্বের তুলনায় অনেক সভ্য এবং পরিণামদর্শী হয়ে উঠেছিল। সে কর্ডোভা দরবার এবং হাশিমের সাহচর্য থেকে অনেকাংশে উপকৃত হয়। এবার সে দস্যু ও তস্করের পরিবর্তে একজন শাসক ও রাজ্যপতিরূপে

আত্মপ্রকাশ করে। সর্বপ্রথম সে যে কাজটি করে তা হলো তার শাসনাধীন এলাকায় চুরি-ডাকাতি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়। চোর-ডাকাত ও অত্যাচারীদের জন্য কঠোর ও শিক্ষাপ্রদ শাস্তির ব্যবস্থা করে। বিশেষত সিপাহী ও সেনাপতিদের জন্যে তার রাজত্বে প্রজাপীড়নের বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয়া হতো না। এটা তার রাজ্যের বিস্তৃতি ও শক্তি বৃদ্ধির কারণ হয়ে ওঠে। উমর ইব্‌ন হাফসুন কর্ডোভা দরবার থেকে রাজ্য শাসনের এ রহস্যটিই অর্জন করেছিল। তখন সুলতানের ও সালতানাতের সে প্রভাব-প্রতিপত্তি না থাকায় রাজ্যের সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার জয়জয়কার চলছিল। আর এ অবস্থায় প্রজাদের জানমালের যে কোন নিরাপত্তা ছিল না তা জানা কথা। কিন্তু উমর ইব্‌ন হাফসুন তার ক্ষুদ্র রাজ্যের সীমানার মধ্যে যা সে বলপূর্বক ও বিদ্রোহী তৎপরতার মাধ্যমে দখল করে নিয়েছিল, ঈর্ষণীয় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফলে সেখানকার প্রজাসাধারণ তাকে ভালবাসতো। আশেপাশের লোকজনের মনেও এতে তার প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি হয়।

সুলতান মুহাম্মাদের ওফাত

২৭২ হিজরীর (৮৮৫-৮৬ খ্রি) শেষ দিকে এবং ২৭৩ হিজরীর (৮৮৬-৮৭ খ্রি) প্রারম্ভে ভাবী সুলতান মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মাদ সৈন্যদল নিয়ে উমর ইব্‌ন হাফসুনের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। প্রথম দিকে কয়েকটি ছোটখাটো যুদ্ধ হয়। তারপর উমর ইবন হাফসুনের পরাস্ত, নিহত অথবা গ্রেফতার হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সে আহত হয়েছিল। তাকে এবং তার ফৌজকে মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মাদ অবরোধ করে এমনি অতিষ্ঠ করে তোলেন যে, তার আত্মসমর্পণের উপক্রম হয়েছিল। এমনি সময় মুনযিরের কাছে তাঁর পিতা সুলতান মুহাম্মাদের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র একটুও কালবিলম্ব না করে মুনযির কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হন। এভাবে ভাগ্যবলে উমর ইব্‌ন হাফসুন ও তার দলবল নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পায়।

সুলতান মুহাম্মাদ ২০৭ হিজরীতে (৮২২-২৩ খ্রি) ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তিনি প্রায় ৬৬ বছর বয়সে ২৭৩ হিরজীর সফর (৮৬৬ খ্রি জুলাই) মাসে ৩৪ বছর কয়েক মাস রাজত্ব করার পর ইন্তিকাল করেন।

সুলতান মুহাম্মাদের রাজত্বকালের পর্যালোচনা

সুলতান মুহাম্মাদের রাজত্বকাল জুড়ে স্পেনে অশান্তি বিরাজ করে। একটি দিনও শান্তির সাথে রাজত্ব করা তাঁর ভাগ্যে জুটেনি। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বাইরের চক্রান্তের এক অবিশ্রান্ত ধারা সুলতান মুহাম্মাদকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত ও বিব্রত রাখে। তাঁর শাসনামলে উমাইয়া রাজত্ব অত্যন্ত দুর্বল, শিথিল ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তখন মামুলী পর্যায়ের লোকেরাও বিদ্রোহ ঘোষণার ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে একটুও দ্বিধাবোধ করতো না। উমাইয়া রাজত্বের এ শৈথিল্য ও দুর্বলতা ঈসায়ীদের জন্যে অত্যন্ত উপাদেয় ও সহায়ক প্রতিপন্ন হয়। তারা নিজেদেরকে শক্তিশালী করে স্পেনে পুনরায় ঈসায়ী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে ওঠে।

সুলতান মুহাম্মাদ ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত বীরপুরুষ ও উদ্যমী ছিলেন। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং স্বয়ং মুসলমান সর্দার সেনাপতিদের বিদ্রোহী তৎপরতা রাজ্যের অবস্থাকে এতই শোচনীয় করে তোলে যে, তা মুসলিম রাজত্ব ধ্বংস ও তাদের সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত হওয়ার হেতু হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু ঈসায়ী রাজ-রাজড়া এবং আব্বাসীয় খলীফাগণও স্পেনের মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির জন্যে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু ততদিনে আব্বাসীয়দের বিরোধিতার ধার অনেকটা কমে এসেছিল। তাদের তখন আর স্পেনের সালতানাতের দিকে তাকাবার মত হুঁশ ছিল না।

ঈসায়ীদের বিরোধিতা কোন গোপন ব্যাপার ছিল না। এবার মুসলমানদের মধ্যে যে বিরাট অনৈক্য ও রেষারেষির সৃষ্টি হয় তা ছিল ফকীহদের সংকীর্ণতার ফলশ্রুতি। স্পেনের আলিম সমাজ ও কাযীদের অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের তুলনায় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সর্বদাই অনেকগুণ বেশি ছিল। সেই অনুপাতে স্পেনীয় মুসলমানদের মধ্যে সর্বদাই অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এর প্রথম উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে সুলতান মুহাম্মাদের আমলে। ঐ সময় ইসলামের সবচাইতে বড় যে ক্ষতি হয় তা'হলো, এর পূর্ব পর্যন্ত ঈসায়ীরা অহরহ ইসলাম গ্রহণ করে আসছিল। উত্তরের পার্বত্য এলাকায় ঈসায়ীরা নানাভাবে ইসলামের ও মুসলমানদের দুর্নাম রটনা করে খ্রিস্টান সমাজকে ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বিষ্ট করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সমঝদার ঈসায়ীরা ঈসায়ী ধর্মের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রায়ই ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছিল। এভাবে নওমুসলিমদের এক বিরাট দল প্রত্যেক যুগেই মওজুদ ছিল।

সুলতান মুহাম্মাদের আমলে উলামা ও ফকীহগণ এমন সব ফতওয়া ও ধর্মীয় বিধি-বিধান জারি করে যাতে ঈসায়ীদের পুরনো আমল থেকে পেয়ে আসা সুযোগ-সুবিধাগুলো ব্যাহত হয় এবং নওমুসলিমদের মনে নানারূপ অবিশ্বাস ও অনাস্থা দেখা দেয়। ফলে ইসলাম ত্যাগ করে পূর্ব ধর্মে ফিরে যাওয়ার হিড়িক পড়ে গেল। মুসলমানদের জন্যে এর চাইতে দুঃখজনক ও শিক্ষাপ্রদ আর কি হতে পারে যে, মৌলভীদের সংকীর্ণতা ও কঠোরতা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রশ্রয় লাভ ও প্রভাব বিস্তার করে সুলতান মুহাম্মাদের রাজত্বের শেষ দিকে ধর্মত্যাগীদের এক বিরাট দল সৃষ্টি করেছিল, যারা উত্তর স্পেনে নয় বরং রাজধানী কর্ডোভাতে জন্মলাভ করে উত্তরাঞ্চলের উগ্র খ্রিস্টানদের চাইতেও অধিকতর ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

পরের কথা বলবো কি আর
ঘরেই আমার শত্রুভরা

সুলতান মুহাম্মাদের শাসনামলের শেষ দিকে স্পেন দেশে বিভিন্ন দল ও মতের উদ্ভব হয়। এদের প্রত্যেক দলের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

১. নির্ভেজাল আরবী বংশোদ্ভূতরা– এদের মধ্যেও একতা ছিল না। এদের কয়েকটি উপদল ছিল। যেমন সিরীয়, ইয়ামানী, হেজাযী, হাদরামী প্রভৃতি।

২. মুওয়াল্লিদীন– অর্থাৎ ঐ সব লোক যাদের পিতারা আরব আর মায়েরা ছিল স্পেন দেশীয় খ্রিস্টান। এদেরকে শংকর আরব বলা যেতে পারে। কিন্তু এদের সকলের দেহে আরব রক্ত প্রবাহিত ছিল না। কেননা এরা অধিকাংশই বার্বার পিতা ও স্পেনীয় মায়েদের সন্তান ছিল।

৩. নওমুসলিম– অর্থাৎ যারা প্রথমে খ্রিস্টান ছিল, পরে মুসলমান। তাদের সন্তানরাও নওমুসলিম বলে আখ্যায়িত হতো। তারা ইসলামী অনুশাসন কঠোরভাবে অনুসরণ করতো।

৪. খালেস বার্বার– এদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর।

৫. মজুসী বা অগ্নি উপাসক– এরা ছিল ঐসব লোকের সন্তান-সন্ততি যাদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রীতদাসরূপে কিনে আনা হয়েছিল। এদের সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না।

৬. ইহুদী– এরাও স্পেনের প্রাচীন অধিবাসী ছিল। এদের পেশা ছিল প্রধানত ব্যবসায়-বাণিজ্য। এরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিদ্রোহ থেকে দূরে থাকতে চাইত।

৭. ঈসায়ী– এরা তাদের ধর্মকর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতো। স্পেনে এদের সংখ্যাই ছিল বেশি।

৮. মুরতাদ– এরা ছিল ঐ সমস্ত লোক, যারা সুলতান মুহাম্মাদের শাসনামলে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আবার তাদের কুফরী জীবনে ফিরে যায়।

এই মুরতাদদের সাথে এমন এক সম্প্রদায়ও শামিল ছিল, যারা কোন ধর্মেরই বন্ধন স্বীকার করতো না। লুটপাট ও ডাকাতি-রাহাজানিই ছিল তাদের পেশা।

প্রথমোক্ত চারটি দল ছিল মুসলমান এবং এরাই আসল ইসলামী শক্তি বলে বিবেচিত হতো। বাদশাহ এবং উলামাদের সর্বপ্রথম ফরয ছিল ঐ চারদলের প্রতি সমান আচরণ করা। কিন্তু সুলতান মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে মারাত্মক ত্রুটি ও দুর্বলতা প্রকাশ পায়। মুওয়াল্লিদীনদের সংখ্যা ও শক্তি প্রচুর থাকা সত্ত্বেও তাদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ দেখা দেয়। উলামা সমাজের দলাদলি এবং মালিকী-হাম্বলী হানাহানি নওমুসলিমদের উৎসাহ-উদ্দীপনা নষ্ট করে দেয়। বার্বাররাও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে মুসলমানদের মধ্য থেকে সামগ্রিকভাবে আত্মিক শক্তি তিরোহিত হয়। তাদের নৈতিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। ধর্মীয় জিহাদের প্রতি উৎসাহ উবে যায়। যে সব তলোয়ার একদিন আল্লাহ্র রাহে কোষমুক্ত হতো, তা এখন প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ঝলসে উঠতে থাকে। প্রত্যেক দলের নিকট তাদের দলীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থই বড় হয়ে ওঠে। সুলতান ফকীহ ও আলিমদের সম্মান যে পরিমাণ বৃদ্ধি করলেন, জনগণের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আস্থা সে পরিমাণ তাদের ওপর থেকে হ্রাস পেল। আলিম সমাজের প্রতি জনগণের আস্থার অভাবে ইসলামের প্রতি জনগণের অনুরাগ তিরোহিত হলো। পার্থিব স্বার্থ পারলৌকিক কল্যাণের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে বসলো।

মুসলমান আর তাদের রাজত্বের অবস্থা তো ছিল এই। ওদিকে ঈসায়ীদের রাজ্যসমূহ শনৈঃ শনৈঃ তাদের আয়তন বৃদ্ধি করতে করতে মুসলিম রাজ্যের প্রায় সমপর্যায়ে চলে আসে। তারা ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছিল। ইলাস্ট্রিয়াসের রাজা তৃতীয় আলফোনস্ স্পেনকে মুসলিম শূন্য করার পরিকল্পনা তৈরি করছিল। পর্তুগালের ঈসায়ীরা তাদের স্বতন্ত্র ঈসায়ী রাষ্ট্র গড়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। আশবেলিয়ায় (সেভিলে) ইব্ন মারওয়ান এবং মালাগা প্রভৃতি অঞ্চলে ইব্ন হাফসুন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিল। টলেডো স্বাধীন হয়ে তার সীমানা কর্ডোভার নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করে নিয়েছিল। জালীকিয়া ও আরাগুণ প্রভৃতি

পিরেনীজ পর্বত থেকে স্পেনের পশ্চিত উপকূল অর্থাৎ পর্তুগাল ও আশবেলিয়া পর্যন্ত খ্রিস্টানদের বিজয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলেছিল। এ সুদীর্ঘ জনপদের সারির মধ্যে কোন কোন শহরে জনপদে যে মুসলিম আমিলরা নিযুক্ত ছিল তারাও খ্রিস্টানদের প্রতি সহানুভূতির গানই গাইতো। মোটকথা, সুলতান মুনযির একটি সঙ্কটময় যুগসন্ধিক্ষণে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান মুনযির ইব্ন মুহাম্মাদ

অভিষেক

সুলতান মুনযির ইব্ন মুহাম্মাদ ২২৯ হিজরীতে (অক্টোবর ৮৪৩-সেপ্টেম্বর ৪৪ খ্রি) ভূমিষ্ঠ হন। পিতার মৃত্যুর পর ৪৪ বছর বয়সে ২৭৩ হিজরীর সফর (৮৮৬ খ্রি জুলাই) মাসে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সমগ্র জীবন কাটে যুদ্ধবিগ্রহ ও শক্তি মহড়ার মধ্যে। তাঁর পিতার রাজত্বকালে অনেকবারই তাঁকে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতে হয়।

মুনযিরের কৃতিত্বসমূহ

মুনযির সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর পিতার উযীরে আযম হাশিম ইব্ন আবদুল আযীযের প্রাণ দণ্ডাদেশের ব্যাপারে প্রদত্ত আলিম সমাজের ফতওয়া কার্যকরী করেন এবং তাঁকে পরপারে পৌঁছিয়ে দেন। উমর ইব্ন হাফসুন শুধু মালাগায় নয় অন্যান্য অনেক শহরও দখল করে তার শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। সুলতান মুনযির হাশিমের প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকরী করেই উমর ইব্ন হাফসুনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। ইব্ন হাফসুন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও সাহসী সিপাহসালার হলেও মুনযিরও কোন অংশে কম ছিলেন না। একের পর এক কেল্লা জয় করে ইব্ন হাফসুনের বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে তিনি অগ্রসর হতে থাকেন। অগত্যা ইব্ন হাফসুনকে পরিস্থিতির চাপে সুলতানের খিদমতে সন্ধির আবেদন করতে হয়। সুলতান এ প্রস্তাবকে অত্যন্ত সময়োচিত ও সহায়ক বলে বিবেচনা করলেন, কেননা এ প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে শক্তি ক্ষয় করার চাইতে অন্যান্য বিদ্রোহী দমন করাকে তিনি অধিকতর জরুরী বিবেচনা করেন। সুলতান সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে কর্ডোভা ফিরে আসতে না আসতেই তার পুনরায় বিদ্রোহী হওয়ার সংবাদ এসে পৌঁছে। সুলতান তৎক্ষণাৎ সেখানে ফিরে গিয়ে তাকে অবরোধ করেন। এবারও ইব্ন হাফসুন পূর্বের তুলনায় অধিক কাকুতি-মিনতির সাথে ক্ষমার আবেদন করে এবং কৃতকর্মের জন্যে গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করে। সে সুলতানের সাথে কর্ডোভা যেতেও সম্মত হয়। সুলতান এ প্রস্তাবটি লুফে নেন। অত্যন্ত সম্মানের সাথে এই বিদ্রোহী নেতাকে নিজের সাথে নিয়ে তিনি কর্ডোভার দিকে রওয়ানা হন।

সুলতানের ইচ্ছে ছিল, কর্ডোভায় পৌঁছেই কালবিলম্ব না করে টলেডো আক্রমণ করবেন। এই কেন্দ্রীয় শহরটিকে সর্বপ্রথম করায়ত্ত করে তারপর অন্য দিকে মনোযোগ দেবেন। এটা ছিল সুলতান মুনযিরের বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনতারই পরিচায়ক। বরং বলা যেতে পারে যে, টলেডোর অবস্থানগত গুরুত্ব এবং এর রাজধানী হওয়ার মত উপযোগিতার কথা ইতিপূর্বে উপলব্ধি না করে মুসলমানরা ভুলই করেছিলেন। তারা যদি আগেই এ শহরটিকে

রাজধানীরূপে গ্রহণ করতেন তাহলে কর্ডোভাকে রাজধানী করায় তারা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাদেরকে সেগুলোর সম্মুখীন হতে হতো না তা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। টলেডোর অবস্থান ছিল স্পেন দেশের মধ্যভাগে। এটি ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত ও মযবুত শহর। এখানে রাজধানী হলে উত্তরাঞ্চলের উগ্র খ্রিস্টানদের রাজ্যসমূহের উত্থানের ও শক্তিশালী হওয়ার পথই রুদ্ধ হয়ে থাকতো। সে যাই হোক সুলতান মুনযির টলেডো বিজয়ের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। বাহ্যত তিনি উমর ইব্‌ন হাফসুনের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে কেউ একজন তাকে ফকীহদের ফতওয়ায় যে তার কি ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। অথচ সুলতান তার দ্বারা কোন দায়িত্বপূর্ণ পদের খিদমত নেবার জন্যে মনেপ্রাণে কামনা করতেন। কিন্তু যখন উমর ইব্‌ন হাফসুনের সে ঘটনার কথা মনে হলো যে, কেবল ফকীহদের বিরোধিতাই তাকে হিশাম ইব্‌ন আবদুল আযীদের বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে এবং ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিতে বাধ্য করেছিল এবং যখন সে অবগত হলো যে, হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক নিজেও ঐ হযরতদের ফতওয়ার শিকার হয়ে প্রাণদণ্ডাদেশে দণ্ডিত হয়েছেন, তখন সে তার নিজের প্রাণদণ্ডাদেশের ব্যাপারে নিশ্চিত হলো। তাই কর্ডোভায় গিয়ে পৌঁছবার পূর্বেই সে গোপনে কেটে পড়লো এবং সোজা নিজের দুর্গে গিয়ে উঠলো এবং সুদৃঢ় দুর্গাভ্যন্তরে স্বেচ্ছা অবরোধ তথা আশ্রয় গ্রহণ করলো। তারপর চতুর্দিক থেকে তার লোকজনকে এনে সেখানে জড়ো করলো।

সুলতান মুনযিরের ওফাত

অগত্যা সুলতান মুনযিরকে আবারও সেদিকে অভিযান চালাতে হলো। এবার তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে কেল্লা অবরোধ করলেন। উমর ইব্‌ন হাফসুনও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাঁকে প্রতিরোধ করে। সে অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। কেল্লাটি জয় করার পূর্বেই অবরোধ চলা অবস্থায়ই মাত্র দু'বছরেরও কম সময় রাজত্ব করে সুলতান মুনযির প্রায় ৪৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

সুলতানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাই বাহিনীর আমীর-উমারা মুনযিরের ভাই আবদুল্লাহর হাতে কিল্লার প্রাচীরের ছায়াতলে বায়আত পর্ব সম্পন্ন করলেন। আবদুল্লাহ উমর ইব্‌ন হাফসুনের রাজত্বকেও যথারীতি স্বীকৃতি প্রদান করলেন। উমর ইব্‌ন হাফসুন একে সুবর্ণ সুযোগরূপে গণ্য করলেন। আবদুল্লাহ মুনযিরের শবদেহ নিয়ে কর্ডোভায় উপনীত হন। পথে আরব সর্দারদের বিরূপ সমালোচনা ও কানাঘুষা সীমা অতিক্রম করে। তারা সুলতান আবদুল্লাহ্‌র সমালোচনার এতই বাড়াবাড়ি করে যে, কর্ডোভা পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে গোটা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আবদুল্লাহ যখন সুলতান মুনযিরের শবদেহ নিয়ে কর্ডোভায় গিয়ে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর বাহিনীতে একশ'রও কম সৈন্য অবশিষ্ট ছিল।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদের প্রথম দুর্বলতা

সুলতান আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেই এ দুর্বলতা প্রদর্শন করলেন যে, তিনি উমর ইব্‌ন হাফসুনের রাজত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করে অবরোধ প্রত্যাহার

করে নিলেন। অথচ তাঁর হাতে সুবর্ণ সুযোগ ছিল। তিনি দুর্গটি জয় করে তাঁর রাজত্বের সূচনালগ্নেই একটি সুনামের ও গৌরবের অধিকারী হতে পারতেন। দীর্ঘ অবরোধে অতিষ্ঠ উমর ইব্ন হাফসুনকে গ্রেফতার বা হত্যা করে তিনি কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করতে পারতেন।

আবদুল্লাহ্র আমলে বনূ উমাইয়ার রাজত্বের অবস্থা

আবদুল্লাহ্র সিংহাসনে আরোহণকালে অর্থাৎ ২৭৫ হিজরীতে (৮৮৮-৮৯ খ্রি) স্পেন সরকার তথা বনূ উমাইয়ার রাজত্বের অবস্থা এতই জরাজীর্ণ ও শোচনীয় ছিল যে, রাজস্ব ভাণ্ডার একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছিল। বার্ষিক রাজস্ব আয় যেখানে একদিন দশ লক্ষ দীনারে উপনীত হয়েছিল, সেখানে তা নেমে বার্ষিক এক লক্ষ দীনারে এসে গিয়েছিল। ঈসায়ী রাজ্যগুলোর কথা বাদ দিলেও রাজধানী কর্ডোভার দু'দিকে এমন দুটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যাদের শক্তি কোন অংশেই কর্ডোভার সরকারের চাইতে কম ছিল না। তার একদিকে ছিল ইব্ন হাফসুন আর অপরদিকে ইব্ন মারওয়ান। ইব্ন হাফসুন ছিল অত্যন্ত সমঝদার, বুদ্ধিদীপ্ত এবং পারঙ্গম ব্যক্তি। তার শাসন পদ্ধতিই এমন ছিল যে, লোক তার দিকে আকৃষ্ট হতে এবং তার অধীনে বাস করতে পছন্দ করতো। কিন্তু সে যেহেতু প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগের কথা ঘোষণা করেছিল, তাই অনেক মুসলমান তাকে সহযোগিতা করা পছন্দ করতো না। এর জন্যই তারা তার পরিবর্তে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্ন মারওয়ানের শরণাপন্ন হতো। ইব্ন হাফসুন নিজেকে মুরতাদ বলে ঘোষণা করলেও ঈসায়ী রাজ্যগুলোর সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ইব্ন মারওয়ান নিজে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইলাস্ট্রিয়াসের খ্রিস্টান রাজা আলফোনসূর সাথে এবং অন্যান্য খ্রিস্টান রাজার সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং তাদের সহযোগী বন্ধু ছিলেন। আশবেলিয়ার আশেপাশে কোন কোন আরব সর্দারের জায়গীর ছিল। তাঁরা সেখানেই অবস্থান করতেন। এ অবস্থা লক্ষ্য করে তাদের কেউ কেউ বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করলেন এবং আশবেলিয়ায় তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করলেন। ওদিকে ঐ ধরনের জায়গীরদার আরবরা গ্রানাডা এলাকায় বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে গ্রানাডা দখল করে বসে। অন্য কথায়, ইব্ন হাফসুন ও ইব্ন মারওয়ানের মুকাবিলায় আরো দুটি শক্তি আত্মপ্রকাশ করে। তারপর ঐ চারটি শক্তির মধ্যে ঘুরেফিরে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকে। কর্ডোভা দরবারের এখন আর সে শক্তি ছিল না যে, ঐ সবকে বাধ্য ও পদানত করে রাখবে। বরং এখন সুলতান আবদুল্লাহর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল এই যে, তিনি কর্ডোভা এলাকার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে মাঝে মাঝে ঐ চারটি শক্তির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে তাদের যুদ্ধকে সন্ধিতে রূপান্তরিত করে দিতেন। ঐ চারটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যেহেতু প্রত্যেকেই একে অপরের বিরুদ্ধে ছিল, তাই তাদের সকলেই কর্ডোভার নেতৃত্ব কর্তৃত্বকে মেনে নিতো এবং সুলতানকে তাদের বাদশাহ বলে অভিহিত করতো, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত ছিল। তারা সুলতান আবদুল্লাহকে কোন রাজস্ব প্রদান করতো না। উপরোক্ত আরব সর্দারদের আচরণ মুওয়াল্লিদীন ও নওমুসলিমদের সাথে মোটেই ভাল ছিল না। এজন্যে মুওয়াল্লিদীন ও নওমুসলিমদের এক বিরাট অংশ ইব্ন মারওয়ানের কাছে চলে যায়।

এ পর্যায়ে উত্তরাঞ্চলীয় শহরসমূহের দু'জন মুসলিম আমিল সারাকসতা ও শান্তবারিয়া এলাকায় ঈসায়ীদের স্পেনকে মুসলিম শূন্য করার পরিকল্পনাকে দারুণভাবে বিঘ্নিত করেন।

ইলাস্ট্রিয়াসের রাজা যখন তাঁর বাহিনী নিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তারসুনা নামক স্থানের আমিল লুব ইব্‌ন মুহাম্মাদ তাঁর স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের একটি বাহিনীর সাহায্যে ঈসায়ী সৈন্যদের উক্ত বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। ওদিকে আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ান তাঁর মিত্র ইলাস্ট্রিয়াসের রাজাকে এ মর্মে হুঁশিয়ার করে দেন যে, তিনি যদি তাঁর রাজ্যসীমা অতিক্রম করে এক পাও অগ্রসর হন, তাহলে তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর মুকাবিলায় অগ্রসর হবেন। এ হুমকি-ধমকিতে কাজ হলো এই যে, খ্রিস্টানরা আরো কিছুদিন চুপ থাকাই সমীচীনবোধ করলো। কেননা, তারা জানতো যে, বহিরাক্রমণ হলে মুসলমানদের আত্মকলহ থেমে যাবে এবং তাদের মধ্যে নতুন করে ঐক্যবোধের সঞ্চার হবে। তাদের মধ্যকার যে পারস্পরিক বৈরী সম্পর্ক তাদেরকে দুর্বল করে তুলছে তা বাধাগ্রস্ত হবে।

ওদিকে ইব্‌ন হাফসুন বুদ্ধি খাটিয়ে আফ্রিকার আগলাবী রাজবংশের সাথে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে তাদেরকে অনুরোধ জানালেন যে, তারা যেন বাগদাদের আব্বাসী খলীফাদের নিকট থেকে তাঁর নামে স্পেন শাসনের সনদ হাসিল করে তাঁকে স্পেনের বৈধ শাসক বলে স্বীকৃতি নিয়ে দেন। এ প্রচেষ্টায় যদিও ইব্‌ন হাফসুন কৃতকার্য হন নি, কিন্তু এ সংবাদ কর্ডোভায় দারুণ চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের সঞ্চার হয়। সুলতান আবদুল্লাহ্ তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে সৈন্য সংগ্রহ করে ইব্‌ন হাফসুনের ওপর কালবিলম্ব না করে হামলা চালালেন। কেননা, আবদুল্লাহ উত্তমরূপে জানতেন যে, উমর ইব্‌ন হাফসুনের কাছে আব্বাসীয় খলীফার সনদ এসে পৌঁছে গেলে সাধারণভাবে লোকজন তার দিকেই ঝুঁকে পড়বে। তারপর স্পেনে উমাইয়া বংশীয়দের অস্তিত্বই আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। সুলতান আবদুল্লাহ তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেও চৌদ্দ হাজারের বেশি সৈন্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন না, পক্ষান্তরে ইব্‌ন হাফসুনের কাছে তখন ত্রিশ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী ছিল। অবশেষে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো। সুলতান আবদুল্লাহ আর তাঁর সহযাত্রীরা এ যাত্রায় অসাধারণ বীরত্ব ও শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করলেন। তারা ইব্‌ন হাফসুনকে যুদ্ধে পরাস্ত করে পার্বত্য অঞ্চলের দিকে তাড়িয়ে দিলেন। বিদ্রোহী সৈন্যদের অনেকেই নিহত হলো। সুলতান আবদুল্লাহর রাজ্যসীমা কিছুটা বিস্তৃত হলো। এ জয়ের প্রভাব কর্ডোভা সরকারের পক্ষে অত্যন্ত শুভ হলো। সালতানাতের যে দাপট ও গৌরব একেবারে শূন্যের কোটায় নেমে গিয়েছিল তা কতকটা উদ্ধার হলো।

আবদুল্লাহ্‌র বাস্তব উদ্যোগ

ওদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মারওয়ান ঐ সময়ই আশবেলিয়ার স্বাধীন রঈস ইবরাহীম ইব্‌ন হাজ্জাজের সাথে সন্ধি করে আপন শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস পেলেন। সুলতান আবদুল্লাহ উপরোক্ত জয়ের প্রভাব লক্ষ্য করে ইব্‌ন মারওয়ানের শক্তি খর্ব ও দর্প চূর্ণ করার জন্যে তার উপর হামলা চালানো জরুরীবোধ করলেন। উযীর আহমদ ইব্‌ন আবী উবায়দাকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে ইব্‌ন মারওয়ানকে দমনের জন্যে প্রেরণ করা হলো। ইব্‌ন মারওয়ান আশবেলিয়ার ওয়ালী ইবরাহীম ইব্‌ন হাজ্জাজের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ইবরাহীমও সাহায্য প্রেরণের জন্যে প্রস্তুত হলেন। উভয়ে সম্মিলিতভাবে আহমদ ইব্‌ন আবী উবায়দার মুকাবিলা

করলেন। এ যুদ্ধেও সুলতান পক্ষের দাপট কার্যকর প্রমাণিত হয় এবং বিদ্রোহীরা পরাজয় বরণ করে। এ পরাজয়ের পর ইবরাহীম ইব্ন হাজ্জাজ আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন। সুলতান আবদুল্লাহ তাঁকে আশবেলিয়ার আমিলরূপে নিয়োগ প্রদান করেন। এ যুদ্ধের ফলাফল প্রথম যুদ্ধের ফলাফলের চাইতেও অধিকতর কার্যকর প্রতিপন্ন হয়। ফলে রাজ্যের পরিধির সাথে সাথে তার মানমর্যাদাও প্রথম দফার তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়। এ ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পরই আবদুর রহমান ইব্ন মারওয়ান মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পুত্ররা টলেডো প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করতে শুরু করেন। এদিকে আশবেলিয়ার শাসক ইবরাহীম ইব্ন হাজ্জাজ তার রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা তাঁর রাজত্বভুক্ত করে নেন। উমর ইব্ন হাফসুন সুলতান আবদুল্লাহর হাতে পরাজয় বরণ করে পাহাড়ী এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সুলতান রাজধানীতে ফিরে যেতেই উমর ইব্ন হাফসুন শনৈঃ শনৈঃ তার শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে এবং নিজ অবস্থার উন্নতি সাধন করতে থাকে।

ইলাস্ট্রিয়াসের রাজা আলফোনস্ এবং তার ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। আলফোনস্ নিজের সান্ত্বনার জন্যে সুলতান আবদুল্লাহর সাথে পত্র যোগাযোগ করে সন্ধি নবায়নের প্রস্তাব দেন। সুলতান কালবিলম্ব না করে এ মর্মে সন্ধিবদ্ধ হলেন যে, আলফোনসু বা সুলতান কেউই তার বর্তমান রাজ্য সীমানা ছেড়ে একটুও বাইরে পা দেবেন না। এই অনাক্রমণ চুক্তি আলফোনসূর জন্যে সবদিক দিয়ে লাভজনক হয়। কেননা, এতকাল মুসলমানরা তার রাজ্যকে তাদেরই রাজ্য বলে অভিহিত করতেন। এখন সুলতান এ চুক্তির মাধ্যমে যথারীতি তার স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন। এতে তার সাহস ও মনোবল অনেকগুণ বৃদ্ধি পেল।

ওদিকে নিত্য-নৈমিত্তিক যুদ্ধবিগ্রহ ও বিদ্রোহে প্রজাসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আর এ অশান্তি যেহেতু দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল তাই লোকজন কর্ডোভা দরবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে অলাভজনক এবং বিদ্রোহীদেরকে সমর্থন দানকে পাপ কাজ বলে ভাবতে শুরু করেছিল। তাই নতুন ব্যবস্থা সকলের মনঃপূত এবং এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে আশবেলিয়া একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যরূপে পূর্বদিকে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এছাড়া অবশিষ্ট এলাকা এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সকলেই যার যার রাজ্যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতো এবং কর্ডোভা দরবারকে বাহ্যিকভাবে সম্মান প্রদর্শন করতো।

ঈসায়ী রাজ্যগুলোর উত্তরাধিকারী নির্ণয় নিয়ে হঠাৎ করে বিরোধ সৃষ্টি হয়। অন্তর্দ্বন্দ্বের দরুন তাদের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র আক্রমণ করার আর অবকাশ ছিল না।

সন্তান-সন্ততি

সুলতান আবদুল্লাহ্র এগার জন পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দু'জন মাতরাফ এবং মুহাম্মাদ শাসনকার্য পরিচালনায় যোগ্যতর পাত্র এবং তাঁরা রাজকার্যে জড়িত ছিলেন। এ দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও রেষারেষিরও সৃষ্টি হয়।

রাজ্যের যোগ্যতর লোকেরা আশবেলিয়া (সেভিল) রাজ্যে গিয়ে উঠেছিল। কেননা, সেখানে জ্ঞানী-গুণীদের খুব কদর ছিল। কর্ডোভার রাজকোষ ছিল অর্থশূন্য। আশবেলিয়ার

নবগঠিত রাজ্যের দরবার ইবরাহীম ইব্ন হাজ্জাজের গুণগ্রাহী চরিত্রের কারণে কর্ডোভার জন্যে ঈর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। এখানকার নীচমনা অমাত্য-আমলারা দুই ভাইয়ের বিরোধে ইন্ধন যোগাতে থাকে। মাতরাফ তাঁর ভাই মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগ পেয়ে যান। তিনি তাঁর পিতার মনকে তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলার প্রয়াস পান। তাঁর সমর্থক আমীর-উমারাগণ এতে তাঁকে সমর্থন যোগাতে থাকেন। সুলতান আবদুল্লাহ্ পুত্র মুহাম্মাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে ওঠেন। অগত্যা মুহাম্মাদ কর্ডোভা থেকে পালিয়ে উমর ইব্ন হাফসুনের ওখানে চলে যান। কয়েকদিন সেখানে অবস্থানের পর কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে সেখান থেকে তিনি পিতার নিকট প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে তাঁর দরবারে তাকে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। আবদুল্লাহ্ তাঁকে প্রাণ রক্ষার অভয় দিয়ে ডেকে পাঠান। এবার মাতরাফের আরো বেশি অভিযোগের সুযোগ হলো। কয়েক দিন পর আবদুল্লাহ্ তাঁর পুত্র মুহাম্মাদকে রাজপ্রাসাদের একটি অংশে নজরবন্দী করেন। সুলতান আবদুল্লাহ্কে কয়েকদিনের জন্যে একটি অভিযান উপলক্ষে রাজধানীর বাইরে যেতে হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজ্যের কাজকর্ম চালানোর দায়িত্ব তিনি মাতরাফের উপর ন্যস্ত করে যান। এ সুযোগে মাতরাফ রাজপ্রাসাদে বন্দী তাঁর ভাই মুহাম্মাদকে হত্যা করিয়ে দেন। আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদের এ হত্যাকাণ্ডে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি মুহাম্মাদের পুত্র আবদুর রহমানকে অত্যন্ত যত্নসহকারে লালন-পালন করতে থাকেন। তারপর ২৮৩ হিজরীতে (৮৯৬ খ্রি) মাতরাফ কোন এক ব্যাপারে মনোমালিন্য হওয়ায় উযীর আবদুল মালিক ইব্ন উমাইয়াকে হত্যা করেন। এবার আবদুল্লাহ্র ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। মুহাম্মাদ ও আবদুল মালিককে হত্যার অপরাধে তিনি মাতরাফকে হত্যা করান।

ওফাত

সুলতান আবদুল্লাহ্ ৩০০ হিজরীর ১ রবিউল আউয়াল (অক্টোবর ৯১২ খ্রি) তারিখে পঁচিশ বছরের কিছু বেশি কাল রাজত্ব করে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

সুলতান আবদুল্লাহ্র গোটা রাজত্বকাল ফিতনা-ফাসাদ ও রাজ্যের দুর্বলতা অক্ষমতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। তাঁর আমলে ফকীহগণ একে অপরের পেছনে লেগেই থাকতেন এবং একে অপরকে জব্দ করার চেষ্টা করতেন। তাঁরা অহেতুক বিতর্কে কালক্ষেপণ করতেন। মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের সেই গৌরব পুনরুদ্ধারের কোন উপায়ই আর চোখে পড়ছিল না। এমনি দুর্যোগময় ও হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে সুলতান আবদুল্লাহ্র পর তাঁর কিশোর পৌত্র আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ছানী অর্থাৎ সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমানের প্রপৌত্র আবদুর রহমান সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

তৃতীয় আবদুর রহমান

অভিষেক

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের প্রপৌত্র আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ তাঁর পিতামহ আবদুল্লাহ্র পর একত্রিশ বছর বয়সে ১ রবিউল আউয়াল ৩০০ হিজরীতে (অক্টোবর ৯১২ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন। এটা ছিল এমন এক যুগসন্ধিক্ষণ যখন তারিক ও মূসার বিজিত ও আবদুর রহমান আদ-দাখিলের প্রতিষ্ঠিত স্পেন রাজত্ব খণ্ডবিখণ্ড ও শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে বাহ্যত তা খ্রিস্টান দখলে চলে যাওয়ার সর্বপ্রকার প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়ে এসেছিল। কিন্তু ভাগ্যনিয়ন্তা সর্বশক্তিমানের তখনো তা মঞ্জুর ছিল না। এ তরুণ সুলতানের অভিষেককালে তাঁর এমন অনেক চাচা মওজুদ ছিলেন যারা বয়স ও যোগ্যতার বিচারে তার তুলনায় অগ্রগণ্যই ছিলেন। কিন্তু হয় তাঁদের সততা ও সদিচ্ছার জন্যে নতুবা এমন নিশ্চিত মৃত্যুপথ যাত্রী সালতানাতের শাসনভার হাতে নিয়ে সঙ্কটের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে তাঁদের কেউই এ পদ গ্রহণের জন্যে এগিয়ে আসেননি বরং তাদের সকলেই হাসিমুখে এই তরুণকে তাঁদের বাদশাহ্‌রূপে বরণ করে নেন। ফলে, অভিষেককালে কোনরূপ গোলযোগ দেখা দেয়নি।

সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান অভিষেককালে এজন্যেও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে যে, এ তরুণ সুলতান স্বল্প বয়সেই তাঁর পিতামহের তত্ত্বাবধানে এমন উত্তম ও উঁচুমানের শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করেন এবং তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি ও মেধা এত উঁচুমানের ছিল যে, বড় বড় জ্ঞানীগুণী এবং আলিম-ফকীহ্‌গণও তাঁর প্রতি রীতিমত ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তাঁর সুমধুর চরিত্র ও মার্জিত আচরণ কর্ডোভা দরবারের আমলা-অমাত্যদেরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ও শুভাকাঙ্ক্ষী করে তুলেছিল। তিনি যে কেবল জ্ঞান-চর্চার মজলিসেরই মধ্যমণি ছিলেন এবং সেখানেই কেবল সম্মানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাই নয়, বরং সেকালের প্রথানুযায়ী সামরিক বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

প্রথম ফরমান

সিংহাসনে বসেই এ তরুণ সুলতান ফরমান জারি করলেন যে, রাজকোষ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর পূর্বসূরিরা বিশেষত সুলতান আবদুল্লাহ্ যে সব কর প্রজাদের উপর ধার্য করেছিলেন আর যে সব বিধি-বিধান শরীয়তের পরিপন্থী ছিল সে সব কর ও ফরমান বাতিল করা হলো। এ ঘোষণার শুভ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। প্রজাসাধারণ তাঁর গুণগানে মেতে ওঠে এবং সকলের মনে একটি আশার আলো দেখা দেয়।

তারপর সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান এ মর্মে ঘোষণা দান করেন যে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে আসবে এবং ভবিষ্যতেও অনুগত থাকার অঙ্গীকার করবে, তার অতীতের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়া হবে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যে এ ক্ষমার ঘোষণা প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সুলতানের দরবার থেকে ঈসায়ী, ইহুদী ও মুসলমান সকলেই সমান ব্যবহার পাবে। সকলের জন্যই ন্যায়বিচার ও আদল নিশ্চিত থাকবে। লোকজন যেহেতু দীর্ঘ অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধে অতিষ্ঠ ও জর্জরিত হয়ে উঠেছিল, তাই যে সব ছোট ছোট সর্দার কর্ডোভার নিকটবর্তী এলাকায় ছিলেন এবং নিজেদেরকে কর্ডোভার সুলতানের অধীনতা বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন এ ঘোষণা শোনামাত্র তাঁরা সুলতান আবদুর রহমানের খিদমতে পৌঁছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করতে লাগলেন। এ ভাবে প্রচুর রাজস্ব রাজকোষে এসে জমা হয় এবং বর্ধিত কর মওকুফের দ্বারা রাজকোষের যেটুকু ঘাটতি পড়েছিল, তা অনায়াসেই পূর্ণ হয়ে যায়।

দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি

এখন কেবল দুটি শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি অবশিষ্ট রইল যারা তুলনামূলকভাবে কর্ডোভার নিকট ছিল এবং এদের পক্ষ থেকে অঘটন ঘটবার আশংকা ছিল। প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিটি হচ্ছে উমর ইব্‌ন হাফসুন। সে মালাগা, রায়া, বিশতর প্রভৃতি এলাকায় রাজত্ব করছিল এবং উবায়দীদের সাথে করে কর্ডোভা সালতানাতকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়ার যোগসাজশে লিপ্ত ছিল। উমর ইব্‌ন হাফসুন এজন্যও বিপজ্জনক ছিল যে, সে একদিকে উবায়দী এবং অপর দিকে উত্তরের ঈসায়ী রাজাদের সাহায্য লাভ করতে পারতো। উবায়দীরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বনূ উমাইয়াদের শত্রু ছিল, যেমনটা শত্রু ছিল তারা আব্বাসীদেরও। আর ঈসায়ীদের কাছে এজন্যে প্রিয় ছিল যে, সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে পুনরায় ঈসায়ী ধর্মে ফিরে গিয়েছিল। অপর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিটি ছিল আশবেলিয়া রাজা। সেখানে আরবদের রাজত্ব ছিল আর শানশওকতের দিক থেকে আশবেলিয়া দরবার কর্ডোভা দরবার থেকে বেশি জৌলুসপূর্ণ মনে হতো। আবদুর রহমান সর্বপ্রথম আশবেলিয়া দরবারের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্যে উদগ্রীব ছিলেন। আশবেলিয়ার শাসক ইবরাহীম ইব্‌ন হাজ্জাজের মৃত্যুর পর সেখানে তার স্থলাভিষিক্তরূপে সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন হাজ্জাজ ইব্‌ন মুসলিমা। আশবেলিয়ার অনেক সর্দারই সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। আশবেলিয়া দরবারও এ সময় একটি কলহ বাঁধানো সঙ্গত বিবেচনা করলো না।

প্রথম অভিযান

আশবেলিয়ার দিক থেকে সামরিক তৎপরতা চালানো হবে না এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে তৃতীয় আবদুর রহমান একটি সৈন্যবাহিনীকে গঠন করে তাঁর আযাদকৃত গোলাম বদরের নেতৃত্বে উমর ইব্‌ন হাফসুনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। এ অভিযানটি তিনি তাঁর সিংহাসনে আরোহণের প্রথম বছরই অর্থাৎ ৩০০ হিজরীতে (আগস্ট ৯১২ খ্রি-জুলাই '১৩ খ্রি) প্রেরণ করেন। বদর একের পর এক উমর ইব্‌ন হাফসুনের দুর্গসমূহ দখল করতে লাগলেন। উমর

ইব্ন হাফসুন সমভূমিতে তার অনেক দুর্গের পতনের পর পার্বত্য এলাকায় দুর্গে গিয়ে আত্মগোপন করলো। বদর অনেক গনীমত সম্ভার নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসলেন। এবার লোকজন পরম উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সুলতানী বাহিনীতে এসে ভর্তি হতে লাগলো।

বিদ্রোহসমূহের মূলোৎপাটন

৩০১ হিজরীতে (৯১৩-১৪ খ্রি.) সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান ইব্ন মুসলিমার পক্ষ থেকে অসঙ্গত আচরণ লক্ষ্য করে এবং আশবেলিয়ার কয়েকজন আমীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়ে আশবেলিয়ার ওপর আক্রমণ চালান। ইব্ন মুসলিমা উমর ইব্ন হাফসুনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। উমর ইব্ন হাফসুন এটাকে সুবর্ণ সুযোগ ভেবে এভাবে তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে যে, সুলতানী বাহিনী যখন আশবেলিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়, তখন তার বাহিনী পিছন দিক থেকে সুলতান বাহিনীকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হয়। সুলতান আবদুর রহমান উমর ইব্ন হাফসুনের বাহিনীকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। ইব্ন মুসলিমাও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ইব্ন মুসলিমা বন্দী হয়। সুলতান আশবেলিয়ায় তার একজন গভর্নর নিয়োগ করেন। সুলতানকে এজন্যে তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি। কারণ স্বয়ং ইব্ন মুসলিমার আত্মীয়-স্বজন ও তার দরবারের অনেক আমলা-অমাত্যরাও চাইতেন যে, আশবেলিয়া যেন তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ে। আশবেলিয়া দরবারের একজন মশহুর সর্দার ছিলেন ইসহাক ইব্ন মুহাম্মাদ। আশবেলিয়া বিজিত হওয়ার পর তিনি কর্ডোভায় চলে আসেন। তাঁর যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে সুলতান আবদুর রহমান তাঁকে উযীর পদে অভিষিক্ত করেন। তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র আহমদ ইব্ন ইসহাক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

এভাবে সালতানাতের সংহতি ও মর্যাদার উন্নতি সাধিত হলে সুলতান আবদুর রহমান সৈন্যবাহিনী অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত করে উমর ইব্ন হাফসুনকে উৎখাত করা জরুরী মনে করলেন। ৩০৪ হিজরী (৯০৫-৬ খ্রি.) তিনি সেদিকে সৈন্য প্রেরণ করলেন। উমর ইব্ন ফাফসুন এ সময় উবায়দীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেখান থেকে যে সব জাহাজ তার সাহায্যার্থে আসে আবদুর রহমান সেগুলোকে তাঁর নৌবাহিনী দিয়ে প্রতিরোধ করেন এবং ইব্ন হাফসুনের নিকটে ঘেঁষতেই দেন নি। সাগরবক্ষেই তিনি সেগুলো আটক করেন। ইব্ন হাফসুন হতাশ হয়ে পড়ে। সে যখন পার্বত্য অঞ্চলে অবরুদ্ধ হয়ে একান্তই নিরূপায় হয়ে পড়লো, তখন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইসহাকের মাধ্যমে সুলতানের কাছে এ মর্মে আবেদন পত্র পাঠালো যে, সে ভবিষ্যতে অনুগত হয়ে থাকবে। তিনি যেন দয়াপরবশ হয়ে সন্ধির প্রস্তাবে রাযী হন। সুলতান তার উর্বর জলসেচের সুবিধাপূর্ণ এলাকাসমূহ নিজ দখলে এনে সামান্য অনুর্বর পাহাড়ী এলাকা তার হাতে ছেড়ে দিয়ে সেদিক থেকে পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে কর্ডোভায় ফিরে আসেন।

তারপর একটি বাহিনীকে তাঁর উযীর ইসহাক ইব্ন মুহাম্মাদের নেতৃত্বে মারসিয়া ও বালানসিয়ার বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। ইসহাক ইব্ন মুহাম্মাদ সেখানকার বিদ্রোহীদেরকে অনুগত করে কারমূনা আক্রমণ করেন এবং হাবীব ইব্ন

সাওয়ারার কবল থেকে তা মুক্ত করে সুলতানের রাজ্যভুক্ত করলেন। ঐ বছরই সুলতানের আযাদকৃত ক্রীতদাস বদর লাবলা আক্রমণ করে সেখানকার বিদ্রোহী সর্দার উসমান ইব্‌ন নসরকে গ্রেফতার করে কর্ডোভায় পাঠিয়ে দিলেন। ৩০৬ হিজরীতে (৯১৮-১৯ খ্রি.) ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ সামবার্না দুর্গ জয় করে সেখানকার বিদ্রোহীদেরকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

সুলতানের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত

৩০৮ হিজরীতে (৯২০-২১ খ্রি.) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল জব্বার ইব্‌ন সুলতান মুহাম্মাদ এবং কাযী ইব্‌ন সুলতান মুহাম্মাদ সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্তে লিপ্ত হন এবং সিংহাসন অধিকার করার উদ্দেশ্যে সুলতানকে হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। ঘটনাচক্রে ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যকার একজন সমুদয় বিবরণ সুলতানকে অবহিত করে। সুলতান তাতে অধীর না হয়ে অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে বিষয়াদির তদন্ত করেন এবং তাদের অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর তাদেরকে হত্যা করলেন।

৩০৯ হিজরীতে (৯২১-২২ খ্রি.) তারসাভী দুর্গ বিজিত হয়। ঐ বছরই আহমদ ইব্‌ন হামদানী যিনি জামা দুর্গ অধিকার করে রেখেছিলেন এবং সুলতানের আনুগত্য বিমুখ ছিলেন পরে তাঁর নিকট স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনুগত্য গ্রহণ করেন এবং জামানত স্বরূপ আপন পুত্রকে কর্ডোভায় পাঠিয়ে দেন। মোদ্দাকথা, যে সব ছোট ছোট সর্দার বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন একের পর এক তাদের সকলেই হয় আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করেন অথবা ঘাতকদের হাতে নিহত হন। এভাবে কর্ডোভার শাসনাধীন রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত হয়ে সুলতান আবদুল্লাহ্‌র সময়কার দুরবস্থা কেটে যায়। অন্য কথায়, যে বিশাল এলাকা শতধা বিভক্ত হয়ে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তা পুনরায় একীভূত হয়ে এক ঐক্যবদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে।

ঈসায়ী অধিকৃত অঞ্চলসমূহের বিবরণ

এবার ঈসায়ী অধিকৃত এলাকাসমূহের বিবরণ শুনুন। সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী দক্ষিণ উপকূলের পাশের পার্বত্য অঞ্চলটি ইব্‌ন হাফসুনের অধিকারে ছিল। এ ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টানরাই ছিল তাঁর সঙ্গী-সাথী। তাই এটা ছিল একটা ঈসায়ী রাজ্য। ইব্‌ন হাফসুনের অভিমত নেতৃত্বের কারণে এটাকে একটি মজবুত ঈসায়ী শক্তিরূপে মনে করা হতো। তবে তার সাথে সুলতানের সন্ধি হয়েছিল।

টলেডো ঃ টলেডো ছিল একটি সুরক্ষিত ও দুর্জয় স্থান যা দখল করা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। সুলতান আবদুল্লাহ্‌র শাসনামলে এখানে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য গড়ে ওঠে। এখন কর্ডোভার সাথে তার কোন আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিল না। এ রাজ্যটি স্পেনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত এবং এটি ছিল একটি মজবুত খ্রিস্টান শক্তি।

বার্সেলোনা ঃ এখানে সুদীর্ঘকাল থেকে ঈসায়ী হুকুমত কায়েম ছিল।

আলবুনিয়া ঃ এখানেও একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ঈসায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

নওয়ার ঃ আলবুনিয়া সন্নিহিত অঞ্চলে ফরাসীরা একটি শক্তিশালী খ্রিস্টান রাজ্য কায়েম করেছিল।

ইলাস্ট্রিয়াস ঃ এটি একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়ে স্পেনের সমভূমি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিরাজ করছিল। জালীকিয়া, লবূন এবং কাস্তালার তিন তিনটি শক্তিশালী খ্রিস্টান রাজ্য এর অধীন ছিল।

তাছাড়া আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য খ্রিস্টানরা গড়ে তুলেছিল। এগুলো জালীকিয়া রাজ্যের অধীন বলে গণ্য হতো। এই ঈসায়ী রাজ্যগুলোর সবক'টিই স্পেন উপদ্বীপের সীমানার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। অবশিষ্ট দক্ষিণ ও পূর্ব ফ্রান্স এবং উত্তর ফ্রান্সের খ্রিস্টান রাজ্যগুলো ছিল এ সব রাজ্যের অতিরিক্ত- যা স্পেনের ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধিতায় সর্বক্ষণ লেগে ছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের উত্তর দিকে নির্গত একটি কোণ ছিল সারাকসতা জেলা। সেখানে যথারীতি মুসলমান আমিল নিযুক্ত থাকতেন। কিন্তু সবসময়ই খ্রিস্টানদের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আর তার এ বন্ধুত্বে কারো আপত্তির কারণ ছিল না এ জন্য যে, সুলতান আবদুল্লাহ্ এবং ইলাস্ট্রিয়াসের রাজা আল-কায়সু তৃতীয় পরস্পর মিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। চুক্তি তখনো পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং কোন পক্ষই তখনো লঙ্ঘন করেনি।

সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান কয়েক বছরের মধ্যেই বিদ্রোহীদের ব্যাপারটি সামলে নিয়ে টলেডো আক্রমণ করলেন। আক্রমণের পূর্বে তিনি টলেডোবাসীর প্রতি প্রেরিত এক বার্তায় তাদেরকে বিরোধিতায় ত্যাগ করে সুলতানের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, এতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। কিন্তু টলেডোবাসীরা তাঁর সে বার্তা ও আহ্বান অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে সাধ্যমত মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তারা আশেপাশের খ্রিস্টান রাজ্যগুলো থেকে ঈসায়ী সৈন্যদের সংগ্রহ করে। বার্সেলোনা, নওয়ার এবং ইলাস্ট্রিয়াসের খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর সাহায্য প্রার্থনা করে। পাদ্রীরা সর্বত্র খ্রিস্টান জনগণকে টলোডা রক্ষার্থে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। অবশেষে সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান অত্যন্ত সন্তর্পণে এবং খুব ভেবেচিন্তে টলেডো অভিমুখে অগ্রসর হন। যুদ্ধবিগ্রহ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। প্রায় এক বছরকাল সংঘর্ষ অব্যাহত থাকার পর সুলতান টলেডো দখল করে নেন। বিজিতদের সাথে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপূর্ণ সদয় ও বিনম্র আচরণ করেন। কয়েক মাসকাল তিনি নিজে টলেডোতে এবং টলেডোর আশেপাশে অবস্থান করে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে কর্ডোভায় ফিরে আসেন।

টলেডো বিজয়ের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ঈসায়ী রাজারা কয়েকটি মুসলিম শহরে আক্রমণ চালিয়ে তা রীতিমত ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়। সুলতান তাঁর উযীর আহমদ ইব্ন ইসহাকের নেতৃত্বে সৈন্যদল দিয়ে সে দিকে প্রেরণ করে। তিনি লবূন রাজ্য আক্রমণ করে ঈসায়ীদেরকে উপর্যুপরি পরাস্ত করে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন। শেষ পর্যন্ত একটি যুদ্ধে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। সুলতান তাঁর ভৃত্য বদরকে সেদিকে পাঠালেন। নওয়ার, লিয়ন প্রভৃতি বিজিত রাজ্যের সৈন্যরা তার মুকাবিলায় অগ্রসর হয়। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়।

বদর তাদেরকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। এর অব্যবহিত পরেই সুলতান আবদুর রহমান নিজে সসৈন্য সেদিকে অগ্রসর হয়ে ঈসায়ীদেরকে তাদের বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত শাস্তি বিধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বিজয় অভিযান অব্যাহত রেখে ফ্রান্সের সীমানায় প্রবেশ করেন। নওয়ার ও আলবুনিয়া বশ্যতা স্বীকার করে সুলতানকে ফেরত পাঠায়। কিন্তু সুলতান ফিরে যাবার সাথে সাথে উত্তরের সমস্ত খ্রিস্টান সংঘবদ্ধভাবে আবার মুসলিম হত্যার পূর্ব চুক্তিসমূহ নবায়ন করে। এটা ৩১৩ হিজরীর (এপ্রিল ৯২৫-মার্চ ২৬ খ্রি) কথা।

সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান উত্তরের খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধরত থাকা অবস্থায়ই তাঁর কাছে উমর ইব্‌ন হাফসুনের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। উমর ইব্‌ন হাফসুন তার দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার জন্য উঁচুদরের লোক বলে গণ্য হয়েছিলেন এবং সর্বদাই তার দিক থেকে যে কোন অঘটন ঘটাবার আশঙ্কা বিরাজমান থাকতো। এহেন শত্রুর মৃত্যুতে সুলতান তাৎক্ষণিকভাবে ফিরে যাওয়াই সঙ্গত বোধ করলেন, কিন্তু সরাসরি তার রাজ্য দখল করে তাকে তাঁর নিজ রাজ্য মুক্ত করাকে তিনি সমীচীনবোধ করলেন না। তিনি উমর ইব্‌ন হাফসুনের পুত্র জাফরকে সে রাজ্যের ওয়ালী মনোনীত করলেন। অবশেষে ৩১৫ হিজরীতে (মার্চ ৯২৭-ফেব্রুয়ারী ২৮ খ্রি) এ রাজ্যটি সুলতানের রাজ্যের মধ্যে বিলীন হয়ে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

এ দিকে সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান তাঁর পিতৃরাজ্যের পুরোটাই বিদ্রোহীদের কবল থেকে মুক্ত করে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। অপর দিকে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই তাঁর জন্য কল্যাণকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তৃতীয় আবদুর রহমান উত্তর দিক থেকে ঈসায়ীদের হামলার আশংকা করতেন। কেননা, ভূমধ্যসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত উপদ্বীপের গোটা উত্তরাঞ্চল জুড়ে তাদেরই দখল ও রাজত্ব ছিল। আর এখন আব্বাসীয়ার স্থলে উবায়দীরা তাদেরকে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছিল। এখন তাদের অন্তরে মুসলমানদের সে ভয় আর বিদ্যমান ছিল না– যা তাদের অন্তরে তারিক ও মূসার আগমনকালে ছিল। আর প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরাও তখন তাদের সেই পূর্ব শৌর্যবীর্য ধরে রাখতে পারেনি। পক্ষান্তরে, ঈসায়ীদের শৌর্যবীর্য পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল।

দক্ষিণ দিকে উবায়দীদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা আফ্রিকা মহাদেশের গোটা উত্তর এলাকা দখল করে নিয়ে মরক্কোর ইদরীসিয়া রাজত্বের নাম-নিশানা মুছে দিয়ে স্পেন বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর ছিল। সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান যুগপৎ উভয় দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়লেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

আল-ফোনসুর বিভক্ত হলো

ইলাস্ট্রিয়াসের রাজা তৃতীয় আলফোনসু তাঁর রাজ্যকে সন্তানদের মধ্যে এভাবে বণ্টন করে দেন।

তিনি লিওন এলাকা গারসিয়াকে দান করেন। জালীকিয়া রাজ্য আর্দুলীর ভাগে পড়ে। উরাইডো এলাকা পান ফার্দীলা। গারসিয়া বিবাহ করেছিলেন নওয়ার রাজের কন্যাকে। এ

জন্য লিওনের সাথে নওয়ারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাই লিওন ও নওয়ার যৌথভাবে কয়েকবারই মুসলমানদের মুকাবিলা করে। তিন বছর রাজত্ব করার পর ৩১৬ হিজরীতে (৯২৮ খ্রি.) গারসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর শাঞ্জা লিওন রাজ্যের শাসকের পদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু জালীকিয়ার শাসনকর্তা তাঁর চাচা আর্দুলী শাঞ্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার রাজ্যটি কেড়ে নিয়ে তাকে নিজ রাজ্যভুক্ত করে নেন। ওদিকে নওয়ারের রাজাও মৃত্যুমুখে পতিত হলে শাঞ্জা পলায়ন করে তার নানার রাজ্যে গিয়ে উঠেন। সেখানে তাঁর নানী ছিলেন তূতা রাণী। তিনি নিজ হস্তে নওয়ার রাজ্য শাসনের দায়িত্ব তুলে নেন। ওদিকে কাস্তালা রাজ্য জালীকিয়া ও লিওনের রাজার আধিপত্য থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। কাস্তালার শাসক ফার্ডিনাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। মোটকথা, উক্ত ঈসায়ী রাজ্যসমূহের রাজারা কয়েক বছর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহে লিপ্ত থাকায় বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত তারা ইসলামী এলাকার দিকে ফিরে তাকাবারও অবকাশ পায়নি। সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান ঈসায়ীদের এ অন্তর্দ্বন্দ্বের খবর পেয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সেদিকে সৈন্য প্রেরণ থেকে বিরত থাকেন। এভাবে তিনি তাদেরকে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকতে দেন। ঐ সময় যদি তিনি উত্তর দিকে সৈন্য প্রেরণ করতেন তাহলে নিশ্চয়ই ঈসায়ীরা তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা ভুলে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেত এবং এভাবে তাদের আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্ব বন্ধ হয়ে যেত।

মরক্কো অধিকার

এমনি যুগসন্ধিক্ষণে দক্ষিণ দিক থেকে এক সুসংবাদ এলো যে, মরক্কোর ইদরীসিয়া রাজ বংশের অবসান ঘটিয়ে মরক্কো দখলের জন্য উবায়দীদের প্রচেষ্টার মুখে অতিষ্ঠ ইদরীসী শাসক ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ উবায়দীর কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের হাতে তাঁর রাজ্য সমর্পণ করতেই উদগ্রীব। এ যাবত কর্ডোভার দরবার ও মরক্কোর মধ্যে সখ্যতার সম্পর্ক সমমর্যাদার ভিত্তিতেই চলে আসছিল। সুলতান আবদুর রহমান এটাকে সাহায্য ও সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর সৈন্যদেরকে জাহাজে বোঝাই করে মরক্কোর উপকূলে অবতরণ করালেন। মরক্কো তখন কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। মরক্কোর প্রত্যেকটি রাজ্যের রঈসরা সুলতান আবদুর রহমানের আধিপত্য স্বীকার করে নিয়ে নিজ নিজ দূতকে উপঢৌকনসহ কর্ডোভায় প্রেরণ করেন এবং কোন কোন রঈস সশরীরে কর্ডোভায় হাযির হয়ে নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করেন। সুলতান রহমানের সৈন্যরা উবায়দীর সৈন্যদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেয় এবং নিজেদের পক্ষ থেকে আমীরদেরকে আমীরীর সনদ প্রদানে শাসকরূপে নিযুক্তি প্রদান করেন। এভাবে মরক্কোও কর্ডোভার দরবারে একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

যে সময় সুলতান আবদুর রহমান মরক্কো নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময় উত্তরের ঈসায়ীদের পক্ষ থেকে কোনরূপ হামলার আশঙ্কা ছিল না। কেননা, তারা তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। উবায়দীর পক্ষ থেকে যে সঙ্কট ছিল এবার তার অবসান ঘটলো। কেননা, মরক্কো এখন সুলতান আবদুর রহমানের অধিকারে চলে এসেছে। স্পেন দেশ এখন অনেকটা নিরাপদ হয়ে গিয়েছে।

সারাকসতার গভর্নরের বিদ্রোহ

৩২২ হিজরী (৯৩৪ খ্রি.) নাগাদ খ্রিস্টান রাজন্যবর্গের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের অবসান ঘটে। আর এ সময়ই সুলতান আবদুর রহমান মরক্কোকে তাঁর সালতানাতভুক্ত করার কাজ সম্পন্ন করেন। এবার ঈসায়ীরা সারাকসতার গভর্নর মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিশামকে বিদ্রোহের উসকানি দিয়ে তাকে সর্বপ্রকার সাহায্যের পাকা আশ্বাস প্রদান করেন। বার্সিলোনা থেকে জালীকিয়া পর্যন্ত গোটা অঞ্চল সুলতান আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে উঠলো। সারাকসতায় মুসলমান আমিলের বিদ্রোহ সফল করার এবং তার সাহায্যার্থে সকলের উদ্যোগী হওয়ার কারণ ছিল এই যে, মরক্কোর স্পেন রাজ্যভুক্ত হওয়ার সংবাদে খ্রিস্টান-মহলকে রাতারাতি সচেতন করে তুলে। এ জন্য তারা যে কোন মূল্যে অতিসত্বর আবদুর রহমানের শক্তিকে চুরমার করে দেয়াকে জরুরী বিবেচনা করে। তারা উপলব্ধি করে যে, এখন চিন্তা-ভাবনায় কালক্ষেপণ করা সঙ্কটকে ঘনীভূত করারই নামান্তর। তাই কর্ডোভা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী এবং ঈসায়ী রাজ্যসমূহের নিকট-প্রতিবেশী সারাকসতার আমিলকে বিদ্রোহের উস্কানি দিয়ে আবদুর রহমানের শক্তিকে দুর্বল করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিপদের ঝুঁকি বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবদুর রহমান সারাকসতার আমিলের বিদ্রোহী হওয়ার সংবাদ শ্রবণে তাকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে উত্তরাঞ্চলের দিকে যখন মনোনিবেশ করলেন তখন গোটা ঈসায়ী অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীসমূহকে সক্রিয় দেখতে পেলেন। ওয়াহ শামা নামক স্থানে ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিশাম যুদ্ধে বন্দী হন। খ্রিস্টান সৈন্যরা নিজ নিজ রাজ্যের দিকে পালিয়ে যায়। তারপর সুলতান আবদুর রহমান প্রতিটি খ্রিস্টান রাজ্যের উপর ভিন্ন ভিন্নভাবে হামলা করে প্রত্যেক রাজ্যকেই পদানত করেন। প্রত্যেক রাজ্যই বশ্যতা স্বীকার করে এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। নওয়ার রাজ্যের রাণী তূতাও ভীষণ যুদ্ধের পর পরাস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি তাঁর দৌহিত্র শাঞ্জাকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে তার উপদেষ্টারূপে থাকলেন। খ্রিস্টানদেরকে শায়েস্তা এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাশিমকে উৎখাতের কাজ সম্পন্ন করে সারাকসতায় উমাইয়া ইব্‌ন ইসহাককে গভর্নররূপে নিয়োগ করে সুলতান কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন।

পরিখার যুদ্ধ

৩২৭ হিজরীর (৯৩৯ খ্রি.) প্রথম দিকের মাসগুলোতে উমাইয়া ইব্‌ন ইসহাকের কোন এক ভাই বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র করে। এ অপরাধের শাস্তিতে সুলতান তাকে হত্যা করলেন। সারাকসতার গভর্নর উমাইয়া ইব্‌ন ইসহাক তার ভাইয়ের হত্যার খবরে মর্মাহত হলেন। ঈসায়ী রাজারা একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে উমাইয়াকে তাদের সহানুভূতি জানিয়ে অনায়াসেই বিদ্রোহী করে তুলে। জালীকিয়ার ঈসায়ী রাজা রাযমীর ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। উমাইয়া বিদ্রোহী হয়ে সারাকসতা থেকে যে পরিমাণ ধন-সম্পদ ও সৈন্য-সামন্ত সাথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে জালীকিয়ার রাজধানী সামুরাতে রাযমীরের কাছে চলে যায়। সেখানে নওয়ার, লিওন ও কাস্তালা প্রভৃতি স্থানের সৈন্যরাও এসে সমবেত হতে

থাকে। বার্সেলোনা ও তারকুফার সৈন্যরাও এখানে এসে পৌঁছে। ফ্রান্স থেকেও ঈসায়ী ধর্মযোদ্ধারা এসে সেখানে সমবেত হতে থাকে। স্পেনে এটা ছিল ঈসায়ী শক্তির সবচাইতে বড় মহড়া। আর এ মহড়ায় একজন মুসলমান গভর্নরও তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে সুলতান আবদুর রহমানকে পরাস্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। এই মুসলমান গভর্নর ঈসায়ীদেরকে অনেক মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেন এবং অনেক কার্যকর বুদ্ধি ও পরামর্শ দান করেন। নিজেদের মধ্যে উমাইয়া ইব্ন ইসহাকের উপস্থিতি ঈসায়ীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মনোবলকে অনেকগুণ বাড়িয়ে তোলে। এদিকে সুলতান আবদুর রহমান এ মহা ষড়যন্ত্রের সংবাদ অবগত হবার সাথে সাথে জিহাদ ঘোষণা করলেন। নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সাথে সাথে অনেক স্বেচ্ছাসেবক এবং বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন লোকও শাহাদাতের উদ্দীপনা নিয়ে সেনাবাহিনীর সাথে শরীক হলো।

এ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৫০ হাজারেরও বেশি। এদেরকে সাথে নিয়ে সুলতান আবদুর রহমান কর্ডোভা থেকে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু ৫০ সহস্রাধিক সৈন্যের অধিকাংশই ছিল অনভিজ্ঞ। সুলতানী বাহিনী যতই উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, ঈসায়ী সৈন্যরা ততই উত্তর দিকে সরে গিয়ে সামুরায় কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। ঈসায়ীদের সংখ্যাগত প্রাবল্যের সাথে সাথে আরেকটি শক্তি ছিল এই যে, সামূরার চতুর্দিকে সাতটি মজবুত বেষ্টনী প্রাচীর ছিল এবং প্রতিটি প্রাচীরের পরেই ছিল সুগভীর পরিখাসমূহ। তাদের প্রধান সিপাহসালার ছিলেন রাযমীর এবং তাঁর সহকারী ও উপদেষ্টা ছিলেন উমাইয়া ইব্ন ইসহাক। ইসলামী বাহিনী রণক্ষেত্রে উপনীত হয়ে যুদ্ধ শুরু করে। ঈসায়ী সৈন্যরা ময়দানে বের হয়ে মুকাবিলা করে। রণক্ষেত্রের প্রতিটি সেকটরে মুসলমানরা জয়ী হন। ঈসায়ী সৈন্যদেরকে প্রতি ক্ষেত্রেই পশ্চাদপসরণ করতে হয়। কয়েকদিনের যুদ্ধের পর ঈসায়ী বাহিনীর সৈন্যরা নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়ে সামরার বেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ৩২৭ হিজরীর ৩০শে শাওয়াল (আগস্ট ৯৩৯ খ্রি) মুসলিম বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে দুটি প্রাচীর ভেঙ্গে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তৃতীয়টিও তারা জয় করে নেন। কিন্তু এ পর্যন্ত পৌঁছার পরই চতুর্দিকের গোপন অবস্থান থেকে বের হয়ে খ্রিস্টান সৈন্যরা তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক বিরাট সংখ্যক মুসলিম সৈন্য তখন না পারছিলেন সম্মুখে অগ্রসর হতে, না পারছিলেন পিছন দিকে সরে আসতে। তাদের অনেকেই পরিখায় পরে ডুবে মারা যায়। মোট কথা, মুসলমানরা এমনি সংকীর্ণ স্থানে এমন নিদারুণভাবে আটকা পড়ে যায় যে, মাত্র ৪৮ জন সৈন্য জীবিত সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়। জীবিতদের মধ্যে পঞ্চাশতম ব্যক্তি ছিলেন স্বয়ং সুলতান আবদুর রহমান— যাঁকে তার সঙ্গী-সাথীরা অতি কষ্টে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। অবশিষ্ট গোটা বাহিনী সামূরার সেই গভীর পরিখার মধ্যে শাহাদাতবরণ করেন। ঐ পঞ্চাশ জনের পিছনে রাযমীর একটি বাহিনীকে পাঠাতে মনস্থ করে, কিন্তু উমাইয়া ইব্ন ইসহাক এই বলে তাকে নিবৃত্ত করেন যে, ইসলামী বাহিনীর এক বিরাট অংশ বাইরের ঝোঁপ-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকাটা বিচিত্র নয়। তারা চতুর্দিক থেকে সমবেত আক্রমণ চালিয়ে আপনার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। সুতরাং এত বড় একটা ঝুঁকি নেয়া সমীচীন হবে না।

মোট কথা, আবদুর রহমান এ যাত্রায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন। মুসলমানদের স্পেনে পদার্পণ অবধি কোন যুদ্ধে তাদের এত বিপুল সংখ্যক লোক শহীদ হননি। এ লড়াইটি ইয়াওমুল খন্দক বা খন্দকের যুদ্ধ নামে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করে।

এ যুদ্ধের পর উমাইয়া ইব্‌ন ইসহাক পঞ্চাশ হাজার মুসলমানের শবদেহ প্রত্যক্ষ করে আপন কুকীর্তি সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশ পায়। তার বিবেক তাকে মুসলমানদের এ বিপুল রক্তপাতের জন্য দংশন করতে থাকে যে, এত বিপুল সংখ্যক মুসলিমের রক্তপাত করে তুমি অনেক বড় গোনাহ করেছ। সে অনুভব করতে পারে যে, মুসলিম জাতির কী মহাসর্বনাশই না সে সাধন করেছে। সে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং যথারীতি সুলতানের দরবারে আবেদন পত্র পাঠিয়ে এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সাথে সাথে সে খ্রিস্টানদের সাথে দল ত্যাগ করে সুলতানের শিবিরে ফিরে আসে। সুলতান আবদুর রহমান কর্ডোভায় ফিরে এসে শক্তিশালী সুসজ্জিত বাহিনী ঈসায়ী রাজ্যগুলোর দিকে রওয়ানা করেন। সে সব বাহিনী নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে পৌঁছে ঈসায়ীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে। ফলে পরিখার যুদ্ধ জয়ের দ্বারা উপকৃত হওয়াটা আর তাদের ভাগ্যে জোটেনি। বরং মুসলিম বাহিনী বিজয়ীর বেশে ফ্রান্সের সীমানায় পর্যন্ত প্রবেশ করে এবং প্রচুর গনীমত সম্ভার নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে।

আব্বাসীয় খিলাফতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের কাছে আব্বাসীয় খলীফা মুকতাদির ৩২৭ হিজরী (৯৩৯ খ্রি.) নিহত হওয়ায়, আব্বাসীয় খিলাফত নামে মাত্র টিকে থাকা এবং উবায়দীদের খিলাফত দাবির সংবাদ এসে পৌঁছে। এখন আব্বাসীয়দের দিক থেকে কোন আশংকা আর বাকি নেই এবং উবায়দীরা শীআ হওয়ার কারণে তাদের প্রতি স্পেনবাসী মুসলমানদের কোন সহানুভূতি নেই লক্ষ্য করে তিনি (সুলতান) নিজেকে আমীরুল মু'মিনীন এবং খলীফাতুল মুসলিমীন উপাধিতে ভূষিত করা সঙ্গত মনে করেন। যা হোক তিনি নিজেকে 'আমীরুল মু'মিনীন' ঘোষণা করেন এবং নিজের জন্য গ্রহণ করেন নাসির লি-দীনিল্লাহ উপাধি। কেউ তাঁর এই উপাধির বিরোধিতা করেনি। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলামী বিশ্বে ঐ সময়ে তিনিই ছিলেন খলীফাতুল মুসলিমীন উপাধি পাওয়ার সর্বাধিক যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক। তারপর আমীরুল মু'মিনীন আবদুর রহমান কর্ডোভার জাঁকজমক বৃদ্ধি এবং সেখানে নয়নাভিরাম ইমারতসমূহ নির্মাণের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং আট-দশ বছর পর্যন্ত প্রতিবছরই উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টান রাজ্যসমূহ পদানত করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে থাকেন। তিনি খ্রিস্টানদেরকে এমনভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন যে, তারা তাঁর কাছে বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশকে নিজেদেরও আত্মরক্ষার একমাত্র পথ বিবেচনা করে। এরই ফলে উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টানদেরও বিদ্রোহ করার এবং মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার আশংকা সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়।

এ পর্যন্ত স্পেনের যে সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা অধ্যয়ন করলে খলীফা আবদুর রহমানের এ ত্রুটি পরিষ্কার ধরা পড়ে যে, তিনি উত্তরাঞ্চলীয় খ্রিস্টান রাজ্যসমূহের প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ঐ সমস্ত রাজ্য বিলুপ্ত করার

প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন নি। তিনি সেগুলোকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত দেখে ৩৩০ হিজরীর (অক্টোবর ৯৪১-সেপ্টেম্বর ৪২ খ্রি) পর মুসলমানরাই অবহেলা ও অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে তাদেরই সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে গজিয়ে ওঠা খ্রিস্টান সাম্রাজ্যগুলোকে একটি একটি করে নিশ্চিহ্ন করে নিজের অধীনে এনে সেখানে নিজস্ব মুসলিম শাসনকর্তা নিয়োগ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি বরং বিচ্ছিন্ন দ্বীপসমূহের ন্যায় আপন সাম্রাজ্যেও ঐগুলোর অস্তিত্ব বহাল রাখেন। পরিণামে এঁরা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বিবেচিত হয়। খুব সম্ভব তখন কেউ এ ধারণাও করতে পারেনি যে, পরবর্তী কোন এক সময়ে শাসক মুসলমানদেরও উত্তর পুরুষরা এমনি দুর্বল ও অকমর্ণ্য হয়ে পড়বে যে, এই সমস্ত খ্রিস্টান নবাব (সামন্তরাজ), যারা আজ পঞ্চমুখে আনুগত্য স্বীকার করছে, তারাই একদিন স্পেন থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে সক্ষম হবে। 'আমীরুল মু'মিনীন' উপাধি গ্রহণের পর তৃতীয় আবদুর রহমান কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানে নিজ সেনাপতিদের অধিনায়কত্বে সৈন্য পাঠিয়ে তিনি তাঁর দায়িত্ব সেরে নিতেন।

স্থল ও নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি

৩২৮ হিজরী (নভেম্বর ৯৩৯ খ্রি.) থেকে সার্বিকভাবে খলীফা নাসিরের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তির যুগ শুরু হয়। তাঁকে বিব্রত করতে পারে বাহ্যত এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব তখন ছিল না। এই সুযোগে খলীফা নাসির লি-দীনিল্লাহ্ অর্থাৎ তৃতীয় আবদুর রহমান তাঁর নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি এবং সেই সাথে স্থল বাহিনীকে সুবিন্যস্ত করার প্রতি মনোনিবেশ করেন। অনেকগুলো সামরিক নৌযান তৈরি করা হয়। ফলে স্পেনের নৌবাহিনী ঐ যুগের সকল নৌবাহিনীর চাইতে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রূম (ভূমধ্য) সাগরের উপর খলীফা নাসিরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খলীফা পুরাতন শাহী মহল সংলগ্ন 'দারুর-রওযা' নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কর্ডোভা মসজিদের আয়তন ও অঙ্গ-সজ্জায় পরিবর্ধন সাধন করা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয় এবং স্পেনের বণিকরাও তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে দূর-দূরান্তে যেতে শুরু করে।

খলীফা আবদুর রহমানের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি

খলীফা আবদুর রহমান নাসিরের ভূমিকা ও খ্যাতি খুব দ্রুত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ৩৩৬ হিজরীতে (৮৪৭-৪৮ খ্রি.) কনসটান্টিনোপলের সম্রাট কনসটানটাইন ইব্ন আলিউন অত্যন্ত মূল্যবান ও জাঁকজমকপূর্ণ উপঢৌকনসহ কর্ডোভায় খলীফা নাসিরের খিদমতে একদল রাজকীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এই উপঢৌকন পাঠিয়ে সম্রাট কনসটানটাইন একদিকে যেমন নিজের শান-শওকত ও প্রাচুর্যের দিকটি তুলে ধরতে চাচ্ছিলেন এবং অন্যদিকে খলীফা নাসিরের বন্ধুত্ব কাজে লাগাতে চাচ্ছিলেন। খলীফা নাসির ঐ প্রতিনিধিদলের আগমন সংবাদ পেয়ে কর্ডোভা শহর সুসজ্জিত করার নির্দেশ দেন। জাঁকজমকপূর্ণ সামরিক পোশাক পরে সৈন্যরা মহড়া দিতে শুরু করে, ঘরের দেওয়াল ও দরজা-জানালা নানা বর্ণে সুসজ্জিত করা হয় এবং তাতে ঝুলিযে দেওয়া হয় নানা রংয়ের পতাকা ও ফেস্টুন। এই ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও

ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ দেখে কনসটান্টিনোপলের রাজদূতেরা হতচকিত হয়ে পড়েন এবং সাথে করে নিয়ে আসা উপঢৌকনসামগ্রী তাদের নিজেদের কাছেই বেমানান মনে হতে থাকে। মর্মর পাথরের আকর্ষণীয় স্তম্ভসমূহ অতিক্রম করে এবং নানা বর্ণের নকশাদার কার্পেট মাড়িয়ে রাজ প্রতিনিধি-দল শাহী দরবারে গিয়ে পৌঁছে, যেখানে খলীফা নাসির সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর আশেপাশের আসনগুলো অলংকৃত করেছিলেন নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী আমীর, উজীর, আলিম, কবি এবং সামরিক নেতৃবৃন্দ। তখন কনসটানটাইনের রাজ প্রতিনিধি দলের চোখেমুখে যে ভীতিপূর্ণ বিস্ময় ফুটে উঠেছিল তা ছিল লক্ষ্য করার মত। যা হোক তারা নিজেদেরকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে, সর্বপ্রকার শিষ্টতা বজায় রেখে কুর্নিশ করতে করতে রাজ সিংহাসনের নিকটবর্তী হয় এবং খলীফার কাছে সম্রাট কনসটান্টিনের পত্রটি হস্তান্তর করে। পত্রটি ছিল একটি আকাশী রঙয়ের কম্বল, যার উপর স্বর্ণাক্ষরে কিছু একটা লিখিত ছিল। ঐ কম্বলে জড়ানো ছিল একটি ছোট বাক্স। বাক্সটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও স্বর্ণপাতে মোড়ানো। তার উপর বসানো ছিল একটি সোনার মোহর, যার ওজন ছিল চার মিসকাল। মোহরের এক পিঠে সম্রাট কনসটান্টিনের ছবি অংকিত ছিল। ঐ বাক্সের ভিতর ছিল স্ফটিকের আর একটি ছোট বাক্স, যা ছিল স্বর্ণের নানারূপ কারুকার্য খচিত। তার ভিতর ছিল একটি অতি সুন্দর রেশমী খাত, যার ভিতরে ছিল অত্যন্ত সুন্দর আসমানী রংয়ের স্বচ্ছ চর্মের উপর সোনালি অক্ষরে লেখা পত্রটি। উক্ত পত্রে খলীফা আবদুর রহমান নাসির লি-দীনিল্লাহকে অত্যন্ত সম্মানসূচক উপাধিতে সম্বোধন করে মূল বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল। খলীফা পত্রটি পড়িয়ে শোনেন। যথারীতি আনুষ্ঠানিকতা পালনের মধ্য দিয়ে সেদিনকার দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অত্যন্ত সম্মান ও জাঁকজমকের সাথে প্রতিনিধিদলের পানাহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। কিছু দিন পর তারা দেশে ফিরে যায় এবং সেই সাথে খলীফা হিশাম ইব্ন হুযায়লকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে সম্রাট কনসটান্টিনের কাছে পাঠানো হয়। কনসটান্টিনের কাছ থেকে একটি বন্ধুত্বমূলক চুক্তি লিখিয়ে আনার জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হয়। হিশাম ইব্ন হুযায়ল কনসটান্টিনের কাছ থেকে একটি বন্ধুত্বমূলক চুক্তি লিখিয়ে নেন এবং ৩৩৮ হিজরীতে (৯৪৯-৫০ খ্রি.) তা নিয়ে কর্ডোভায় ফিরে আসেন। তারপর ইতালী সম্রাট, জার্মান সম্রাট ও ফরাসী সম্রাটের দূতেরা একের পর এক কর্ডোভার রাজদরবারে হাযির হন এবং নিজ নিজ সম্রাটের পক্ষ থেকে খলীফার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের আবেদন জানান। কোন সম্রাটই নিজের প্রতি খলীফা আবদুর রহমান নাসিরের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপারে আবেদন-নিবেদনের ক্ষেত্রে সামান্য মাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নি। তখন ইউরোপের সব সম্রাটই চাচ্ছিলেন খলীফাকে নিজের সাহায্যকারী করে নিতে, যাতে তাঁর মাধ্যমে অন্যান্য শত্রুর হাত থেকে নিজের সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেন।

খলীফা আবদুর রহমানের আপন পুত্র হাকামকে 'অলীআহ্‌দ' (স্থলাভিষিক্ত) নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহ্‌ নামায-রোযার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী এবং 'যাহিদ' নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কর্ডোভার আবদুল বারী নামক জনৈক ফকীহ্‌

আবদুল্লাহ্‌কে প্ররোচিত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য এবং খলীফা আবদুর রহমান ও হাকামকে হত্যা করার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত ফকীহ্ আবদুল বারী ও আবদুল্লাহ্ উভয়ে মিলে খলীফা ও তাঁর অলীআহ্‌দকে হত্যা করার প্রস্তুতি নেন। এই ষড়যন্ত্রে অন্যান্য লোককেও শরীক করা হয়। কিন্তু ৩৩৯ হিরজীর ১০ই যিলহজ্জ (মে ৯৫১ খ্রি) ঈদুল আযহার দিন ঘটনাচক্রে এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে খলীফা তাঁর অলীআহ্‌দসহ একেবারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। খলীফা আপন পুত্র আবদুল্লাহ ও ফকীহ আবদুল বারী উভয়কে বন্দী করে জেলখানায় পাঠিয়ে দেন এবং ঐ দিনই আবদুল্লাহ্‌কে জেলখানা থেকে বের করে এনে নির্মমভাবে হত্যা করেন। ফকীহ্ আবদুল বারী তার মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ পেয়ে জেলখানায় আত্মহত্যা করেন।

৩৪২ হিজরীতে (৯৫৩-৫৪ খ্রি.) জালীকিয়ার সম্রাট রাযমীরের মৃত্যু হলে তার পুত্র চতুর্থ আর্দোনী সিংহাসনে আরোহণ করে একজন দূত মারফত খলীফা আবদুর রহমানকে নিজ পিতার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করেন এবং পিতার স্থলে নিজের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে খলীফার অনুমোদন প্রার্থনা করেন। খলীফা তাতে অনুমোদন দেন। ৩৪৫ হিজরীতে (৯৫৬ খ্রি) কাসতিলের গোত্রপতি ফার্ডিনান্ড চতুর্থ আর্দোনীকে নিজের সুপারিশকারী হিসেবে খলীফার কাছে প্রেরণ করেন এবং একটি পৃথক রাজ্যের অধিপতি হিসেবে তাকে অনুমোদন দানের জন্য খলীফার কাছে আবেদন জানান। খলীফা ঐ আবেদন মঞ্জুর করে ফার্ডিনাণ্ডকে কাসতিলের স্বাধীন অধিপতি হিসাবে ঘোষণা করেন। তখন পর্যন্ত ফার্ডিনান্ডকে জালীকিয়া সাম্রাজ্যের অর্থাৎ রাযমীরের অধীনস্থ মনে করা হতো। যেহেতু চতুর্থ আর্দোনীকে সিংহাসনের অধিকারী করার ব্যাপারে ফার্ডিনান্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাই চতুর্থ আর্দোনী খলীফার কাছে সুপারিশ করে ফার্নিনান্ডকেও একজন স্বাধীন অধিপতি বানিয়ে দেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, শাবখা তার পূর্বপুরুষের রাজ্য লিওন অধিকার করে নিয়েছিলেন এবং বেশ কয়েক বছর যাবত লিওন রাজ্য জালীকিয়া থেকে পৃথক হয়ে শাবখার শাসনাধীনে চলে গিয়েছিল। আর নওয়ার রাজ্য শাসন করেছিলেন তার মাতামহী তোতা। শাবখার দেহে মেদ এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, ঘোড়ায় চড়া তো দূরের কথা, দু'কদম পায়ে হাঁটাও তার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ৩৪৬ হিজরীতে (৯৫৭ খ্রি) ফার্ডিনান্ড ও চতুর্থ আর্দোনী একজোট হয়ে শাবখাকে লিওন রাজ্য থেকে বেদখল করে দেন। তখন শাবখা আপন মাতামহী তোতার মামা নওয়ার রাজ্য শাসন করছিলেন। তবে সেখানকার প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল শাবখার মাতামহীর হাতে। নিজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বলে তিনি নিজ পুত্র নওয়ারের সম্রাটের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক ছিলেন। রাণী তোতা খলীফার কাছে অনেক উপঢৌকন পাঠিয়ে আবেদন করেন, তিনি যেন আর্দোনীর কাছ থেকে শাবখার রাজ্য ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন এবং শাবখার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য কর্ডোভা থেকে একজন চিকিৎসক পাঠান। খলীফা একজন শাহী চিকিৎসক নওয়ার রাজ্যে প্রেরণ করেন এবং রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বিবেচনা করবেন বলে রাণীকে জানিয়ে দেন। শাহী চিকিৎসক নওয়ারা পৌঁছে শাবখার চিকিৎসা আরম্ভ করেন এবং অচিরেই তার পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরে পান।

ফরিয়াদীরূপে খলীফার দরবারে তিনজন খ্রিস্টান রাজার উপস্থিতি

তারপর ৩৪৭ হিজরীতে (এপ্রিল ৯৫৮-মার্চ ৫৯ খ্রি) খোদ রাণী তোতা সরাসরি খলীফার দরবারে আবেদন পেশ করার জন্য আপন পুত্র (নওয়ারের শাসনকর্তা) এবং আপন নাতি (লিউনের সম্রাট)-কে সঙ্গে নিয়ে কর্ডোভার উদ্দেশে রওয়ানা হন। বলতে গেলে, তিনজন খ্রিস্টান সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহ থেকে খলীফার দরবারে হাযির হওয়ার জন্য প্রায় এই সাথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে যে সব শহর অথবা বসতিতে তারা অবস্থান করতেন তাদেরকে দেখার জন্য জনসাধারণ সেখানে ভিড় জমাত। তারা অত্যন্ত কৌতূহলী দৃষ্টিতে এমন কয়েকজন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে প্রত্যক্ষ করছিল, যারা ফরিয়াদীরূপে কর্ডোভায় যাচ্ছিলেন। কর্ডোভার সন্নিকটে পৌঁছলে তাদের উষ্ণ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। যখন তাঁরা খলীফার দরবারে গিয়ে হাযির হন তখন সেখানকার শান-শওকত এবং খলীফার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য তাদেরকে দিশেহারা করে ফেলে এবং তারা অজান্তে তাঁর সামনে সিজদাবনত হয়ে পড়েন। খলীফা তাদেরকে সান্ত্বনা দেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ পেশ করার ফলে খলীফা তাদের সাথেই এক সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন, যাতে ঐ বাহিনী লিওন ও জালীকিয়া রাজ্যের শাসন ক্ষমতা শাবখার হাতে তুলে দেয়। যেহেতু আমীরুল মু'মিনীন তৃতীয় আবদুর রহমানের সেনাবাহিনী চতুর্থ আর্দোনীকে বিতাড়িত করে শাবখাকে জালীকিয়া ও লিওনের বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছিল তাই আর্দোনী সেখান থেকে পলায়ন করে ফার্ডিনান্ডের কাছে কাসতিলায় চলে যান। অবশ্য সুলতানের সেনাবাহিনী এ ব্যাপারে তাকে সেরূপ কোন বাধা প্রদান করেনি। আর্দোনীর এই পরিণাম লক্ষ্য করে বার্সেলোনা ও তারকুনার রাজ্যদ্বয় আপন আপন দূত কর্ডোভায় পাঠিয়ে সবিনয় প্রার্থনা জানান ঃ আমরা হচ্ছি দরবারে খিলাফতের গোলাম এবং আমরা আপন আপন রাজ্য সুলতানের দান বলেই মনে করি। সুলতানের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের ক্ষেত্রে যে কোন শর্ত মেনে নিতে আমরা সদাপ্রস্তুত। অতএব অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে রাজ্য শাসনের সনদ পুনরায় প্রদানপূর্বক আমাদের আনুগত্যের নবায়ন করতে মর্জি হয়। খলীফা নাসির আপন সন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দিয়ে ঐ খ্রিস্টান রাজাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

তৃতীয় আবদুর রহমান যখনই কোন জ্ঞানী-গুণীর নাম শুনেছেন, যেখানেই তিনি থাকুন না কেন তাঁকে সেখান থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এ কারণেই বাগদাদ, কনসটান্টিনোপল, কায়রো, কায়রাওয়ান, দামেশক, মদীনা, মক্কা, ইয়ামন, ইরান, খুরাসান তথা মুসলিম বিশ্বের সব প্রান্ত থেকে জ্ঞানী-গুণীরা দলে দলে কর্ডোভায় এসে ভিড় জমিয়েছিলেন। এই জ্ঞানী-গুণীরা বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী এবং বিভিন্ন ধর্ম ও মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কেননা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জ্ঞানী-গুণীর প্রতিই দরবারে খিলাফতের পক্ষ থেকে অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করা হতো এবং সকলের জন্যই তাদের নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী ভাতাও নির্ধারণ করা হতো।

স্থাপত্য শিল্পের উন্নয়ন

স্পেনের সুলতানদের মধ্যে খলীফা আবদুর রহমান সেই মর্যাদার অধিকারী, যে মর্যাদার অধিকারী ছিলেন হিন্দুস্থানের মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সম্রাট শাহজাহান। কর্ডোভা মসজিদের নির্মাণ কাজ প্রথম আবদুর রহমানের যুগে শুরু হয়ে তাঁর পুত্র হিশামের যুগে শেষ হয়। কিন্তু তাদের পরবর্তী প্রত্যেক শাসকই সেই মসজিদের শান-শওকত ও জাঁকজমক বৃদ্ধির কাজে সব সময়ই রাজকীয় ভাণ্ডারের মুখ উন্মুক্ত রাখেন। খলীফা তৃতীয় আবদুর রহমানও মসজিদের কাজ চূড়ান্ত করতে গিয়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন। মসজিদের দৈর্ঘ্য ছিল পূর্ব-পশ্চিমে পাঁচ শ' ফুট। এর সুন্দর ও আকর্ষণীয় মিহরাবসমূহ স্থাপিত ছিল পাথরের নির্মিত। এক হাজার চার শ' সতেরটি স্তম্ভের উপর। মিহরাবের নিকট একটি উচ্চ মিম্বর ছিল, হস্তীদন্ত ও ছত্রিশ হাজার বিভিন্ন রং ও বিভিন্ন আকারের কাষ্ঠ খণ্ডের তৈরি। সেগুলোর উপর আবার ছিল হরেক প্রকার হীরা-জহরতের কারুকাজ। দীর্ঘ সাত বছরের পরিশ্রমে মিম্বরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। খলীফা আবদুর রহমান মসজিদের পুরাতন মিনারসমূহ ভেঙ্গে তদস্থলে এক শ' আট ফুট উঁচু একটি নতুন মিনার নির্মাণ করেছিলেন। মিনারে উঠা-নামার জন্য নির্মিত দুটি সিঁড়ির ছিল একশ' সাতটি ধাপ। মসজিদের মধ্যে ছোট বড় দশ হাজার ঝাড় বাতি জ্বালানো হতো। তার মধ্যে সর্ব বৃহৎ তিনটি ঝাড় বাতি ছিল রূপার এবং বাকিগুলো পিতলের তৈরি। বড় বড় ঝাড়ের মধ্যে এক হাজার চারশ' আশিটি প্রদীপ জ্বালানো হতো। শুধু তিনটি রূপার ঝাড়ে ছত্রিশ সের তৈল পোড়ানো হতো। তিনশ' কর্মচারী ও খাদিম শুধু এই মসজিদের তদারকিতেই নিয়োজিত ছিল।

খলীফা আবদুর রহমান তাঁর খ্রিস্টান স্ত্রী যুহরার জন্য কর্ডোভা থেকে চার মাইল দূরে আকর্ষণীয় 'জাবালুল আরূস'-এর গা ঘেঁষে একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদটি এতই প্রশস্ত ছিল যে, এটাকে যুহরা প্রাসাদ না বলে, যুহরা নগরী বলা হতো। প্রাসাদটির প্রশস্ততা অনুমান করা যেতে পারে এর প্রাচীরের দেওয়ালসমূহে মোট পনের হাজার সুউচ্চ ও বিরাটাকার দরজা ছিল। এটা নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল প্রায় বিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা। আমাদের বর্তমান যুগের হিসাব অনুযায়ী যুহরা প্রাসাদের নির্মাণ ব্যয় একশ' কোটি টাকার কম হবে না। প্রাসাদটির দৈর্ঘ্য ছিল চার মাইল এবং প্রস্থ আমুনানিক তিন মাইল। ৩২৫ হিজরীতে (৯৩৭ খ্রি) নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় ৩৫০ হিজরীতে (৯৬১ খ্রি.)। নির্মাণ কাজে দৈনিক দশ হাজার মিস্ত্রী ও চার হাজার উট খচ্চর নিয়োজিত করা হতো। প্রাসাদটি মর্মর ও অন্যান্য মূল্যবান পাথরের চার হাজার তিনশ' টাওয়ার (বুরুজ) ও স্তম্ভের উপর নির্মিত হয়েছিল। এই সমস্ত স্তম্ভের কোন কোনটি ফ্রান্স, কনসটান্টিনোপল প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিরা দানস্বরূপ আবদুর রহমান নাসিরের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ, আলী ইব্ন জা'ফর প্রমুখ স্থপতিকে পাঠিয়ে আফ্রিকা থেকেও মর্মর পাথর নিয়ে আসা হয়। একটি বিরাট ফোয়ারা যা সোনার তৈরি বলে মনে হচ্ছিল এবং যার উপর অত্যন্ত আকর্ষণীয় কারুকাজ করা হয়েছিল- তা আহমাদ ইউনানী এবং পাদ্রী বারী কনসটান্টিনোপল থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সবুজ পাথরের একটি ফোয়ারা

সিরিয়া থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। হীরা-হজরত ও সোনার তৈরি বারটি পশু-পাখি ঐ ফোয়ারার গায়ে খোদিত ছিল। প্রতিটি পশু-পাখির মুখ অথবা ঠোঁট থেকে পানির ধারা প্রবাহিত হতো। ঐ ফোয়ারার মধ্যে কারিগররা এমনি কারুকাজ করেছিল যে, ইউরোপের যে সমস্ত পর্যটক সেগুলো প্রত্যক্ষ করেছিল তাদের মতে এরূপ জিনিস বাস্তবে দেখা তো দূরের কথা, এগুলোর কল্পনা করাও যে মানুষের পক্ষে ছিল অসম্ভব।

প্রাসাদের 'কাসরুল খুলাফা' নামক অংশটিও ছিল একটি দর্শনীয় বস্তু। এর ছাদ খাঁটি সোনা ও স্বচ্ছ মর্মর পাথরে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, গ্লাসের মত এর বিপরীত দিকের জিনিস অনায়াসে দৃষ্টিগোচর হতো। ছাদের বাইরের দিক সোনা-রূপার কারুকাজে সজ্জিত ছিল। এর মধ্যস্থলে সোনার পাতে মোড়ানো একটি আকর্ষণীয় ফোয়ারা স্থাপন করা হয়েছিল। ফোয়ারার মাথায় সেই বিখ্যাত মূর্তিটি স্থাপন করা হয়েছিল, যা গ্রীক সম্রাট উপঢৌকন হিসাবে তৃতীয় আবদুর রহমানের খিদমতে পাঠিয়েছিলেন। এই ফোয়ারা ছাড়াও প্রাসাদের ঠিক মধ্যস্থলে ফোয়ারা সদৃশ পারদ ভর্তি একটি তশতরী রাখা হয়েছিল। প্রাসাদের চতুর্দিকে হস্তীদন্তের ফ্রেমে আটকিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় আয়নাসমূহ রাখা হয়েছিল। বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান কাঠের দরজা মর্মর পাথর ও স্ফটিকের চৌকাঠের উপর স্থাপন করা হয়েছিল। যখন এই সমস্ত খুলে দেওয়া হতো এবং সূর্য কিরণ ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত গৃহকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলত তখন কারো পক্ষে প্রাসাদের ছাদ অথবা দেওয়ালের দিকে চোখ তুলে তাকানো সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় যখন পারদসমূহকে আন্দোলিত করা হতো তখন মনে হতো যেন সমস্ত গৃহটি আন্দোলিত হচ্ছে। যারা এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনবহিত ছিল তারা প্রাসাদটি এভাবে আন্দোলিত হতে দেখে ভয় পেয়ে যেত।

এই প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তের হাজার সাতশ' কর্মচারী এবং তের হাজার তিন শ' বিরাশি জন খ্রিস্টান দাস মোতায়েন ছিল। প্রাসাদের অন্দর-মহলে ছয় হাজার স্ত্রীলোক সেবা কাজে নিয়োজিত ছিল। বিভিন্ন হাউজের মধ্যে অন্যান্য খাদ্য ছাড়াও বার হাজার রুটি মাছের খাদ্য হিসাবে নিক্ষেপ করা হতো। মাদীনাতুত যুহরা ছিল সেই অত্যাশ্চর্য প্রাসাদ যার প্রশস্ততা, মর্মর পাথরে তৈরি যার ইমারতসমূহ, যার সাধারণ ও বিশেষ দরবারের শান-শওকত, যার মনোরম উপাদানসমূহের হাজার হাজার উত্তাল ফোয়ারা, নদী ও হাউজ দূর-দূরান্তের পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। আরবরা যেন এই প্রাসাদকে তাদের শিল্প ও কারু-কর্মের একটি প্রদর্শনী কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। আক্ষেপের বিষয়—খ্রিস্টান নরপশুরা পরবর্তী যুগে যখন কর্ডোভা দখল করে তখন কাসরুয-যাহরার নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলে। তারা মসজিদসমূহ ধ্বংস করতে গিয়ে এমন কি মুসলমানদের কবরের চিহ্নসমূহও ধূলিসাৎ করে দেয়।

পবিত্র-চিত্ততা

ইতিপূর্বে প্রধান বিচারপতি মুনযির ইব্ন সাঈদ বালুতী প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আবদুর রহমান নাসিরের সাথে সংশ্লিষ্ট তাঁর একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আবদুর রহমান নিজের কোন প্রয়োজনে কর্ডোভায় একটি ঘর খরিদ করতে চাচ্ছিলেন। তা ছিল

কয়েকটি ইয়াতীম শিশুর মালিকানাধীন এবং ওরা ছিল বিচারপতি মুনযিরের তত্ত্বাবধানে। মুনযিরের কাছে এই ঘর খরিদ করার সংবাদ পৌঁছলে তিনি তা বিক্রি করতে অস্বীকার করেন এবং খলীফার খিদমতে বলে পাঠান যে, ইয়াতীমদের সম্পত্তি ঠিক তখনই হস্তান্তর করা যেতে পারে যখন তাতে নিম্নের তিনটি শর্ত পুরোপুরিভাবে পাওয়া যায়।

১. যখন তা বিক্রি করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেবে।

২. যখন তা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেবে।

৩. এমন সন্তোষজনক মূল্য পাওয়া যাবে, যার দ্বারা ইয়াতীমরা ভবিষ্যতে অধিকতর লাভবান হতে পারবে। বর্তমানে এই তিন শর্তের কোনটিই বিদ্যমান নেই। তাছাড়া সরকারী কর্মচারীরা এর যে মূল্য নির্ধারণ করেছে তাও পরিমাণে অনেক কম।

খলীফা এই বার্তা পেয়ে নিশ্চুপ হয়ে যান। তিনি ধারণা করেন যে, মুনযির এই জমির মূল্য বৃদ্ধি না করে ছাড়বে না। অপরদিকে মুনযিরের আশংকা হলো, খলীফা হয়ত এই ঘরটি জবরদস্তিমূলকভাবে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন। তাই তিনি অবিলম্বে ঘরটি ধ্বংস করে ফেলেন। তারপর রাজকীয় কর্মচারীরা দ্বিগুণ মূল্য দিয়ে এই জায়গাটি খরিদ করে। খলীফা এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে মুনযিরকে ডেকে পাঠান এবং এভাবে তা ধ্বংস করার কারণ জিজ্ঞেস করেন। মুনযির উত্তরে বলেন, আমি ঘরটির ধ্বংস করার হুকুম দানকালে আমার সামনে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি ছিল ঃ

فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا رَكِبَ فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا .

"তারপর উভয়ে (মূসা ও খিযির) চলতে লাগল। পরে তারা নৌকায় আরোহণ করলে সে (খিযির) তা বিদীর্ণ করে দিল। মূসা বললো, আপনি কি আরোহীদের নিমজ্জিত করে দেবার জন্য এটা বিদীর্ণ করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।" (১৮ ঃ ৭১)

খলীফা এ কথা শুনে নীরব হয়ে যান এবং ঐ দিন থেকে বিচারপতি মুনযিরকে আরো বেশি সম্মানের চোখে দেখতে থাকেন। এই ঘটনা থেকে খলীফা এবং বিচারপতি (কাযী) উভয়েরই পবিত্র-চিত্ততার প্রমাণ মিলে। খলীফা নাসিরের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে ৩৫৫ হিজরীতে (৯৬৫-৬৬ খ্রি) কাযী মুনযির ইনতিকাল করেন। আমীরুল মু'মিনীন খলীফা আবদুর রহমান (তৃতীয়) নাসির লি-দীনিল্লাহ ৩৫০ হিজরীর ২রা রমযান (সেপ্টেম্বর ৯৬১ খ্রি.) ৭২ বছরের কিছু অধিক বয়সে যাহরা প্রাসাদে মৃত্যুবরণ করেন।

রাজস্ব আয়

এই খলীফার যুগে বার্ষিক দুই কোটি চুয়ান্ন লক্ষ আশি হাজার দীনার শাহী কোষাগারে জমা হতো। এছাড়াও বিভিন্ন মাধ্যমে সাত লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দীনার সংগৃহীত হতো। আয়ের সমুদয় অর্থই দেশের এবং প্রজাসাধারণের হিতার্থে ব্যয় করা হতো। এছাড়া যে সব অর্থ খারাজ ও জিযিয়া হিসাবে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের কাছ থেকে আদায় করা হতো তা খাস শাহী কোষাগারে দাখিল করা হতো। এই আয়ের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল না। এর মধ্য

থেকে এক-তৃতীয়াংশ সুলতানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বাকি সব অর্থ ইমারত, পুল, সড়ক ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা হতো।

খলীফার মৃত্যু

এই খলীফার মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে তাঁর নিজের লেখা একটি নোট পাওয়া যায়। তাতে তিনি তাঁর পঞ্চাশ বছরের শাসনকালের ঐ দিনগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। যেগুলো ছিল তাঁর কাছে চিন্তা-ভাবনামুক্ত। আর এমন দিনের সংখ্যা ছিল মাত্র চৌদ্দটি। মৃত্যুকালে খলীফার এগারজন পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে হাকাম ছিলেন অলীআহ্‌দ (ভাবী খলীফারূপে মনোনীত)।

তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনকাল ঃ একটি পর্যালোচনা

খলীফা তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনকাল ছিল স্পেনের মুসলিম শাসনের অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ সময়পর্ব। তখন সমগ্র দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থাও ছিল খুব জমজমাট। স্পেনবাসীরা তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিল আফ্রিকা-এশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে। নৌশক্তির ক্ষেত্রেও কোন দেশ বা কোন জাতি স্পেনের সমকক্ষ ছিল না। তাই সমগ্র সাগর-মহাসাগরও মুসলিম স্পেনের অধীনে ছিল। খলীফা আবদুর রহমান সাম্রাজ্যের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নিজেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন– কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাতে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকতেন না। ঐ সমস্ত আরব সর্দার ও ফকীহ্, যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তিনি ক্রমে ক্রমে তাদের ক্ষমতা হ্রাস করে ঐ সমস্ত ব্যক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন, যারা ছিল খলীফার প্রতি সহানুভূতিশীল ও তার শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি আপন ব্যক্তিগত ক্রীতদাসদের সমন্বয়ে একটি পৃথক প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করেন। তিনি এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন যে, রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়াদিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারত না।

এই খলীফা যে বিরাট কাজটি করেছিলেন তা হলো, মুসলমানদের বিভিন্ন জামাআত ও দল-উপদলের মধ্যে যে বিরোধ ও ঘরোয়া যুদ্ধ চলছিল তিনি তা নিশ্চিহ্ন করে দেন। তিনি মুসলমানদের প্রত্যেকটি দলকেই তাদের মর্যাদা অনুযায়ী অধিকার প্রদান করেছিলেন। তাই একদল অপর দলের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকলেও তাদের কেউই খলীফার শত্রু ছিল না। আর এর মধ্যেই ছিল খলীফা আবদুর রহমানের সাফল্যের রহস্য নিহিত। আর এটাই ছিল মূল বিষয়, যে কারণে স্পেনীয় মুসলমানদের ভাবমূর্তি সমগ্র বিশ্বের চোখে জাগরূক ছিল।

এই খলীফার যুগে অমুসলিম তথা খ্রিস্টান, ইহুদী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে অত্যন্ত বিনম্র ও সদয় আচরণ করা হতো। খলীফা আবদুর রহমানের সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী সমগ্র খ্রিস্টান সম্প্রদায় খলীফা আবদুর রহমানের প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীল ছিল যে, এক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের চাইতে কোন অংশেই কম ছিল না।

যে সব মুসলিম ধর্মীয় নেতা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা ও অমুসলিমদের প্রতি কঠোর আচরণের পক্ষপাতী ছিলেন খলীফা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঐ সব সদয়

আচরণের প্রতি, যা তিনি অমুসলিমদের সাথে করতেন। তিনি ঐ সমস্ত ধর্মীয় নেতাকে উদ্বুদ্ধ করেন যাতে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের মর্মবাণী সম্পর্কে অবহিত হন এবং শরীয়ত সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তাঁদের সংকীর্ণ মনোভাব পরিত্যাগ করেন। এক্ষেত্রে খলীফা সাফল্য অর্জন করেন এবং এ কারণেই তার যুগকে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ মনে করা হয়।

কাফিরদের মুকাবিলায় স্বয়ং যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই খলীফা কারো চাইতে কম ছিলেন না। তাঁর সামরিক তৎপরতা ছিল বিরাট ও ব্যাপক। তার সমাজ কল্যাণমূলক কাজকর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নয়ন, স্থাপত্যকর্ম এবং শিল্প, বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতির উন্নয়ন সম্পর্কে যদি চিন্তা করা যায় তাহলে যে কোন লোকের চোখে তার সম্মান ও মর্যাদা অনায়াসে ধরা পড়বে এবং যে কেউ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, তৃতীয় আবদুর রহমান প্রথম আবদুর রহমানের চাইতে কোন অংশেই কম ছিলেন না।

এই খলীফার যুগে শুধু কর্ডোভা নয় বরং সমগ্র স্পেন স্বর্গীয় রূপ ধারণ করেছিল। দেশের কোথাও এমন এক খণ্ড জমিও ছিল না, যেখানে কৃষিকাজ হতো না। উদ্যানাদির প্রাচুর্যের কারণে সমগ্র দেশটিকে একটি বৃহৎ উদ্যান বলেই মনে হতো। কোন শহর বা জনপদ এমন ছিল না, যেখানে মনোরম ও আকাশচুম্বী দালান-কোঠার প্রাচুর্য ছিল না। এই খলীফার সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে যে স্পেন ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তির কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত হয়েছিল, তাঁর সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার কারণে তা শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্যের চারণভূমিতে পরিণত হয়। তাঁর যুগে কর্ডোভা ও স্পেনের অন্যান্য নগরীর জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপত্যকর্ম বাগদাদ, দামেশক প্রভৃতি নগরীর চাইতে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উন্নত স্পেনের তুলনায় সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ ছিল যেন একটি মরুভূমি, যেখানে সভ্যতা-সংস্কৃতির নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই। সমগ্র ইউরোপের রাজা-বাদশাদের আয় একসাথে যোগ করলেও তা শুধু তৃতীয় আবদুর রহমানের আয়ের সমতুল্য হতো না। খলীফা তৃতীয় আবদুর রহমানের রেজিস্ট্রিভুক্ত নিয়মিত সৈন্যের সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ। প্রয়োজন অনুযায়ী সাময়িকভাবে সেনাবাহিনীতে যেসব স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হতো তাদের কোন সীমা-সংখ্যা ছিল না। শুধু খলীফার ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনীতে ছিল বার হাজার সৈন্য। তন্মধ্যে আট হাজার ছিল অশ্বারোহী এবং চার হাজার পদাতিক।

সমগ্র স্পেন উপদ্বীপের উপর রাজপথ ও জনপথের জাল এমনভাবে বিস্তৃত ছিল যে, দেশের এক প্রান্তের সাথে অপর প্রান্তের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। পথিকদের নিরাপত্তার জন্য কিছুদূর পর পর চৌকি স্থাপন করা হয়েছিল। সৈন্যরা ঐ সমস্ত চৌকিতে অবস্থান করে সমগ্র রাস্তা পাহারা দিত। বার্তাবাহকের মাধ্যমে ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছিল। ঐ বাহকেরা তেজস্বী ঘোড়া ছুটিয়ে এক স্থানের খবর অন্যস্থানে এত দ্রুত পৌঁছিয়ে দিত যে, অন্যান্য দেশের লোকেরা এটাকে একটি যাদুকরী ব্যবস্থা বলেই মনে করত। পাহারা চৌকির জন্য রাজপথের সর্বত্র অসংখ্য টাওয়ার নিমাণ করা হয়েছিল। সমুদ্র উপকূলেও অনুরূপ টাওয়ার ছিল। এই সমস্ত টাওয়ারের শীর্ষ থেকে উপকূল অতিক্রমকারী জাহাজসমূহের আনাগোনার খবর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজধানীতে পৌঁছিয়ে দেওয়া হতো। সমাজ কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো পাকা দালান

নির্মাণ করা হয়েছিল। এ কাজের জন্য বায়তুল মাল থেকে নিয়মিত একটি বড় অংকের অর্থ বরাদ্দ করা হতো। স্থপতি ও শ্রমিকদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্যও এ ধরনের কাজ সব সময় জারি রাখা হতো। আর একমাত্র এ কারণেই মুসলিম শাসনাধীন প্রায় সব দেশে অসংখ্য দুর্গ ও পুল নির্মিত হয়েছিল। রোগাক্রান্ত ও অভাবগ্রস্ত মানুষের জন্য এখানে সেখানে সরকারী খরচে ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলোতে সরকারী খরচেই জনসাধারণের সেবা ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা ছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইয়াতীমখানা গড়ে উঠেছিল। সেগুলোতে খলীফার নিজস্ব ব্যয়খাত থেকে ইয়াতীমদের প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা হতো।

কর্ডোভার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। সেখানকার রাস্তাগুলো ছিল পাকা ও অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরবাড়িগুলো ছিল সাধারণত মর্মর পাথরের তৈরি। পানি নিষ্কাশনের জন্য অত্যন্ত সুন্দর ও পরিকল্পিত ড্রেন ব্যবস্থা ছিল। একটি নির্দিষ্ট সংস্থার উপর শহর পরিচ্ছন্ন রাখার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব অর্পিত ছিল। শহরের অভ্যন্তরেও এখানে সেখানে সুন্দর সুন্দর বাগ-বাগিচা রচিত হয়েছিল। আর বহির্ভাগে যে সমস্ত উদ্যান রচিত হয়েছিল সেগুলো ছিল যেমন বিরাট তেমনি আকর্ষণীয়। শহরের মধ্যে ছিল এক লক্ষ তের হাজার ঘরবাড়ি। মন্ত্রীবর্গ, আমীর-উমারা ও খলীফার জন্য যে সব মহল ও প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছিল তা ছিল এই হিসাবের বাইরে। আশি হাজার চারশ' দোকান, সাতশ' মসজিদ, নয়শ' হাম্মাম (গোসলখানা) এবং পণ্যদ্রব্য রাখার জন্য চার হাজার তিনটি গুদাম ঘর ছিল। বিশ্বের প্রত্যেকটি শহরের মানুষ, প্রত্যেকটি দেশের পোশাক এবং প্রত্যেকটি রাজ্য ও সালতানাতের মুদ্রা কর্ডোভায় দৃষ্টিগোচর হতো। কর্ডোভা নগরীর দৈর্ঘ্য ছিল চব্বিশ মাইল এবং প্রস্থ ছিল ছয় মাইল। প্রাচীর বেষ্টিত মূল নগরীর আয়তন ছিল চৌদ্দ মাইল। রাতের বেলা কোন ব্যক্তি কর্ডোভার বাজারে হাঁটতে থাকলে সে দশ মাইল পর্যন্ত বাজারের প্রজ্বলিত বাতিসমূহের আলোয় চলতে পারত। তখন ভূ-পৃষ্ঠের কোন শহরই কর্ডোভার সমকক্ষতা দাবি করতে পারত না। তখনকার কর্ডোভা শহরে যে বিপুল পরিমাণ হস্ত লিখিত গ্রন্থাদি পাওয়া যেত তা বিশ্বের অন্য কোন শহরেই পাওয়া যেত না। আড়াই মাইল দূরত্ব থেকে বিরাট পাইপের মাধ্যমে শহরে পানি নিয়ে আসা হতো এবং অসংখ্য পাইপের মাধ্যমে তা সমগ্র শহরে সরবরাহ করা হতো। প্রতিটি শিক্ষাগার, প্রতিটি সরাইখানা এবং প্রতিটি মসজিদের দরজায় পানির পাইপ লাগানো হয়েছিল। এসব পাইপ উদ্যানসমূহে নির্মিত ঝর্ণাসমূহেও পানি সরবরাহ করত। শহরে বিরাট বিরাট সাতটি দরজা ছিল, যেগুলোতে নিয়মিত তালা লাগিয়ে রাখা হতো। শহর প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগ মোট পাঁচটি অংশে বিভক্ত ছিল। শাহী প্রাসাদ ছিল এই পাঁচটি অংশের অন্যতম। এই অংশে একটি পৃথক দুর্গ ছিল, যেখানে সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ বসবাস করতেন। শুধু কর্ডোভা নগরীতে নয়, বরং সমগ্র স্পেনে কোন ভিক্ষুক দৃষ্টিগোচর হতো না। সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান তাঁর শাসনকালের শেষদিকে মদীনাতুয যাহরায় (যাহরা নগরী) চলে গিয়েছিলেন। মদীনাতুয যাহরা ছিল কর্ডোভার সন্নিকটে নির্মিত অপর একটি ক্ষুদ্র শহর, যা জাঁকজমকের দিক দিয়ে ছিল কর্ডোভার অনেক

উপরে। তখন স্পেনে হরেক রকমের ফল-ফলাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো এবং হাটে-বাজারে তা অত্যন্ত সুলভমূল্যে বিক্রি হতো।

রাজধানী কর্ডোভায় প্রচুর সংখ্যক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায়ই এখানে সেখানে কবিতা পাঠের আসর, বিতর্ক সভা ও জ্ঞানালোচনার বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। রাজকুমারবৃন্দ, আমীর-উমারা এবং স্বয়ং খলীফা এই সমস্ত বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং নিজেরাও তাতে যোগদান করতেন। তাঁরা আলিম-উলামাকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করতেন এবং তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় ভাতাও নির্ধারণ করে দিতেন। একারণেই গণিত, চিকিৎসা, দর্শন, ফিকাহ, হাদীস এবং তাফসীরশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্ডোভায় এসে জড়ো হতেন। শিক্ষার্থীদের আহার-বাসস্থান এবং অন্যান্য খরচাদি রাজকীয় কোষাগারই বহন করত। খলীফা আবদুর রহমান শেষ বয়সে তাঁর স্থলাভিষিক্ত (অলী-আহ্দ) হাকামের হাতে শাসন পরিচালনার বেশির ভাগ দায়িত্ব অর্পণ করে অধিকাংশ সময় ইবাদত-বন্দেগীতেই অতিবাহিত করতেন।

মৃত্যু

খলীফা আবদুর রহমান নাসির লি-দীনিল্লাহ তাঁর মৃত্যুকালে স্পেন সাম্রাজ্যকে এমন অবস্থায় রেখে যান যে, খ্রিস্টান রাজন্যবর্গ, যারা স্পেনের সীমান্ত অঞ্চলে রাজত্ব করছিলেন, বাধ্য হয়ে মুসলিম সুলতানদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কেননা শত শত বছর অবিরাম চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম সালতানাতের কোনরূপ ক্ষতিসাধনতো দূরের কথা, উল্টো তারা নিজেরাই দুর্বল ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। তারা অধীনস্থ দাস-দাসীদের ন্যায় কর্ডোভার শাহী দরবারে আবেদনপত্র পাঠাতেন এবং নিজেদের মনোবাসনা পূরণের জন্য বাদশার দরবারে করজোড়ে প্রার্থনা করতেন। যে সমস্ত খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহ্ দূর-দূরান্তের দেশসমূহে রাজত্ব করছিলেন তারাও স্পেনের খলীফার সন্তুষ্টি অর্জনে সদা তৎপর থাকতেন এবং তাঁর সাথে সখ্যতা স্থাপন করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। মরক্কো স্পেন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, রোম সাগর এবং অন্যান্য সাগরের উপরও স্পেনীয় নৌবহরের আধিপত্য ছিল। স্পেনের নৌশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে এমন ক্ষমতা কারো ছিল না। দেশের অভ্যন্তরেও পুরোপুরি শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল।

খলীফা হাকাম ইবন আবদুর রহমানের খিলাফত লাভ

পিতার মৃত্যুর তৃতীয় দিনে ৩৫০ হিজরীর ৫ই রমযান (সেপ্টেম্বর ৯৬১ খ্রি) আটচল্লিশ বছর বয়সে হাকাম ইব্ন আবদুর রহমান যাহরা প্রাসাদে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। মন্ত্রীবর্গ, সেনাবাহিনীর অধিনায়কবৃন্দ, আমীর-উমারা, উলামাবৃন্দ, সালতানাতের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বায়আত করার জন্য দরবারে হাযির হন। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি প্রথমে বায়আত করেন। তারপর বায়আত করেন খলীফার ভ্রাতৃবৃন্দ ও অন্যান্য শাহযাদা। তারপর যথাক্রমে বায়আত করেন মন্ত্রীবর্গ, আমীর-উমারা ও ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ। যে সব প্রাদেশিক কর্মকর্তা তখন কর্ডোভায় হাযির হতে পেরেছিলেন তারাও

বায়আতে অংশগ্রহণ করেন। দেশের সর্বসাধারণ যাতে বায়আতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য প্রদেশে ও বড় বড় শহরে খলীফা প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। শাহী প্রাসাদের চাকর-ভৃত্য এবং দাস-দাসীরাও বায়আতে অংশগ্রহণ করে। তারপর ধুমধাম ও জাঁকজমকের সাথে সিংহাসনে আরোহণের পর্বটি সমাধা করা হয়। খলীফা দ্বিতীয় হাকাম নিজের জন্য 'মুসতানসির বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন এবং জা'ফর মুসহাফীকে নিজের হাজিব (মুখ্য সচিব) নিয়োগ করেন।

প্রশাসন ব্যবস্থার পর্যালোচনা

তারপর খলীফা হাকাম সালতানাতের প্রতিটি বিভাগে এবং প্রতিটি দপ্তরে কাজকর্ম ও ব্যবস্থাপনা বিশেষভাবে খতিয়ে দেখেন। তিনি প্রত্যেক মন্ত্রীর দফতর পরিদর্শন করেন, সামরিক বাহিনীর রেজিস্টারসমূহ যাচাই করেন এবং সেগুলোর পরিসংখ্যান নেন। মোটকথা, তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সালতানাতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কেও অবহিত হন। অবশ্য প্রথম থেকেই তিনি সালতানাতের কাজকর্ম সম্পর্কে মোটামুটি অবহিত ছিলেন এবং প্রত্যেকটি বিভাগ দেখাশুনার দায়িত্বও পালন করেছিলেন। যা হোক, সমগ্র প্রশাসন-কাঠামো সম্পর্কে নতুনভাবে পর্যালোচনা করার পর তিনি প্রতিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে স্ব-স্ব পদে স্থায়ী নিয়োগপত্র প্রদান করেন। অন্যকথায়, খলীফা প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে যেন নতুনভাবে তার চাকরিতে নিয়োগ করেন। আর এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করার কারণে তার অপূর্ব সূক্ষ্মদর্শিতা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জনসাধারণ আরো বেশি সজাগ হয়ে ওঠে।

সীমান্তবর্তী খ্রিস্টান রাজাদের বিদ্রোহ

ছোটবেলা থেকে খলীফা হাকামের মনে বইপত্র পড়া ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ছিল প্রবল। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে। বড় বড় জ্ঞানী-গুণী তাঁর সামনে কোন জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদানে ছিলেন ভীতিগ্রস্ত। তাঁর মত এত বিপুল জ্ঞানের অধিকারী কোন সম্রাট খুব সম্ভবত কোন দেশের বা কোন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন নি। যেহেতু পূর্ব থেকেই দ্বিতীয় হাকামের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং বিপুল সংখ্যক গ্রন্থাদি অধ্যয়নের কাহিনী চতুর্দিকে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁর সিংহাসন আরোহণের সংবাদ পেয়ে সীমান্তবর্তী খ্রিস্টান রাজন্যবর্গ এই ধারণার বশবর্তী হয় যে, তিনি তাঁর পিতার ন্যায় নিজেকে একজন অতি কষ্টসহিষ্ণু সামরিক অধিনায়ক হিসাবে প্রমাণ করতে পারবেন না। অতএব, তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেন।

কাসতালার সম্রাট ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী শহরসমূহও আক্রমণ করতে শুরু করেন। খলীফা এই অবস্থা লক্ষ্য করে সিংহাসনে আরোহণের প্রথম বছরই সেনাবাহিনী নিয়ে স্বয়ং কাসতালার দিকে রওয়ানা হন এবং সেখানকার খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে জালীকিয়া রাজ্যের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং প্রজাসাধারণের কাছ থেকে নতুনভাবে আনুগত্যের শপথ নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন।

তারপর জানা গেল যে, জালীকিয়ার খ্রিস্টান বিদ্রোহীরা এই হামলাকে খুব একটা আমল দেয়নি। তাই সেখানে পুনরায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। এবার খলীফা হাকাম তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস গালিবকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের দিকে প্রেরণ করেন এবং জালীকিয়াবাসীদেরকে পর্যুদস্ত করার জন্যও তাকে জোর তাকীদ দেন। গালীব সেখানে পৌঁছে দেখতে পান যে, খ্রিস্টান সেনাবাহিনীর সংখ্যা মুসলিম সেনাবাহিনীর চাইতে বহুগুণ বেশি। এতদসত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তাদের উপর আক্রমণ করেন খ্রিস্টানরা এই আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারপর গালিব কাসতালা রাজ্যের একটি বিরাট অংশ পদানত এবং সেখানকার দুর্গসমূহ ধ্বংস করে কর্ডোভায় ফিরে আসেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হতে না হতেই সংবাদ পাওয়া গেল যে, শানজা (সাঞ্জো) বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং তার সাহায্যার্থে লিওন, নওয়ার, কাসতালা প্রভৃতি রাজ্যের সেনাবাহিনী একত্রিত হয়েছে। খলীফা হাকাম সারাকসতার শাসক ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদকে লিখেন, 'তুমি এই সব বিদ্রোহীকে পরাস্ত কর'। ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদ অত্যন্ত যোগ্যতা ও বীরত্বের সাথে ঐ সমস্ত বিদ্রোহীর মুকাবিলা করেন এবং তাদের সবাইকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে প্রচুর মালে গনীমতসহ খলীফা হাকামের দরবারে হাযির হন। ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদ তখনো কর্ডোভায় অবস্থান করছিলেন এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, বার্সিলোনার অধিপতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। সাথে সাথে এটাও জানা গেল যে, কাসতালার অধিপতিও বিদ্রোহ ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। খলীফা হাকাম ইয়ালা ইবন মুহাম্মাদকে বার্সিলোনার দিকে প্রেরণ করেন। গালিব এবং হুযায়েল ইব্‌ন হাশিমকে কাসতালা অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। উভয় বাহিনী নিজ নিজ গন্তব্য অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং উভয় অঞ্চলেরই বিদ্রোহী খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করে তাদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ নিয়ে ফিরে আসেন।

খলীফা হাকামের শাসনামলের একেবারে সূচনাকালে যখন খ্রিস্টানরা ক্রমাগত পরাজয়বরণ করে তখন তাদের সাহস লোপ পায় এবং তাদের অন্তরে এঁ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, সাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবলের দিক দিয়ে খলীফা দ্বিতীয় হাকাম তাঁর পিতার চাইতে কোন অংশেই কম নন। ৩৫৪ হিজরীতে (৯৬৫ খ্রি.) সীমান্তবর্তী খ্রিস্টানদের মধ্যে পুনরায় বিদ্রোহী মনোভাব জেগে উঠলে ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদ এবং কাসিম ইব্‌ন মুতরিফ তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে শায়েস্তা করেন। ঐ বছর নর্মানরা স্পেন উপদ্বীপের পশ্চিত উপকূলে আক্রমণ চালিয়ে বিশুনা (বিস্‌ন) নগরী পর্যুদস্ত করতে শুরু করে। খলীফা এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে নৌবাহিনী প্রধান আবদুর রহমান ইব্‌ন রিবাহিসকে নির্দেশ দেন– এই ডাকাতদের পালিয়ে যেতে দেবে না। তারপর তিনি স্বয়ং সেনাবাহিনী নিয়ে কর্ডোভা থেকে বিস্‌ন অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু খলীফা ও নৌবাহিনী প্রধান আবদুর রহমানের সেখানে পৌঁছার পূর্বেই সেখানকার অধিবাসীরাই জলস্থল উভয় দিক থেকে ঐ ডাকাতদের উপর হামলা চালায় এবং তাদেরকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। অতএব খলীফা সেখানে পৌঁছার পর না স্থলভাগে কোন সৈন্য দেখেন, আর না জলভাগে কোন নৌযান।

খ্রিস্টান রাজন্যবর্গের ভীতিগ্রস্ততা

শানজার (সাঞ্জার) চাচাত ভাই উর্দুনী, কাসতালার শাসক ফার্ডিনান্ডের জামাতা লিওনের শাসনকর্তা ছিলেন। যখন খলীফা তৃতীয় আবদুর রহমানের বাহিনী শানজাকে লিওনের সিংহাসনে বসিয়ে দেয় তখন উর্দুনী তার শ্বশুর ফার্ডিনান্ডের কাছে চলে যান। এবার উর্দুনী জালীকিয়া থেকে বিশজন সঙ্গী নিয়ে খলীফা হাকামের দরবারে হাযির হয়ে সরাসরি ফরিয়াদ পেশ করার সংকল্প করেন। কিন্তু ৩৫৫ হিজরীতে (৯৬৫-৬৬ খ্রি) লিওনের রাজা উর্দুনী যখন সঙ্গী-সাথীসহ সালিম শহরে উপনীত হন তখন তাকে বাধা প্রদান করেন এবং বলেন ঃ তুমি কোনরূপ পূর্ব অনুমতি ছাড়া মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে কিভাবে প্রবেশ করলে? প্রাক্তন রাজা উর্দুনী বলেন, আমি হচ্ছি আমীরুল মু'মিনীনের একজন নগণ্য দাস। আমি আমার প্রভুর কাছে যাচ্ছি। তাই কারো অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনবোধ করিনি। এতদ্সত্ত্বেও গালিব তাকে সেখানে আটকে রেখে দরবারে খিলাফতকে তার সম্পর্কে অবহিত করেন। দরবার থেকে উর্দুনীর জন্য অনুমতি আসল। উপরন্তু তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য দরবার থেকে একজন সর্দারকেও প্রেরণ করা হলো।

উর্দুনী ধীরে ধীরে কর্ডোভা শহরের সন্নিকটে এসে পৌছেন এবং শহরে প্রবেশ করে যখন খলীফা তৃতীয় আবদুর রহমানের কবরের সামনে এসে দাঁড়ান তখন ঘোড়া থেকে অবতরণ করে দীর্ঘক্ষণ প্রার্থনারত থাকেন। তারপর তিনি কবরকে সিজদা করে দরবার অভিমুখে রওয়ানা হন। খলীফা হাকাম উর্দুনীকে শুভ্র বস্ত্র (বনু উমাইয়া যাকে সম্মানের পোশাক বলে মনে করত) পরিধান করে দরবারে প্রবেশের অনুমতি দেন। টলেডো নগরীর পৌরকর্তা আবদুল্লাহ ইব্ন কাসিম এবং কর্ডোভার খ্রিস্টান ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ালীদ ইবন খীরুন উর্দুনীর সম্মানার্থে এবং তাকে প্রদর্শনের জন্য তার সাথেই ছিলেন। উর্দুনী যখন খলীফার দরবারে হাযির হন তখন খলীফার সামনে পৌছার পূর্বেই দরবারের চাকচিক্য ও জাঁকজমক দেখে একেবারে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং মাথার টুপী খুলে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকেন। সঙ্গীরা তাকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিত প্রদান করে। যখন তিনি সিংহাসনের সামনে গিয়ে হাযির হন তখন একেবারে অলক্ষ্যেই সিজদাবনত হয়ে পড়েন। এভাবে সিজদা (কুর্নিশ) করতে করতে তিনি সেই স্থানে গিয়ে পৌছেন, যে স্থানটি তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। তিনি সেখানে তার জন্য নির্ধারিত আসনে উপবেশন করেন। এবার তিনি ওয়ালীদ ইব্ন খিরূনের ইঙ্গিতে বেশ কয়েক বার কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তখন এত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হয়নি। তার এই অবস্থা দেখে খলীফা হাকাম বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকেন, যাতে উর্দুনীর সম্বিত ফিরে আসে। তারপর খলীফা বলেন, হে উর্দুনী! তুমি এখানে আসায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার দরবারের পক্ষ থেকে তোমার মনস্কামনা পূরণ করা হবে। উর্দুনী এই কথা শুনে আনন্দের আতিশয্যে সিংহাসনের সামনে গিয়ে সিজদাবনত হন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিবেদন করেন ঃ হে প্রভু! আমি আপনার একজন নগণ্য গোলাম। খলীফা বললেন, যদি তোমার কোন প্রার্থনা থাকে তো পেশ কর, আমি তা মঞ্জুর করব। এ কথা শুনে উর্দুনী

দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সিংহাসনের সামনে সিজদাবনত থাকেন। তারপর অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করেন– আমার চাচাত ভাই সাঞ্চো ইতোপূর্বে প্রাক্তন খলীফার খিদমতে এমতাবস্থায় হাযির হয়েছিল যে, তার কোন বন্ধু-বান্ধব বা সাহায্যকারী ছিল না। এমন কি প্রজাসাধারণও তার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও মরহুম খলীফা তার সবিনয় প্রার্থনা শ্রবণ করে তাকে বাদশাহ বানিয়ে দেন। আমি মরহুম খলীফার ঐ নির্দেশ এবং সিদ্ধান্তের কোন বিরোধিতা না করে চুপচাপ দেশ ত্যাগ করি। অথচ প্রজাসাধারণ আমার উপর সন্তুষ্ট ছিল। আমি এবার আন্তরিক আশা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে হাযির হয়েছি। আমি আশা করি মহানুভব খলীফা আমার অধিকার ও যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে অনুগ্রহপূর্বক আমার রাজ্য আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। খলীফা এ কথা শুনে বললেন ঃ আমি তোমার ইচ্ছার কথা বুঝতে পেরেছি। যদি সাঞ্চোর মুকাবিলায় তোমার অধিকার বেশি হয় তাহলে অবশ্যই তুমি তোমার রাজ্য ফিরে পাবে। এ কথা শুনে উর্দুনী পুনরায় সিজদাবনত হয়ে পড়েন। খলীফা দরবারের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং উর্দুনীকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে তার অবস্থান স্থলে পৌঁছিয়ে দেন। উর্দুনীর অবস্থানস্থল হিসাবে প্রাসাদের পশ্চিম অংশের বালাখানা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেখানে যাবার পথে তিনি একটি সিংহাসন দেখতে পান, যার উপর খলীফা কখনো কখনো উপবেশন করতেন। ঐ শূন্য সিংহাসনটি দেখে তিনি এমনভাবে সিজদাবনত হয়ে পড়েন, যেন খলীফা সেটির উপর বসে আছেন। তারপর খলীফার প্রধানমন্ত্রী জা'ফর এসে খলীফার পক্ষ থেকে উর্দুনীকে একট অতি সুন্দর পোশাক জোড়া প্রদান করেন। এভাবে কিছুদিন মেহমানদারীর পর উর্দুনীকে বিদায় জ্ঞাপন করা হয়। কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে তার সাথে পাঠানো হয়, যাতে তারা উর্দুনীকে তার পিতৃরাজ্যের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে আসেন। তারপর সাঞ্চো এবং সামূরা ও জালীকিয়ার সামন্ত রাজারা খলীফার কাছে তাদের আনুগত্য পত্র এবং সেই সাথে প্রচুর উপহার-উপঢৌকন পাঠান। বার্সিলোনা ও তারকূনার শাসকরাও খলীফার দরবারে মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন পাঠান ও কর প্রেরণ করে বশ্যতা স্বীকার করেন।

তারপর ফ্রান্স, ইতালী এবং ইউরোপের অন্যান্য খ্রিস্টান রাজা যারা ইতিপূর্বে খলীফা আবদুর রহমানের কাছে দূত ও উপহার-উপঢৌকন প্রেরণ করতেন, খলীফা হাকামের কাছেও প্রেরণ করতে থাকেন। ফলে পিতার ন্যায় খলীফা হাকামেরও ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। পশ্চিম জালীকিয়ার খ্রিস্টান শাসক, যিনি ঐ সময়ে খুব প্রভাবশালী ছিলেন এবং যার নাম ছিল রডারিক, তার মাকে খলীফা হাকামের দরবারে প্রেরণ করেন। খলীফা রডারিকের মাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দরবারে অভ্যর্থনা জানান এবং তার প্রার্থনা অনুযায়ী তার পুত্রকে লিখিতভাবে রাজ-সনদ এবং শাসনক্ষমতা প্রদান করেন।

মরক্কোর শাসনকর্তার বিদ্রোহ

৩১৬ হিজরীতে (৯২৮ খ্রি.) মরক্কোর ইদরীসী শাসনকর্তা, যিনি কর্ডোভার খলীফার পক্ষ থেকে সেখানে শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন, বার্বারদের মধ্য থেকে বিরাট সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। খলীফা তখন সারকাতের শাসনকর্তা

ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়াকে মরক্কোর দিকে প্রেরণ করেন। স্পেনীয় বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনে মরক্কোর শাসনকর্তা মুসিয়া উবাইদীর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাঁর অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করে নেন। এদিকে আমীর জাওহার সেনাবাহিনী নিয়ে মরক্কোয় গিয়ে পৌঁছেন। উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদ এতে নিহত হন। ফলে এই অভিযান ব্যর্থ হয়।

এই সংবাদ শোনার পর কর্ডোভার দরবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। এবার খলীফা তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম আমীর গালিবকে মরক্কো অভিমুখে প্রেরণ করেন। গালিব সেখানে পৌঁছার পর জাওহার অবশ্য মিসরে চলে যান, তবে মরক্কোর শাসনকর্তা হাসান তার মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের পর বাধ্য করেন যে, তিনি (হাসান) বিনা শর্তে তার (গালিবের) কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। এবার গালিব মরক্কোর শাসনকর্তাকে কর্ডোভার উদ্দেশে প্রেরণ করেন। খলীফা হাসানের সাথে সম্মানজনক আচরণ করেন। একজন অতিথি হিসেবে কর্ডোভায় তার অবস্থানের ব্যবস্থা এবং তার জন্য দৈনিক ভাতাও নির্ধারণ করে দেন। কিছুদিন পর তার ইচ্ছা অনুযায়ী হাসানকে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গালিব এক বছর মরক্কোয় অবস্থান করে সেখানকার প্রশাসন ব্যবস্থাকে মজবুত ও সুদৃঢ় করে তুলেন এবং ৩৬৩ হিজরীতে (৯৭৩ খ্রি) প্রচুর সংখ্যক বন্দীসহ মরক্কো থেকে কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাকে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

অলীআহ্‌দী (ভাবী উত্তরাধিকারত্ব)

৩৬৫ হিজরীতে (৯৭৫ খ্রি) খলীফা হাকাম পুত্র হিশামকে তাঁর অলীআহ্‌দ তথা ভাবী উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন এবং এজন্য আমীর-উমারা, মন্ত্রীবর্গ এবং সালতানাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বায়আত গ্রহণ করেন। অধিকৃত সমগ্র রাজ্যের উলামাবৃন্দের কাছ থেকে অলীআহ্‌দীর বায়আত গ্রহণ করা হয়।

মৃত্যু

ষোল বছর রাজত্ব করার পর দ্বিতীয় খলীফা ৬৪ বছর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩৬৬ হিজরীর ২রা সফর (সেপ্টেম্বর ৯৭৬ খ্রি) ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে হিশামের বয়স ছিল ১১ বছরের কাছাকাছি। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমিরকে হিশামের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। পরদিন হিশাম সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খলীফা দ্বিতীয় হাকামের শাসনকাল ঃ একটি পর্যালোচনা

খলীফা দ্বিতীয় হাকাম স্পেনের প্রখ্যাত উলামাবৃন্দের মধ্যে গণ্য হতেন। তাঁর খিলাফতকালে যদি প্রচুর সংখ্যক যুদ্ধাভিযানের সুযোগ থাকত তাহলে নিশ্চিতভাবে তিনি নিজেকে একজন শীর্ষস্থানীয় সমর-নায়ক হিসেবে প্রতিপন্ন করতে পারতেন। তাঁর আমলে যুদ্ধবিগ্রহ খুব কম হলেও যা হয়েছে তা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলোতে সাধারণভাবে স্পেনীয় বাহিনী বিজয়লাভ করেছিল।

এই খলীফা বেশির ভাগ সময় জ্ঞানচর্চায় অতিবাহিত করতেন। তাঁর মন্ত্রী জা'ফরও খলীফা হারূনুর রশীদের মন্ত্রী জা'ফর বারমাকীর চাইতে কম যোগ্য ছিলেন না। খলীফা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জা'ফরের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের জন্য জ্ঞানচর্চার সময় বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। এই খলীফার যুগে অহেতুক ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ একেবারেই লোপ পেয়েছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেকটি ধর্মের লোকেরা স্পেনে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি খলীফা অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। ফলে সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকই খলীফার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল।

খলীফা হাকাম কুরআনের নির্দেশাবলী কঠোরভাবে পালন করতেন এবং মুসলমানদেরকেও তা পালনে বাধ্য করতেন। ইতিপূর্বে স্পেনের সামরিক বাহিনীর মধ্যে মদ্যপান আসক্তি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। খলীফা মদ তৈরি, বিক্রি এবং তা ব্যবহার করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে এই কলুষতা থেকে দেশকে মুক্ত করেন। খলীফার পক্ষ থেকে একটি বিরাট অংকের অর্থ প্রতিদিন দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হতো। দেশের বড় বড় শহরের এখানে সেখানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ছোট ছোট জনপদ এবং পল্লীতেও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ছাত্রদের বেশির ভাগ খরচাদি রাজকোষ থেকে নির্বাহ করা হতো। যে সব ছাত্র বাইরে থেকে আসত তারা ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফার সম্মানিত মেহমান হিসাবে গণ্য হতো, যতক্ষণ ব্যাপৃত থাকত শিক্ষার্জনে। খলীফা তাঁর ভাই মুনযিরকে শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন অফিসার নিয়োগ করেছিলেন।

দ্বিতীয় হাকামের বিদ্যানুরাগ

প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় খলীফা হাকামের পরিপূর্ণ দক্ষতা ছিল। তিনি ছিলেন গ্রন্থপ্রেমিক। দামেশক, বাগদাদ, কনসটান্টিনোপল, কায়রো, কায়রোয়ান, কূফা, বসরা যেখানেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল সেখানেই খলীফা দ্বিতীয় হাকামের নিজস্ব প্রতিনিধি নিয়োজিত থাকত। তাদের কাজ ছিল যেখানে ভাল বা দুষ্প্রাপ্য কোন গ্রন্থ পাবে সঙ্গে সঙ্গে তা খরিদ করে খলীফার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তারা গ্রন্থকারদেরকে অনুপ্রাণিত করত, যেন তারা তাদের গ্রন্থের প্রথম কপিটি খলীফার কাছে পাঠিয়ে দেন। তারা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবৃন্দকে কর্ডোভায় চলে আসার জন্য উৎসাহিত করত। কোন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি কর্ডোভায় চলে এলে তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে গ্রহণ করা হতো এবং তার জন্য প্রচুর বেতন-ভাতাও নির্ধারণ করা হতো। কোন নতুন গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া গেলে তা হস্তগত করতে যত বাধাবিপত্তিই আসুক, বা তার মূল্য যত বেশিই হোক, হাকামের লাইব্রেরীর জন্য সে গ্রন্থ অবশ্যই খরিদ করা হতো। প্রতিটি শহরে হাকামের লোকেরা শুধু এ জন্য মোতায়েন ছিল যাতে তারা নতুন নতুন গ্রন্থ নকল করে কর্ডোভায় পাঠাতে পারে। তখনকার বিশ্বের সমগ্র রাজা-বাদশাহর সাথে খলীফা হাকামের সুসম্পর্ক ছিল এবং তাদের সকলের লাইব্রেরীতেই খলীফা হাকামের পক্ষ থেকে একজন নকলনবীশ নিয়োজিত থাকত, যাতে তারা প্রতিটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ নকল করে হাকামের কাছে পাঠাতে পারে।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে এবং প্রতিটি শহরে একথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল যে, কর্ডোভার খলীফা লেখক ও গ্রন্থকারদেরকে অত্যন্ত সম্মান করেন। এ কারণেই এমন অনেক গ্রন্থকার ছিলেন যাঁরা বাগদাদ, বসরা প্রভৃতি শহরে অবস্থান করতেন, কিন্তু তাঁদের লেখা গ্রন্থাদি খলীফা হাকামের নামে উৎসর্গ করে তা কর্ডোভায় পাঠিয়ে দিতেন। দ্বিতীয় হাকাম গ্রীক এবং ইবরানী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি আরবীতে অনুবাদ করার জন্য শত শত, এমনকি হাজার হাজার উলামা সমন্বয়ে একটি অনুবাদ বোর্ড গঠন করেছিলেন। স্পেন বিশেষ করে কর্ডোভার প্রতিটি লোকই গ্রন্থাদির প্রতি আসক্ত হয়ে উঠেছিল। ফলে প্রতিটি ঘরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ একটি গ্রন্থাগার বিদ্যমান ছিল। শুধু কর্ডোভায়ই নয়, বরং স্পেনের প্রতিটি শহরেই সরকারী ব্যবস্থাপনায় একটি পাবলিক গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। যে কোন ব্যক্তি আমীরুল মু'মিনীনের আনুকূল্য বা অনুগ্রহপ্রার্থী হলে আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন একটি দুষ্প্রাপ্য ও উপকারী পুস্তক সংগ্রহ করে তা উপঢৌকনস্বরূপ পেশ করার জন্য আমীরুল মু'মিনীনের খিদমতে এসে হাযির হতো।

হাকামের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী

খলীফা হাকামের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীটি শাহী প্রাসাদের চাইতে কম প্রশস্ত বা জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না। তা ছিল সুন্দর মর্মর পাথরে তৈরি। মেঝেও ছিল মর্মর ও অন্যান্য মূল্যবান পাথরে নকশা করা। তাতে ছিল সন্দুল, আবনূস এবং অন্যান্য মুল্যবান কাঠের তৈরি সারি সারি আলমারি। আলমারির ভিতরে কোন্ কোন্ বিষয়ের কি কি পুস্তকাদি রয়েছে তা আলমারির উপরিভাগে সোনালি অক্ষরে লেখা থাকত। ঐ গ্রন্থাগারে হাজার হাজার বাঁধাইকারী এবং নকলনবীস সর্বক্ষণ কর্মরত থাকত। হাকামের লাইব্রেরীতে গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ছয় লাখের কাছাকাছি।

গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা

যে তালিকায় শুধু গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম লিপিবদ্ধ ছিল তা ছিল ৪৪ খণ্ডে বিভক্ত। সেগুলোর মধ্যে এমন অনেক গ্রন্থ ছিল, যেগুলো অধ্যয়ন করার সুযোগ (ফুরসত) খলীফা হাকাম পাননি। এগুলো ছাড়া প্রায় প্রতিটি গ্রন্থের মধ্যে খলীফা নিজ হাতে টীকা লিখেছিলেন। এছাড়াও প্রতিটি গ্রন্থের প্রথম পাতায় খলীফা নিজ হাতে গ্রন্থের নাম এবং গ্রন্থকার ও তার বংশ পরিচয় লিখে রেখেছিলেন। খলীফা হাকামের স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। সেই সাথে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও বিচক্ষণ। তিনি অনায়াসে যে কোন ধরনের পদ্য বা গদ্য রচনা করতে পারতেন।

হাকামের রচনা

ইতিহাসের প্রতি খলীফা হাকামের অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। তিনি নিজেই স্পেনের একটি ইতিহাস রচনা করেছিলেন। কিন্তু কালের করাল গ্রাসে পড়ে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তখনকার বিশ্বের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবৃন্দ চাই তারা যে কোন সম্প্রদায়ের, যে কোন ধর্মের বা যে কোন বিষয়ের হোন– দলে দলে কর্ডোভায় এসে জড় হয়েছিলেন। মোটকথা, খলীফা হাকামের যুগে কর্ডোভা সব রকম জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি অতুলনীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

'কিতাবুল আমালী'-এর গ্রন্থকার আবূ আলী কা-লী বাগদাদী তৃতীয় আবদুর রহমানের খিলাফত আমলে স্পেনে পদার্পণ করেন। সুলতান হাকাম এই প্রখ্যাত আলিমকে এক মুহূর্তের জন্যও নিজের কাছছাড়া করতেন না। আবূ বকর আল-আরযাক, যিনি ছিলেন ঐ যুগের একজন বিখ্যাত আলিম এবং সালামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর অধঃস্তন পুরুষ। ৩৫৯ হিজরীতে (৯৭০ খ্রি.) কর্ডোভায় এসে উপনীত হন এবং ৫৮ বছর বয়সে ৩৮৫ হিজরীর যিলকদ (ডিসেম্বর ৯৯৫ খ্রি) মাসে এখানেই মৃত্যুবরণ করেন এবং সমাধিস্থ হন। খলীফা হাকাম তার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আলী, যিনি ইবন যামা-এর বংশের লোক ছিলেন— কায়রো থেকে স্পেনে আসেন এবং খলীফা হাকাম-এর উলামা মজলিসের অন্তর্ভুক্ত হন। সাকার আল বাগদাদী এবং ইব্ন আমর প্রমুখ বিখ্যাত কাতিব ছিলেন। খলীফা হাকাম তাদেরকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। আবুল ফারাহ ইসফাহানী এবং আবূ বকর মালিকীর কাছে খলীফা উপহারস্বরূপ এক হাজার দীনার করে পাঠিয়েছিলেন। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আযরী কর্ডোভার রাজ-দরবারের একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন চিকিৎসক ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবন মুফার্রিজ ছিলেন ফিকাহ ও হাদীসের বিখ্যাত আলিম। ইব্ন মুগীছ আহমদ ইবন আবদুল মালিক, ইবন হিশাম আল-কাভী, ইউসুফ ইব্ন হারূন, আবুল ওয়ালীদ ইউনুস এবং আহমদ ইব্ন সাঈদ হামদানী ছিলেন স্পেনের বিখ্যাত কবি। খলীফা হাকামের নির্দেশে মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ দুররানী মানচিত্র সহকারে আফ্রিকার ইতিহাস লিখেছিলেন। ঈসা ইব্ন মুহাম্মদ, আবূ উমর আহমদ ইব্ন ফারাজ এবং ইয়াঈশ ইব্ন সাঈদ ছিলেন খলীফা হাকামের যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক। এরা সকলেই কর্ডোভা রাজ দরবারের শোভা বর্ধন করেছিলেন।

জ্ঞানী ও গুণীজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি দৃষ্টান্ত

খলীফা হাকাম জ্ঞানী ও গুণীজনের প্রতি যে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন তার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত এই যে, একদা আবূ ইবরাহীম নামীয় একজন ফকীহ্ মসজিদে আবূ উসমানে ওয়ায করছিলেন। এমন সময় শাহী দূত (দণ্ডধারী) এসে তাঁকে বললো, আমীরুল মু'মিনীন আপনাকে এখনই ডেকেছেন এবং তিনি আপনার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছেন। আবূ ইবরাহীম উত্তর দেন, তুমি আমীরুল মু'মিনীনকে গিয়ে বল, আমি এখন আল্লাহ্র কাজে ব্যস্ত আছি। যতক্ষণ না এই কাজ থেকে অবসর নেব ততক্ষণ আমার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। রাজদূত এই উত্তর শুনে অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করে এবং খলীফার কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে ইবরাহীমের এই উক্তি সম্পর্কে অবহিত করে। খলীফা হাকাম তা শুনে দূতকে বলেন, তুমি ইবরাহীমকে গিয়ে বল, আমি এ কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি যে, আপনি আল্লাহ্র কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। যখন এই কাজ থেকে অবসর নেবেন তখনি আসবেন। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত দরবারে আপনার অপেক্ষায় থাকব। দূত আবূ ইবরাহীমের কাছে এসে খলীফার পয়গাম সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। এবার আবূ ইবরাহীম বললেন, তুমি আমীরুল মু'মিনীনকে গিয়ে বল, বার্ধক্যের কারণে না আমি ঘোড়ায় চড়তে পারি, আর না হাঁটতে পারি।

রাজপ্রাসাদের বাবুস সাদ্দাহ এখান থেকে বেশ দূরে এবং বাবুস্ সানআ অপেক্ষাকৃত নিকটে। যদি আমিরুল মু'মিনীন বাবুস্ সান্আ খুলে দেওয়ার অনুমতি দেন তাহলে আমি সহজেই এই দরজা দিয়ে দরবারে হাযির হতে পারি। রাজপ্রাসাদের বাবুস সান্আ সব সময় বন্ধ থাকত এবং শুধু বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে তা খোলার অনুমতি দেওয়া হতো। যা হোক আবূ ইবরাহীম পুনরায় বক্তৃতায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। দূত এই বার্তাটি খলীফার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে খলীফার নির্দেশে পুনরায় মসজিদে এসে বসে পড়ে। যখন ইবরাহীম তাঁর ওয়ায শেষ করেন তখন দূত অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁকে বলেন ঃ হুযূর, সান্আ আপনার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে এবং আমীরুল মু'মিনীন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আবূ ইবরাহীম যখন বাবুস আনআয় পৌঁছেন তখন দেখতে পান যে, সেখানে আমীর-উমারা এবং মন্ত্রীবর্গ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। যাহোক তিনি দরবারে যান এবং খলীফার সাথে কথাবার্তা বলে ঐ দরজা দিয়েই সসম্মানে বেরিয়ে আসেন।

হাকামের খিলাফত আমলের বৈশিষ্ট্যসমূহ

দ্বিতীয় হাকামকে অত্যন্ত নির্দ্বিধায় স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা বলা যেতে পারে। কেননা তাঁর যুগে সালতানাতের পরাক্রম, দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, জাঁকজমক, ঐশ্বর্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি চরম উন্নতি লাভ করে। আর সবচেয়ে বেশি উন্নতি পরিলক্ষিত হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। এটি এমন একটি কৃতিত্ব, যা অর্জন করা হারূন, মামূন ও মানসূরের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। একজন প্রতাপশালী সুলতান ও জ্ঞানানুসারী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে খলীফা হাকাম ছিলেন সবার শীর্ষে। কিন্তু একটি ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়। আর তা হলো, এই অনন্য জ্ঞানী-গুণী সুলতানও পিতৃস্নেহের কাছে চরমভাবে হার মেনেছিলেন। তিনি তাঁর সেই ছেলেকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছিলেন যার বয়স ছিল তার (খলীফার) মৃত্যুকালে মাত্র এগার বছর। খিলাফত ও সালতানাতের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারিত্বের অভিশাপ থেকে তাঁর মত জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করাটা ছিল অতীব বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তিনি এ ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন এবং মামূনুর রশীদ আব্বাসীর কাছে আর কোন ক্ষেত্রে না হলেও এক্ষেত্রে তাঁকে চরম পরাজয় বরণ করতে হয়। কেননা সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে মামূন তাঁর বংশধরদের পরওয়া করেন নি। তিনি নির্দ্বিধায় একজন আলাভীকেই আপন উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন। কিন্তু যখন ঐ উত্তরাধিকারী মামূনের জীবিতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন একমাত্র তখনই মামূনের ভাই মুতাসিম পরবর্তী খলীফা মনোনীত হবার সুযোগ পান।

খলীফা দ্বিতীয় হাকামের ভাই মুগীরা হুকুমত পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। হাকাম অত্যন্ত ন্যায্যভাবে তাঁকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি মুগীরাকে বঞ্চিত করে অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকেই অলীআহ্দ নিয়োগ করেন। আর প্রধানত একারণেই স্পেনের আকাশে দেখা দেয় দুর্যোগের ঘনঘটা– শুরু হয় উমাইয়া সাম্রাজ্যের দ্রুত পতনের যুগ।

দ্বিতীয় হিশাম ইব্‌ন হাকাম দ্বিতীয় এবং মানসূর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমির

৩৬৬ হিজরীতে (৯৭৬ খ্রি) যখন খলীফা দ্বিতীয় হাকাম মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হিশাম এগার বছর বয়সে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন তখন স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী।

১. হাজিবুস্ সুলতানাত প্রধানমন্ত্রী জা'ফর ইব্‌ন উসমান মুসহাফী। তিনি হাকামের শাসনামল থেকেই প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁকে একজন জ্ঞানী, জ্ঞানানুরাগী এবং অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি বলে মনে করা হতো।

২. সম্রাজ্ঞী সুবাহ্ ছিলেন দ্বিতীয় হাকামের সহধর্মিণী এবং হিশাম ইব্‌ন হাকামের মা। খলীফা দ্বিতীয় হাকামের শাসনামলেও তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন। খলীফা হাকামও তাঁর মন যুগিয়ে চলতেন। এর একটি কারণ এই ছিল যে, এই রমণী ছিলেন অলীআহ্‌দের মা। তাছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ মহিলা।

৩. স্পেন সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি গালিব। ইনি ছিলেন খলীফা দ্বিতীয় হাকামের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস। তাছাড়া সেনাবাহিনী ও সাধারণ নাগরিকদের কাছে তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়।

৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমীর ইব্‌ন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মুহাম্মাদ ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক মুআফিরী– তার উর্ধ্বতন পুরুষ আবদুল মালিক মুআফিরী প্রথম স্পেন বিজয়ী তারিক ইবন যিয়াদের সাথে স্পেনে পদার্পণ করেছিলেন।

৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির ছিলেন হিশাম ইব্‌ন হাকামের গৃহশিক্ষক (প্রশিক্ষক)। সম্রাজ্ঞী সুবাহ্ও তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতেন। খাজাসারা (অন্দর মহলের কর্মাধ্যক্ষ) ফায়িক। ইনি রাজপ্রাসাদের রক্ষীবাহিনীর অধ্যক্ষ এবং খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন।

৬. খাজাসারা জুযার। ইনি ছিলেন কর্ডোভা নগরীর বাজারসমূহের নিরাপত্তা কর্মকর্তা বা পুলিশ প্রধান। শেষোক্ত দু'জন খাজাসারা এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, বড় বড় আমীররাও তাদেরকে ভয় করতেন এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জনে সদাসচেষ্ট থাকেন।

সালতানাতের অধিকারী সদস্যবর্গের পরামর্শ

খলীফা দ্বিতীয় হাকাম যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন ফায়িক এবং জাওয়ার ছাড়া অন্য কেউ রাজধানীতে ছিলেন না। খলীফার মৃত্যুর পর পরস্পর সলাপরামর্শ করে তারা উভয়ে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেন যে, শাহযাদা হিশামকে সিংহাসনে বসালে ইসলামী রাষ্ট্রে সঙ্কটের সৃষ্টি হতে পারে। অতএব খলীফা হাকামের ভাই মুগীরাকেই সিংহাসনে বসানো উচিত। কেননা খিলাফতের দায়িত্ব বহন করার মত যোগ্যতা তাঁর রয়েছে। জাওযারের অভিমত ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী জা'ফর মাসহাফীকে সর্বপ্রথম হত্যা করা উচিত, যাতে মুগীরার সিংহাসনে

আরোহণের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়। কিন্তু ফায়িক বললেন, আমার মনে হয়, প্রথম প্রধানমন্ত্রী মাসহাফীর সামনে প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে তাকে আমাদের স্বপক্ষে নিয়ে আসা উচিত। কেননা তিনি যে আমাদের পক্ষ সমর্থন করবেন তার পুরোপুরি সম্ভাবনা রয়েছে। আর তিনি যদি একান্তই আমাদের পক্ষ সমর্থন না করেন তাহলে তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। যা হোক, মন্ত্রী জা'ফরকে তলব করা হয়। তিনি যখন আসেন তখন তার কাছে খলীফার মৃত্যু সংবাদ এবং সেই সাথে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথাও ব্যক্ত করা হয়। মন্ত্রী পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, আমি আপনাদের উভয়ের মতানুযায়ী কাজ করব। তবে সালতানাতের অন্য সদস্যদের সাথেও এ ব্যাপারে পরামর্শ করা উচিত। এভাবে জা'ফর তাদের উভয়কে ধোঁকা দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন এবং নিজের ঘরে পৌঁছেই সুলতানের অধিকার সদস্যবর্গকে একত্র করে তাদেরকে খলীফার মৃত্যু এবং ফায়িক ও জাওয়ারের অভিমত সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বলেন, আমার অভিমত এই যে, সম্ভাব্য ফিতনা প্রতিরোধের জন্য এই মুহূর্তেই মুগীরা এবং হাকামকে হত্যা করা উচিত। উপস্থিত সকলেই তার এ অভিমত পছন্দ করেন, কিন্তু এ নিরপরাধ লোকগুলোকে হত্যা করার সাহস পান নি। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমির বলেন, আমিই ঐ কাজ সম্পাদন করবো। যখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমির মুগীরার ঘরে গিয়ে পৌঁছেন তখন তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। আপন ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ তখন পর্যন্ত তার কাছে পৌঁছেনি। ঘুম থেকে জেগে যখন তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমিরের কাছ থেকে এই দুঃসংবাদ পান তখন অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং আপন ভাতিজা হিশামের আনুগত্য স্বীকার এবং তার হাতে বায়আত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমির এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এবং মুগীরাকে একেবারে নিরীহ ও নির্দোষ লক্ষ্য করে জা'ফর মাসহাফীর কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠান যে, মুগীরা হিশামের আনুগত্য স্বীকারে সদা প্রস্তুত এবং অবাধ্যতার কোন ইচ্ছা তার নেই। এমতাবস্থায় সাবধানতা অবলম্বনের জন্য মুগীরাকে বন্দীশালায় আটকে রাখাই যথেষ্ট। তাকে হত্যা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মন্ত্রী জা'ফর সঙ্গে সঙ্গে পয়গাম পাঠান– তুমি যদি এই কাজ করতে না পার তাহলে আমি এমন কাউকে পাঠাচ্ছি, যে নির্দ্বিধায় এ কাজ সমাধা করতে পারে। এই পয়গাম প্রাপ্তির সাথে সাথে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির নির্দোষ মুগীরাকে হত্যা করে ফেলেন এবং যে কক্ষে তাকে হত্যা করা হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে তা প্রাচীর বেষ্টিত করে ফেলা হয়।

সিংহাসনে আরোহণ

তারপর খলীফা হিশামের সিংহাসন-আরোহণ উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়। ফায়িক ও জাওয়ারের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তারপর তারা অল্পবয়স্ক খলীফার বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াস পান এবং বিনা অপরাধে মুগীরাকে যে হত্যা করা হয়েছে সেদিকেও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে মানুষের মধ্যে এক সাংঘাতিক ধরনের অসন্তোষ পরিলক্ষিত হয় এবং কিছুদিন পরই রাজধানী কর্ডোভায় সংবাদ পৌঁছে যে, উত্তর সীমান্তবর্তী খ্রিস্টান করদ রাজ্যের অধিপতিরা মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে লুটপাট

শুরু করে দিয়েছে এবং অল্পবয়স্ক একজন খলীফা সিংহাসনে আরোহণ করায় তারা অত্যন্ত দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী জা'ফর যোগ্যতার বিশেষ কোন পরিচয় দিতে পারেন নি বরং অন্তর্বিরোধ ও আত্মকলহের কারণে তিনি কিছুটা দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

একজন উপদেষ্টা হিসাবে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমির

শেষ পর্যন্ত রাণী সুবাহের নির্দেশে ও ইঙ্গিতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমিরকে মন্ত্রী জা'ফরের কাজ-কর্মে তার সহযোগী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির জা'ফরের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে নিজেই রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজকর্মের হর্তাকর্তায় পরিণত হন। তারপর স্পেনের মুসলিম রাষ্ট্রের যে অবস্থাদি বর্ণনা করা হবে তা প্রকৃতপক্ষে ইব্‌ন আবী আমিরেরই কর্মতৎপরতার প্রতিচ্ছবি। তাই এই বর্ণনায় হিশামের সাথে ইব্‌ন আমিরের নামও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমিরের জীবন-বৃত্তান্ত

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমির স্পেনের তারকশ নামক স্থানে ৩৫৭ হিজরীতে (৯৬৮ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর বংশের লোকেরা বসবাস করলেও তাঁর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ আবদুল মালিক মুআফিরী ছিলেন একজন ইয়ামানী। তিনি ছিলেন একজন পেশাদার সিপাহী। অবশ্য পরবর্তীকালে তার বংশধরদের মধ্যে বহুল পরিমাণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। ফলে সিহাপীগিরির দিকে তাদের খুব একটা আকর্ষণ থাকেনি। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই তাঁর পিতা হজ্জ করে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে পশ্চিম ত্রিপোলী অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমির অতি অল্প বয়সে কর্ডোভায় এসে তখনকার সরকারী মাদরাসায় শিক্ষা লাভ করতে থাকেন এবং শিক্ষা সমাপনান্তে শাহী দরবার সংলগ্ন একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে বসে দরখাস্ত লেখার পেশা গ্রহণ করেন। তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মানুষের চিঠিপত্র এবং কোর্ট-কাছারিতে পেশ করা হবে এমন সব দরখাস্ত লিখে দিতেন। এটাই ছিল তাঁর একমাত্র পেশা। ঘটনাচক্রে সুবাহের অর্থাৎ হিশামের মাতার এমন একজন লেখকের (কেরানী) প্রয়োজন পড়ে, যে তার বিষয়-সম্পত্তির হিসাব রাখবে। শাহী মহলের কোন একজন ভৃত্য সে পদের জন্য মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমিরের ব্যাপারে রাণীর কাছে সুপারিশ করে। ফলে তিনি রাণীর ওখানে লেখক হিসাবে নিযুক্ত হন। আপন কর্মদক্ষতার খ্যাতি এবং রাণীর সুপারিশের কারণে কিছুদিনের মধ্যেই পদোন্নতি লাভ করে ইব্‌ন আমির সেভিলে কর আদায় বিভাগের অফিসার নিযুক্ত হন। এই পদে চাকরিকালে যেহেতু তাঁকে কর্ডোভার বাইরে অবস্থান করতে হতো তাই তিনি রাণী সুবাহের কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করে তাকে এই মর্মে সম্মত করতে সক্ষম হন যে, তিনি খলীফা হাকামের কাছে সুপারিশ করে তাকে (ইব্‌ন আমিরকে) কর্ডোভায় ঐ ধরনেরই কোন পদ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। শেষ পর্যন্ত তাকে টাকশাল বিভাগের কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমির সবিশেষ

যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি রাণী সুবাহকেও মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে সন্তুষ্ট রাখেন। তিনি মন্ত্রী মাসহাফী এবং অন্যান্য সভাসদকেও নিজের বন্ধু ও কল্যাণকামীতে পরিণত করেন। এভাবে তিনি নিজেকে রাতারাতি এতই বিশ্বস্ত করে তুলেন যে, খলীফা হাকাম মৃত্যুর পূর্বে তাঁকেই শাহযাদা হিশামের আতালীক (গৃহশিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক) নিয়োগ করে যান।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমিরের কৃতিত্ব

খলীফা হাকামের মৃত্যু এবং মুগীরার নিহত হওয়ার পর যখনই হিশাম সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন সাম্রাজ্যের যাবতীয় কর্তৃত্ব মন্ত্রী জা'ফর মাসহাফীর হাতে চলে আসে। সেনাপতি গালিবকে বাহ্যত মন্ত্রী জা'ফরের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হতো। রাণী সুবাহ রাজকীয় কাজকর্মে পূর্বের চাইতেও অধিক প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তাকে সবাই সমীহ করত এবং তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমিরের প্রতি অধিকতর উদার ও দয়াশীল। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির মন্ত্রী জা'ফর এবং সেনাপতি গালিবকে পরামর্শ দিয়ে সর্ব প্রথম প্রাসাদ কর্মচারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস করেন। ফায়িককে মেওর্কায় নির্বাসিত করা হয় এবং সেখানে সে অজ্ঞাত ও অখ্যাত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। জাওযারকে তার পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয় এবং তার সঙ্গী-সমর্থকদেরকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। এমতাবস্থায় উত্তর সীমান্তবর্তী খ্রিস্টানদের মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ ও খলীফাকে করদানে অস্বীকৃতির খবর আসতে থাকে। মন্ত্রী জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমিরকে খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির উত্তর সীমান্তে পৌঁছে খ্রিস্টানদের পরাজিত ও পর্দুদস্ত করে বিজয়ী বেশে কর্ডোভায় ফিরে আসেন। এই সমস্ত বিজয়ের সংবাদ প্রথমই কর্ডোভায় এসে পৌঁছেছিল। ফলে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমিরের জনপ্রিয়তা ও মর্যাদাও অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছিল। কর্ডোভাবাসীরা তাকে জাঁকজমকের সাথে অভ্যর্থনা জানায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই শাহী দরবারে তাঁর অধিকার ও কর্তৃত্ব দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এবার মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির গালিবকে স্বমতে টেনে এনে মাসহাফীকে মন্ত্রীত্ব থেকে বরখাস্ত এবং নানাভাবে অপদস্থ করেন। এমন কি তাকে বন্দী করে ফেলেন এবং এই অবস্থায়ই মাসহাফীর দুঃখজনক মৃত্যু ঘটে।

যেহেতু গালিব স্পেনের সমগ্র সেনাবাহিনীর কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, তাই তার উপর হস্তক্ষেপ করাটা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি শুরু করেন এবং যাদেরকে ভর্তি করেন তারা ছিল উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ী খ্রিস্টান এবং মরক্কো ও পশ্চিম ত্রিপোলীর বার্বার। ইব্‌ন আবী আমির এখন একক প্রধানমন্ত্রী। তিনি গালিবের প্রতি এবার সীমাহীন ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে থাকেন। গালিবের দিক থেকে তার আশংকার কোন কারণ বাকি ছিল না। যেহেতু তিনি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখতেন এবং নিজের মর্জিমত স্পেন শাসন করতে পারছিলেন না, তাই অত্যন্ত কৌশলের সাথে পুরাতন সেনাবাহিনীর একটি অংশকে বাতিল করে দেন এবং বাকি সবাই অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক পদে নিয়োগ করে সেনাবাহিনীর জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে

চূর্ণ-বিচূর্ণ করে অপর দিকে তিনি নতুনভাবে ভর্তিকৃত বাহিনীকে অত্যন্ত সুসংগঠিত করে তোলেন। এভাবে তিনি অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে গালিরের শক্তিকে দুর্বল করে দেন। তারপর এক সময়ে গালিবকেও তিনি অত্যন্ত সহজে তাঁর পথ থেকে হটিয়ে দেন। সাম্রাজ্যের কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি দেখা দেয়নি। একদা গালিব ও ইব্ন আমিরের মধ্যে কোন একটি বিষয়ে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয় এবং অবস্থা শেষ পর্যন্ত তরবারি যুদ্ধের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। ফলে ইব্ন আবী আমির কিছুটা আহত হন এবং গালিব কর্ডোভা থেকে পালিয়ে খ্রিস্টান সম্রাট লিউনের কাছে চলে যান। এভাবে এক এক করে আপন প্রতিদ্বন্দ্বীদের পর্যুদস্ত করে ইব্ন আবী আমির শেষ পর্যন্ত রাণী সুবাহের যাবতীয় ক্ষমতাও খর্ব করে ফেলেন এবং দ্বিতীয় হিশামকে শাহী প্রাসাদের অভ্যন্তরে আপন নিয়োগকৃত ভৃত্যদের মধ্যে বলতে গেলে, নজর বন্দী করে ফেলেন।

হিশাম শাহী প্রাসাদ থেকে বের হতে পারতেন না। মহলের অভ্যন্তরেই তার জন্য যাবতীয় খেলাধুলা ও আরাম সামগ্রীর যোগান দেওয়া হতো এবং এই নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। ইব্ন আমিরের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি হিশামের সাথে সাক্ষাত করতে পারত না। ইব্ন আমির সব দিক থেকে স্বস্তি লাভের পর সামরিক বাহিনীর সংস্কার ও সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন এবং অতি সত্ত্বরই একটি সুসংগঠিত বীরত্বপূর্ণ বাহিনীর অধিকারী হন। তারপর তিনি আপন বাহিনীর মধ্যে নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

তারপর ইব্ন আবূ আমির খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বেশ কয়েকটি খ্রিস্টান রাজ্যকে আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। বাকি খ্রিস্টান রাজ্যগুলোকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়। ফলে তার নাম শোনামাত্র খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। এরই ফলশ্রুতিতে স্বয়ং খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহ এবং গোত্রপতিরা ইবন আমিরের বাহিনীতে শরীক হয়ে অনেক খ্রিস্টান রাজাকে পর্যুদস্ত করছে— এমনকি, স্বয়ং খ্রিস্টানরা মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়ে নিজেরাই নিজেদের গির্জা ধ্বংস করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। কিন্তু ইব্ন আবূ আমির খ্রিস্টানদেরকে তাদের উপাসনালয় ধ্বংস কিংবা সেগুলোর অমর্যাদা করা থেকে বিরত রাখেন। তারপর তিনি আফ্রিকার দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি সেদিকেও স্পেন সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন। মোটকথা, তিনি তাঁর যুগে মোট ৫৬টি যুদ্ধ করেন এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধেই জয়লাভ করেন। তিনি তার শাসনামলের শেষ দিকে নিজের জন্য 'মানসূর' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু শুধু 'মানসূর' নয় বরং মহান 'মানসূর' (মানসূরে আযম) উপাধিতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মৃত্যু

ইব্ন আবূ আমির মোট ২৭ বছর শাসন পরিচালনার পর কাস্তালার সর্বশেষ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনা-ই-সালিম তথা মিডনিয়াসিলিতে ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমির মানসূরের শাসনকাল সম্বন্ধে পর্যালোচনা

মানসূরে আযমের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন খিলাফতে বাগদাদের দায়লামী, সালজুকী প্রমুখ সুলতান তাদের সময়ে আব্বাসীয় খলীফার নামেমাত্র খলীফা ছিলেন। শাসনক্ষমতা ছিল প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত সুলতানেরই হাতে। অনুরূপভাবে মানসূরের আযম নিজেকে 'হাজিব' তথা মুখ্য সচিব উপাধিতে আখ্যায়িত করলেও স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র ক্ষমতা তাঁর হাতেই ছিল। তিনি কর্ডোভা থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে 'মদীনা-ই-যাহির' নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন, যা ছিল একটি দুর্গেরই অনুরূপ। ঐ প্রাসাদে তিনি তাঁর যাবতীয় দফতর ও মাল-ভাণ্ডার স্থানান্তরিত করে নিয়েছিলেন। জুমুআর খুতবায় হিশামের সাথে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমিরের নামও উল্লেখ করা হতো। মুদ্রায়ও তাঁর নাম অংকিত হতো। সরকারী কর্মকর্তারা তাঁকে সেরূপ সম্মান ও মর্যাদা দিত, যেরূপ সম্মান ও মর্যাদা দিত স্পেনের উমাইয়া খলীফাদেরকে।

ইব্‌ন আবূ আমির অর্থাৎ মানসূরে আযমের অস্তিত্ব ছিল স্পেন এবং স্পেনের ইসলামী সালতানাতের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। তিনি লিওন এবং তার আশেপাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে সরাসরি ইসলামী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে রূপান্তরিত করেন। বার্সিলোনা, কাসতালা এবং নওয়ার রাজ্যকে তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অনুগত করদ রাজ্যে পরিণত করেন। একদা কোন একটি প্রয়োজনে মানসূরে আযমের একজন দূত রাজা গার্সিয়ার লাশকাম্বিস রাজ্যে গিয়েছিল। গার্সিয়া তাকে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে অভ্যর্থনা জানান এবং রাজ্যব্যাপী তার পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। ঐ পরিভ্রমণকালে দূত জানতে পারে যে, কোন একটি গির্জায় একজন মুসলিম মহিলাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। ঐ গির্জার পুরোহিতরা তাকে বন্দী করে রেখেছিল। দূত কর্ডোভায় ফিরে এসে গার্সিয়ার রাজ্যের অবস্থাদি এবং সেই সাথে সেখানে বন্দী ঐ মহিলার কথা বর্ণনা করে। মানসূরে আযম সঙ্গে সঙ্গে লাশকাম্বিস আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যখন তিনি লাশকাম্বিসের নিকটে গিয়ে পৌঁছেন তখন গার্সিয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে তার খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করেন ঃ আমি তো আপনার বা মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন অশিষ্ট আচরণ করি নি। মানসূর বলেন, তুমি এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে, তোমার দেশে কোন মুসলমানকে বন্দী করে রাখবে না। এতদসত্ত্বেও অমুক গির্জায় একজন মুসলিম মহিলাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। গার্সিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঐ মুসলিম মহিলাকে মানসূরের কাছে হস্তান্তর করে ঐ গির্জাটি ধ্বংস করে ফেলেন।

৩৭৮ হিজরীর ২৪শে জমাদিউস সানী (অক্টোবর ৯৮৮ খ্রি) মানসূর কর্ডোভা থেকে কুরিয়া নগরীর উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং তা পদানত করে জালীকিয়ায় গিয়ে পৌঁছেন। খ্রিস্টান নেতৃস্থানীয় লোকেরা সেখানে এসে মানসূরের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে এবং ঐ অভিযানে তাঁর সাথে যোগ দেয়। তাদের সকলকে নিয়ে মানসূরে আযম সমুদ্র-উপকূল পর্যন্ত সমগ্র এলাকার বিদ্রোহী লোকদেরকে শাস্তি প্রদান করেন এবং সেখানকার যে সমস্ত গির্জা ষড়যন্ত্রের আবাসে পরিণত হয়েছিল সেগুলোকে ধ্বংস করে আটলান্টিক মহাসাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমূহও জয় করেন এবং যে সমস্ত পলাতক বিদ্রোহী সেগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল

তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। তিনি ফ্রান্সের উপকূলবর্তী শহরসমূহও জয় করেন এবং সেখানকার যে সমস্ত দুর্গকে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা হয়েছিল সেগুলোকে ধ্বংস করে কর্ডোভায় ফিরে আসেন। এটা ছিল মানসূরের ৪৮তম অভিযান।

মানসূরে আযম জ্ঞানী-গুণীদের মর্যাদা দিতেন

খলীফা দ্বিতীয় হাকামের মত মানসূরে আযম জ্ঞানী-গুণীদের অত্যন্ত মর্যাদা প্রদান করতেন। তিনি নিজেও ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। এতদসত্ত্বেও যারা ছাত্রজীবনে তাঁর সতীর্থ ছিলেন তাদের কেউ কেউ তাঁর এই বিরাট সম্মান ও মর্যাদা প্রত্যক্ষ করে ঈর্ষার আগুনে একেবারে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল। তারা সুযোগ বুঝে মানসূরের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র পাকায়। তারা তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে, দর্শনশাস্ত্র এবং নাস্তিকতার প্রতি তাঁর ঝোঁক রয়েছে। মানসূর সঙ্গে সঙ্গে এই গুজব রটনার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। তিনি উলামার একটি বিরাট বৈঠক আহ্বান করে এই গুজব যে একেবারে অমূলক ও ভিত্তিহীন তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মানসূর অনেকগুলো সেতু নির্মাণ করেন এবং কর্ডোভা জামে মসজিদের আয়তনও বৃদ্ধি করেন। তাঁর আমলে দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য পূর্বের চাইতে অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। তিনি এমন সব অঞ্চলেও সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন, যেখানে ইতিপূর্বে মুসলমানরা কখনো পৌঁছতে পারেনি। সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রতিটি ক্ষেত্রে মানসূরের শাসনকাল ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক জাঁকজমকপূর্ণ। মানসূরে আযমের নাম শুনলে খ্রিস্টান রাজাগণ একেবারে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ত। কোন উমাইয়া খলীফাকেও তারা এরূপ ভয় করত না। মানসূর অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে উন্নতি করে স্পেন সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি বিশ্বের দুঃসাহসী ও সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রথম সারিতে আপন স্থান দখল করে নিয়েছেন। ৩৯৪ হিজরীতে (নভেম্বর ১০০৩-অক্টোবর ১০০৪ খ্রি) যখন তার মৃত্যু হয় তখন দ্বিতীয় হিশামের অযোগ্যতার কারণে যদিও খিলাফতে বনূ উমাইয়া তার পতনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল, এতদসত্ত্বেও সেখানকার ইসলামী মর্যাদা ও পরাক্রম ছিল তখনো উন্নতির একেবারে শীর্ষ পর্যায়ে।

মানসূরে আযমের মৃত্যু সংবাদ যখন কর্ডোভায় পৌঁছল তখন বনূ উমাইয়া খিলাফতের সভাসদরা এই ভেবে সন্তুষ্ট হলো যে, এবার দাবাড়ু দ্বিতীয় হিশামের চোখে ধূলা দিয়ে তারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই দেশ চালাতে সক্ষম হবে। যা হোক, হিশাম মানসূরের মৃত্যু সংবাদ শুনে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী মন্ত্রী কে হবে তখন সে সম্পর্কে কাউকে কিছু বলেন নি। যখন মানসূরে আযমের পুত্র আবদুল মালিক আপন পিতাকে সালিম শহরে দাফন করার পর কর্ডোভায় ফিরে আসেন তখন দ্বিতীয় হিশাম তাকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠিয়ে আপন মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। এখন থেকে মানসূরের মতই আবদুল মালিকও স্পেন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র প্রশাসকে পরিণত হন। খলীফা হিশাম তাকে 'সায়ফুদ্দৌলা' ও 'মুযাফফর' উপাধি প্রদান করেন। মুযাফফর তার পিতার নীতি অবলম্বনে ছয় বছর দেশ শাসন করে ৩৯৯ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ১০০৮-আগস্ট ১০০৯ খ্রি) ইনতিকাল করেন। মুযাফফর তাঁর শাসনামলে মোট আট বার খ্রিস্টান দেশসমূহের উপর সামরিক অভিযান

পরিচালনা করেন এবং প্রতিবারই বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। তাঁর শাসনামলেও দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং তার পিতা মানসূর হুকুমতে ইসলামিয়া সম্পর্কে যে ভাবমূর্তির সৃষ্টি করেছিলেন তাতে কোনরূপ ঘাটতি দেখা দেয়নি।

মুযাফ্ফরের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আবদুর রহমান ইব্‌ন মানসূর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। আবদুর রহমান 'নাসির' উপাধি গ্রহণ করেন। যদিও নাসিরের ভাই মুযাফ্ফর এবং তার পিতা মানসূর স্পেন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক ছিলেন, কিন্তু তিনি 'হাজিবুস সালতানাত' বা প্রধানমন্ত্রী বলেই নিজের পরিচয় প্রদান করতেন। কিন্তু যখন তিনি লক্ষ্য করেন যে, সুলতানী দরবারের সভাসদবৃন্দ, সেনাবাহিনীর অধিনায়কবৃন্দ এবং সাম্রাজ্যের কর্মকর্তা ও প্রশাসকবৃন্দ সকলেই তার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং তার পিতার প্রবর্তিত শাসন পদ্ধতির প্রতি অনুগত তখন তিনি নির্ভয়ে নিজেকে স্বেচ্ছাচারী শাসকে পরিণত করেন এবং খলীফা হিশামের প্রতি যথার্থ সম্মান, এমনকি বাহ্যিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও নির্লিপ্ততার পরিচয় দিতে থাকেন।

তারপর নাসির তাকে 'অলীআহ্‌দ' নিয়োগ করার জন্য হিশামের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। যার ফলে হিশাম বাধ্য হয়ে একটি পত্র লিখে তাতে স্বাক্ষর করেন এবং সাম্রাজ্যের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিকট তার অনুলিপি পাঠিয়ে দেন। ঐ পত্রে তিনি লিখেছিলেন ঃ আমার পর আবদুর রহমান নাসিরকে যেন খলীফা মনোনীত করা হয় এবং এখন থেকে প্রত্যেকটি লোক যেন তাকে খিলাফতের 'অলীআহ্‌দ' (ভাবী উত্তরাধিকারী) জ্ঞান করে। ঐ পত্রে নাসিরের উচ্চবংশ মর্যাদা এবং যোগ্যতার প্রভূত প্রশংসা করা হয়। খলীফার এই ফরমান তথা অলীআহ্‌দীর সনদে খিলাফতে এই ফরমান তথা অলীআহ্‌দীর সনদে খিলাফতের সম্ভাব্য সকল দাবিকারীর সম্মতি ও সত্যায়ন স্বাক্ষর নেওয়া হয়। তারপর কর্ডোভার জামে মসজিদে তা ঘোষণা করা হয়। নাসির তার এই সাফল্যের জন্য যারপর নাই সন্তুষ্ট হন। কিন্তু পরিণামে এই অলীআহ্‌দীর সনদই তার ধ্বংসের কারণে পরিণত হয়।

হিশামের পদচ্যুতি

নাসির তার শাসনামলের প্রথম বছরেই আপন ভাই এবং পিতার রীতি অনুযায়ী খ্রিস্টানদের পদানত করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়ে সীমান্তের দিকে রওয়ানা হন। কর্ডোভার কুরায়শী এবং উমাইয়ারা এই দেখে যারপর নাই মর্মাহত হয় যে, স্পেনের হুকুমত ও খিলাফত বনূ উমাইয়ার দখল থেকে আর একটি খান্দানের দখলে চলে যাচ্ছে। অতএব তারা তাদের খান্দানের খিলাফতের পক্ষে গোপনীয়ভাবে জনমত সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। এবার যখন নাসির সেনাবাহিনীসহ উত্তর সীমান্তের দিকে চলে যান তখন কর্ডোভাবাসীরা কর্ডোভায় অবস্থানকারী অবশিষ্ট সেনাবাহিনীর ঐ সমস্ত অফিসারকে হত্যা করে ফেলে, যারা নাসিরের সমর্থক ও তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তারপর তারা দ্বিতীয় হিশামকে পদচ্যুত করে তার স্থলে তৃতীয় আবদুর রহমানের দৌহিত্র মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিশাম ইবন আবদুল জব্বার ইব্‌ন খলীফা আবদুর রহমানকে 'মাহ্‌দী বিল্লাহ্' উপাধি দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। নাসির আবদুর রহমান এই সংবাদ শুনে অবিলম্বে কর্ডোভার দিকে রওয়ানা হন। যখন তিনি

কর্ডোভার নিকটবর্তী হন তখন তার বাহিনীর বেশির ভাগ অফিসার এবং বার্বার সৈন্যরা খলীফা মাহ্দীর কাছে গিয়ে তার আনুগত্য স্বীকার করে। নাসির যখন তার সামান্য কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বিচলিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন তখন তারই জনৈক সাথী তাকে হত্যা করে তার কর্তিত মস্তক খলীফা মাহ্দীর দরবারে নিয়ে আসে। এখানেই বনী আমিরের শাসনকালের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং সেই সাথে স্পেনে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রেরও সূত্রপাত হয়।

মাহ্দী ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদুল জাব্বার

হিশাম যখন জানতে পারেন যে, জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে চলে গেছে তখন তিনি কোনরূপ ইতস্তত না করে লিখিতভাবে খলীফা পদে ইস্তফা দেন। মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম ওরফে মাহ্দী বিল্লাহ তাকে রাজপ্রাসাদের একটি অংশে নজরবন্দী করে রাখেন। তারপর আপন এক চাচাত ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন মুগীরাকে হাজিব এবং অপর চাচাত ভাই উমাইয়া ইব্ন আলহাফকে কর্ডোভার পুলিশ প্রধান নিয়োগ করেন। তারপর মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম মানসূরে আযমের শহর ও যাহ্রা প্রাসাদের দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন। সেখানকার অধিবাসীরা কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়াই শহরের সিংহদ্বার খুলে দেয়। তারপর খলীফা মাহ্দীর সমগ্র বাহিনী সেখানকার ধন-সম্পদ লুট করে এবং যাবতীয় প্রাসাদ ও দালান-কোঠা চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ৩৯৯, ৪০০ হিজরী (১০০৮, ১০০৯ খ্রি) এই ঘটনা ঘটে। তারপর নাসির হত্যা এবং ইব্ন আমির বংশের শাসনক্ষমতা হারানোর ঘটনা ঘটে। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেনের ইসলামী হুকুমতের মর্যাদা হ্রাস পায় এবং সেখানে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হয়।

সেনাবাহিনীর ক্ষমতা

খলীফা দ্বিতীয় হিশামের পদচ্যুতি, খলীফা মাহ্দীর সিংহাসন লাভ এবং সুলতান নাসিরের বিরুদ্ধে কুরায়শ ও উমাইয়াদের রাতারাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে বার্বার সৈন্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই খলীফা মাহ্দীর হুকুমত ও খিলাফতে বার্বার সৈন্যদের দাপট অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং সত্যি কথা বলতে গেলে, খিলাফতের লাগাম সামরিক বাহিনীর হাতেই চলে যায়। তারা প্রজাসাধারণের উপর বাড়াবাড়ি শুরু করে। শেষ পর্যন্ত প্রজারা বাধ্য হয়ে খলীফা মাহ্দীর কাছে এ সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করে। কিন্তু মাহ্দী তাদের অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত করেননি এই ভেবে যে, এই মুহূর্তে বার্বারদের অসন্তুষ্ট করা যুক্তিযুক্ত হবে না। এর ফলে যে সব কর্ডোভাবাসী মাহ্দীর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাকে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তার এ যন্ত্রণাদায়ক শাসন থেকে মুক্তিলাভের পথ খুঁজতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত বার্বারদের বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে শহরবাসীরা বেশ কয়েকজন বার্বারকে হত্যা করে ফেলে। তখন খলীফা মাহ্দী ঐ হত্যাকারীদের প্রাণদণ্ড প্রদান করেন। এভাবে দিনের পর দিন জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মাহ্‌দীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

খলীফা মাহ্‌দীও ক্রমে ক্রমে বার্বারদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তিনি সামরিক বাহিনীর এই ক্ষমতাকে সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষতিকারক বিবেচনা করে কিভাবে তা হ্রাস করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। ঘটনাচক্রে সেনাবাহিনীর লোকেরা তথা বার্বাররা একথা বুঝে ফেলে যে, খলীফা তাদেরকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করছেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে খলীফা পরিবারেরই জনৈক শাহযাদা হিশাম ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহমান সালিমকে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠানের এবং মাহ্‌দীকে পদচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করে। মাহ্‌দী এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার পূর্বেই হিশাম ইব্‌ন সুলায়মান এবং তার ভাই আবূ বকরকে বন্দী করে নিজ হাতেই তাদেরকে হত্যা করেন।

সুলায়মান ইব্‌ন হাকামের মৃত্যু

সুলায়মান এবং তার ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ শুনে সুলায়মান ইব্‌ন হাকাম নামক অপর একজন উমাইয়া শাহযাদা কর্ডোভা থেকে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন। বার্বাররা কর্ডোভার বাইরে একত্রিত হচ্ছিল এবং অপর কোন উমাইয়া শাহযাদাকে খলীফা নির্বাচনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে সুলায়মান ইব্‌ন হাকামকে আসতে দেখে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় এবং তাকেই খলীফা মনোনীত করে। তারা তাকে 'মুসতাঈন বিল্লাহ' উপাধি দিয়ে কর্ডোভা আক্রমণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। সুলায়মান ইব্‌ন হাকাম তখন বলেন, আমার এত ক্ষমতাও নেই যে, কর্ডোভা জয় করতে পারব। প্রথমে ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তা সুসংহত করা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসতাঈন বিল্লাহ্‌ বার্বারদের নিয়ে টলেডোয় গিয়ে পৌছেন এবং আহমদ ইব্‌ন নাসীবকে আপন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তারপর মুসতাঈন সালিম নগরীর শাসক ওয়াযিহ আমিরীর নিকট পত্র পাঠিয়ে তাকে নিজের পক্ষে টেনে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওয়াযিহ্‌ আমিরী ইতিপূর্বে যেহেতু খলীফা মাহ্‌দীর হাতে বায়আত করে ফেলেছিলেন তাই তিনি মুসতাঈন বিল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করেন।

গৃহযুদ্ধ

মুসতাঈন বার্বার বাহিনী নিয়ে টলেডো থেকে সালিম নগরী অভিমুখে রওয়ানা হন। মাহ্‌দী যখন শুনতে পান যে, মুসতাঈন সালিম নগরী আক্রমণ করেছেন তখন তিনি আপন ক্রীতদাস কায়সারকে কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ ওয়াযিহ আমিরীর সাহায্যার্থে পাঠান। সালিম নগরীর উপকণ্ঠে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে কায়সার নিহত হন এবং ওয়াযিহ সালিম নগরীতে দুর্গবন্দী হয়ে বসে থাকেন।

খ্রিস্টান সম্রাট ইব্‌ন আওফুনুশ-এর কাছে সুলায়মান ও মাহ্‌দীর সাহায্য প্রার্থনা

মুসতাঈন যখন দেখতে পান যে, সালিম নগরী জয় করা কঠিন হয়ে উঠেছে এমনকি এখানে সৈন্যদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী রসদ সরবরাহ করাই সম্ভব হচ্ছে না তখন তিনি

খ্রিস্টান সম্রাট ইব্ন আওফুনুশ-এর কাছে দূত পাঠিয়ে আবেদন জানান— আপনি আমাকে সাহায্য করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী রসদসামগ্রী ও সেনাবাহিনী প্রেরণ করুন, যাতে আমি কর্ডোভার উপর আক্রমণ চালিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারি। দূত প্রেরণের এই সংবাদ যখন মাহ্দীর কাছে কর্ডোভায় গিয়ে পৌঁছে তখন তিনিও খ্রিস্টান সম্রাটের কাছে পত্র প্রেরণ করেন এবং তাকে নিজের পক্ষে টেনে আনার অভিপ্রায়ে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, আমি সীমান্ত অঞ্চলের সবগুলো দুর্গ এবং শহর আপনার হাতে সমর্পণ করবো। উভয়ের পয়গাম লাভ করার পর খ্রিস্টান সম্রাট মুসতাঈনের পক্ষাবলম্বনকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন এবং এক হাজার ষাঁড়, পনের হাজার বকরী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরদ-সামগ্রী মুসতাঈনের কাছে প্রেরণ করেন। তারপর তাঁর সাহায্যার্থে সৈন্যও পাঠান। এবার মুসতাঈন ওয়াযিহকে সালিম নগরীতে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়ে কর্ডোভার দিকে চলে যান। তার বাহিনীতে বার্বার, খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। মুসতাঈনকে কর্ডোভার দিকে যেতে দেখে ওয়াযিহও আপন বাহিনী নিয়ে তার পিছনে পিছনে চলতে থাকেন। কিন্তু তার একটি ভুল এই হয়ে গিয়েছিল যে, কর্ডোভা পৌঁছার পূর্বেই তিনি মুসতাঈনের উপর হামলা চালান। এই যুদ্ধে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং নিজের অনেক সঙ্গী-সাথীকে ধ্বংস করে শুধু চারশ' লোক নিয়ে কর্ডোভার দিকে পলায়ন করেন। ওয়াযিহ যখন কর্ডোভায় পৌঁছেন এবং মাহ্দী যখন মুসতাঈনের এই হামলার কথা জানতে পারেন তখন তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে মুসতাঈনের মুকাবিলার জন্য কর্ডোভা থেকে বহির্গত হন। সারদিক প্রান্তরে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যারা প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল তাদেরকে নিয়ে মাহ্দী টলেডোর দিকে পলায়ন করেন। মুসতাঈন বিজয়ীবেশে কর্ডোভায় প্রবেশ করে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। মুসতাঈন যেহেতু এই বিজয় খ্রিস্টানদের সহায়তায় লাভ করেছিলেন তাই খ্রিস্টানদের প্রতি তিনি যারপর নাই বিনয়ী হয়ে উঠেন এবং এই সুযোগে খ্রিস্টান নরপশুরা আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের একটি বিরাট অংশকে হত্যা করে। খলীফা মাহ্দী টলোডোয় পৌঁছে খ্রিস্টান সম্রাট আওফুনুশের কাছে পুনরায় চিঠিপত্র লিখে নিজের সাহায্যের জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। খ্রিস্টান সম্রাট এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। তিনি ভালভাবে জানতেন, মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ বাধিয়ে দিয়ে তাদেরকে দুর্বল করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। অতএব তিনি অবিলম্বে মাহ্দীর কাছ থেকে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নিয়ে তার সাহায্যার্থে আপন সামর্থ্য অনুযায়ী সেনাবাহিনী পাঠান। এমন কি তিনি এ কথারও কোন পরওয়া করেন নি যে, যে সেনাবাহিনী তিনি মুসতাঈনের কাছে পাঠিয়েছিলেন তারা এখনো ফিরে আসেনি। মাহ্দী খ্রিস্টানদের সাহায্য নিয়ে কর্ডোভা আক্রমণ করেন। 'আকাবাতুল বকর' নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে মুসতাঈনের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মাহ্দী পুনরায় বিজয়ী বেশে কর্ডোভায় প্রবেশ করেন এবং খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। খ্রিস্টানদের ঐ বাহিনী সাথে যোগ দেয়। এই যুদ্ধেও বেশির ভাগ মুসলমান এবং কর্ডোভাবাসী নিহত হন। মুসতাঈন কর্ডোভা থেকে বের হয়ে দেশব্যাপী লুটপাট, হত্যা ও রাহাজানি শুরু করেন। অপর দিকে মাহ্দী কর্ডোভায় প্রবেশ করার পর খ্রিস্টান বাহিনী রাজধানীর বাসিন্দাদের উপর লুটপাট চালিয়ে এক শ্বাসরুদ্ধকর

অবস্থার সৃষ্টি করে। মাহ্দী কর্ডোভায় প্রবেশ করে আয়েশ-আরামের মধ্যে গা-ভাসিয়ে দেন। ফলে এতদিন যে স্পেন শান্তি ও নিরাপত্তার লালনক্ষেত্র ছিল তা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। প্রতিটি শান্তিপ্রিয় নাগরিকের পক্ষে জানমাল নিয়ে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।

মাহ্দীর অপসারণ

ওয়াযিহ্ আমিরী মাহ্দীর সাথে ছিলেন। তিনি যখন এভাবে দেশকে তথা হুকুমতে ইসলামিয়াকে ধ্বংস হতে দেখেন তখন কর্ডোভা নগরীর অধিবাসীদের সাথে সলা-পরামর্শ করে মাহ্দীকে অপসারণ এবং খলীফা হিশামকে পুনরায় খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেন। ফলে ৪০০ হিজরীর ১১ যিলহজ্জ (আগস্ট ১০১০ খ্রি) হিশাম পুনরায় বন্দীশালা থেকে বের হয়ে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। মাহ্দীকে দিন-দুপুরে হিশামের সামনেই গীয়ার নামক জনৈক ক্রীতদাস হত্যা করে।

হিশামের পুনরায় সিংহাসন লাভ

দ্বিতীয় হিশাম পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ওয়াযিহ আমিরী, যিনি মানসূর ইব্ন আবী আমিরের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিলেন, হিজাবত তথা প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করেন। ওয়াযিহ মাহ্দীর কর্তিত মস্তক মুসতাঈনের কাছে শুস নামক স্থানে প্রেরণ করেন এবং লিখেন ঃ খলীফা হিশাম পুনরায় খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং মাহ্দীকে হত্যা করা হয়েছে। অতএব এখন তোমার উচিত বর্তমান খলীফার বশ্যতা স্বীকার করা এবং অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকা। যেহেতু ঐ লুটপাটের মধ্যে মুসতাঈনের সাথে খ্রিস্টান সম্রাট ইব্ন আওফুনুশও অংশীদার হয়ে গিয়েছিলেন তাই মুসতাঈন ওয়াযিহ আমিরীর ঐ আহ্বানে মোটেই সাড়া দেন নি বরং কিছুদিনের মধ্যেই ইব্ন আওফুনুশ এবং মুসতাঈন এক জোট হয়ে কর্ডোভা আক্রমণ করেন এবং কর্ডোভার পার্শ্ববর্তী সমগ্র এলাকা ধ্বংস করে কর্ডোভা ঘেরাও করে রাখেন।

দুশ'টি দুর্গের বিনিময়ে খ্রিস্টান সম্রাটের সাথে আপোস

কর্ডোভা নগরী দীর্ঘদিন ঘেরাও থাকার ফলে দ্বিতীয় হিশাম অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং খ্রিস্টান সম্রাটকে মুসতাঈনের কাছ থেকে পৃথক করার ফন্দি আঁটতে থাকেন। তিনি খ্রিস্টান সম্রাটের সাথে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান শুরু করেন এবং তারই দাবি অনুযায়ী তার সাম্রাজ্য সংলগ্ন দুশটি দুর্গ এবং কয়েকটি শহর তাকে দান করেন। উপরোক্ত মর্মে একটি সনদপত্রও তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আওফুনুশ এই সনদপত্র বলে নতুন এলাকাসমূহ দখল করে মুসতাঈনের পক্ষ ত্যাগ করেন। মুসতাঈন এবং তার সঙ্গী বার্বাররা বরাবরই ঘেরাও অবস্থায় থাকেন। কিন্তু যেহেতু ঘেরাও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল তাই এখন সংঘর্ষ এই অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল যে, কখনো শহরবাসী বার্বারদেরকে তাড়াতে তাড়াতে অনেক দূর পর্যন্ত পিছনে হটিয়ে দিত, আবার কখনো কখনো বার্বাররা শহরবাসীদেরকে পরাজিত করে শহরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ত। এই অবস্থা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই মধ্যবর্তী সময়ে

আরো কয়েকজন খ্রিস্টান রাজা বিদ্রোহ ঘোষণার ভান করেন এবং মুসতাঈনকে সাহায্য করবেন– এই ভয় দেখিয়ে কর্ডোভার দরবার থেকে ইব্‌ন আওফুনুশের মত বিভিন্ন অঞ্চল দান হিসাবে লাভ করেন। ফলে অনেক রাজ্যই খ্রিস্টানদের দখলে চলে যায়।

হিশামের পরিণাম

শেষ পর্যন্ত ৪০৩ হিজরীর ৩রা শাওয়াল (এপ্রিল ১০১২ খ্রি) মুসতাঈন অস্ত্রবলে কর্ডোভা দখল করে নেন। দ্বিতীয় হিশাম এই দাঙ্গায় হয় নিহত হন, নয়ত অন্য কোথাও এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে যান যে, তারপর তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। ওয়াযিহ আমিরী এর কিছু দিন পূর্বেই নিহত হয়েছিলেন। যাহোক মুসতাঈন কর্ডোভায় প্রবেশ করে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন।

মুসতাঈন বিল্লাহ্

ইতিপূর্বে মুসতাঈনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক এবার তিনি পুরোপুরিভাবে কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ইত্যবসরে বিভিন্ন প্রদেশের শাসকরা এক একজন স্বাধীন রাজা হয়ে বসেন। ইব্‌ন ইবাদ আশবেলিয়ায়, ইব্‌ন আকতাস বাতলিউসে, ইব্‌ন আবী আমির ভ্যালেন্সিয়ার ও মার্সিয়ায়, ইব্‌ন হুদ সারাকসতায় এবং মুজাহিদ আমিরী রানীয়া এবং জাযায়রে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। উত্তরাঞ্চলীয় খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহরাও এই সময় ও সুযোগকে কাজে লাগাতে কসুর করেনি। প্রত্যেক খ্রিস্টান রাজাই আপন আশেপাশের এলাকা দখল করে নিজ রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন। মোটকথা, স্পেনে বিশৃঙ্খলা ও গৃহযুদ্ধের যুগ শুরু হয় এবং ইসলামী হুকুমত টুকরা টুকরা হয়ে যারপর নাই দুর্বল হয়ে পড়ে।

মুসতাঈন নিহত

৪০৭ হিজরীর মুহাররম (জুন ১০১৬ খ্রি) পর্যন্ত মুসতাঈন কর্ডোভা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার উপর হুকুমত চালান এবং তিন বছর কয়েক মাস 'নাম কাওয়াস্তে' খলীফা থাকার পর আশবেলিয়া-সংলগ্ন তালিকার রণক্ষেত্রে আলী ইব্‌ন হামুদের কাছে পরাজিত হয়ে বন্দী ও নিহত হন। আর এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে স্পেনে উমাইয়া হুকুমতের। প্রকৃতপক্ষে বনূ উমাইয়া শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল যখন দ্বিতীয় হাকামের মৃত্যু হয় এবং দ্বিতীয় হিশাম সিংহাসনে আরোহণ করেন। অবশ্য দ্বিতীয় হিশামের সময়েও খলীফার বংশ হিসাবে বনূ উমাইয়াদের সম্মান ও মর্যাদা অব্যাহত ছিল।

উমাইয়া শাসনের পরিসমাপ্তি

মুসতাঈন নিহত হওয়ার পর ৪০৭ হিজরী (১০১৬-১০১৭ খ্রি.) থেকে উমাইয়া বংশের চিহ্নসমূহ স্পেনের মাটি থেকে মুছে যেতে শুরু করে। অবশ্য ৪২৮ হিজরী (১০৩৭ খ্রি) পর্যন্ত উমাইয়া বংশের কোন কোন ব্যক্তি পুনরায় হুকুমত লাভের চেষ্টা করেন। কেউ কেউ সাময়িকভাবে কিছুটা সফলও হন। কিন্তু ৪২৮ হিজরীর (১০৩৬-৩৭ খ্রি) পর এই ধারারও পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, ৪০৭ হিজরীতে (১০১৬-১৭ খ্রি.) আলী ইবন হামুদ মুসতাঈনকে হত্যা করে কর্ডোভা দখল করেন এবং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। হিজরী ৪১৩ পর্যন্ত (এপ্রিল ১০২২-মার্চ '২৩ খ্রি) তিনি এবং তার ভাই কাসিম কর্ডোভা শাসন করেন। হিজরী ৪১৩ সনের (১০২২-২৩ খ্রি) শেষ দিকে ইব্ন হামুদের শাসনকালের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং কর্ডোভাবাসীদের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করে আবদুর রহমান ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদুল জব্বার (মাহ্দীর ভাই) হিজরী ৪১৩ সনের রমযান (ডিসেম্বর ১০২২ খ্রি.) মাসে কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজের জন্য 'মুসতাযহির' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু মাত্র দু'মাস শাসন পরিচালনার পর তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান কর্ডোভার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু হিজরী ৪১৬ সনে (মার্চ ১০২৫-ফেব্রুয়ারী. '২৬ খ্রি.) ইয়াহইয়া ইব্ন আলী ইব্ন হামুদ তাকে পরাজিত করে কর্ডোভার শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। পরাজিত মুহাম্মাদ কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে উত্তরাঞ্চলের দিকে পালিয়ে যান এবং সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইয়াহইয়া ইবন আলী ইব্ন হামূদ ৪১৭ হিজরী (মার্চ ১০২৬ - ফেব্রুয়ারী '২৭ খ্রি) পর্যন্ত কর্ডোভা শাসন করতে থাকেন। তারপর ওযীরুস্ সুলতানাত (প্রধানমন্ত্রী) আবূ মুহাম্মাদ জামহুর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন জামহুর, হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ উমুভীর হাতে গায়েবানা বায়আত করেন। ঐ সময়ে হিশাম ইবন মুহাম্মাদ লারীদা নামক স্থানে ইব্ন হুদের কাছে অবস্থান করছিলেন। যখন তিনি শুনতে পান যে, তার নামে বায়আত গ্রহণ করা হয়েছে তখন তিনি লারীদা থেকে বারান্ত নামক স্থানে চলে আসেন। তিনি সেখানে তিন বছর অবস্থান করেন এবং নিজের জন্য 'মু'তামিদ বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। কর্ডোভার দুই নেতা (ইয়াহইয়া ও আবূ মুহাম্মাদ) পরস্পর মিলেমিশে কর্ডোভার শাসন পরিচালনা এবং হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদকে নিজেদের খলীফা হিসাবে মান্য করতে থাকেন। যখন তাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দেয় তখন ৪২০ হিজরীতে (১০২৯ খ্রি.) তারা হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ উমুভীকে বারান্ত থেকে কর্ডোভায় নিয়ে আসেন এবং তার হাতে যথারীতি বায়আত করেন। কিন্তু ৪২২ হিজরী (১০৩১ খ্রি.) সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদকে পদচ্যুত করে। এবার হিশাম কর্ডোভা থেকে লরীদায় চলে যান এবং ৪২৮ হিজরীতে (১০৩৭ খ্রি.) সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদের মৃত্যুর সাথে এতদিন বনূ উমাইয়া বংশের নামমাত্র খিলাফতের যে ধারা অব্যাহত ছিল তাও ছিন্ন হয়ে যায়।

উমাইয়া শাসনকাল ঃ একটি পর্যালোচনা

প্রথম আবদুর রহমান ১৩৮ হিজরীতে (৭৫৫-৫৬ খ্রি.) স্পেনে প্রবেশ করে উমাইয়া হুকুমতের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর বংশধরদের মধ্যে হিশাম মুহাম্মদের মৃত্যুর সাথে সাথে, ৪২৮ হিজরী (১০৩৭ খ্রি.) মোট ২৯০ বছর পর স্পেন থেকে উমাইয়া হুকুমতের পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রথম আবদুর রহমানের বংশধরদের মধ্যে এমন কিছু বিদ্যোৎসাহী ও সুযোগ্য শাসকের আবির্ভাব ঘটে যারা স্পেনকে একটি গর্বিত সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁরা দেশকে শুধু চিত্রভাস্কর্যে ও ফলে-ফুলেই সুশোভিত করে তুলেন নি, সেখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও এত

উন্নতি সাধন করেন যে, আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আধুনিক ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ বিদ্যানুরাগী উমাইয়া শাসকদের কাছে চির ঋণী। স্পেনের খলীফারা কর্ডোভায় এমনভাবে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন যে, পরবর্তীকালে তা সমগ্র ইউরোপকে উজ্জ্বল করে তোলে। স্পেনের খলীফাদেরই উদ্যোগ-আয়োজনের ফলশ্রুতিতে আজ ইউরোপ সমগ্র বিশ্বকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছে। স্পেনের খলীফারা এমনি ক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী ছিলেন যে, সমগ্র ইউরোপের রাজা-বাদশাহরা তাদের ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপতেন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যে কোন অপমান ও লাঞ্ছনা নির্বিবাদে সহ্য করে নিতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও ঐ হুকুমত ধ্বংস হলো কেন? এর প্রধান এবং একমাত্র কারণ এই যে, সেখানকার মুসলমানরা ইসলামী শরীয়ত এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বের হুকুমত ও সালতানাত কোন একটি বিশেষ বংশ বা গোত্রের কুক্ষিগত থাকবে ইসলাম একথা স্বীকার করে না। মুসলমানরা ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে খিলাফতের ক্ষেত্রে 'ওরাছাত' তথা উত্তরাধিকারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। অর্থাৎ পিতার পর তার পুত্র চাই সে যতই অযোগ্য থেকে থাকুক, খিলাফতের অধিকারী হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই রীতিকে চিরতরে মুছে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর ওফাতের কিছুকাল পরই মুসলমানরা পুনরায় এই অভিশাপকে নিজেদের গলার মালা করে নেয়। ফলে অযোগ্য ও অথর্ব লোকেরাও খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেতে থাকে। কুরআন করীম এবং ইসলামী শরীয়তের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের প্রতিফল এই দাঁড়ায় যে, একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করে। তাদের এই পরস্পর বিরোধিতা শত্রুদেরকে শক্তিশালী করে তোলে। ফলে তারা একদিন স্পেন থেকে নির্মমভাবে বিতাড়িত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বনূ হামূদের শাসনামল

ইতোপূর্বে ইদরীসী সাম্রাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। আব্বাসী খলীফা হারূন রশীদের আমলেই মরক্কোয় স্বাধীন ইদরীসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তখন কিন্তু মরক্কোয় আর ঐ ইদরীসী সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। মানসূরে আযম কিংবা ইব্ন আবী আমিরের মন্ত্রীত্বে তথা শাসনামলে মরক্কো থেকে যে সমস্ত বার্বার লোক স্পেনে এসেছিল তাদের সঙ্গে এসেছিল ইদরীসী বংশের দুই সহোদর। তাদের নাম ছিল আলী এবং কাসিম। তারা ছিল হামূদ ইব্ন মায়মুন ইব্ন আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর। হামূদ মানসূরে আযমের সেনাদলে ভর্তি হয়ে যান। মানসূর ইব্ন আমিরের সাথে খ্রিস্টানদের যে সমস্ত যুদ্ধ হয়েছিল তাতে এই দুই ভাই অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দেন। ইব্ন আমির তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের উভয়কে সেনাধ্যক্ষ পদে উন্নীত করেন। বার্বাররা তাদেরকে সেনাধ্যক্ষ হিসাবে পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। কেননা তাদের বংশ দীর্ঘদিন পর্যন্ত মরক্কো শাসন করেছে। এই দুই ভাই-ই বার্বার সৈন্যদের নিয়ে ইব্ন আমির বংশের ধ্বংস সাধন করেন এবং উমাইয়া বংশের মুসতাঈনকে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। মুসতাঈন কর্ডোভায় খিলাফতের আসনে বসে আলী ইব্ন হামূদকে তাঞ্জা এবং আফ্রিকার অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

আলী ইব্ন হামূদ

মুসতাঈনের মাত্র কয়েক দিনের শাসনামলে স্পেনের সবগুলো প্রদেশই স্বাধীন হয়ে যায়। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আলী ইব্ন হামূদও তাঞ্জায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করেন এবং নিজেকে মুসতাঈনের অধীনতা থেকে মুক্ত করে নেন। আলমিরা-এর শাসক খায়রানকে আপন সহযোগী করে নিয়ে আলী ইব্ন হামূদ সমুদ্রযানের মাধ্যমে আপন সেনাবাহিনী নিয়ে স্পেন উপকূলে অবতরণ করেন। তাঞ্জায় নিজ পুত্র ইয়াহইয়াকে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে যান। যা হোক তিনি তার বাহিনী নিয়ে কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সর্বত্র প্রচার করেন ঃ আমি খলীফা হিশামের রক্তের প্রতিশোধ নিতে এসেছি। শেষ পর্যন্ত মুসতাঈন তার সাথে মুকাবিলা করার জন্য কর্ডোভা থেকে মালাগা পর্যন্ত আসেন এবং সেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে মুসতাঈন শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করেন। এটা হচ্ছে ৪০৭ হিজরীর মুহাররম (১০১৬ খ্রি জুন) মাসের ঘটনা। এবার আলী দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে কর্ডোভা দখল করেন এবং মুসতাঈনকে বন্দী করে এনে নির্মমভাবে হত্যা করেন। তারপর তিনি 'নাসির লি-দীনিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে স্বয়ং কর্ডোভা শাসন করতে থাকেন। যেহেতু বার্বাররা আলী ইব্ন হামূদের উপর সন্তুষ্ট ছিল, তাই মালাগা যুদ্ধের পর আলী ইব্ন হামূদকে কোনরূপ বিরোধিতা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে

হয়নি। আলী ইব্ন হামূদের প্রাথমিক শাসনকাল খুবই মঙ্গলজনক প্রমাণিত হয়। ন্যায় ও সত্যের প্রতি তাঁর বেশ ঝোঁক পরিলক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি বার্বারদেরকেও নারাজ করে ফেলেন এবং প্রজাসাধারণের উপর নতুন নতুন ট্যাক্স আরোপ করেন। যার ফলে সেনাবাহিনী ও প্রজাসাধারণ উভয়ই তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। এই অবস্থা লক্ষ্য করে আলমেরিয়ার শাসনকর্তা খায়রান সাকলাবী, যার কথা উপরে উল্লিখিত হয়েছে, আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদকে 'বাদশাহ' বলে প্রচার করেন।

আলী ইব্ন হামূদকে হত্যা

আলী ইব্ন হামূদের বিশেষ ভৃত্যদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাকলাবীও ছিল। খায়রান সাকলাবী ষড়যন্ত্র করে তাদেরই মাধ্যমে ৪০৮ হিজরী যিলকদ (এপ্রিল ১০১৮ খ্রি.) মাসে হাম্মাম (গোসল খানা)-এর মধ্যে আলী ইব্ন হামূদকে হত্যা করে।

কাসিম ইব্ন হামূদ

আলী ইব্ন হামূদের হত্যার সংবাদ পেয়ে সাধারণ লোকেরা খুশিই হয়। তবে বার্বাররা আলী ইব্ন হামূদের ভাই কাসিম ইব্ন হামূদকে, যিনি মুসতাঈনের যুগ থেকে খাযরা দ্বীপের শাসনকর্তা ছিলেন, কর্ডোভায় ডেকে নিয়ে এসে আলী ইব্ন হামূদের স্থলে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। কাসিম যেহেতু কর্ডোভার নিকটবর্তী ছিলেন তাই উপস্থিত সময়ে তাকেই সিংহাসনে বসানো হয়। অন্যথায় বেশির ভাগ বার্বার সৈন্য তাঞ্জা থেকে আলী ইব্ন হামূদের পুত্র ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলীকে ডেকে নিয়ে এসে তাকেই সিংহাসনে বসানোর ইচ্ছা পোষণ করছিল। অপরদিকে খায়রান সাকলাবী আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদকে সঙ্গে নিয়ে সারা দেশ পরিভ্রমণ করেন। ফলে সাধারণ লোকেরা আবদুর রহমানের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন পর গ্রানাডার শাসনকর্তার বিরুদ্ধে— যিনি একজন বার্বার গোত্রপতি ছিলেন, খায়রান সাকলাবীর এক যুদ্ধ সংঘটিত হলে ঠিক যুদ্ধের মুহূর্তে প্রতারণা করে তিনি (খায়রান) আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদকে হত্যা করেন।

ইয়াহইয়া ইব্ন আলীর এক ভাই ইদরীস ইব্ন আলী ইব্ন হামূদ মালাগার শাসনকর্তা ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইদরীসকে আপন সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং স্বয়ং তাঞ্জা থেকে জাহাজযোগে রওয়ানা হয়ে স্পেনে এসে অবতরণ করেন এবং আপন চাচা কাসিমের বিরুদ্ধে সিংহাসনের দাবি উত্থাপন করেন। খায়রান সাকলাবীও ইয়াহ্ইয়ার পক্ষ সমর্থন করেন। ইয়াহ্ইয়াকে তার ভাই ইদরীস, খায়রান সম্পর্কে এই মর্মে সতর্ক করে দেন যে, সে অত্যন্ত ধূর্ত এবং ফ্যাসাদী। কিন্তু ইয়াহ্ইয়া উত্তরে বলেন, তার সাহায্য ও সহানুভূতি থেকে আমাদের উপকৃত হওয়া উচিত। ইয়াহ্ইয়া তার বাহিনী নিয়ে কর্ডোভার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কাসিম এই আক্রমণ সংবাদ শুনে কর্ডোভা থেকে আশবেলিয়ায় পালিয়ে গিয়ে কাযী ইব্ন ইবাদের আশ্রয়প্রার্থী হন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলী ইব্ন হামূদ

কাসিম ৪১০ হিজরীর ১লা জমাদিউল আউয়াল (সেপ্টেম্বর ১০১৯ খ্রি) কর্ডোভা থেকে পলায়ন করেন এবং এর এক মাস পরে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলী বিনা বাধায় কর্ডোভায় প্রবেশ

করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজের জন্য 'মুতাআলী' উপাধি গ্রহণ করেন এবং শুধু কর্ডোভা শহর দখল করে নিজেকে সমগ্র স্পেনের সম্রাট বলে ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই ছিল যে, কর্ডোভা শহরের বাইরে কেউই তার হুকুমত স্বীকার করত না। এই সুযোগে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ অঞ্চল শাসন করছিলেন। ইয়াহ্ইয়ার অন্যমনস্কতা ও মূর্খতার ফলশ্রুতিতে দেশের মধ্যে পুনরায় ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং কর্ডোভারই সেনাবাহিনীর অনেক অধিনায়ক সেভিলে গিয়ে কাসিমের সাথে সাক্ষাত করে তাকে কর্ডোভা আক্রমণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ইয়াহ্ইয়া এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে এতই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, আদ্যোপান্ত পরিস্থিতি বিবেচনা না করেই কর্ডোভা থেকে পালিয়ে মালাগায় চলে যান।

কাসিম ইবন হামূদের দ্বিতীয়বার শাসন ক্ষমতা দখল

ইয়াহ্ইয়ার পলায়ন সংবাদ শুনে ৪১৩ হিজরীতে (এপ্রিল ১০২২-মার্চ '২৩ খ্রি) কাসিম কর্ডোভায় এসে পুনরায় শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। এদিকে ইয়াহ্ইয়া মালাগায় গিয়ে সে অঞ্চলটি নিজ দখলে নিয়ে নেন এবং একজন স্বাধীন শাসকে পরিণত হন। ইদরীস যখন দেখলেন যে, ইয়াহ্ইয়া মালাগার শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন তখন তিনি ভাইয়ের সাথে সংঘর্ষে না গিয়ে মালাগা থেকে তাঞ্জায় গিয়ে সে অঞ্চলটি নিজ দখলে নিয়ে নেন। এভাবে কাসিম কর্ডোভায়, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলী মালাগায় এবং ইদরীস ইব্ন আলী তাঞ্জায় স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করতে থাকেন।

উমাইয়াদের পাইকারী হত্যা

কিছু দিন পর বার্বার নেতারা কাসিমের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। এদিকে কর্ডোভার অধিবাসীরা পুনরায় কোন উমাইয়া রাজকুমারকে স্পেনের সিংহাসনে বসানোর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। কাসিম এই সংবাদ পেয়ে উমাইয়াদেরকে খুঁজে বের করে কাউকে বন্দী, আবার কাউকে হত্যা করতে থাকেন। এই অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি প্রত্যক্ষ করে জনসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। শরহবাসীদের বিদ্রোহ দমনের জন্য কাসিম বার্বার বাহিনীকে ব্যবহার করেন। শহরবাসীরা একত্রিত হয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করে এবং শেষ পর্যন্ত কাসিম এবং তার বাহিনীকে পরাস্ত করে শহর থেকে বের করে দেয়। বার্বার বাহিনী পরাজিত হয়ে ইয়াহ্ইয়ার কাছে মালাগায় চলে যায় এবং কাসিম কর্ডোভা থেকে বের হয়ে আশবেলিয়ার দিকে চলে আসেন। কাসিম তার পুত্রকে আশবেলিয়ার শাসক নিয়োগ করে মুহাম্মাদ ইব্ন যায়রী এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইবাদকে তার মন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন। এবার এই দুই কর্মকর্তা যখন জানতে পারলেন যে, কাসিম কর্ডোভা থেকে পরাজিত হয়ে আসছেন তখন তারা আশবেলিয়ার ফটক বন্ধ করে দেয় এবং তার সাথে মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কাসিম শহরের বাইরে অবস্থান নিয়ে ঐ কর্মকর্তাদের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠায় ঃ তোমরা আমার পুত্রকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাব। ফলে এরা কাসিমের পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজনকে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কাসিম তার পরিবার-পরিজন এবং হাবশী ক্রীতদাসদের নিয়ে সারীশ দুর্গে

অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু ৪১৫ হিজরীতে (মার্চ ১০২৪- ফেব্রুয়ারী '২৫খ্রি) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলী সারীশ দুর্গ দখল করে কাসিমকে বন্দী করেন। ৪২৭ হিজরীতে (১০৩৬ খ্রি.) ইয়াহ্ইয়ারই নির্দেশে কাসিমকে হত্যা করা হয়।

আবদুর রহমান ইব্ন হিশাম

কাসিম যখন কর্ডোভা থেকে আশবেলিয়ার দিকে পালিয়ে যান তখন কিছুদিন পর্যন্ত কর্ডোভায় কোন সুলতান বা শাসক ছিলেন না। কর্ডোভাবাসীরা উমাইয়া বংশের কোন ব্যক্তিকে খিলাফতের আসনে বসাতে চাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত উমাইয়া বংশের তিনজন রাজকুমার সাম্রাজ্য ও সিংহাসনের দাবিদার হন। ৪১৪ হিজরীর ১৫ই রমযান (নভেম্বর ১০২৩ খ্রি.) কর্ডোভাবাসীরা একটি সাধারণ সভায় ঐ তিন রাজকুমারের মধ্য থেকে আবদুর রহমান ইব্ন হিশাম নামীয় একজন রাজকুমারকে খলীফা পদে নির্বাচিত করেন। আবদুর রহমান মুসতাযহির উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ক্ষমতা লাভের সাথে সাথে আপন মন্ত্রীদের মতামতকে উপেক্ষা করে আবূ ইমরান নামীয় একজন বার্বার সর্দারকে বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে দেন। উপরন্তু তিনি তাকে অধিনায়কত্ব দান করেন। এই আবূ ইমরানেরই ষড়যন্ত্রে ৪১৪ হিজরীর ৩রা যিলকদ (জানুয়ারি ১০২৪ খ্রি.) মুসতাযহির নিহত হন।

মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ মুসতাকফী

তারপর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ 'মুসতাকফী' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ৪১৬ হিজরী (১০২৫ খ্রি.) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলী ইব্ন হামূদ, যিনি আপন পিতৃব্য আবদুল কাসিমকে বন্দী করে সারীশ, মালাগা এবং জাযীরা নিজ দখলে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তার বাহিনী নিয়ে কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হন। মুসতাকফী ইয়াহ্ইয়ার এই আগমন সংবাদ শুনে এমনি কিংকতব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন যে, সঙ্গে সঙ্গে কর্ডোভা থেকে উত্তর সীমান্তের দিকে পালিয়ে যান এবং সেখানেই ৪১৬ হিজরীর ২৫শে রবিউল আউয়াল (মে ১০২৫ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইয়াহ্ইয়া কর্ডোভায় প্রবেশ করে ইব্ন আত্তাফ নামক একজন অধিনায়ককে কর্ডোভার শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং নিজে মালাগার দিকে চলে যান। তিনি মালাগায় পৌঁছে আশবেলিয়ার শাসক আবুল কাসিম ইব্ন ইবাদের মুকাবিলা করার জন্য সামরিক প্রস্তুতি শুরু করেন। কিছুদিন পর কর্ডোভাবাসীরা ইব্ন আত্তাফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাকে কর্ডোভা থেকে বের করে দেয়।

কর্ডোভাবাসীদের মধ্যে তখন আবূ মুহাম্মাদ জামহুর ইব্ন মুহাম্মাদ নামীয় একজন অতি প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তারই পরামর্শে কর্ডোভাবাসীরা উমাইয়া বংশের হিশাম নামীয় জনৈক ব্যক্তিকে, যিনি তখন লারীদায় অবস্থান করছিলেন, নিজেদের খলীফা বলে স্বীকার করে নেয়। হিশাম তিন বছর পর্যন্ত কর্ডোভায় আসতে পারেন নি। তারপর ৪২০ হিজরীতে (১০২৯ খ্রি.) তিনি কর্ডোভায় প্রবেশ করেন এবং 'মুতামিদ বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু দু'বছর পর ৪২২ হিজরীতে (১০৩১ খ্রি) সেনাবাহিনী এবং প্রজাসাধারণ একজোট হয়ে তাকে পদচ্যুত করে এবং কর্ডোভা থেকে বের করে দেয়। তিনি

লাবীদায় ফিরে আসেন এবং সেখানে ৪২৮ হিজরী (নভেম্বর ১০৩৬-অক্টোবর '৩৭ খ্রি) পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আলী সেভিল ঘেরাও করে নিয়েছিলেন এবং কর্ডোভাবাসীদেরকেও ধমকাচ্ছিলেন। কর্ডোভা থেকে হিশামের চলে যাওয়ার পর কর্ডোভাবাসীরা ইয়াহ্ইয়ার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। ইয়াহ্ইয়া ৪২৬ হিজরীতে (১০৩৫ খ্রি.) সেভিল দখল করে নেন। কিন্তু ৪২৭ হিজরীতে (১০৩৬ খ্রি.) সেভিলবাসীরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাদের সাথে এক সংঘর্ষে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আলী নিহত হন। ইয়াহ্ইয়া নিহত হওয়ার পর তার সঙ্গী-সাথী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা মালাগা চলে যায়। সেখানে ইয়াহ্ইয়ার স্থায়ী হুকুমত ছিল। তারা ইয়াহ্ইয়ার ভাই ইদরীস ইব্‌ন আলীকে সিউটা থেকে ডেকে পাঠিয়ে তাকেই সিংহাসনে বসান। সিউটার শাসনক্ষমতা হাসান ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়ার হাতে ন্যস্ত করা হয়। ইদরীস ইব্‌ন আলী মালাগার সিংহাসনে বসে 'মুতাআইয়িদ বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। আবু মুহাম্মাদ জামহুর কর্ডোভায় জামহুরী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। কাউন্সিল সদস্যরা আবু মুহাম্মাদ জামহুরকে নিজেদের 'সদর' বা সভাপতি নির্বাচিত করে। এভাবে কর্ডোভা শহরে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইদরীস ইব্‌ন আলী কারমুনা এবং আলমেরিয়ার শাসকদ্বয়কে নিজের পক্ষে টেনে এনে সেভিলের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। তিন-চার বছর পর্যন্ত সেভিলের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ৪৩১ হিজরীতে (অক্টোবর ১০৩৯- সেপ্টেম্ব '৪০ খ্রি.) ইদরীস ইব্‌ন আলী মৃত্যুবরণ করেন। কোন কোন সর্দার তার পুত্র ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইদরীসকে মালাগার সিংহাসনে বসাতে চান। কারো কারো মতে সিউটার শাসনকর্তা হুসায়ন ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়াই হচ্ছেন সিংহাসনের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি। শেষ পর্যন্ত হাসান ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া সিউটা থেকে এসে মালাগার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নিজের জন্য 'মুসতানসির' উপাধি গ্রহণ করেন। ৪৩৮ হিজরীতে (১০৪৬-৪৭ খ্রি.) হাসানের চাচাত বোন অর্থাৎ ইদরীসের কন্যা তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। তারপর তিন-চার বছর পর্যন্ত এই বংশের দাস ভৃত্যরা একের পর এক মালাগা শাসন করে।

ইদরীস ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া হামূদী

শেষ পর্যন্ত ৪৪৩ হিজরীতে (১০৫১ -৫২ খ্রি.) ইদরীস ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হামূদ মালাগার সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রানাডা এবং কারমুনার শাসকরা তার বশ্যতা স্বীকার করে। ইদরীস ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া নিজের জন্য 'আ-লী' উপাধি গ্রহণ করেন এবং সিউটার শাসন ক্ষমতা পিতার ক্রীতদাস সাকূত এবং যারকুল্লাহকে প্রদান করেন। ৪৪৮ হিজরীতে (এপ্রিল ১০৫৬ খ্রি-৫৭ খ্রি) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হামূদ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ইদরীস ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তার হাতে পরাজিত হয়ে কামারুশ চলে যান। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস মালাগার সিংহাসনে আরোহণ করে নিজের জন্য 'মাহ্দী' উপাধি গ্রহণ করেন এবং আপন ভ্রাতা সানালীকে নিজের 'অলীআহ্দ' নিয়োগ করেন। ৪৪৯ হিজরী (মার্চ ১০৫৭-ফেব্রুয়ারী ৫৮ খ্রি) সনে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার মৃত্যু সংবাদ শুনে ইদরীস ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া পুনরায় মালাগায় এসে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তারপর ৪৫০ হিজরীতে (মার্চ ১০৫৮- ফেব্রুয়ারী ৫৯ খ্রি.) ইদরীস ইব্ন ইয়াহ্ইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হামূদ বংশের শেষ সম্রাট মুহাম্মাদ আসগর

তারপর মুহাম্মাদ আসগর ইব্ন ইদরীস ইব্ন আলী ইব্ন হামূদ মালাগার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৪৫১ হিজরীতে (১০৫৯ খ্রি.) গ্রানাডার রাজা বাদীস ইব্ন হাকূস মালাগা আক্রমণ করে মুহাম্মাদ আসগরকে সেখান থেকে বের করে দেয়। মুহাম্মাদ আসগর মালাগা থেকে আলমেরিয়ায় চলে আসেন। ৪৫৬ হিজরী (১০৬৪ খ্রি.) পর্যন্ত তিনি এখানে অশান্তির মধ্যে কালাতিপাত করেন। ৪৫৬ হিজরী (১০৬৪ খ্রি) মালীলা (আফ্রিকা)বাসীদের আবেদন মতে তিনি আফ্রিকা চলে যান এবং সেখানকার শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। ৪৬০ হিজরী (১০৬৮ খ্রি.) পর্যন্ত তিনি সেখানকার বাদশাহ ছিলেন। মুহাম্মাদ আসগর হচ্ছেন হামূদ বংশের সর্বশেষ সুলতান। অবশ্য 'ওয়াসিক বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণকারী কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ নামীয় অপর এক ব্যক্তি ৪৫০ হিজরী (১০৫৮ খ্রি.) সন পর্যন্ত জাযীরা প্রদেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আশবেলিয়ার বাদশাহ মুতাযিদ ইব্ন আবুল কাসিম ইব্ন ইবাদ ৪৫০ হিজরী (১০৫৮ খ্রি.) জাযীরা আক্রমণ করে কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদকে বন্দী করে ফেলেন। এভাবে স্পেন থেকে হামূদ বংশের শাসনামলের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সপ্তম অধ্যায়

বনূ ইবাদ, বনূ যুন্নুন, বনূ হূদ প্রভৃতি

স্বাধীন রাজবংশ

উপরে বনূ হামূদ বংশের শাসনকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। উমাইয়া বংশের শাসনকাল হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে শেষ হয়ে গিয়েছিল। বনূ হামূদ বংশের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা ৪০৫ হিজরী (১০১৪-১৫ খ্রি.) পর্যন্ত পৌছে গেছি। প্রকৃত অবস্থা এই যে, স্পেন ভূখণ্ডের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের উপর হামূদরা তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের সমসাময়িক আরো কয়েকটি বংশ পৃথক পৃথক প্রদেশগুলোর উপর নিজেদেরই শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ওদের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করার অবকাশ এখানে নেই। তাই অতি সংক্ষেপে সে সমস্ত শাসক সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হচ্ছে।

সেভিল ও পশ্চিম স্পেন (বনূ ইবাদ)

বনূ ইবাদ বংশের মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন কুরায়শ তাশানা মহল্লার সাহিবুস সালাত তথা ইমাম ছিলেন। তাঁর পুত্র ইসমাঈল ৪১৩ হিজরীতে (এপ্রিল ১০২২-মার্চ '২৩ খ্রি) সেভিল রাজদরবারে মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ৪১৪ হিজরী (এপ্রিল ১০২৩-মার্চ ২৪ খ্রি) ইসমাঈল ইব্‌ন মুহাম্মাদের পুত্র আবুল কাসিম মুহাম্মাদ সেভিলের কাযী (বিচারক) ও মন্ত্রী নিযুক্ত হন। যখন কাসিম ইব্‌ন হামূদ সেভিলের দিকে আসেন তখন কাসিম মুহাম্মাদ (সেভিলের কাযী) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন যুবায়রী সেভিল দখল করে নেন এবং কাসিম ইব্‌ন হামূদকে সেখানে প্রবেশ করতে দেন নি।

আবুল কাসিম মুহাম্মাদ

তারপর আবুল কাসিম মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন যুবায়রীকেও সেভিল থেকে বের করে দেন এবং নিজেই সেভিলের শাসক হয়ে বসেন। কাসিম ইব্‌ন হামূদ কারমুনার দিকে চলে গিয়েছিলেন সেখানে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ বায়যালী ৪০৪ হিজরী (১০১৩-১৪ খ্রি) থেকে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাসিম ইব্‌ন হামূদ সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে সারীশ দুর্গের দিকে চলে আসেন এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ যথারীতি কারমুনা শাসন করতে থাকেন।

আবূ উমর ইবাদ

আবুল কাসিম মুহাম্মাদের পর তার পুত্র আবূ উমর ইবাদ সেভিলের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নিজের জন্য 'মুতাদিদ' উপাধি গ্রহণ করেন। মুতাদিদ এবং কারমুনার রাজা

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহর মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৪৩৪ হিজরী (সেপ্টেম্বর ১০৪২-আগস্ট '৪৩ খ্রি) ইসমাঈল ইব্‌ন কাসিম হামূদ, কারমুনার শাসক মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে হত্যা করে কারমুনা দখল করে নেন। কিছুদিন পর ইসমাঈল কারমুনা থেকে জাযীরার দিকে চলে যান এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহর পুত্র আযীয মুসতাযহির কারমুনা দখল করে নেন। কিছু দিন পর মুতাদিদ কারমুনা, সারীশ, আরকাশ, রিনদাহ প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে সেগুলোকে আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আবদুল আযীয বাকরী স্বাধীনভাবে আদীনাহ্‌ ও সালত্তীশ শাসন করছিলেন। সেভিলের শাসক মুতাদিদ তার উপর হামলা পরিচালনা করেন। প্রথমত কর্ডোভার 'ওয়াযিরুস সুলতানাত' (প্রধানমন্ত্রী) ইব্‌ন জামহুরের হস্তক্ষেপের ফলে মুতাদিদ ও আবদুল আযীযের মধ্যে একটা আপোস মীমাংসা হয়। কিন্তু ইব্‌ন জামহুরের মৃত্যুর পর ৪৪৩ হিজরী (মে ১০৫১-এপ্রিল '৫২ খ্রি) মুতাদিদ আদীনাহ্‌ এবং শালতীশ জয় করে সেগুলোকে আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং আপন পুত্র মুতামিদকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। শাল্‌ব-এর শাসক মুযাফফর ৪২২ হিজরী (১০৩১ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার পুত্রকে সেখান থেকে হটিয়ে মুতাদিদ শাল্‌ব অঞ্চলকেও নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং এর শাসন ক্ষমতাও আপন পুত্র মুতামিদের হাতে অর্পণ করেন।

আবুল আব্বাস আহমদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ৪১৪ হিজরী (এপ্রিল ১০২৩-মার্চ '২৪ খ্রি) লাবনায় নিজের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ৪৩৩ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ১০৪১-আগস্ট '৪২ খ্রি) ইনতিকাল করলে তার ভাই মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া সেখানকার শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। মুতাদিদ সুযোগ বুঝে লাবলা আক্রমণ করেন। বেশ অনেকগুলো যুদ্ধের পর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া লাবলা পরিত্যাগ করে আপন ভাতিজা ফাতহা ইব্‌ন খাল্‌ফ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়ার কাছে কর্ডোভায় চলে যান। মুতাদিদ ৪৪৫ হিজরীতে (মে ১০৫৩-এপ্রিল '৫৪ খ্রি) কর্ডোভাও দখল করে নেন। এভাবে তিনি ইব্‌ন রাশীকের কাছ থেকে আলমেরিয়া এবং ইব্‌ন তাইগুরের কাছ থেকে মারতালা ছিনিয়ে নেন এবং ক্রমান্বয়ে আপন সাম্রাজ্যের আয়তন বহুলভাবে বৃদ্ধি করেন। এভাবে তিনি বনূ ইবাদের একটি সুদৃঢ় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। বাদীস ইব্‌ন হাবুস এবং মুতাদিদের মধ্যে বেশ কিছু দিন যাবত যুদ্ধ চলছিল। এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই হিজরী ৪৬১ (নভেম্বর ১০৬৮-অক্টোবর '৬৯ খ্রি) মুতাদিদ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুতামিদ ইব্‌ন মুতাদিদ ইব্‌ন ইসমাঈল

মুতাদিদের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুতামিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুতামিদও আপন পিতার ন্যায় সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করতে থাকেন। বাদীস ইব্‌ন হাবূসও মুতামিদের নেতৃত্ব মেনে নেন। ৪৪৭ হিজরী (এপ্রিল ১০৫৫-মার্চ '৫৬ খ্রি) ক্যাস্টিল ও লিউনের খ্রিস্টান সম্রাট প্রথম ফার্ডিনান্ড মুসলমানদেরকে আপোসে যুদ্ধরত দেখে সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে সেভিল রাজ্য আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে মুসলমান সামন্ত শাসকরা আপন মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বীর মুকাবিলায় ফার্ডিনান্ডকে কর প্রদানে সম্মত হন এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুতাদিদও এই হামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করেন। তার পুত্র আলফোনসূ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।

আলফোনসূ ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক ও অহংকারী। ৪৬৮ হিজরী (১০৭৫ -'৭৬ খ্রি) মুতামিদ নিজের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ও সুসংগঠিত করে খ্রিস্টান সম্রাটকে কর দান বন্ধ করে দেন।

চতুর্থ আলফোনসূ কর্তৃক মুসলমান অধ্যুষিত শহরসমূহ লুণ্ঠন

পশ্চিম স্পেনে বনূ ইবাদ ছাড়াও আরো কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত অধিপতি স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করছিলেন। তারা বনূ ইবাদের অধীনে ছিলেন না। তাদের অধিকাংশই খ্রিস্টান সম্রাটের কর্তৃত্বাধীন চলে গিয়েছিলেন। চতুর্থ আলফোনসূ মুসলমান অধ্যুষিত শহরসমূহ লুণ্ঠন এবং মুসলমান সামন্ত শাসকদের কাছ থেকে কর আদায় করে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি খ্রিস্টানদের একটি বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করে ৪৭৮ হিজরী (মে ১০৮৫-এপ্রিল '৮৬ খ্রি) সনে বনী যুন্নুন বংশের শেষ সুলতান কাদিরের কাছ থেকে টলেডো ছিনিয়ে নেন। তারপর সমগ্র মুসলমান সুলতানকেই ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে থাকেন।

আলফোনসূ কর্তৃক মুতামিদের কাছ থেকে কর তলব

চতুর্থ আলফোনসূর ইব্‌ন শালিব নামীয় জনৈক ইহুদী দূত মুতামিদের কাছে এসে তার কাছ থেকে কর তলব করে। মুতামিদ বিনাদ্বিধায় ঐ ইহুদী দূতের কাছে কর পাঠিয়ে দেন। কিন্তু দূত ঐ অর্থ মুতামিদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে বলে ঃ এটা তো রৌপ্যমুদ্রা, আমি রৌপ্য মুদ্রা নেব না, বরং এর পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা অর্থাৎ আশরাফী নেব। উপরোক্ত পয়গামসহ যখন করের অর্থ মুতামিদের হাতে এসে পৌঁছে তখন তিনি নিজের কয়েকজন সৈন্যের মাধ্যমে ঐ দূতকে ডেকে পাঠান এবং তার ঐ বেআদবী ও অশিষ্টতার শাস্তিস্বরূপ তাকে একটি কাঠের তক্তার উপর শুইয়ে তার হাত এবং পায়ের মধ্যে লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দেন। ইহুদী দূত ইব্‌ন শালিব নিজেকে এরূপ ধ্বংসের মুখোমুখি দেখতে পেয়ে মুতামিদের কাছে আবেদন জানায় ঃ যদি আপনি আমাকে রেহাই দেন তাহলে আমি আমার ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ আপনার খিদমতে হাযির করবো। কিন্তু মুতামিদ তাকে হত্যা করে তার সঙ্গীদেরকে বন্দী করে ফেলেন। মুতামিদ জানতেন, এবার চতুর্থ আলফোনসূ যে তার উপর আক্রমণ পরিচালনা করবেন। আলফোনসূ এই সংবাদ শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। বাহ্যত তখন মুসলমানদের নামমাত্র কর্তৃত্ব একেবারে নিভু নিভু অবস্থায় ছিল এবং প্রায় সমগ্র দেশ খ্রিস্টানদের দখলে চলে গিয়েছিল। গৃহযুদ্ধের কারণে মুসলমানরা এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, খ্রিস্টানদের সাথে মুকাবিলা করার মত শক্তি, সাহস কোনটাই তাদের ছিল না

মুতামিদ কর্তৃক ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের কাছে সাহায্যের আবেদন

মুতামিদ বিষয়টির পরিণামের দিক বিবেচনা করে মরক্কোর বাদশাহ্ ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন-এর কাছে এই মর্মে এক অনুরোধ পত্র প্রেরণ করেন য, এই মুহূর্তে আমার সাহায্যের অতীব প্রয়োজন। অন্যথায় স্পেন থেকে ইসলামের নাম-নিশানা চিরতরে মুছে যাবে। মুরাবিতীন বংশের ইউসুফ ইবন তাশুফীন মাত্র কিছু দিন পূর্বে আফ্রিকার শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী সম্রাট। মুতামিদ ইবাদীর পত্র পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্পেন অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেভিলে এসে পৌঁছেন। অপর দিকে চতুর্থ আলফোনসূ এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে সেভিলের দিকে অগ্রসর হন।

যালাকা রণক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের ঐতিহাসিক যুদ্ধ

৪৮০ হিজরী মুতাবিক ১০৮৬ খ্রিস্টাব্দে যালাকার যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানরা খ্রিস্টানদের মুখোমুখি হয়। ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন এবং মুতামিদের সম্মিলিত ইসলামী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। অপর দিকে খ্রিস্টানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। এটা স্পেনের বিখ্যাত যুদ্ধসমূহের অন্যতম। কেননা এই যুদ্ধের ফলেই মুসলমানরা আরো কয়েকশ বছরের জন্য স্পেনে নিজেদেরকে সুদৃঢ় করার এবং খ্রিস্টানদের অন্তরে নিজেদের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ কিভাবে নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করেছিল তা ইব্‌ন আসীরের একটি উক্তি থেকে অনুমান করা যেতে পারে। তিনি বলেন, এই যুদ্ধে চতুর্থ আলফোনসূ তার মাত্র তিনজন সঙ্গী নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং বাকি সবাই মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারায়। এই বিরাট বিজয়ের পর মুসলমানরা তাদের শক্তিকে সুসংহত করার আরেকটি সুযোগ পায়। কিন্তু ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন মরক্কোয় প্রত্যাবর্তনের পর মুসলমানরা পুনরায় গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুতামিদ ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং জ্ঞানী-গুণীদের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু যালাকা বিজয়ের পর মুতামিদের চালচলন আপত্তির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। পরবর্তী বছর ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন পুনরায় স্পেনে আসেন এবং বেশির ভাগ আমীর ও সুলতানের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে পুনরায় আফ্রিকায় যান। অবশ্য ফিরে যাবার সময় পর্যবেক্ষক হিসাবে তিনি নিজের একজন গভর্নরকে রেখে যান। ঐ সমস্ত সুলতানের অসংযত আচার-আচরণ ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনকে সরাসরি স্পেনের উপর হস্তক্ষেপ করার এবং এটাকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার সুযোগ এনে দেয়। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ৪৮৪ হিজরীতে (১০৯১ খ্রি.) ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন, মুতামিদকে বন্দী করে নিয়ে যান এবং মরক্কোর 'আগমাত' নামক স্থানে আটকে রাখেন। চার বছর পর ৪৮৮ হিজরীতে (১০৯৫ খ্রি.) মুতামিদ সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করেন। এভাবে বনী ইবাদ শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বনী ইবাদ ছাড়াও আরো কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য স্পেনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এখানে সেগুলোর বর্ণনা পরিত্যাজ্য হলো।

বাতলিউস (পশ্চিম স্পেন) প্রদেশে বনূ আফতাসের শাসন প্রতিষ্ঠা

স্পেনে যখন ইসলামী খিলাফত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল তখন আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসালামাহ ওরফে ইব্‌ন আফতাস পশ্চিম স্পেনের বাতলিউস প্রদেশ দখল করে সেখানে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র আবূ বকর মুযাফ্‌ফর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দেশ শাসন করেন। বনূ যুনূন বনূ ইবাদের সাথে তার বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। কিন্তু ৪৪৩ হিজরী (১০৫১-৫২ খ্রি.) মুযাফ্‌ফর বাতলিউসের কেল্লায় অবরুদ্ধ ও বন্দী হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ইবন জামহূরের চেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে একটি আপোসচুক্তি সম্পাদিত হয়। ৪৬০ হিজরী (১০৬৮ খ্রি.) সনে মুযাফ্‌ফর মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তার পুত্র আবূ হাফস উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ওরফে সাজাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজের জন্য 'মুতাওয়াক্কিল' উপাধি গ্রহণ করেন।

ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন কর্তৃক বাতলিউস দখল

৪৮৯ হিজরীতে (১০৯৬ খ্রি.) ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন বাতলিউস দখল করে ঈদুল আযহার দিনে মুতাওয়াক্কিল এবং তার সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করেন। মুতাওয়াক্কিলকে এই কঠোর শাস্তি এ জন্য দেওয়া হয় যে, তিনি খ্রিস্টানদের সাথে চিঠিপত্র আদান প্রদান করে এই চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন, যাতে খ্রিস্টানরা মুসলিম এলাকাগুলোর উপর আক্রমণ চালায় এবং স্পেন থেকে ইউসূফ ইব্‌ন তাশুফীনের প্রভাব মুছে ফেলে। তার এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন তাকে উপরোক্ত শাস্তি দিয়ে তার নাম-নিশানা মুছে ফেলার উদ্যোগ নেন, যাতে অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।

কর্ডোভায় ইব্‌ন জাহূর-এর শাসন প্রতিষ্ঠা

জাহূর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবিল গাফির ইব্‌ন আবী উবায়দা কালাবী ওরফে ইব্‌ন হাযমকে ৪২২ হিজরী (১০৩১ খ্রি.) কর্ডোভাবাসীদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তিনি একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সকলেরই পরামর্শ অনুযায়ী দেশ শাসন করতে থাকেন। তিনি আরেকটি সতর্কতা এভাবে অবলম্বন করেন যে, রাজপ্রাসাদের পরিবর্তে নিজের বাসস্থানেই দরবার প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেকে বাদশাহ্‌ বা সুলতান আখ্যা দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান ও পবিত্রচেতা লোক ছিলেন। তার শাসন সব দিক দিয়েই প্রশংসনীয় ছিল। তিনি রোগীদের দেখতে যেতেন এবং সাধারণ বৈঠক-সভা-সমিতিতে নির্দ্বিধায় যোগদান করতেন। তিনি ৪৩৫ হিজরী (১০৪৩-৪৪ খ্রি.) সনে মৃত্যুবরণ করেন এবং নিজের বাসস্থানেই সমাধিস্থ হন।

আবুল ওয়ালীদ ইব্‌ন জাহূর আবদুল মালিক

জাহূরের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবুল ওয়ালীদ ইব্‌ন জাহূর আবদুল মালিককে কর্ডোভার অধিবাসীরা সর্বসম্মতিক্রমে স্পেনের শাসক নিয়োগ করে। তিনিও তার পিতার মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সামন্ত রাজ-রাজড়াদের মধ্যে তার শাসনকালই ছিল সবচাইতে প্রশংসনীয়। আবুল ওয়ালীদের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুল মালিক কর্ডোভার শাসক হন। কিন্তু কর্ডোভাবাসীরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে।

ইব্‌ন আক্তাশা

বনূ যুন্নুন যখন কর্ডোভা আক্রমণ করে তখন আবদুল মালিক বনূ ইবাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইবাদী সেনাবাহিনী বনূ যুন্নুনকে তাড়িয়ে দেয় বটে, তবে নিজেরা কর্ডোভা দখল করে আবদুল মালিককে বন্দী করে ফেলে। এভাবে ৪৬১ হিজরীতে (১০৬৯ খ্রি.) জাহূর বংশের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মুতাযিদ ইবাদী তার পুত্র সিরাজুদ্দৌলাকে কর্ডোভায় আসার কিছুদিন পরই কে বা কারা তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। তারপর ইব্‌ন আক্তাশা কর্ডোভা দখল করে নেন।

গ্রানাডায় ইব্ন হাবূসের শাসন

যে সময় বনূ হামূদ মালাগায় নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন ঠিক সে সময়ে যাদী ইব্ন যায়রী মানাদ নামীয় জনৈক বার্বার সর্দার গ্রানাডায় আপন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। যখন স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তখন অর্থাৎ ৪১০ হিজরী (মে ১০১৯-এপ্রিল১০২০ খ্রি) সনে যাদী তার পুত্রকে গ্রানাডায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে স্বয়ং কায়রোয়ানের সম্রাটের কাছে আফ্রিকায় চলে যান। কিন্তু যাদীর অনুপস্থিতিতে তার ভাই মাকিস ইব্ন যায়রী গ্রানাডা দখল করে তার ভাতিজাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন এবং নিজেই সেখানকার বাদশাহ হয়ে বসেন। ৪২৯ হিজরীতে (অক্টোবর ১০৩৭-সেপ্টেম্বর ১০৩৮ খ্রি) মাকিস ইব্ন যায়রীর মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র বাদীস ওরফে ইব্ন হাবূস সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইব্ন যুন্নুন ও ইব্ন ইবাদের সাথে বাদীসের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। ইব্ন হাবূসের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইসমাঈল নামীয় জনৈক ইহুদী। ৪৬৭ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ১০৭৪-আগস্ট ১০৭৫ খ্রি) ইব্ন হাবূসের মৃত্যু হয়। তারপর তার প্রপৌত্র আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইব্ন বুলুকীন ইব্ন বাদীস সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তার ভাই তামীমের কাছে আপন পিতামহের ওসীয়ত অনুযায়ী মালাগার শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করেন। ৪৮৩ হিজরী (মার্চ ১০৯০-ফেব্রুয়ারি ১০৯১ খ্রি) সনে মুরাবিতীনরা এই দুই ভাইকে পদচ্যুত ও দেশান্তরিত করে আগামাতের দিকে পাঠিয়ে দেয়।

তালীতলায় বনূ যুন্নুনের শাসন

যখন স্পেনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ৪১৯ হিজরীতে (১০২৮ খ্রি.) ইসমাঈল ইব্ন যাফির ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন সুলায়মান ইব্ন যুন্নুন আকলাতীন দুর্গ দখল করে নেন। টলেডোর শাসনকর্তা ইয়াঈশ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াঈশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে টলেডোয় স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৪২৭ হিজরীতে (১০৩৬ খ্রি) যখন তার মৃত্যু হয় তখন টলেডোর সেনা অধিনায়ক আকলাতীন দুর্গ থেকে ইসমাঈলকে এই মর্মে তলব করেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে এসে টলেডো দখল করে নেন। অতএব ইসমাঈল বিনা সংঘর্ষে টলেডোর উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে দেশ শাসন করতে থাকেন। ৪৩৯ হিজরীতে (১০৪৭-৪৮ খ্রি.) ইসমাঈল ইব্ন যাফিরের মৃত্যু হলে তার পুত্র আবুল হাসান ইয়াহইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নিজের জন্য মামূন উপাধি গ্রহণ করেন। মামূন প্রবল প্রতাপে দেশ শাসন করেন। সামন্ত শাসকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচাইতে বেশি পরাক্রমশীল। সীমান্তবর্তী খ্রিস্টান রাজাদের সাথে তার অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মানসূর আযম ইব্ন আবী আমির-এর বংশধরদের মধ্যে মুযাফ্ফর নামীয় জনৈক ব্যক্তি ভ্যালেন্সিয়া প্রদেশ দখল করে নিয়েছিল। মামূন ৪৩৫ হিজরীতে (১০৪৩ খ্রি) তাকে ভ্যালেন্সিয়া থেকে বেদখল করে সে প্রদেশটিও নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তারপর মামূন কর্ডোভা আক্রমণ করেন এবং সেটাকে বনূ ইবাদের দখল থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। তারপর তার পুত্র আবূ উমারকে কর্ডোভাবাসীরা হত্যা করে ফেলে। ৪৬৭ হিজরীতে (১০৭৪-৭৫ খ্রি) মামূনকেও কে বা কারা বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। তারপর টলেডোর শাসন ক্ষমতা তার পৌত্র কাদির ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন ইসমাঈলের দখলে চলে আসে। ৪৭৮ হিজরীতে (১০৮৫ খ্রি) কিস্টালের খ্রিস্টান সম্রাট টলেডো আক্রমণ করেন। কাদির ইব্ন ইয়াহইয়া টলেডো মুক্ত করে দেন এবং চতুর্থ আল-ফোনসূর সাথে এই শর্ত

আরোপ করেন যে, তিনি তাকে (কাদিরকে) ভ্যালেন্সিয়া প্রদেশ দখল করার ব্যাপারে সাহায্য করবেন। তখন ভ্যালেন্সিয়া প্রদেশের শাসক ছিলেন কাযী উসমান ইব্ন আবূ বকর ইব্ন আবদুল আযীয। ভ্যালেন্সিয়ার অধিবাসীরা যখন জানতে পারে যে, চতুর্থ আলফোনসূ ভ্যালেন্সিয়া দখলের ব্যাপারে কাদিরকে সাহায্য করবেন তখন তারা নিজেরাই উসমান ইব্ন আবূ বকরকে পদচ্যুত করে কাদির ইব্ন ইয়াহইয়াকে আহ্বান জানায় এবং তার হাতেই ভ্যালেন্সিয়ার শাসন কর্তৃত্ব তুলে দেয়। ৪৮১ হিজরীতে (১০৮৮ খ্রি) কাদিরের মৃত্যু হয়।

সারাকাস্তায় বনূ হূদের শাসন

আবূ আইয়ুব সুলায়মান, আহমদ মুকতাদির বিল্লাহ, ইউসুফ মু'তামিন ও আহমদ মুসতাঈন

যখন স্পেনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে তখন সারাকাস্তার শাসনকর্তা ছিলেন মুনযির ইবন মুতরিফ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ। মুনযির প্রথম প্রথম মুসতাঈনের পক্ষাবলম্বন করলেও পরে তাকে পরিত্যাগ করেন। কিছুদিন পর মুনযির সারাকাস্তা প্রদেশ স্বাধীনভাবে শাসন করতে শুরু করেন। তারপর প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ও বার্সিলোনার খ্রিস্টান রাজাদের সাথে আপোস চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ৪১৪ হিজরীতে (১০২৩ খ্রি.) যখন মানসূরের মৃত্যু হয় তখন তার পুত্র মুযাফ্ফর সারাকাস্তার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে আবূ হুযায়ফার মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস আবূ আইয়ূব ইবন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মূসা ইব্ন সালিম ছিলেন তালীতলা নগরীর দখলকার ও শাসক।

৪৩১ হিজরী (সেপ্টেম্বর ১০৩৯-আগস্ট ১০৪০ খ্রি) সুলায়মান, মুযাফ্ফরকে বন্দী ও হত্যা করেন এবং সারাকাস্তা দখল করে নেন। তখন মুযাফফরের পুত্র ইউসুফ লারীদাহ শাসন করতে থাকেন এবং মুযাফ্ফরের সাথে তার একটির পর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে।

কিছুদিন পর ৪৩৭ হিজরীতে (১০৪৫-৪৬ খ্রি) সুলায়মানের মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র আহমদ 'মুকতাদির বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুকতাদির বিল্লাহ্ ইউসুফের বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও বাশকান্সের রাজাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তারা মুকতাদিরের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ইউসুফ অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে মিত্রবাহিনীর মুকাবিলা করেন এবং মুকতাদির ও খ্রিস্টান রাজাদেরকে সারাকাস্তায় অবরুদ্ধ করে ফেলেন। এটা হচ্ছে ৪৪৩ হিজরীর (মে ১০৫১-এপ্রিল ৫২ খ্রি) ঘটনা। এতে ইউসুফ পরাজিত ও বিপর্যস্ত হন এবং খ্রিস্টান রাজারা নিজেদের দেশে ফিরে যান। মুকতাদির ৪৭৪ হিজরী (১০৮১-৮২ খ্রি) পর্যন্ত সারাকাস্তা শাসন করে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুকতাদিরের পর তার পুত্র ইউসুফ সারাকাস্তার শাসনভার গ্রহণ করে নিজের জন্য মুতামিন উপাধি গ্রহণ করেন। ইউসুফ মুতামিন গণিত শাস্ত্রে খুব পরদর্শী ছিলেন। এই বিষয়ের উপর তিনি 'আল-ইসতেহলাল', 'আল-মানাযির' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। হিজরী ৪৭৮ (মে ১০৮৫-৮৬ খ্রি) সনে ইউসুফ মুতামিনের মৃত্যু হয়। এই বছর খ্রিস্টানরা কাদির যিন্নুনের কাছ থেকে টলেডো ছিনিয়ে নেয়।

ইউসুফ মুতামিনের পর তার পুত্র আহমদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজের জন্য মুসতাঈন উপাধি গ্রহণ করেন। তার আমলে খ্রিস্টানরা ওয়াশকাহ্ আরোপ করেন। আহমদ মুসতাঈন সেটাকে মুক্ত করার জন্য সারাকাস্তা থেকে রওয়ানা হন। ৪৮৯ হিজরী

(১০৯৫-৯৬ খ্রি) সনে ওয়াশকায় খ্রিস্টানদের সাথে তার ভীষণ যুদ্ধ হয়। তাতে তিনি পরাজিত হন এবং সে যুদ্ধে দশ হাজার মুসলমান শাহাদাতবরণ করে। আহমদ মুসতাঈন সারাকাস্তায় ফিরে এসে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। কিন্তু যেহেতু ওয়াশকায় বিজয় লাভ করে খ্রিস্টানরা দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল তাই তিনি পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পর ৫০৩ হিজরীতে (১১০৯-১০ খ্রি.) সারাকাস্তা আক্রমণ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে আহমদ মুসতাঈন শাহাদাতবরণ করেন।

এবার আহমদ মুসতাঈনের পুত্র আবদুল মালিক সারকাস্তার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নিজের জন্য ইমাদুদ্দৌলা উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু ৫১২ হিজরীতে (মে ১১১৮-এপ্রিল '১৯ খি) খ্রিস্টান বিদ্রোহীরা সারাকাস্তা দখল করে ইমাদুদ্দৌলাকে সেখান থেকে বের করে দেয়। ইমাদুদ্দৌলা সারাকাস্তা রাজ্যে 'রাওতা' নামক একটি দুর্গে আশ্রয় নেন এবং পরিপূর্ণ এক বছর অবস্থানের পর সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

ইমাদুদ্দৌলার মৃত্যুর পর তার পুত্র আহমদ সাইফুদ্দৌলা উপাধি গ্রহণ করে রাওতা দুর্গে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খ্রিস্টানদের কাছ থেকে তার পিতার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কিন্তু সফলকাম হতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি রাওতা দুর্গ খ্রিস্টানদের কাছে বিক্রি করে পরিবার-পরিজনসহ তালীতলায় এসে বসবাস করতে থাকেন এবং এখানেই ৫৩৬ হিজরীতে (১১৪১-৪২ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন।

পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপ মেজর্কা, মেয়র্কা, সার্দানিয়া ইত্যাদি

২৯০ হিজরীতে (৯০৩ খ্রি.) ইসাম খাওলানী মেয়র্কা দ্বীপ জয় করেছিলেন এবং স্পেনের সুলতানের পক্ষ থেকে তিনি সেখানকার গভর্নরও নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইসামের পর তার সেখানকার গভর্নর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তারপর খলীফা নাসীর, পুত্র মুয়াফফিককে উক্ত দ্বীপের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মুয়াফফিক ফ্রান্স রাজ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করেন। ৩৫৯ হিজরীতে (৯৭০ খ্রি.) মুয়াফফিক মৃত্যুবরণ করেন। তারপর কাওসার নামীয় তার এক ভৃত্য মেয়র্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ৩৮৯ হিজরীতে (৯৯৯ খ্রি.) মৃত্যুমুখে পতিত হন। মানসূর, মুকাতিল নামীয় তার এক ভৃত্যকে মেয়র্কার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ৪০৩ হিজরীতে (১০১২-১৩ খ্রি.) মুকাতিল মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর মুজাহিদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন আলী আমিরী মেয়র্কার গভর্নর নিযুক্ত হন। তারপর সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন আবদুল্লাহ্। তিনি ৪১৩ হিজরীতে (এপ্রিল ১০২২-মার্চ ১০২৩ খ্রি) সাদানিয়া জয় করে সেটাকে আপন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ৪৬৮ হিজরীতে (১০৭৫-৭৬ খ্রি) মুবাশশির নামীয় এক ব্যক্তি মেয়র্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তখন পর্যন্ত মেয়র্কা, মেনর্কা এবং সার্দানিয়া দ্বীপসমূহ কোন না কোন স্বাধীন রাজার অধীনে রয়েছে বলে মনে করা হতো। মুবাশশির সবগুলো দ্বীপকে নিজের অধীনে নিয়ে আসেন এবং ফ্রান্স উপকূলে অবতরণ করে বরাবর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন। ফলে বার্সিলোনা ও ফ্রান্সের খ্রিস্টান রাজারা একজোট হয়ে মেয়র্কা দ্বীপকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। মুবাশশির আলী ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আলীর সামরিক জাহাজসমূহ খ্রিস্টানদের মেরে তাড়িয়ে দেয়। এরপর এ সমস্ত দ্বীপের শাসনক্ষমতা মুরাবিতীনদের হাতে চলে যায়। এরপর মুওয়াহহিদীনরা তা দখল করে নেয়। তাদের পর এই সমস্ত দ্বীপের শাসন ক্ষমতা খ্রিস্টানদের হাতে চলে যায়।

অষ্টম অধ্যায়

খ্রিস্টানদের দুঃসাহসিকতা ও বাড়বাড়ি এবং মুরাবিতীনদের শাসন

আদ্যোপান্ত ঘটনাসমূহের ক্রমধারায় একটা সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আমরা এখন কিছুটা পিছনে চলে যাচ্ছি। স্পেন উপদ্বীপের ইসলামী সাম্রাজ্যে যখন পতন দেখা দিল তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটলো। স্পেনের উত্তর সীমান্তের খ্রিস্টান রাজ্যসমূহ, যেগুলোর অস্তিত্ব মুসলমানদের দয়া ও করুণার উপর নির্ভর করত, এবার নিজেদের উন্নতির ব্যাপারে আশান্বিত হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি এবং মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ জিইয়ে রাখার ব্যাপারে খ্রিস্টানরা ছিল খুবই তৎপর। এ ক্ষেত্রে তারা কোন সুযোগই হাতছাড়া করেনি। চতুর্থ আলফোনসূ ৪৬৭ হিজরীতে (১০৭৪-৭৫ খ্রি) মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য স্বয়ং রণ প্রস্তুতি শুরু করেন। স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে যে সমস্ত খ্রিস্টান রাজ্য ছিল তাদেরকেও তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকেন এবং সমগ্র খ্রিস্টান রাজন্যকে নিজের পক্ষে টেনে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। তিনি ৪৭৪ হিজরী (১০৮১ খ্রি) আল-কাদির বিল্লাহ-এর হাত থেকে টলেডো ছিনিয়ে নিয়ে সেটাকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। টলেডোয় তিনি প্রথম প্রথম মুসলমানদেরকে পাদ্রীদের প্রচারাভিযানের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু যখন তার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় অর্থাৎ একজন মুসলমানও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি তখন তিনি মুসলমানদের উপর জুলুম-নির্যাতন শুরু করেন। এমনকি তিনি মসজিদসমূহ ধ্বংস করে বড় বড় মসজিদগুলোকে গির্জায় রূপান্তর করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

অপরদিকে আরাগনের খ্রিস্টান সম্রাট ভ্যালেন্সিয়া প্রদেশে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে মুসলমান সৈন্যদের কাছ থেকে সারাকাস্তা ছিনিয়ে নেন এবং অবাধে সেখানকার মসজিদসমূহ ধ্বংস করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে মুসলমানরা বার বার খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করেছে, বিজয়ীবেশে তাদের শহরসমূহে প্রবেশ করেছে, কিন্তু একটি বারও তারা পাষাণের মত খ্রিস্টান মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করেনি। কিন্তু খ্রিস্টানরা এবার যখন মুসলমানদের শহরসমূহ জয় করল তখন তারা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শান্তিপ্রিয় প্রজা-সাধারণকে তাদের সন্তান, স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধসহ পাইকারীভাবে হত্যা করল। এরপরও মুসলমানরা যখন কোথাও কোথাও খ্রিস্টানদের উপর জয়লাভ করেছে তখনও তারা খ্রিস্টানদের শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধদের উপর মোটেই হাত তোলেনি।

চতুর্থ আলফোনস্ টলেডো দখল করার পর সেভিল রাজ্যের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হওয়ার দুঃসাহস দেখান। সেভিলের বাদশাহ মুতামিদ ইব্ন মুতাদিদ ইবাদী আলমেরিয়ার বাদশাহর সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। তাই তিনি অবিলম্বে করের অর্থ চতুর্থ আলফোনসূর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্যোগ নেন। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ আলফোনস্ মুতামিদের কাছে পয়গাম পাঠান : আমার স্ত্রী বর্তমানে গর্ভবতী। সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে কর্ডোভা মসজিদে রাখতে চাই যাতে সেখানেই সে সন্তান প্রসব করে। তুমি সেখানে তার থাকার ব্যবস্থা কর এবং যুহরা প্রাসাদও তার জন্য খুলে দাও। ঐ সময়ে কর্ডোভা ছিল মুতামিদের শাসনাধীন। মুতামিদ আলফোনসূর ঐ প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। উপরন্তু যে ইহুদী দূত আলফোনসূর ঐ পয়গাম নিয়ে এসেছিল তিনি তাকে হত্যা করেন। চতুর্থ আলফোনস্ এই সংবাদ শোনার সাথে সাথে ওয়াদিউল কবীর নদীর তীর ধরে অগ্রসর হন এবং সেভিলের উপকণ্ঠে তাঁবু স্থাপন করেন।

সেখানে থেকে তিনি মুতামিদকে লিখেন ঃ আমার জন্য শহর এবং মহল্লাসমূহ খালি করে দাও। মুতামিদ ঐ চিঠির উল্টো পৃষ্ঠায় এই মর্মে উত্তর দেন– আল্লাহ্ চাহেতো শীঘ্রই তোমাকে তোমার এই অশিষ্টতার স্বাদ ভোগ করতে হবে। এই সংক্ষিপ্ত জবাব পেয়ে আল-ফোনসূর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। তিনি সেভিল আক্রমণ করার সাহস আর পাননি। তবে আপন গুপ্তচরদের মাধ্যমে সমগ্র স্পেন জুড়ে এই সংবাদ রটিয়ে দেন যে, মুতামিদ ইবাদী তার সাহায্যের জন্য ইউসুফ ইব্ন তাশুফীনকে মরক্কো থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এই সংবাদ রটানোর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, স্পেনের প্রধান কর্মকর্তারা তাদের দেশে মরক্কোর বাদশাহর আগমনকে মোটেই পছন্দ করতেন না বরং এটাকে তারা নিজেদের জন্য অপমানকর বলেই বিবেচনা করতেন। অথচ খ্রিস্টান বাদশাহদের সাথে আপোস চুক্তি সম্পাদন, এমন কি খ্রিস্টানদেরকে কর প্রদান করতেও তারা লজ্জাবোধ করতেন না। যাহোক উপরোক্ত সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম সুলতানরা সেভিলের অধিপতি মুতামিদ ইব্ন মুতাদিদ ইবাদীর কাছে তিরস্কারমূলক ভাষায় পত্র লিখে তার কাছে জানতে চাচ্ছিলেন, কেন ও কি উদ্দেশ্যে তিনি ইউসুফ ইব্ন তাশুফীনকে স্পেনে ডেকে পাঠিয়েছেন? মুতামিদ সবার কাছে অতি সংক্ষেপে নিম্নোক্ত উত্তর পাঠালেন :

“শূকরের দল পাহারা দেওয়ার চাইতে
উটের রাখালীই আমার কাছে পছন্দনীয়।”

তাঁর এ কথার মর্মার্থ ছিল এই যে, আলফোনস্ আমাকে বন্দী করে নিয়ে শূকর চরানোর কাজে নিয়োজিত করবেন। আর ইউসুফ ইব্ন তাশুফীন স্পেনে এসে যদি স্বয়ং তা দখল করে নেন এবং আমাকে বন্দী করে মরক্কো নিয়ে যান তাহলে সেখানে আমাকে উট চরানোর কাজই দেওয়া হবে। অর্থাৎ ইউসুফের কাছে বন্দী হওয়াটা আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু আলফোনসূর কাছে বন্দী হওয়াটা সহ্য করতে পারি না। তারপর মুতামিদ ইউসুফ ইব্ন তাশুফীনের কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন এবং খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইউসুফ ইব্ন তাশুফীন সঙ্গে সঙ্গে স্পেনে এসে পৌছেন। আলফোনস্ এই পরাক্রমশালী শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। তিনি চতুর্দিক

থেকে দক্ষ ও দুঃসাহসী বীর যোদ্ধাদের সংগ্রহ করে ষাট হাজার সৈন্যর একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। নিজের এই বিরাট বাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করে আলফোনসূ গর্বভরে বলেছিলেন : যদি আমার মুকাবিলায় আসমান থেকে ফেরেশতারাও নাযিল হয় তাহলে তাদেরকেও আমার এই বাহিনীর কাছে পরাজয় বরণ করতে হবে। তারপর আলফোনসূ সেভিলে অবস্থানরত ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের কাছে একটি পত্র লেখেন। ঐ পত্রে তিনি তার বিরাট সেনাবাহিনী ও অসাধারণ শক্তির উল্লেখ করে ইউসুফকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছিলেন। ইউসুফ তার জনৈক কর্মকর্তা আবূ বকর ইব্‌ন কাসীরকে এই পত্রের উত্তর লেখার নির্দেশ দেন। আবূ বকর একটি অতি প্রামাণিক ও লম্বা-চওড়া পত্রের মুসাবিদা তৈরি করে ইউসুফের কাছে পেশ করেন। ইউসুফ তা দেখে বলেন, এত বেশি লেখার কি প্রয়োজন ছিল ? তারপর তিনি ঐ পত্রের পৃষ্ঠদেশে স্বহস্তে লিখে দেন ঃ

"যে জীবিত থাকবে সে দেখবে।"

এই সংক্ষিপ্ত উত্তর পড়ে আলফোনসূ ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত যালাকা প্রান্তরে উভয় বাহিনী অবতরণ করে। মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। অপর দিকে খ্রিস্টানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ষাট হাজার।

৪৭৯ হিজরীর রজব (অক্টোবর ১০৮৬ খ্রি) মাসের কোন এক বুধবার যখন মুসলিম বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয় তখন আলফোনসূর এই মর্মে পয়গাম প্রেরণ করেন, আমি শনিবার দিন মুখোমুখি হবো। ইউসুফ ও মুতামিদ আলফোনসূর ঐ আবেদন মঞ্জুর করেন। কিন্তু আঁল-ফোনসূ ঐ পয়গাম পাঠিয়ে মুসলিম বাহিনীকে প্রতারণা করেছিলেন। তিনি মুসলিম বাহিনীর অজ্ঞাতেই শুক্রবার দিন হামলা করে বসেন। এতে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এক ধরনের হতাশার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তারা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সামলে নিয়ে খ্রিস্টানদের হামলা প্রতিহত করে এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়ে যায়। মুতামিদের পর পর তিনটি ঘোড়া নিহত হয়। কিন্তু তিনি অবিরাম লড়ে যেতে থাকেন। ইউসুফ যখন পূর্ণোধ্যমে হামলা করেন তখন খ্রিস্টানদের কাছে তা অসহ্যকর হয়ে ওঠে। আলফোনসূ এই যুদ্ধে আহত হন। শেষ পর্যন্ত তিনি মাত্র কয়েকশ' সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যালাকা প্রান্তর থেকে পলায়ন করেন। এটা ৪৭৯ হিজরীর ২০শে রজব (অক্টোবর ১০৮৬ খ্রি) রোজ শুক্রবারের ঘটনা। এই বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী চারদিন অর্থাৎ ২৪শে রজব পর্যন্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করে। মুতামিদ মালে গনীমতের হিসাব ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের খিদমতে পেশ করে নিবেদন করেন– বলুন কিভাবে এগুলোকে বণ্টন করা হবে। ইউসুফ উত্তর দেন– আমি তোমার সাহায্য করতে এসেছি, মালে গনীমত পাওয়ার জন্য আসিনি। যাহোক ইউসুফ ও মুতামিদ সেভিলে ফিরে আসেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর ইউসুফ আফ্রিকায় ফিরে যান। এই পরাজয়ের পর আলফোনসূ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। কিন্তু মুসলিম শাসকরা খ্রিস্টানদের এই বিরাট পরাজয় থেকে মোটেই উপকৃত হয়নি। তারা পুনরায় গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে খ্রিস্টানরা পুনরায় সাহসী হয়ে ওঠে এবং সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে মুসলমানদের দখল থেকে একটির পর একটি শহর ছিনিয়ে নিতে থাকে। তারা সেভিলের কিছু দুর্গ দখল করে নেয়।

৪৮১ হিজরীর রবিউল আউয়াল (জুন ১০৮৮ খ্রি) মাসে স্পেনের শাসকদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের পুনরায় স্পেনে আসতে হয়। কিন্তু এবার স্পেনের মুসলমানরা অপমান ও দুর্ভাগ্যের সেই স্তরে নেমে যায় যে, ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের সাথে থেকেই ক্যাম্পে অবস্থান করেও পারস্পরিক বিরোধ ও হানাহানির কথা ভুলে থাকতে পারেনি। ইউসুফ তাদের এই অবস্থা লক্ষ্য করে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং মরক্কো চলে যান।

দু'বছর পর অর্থাৎ ৪৮৩ হিজরী (মার্চ ১০৯০-ফেব্রুয়ারি ১০৯১ খ্রি) সনে ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন খ্রিস্টানদের শাস্তি দেওয়ার জন্য পুনরায় স্পেনে আসেন। কেননা স্পেনের শাসকরা তাকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বলেই মনে করত এবং খ্রিস্টানদেরকে তাদের রাজ্যে হামলা করার সম্ভাবনা দেখলেই ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনে সাহায্য প্রার্থনা করত। এবার ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন খ্রিস্টান বাহিনীকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করতে করতে টলেডো শহরের সম্মুখে গিয়ে পৌঁছেন এবং শহরকে অবরোধ করে ফেলেন। চতুর্থ আলফোনস্ টলেডো শহরকে রাজধানী করে নিয়েছিলেন এবং তখন তিনি সেখানেই বিদ্যমান ছিলেন। ইউসুফ টলেডো ঘেরাও করে স্পেনের শাসকদের সাহায্য কামনা করেন। কিন্তু তাদের কেউই তাকে সাহায্য করেনি। বিশেষ করে গ্রানাডার শাসক আবদুল্লাহ্ ইবন বুলুক্কীন– যার এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব পালনের কথা, ইউসুফের ডাকে মোটেই সাড়া দেননি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ইউসুফ অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে টলেডো থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। এবার তিনি স্পেনের শাসকদের কিছুটা শিক্ষা দিতে মনস্থ করেন। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে এটা তাঁর জন্য জরুরী হয়ে পড়েছিল। তিনি গ্রানাডার শাসক আবদুল্লাহ্ এবং তার ভাই মালাগার শাসক তামীমকে বন্দী করে আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেন।

তারপর ৪৮৩ হিজরীর রমযান (নভেম্বর ১০৯০ খ্রি) মাসে ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন আপন ভাতিজা ও সেনাবাহিনীর অধিনায়কসহ সায়র ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন তাশুফীনকে তার বাহিনীসহ স্পেনে রেখে আফ্রিকায় ফিরে যান। সায়র আলফোনসূর উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং বেশ কয়েকটি অঞ্চল তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। এই যুদ্ধে সায়র ইব্‌ন আবী বকরের সাহায্য করা মুসলমান শাসকদের জন্য অপরিহার্য ছিল। কেননা খ্রিস্টানদেরকে দমনের জন্যই ইউসুফ সায়রকে স্পেনে রেখে গিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও স্পেনের হতভাগ্য শাসকরা সায়রকে সাহায্য করতে বা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সায়র ইব্‌ন আবী বকর স্পেনের শাসকদের এই নির্বুদ্ধিতার প্রতি দৃকপাত না করে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে আপন বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখতে এবং পর্তুগাল প্রদেশসহ স্পেনের একটি বিরাট অংশ খ্রিস্টানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। কোন কোন খ্রিস্টান শাসক তাঁর বশ্যতাও স্বীকার করে। যখন এই সেনানায়কের দখলে দেশের একটি বিরাট অঞ্চল এসে গেল এবং তিনি স্পেনে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সক্ষম হলেন তখন তিনি ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের কাছে লিখেন– স্পেন উপদ্বীপের একটি বিরাট অংশ আমরা খ্রিস্টানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। কিন্তু স্পেনের মুসলমান শাসকরা এ ক্ষেত্রে আমাকে মোটেই সাহায্য করেনি। তারা আমাদের পরিবর্তে খ্রিস্টানদের সাথেই বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে এবং তাদের এই আচরণ ইসলামের অপরিসীম ক্ষতি করেছে। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে অনুগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিন।

ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন সায়র ইব্‌ন আবী বকরকে লিখলেন– তুমি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং স্পেনের শাসকদের কাছে পুনরায় সাহায্য চাও। যদি তারা তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসে তাহলে ওদের সাহায্য গ্রহণ কর। আর যদি খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় ওরা তোমার সাহায্য না করে এবং তোমার প্রতি কোনরূপ সহানুভূতিও না দেখায় তাহলে তুমি ওদের রাজ্য ছিনিয়ে নাও। কিন্তু একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। প্রথমত তুমি ঐসব মুসলমান শাসকের রাজ্যসমূহ দখল করবে, যেগুলো খ্রিস্টান রাজ্যের সীমান্তে রয়েছে, যাতে করে কোন অঞ্চল মুসলমানদের দখল থেকে বের হয়ে পুনরায় আবার খ্রিস্টানদের দখলে চলে না যায়। সায়র ইব্‌ন আবী বকর এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন। তিনি সর্ব প্রথম সারাকাস্তার বাদশাহ ইব্‌ন হূদের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এটা ছিল ঐ সময়, যখন সারাকাস্তা ইতিমধ্যেই খ্রিস্টানদের দখলে চলে গিয়েছিল। সারাকাস্তার মুসলমান বাদশাহ রাওতা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং শুধু এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলই তার দখলে ছিল। সায়র অতি সহজেই রাওতা জয় করেন। তারপর ৪৮৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে (ডিসেম্বর ১০৯১ খ্রি) তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন তাহিরের কাছ থেকে মার্সিয়া ছিনিয়ে নেন এবং তাকে গ্রেফতার করে আফ্রিকার দিকে পাঠিয়ে দেন। তারপর তিনি আলমেরিয়া এবং বাতলিউস জয় করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে কার্মুনা, বিজাহ, বালাত, মালাগা, কর্ডোভা প্রভৃতি স্থান দখল করা হয়। সেভিলের বাদশাহ মুতামিদ মুরাবিতীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। স্পেনের তৎকালীন বাদশাহদের মধ্যে ইনিই ছিলেন সর্বাধিক পরাক্রমশীল। মুতামিদ চতুর্থ আলফোনসূর কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং আলফোনসূ তার সাহায্যার্থে একটি বাহিনীও প্রেরণ করেন। এই সাহায্যকারী বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনে সেনাপতি সায়র ইব্‌ন আবী বকর একদিকে সেভিল অবরোধ করেন এবং অন্যদিকে খ্রিস্টান বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য একজন অধিনায়ক পাঠিয়ে দেন। ঐ অধিনায়ক খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে সায়র ইব্‌ন আবী বকর সেভিল জয় করে মুতামিদকে তার পরিবার-পরিজনসহ বন্দী করে আফ্রিকা পাঠিয়ে দেন। মুতামিদ সেখানে নজরবন্দী অবস্থায় থেকে ৪৮৮ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মার্চ ১০৯৫ খ্রি) মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন কর্তৃক স্পেন দখল

৪৮৫ হিজরীতে (১০৯২ খ্রি.) সমগ্র মুসলিম স্পেন ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের দখলে চলে আসে। তাই স্পেনে সামন্ত শাসনেরও অবসান ঘটে। ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন মুরাবিতীন সম্রাটের ভাইসরয় ও গভর্নর হিসাবে স্পেন শাসন করতে থাকেন। এভাবে যে দেশটি টুকরা টুকরা হয়ে খ্রিস্টানদের দখলে চলে যাবার উপক্রম হয়েছিল, মরক্কোর মুসলমান বাদশাহের দখলে এসে তা রক্ষা পায়। ফলে খ্রিস্টানদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তখনও স্পেনের উত্তরাঞ্চল খ্রিস্টানদের দখলে ছিল। তবে এর সিংহভাগ তথা উর্বর দক্ষিণাঞ্চল মুসলমানদেরই অধিকারে ছিল। ৪৭৯ হিজরীতে (এপ্রিল ১০৮৬-মার্চ '৮৭ খ্রি) বাগদাদের খলীফা মুকতাদী বিআমবিল্লাহ ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনকে 'আমীরুল মুসলিমীন' উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁর জন্য পতাকা ও রাজকীয় পদক উপহার দেন।

ইউসুফ ইব্ন তাশুফীনের মৃত্যু

স্পেনে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার পর আমীরুল মুসলিমীন ইউসুফ ইব্ন তাশুফীন ১৫ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ৫০০ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ১১০৬-আগস্ট ১১০৭ খ্রি) তাঁর মৃত্যু হয়। এই যুগে স্পেনে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছিল। যদিও স্পেনের আরব বংশীয় মুসলমানদের মুরাবিতীনদের শাসনের প্রতি কিছুটা অনীহা ছিল এই কারণে যে, বার্বাররা আরব বংশোদ্ভূতদের উপর শাসন পরিচালনা করুক এটা তারা সহজে মেনে নিতে রাজী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। কেননা বার্বার মুসলমানরা তাদের শাসক না হলে তাদেরকে খ্রিস্টানদেরই দাসত্ব করতে হতো।

আবুল হাসান আলী ইব্ন ইউসুফ ইব্ন তাশুফীন

আমীরুল মুসলিমীন ইউসুফ ইব্ন তাশুফীনের ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র আবুল হাসান আলী ইব্ন ইউসুফ তেত্রিশ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৫০৩ হিজরীতে (১১০৯-১০ খ্রি) আলী ইব্ন ইউসুফ টলেডো ঘেরাও করেন। কিন্তু সুদৃঢ় প্রাচীর ও বিচিত্র ধরনের অবস্থান হেতু দুর্গটি জয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে আলী ইব্ন ইউসুফ ওয়াদিউল হিজারাহ এবং তার পার্শ্ববর্তী বেশির ভাগ শহরই জয় করেন। ঐ বছরই বাশূনা (লাসীন) এবং পর্তুগালের অবশিষ্ট শহরসমূহও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আলী ইব্ন ইউসুফ তাঁর ভাই তামীম ইব্ন ইউসুফকে স্পেনের ভাইসরয় নিয়োগ করেছিলেন। বার্সিলোনার সম্রাট ও রুমেরের পুত্র প্রথম আলফোনসূর যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ শুনে তামীম তার উপর হামলা চালান। ফলে তার অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। তারপর তিনি খ্রিস্টানদের কাছ থেকে সারাকাস্তা ছিনিয়ে নিয়ে মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি করেন। বার্সিলোনার সম্রাট ফ্রান্সের সম্রাটকে তার সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ৫১২ হিজরীতে (মে ১১১৮-এপ্রিল '১৯ খ্রি.) সারাকাস্তা অবরোধ করেন। সমরাস্ত্রের পরিমাণ ও সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে খ্রিস্টান বাহিনী এতই শক্তিশালী ছিল যে, সারাকাস্তার মুসলমানরা তাদের মুকাবিলায় টিকে থাকতে পারেনি। রসদ-সামগ্রীর অভাবের দরুন যখন তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো তখন বাধ্য হয়ে নগরীর দরজা খুলে দেয়। এভাবে সারাকাস্তা খ্রিস্টানদের দখলে চলে যায়। তারপর খ্রিস্টানরা ঐ প্রদেশের অন্যান্য শহর ও দুর্গ জয় করে ফেলে।

আলী ইব্ন ইউসুফের কাছে যখন এই দুঃখজনক সংবাদ পৌছে তখন তিনি ৫১৩ হিজরী (এপ্রিল ১১১৯-মার্চ '২০ খ্রি) স্পেনে আসেন এবং সেভিল ও কর্ডোভা হয়ে সারাকাস্তায় গিয়ে পৌছেন। তারপর তিনি খ্রিস্টানদের উপর হামলা চালিয়ে যে সমস্ত অঞ্চল তারা ইতোমধ্যে দখল করে নিয়েছিল তা মুক্ত করেন। তিনি খ্রিস্টানদের সমুচিত শিক্ষা দেন এবং তাদের কাছ থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার নিয়ে ৫১৫ হিজরীতে (মার্চ ১১২১-ফেব্রুয়ারী ১১২২ খ্রি) মরক্কোয় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু বার্সিলোনার সম্রাট প্রথম আলফোনসূ তখনো জীবিত ছিলেন। ইতোমধ্যে তাকে ইব্ন 'রুমীর' বলে উল্লেখ করা হয়। আলী ইব্ন ইউসুফ স্পেন থেকে মরক্কোয় প্রত্যাবর্তনের সাথে ইব্ন রুমীর মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। তার এই আক্রমণের কারণ ছিল এই যে, গ্রানাডার খ্রিস্টান অধিবাসীরা তাকে লিখেছিল– তুমি গ্রানাডা আক্রমণ করো, আমরা তোমার এই আক্রমণকে ফলপ্রসূ করার আপ্রাণ চেষ্টা করবো। অতএব ইব্ন রুমীর একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে গ্রানাডা পর্যন্ত

পৌছেন। মূলত ইউসুফ ইব্ন তাশুফীন খ্রিস্টানদের বিজয়াকাঙ্ক্ষাকে একেবারে অবদমিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাই তারা মুরাবিতীনদেরকে খুব ভয় করত। কিন্তু স্বয়ং স্পেনের কিছু সংখ্যক মুসলমান অধিবাসী মুরাবিতীনদের সাথে শত্রুতা এবং খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণ করত। ওদের এই হীনমনা আচরণের কারণে খ্রিস্টানদের সাহস এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, তারা সেনাবাহিনী নিয়ে মুরাবিতীনদের মুকাবিলা করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে শুরু করে। ইব্ন রূমীর আক্রমণও ছিল এ পটভূমিতেই। কিন্তু ৫১৫ হিজরীর যিলহজ্জ (ফেব্রুয়ারী ১১২২ খ্রি) মাসে তামীম ইব্ন ইউসুফ ইব্ন তাশুফীনের নেতৃত্বে মুসলমানরা তাকে এমনভাবে পরাজিত করে যে, তিনি তার অর্ধেক সৈন্য ধ্বংস করে বার্সিলোনার দিকে পালিয়ে যান। গ্রানাডা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় অধিকসংখ্যক খ্রিস্টান বসবাস করত এবং তারা সব সময়ই মুসলমানদের বিরোধিতা করত এবং খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহদের পক্ষে নানা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করত। এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর ইব্ন ইউসুফ ৫১৬ হিজরীতে (মার্চ ১১২২-ফেব্রুয়ারী ১১২৩ খ্রি) স্বয়ং স্পেনে আসেন এবং গ্রানাডা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বহু খ্রিস্টানকে আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেন। কিছুসংখ্যক খ্রিস্টানকে স্পেনের অপরাপর অঞ্চলেও স্থানান্তর করা হয়।

৫২০ হিজরীতে (১১২৬ খ্রি.) আবূ তাহির তামীম ইব্ন ইউসুফ তার পুত্র তাশুফীন ইব্ন আলী ইব্ন ইউসুফ ইব্ন তাশুফীনকে স্পেনের ভাইসরয় নিয়োগ করেন। ছত্রিশ বছর সাত মাস মরক্কো ও স্পেনের উপর শাসন পরিচালনা করার পর ৫৩৭ হিজরীর রজব (ফেব্রুয়ারী ১১৪৩ খ্রি) মাসে আলী ইব্ন ইউসুফ ইনতিকাল করেন।

আবূ মুহাম্মাদ তাশুফীন

ইউসুফের ইন্তিকালের পর তার পুত্র আবূ মুহাম্মাদ তাশুফীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৫১৬ হিজরীতে (মার্চ ১১২২-ফেব্রুয়ারী ১১২৩ খ্রি) আলী ইব্ন ইউসুফ শেষ বারের মত স্পেনে এসেছিলেন। তারপর তিনি আর স্পেনে আসতে পারেননি। বরং তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ওরফে মাহ্দী মাওউদ (প্রতিশ্রুতি মাহ্দী)-এর ঝগড়ায় ব্যাপৃত থাকেন। মুসলমানদের এই একটি নতুন শত্রু মরক্কোয় জন্মগ্রহণ করেছিল। তার সম্পর্কে আগামীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সে দিন দিন প্রভাবশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এই পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যে, আলীর পুত্র আবূ মুহাম্মদ তাশুফীনও পিতার পর সিংহাসনে আরোহণ করতেই মরক্কোর অভ্যন্তরীণ ফিতনা-হাঙ্গামায় এমনভাবে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন যে, স্পেনের দিকে লক্ষ্য করার কোন অবকাশই পাননি।

তাশুফীন ইব্ন আলী

৫৩৭ হিজরীতে (১১৪২-৪৩ খ্রি.) তাশুফীন ইব্ন আলী স্পেন থেকে মরক্কোয় গিয়ে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং ইয়াহইয়া ইব্ন আলী ইব্ন গালিয়াহকে স্পেনের ভাইসরয় নিয়োগ করেন। ইয়াহইয়া যথাসম্ভব স্পেনকে রক্ষা করেন এবং খ্রিস্টানদের শক্তি অবদমনে ব্যাপৃত থাকেন। এদিকে দিন দিন মুরাবিতীন সাম্রাজ্যের মধ্যে অধঃপতনের চিহ্ন ফুটে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ৫৩৯ হিজরীর ২৭শে রমযান (মার্চ ১১৪৫ খ্রি.) তাশুফীন ইব্ন আলী আবদুল মু'মিনের কাছে পরাজিত হয়ে অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

ইবরাহীম ইব্ন তাশুফীন

তাশুফীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন তাশুফীন মরক্কোর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এভাবে মুরাবিতীন শাসনের অবসান ঘটে। স্পেনে যখন আবদুল মু'মিনের দুঃসাহসিকতা এবং মুরাবিতীনদের পরাজয়ের সংবাদ এসে পৌঁছে তখন খ্রিস্টানরা পুনরায় অত্যন্ত জোরেশোরে মুসলিম অধিকৃত এলাকাসমূহের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে শুরু করে।

৫২৮ হিজরীতে (১১৩৪ খ্রি.) ইব্ন রূমীর কিছুসংখ্যক শহর দখল করলে ইয়াহইয়া ইব্ন আলী তার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ান এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ইব্ন রূমীরকে হত্যা করেন। এভাবে তিনি পুনরায় ইসলামী সাম্রাজ্যের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

স্পেনের উপর মুরাবিতীন সাম্রাজ্যের পতনের প্রতিক্রিয়া

মুরাবিতীন সাম্রাজ্য ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার সংবাদ শুনে স্পেনের শাসকরা এখানে সেখানে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। খিলাফতে বনূ উমাইয়া ধ্বংস হওয়ার পর যেমন স্পেনে বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল ঠিক তেমনি মুরাবিতীন সাম্রাজ্যের পতনের পরও স্পেনের প্রত্যেকটি শহর এবং প্রত্যেকটি দুর্গের শাসনকর্তা বা অধিপতিরা নিজ নিজ এলাকার স্বাধীন শাসকে পরিণত হন– এবং দেশব্যাপী প্রচুর স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। বলতে গেলে প্রতিটি শহর এবং প্রতিটি জনবসতি এক একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয় এবং সেখানকার শাসকরা আপন আপন মর্জিমাফিক বিভিন্ন উপাধিও গ্রহণ করেন। আর সবচেয়ে আক্ষেপের ব্যাপার হলো, তারা একে অন্য থেকে শুধু পৃথক হয়ে যাননি বরং একে অন্যের কট্টর শত্রু হয়ে দাঁড়ান। ফলে সমগ্র স্পেনে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। খ্রিস্টানদের জন্য এটাই ছিল সমগ্র স্পেন দখল করার একটি মোক্ষম মুহূর্ত। স্পেনের ভাইসরয় খোদ ইয়াহইয়া ইব্ন আলীও কর্ডোভা দখল করে নিজেকে স্বাধীন রাজাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তাই স্বাভাবিকভাবে তিনিও অন্য রাজাদের চাইতে শক্তিশালী ছিলেন না। এই অবস্থায় মুওয়াহহিদীন নেতা আবদুল মু'মিন মুরাবিতীন সেনাপতিকে স্পেনের দিকে প্রেরণ করেন এবং ৫৪২ হিজরীতে (১১৪৭-৪৮ খ্রি) স্পেনের উপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর স্বাধীন রাজ্যসমূহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং স্পেন ধীরে ধীরে মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

মুরাবিতীনদের শাসনামলে ফকীহ্দের খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। ইউসুফ এবং আলী উভয়েই মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁরা ফকীহ্দেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও বিদ্যানুরাগী শাসক। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তাঁদের বাড়াবাড়ি এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, তাঁরা দর্শন ও ইল্মে কালামের কট্টর শত্রু হয়ে দাঁড়ান। কাযী আয়ায ইমাম গায্যালীর বিরুদ্ধে শাহী দরবারে এমনভাবে অভিযোগ পেশ করেন, যার ফলে শাহী দরবার থেকে সঙ্গে সঙ্গে এই মর্মে এক নির্দেশ জারি করা হয় যে, এখন থেকে যার কাছেই ইমাম গায্যালীর লেখা কোন পুস্তক-পুস্তিকা পাওয়া যাবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে।

নবম অধ্যায়

স্পেনে মুওয়াহ্হিদীন শাসন

মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তুমার্ত

মুহাম্মাদ ইব্ন আবুদল্লাহ্ ইব্ন তুমার্ত, যিনি ইব্ন তুমার্ত নামে বিখ্যাত ছিলেন, মরক্কোর সূস এলাকার একটি পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বার্বার গোত্র 'মাসমূদাহ'-এর লোক ছিলেন। তবে পরবর্তীকালে তিনি দাবি করেন যে, তিনি আলী ইব্ন আবী তালিবের বংশধর। তিনি হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবী তালিব পর্যন্ত তাঁর একটি বংশ তালিকাও তৈরি করেন।

৫০১ হিজরীতে (আগস্ট ১১০৭-জুলাই ১১০৮ খ্রি) ইব্ন তুমার্ত আপন জন্মভূমি সূস থেকে প্রাচ্যের দেশসমূহে চলে যান এবং বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে চৌদ্দবছর পর্যন্ত দেশের বাইরে অবস্থান করেন। তিনি আবূ বকর শাশীর কাছ থেকে উসূলে ফিকাহ ও ধর্মীয় বিষয় এবং মুবারক ইব্ন আবদুল জব্বার ও অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীর কাছ থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন।

ইমাম গায্যালী (র)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

ইব্ন তুমার্ত হযরত ইমাম গায্যালীর সান্নিধ্য লাভেও ধন্য হন। ইব্ন তুমার্ত ইমাম গায্যালীর খিদমতে উপস্থিত ছিলেন এমন সময়ে একদা জনৈক ব্যক্তি ইমাম গায্যালীর কাছে নিবেদন করে— মরক্কো ও স্পেনের শাসক আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন ইউসুফ ইব্ন তাশুফীন আপনার কিতাবসমূহ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন ইমাম গায্যালী বলেন, তার সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমার ধরণা এই ধ্বংসকার্য যে ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হবে তিনি এখন আমার এই মজলিসে উপস্থিত রয়েছেন। ইমাম গায্যালী এই কথা বলার সময় ইব্ন তুমার্তের দিকে ইঙ্গিত করেন। সেই দিন থেকেই ইব্ন তুমার্তের অন্তরে এই ইচ্ছা জন্ম নিল যে, তিনি মুরাবিতীনদের ঐ সাম্রাজ্য ধ্বংস করবেন, যারা গোঁড়ামির অনুসারী এবং ঔদার্যের শত্রু। তিনি তখনি তাঁর জন্মভূমির উদ্দেশে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ায় তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন এবং সেখানেও ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় প্রতিরোধের কাজ চালিয়ে যান। এই অপরাধে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক তাঁকে শহর থেকে বের করে দেন। মোটকথা ইব্ন তুমার্তের এই গুণটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি জনসাধারণকে সত্যের উপদেশ এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে সব সময়ই ছিলেন আপোসহীন। তিনি ইবাদতগুযার, সংসারবিমুখ ও একজন আল্লাহওয়ালা লোক ছিলেন। ইব্ন তুমার্তের আকীদা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি আশাইরা, মুতাকাল্লিমীন এবং

ইমামিয়াদের মিলন ক্ষেত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ আল্লাহভীরু ও মুত্তাকী পরহিযগার ব্যক্তি। তাঁর পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল। তাঁকে সব সময়ই প্রফুল্ল দেখা যেত। তিনি ছিলেন রিয়াযত ও সাধনার প্রতি অনুরাগী। ইব্ন তুমার্ত অলংকার সমৃদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতেন। মরক্কোর ভাষা ছিল তাঁর মাতৃভাষা। ৫১৫ হিজরীতে (এপ্রিল ১১২১-মার্চ '২২ খ্রি) তিনি তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন এবং জনসাধারণকে ওয়ায-নসীহত করতে থাকেন।

ইব্ন তুমার্তের বিশিষ্ট শিষ্য আবদুল মু'মিন

ঐ সময়ে বার্বার গোত্রের আবদুল মু'মিন নামীয় জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে এবং তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র ও শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাভাবিক আচার-আচরণ এবং ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে ইব্ন তুমার্তের সাথে আবদুল মু'মিনের অপূর্ব মিল ছিল। ধীরে ধীরে প্রচুর সংখ্যক লোক ইব্ন তুমার্তের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমীরুল মু'মিনীনের ফকীহরা ইব্ন তুমার্তকে হত্যা করার জন্য তাকে পরামর্শ দেন। কিন্তু আলী ইব্ন ইউসুফ উত্তরে বলেন,আমি তো তাঁকে হত্যা করার কোন কারণ দেখি না। শেষ পর্যন্ত ফকীহদের চাপ সৃষ্টির ফলে আবদুল মু'মিনকে মরক্কো শহর থেকে বের করে দেওয়া হয়। ইব্ন তুমার্ত তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে এটলাস পর্বতমালার একটি পল্লীতে অবস্থান করতে থাকেন। সেখানে বার্বার গোত্রের লোকেরা দলে দলে তাঁর জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।

ইব্ন তুমার্তের মাহ্দী হওয়ার দাবি

কিছুদিন পর ইব্ন তুমার্ত নিজেকে প্রতিশ্রুত মাহ্দী বলে দাবি করেন এবং আপন শিষ্যদের মধ্যে স্তর বিন্যাস করেন। তিনি প্রথম স্তরের লোকদেরকে 'মুহাজিরীন' এবং দ্বিতীয় স্তরের লোকদেরকে 'মু'মিনীন' উপাধি দেন। এভাবে তিনি তাঁর শিষ্যদের সাত কিংবা আটটি স্তরে বিভক্ত করেন। যখন দল ভারী হলো তখন তিনি আবদুল মু'মিনকে সেনাপতি নিয়োগ করে মুরাবিতীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করেন। প্রথম সংঘর্ষে মু'মিনীনের দল পরাজিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালেও তারা শক্তি পরীক্ষার ধারা অব্যাহত রাখে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, মরক্কোর একটি অংশ ইব্ন তুমার্তের দখলে চলে আসে। ইব্ন তুমার্ত ৫১৭ হিজরীতে (মার্চ ১১২৩-ফেব্রুয়ারী '২৪ খ্রি) যুদ্ধাভিযান শুরু করেছিলেন। সাত বছর যুদ্ধ পরিচালনার পর তিনি ৫২৪ হিজরীতে (১১৩০ খ্রি.) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে আবদুল মু'মিনকে আমীরুল মু'মিনীন উপাধি দিয়ে আপন অলীআহদ ও স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। এটা ছিল সেই যুগ, যখন মুরাবিতীনের মুকাবিলায় ইব্ন তুমার্তের হুকুমত বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

আবদুল মু'মিন

আবদুল মু'মিনের পিতার নাম ছিল আলী। আলী ছিলেন মাসমূদাহ গোত্রসমূহের অন্তর্গত কুমিয়াহ গোত্রের অধঃস্তন পুরুষ। আবদুল মু'মিন ৪৮৭ হিজরীতে (১০৯৪ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন। ৫৩৭ হিজরীতে (১১৪২-৪৩ খ্রি) আলী ইব্ন ইউসুফ ইব্ন তাশুফীনের মৃত্যু হলে আবদুল মু'মিনের হুকুমত পুরোপুরিভাবে সমগ্র মরক্কোয় স্বীকৃতি লাভ করে। যেহেতু ইব্ন

তুমার্‌তের শিক্ষার সারকথা ছিল পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র তাওহীদকে স্বীকার করা এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে তাঁর সত্তা থেকে পৃথক জ্ঞান না করা– তাই সমগ্র শিষ্যকে সাধারণভাবে মুওয়াহহিদীন (একাত্ববাদী) নামে অভিহিত করা হতো।

আবদুল মু'মিন কর্তৃক স্পেন দখলের বিশদ বিবরণ

মরক্কোর শাসন ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে করায়ত্ত করার পর ৫৩৬ হিজরীতে (১১৪১-৪২ খ্রি) আবদুল মু'মিন, আবূ ইমরান মূসা ইব্‌ন সাঈদ নামীয় তাঁর এক অধিনায়ককে স্পেনের দিকে প্রেরণ করেন। তিনি সর্ব প্রথম 'তারীফ' দ্বীপ দখল করেন। ৫৪১ হিজরীতে (১১৪৬-৪৭ খ্রি) স্বয়ং আবদুল মু'মিন স্পেনে আগমনের সংকল্প নেন। কিন্তু ঠিক রওয়ানা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মরক্কোর পূর্ব সীমান্তে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার সংবাদ শুনে যাত্রা বিরতি করেন। অবশ্য তাঁর পুত্রদেরকে তিনি স্পেন অভিমুখে রওয়ানা করান। আবূ সাঈদ ইব্‌ন আবদুল মু'মিন আসসীরাহ জয় করেছিলেন। ৫৪৫ হিজরীতে (মে ১১৫০-এপ্রিল ১১৫১ খ্রি) যখন খ্রিস্টানরা কর্ডোভা অবরোধ করে রেখেছিল তখন আবদুল মু'মিনের জনৈক অধিনায়ক ইয়াহইয়া ইব্‌ন মায়মূন খ্রিস্টানদের তাড়িয়ে দিয়ে তা জয় করে নিয়েছিলেন। ৫৪৮ হিজরীতে (এপ্রিল ১১৫৩-৫৪ খ্রি) আবদুল মু'মিন জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে এসে উপনীত হন এবং স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে একটি শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। শহরটির নামকরণ করা হয় আল-ফতেহ্‌। সেখানে স্পেনের সকল শাসক এবং অধিনায়করা আবদুল মু'মিনের খিদমতে এসে হাযির হয় এবং তার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের প্রতিশ্রুতি দেয়। এভাবে সমগ্র মুসলিম স্পেন পুনরায় একটি একক সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

৫৫৫ হিজরীতে (১১৬০ খ্রি.) আবদুল মু'মিন তাঁর পুত্র আবূ সাঈদকে গ্রানাডার শাসক এবং সমগ্র মুসলিম স্পেনের ভাইসরয় নিয়োগ করেন। ৫৫৬ হিজরীতে (১১৬১ খ্রি.) আবূ সাঈদকে পিতার কাছে মরক্কোয় চলে যেতে হয়। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে ইবরাহীম নামীয় জনৈক ব্যক্তি গ্রানাডা দখল করে নেয় এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই সংবাদ শুনে আবূ সাঈদ আপন ভাই আবূ হিফসসহ স্পেনে আগমন করেন। ইবরাহীম গ্রানাডা থেকে বের হয়ে আবূ সাঈদের মুকাবিলা করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আবূ হিফস নিহত হন এবং আবূ সাঈদ পরাজিত হয়ে মালাগায় গিয়ে অবস্থান নেন। ইবরাহীমের জামাতা মারদীনশ মুর্সিয়া ও জিয়ানের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ইবরাহীমের পক্ষাবলম্বন করেন। ফলে সমগ্র স্পেন সাম্রাজ্যে পুনরায় অব্যবস্থা ও অশান্তি দেখা দেয়। ৫৫৭ হিজরীতে (১১৬২ খ্রি) আবদুল মু'মিন তাঁর তৃতীয় পুত্র আবূ ইয়াকূব এবং সামরিক অধিনায়ক শায়খ আবূ ইউসুফ ইব্‌ন সুলায়মানকে আবূ সাঈদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। এ দিকে আবূ সাঈদও মালাগায় যথেষ্ট সংখ্যক সৈন সংগ্রহ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত গ্রানাডার সন্নিকটে পুনরায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মুওয়াহহিদীন বাহিনী জয়লাভ করে। মারদীনশ জিয়ানের দিকে পালিয়ে যান। ইবরাহীম ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়। এই বিদ্রোহ দমনের পর আবদুল মু'মিনের জন্য দুশ্চিন্তার আর কোন কারণ বাকি ছিল না। এবার তিনি আফ্রিকা ও স্পেনে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। মরক্কোয় তিন লক্ষ সৈন্য আবদুল মু'মিনের পতাকা তলে সমবেত হয় এবং স্পেনে প্রায় দু' লক্ষ মুসলমান জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আবদুল মু'মিন এই পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিয়ে স্পেনের উত্তর

সীমান্তের খ্রিস্টান রাজ্যসমূহ জয় করে তারপর সমগ্র ইউরোপকে পদানত করার সংকল্প নেন। আবদুল মু'মিনের আয়ু তাঁর অনুকূলে থাকলে তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে এই জিহাদে অবশ্যই সাফল্য লাভ করতেন। কিন্তু তিনি তার এই বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে ৫৫৮ হিজরীতে (১১৬৩ খ্রি.) শেষ জুমুআর দিন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবূ ইয়াকূব

আবদুল মু'মিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবূ ইয়াকূব ইউসুফ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবদুল মু'মিন তাঁর যে অভিযানটি বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছিলেন কোন কোন অভ্যন্তরীণ জটিলতার কারণে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এদিকে জিয়ান ও মার্সিয়ার শাসনকর্তা মারদীনশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে খ্রিস্টানদের হাতকে মজবুত করেন। আবূ ইয়াকূব মরক্কো থেকে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে স্পেন অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেভিলে আসার পরই মার্সিয়া ও জিয়ানের শাসক মারদীনশ মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পুত্ররা এসে তাদের পিতার সমগ্র এলাকা আবূ ইয়াকূব ইউসুফের হাতে অর্পণ করে। তারা আবূ ইয়াকূবের আনুগত্য এবং বশ্যতাও স্বীকার করে।

আবূ ইয়াকূব ইউসুফও তাদের সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন এবং তাদেরকেই তাদের পিতার অধিকৃত এলাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তারপর আবূ ইয়াকূব পশ্চিমাঞ্চলীয় খ্রিস্টানদের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং যে সমস্ত মুসলিম এলাকা তারা ইতোমধ্যে দখল করে নিয়েছিল তা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনেন। এরপর তিনি টলেডো অবরোধ করেন। কিন্তু কিছুদিন পর অনিবার্য কারণবশত অবরোধ উঠিয়ে মরক্কোয় চলে যান। ৫৮০ হিজরীতে (এপ্রিল ১১৮৪-মার্চ ১১৮৫ খ্রি) শান্তারীন শহরের খ্রিস্টানরা পুনরায় বিদ্রোহ করে। আমীরুল মু'মিনীন আবূ ইয়াকূব ইউসুফ স্পেনে এসে শান্তারীন অবরোধ করেন। এই অবস্থায় এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমীরুল মু'মিনীন ইউসুফ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৫৮০ হিজরীর ৭ই রজব (অক্টোবর ১১৮৪ খ্রি) শনিবার দিন ইনতিকাল করেন। তাঁর মরদেহ প্রথমে সেভিলে তারপর সেখান থেকে মরক্কোয় নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয়।

আবূ ইয়াকূবের শাসনকাল সম্পর্কে পর্যালোচনা

আবূ ইয়াকূবের পর তাঁর পুত্র আবূ ইউসুফ 'মানসূর বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবূ ইয়াকূব ছিলেন অত্যন্ত পুণ্যবান, জ্ঞানানুরাগী এবং উদারচিত্ত। আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন তুফায়ল, যাঁকে দর্শন ও ইল্‌মে কালামের ইমাম মনে করা হতো, আবূ ইয়াকূবের সভাসদ ও বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। অনুরূপ মর্যাদাসম্পন্ন আলিম আবূ বকর ইব্‌ন সানি, ওরফে ইব্‌ন মাজাহও ছিলেন আবূ ইয়াকূবের উপদেষ্টাদের অন্যতম। এছাড়াও আরো অনেক বড় বড় আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তি আবূ ইয়াকূবের দরবারকে অলংকৃত করতেন। আবূ তুফায়লের পরামর্শে আমীরুল মু'মিনীন আবূ ইয়াকূব আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুশদকে কর্ডোভা থেকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সভাসদ নিয়োগ করেন। ইনি হচ্ছেন সেই ইব্‌ন রুশদ, যিনি ছিলেন দর্শনের প্রখ্যাত ইমাম এবং এরিস্টটলের রচনাসমূহের সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক ও নিখুঁত পর্যালোচনাকারী। এখনো সমগ্র বিশ্বে ইব্‌ন রুশদ

একটি অতি পরিচিত নাম। আবূ ইয়াকূবের শাসনকালে মরক্কো থেকে ত্রিপোলী পর্যন্ত আফ্রিকার দেশসমূহ, সমগ্র স্পেন ভূখণ্ড, সিসিলী দ্বীপ এবং রোম সাগরের অন্যান্য দ্বীপ মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। মুওয়াহহিদীন সুলতান তখন বিশ্বের বিখ্যাত সুলতানদের মধ্যে পরিগণিত হতেন।

আবূ ইউসুফ মানসূর

আবূ ইয়াকূবের পর তাঁর পুত্র আবূ ইউসুফ মানসূর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩২ বছর। তিনি সাহিরাহ নামীয় জনৈক খ্রিস্টান মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মানসূরের শাসনামলে মুসলমানরা স্পেনের সর্বত্রই অত্যন্ত সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিল। মানসূর সব দিক দিয়েই তাঁর পিতার মত ছিলেন। তিনি উলামা ও পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। বইপত্রের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল অসাধারণ। যেভাবে ইয়াকূব কখনো স্পেনে, আবার কখনো মরক্কো থাকতেন, মানসূরও তেমনি উভয় জায়গায়ই থাকতেন তবে তিনি তাঁর শাসনামলের বেশির ভাগ সময় স্পেনেই অতিবাহিত করেন। ৫৮৫ হিজরীতে (১১৮৯ খ্রি.) মানসূর স্পেনের পশ্চিমাঞ্চল থেকে খ্রিস্টানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি মুছে ফেলেন। টলেডোর সম্রাট দ্বিতীয় আলফোনসূ মানসূরের সাথে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এটা হচ্ছে সেই যুগ যখন খ্রিস্টানরা ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ থেকে জোট বেঁধে এসে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন আক্রমণ করছিল। টলেডোর সম্রাট দ্বিতীয় আলফোনসূ এই আশঙ্কায় যে, মানসূর তার নাম-নিশানা মুছে ফেলবেন, তাঁর (মানসূরের সাথে) কাছে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের আবেদন জানান, যাতে করে এই সময়কালের মধ্যে ক্রুসেড যোদ্ধারা তাদের যুদ্ধ শেষ করে তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। কেননা স্বয়ং স্পেনেরও অনেক খ্রিস্টান সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের ক্রুসেড যুদ্ধে তখন অংশগ্রহণ করছিল।

মানসূরের নৌশক্তিও ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। এ জন্য সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী মানসূরের কাছে আব্দুর রহমান ইব্ন মুনকিদ নামীয় উচ্চপর্যায়ের একজন কবিকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। দূতের সাথে প্রেরিত একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন– খ্রিস্টানবাহিনী ফিলিস্তীন আক্রমণ করেছে। এ সময় যদি আপনি আপনার যুদ্ধ জাহাজসমূহ মুসলমানদের সাহায্যার্থে পাঠান এবং ফিলিস্তীন উপকূল রক্ষার্থে সাহায্য করেন, তাহলে অতি সহজেই খ্রিস্টান বাহিনীকে পরাজিত করা যেতে পারে। ঐ চিঠিতে সুলতান সালাহউদ্দীন মানসূরকে আমীরুল মু'মিনীন উপাধিতে সম্বোধন করেননি। কেননা সুলতান সালাহউদ্দীন শুধু বাগদাদের খলীফাকেই খলীফাতুল মুসলিমীন বলে মনে করতেন। যা হোক এতে মানসূর কিছুটা অসন্তুষ্ট হন। অবশ্য ইব্ন মুনকিদকে তিনি বেশ আদর-আপ্যায়ন করেন এবং একটি কাসীদার বদলে তাকে চল্লিশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দেন। কিন্তু সুলতান সালাহউদ্দীন তাঁর কাছে যে সাহায্য চেয়েছিলেন সে ব্যাপারে তিনি খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। টলেডোর সম্রাট দ্বিতীয় আলফোনসূ পঞ্চবার্ষিকী চুক্তির মেয়াদকালে মুসলমানদের আক্রমণ থেকে একেবারে নিশ্চিত ছিলেন। কেননা তিনি এ কথা ভালভাবেই জানতেন যে, মুসলমানরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কখনো আক্রমণ করবে না। এই অবসর সময়ে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অন্যান্য খ্রিস্টান রাজাকেও তার জন্য অনুপ্রাণিত

করেন এবং নিজের এই রণপ্রস্তুতিকে ক্রুসেড যুদ্ধের ন্যায় ধর্মযুদ্ধ আখ্যা দিয়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহায়তা লাভ করেন। সন্ধি চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে পর ৫৯১ হিজরীর রজব (জুন ১২৯৫ খ্রি) মাসে তিনি কয়েকজন খ্রিস্টান রাজা এবং তাদের সেনাবাহিনীসহ বাতলিউস এলাকার মালার নামক স্থানে এসে পৌঁছেন। এদিকে মানসূরও তার সাথে মুকাবিলা করার জন্য সেখানে গিয়ে পৌঁছান। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। খ্রিস্টান বাহিনীর এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার লোক নিহত এবং ৩০ হাজার লোক বন্দী হয়। বাকিরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা পায়। এটা ছিল মুসলমানদের একটা বিরাট বিজয় যা মানসূরের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল। এতে ঈসায়ীরা অত্যন্ত নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে মুসলমানরা গনীমত হিসাবে লাভ করে দেড় লক্ষ তাঁবু, ৮০ হাজার ঘোড়া, এক লক্ষ খচ্চর, চার লক্ষ ভারবাহী গাধা এবং ৬০ হাজার বিভিন্ন ধরনের বর্ম ও যুদ্ধ সামগ্রী। খ্রিস্টানদের এবারকার যুদ্ধ প্রস্তুতি কত বিরাট ও কত পরিপূর্ণ ছিল উপরিউক্ত গনীমত সামগ্রী থেকে তা অনায়াসে অনুমান করা যায়। মানসূর যাবতীয় মালে গনীমত, যার মধ্যে অনেক সোনাদানা ও হীরা-জহরত ছিল; তার সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

দ্বিতীয় আলফোনস্ এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে অবশিষ্ট সৈন্যসহ 'রিবাহ' দুর্গে আশ্রয় নেন। মানসূর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ঐ দুর্গ অবরোধ করেন। আলফোনস্ সেখান থেকে পালিয়ে টলেডোয় আসেন এবং ঐ লজ্জাকর পরাজয়ের গ্লানিতে তার চুল-দাড়ি কামিয়ে ফেলেন এবং (ক্রুশ) উঠিয়ে শপথ নেন যতদিন আমি এই লক্ষ লক্ষ নিহত খ্রিস্টানের হত্যার বদলা না নেব ততদিন নিজের আয়েশ-আরামকে হারাম বলেই মনে করব। মানসূর যখন জানতে পারেন যে, আলফোনস্ যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন তিনি অবিলম্বে টলেডো আক্রমণ করেন। তিনি শহর অবরোধ করে দুর্গ ধ্বংসী কামানের সাহায্যে শহর প্রাচীর এবং দুর্গকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেন। যখন শহর এবং আলফোনস্ উভয়ই মানসূরের কবজায় আসার উপক্রম হলো ঠিক তখনি দ্বিতীয় আলফোনস্ নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও বীরত্বের যে যে খেলা দেখান তা হলো তিনি তার মাতা-পিতা এবং স্ত্রী-কন্যাকে মানসূরের কাছে প্রেরণ করেন। ঐ স্ত্রী লোকেরা খালি মাথা ও খালি পায়ে ক্রন্দন করতে করতে মানসূরের সামনে এসে হাযির হয়। আলফোনসূর মাতা আপন পুত্রের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করতে গিয়ে এমন ভাবে কাঁদতে শুরু করেন যে, মানসূর সে করুণ দৃশ্য সহ্য করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত অশ্রুই রক্তের উপর জয়লাভ করে এবং করুণা পরাজিত করে ক্রোধকে। মানসূর আল-ফোনসূকে শুধু মার্জনাই করেননি বরং তার মা, স্ত্রী ও কন্যাদের সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন এবং বহু মূল্যবান অলংকারাদি এবং নানা ধরনের উপহার-উপঢৌকনসহ অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদেরকে শহরের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেন। তারপর সেই মুহূর্তেই তিনি টলেডো থেকে কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। মানসূর সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার পর আলফোনস্ তার আনুগত্যের অঙ্গীকার চুক্তি সম্পাদনের জন্য একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, যারা কর্ডোভার দরবারে এসে হাযির হয়। মানসূরের কাছে যে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বন্দী খ্রিস্টান ছিল তিনি তাদেরকে মরক্কোয় পাঠিয়ে দেন এবং সেখানে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। মানসূর অত্যন্ত পুণ্যবান, আবিদ, যাহিদ ও সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন। তাঁর নির্দেশে জাহরী নামাযসমূহে (যে নামাযসমূহে কিরাত উচ্চকণ্ঠে পড়া হয়) ইমামগণ 'আলহামদু'-এর পূর্বে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমও উচ্চকণ্ঠে পড়তেন। আবুল ওয়ালীদ

ইব্‌ন রুশদ ৫৯৪ হিজরীর (১১৯৮ খ্রি.) শেষ দিকে মানসূরের শাসনামলে ইনতিকাল করেন। ৫৯৫ হিজরীর সফর (ডিসেম্বর ১১৯৮ খ্রি) মাসে আনুমানিক ১৫ বছর রাজ্য শাসন করার পর মানসূরের মৃত্যু হয়। ঐ বছরই ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড মৃত্যুবরণ করেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ

মানসূরের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ৫৯৫ হিজরীর সফর (ডিসেম্বর ১১৯৮ খ্রি) মাসে ১৭ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজের জন্য 'নাসির লিদীনিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। সম্রাট নাসিরের শাসনামলে মরক্কোর পূর্বাঞ্চলের দেশসমূহে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং মুরাবিতীন সাম্রাজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সৈন্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন দেশ দখল করতে শুরু করে। নাসির এই বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য মরক্কোয় অবস্থান করতে থাকেন। ঐ দিকে সুলতান সালাহউদ্দীনের কাছে সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের রণক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে যে সব খ্রিস্টান সৈন্য ইউরোপের দেশসমূহে ফিরে এসেছিল তারা সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের পরাজয়ের প্রতিশোধ স্পেন ও মরক্কোর ইসলামী সাম্রাজ্যের উপর থেকে গ্রহণ করতে চায়।

ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ থেকে খ্রিস্টান যোদ্ধারা বার্সিলোনা, ক্যাটালনিয়া, লিওন প্রভৃতি রাজ্যের খ্রিস্টান রাজাদের কাছে সমবেত হতে থাকে। রোমের পোপ মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ঐ সময়ে ইংল্যান্ডের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সামন্ত রাজারা সেখানকার সম্রাট জনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। পোপ তৃতীয় অ্যানুসেন্ট সম্রাট জনকে খ্রিস্ট ধর্ম থেকে খারিজ বলে ঘোষণা করেন। তখন জন তাঁহার তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল নাসির লিদীনিল্লাহ-এর কাছে মরক্কো প্রেরণ করেন। ঐ প্রতিনিধি দলে ছিলেন টমাস, হাডিংটন, র‍্যালফ ফ্রাংকোলিস এবং লন্ডনের পাদ্রী রবার্ট। প্রতিনিধি দলটি ৬০৬ হিজরীতে (১২০৯-১০ খ্রি) মরক্কোয় পৌঁছে। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বৈঠকখানা ও দেউড়ীসমূহ অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে থাকে। তখন দুই দিকে রাজকীয় ভৃত্যরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারা নাসির লিদীনিল্লাহর সম্মুখে গিয়ে হাযির হয়। ঐ সময় নাসির অধ্যয়নরত ছিলেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ইংল্যান্ডের সম্রাটের পত্র পেশ করে। ঐ পত্রে সম্রাট লিখেছিলেন– আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমার দেশের বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ করুন। তিনি এও লিখেছিলেন– আমি খ্রিস্ট ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত রয়েছি। পাদ্রী রবার্ট ঐ প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন। তিনি আমীর নাসিরের সাথে যেভাবে কথাবার্তা বলেন, তাতে আমীর নাসিরের এই সন্দেহ হয় যে, এই সমস্ত লোক পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য উৎকোচ হিসাবে ধর্ম পরিবর্তনের লোভ দেখাচ্ছে। এ কারণে তিনি এই প্রতিনিধি দলকে খুব একটা মর্যাদা দেন নি, বরং বাহ্যিকভাবে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করে তাদেরকে বিদায় দেন। তবে পরবর্তী সময়ে এই অপেক্ষায় ছিলেন যে, ইংল্যান্ডের সম্রাট যদি ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে নেয় তাহলে সে নিশ্চয়ই আমার এই অন্যমনস্কতা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করবে এবং ঠিক তখনি তাঁর সাহায্যের জন্য সামরিক নৌবহর প্রেরণ করা হবে।

আমীর নাসির অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতি তার কোন ঝোঁক ছিল না। আমীর নাসিরের এই অন্যমনস্কতার কারণেই যে সেনাবাহিনী তার পিতার যুগে অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিদ্যোৎসাহী ছিল, তার অধিনায়করা তাঁর (নাসিরের) প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে থাকে। তাছাড়া প্রাক্তন আমীরের শাসনামলে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈন্য তার নির্দিষ্ট বেতন ও ভাতা ছাড়াও প্রতি তিন মাস অন্তর বাদশাহর পক্ষ থেকে যে সব পুরস্কার পেত আমীর নাসির তাও বন্ধ করে দেন। ফলে সাধারণ সৈন্যরাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। ৬০৮ হিজরীতে (১২১১-১২ খ্রি.) আমীর নাসির আফ্রিকা অভিযান শেষ করে স্পেনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। অপর দিকে টলেডোয় কাস্টাইল সম্রাট আলফোনসূর চতুর্দিকে ইউরোপের প্রত্যেকটি রাজ্য এবং প্রত্যেকটি অঞ্চল থেকে খ্রিস্টানরা দলে দলে এসে সমবেত হচ্ছিল। অন্য কথায় বলা যায়, মুসলমানদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের রাজন্যবর্গের যাবতীয় সামরিক ক্ষমতা ও যুদ্ধসামগ্রী তখন স্পেন ইউরোপে এসে সংগৃহীত হয়েছিল। সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের অনুপাতে স্পেন ছিল ইউরোপের অধিক নিকটে এবং স্পেনের সমতল ভূমি পর্যন্ত খ্রিস্টান রাজ্যসমূহের সীমান্ত বিস্তৃত ছিল। এ কারণেই মধ্য স্পেনের খ্রিস্টান শক্তির এই বৃহৎ সমাবেশ সম্ভব হয়েছিল।

নাসির লিদীনিল্লাহ্ খ্রিস্টানদের এই বিরাট প্রস্তুতি এবং ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার এই সংবাদ শুনে মরক্কো ও স্পেন থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং জিহাদের ঘোষণা প্রদান করেন। ফলে প্রায় ছয় লক্ষ সৈন্যের একটি সুবিন্যস্ত বাহিনী সেভিলে এসে সমবেত হয়। এই বাহিনী নিয়ে আমীর নাসির জিয়ান শহরের দিকে রওয়ানা হন।

অপরদিকে আলফোনসূ তার বিরাট বাহিনী নিয়ে সালিম শহরের নিকটবর্তী আল-ইকাব নামক স্থানে এসে তাঁবু স্থাপন করেন। তখন মুসলিম বাহিনীও জিয়ান শহর থেকে চলে আসে। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের উপর থেকে সিরিয়া ও অন্যান্য স্থানের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একেবারে পাগলপারা হয়ে উঠেছিল। অপরদিকে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা ছিল এর বিপরীত। নিয়মিত বাহিনীর সৈন্যরা, যারা সুষ্ঠুভাবে শত্রুর মুকাবিলা করার যোগ্যতা রাখত, তারা ছিল তাদের অধিনায়কদের প্রতি অসন্তুষ্ট। কেননা বেশ কয়েক মাস যাবৎ তারা কোন বেতন পায় নি। এই অবস্থা এবং আরো কিছু অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড দেখে পরিষ্কার মনে হচ্ছিল, মুসলিম বাহিনীর অধিনায়করা তাদেরই বাদশাহর পরাজয় কামনা করছে। কেননা যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন কোন কোন অধিনায়ক তাদের অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে পৃথক হয়ে গেল। কোন কোন অধিনায়ক এবং তাদের অধীনস্থ সৈন্যরা শত্রুদের বক্ষ লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপের পরিবর্তে তা মাটিতে গেড়ে রাখল এবং নিজেদের তরবারিসমূহও শত্রুদের দিকে ছুঁড়ে মারল। এছাড়া তারা আরো অনেক হাস্যকর আচরণ শুরু করে দিল। তারা আমীর নাসিরের নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল। একটি নিয়মিত বিরাট বাহিনীর এই অকল্পনীয় অশিষ্ট আচরণ প্রত্যক্ষ করে যারা মুজাহিদ তারাও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। আমীর নাসিরের কার্পণ্যের এই ভয়ংকর পরিণাম এবং মরক্কোর বার্বার বাহিনীর এই বিশ্বাসঘাতকতা ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বনাশ সাধন করল। স্পেনের কোন যুদ্ধক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের এরূপ বিশাল বাহিনীর সমাবেশ ঘটেনি। ঠিক যুদ্ধের মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীর

একটি বিরাট অংশ যদি এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা না করত তাহলে ইউরোপের মিত্র বাহিনী নিঃসন্দেহে মুসলমানদের হাতে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হতো এবং পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের দুঃসাহস পেত না। কেননা সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের যুদ্ধে ইতোপূর্বে তাদের যে পরিণাম হয়েছিল তার চাইতে ভয়াবহ পরিণাম হতো স্পেনের এই যুদ্ধে। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, এখানে ছয় লক্ষ মুসলিম বাহিনীর এমন দুঃখজনক পরিণাম হলো যে, তারা তাদের আমীরের নির্দেশ অমান্য করে সকলেই খ্রিস্টানদের হাতে নিহত হলো। আমীর নাসির তরবারি চালনায় মোটেই অবহেলা করেননি। অধিকাংশ মুজাহিদও তার সাথে আপ্রাণ যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত ছয় লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র এক হাজার লোক প্রাণে রক্ষা পায় এবং তারাই কোন মতে আমীর নাসিরকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। বাকি সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে লড়তে লড়তে শাহাদাতবরণ করে, নয়ত খ্রিস্টানদের হাতে বন্দী হয়। বন্দীরা আশা করেছিল যে, তাদেরকে ছাড়িয়ে আনা হবে। কিন্তু খ্রিস্টানরা এই যুদ্ধ ক্ষেত্রেই তাদের সবাইকে যবাই করে ফেলে। ৬০৯ হিজরীতে (১২১২-১৩ খ্রি.) এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আমীর নাসির পরাজিত হয়ে সেভিলে ফিরে এলেন। অপর দিকে খ্রিস্টানরা স্পেনের মুসলিম অধ্যুষিত শহরসমূহ লুটপাট এবং মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করল। তারা জিয়ান শহরের সকল মুসলমানকে বন্দী করে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করল। আলফোনস্ যখন লক্ষ্য করলেন যে, খ্রিস্টান যোদ্ধারা সমগ্র দেশে হত্যাকাণ্ড চালাতে এবং মাল-আসবাব লুটপাট করতে একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তখন তিনি তাদেরকে সংযত করে আপন নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার চেষ্টা করেন। এতে খ্রিস্টান যোদ্ধারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে এবং নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে শুরু করে। এতে আল-ফোনসূও বেশ স্বস্তিবোধ করেন। আল-ইকাব যুদ্ধ স্পেনে মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি কাঁপিয়ে তুলে। এতে মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্যসহ পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম হুকুমতসমূহের দ্রুত পতন ঘটতে থাকে। যুদ্ধের কারণে সাকিশের অনেক জনবসতি এবং গ্রাম-পল্লী একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। কেননা ওখানকার সব অধিবাসীই ঐ যুদ্ধে নিহত হয়।

আমীর নাসির কিছুদিন সেভিলে অবস্থান করে মরক্কোয় ফিরে আসেন এবং ৬১০ হিজরীর ১০ই শাবান (ডিসেম্বর ১২১৩ খ্রি) বুধবার মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরদিন বৃহস্পতিবার তাঁকে দাফন করা হয়।

ইউসুফ মুসতানসির

আমীর নাসিরের মৃত্যুর পর ৬১০ হিজরীর ১১ই শাবান (ডিসেম্বর ১২১৩ খ্রি) তাঁর পুত্র ইউসুফ মুসতানসির উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর। তাঁর জন্ম হয়েছিল ৫৯৪ হিজরীর ১লা শাওয়াল (আগস্ট ১১৯৮ খ্রি)। দশ বছর ক্ষমতায় থেকে ৬২০ হিজরীর শাওয়াল (নভেম্বর ১২২৩ খ্রি) মাসে নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আরামপ্রিয় ও ভীরু প্রকৃতির। তাঁর আমলে খ্রিস্টানরা স্পেনের বেশির ভাগ অঞ্চলই দখল করে নেয়। অবশ্য কোন কোন প্রদেশের শাসকরা অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে নিজ নিজ অঞ্চল খ্রিস্টানদের হাত থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু মুসতানসির বাদশাহ হওয়ার পর কখনো স্পেন কিংবা বাইরের কোন অঞ্চলে যান নি।

আবদুল ওয়াহিদ

মুসতানসিরের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আবদুল ওয়াহিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। নয় মাস পর মুওয়াহহিদীন অধিনায়ক ও কর্মকর্তারা তাঁকে প্রথমে পদচ্যুত, তারপর নির্মমভাবে হত্যা করে মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্যকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে।

আবদুল ওয়াহিদ আদিল

তখন আমীর মানসূরের এক পুত্র অর্থাৎ আমীর নাসিরের ভাই আবদুল ওয়াহিদ স্পেনের মার্সিয়া প্রদেশের শাসক ছিলেন। আবদুল ওয়াহিদ নাসিরের নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে তিনি নিজেকে আমীর বলে দাবি করেন এবং নিজের জন্য 'আদিল' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মরক্কোয় নয় বরং মার্সিয়াই আমীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ বছর অর্থাৎ ৬২১ হিজরীতে (১২২৪ খ্রি.) খ্রিস্টানরা তার উপর আক্রমণ চালায়। এই যুদ্ধে আদিল পরাজিত হন। এই পরাজয়ের পর আদিল তাঁর ভাই ইদরীসকে সেভিলে তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে স্বয়ং মরক্কোয় চলে যান। ওদিকে মরক্কোবাসীরা ইয়াহইয়া ইব্‌ন নাসির নামীয় এক কিশোরকে নিজেদের সম্রাট বানিয়ে আদিলের সাথে যুদ্ধ করে।

এ যুদ্ধে আদিল বন্দী হন। এই অবস্থা দেখে ইদরীস সেভিলে আনুষ্ঠানিকভাবে আমীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নিজের জন্য মামূন উপাধি গ্রহণ করেন। এটা হচ্ছে ঐ সময়ের কথা যখন মুওয়াহ্‌হিদীনের ভাবমূর্তি স্পেন মরক্কো উভয় দেশেই একেবারে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। মরক্কোয় বনী মারীন ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা করছিল। এদিকে স্পেনের মুসলমান শাসকরা ভাবতে শুরু করল, মরক্কোর অধিবাসী তথা বার্বাররা আমাদের দেশ শাসন করবে কেন? আমাদেরই উচিত নিজেদের মাধ্যমে একজন আমীর নির্বাচিত করা যাতে আমরা খ্রিস্টানদের অধীনতা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি। যদি আমরা আরো কিছুদিন মরক্কোয় এরূপ দুর্বল আমীরের অধীনে থাকি তাহলে খ্রিস্টানরা সমগ্র স্পেন দখল করে আমাদেরকে তাদের দাসে পরিণত করবে। অতএব সারাকাস্তার শাসক বনী হূদ বংশের মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ নামীয় জনৈক ব্যক্তি মামূনকে স্পেন থেকে বের করে দিয়ে সেখানে নিজস্ব হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন।

মুওয়াহ্‌হিদীন শাসনের অবসান

এভাবে ৬২৫ হিজরীতে (১২২৮ খ্রি.) স্পেন থেকে মুওয়াহ্‌হিদীন শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মামূন স্পেন পরিত্যাগ করে মরক্কোয় সাবতাহ্ বন্দরে চলে আসেন এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর তাঁর পুত্র রশীদ সাবতাহ বন্দরেই আমীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বনী মারীন দিনের পর দিন মরক্কোয় তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, মুওয়াহহিদীনের নাম-নিশানা চিরতরে মুছে যায় এবং মরক্কোয় পুরোপুরিভাবে বনী মারীনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

দশম অধ্যায়

মুসলিম অধ্যুষিত স্পেনে পুনরায় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, স্পেনে বনূ উমাইয়া বংশের খিলাফত ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র স্পেন উপদ্বীপে পৃথক পৃথক অনেকগুলো স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটে এবং তারা একে অন্যের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। আর খ্রিস্টান বাদশাহরা এই সুযোগে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ দখল করে নিয়ে নিজ নিজ রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করে। তারপর স্পেনের মুরাবিতীনরা স্পেন দখল করে এবং পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলো এই মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু দেশে অরাজকতা চলাকালে যে পরিমাণ ভূখণ্ড খ্রিস্টান রাজাদের দখলে চলে গিয়েছিল তা আর ফিরে আসেনি।

মুরাবিতীন সাম্রাজ্য যখন ধ্বংস হয়ে গেল এবং তার স্থলে মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হলো তখন অর্থাৎ এই ভাঙ্গা-গড়ার যুগসন্ধিক্ষণে খ্রিস্টানরা স্পেনের আরো কিছু অংশ দখল করে নেয়। ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের আয়তন আরো হ্রাস পায়। এবার এমন এক মুহূর্তে মুওয়াহহিদীনের সাম্রাজ্যে দুর্বলতা ও পতন দেখা দেয় যখন সমগ্র ইউরোপের গোটা খ্রিস্টান জাতি মুসলমানদেরকে বিতাড়ন ও পাইকারীভাবে হত্যা করার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠেছে। আল-ইকাব যুদ্ধ শুধু মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্যের মৃত্যু ঘণ্টা বাজায়নি, বরং স্পেনে খ্রিস্টানদের দখলাধীন ভূমির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে। ঐ সময়ে স্পেন থেকে মুসলমানদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু ইউরোপের খ্রিস্টান যোদ্ধাদের অনুপযুক্ততা ও অসদাচরণ স্পেনের খ্রিস্টানদের কিছুটা ক্ষেপিয়ে তোলে। ফলে স্পেনের খ্রিস্টানদের কারণেই তখনকার মত মুসলিম বিতাড়ন অভিযান স্থগিত থাকে। স্পেন থেকে যখন মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্য লোপ পায় তখন স্পেনের উত্তরাংশের অর্ধেকের চাইতে বেশি এবং পশ্চিমের সবগুলো প্রদেশই খ্রিস্টানদের দখলে চলে গিয়েছিল। আর মুসলমানরা পিছনে হটতে হটতে এবং নিজেদের সামলাতে সামলাতে একবারে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলে এসেছিল। মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্যের পতনের পর স্পেনে পুনরায় অরাজকতা দেখা দেয়—যেমন অরাজকতা দেখা দিয়েছিল বনূ উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের পর। পার্থক্য শুধু এতটুকু ছিল যে, প্রথম অরাজকতার সময় মুসলিম রাজ্যগুলোর আয়তন ছিল বেশি এবং প্রত্যেক শাসকের অধীনস্থ প্রদেশগুলোও ছিল বড় বড়। কিন্তু পরবর্তী অরাজকতা মুসলিম স্পেনের আয়তনকে অত্যন্ত সীমিত ও সংকীর্ণ করে দেয়। ফলে এক একজন মুসলিম শাসকের অধীনে থাকে এক একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল। অধিকন্তু প্রথম অরাজকতার সময় যেমন মুসলিম শাসকরা ছিল পরস্পরের শত্রু ও রক্তপিয়াসী ঠিক তেমনি এবারও তারা একে অন্যের প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু এবার আর একটি বিপদ এই দেখা দেয় যে, প্রত্যেক মুসলমান

শাসক একে অন্যের ধ্বংস করার জন্য সাধারণত খ্রিস্টান সম্রাটকে ডেকে নিয়ে আসত এবং এই ভ্রাতৃহত্যার কাজ সমাপনান্তে আপন রাজ্যের কিছু শহর ও দুর্গ খ্রিস্টান সম্রাটের হাতে (তার মুসলিম নিধনের পুরস্কার স্বরূপ) তুলে দিত। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের এই আচরণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল। এভাবে যে তাদের মুসলিম নিধনের লক্ষ্য খোদ মুসলিমদের মাধ্যমে আপনা-আপনি অর্জিত হয়ে যাচ্ছে।

বনূ হূদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের শাসনকাল

৫০৩ হিজরীতে (১১০৯-১০ খ্রি.) আহমদ মুসতাঈন ইব্‌ন আবূ আমির ইউসুফ মুতামিন ইব্‌ন আবূ জা'ফর ইব্‌ন হূদ খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে সারাকাস্তার সামনে শাহাদাতবরণ করেন। সারকাস্তার সম্রাটদের মধ্যে ইনি ছিলেন চতুর্থ। তার বংশধরদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ নামীয় এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি মুওয়াহ্‌হিদীন শাসনের শেষ সময়ে স্পেনে অত্যন্ত শান-শওকতের জীবন-যাপন করছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, সাম্রাজ্যের অবস্থা একেবারে ডুবু ডুবু তখন একটি দস্যুদলে ভর্তি হন এবং সে দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে তিনি তার দস্যুদলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে একদিন তাদেরই সাহায্যে মার্সিয়া দখল কর নেন। তখন মার্সিয়ার শাসক ছিলেন আবুল আব্বাস। মার্সিয়া দখল করার পর কিছু দিনের মধ্যেই মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ গ্রানাডা, মালাকা, আলমেরিয়া প্রভৃতি স্থানও দখল করে নেন। এরপর ৬২৫ হিজরীতে (১২২৮ খ্রি.) মুওয়াহ্‌হিদীন সম্রাট মালূনকে স্পেন থেকে বিতাড়িত করে কর্ডোভাও দখল করে নেন। ৬২৬ হিজরীতে (১২২৯ খ্রি.) প্রায় সমগ্র মুসলিম স্পেন তার অধীনে চলে আসে। ঐ বছরই বার্সিলোনার খ্রিস্টান সম্রাট মেযর্কা ও মেনর্কা দখল করে সেখান থেকে মুসলিম কর্মকর্তাদের বের করে দেন। এদিকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে স্পেনের আরো কিছু সংখ্যক উচ্চাকাঙ্ক্ষী অধিনায়ক নিজেদের জন্য এক একটি পৃথক রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ যখন দেখলেন যে, সকল অধিনায়কের উপর জয়ী হওয়া এবং প্রজা-সাধারণকেও এ ব্যাপারে রাযী করানো সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয় তখন তিনি বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফার কাছে একটি দরখাস্ত পাঠান। তাতে তিনি লিখেন, আমি আপনার নামে সমগ্র স্পেন জয় করে নিয়েছি এবং এখানে আমার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমাকে অনুগ্রহপূর্বক এই দেশের ওয়ালী (শাসনকর্তা) নিয়োগ এবং এখানকার শাসন পরিচালনার সনদ প্রদান করুন। বাগদাদের খলীফা এই দরখাস্তকে একটি গায়েবী সাহায্য মনে করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের কাছে জোড়া পোশাকসহ স্পেন শাসনের সনদপত্র প্রেরণ করে। যখন বাগদাদের খলীফা মুসতানসিরের কাছে থেকে সনদপত্র পৌঁছল তখন ইব্‌ন হূদ তথা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ জনসাধারণকে গ্রানাডার জামে মসজিদে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং স্বয়ং আব্বাসীয় খলীফার জোড়া পোশাক পরে কালো পতাকা হাতে নিয়ে সেখানে আসেন। তিনি সকলকে খলীফা মুসতানসির আব্বাসীর ফরমান পড়ে শুনান এবং সমগ্র মুসলমানকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন এই বলে যে, খলীফা আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে আমার

পৃষ্ঠপোষকতার দায়-দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। যা হোক তার এ কৌশল অবলম্বনের ফল এই দাঁড়ায় যে, কিছুদিনের জন্য নাসর ইব্‌ন ইউসুফ ওরফে ইবনুল আহ্‌মার, আবূ জামীল যায়ন ইব্‌ন মরদেনেশ প্রমুখ শাসক, যারা ইব্‌ন হূদ তথা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের বিরুদ্ধাচরণের সংকল্প নিয়েছিলেন, কিছু দিনের জন্য নিশ্চুপ বসে থাকেন। এমন কি বাহ্যিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের হাতে বায়আতও করেন। কিন্তু কিছু দিন পরই তারা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং পুনরায় গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। খ্রিস্টানরা এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পুনরায় মুসলমানদের শহরসমূহ দখল করতে শুরু করে। তারা ৬২৭ হিজরীতে (১২৩০ খ্রি.) কর্ডোভার পর স্পেনের সর্ব বৃহৎ শহর মারীদাহ দখল করে নেয়। মারীদাহবাসীরা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফকে এই সংবাদ দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মারীদায়ে উপনীত হয়ে নবম আলফোনসূ সম্রাট লিওনের উপর নির্দ্বিধায় হামলা চালান। অবশ্য এ যুদ্ধে তিনি খ্রিস্টানদের হাতে পরাজিত হয়ে মার্সিয়ায় ফিরে আসেন এবং মার্সিয়াকেই রাজধানী করে দেশ শাসন করতে থাকেন। ৬২৯ হিজরীতে (১২৩২ খ্রি.) ইবনুল আহমার নিজেকে স্পেন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে শ্রীস, জিয়ান প্রভৃতি নগরী দখল করে নেন। ঐ সময়ে আবূ মারওয়ান নামক জনৈক সর্দার সেভিলের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনুল আহমার আবূ মারওয়ানের সাথে ঐক্য ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। ৬৩২ হিজরীতে (১২৩৪-৩৫ খ্রি) ইবনুল আহমার বন্ধুরূপে সেভিলে প্রবেশ করেন এবং আবূ মারওয়ানকে হত্যা করে তার দখলীকৃত সমগ্র এলাকা দখল করে নেন। কিন্তু সেভিলের লোকেরা কিছুদিন পর অসন্তুষ্ট হয়ে ইবনুল আহমারকে সেখান থেকে বের করে দিয়ে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ ইবনুর রামীমী নামক জনৈক ব্যক্তিকে আপন মন্ত্রী নিয়োগ করে তার হাতে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ বিষয়াদি সমর্পণ করে রেখেছিলেন। এরপর তিনি তাকে আলমেরিয়ার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। ইবনুর রামীমী আলমেরিয়ায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ তাকে দমন করার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি পথিমধ্যেই ছিলেন এমন সময় ইবনুর রামীমীর গোয়েন্দারা রাতের বেলা সুযোগ পেয়ে তাকে তাঁবুর মধ্যেই গলা টিপে হত্যা করে। এই ঘটনা ঘটে ৬২৫ হিজরীর ২৪ জমাদিউস সানী (ফেব্রুয়ারী ১২৩৮ খ্রি) এরপর ইবনুর রামীমী আলমেরিয়ার স্বাধীন সম্রাটে পরিণত হয়। মার্সিয়ার শাসনক্ষমতা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের সন্তানদের দখলে থাকে, যারা ইতোমধ্যে ইবনুল আহমারের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। ৬৫৮ হিজরীতে (১২৬০ খ্রি) এই বংশের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বনূ হূদ ছাড়াও ইবনুল আহ্‌মার, ইব্‌ন মারওয়ান, ইব্‌ন খালিদ, ইব্‌ন মরাদেনেশ প্রমুখ অনেক ছোট ছোট সর্দার নিজেদের পৃথক পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনুল আহ্‌মার ক্যাস্টাইল ও টলেডোর সম্রাট ফার্ডিনান্ডের সাথে প্রথম প্রথম বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং অন্যান্য ছোট ছোট মুসলমান শাসককে ধ্বংস সাধনে ফার্ডিনান্ডের সহযোগী হিসাবে কাজ করেন। অপর দিকে বার্সিলোনার সম্রাট পৃথকভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ শুরু করেছিলেন। খ্রিস্টানরা এই কৌশল অবলম্বন করেছিল যে, তারা প্রথমে দু'জন মুসলমানের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিত। এরপর একজনের পক্ষাবলম্বন করে অপরজনকে ধ্বংস

করত। এরপর যে জয়ী হতো তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করত এবং অন্যান্য মুসলমানকে তার বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিত। এভাবে তারা একের পর এক মুসলমানদের শহর ও দুর্গসমূহ দখল করতে থাকে। তখনি ক্যাস্টাইল (কাস্তা লাহ্)-এর সম্রাট ফার্ডিনান্ড ৬৩৬ হিজরীর ২৩ শাওয়াল (জুন ১২৩৯ খ্রি) রাজধানী কর্ডোভা দখল করে নেন এবং ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শহরের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বকে ধূলিসাৎ করে স্পেনে স্থায়িভাবে খ্রিস্টান সামাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে এ তারিখেই স্পেনে ইসলামী শান-শওকতের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইবনুল আহমার এই বিচক্ষণতার পরিচয় দেন যে, তিনি তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের সাথে আপোস করে এবং কিছু শহর ও দুর্গ তাকে ভেট দিয়ে বেশ কিছুদিন নিজেকে নিরাপদ রাখেন এবং এই অবকাশে গ্রানাডা, মালাক্কা, লারকা, আলমেরিয়া, জিয়ান প্রভৃতি অঞ্চলের উপর নিজের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্পেন উপদ্বীপের প্রায় এক-চতুর্থাংশ অঞ্চলের উপর এমন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা আড়াইশ বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। এখন থেকে সমগ্র স্পেন উপদ্বীপের পরিবর্তে শুধু এর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সাম্রাজ্য সীমবদ্ধ থাকে এবং কর্ডোভার পরিবর্তে গ্রানাডা মুসলিম স্পেনের রাজধানীতে পরিণত হয়। এ ক্ষুদ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল অর্থাৎ সমগ্র উপদ্বীপের এক-চতুর্থাংশ। এখন আমরা গ্রানাডা সাম্রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা করবো। আর এখানেই শেষ হয়ে যাবে স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের ইতিহাস।

একাদশ অধ্যায়

গ্রানাডা সাম্রাজ্য

ইবনুল আহমার

নাসর ইব্‌ন ইউসুফ যিনি ইবনুল আহমার নামে বিখ্যাত ছিলেন, ইতোপূর্বে তার আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ৬৩২ হিজরীতে (অক্টোবর ১২৩৪-সেপ্টেম্বর '৩৫ খ্রি) সেভিলের শাসক ইব্‌ন খালিদকে আপন বন্ধু ও খলীফা বানিয়ে গ্রানাডা ও মালাগা দখল করেছিলেন। ৬৪৩ হিজরীতে (১২৪৫-৪৬ খ্রি.) আলমেরিয়ার শাসক তার আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন এবং ৬৬৩ হিজরীতে (নভেম্বর ১২৬৪-অক্টোবর '৬৫ খ্রি) লারকায় প্রজাবর্গও তাকে নিজেদের বাদশাহ বলে মেনে নিয়েছিল। তখন পর্যন্ত ফার্ডিনান্ডের সাথে তার সদ্ভাব ছিল। কিন্তু যখন এক এক করে মুসলিম রাজ্যসমূহ ধ্বংস হয়ে গেল তখন খ্রিস্টানরা ইবনুল আহমারের রাজ্যও হজম করে নিতে চাইল। ইবনুল আহমার একটি বুদ্ধির কাজ করেছিলেন যে, তিনি বনী মারীনের বাদশাহ্ ইয়াকুব আবদুল হকের সাথে, যিনি মুওয়াহহিদীনের পর আফ্রিকা ও মরক্কোর শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন। অতএব যখন ইবনুল আহমারের খ্রিস্টানদের সাথে মুকাবিলার প্রয়োজন হতো তখনি ইয়াকূব মারীনীর পক্ষ থেকে সামরিক সাহায্য পাওয়া যেত। এভাবে ইবনুল আহমার বার বার খ্রিস্টানদের পরাজিত করেন এবং নিজের ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। ইবনুল আহমার গ্রানাডায় কাসরুল হামরায় (লাল প্রাসাদ) ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যা স্পেনে ইসলামের শান-শওকত বিলুপ্তিকালীন সময়কার একটি বিরাট কীর্তি বলে মনে করা হয়। কারো কারো মতে, এটা বিশ্বের সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম অথচ কর্ডোভার কাসরে যাহরার সাথে এর কোন তুলনাই হয় না, যা খ্রিস্টান অমানুষরা ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। ইবনুল আহমার একটি যুদ্ধে খ্রিস্টানদের পরাজিত করে গ্রানাডায় ফিরে আসছিলেন। রাজকীয় প্রাসাদের নিকটবর্তী হওয়ার পর তার ঘোড়াটি হঠাৎ হোঁচট খেলে তিনি তার উপর থেকে নিচে পড়ে যান। তাতে তার দেহে বাহ্যিকভাবে মারাত্মক কোন ক্ষত দেখা দেয় নি। অথচ এ কারণেই তিনি উক্ত দুর্ঘটনার ১৫ দিন পর ৬৭১ হিজরীর ২৯ জমাদিউস সানী (জানুয়ারী ১২৭৩ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ

ইবনুল আহমারের পর তাঁর পুত্র আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৮ বছর। তিনি তাঁর পিতার ওসীয়ত অনুযায়ী বনী মারীনের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক অব্যাহত রাখেন এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার সাথে সাম্রাজ্য শাসন

করতে থাকেন। ৬৭৩ হিজরীতে (১২৭৪-৭৫ খ্রি.) খ্রিস্টানদের গ্রানাডা রাজ্য আক্রমণ করে। মুহাম্মাদ, ইয়াকূব ইব্‌ন মুহাম্মাদ মারীনীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইয়াকূব সঙ্গে সঙ্গে আপন পুত্রকে একটি বাহিনীসহ স্পেন অভিমুখে প্রেরণ করেন। এরপর নিজেও রওয়ানা হন এবং একজন বিদ্রোহী আমীরের কাছ থকে আল খারো দ্বীপ দখল করে সেটাকে তার নিজস্ব বাহিনীর ঘাঁটিতে পরিণত করেন। মুহাম্মাদও নিজের পক্ষ থেকে যারীদার দুর্গটি ইয়াকূবের হাতে সমার্পণ করেন, যাতে তিনি সেটাকে তার সৈন্যদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এবার সুলতান মুহাম্মাদ ও সুলতান ইয়াকূব উভয়ে মিলে খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এটা হচ্ছে ৬৭২ হিজরীর ১৫ রবিউল আউয়ালের (সেপ্টেম্বর ১২৭৬ খ্রি) ঘটনা। এই পরাজয়ের পর খ্রিস্টানরা পুনরায় সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। কিন্তু এবারও তারা মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়। এরপর ৬৯৫ হিজরী সনের মুহাররম মাসে (নভেম্বর ১২৯৫ খ্রি) কাসতালার (কাস্টাইলের) সম্রাট গ্রানাডা সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে থাকেন। সুলতান মুহাম্মাদ এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং কাজাতাহ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, যা খ্রিস্টানদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল, দখল করে নেন। ৬৯৯ হিজরী (অক্টোবর ১২৯৯ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদ খ্রিস্টানদের কাছ থেকে কিছু সংখ্যক সীমান্তবর্তী দুর্গ দখল করে নেন। আনুমানিক ত্রিশ বছর শাসন পরিচালনার পর ৭০১ হিজরীর ৮ শাবান (এপ্রিল ১৩০২ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সুলতান মুহাম্মাদ 'ফাকীহ' নামে সুপরিচিত ছিলেন। কেননা পুস্তক অধ্যয়নের প্রতি তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল।

মুহাম্মাদ ফাকীহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ মাখলূ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান মুহাম্মাদ ফাকীহের সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি এই হয়েছিল যে, তিনি ইয়াকূব ইব্‌ন আবদুল হকের খাদ্‌রা দ্বীপস্থ সামরিক ঘাঁটিকে নিজের জন্য 'আশংকার কারণ' মনে করে ইয়াকুবের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের প্ররোচিত করেন এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্যও দেন। খ্রিস্টানরা ইয়াকূবের বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে উক্ত ঘাঁটিটি তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। ফলে খ্রিস্টানরা এমন একটি ঘাঁটির অধিকারী হয়, যার কারণে গ্রানাডা রাজ্যের কাছে সামুদ্রিক পথে বাইরে থেকে কোনরূপ সাহায্য আসা কঠিন হয়ে পড়ে।

মুহাম্মাদ মাখলূ

মুহাম্মাদ ফাকীহের পর তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ মাখলূ সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ হাকাম লাখমীর হাতে দেশ শাসনের যাবতীয় ক্ষমতা অর্পণ করেন। ৭০০ হিজরীতে (১৩০০-১৩০১ খ্রি) 'ওয়াদীয়ে আশ'-এর শাসনকর্তা আবুল হাজ্জ ইব্‌ন নাসর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু পরে বন্দী ও নিহত হন। ৭০৫ হিজরীতে (১৩০৫-০৬ খ্রি.) মুহাম্মাদ মাখলূ আফ্রিকার সৌতা দুর্গ দখল করে নেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সাধারণ প্রজারা অসন্তুষ্ট ছিল। তাই তারা মুহাম্মাদ মাখলূ-এর ভাই নাসর ইব্‌ন মুহাম্মাদকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে অনুপ্রাণিত করে। তারা প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন লুট করে। এরপর শাহী প্রাসাদ ঘেরাও করে মুহাম্মাদ মাখলূকে গ্রেফতার করে এবং নাসর ইব্‌ন মুহাম্মাদকে সিংহাসনে বসায়।

সুলতান নাস্‌র ইব্‌ন মুহাম্মাদ

সুলতান নাস্‌র ইব্‌ন মুহাম্মাদ ফাকীহ্ সিংহাসনে আরোহণ করে উল্লিখিত নিহত আবূ হাজ্জের পুত্র নাস্‌রকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। মুহাম্মাদ মাখলূ-এর পদচ্যুতি এবং নাস্‌র ইব্‌ন মুহাম্মাদের ক্ষমতালাভের ঘটনা ৭০৮ হিজরীতে (১৩০৯ খ্রি.) ঈদুল ফিতরের দিন ঘটে। ৭০৯ হিজরী (১৩০৯ খ্রি) কাসতালার সম্রাট আল-আলজেরিয়া জাযায়ের আক্রমণ করেন। এই শহর বিজিত হয় নি, তবে জিব্রাল্টারও কাসতালা সম্রাটের দখলে চলে আসে। এই বছরই বার্সিলোনার সম্রাট আলমেরিয়া আক্রমণ করেন। সুলতান নাস্‌র আলমেরিয়া রক্ষার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। আলমেরিয়ায় যুদ্ধ অব্যাহত ছিল, এমনি সময়ে ইবনুল আহমারের ভাতিজা এবং মালাগার শাসনকর্তা আবূ সাঈদ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আবুল ওয়ালীদ আলমেরিয়া এবং সেই সাথে বেলীশও জয় করেন। এভাবে গ্রানাডা রাজ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে রাজ্যটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির একটা সুরাহা হওয়ার পূর্বেই ৭১০ হিজরীর জমাদিউস সানী (নভেম্বর ১৩১০ খ্রি) মাসে সুলতান মুহাম্মাদ মাখলূকে সুলতান নাস্‌রের স্থলাভিষিক্ত করতে চাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে সুলতান নাস্‌র সুস্থ হয়ে উঠেন এবং সুলতান মুহাম্মাদ মাখলূকে যিনি তখন পর্যন্ত বন্দী ছিলেন, হত্যা করেন। আবূ সাঈদ এবং তার পুত্র আবুল ওয়ালীদ মালাগাকে রাজধানী করে নিজেদের দখলীকৃত ভূখণ্ডের উপর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুরু করে দিয়েছিল। ৭১৩ হিজরীতে (১৩১৩-১৪ খ্রি.) আবুল ওয়ালীদ তার সেনাবাহিনী নিয়ে এসে গ্রানাডার নিকটস্থ (কারইয়াতুল আতশায়) জনপদে তাঁবু স্থাপন করেন। সুলতান নাস্‌রও গ্রানাডা থেকে নিজস্ব বাহিনী নিয়ে বের হন। যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং সুলতান নাস্‌র আবুল ওয়ালীদের কাছে পরাজিত হয়ে গ্রানাডায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এটা হচ্ছে ৭১৩ হিজরী সনের ১৩ই মুহাররমের (মে ১৩১৩ খ্রি) ঘটনা। সুলতান নাস্‌র গ্রানাডায় পৌঁছে আপোস-মীমাংসার প্রচেষ্টা চালান। আপোস চুক্তি তখনো সম্পাদিত হয় নি এমনি সময় গ্রানাডার কিছু অধিবাসী আবুল ওয়ালীদের কাছে গিয়ে (যিনি মালাগায় চলে গিয়েছিলেন) তাকে আপোস-চুক্তি থেকে বিরত রাখে এবং তাকে গ্রানাডার উপর হামলা চালানোর জন্য অনুপ্রাণিত করে। আবুল ওয়ালীদ গ্রানাডার কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নিজের প্রতি সহানুভূতিশীল দেখে সঙ্গে সঙ্গে গ্রানাডা আক্রমণে রাযী হয়ে যান। শাদূনার নিকটবর্তী একটি স্থানে মালাগা ও গ্রানাডা বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত আবুল ওয়ালীদ জয়ী হন এবং তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে গ্রানাডায় প্রবেশ করেন। সুলতান আল-হামরা প্রাসাদে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ৭১৩ হিজরীর ২১শে শাওয়াল (ফেব্রুয়ারী ১৩১৪ খ্রি) সুলতান পদত্যাগ করে যাবতীয় শাসনক্ষমতা লিখিতভাবে আবুল ওয়ালীদের হাতে অর্পণ করেন।

আবুল ওয়ালীদ

আবুল ওয়ালীদ গ্রানাডার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নাসিরকে 'ওয়াদিয়ে আশ' (আশ উপত্যকায়) গিয়ে বসবাস করার অনুমতি দেন। আবুল ওয়ালীদ গ্রানাডায় শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করেন। খ্রিস্টানরা, যারা নীরবে মুসলমানদের এই গৃহযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছিল– যখন দেখল যে, এবার

পূর্বের চাইতে অধিক যোগ্য ও অধিক বীরত্বের অধিকারী একজন বাদশাহ গ্রানাডার সিংহাসনে আরোহণ করেছেন তখন তারা তার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তুতি নিতে থাকে। ৭১৬ হিজরীতে (এপ্রিল ১৩১৬-মার্চ ১৩১৭ খ্রি) কাসতালার সম্রাট গ্রানাডা রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় হামলা চালিয়ে সেখানকার বেশ কয়েকটি শহর দখল করে নেন। আবুল ওয়ালীদও ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত ৭১৯ হিজরীর মুহাররম (মার্চ ১৩১৯ খ্রি) মাসে খ্রিস্টানদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তার সমগ্র এলাকা মুক্ত করে নেন।

আবুল ওয়ালীদের এই দুঃসাহস প্রত্যক্ষ করে খ্রিস্টানরা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সমগ্র খ্রিস্টান নৃপতিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। খ্রিস্টান পাদ্রী এবং পুরোহিতরা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে খ্রিস্টান রাজ্যসমূহে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করে। স্পেনের মহান পোপও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। টলেডো শহরে খ্রিস্টান বাহিনী সমবেত হয়। গ্রানাডা রাজ্যকে ধ্বংস করে স্পেন উপদ্বীপ থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলার জন্য দু'লক্ষাধিক খ্রিস্টান সৈন্য টলেডো এসে একত্রিত হয়। ঐ বিরাট বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করা হয় কাসতালা সাম্রাজ্যের 'অলীআহ্দ' বাতরাদাহকে। ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় পাঁচশ খ্রিস্টান রাজা ঐ বাহিনীতে যোগদান করেন। মহান পোপ প্রত্যেক অধিনায়কের মাথায় হাত বুলিয়ে তাদের শুভেচ্ছা কামনা করেন। এছাড়াও ইউরোপ মহাদেশের সকল পাদ্রী গির্জায় গির্জায় এই মর্মে প্রার্থনা করে যে, খ্রিস্টান সৈন্যরা যেন স্পেন থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে সক্ষম হয়।

আল-বাসীরা যুদ্ধ

খ্রিস্টানদের বিরাট বাহিনী এবং তাদের বিস্ময়কর যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা শুনে গ্রানাডার মুসলমানরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। আবুল ওয়ালীদ মরক্কোর বাদশাহ আবূ সাঈদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু আবূ সাঈদ কোনরূপ সাহায্য প্রদান করতে অস্বীকার করেন। কিংবা এও হতে পারে যে, সাহায্য প্রদান করার মত ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। পরিস্থিতি যখন এই দাঁড়ায়, তখন গ্রানাডার মুসলমানরা একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ে। তাদের সামনে নিশ্চিত ধ্বংসের চিহ্ন ফুটে উঠে। গ্রানাডার সুলতান আবুল ওয়ালীদ যে সৈন্য সংগ্রহ করেন তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার। তার মধ্যে চার হাজার পদাতিক এবং দেড় হাজার অশ্বারোহী। খ্রিস্টানদের কয়েক লক্ষ সৈন্যের মুকাবিলায় এটা ছিল যেন সিন্ধুতে বিন্দুতুল্য। তবু আল্লাহ্র উপর ভরসা করে এই সামান্য সৈন্য নিয়েই গ্রানাডার সুলতান ৭১৯ হিজরী ২০শে রবিউল আউয়াল (মে ১৩১৯ খ্রি) গ্রানাডা থেকে রওয়ানা হন। সুলতান অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে 'শায়খুল গথওয়া নামীয় তার এক অধিনায়কের নেতৃত্বে পাঁচশ সৈন্য প্রেরণ করেন এবং পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে স্বয়ং রওয়ানা হন। কিভাবে খ্রিস্টানদের উপর বিজয় অর্জন করা যায় সমস্ত রাস্তা জুড়ে অধিনায়করা তাই নিয়ে সলাপরামর্শ করতে থাকে। মুসলিম অগ্রবর্তী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে খ্রিস্টান অগ্রবর্তী বাহিনী পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করে। এরপর সুলতান আবুল ওয়ালীদ তার এক অধিনায়ক আবুল জুয়ূশের নেতৃত্বে এক হাজার অশ্বারোহীর একটি বাহিনী আল-বাসীরার নিকটবর্তী একটি ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। তিনি পাঁচশ সৈন্যসহ শায়খুল গাযওয়াকে অগ্রে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন ঃ তুমি খ্রিস্টান বাহিনীর সম্মুখবর্তী হয়ে পিছনে হটতে থাকবে এবং তাদেরকে

তোমার পশ্চাদ্ধাবনে ব্যাপৃত রাখবে। এদিকে আবুল জুয়ূশকে নির্দেশ দেন ঃ যখন খ্রিস্টানরা তোমাকে অতিক্রম করে যাবে তখন তুমি ঝোঁপ থেকে বের হয়ে পিছন দিক থেকে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শুধু তিনশ অশ্বারোহী নিয়ে আবুল ওয়ালীদ একটি সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান নেন এবং অপর একজন অধিনায়কের নেতৃত্বে বাকি সৈন্যকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। শায়খুল গাযওয়া ৭১৯ হিজরীর ৬ই জমাদিউল আউয়াল (জুন ১৩১৯ খ্রি) ভোর বেলা খ্রিস্টান বাহিনীর সম্মুখে গিয়ে পৌঁছেন। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র বাহিনীর উপর সঙ্গে সঙ্গে হামলা চালায়। শায়খুল গাযওয়া পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পিছনে হটতে শুরু করেন। কিন্তু বিরাট সমুদ্রতুল্য খ্রিস্টান বাহিনী মুসলমানদেরকে কচু কাটা করার জন্য অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। শায়খুল গাযওয়া ক্রমাগত পিছনে হটছিলেন এবং খ্রিস্টান বাহিনী দ্বিগুণ উদ্যমে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিল। এভাবে খ্রিস্টান বাহিনী যখন আবুল জুয়ূশকে অতিক্রম করে চলে গেল তখন তিনি তার এক হাজার সঙ্গীকে নিয়ে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত ঝোঁপ থেকে বের হয়ে খ্রিস্টান বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঠিক ঐ মুহূর্তে সুলতান আবুল ওয়ালীদও অপর দিক থেকে তার তিনশ অশ্বারোহীকে নিয়ে শত্রু বাহিনীর উপর হামলা চালান। এরপর বাকি সৈন্যরাও অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাহ্যত এই হামলা কয়েক লক্ষ খ্রিস্টান বাহিনীর উপর কোন দিক দিয়েই মারাত্মক হবার কথা ছিল না, কিন্তু মুসলমানরা উপস্থিত পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনা পূর্বক প্রাণের বাজি ধরে এবং শাহাদাত লাভের ঐকান্তিক কামনা নিয়ে খ্রিস্টান বাহিনীর উপর তিন দিক থেকে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাতে ঐ বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈন্য কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং এই অকল্পনীয় হামলার সামনে টিকতে না পেরে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করে। একলক্ষ খ্রিস্টান সৈন্যের অধিকাংশই মুসলমানদের হাতে প্রাণ দেয় এবং বাকিরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচে। খুব সম্ভবত এই আল্-বাসীরা যুদ্ধ আপন ধরন-ধারণের দিক দিয়ে ছিল অনন্য। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এই যুদ্ধে শুধু তেরজন মুসলমান শাহাদাতবরণ করেছিলেন। এক পক্ষে মাত্র তের জনের এবং অপর পক্ষে এক লক্ষের নিহত হওয়াটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপারই বটে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতি বাতরাদাহ্ এবং তার পঁচিশজন প্রধান সহযোগীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। বাতরাদাহর স্ত্রী এবং ছেলেরাও সাত হাজার বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাতরাদাহর মৃতদেহ একটি সিন্দুকে ভরে সে সিন্দুকটি গ্রানাডা শহরের সিংহ দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই শোচনীয় পরাজয়ের ফলে খ্রিস্টানদের মেরুদণ্ড ভেংগে পড়ে। তারা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে যে, স্পেন থেকে গ্রানাডা রাজ্যের নাম-নিশানা মুছে ফেলাটা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এই বিজয়ের জন্য সুলতান আবুল ওয়ালীদ আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন এবং খ্রিস্টানদের আবেদন অনুযায়ী তাদের সাথে আপোসচুক্তি সম্পাদন করে আপন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। ৭২৫ হিজরীতে (১৩২৫ খ্রি) যখন আবুল ওয়ালীদ মারতাশ দুর্গ দখল করে গ্রানাডায় ফিরে আসেন তখন অর্থাৎ ৭২৫ হিজরীর ২৭শে রজব (জুন ১৩২৫ খ্রি) তারই জনৈক ভাতিজা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাকে হত্যা করে। সাম্রাজ্যের সভাসদ ও কর্মকর্তারা হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড প্রদান করে। এরপর সুলতানের পুত্র মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান মুহাম্মাদ

সুলতান মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করে আবুল আলা উসমানকে তার মন্ত্রী নিয়োগ করেন। মন্ত্রী উসমান যখন সীমাহীন ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে ফেলেন এবং তা সালতানাতের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে লাগল তখন সুলতান মুহাম্মাদ ৭২৯ হিজরীতে (১৩২৯ খ্রি) তাকে হত্যা করেন। ৭৩৩ হিজরীতে (অক্টোবর ১৩৩২-সেপ্টেম্বর ১৩৩৩ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদ খ্রিস্টানদের কাছ থেকে জিব্রাল্টার ছিনিয়ে নেন। খ্রিস্টানরা সেটাকে রক্ষা করার জন্য স্থল ও নৌবাহিনী নিয়ে হামলা চালায়। কিন্তু সফলকাম হতে পারে নি। সুলতান মুহাম্মাদ জিব্রাল্টার থেকে গ্রানাডা প্রত্যাবর্তন করছিলেন এমন সময় আবুল আলা উসমানের পুত্রগণ এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সুযোগ পেয়ে তার উপর হামলা চালায় এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সুলতানের সঙ্গীরা তার লাশ মালাগায় নিয়ে এসে সমাধিস্থ করে।

সুলতান ইউসুফ

সুলতান মুহাম্মাদ নিহত হওয়ার পর তার ভাই ইউসুফ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, আল্লাহ্ভীরু ও সিংহহৃদয় ব্যক্তি। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে সালতানাতের হাল ধরেন। তিনি তাঁর ভাইয়ের হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। খ্রিস্টানরা জিব্রাল্টার এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় পুনরায় হামলা চালায় এবং নানা ধরনের উৎপাত শুরু করে। সুলতান ইউসুফ এ অবস্থার প্রতি মরক্কোর বাদশাহ আবুল হাসান মারীনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর সাহায্য কামনা করেন। আবুল হাসান মারীনী তাঁর পুত্রের নেতৃত্বে জিব্রাল্টারের দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। অপর দিক থেকে সুলতান ইউসুফও সেখানে পৌঁছে যান। যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং খ্রিস্টানরা পরাজয়বরণ করে। যখন মরক্কোর বাহিনী ফিরে যেতে লাগল তখন খ্রিস্টানরা ধোঁকা দিয়ে তাদের উপর একটি শক্ত হামলা চালায়। এতে মুসলমানরা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৭৪০ হিজরীতে (১৩৩৯-৪০ খ্রি) সুলতান আবুল হাসান স্বয়ং ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে স্পেনে আসেন। অপর দিকে সুলতান ইউসুফও তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। খ্রিস্টান বাহিনী মুসলমানদের এই আক্রমণের খবর পেয়ে পূর্বাহ্নেই যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যারীফের নিকটবর্তী একটি প্রান্তরে এই ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খ্রিস্টানরা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি। তাদের যুদ্ধাস্ত্রও ছিল প্রচুর। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা এই যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং তাদের এক বিরাট সংখ্যক সৈন্য শাহাদাতবরণ করে। তখন খ্রিস্টানরা গ্রানাডার একটি অংশ দখল করে নেয়। সুলতান আবুল হাসান মরক্কোয় ফিরে আসেন এবং ইউসুফ গ্রানাডায় গিয়ে আশ্রয় নেন। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেক বড় বড় আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তি শাহাদাতবরণ করেন। লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীবের পিতা আবদুল্লাহ্ সালমান ছিলেন এ শহীদদের অন্যতম।

৭৪৯ হিজরীতে (এপ্রিল ১৩৪৮—মার্চ ১৩৪৯ খ্রি) সুলতান ইউসূফ লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীবকে তার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং খ্রিস্টানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধ প্রস্তুতি চালান। হিজরী ৭৫৫ হিজরীতে (১৩৫৪ খ্রি.) জিহাদের জন্য তিনি পুরোপুরি তৈরি

হয়ে যান। কিন্তু ঈদের নামায আদায়কালে সিজদারত অবস্থায় জনৈক অখ্যাত অচেনা ব্যক্তি বর্শার আঘাতে তাঁকে হত্যা করে। আল-হামরা প্রাসাদে তাঁকে দাফন করা হয়।

সুলতান মুহাম্মাদ গনী বিল্লাহ্

ইউসুফের পর তার পুত্র মুহাম্মাদ 'গনী বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীবকে মরক্কোর বাদশাহ আবূ সালিম ইব্ন আবুল হাসান মারীনীর কাছে পাঠান, যাতে তিনি বাদশাহকে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য দানে উদ্বুদ্ধ করেন। মরক্কোর বাদশাহ একদল সৈন্য পাঠান এবং খ্রিস্টানদের সাথে মামুলি ধরনের যুদ্ধও সংঘটিত হয়। কিন্তু তাতে উল্লেখযোগ্য কোন সুফল পাওয়া যায়নি। রেযওয়ান নামক প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে পুরোপুরি শাসন ক্ষমতা কবজা করে। এতে কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এই সুযোগে সুলতান মুহাম্মাদের সৎভাই ইসমাঈল, ৭৬০ হিজরী ২৮শে রমযান (আগস্ট ১৩৫৯ খ্রি) গ্রানাডা দুর্গ দখল করে নেন। সুলতান তখন শহরের বাইরে জান্নাতুল আরীফে অবস্থান করছিলেন। ২৯শে রমযান ভোরে যখন তিনি এই সংবাদ পান তখন সোজা 'ওয়াদিয়ে আশ'-এর আশ উপত্যকার দিকে চলে যান এবং সেখানে অবস্থানপূর্বক সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। তিনি কাস্তালার সম্রাটের সাথেও চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে তাকে নিজের পক্ষে টানার চেষ্টা করেন। তখনও খ্রিস্টান বাদশাহর দিক থেকে কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি এমনি সময়ে মরক্কোর বাদশাহ্ সুলতান আবূ সালিম ইব্ন আবুল হাসান মারীনীর পক্ষ থেকে আবুল কাসিম ইব্ন শরীফ নামক জনৈক দূত ৭৬০ হিজরীর ১০ই যিলহজ্জ (নভেম্বর ১৩৫৯ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাত করে এবং বলে ঃ মরক্কোর বাদশাহর সাথে আপনার প্রাচীন বন্ধুত্বের সুবাদে তিনি খুবই আগ্রহী যে, আপনি এই মুহূর্তে তার ওখানে গিয়ে একজন সম্মানিত অতিথি হিসাবে অবস্থান করেন। তিনি আপনাকে সবরকম সাহায্য দানেও প্রস্তুত আছেন। অতএব সুলতান মুহাম্মাদ ১১ই যিলহজ্জ 'ওয়াদিয়ে আশ' থেকে মরক্কো অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌঁছে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে আবূ সালিমের অতিথি হিসাবে অবস্থান করতে থাকেন। এদিকে গ্রানাডায় শুরু হয় সুলতান ইসমাঈলের শাসনামল।

সুলতান ইসমাঈল

সিংহাসনে আরোহণ করার পর সুলতান ইসমাঈল ও কাসতালার খ্রিস্টান সম্রাটের সাথে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে একটা আপোস চুক্তিতে উপনীত হন। ঐ সময়ে কাসতালার সম্রাট যেহেতু বার্সিলোনার সম্রাটের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন তাই তিনি এই আপোস চুক্তিকে একটি সুবর্ণ সুযোগ বলেই মনে করেন। কিন্তু ৭৬১ হিজরীর ৪ঠা শাবান (জুন ১৩৬০ খ্রি) সুলতান ইসমাঈলের ভাই আবূ ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ্, সুলতান এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে হত্যা করে স্বয়ং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এদিকে ২১ মাস নির্বাসিত জীবন যাপনের পর ৭৬২ হিজরীর ২৭শে শাওয়াল (আগস্ট ১৩৬১ খ্রি) মরক্কোর সুলতানের সাহায্য নিয়ে সুলতান মুহাম্মাদ স্পেনে ফিরে আসেন এবং গ্রানাডা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা দখল করতে শুরু করেন। তখন আবূ ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ্ নিজের দুর্বলতার দিক লক্ষ্য করে

সাহায্য প্রার্থনার জন্য স্বয়ং কাসতালার সম্রাটের কাছে যান। কিন্তু কাসতালার সম্রাট তার কাছে সাহায্য ও আশ্রয়প্রার্থী এই মুসলিম শাসক এবং তার সকল সঙ্গী-সাথীকে সেভিলের সন্নিকটে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের যাবতীয় ধন-সম্পদ হস্তগত করে নেন।

এদিকে সুলতান মুহাম্মাদ মাখলূ ৭৬৩ হিজরীর ২০শে জমাদিউস্ সানী (এপ্রিল ১৩৬২ খ্রি) গ্রানাডা দখল করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এটা হলো সেই সময়কার কথা যখন জিব্রাল্টার মরক্কো সাম্রাজ্যের দখলাধীন ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বেশ কয়েক বছর ধরে গ্রানাডা রাজ্য খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের করদরাজ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সুলতান মুহাম্মাদ এবার গ্রানাডা দখল করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ও সুষ্ঠুভাবে অবস্থা শুধরানোর চেষ্টা চালান। ঘটনাচক্রে মরক্কোর বাদশাহ আবূ সালিম ইনতিকাল করায় তার সন্তানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এদিকে কাসতালায় সম্রাট ও তার ভাইয়ের মধ্যেও একটার পর একটা যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে। এ থেকে সুলতান মুহাম্মাদ বেশ কিছুটা উপকৃত হন। একদিকে তিনি জিব্রাল্টার দখল করে নেন এবং অন্যদিকে কাসতালার সম্রাটকে কর দিতে অস্বীকার করেন। এতদসত্ত্বেও কাসতালার সম্রাট মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস পান নি। মোটকথা, এই সুলতানের শাসনামলে গ্রানাডা রাজ্যের পরাক্রম খুব বৃদ্ধি পায় এবং খ্রিস্টানরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

সুলতান ইউসুফ (দ্বিতীয়)

৭৯৩ হিজরীতে (১৩৯১ খ্রি.) সুলতান মুহাম্মাদ ইনতিকাল করলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ইউসুফ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন আপোসকামী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কাস্তালার সম্রাটের সাথে তিনি একটি পরিপূর্ণ আপোসচুক্তি সম্পাদন করেন। ইউসুফ, মুহাম্মাদ, আলী ও আহমদ নামে দ্বিতীয় ইউসুফের চারপুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে মুহাম্মাদ ছিলেন সবচাইতে চতুর ও বিচক্ষণ।

সুলতান মুহাম্মাদ (সপ্তম)

৭৯৮ হিজরীতে (অক্টোবর ১৩৯৫-সেপ্টেবর ১৩৯৬ খ্রি) দ্বিতীয় ইউসুফের মৃত্যু হলে মুহাম্মাদ তার বড় ভাই ইউসুফকে বঞ্চিত করে নিজেই সিংহাসন দখল করে নেন। এই বংশে মুহাম্মাদ নামের অনেক ব্যক্তি ছিলেন। তাই মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ (দ্বিতীয়)-কে সপ্তম মুহাম্মাদ নামে উল্লেখ করা হয়। সপ্তম মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করার কিছু দিন পর খ্রিস্টানদের সাথে তার পুনরায় গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে মুসলমানরা খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করে কাস্তালা সাম্রাজ্যের কিছু জায়গা দখল করে নেয়। ঐ সময়ে কাস্তালার সম্রাট জন নামীয় একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান রেখে মারা যান। এই দুগ্ধপোষ্য শিশুকেই সিংহাসনে বসিয়ে তার চাচা ফার্ডিনান্ড দেশ শাসন করতে থাকেন। ফার্ডিনান্ডও যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। যেহেতু খ্রিস্টানদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি ছিল তাই সুলতান সপ্তম মুহাম্মাদ খ্রিস্টান বাহিনীকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রেখে নিজের বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে জিয়ান শহরের উপর হামলা চালান। এই কৌশল অবলম্বন করার কারণে খ্রিস্টানরা রাতারাতি তাদের বাহিনীকে ঐদিকে স্থানান্তরিত করে, যার ফলে তাদের হাত-পা

ফুলে উঠে। ফার্ডিনান্ড বাধ্য হয়ে আপোস চুক্তি সম্পাদনের আবেদন জানান, যা সুলতান সপ্তম মুহাম্মাদ সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করেন। এভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের একটা পরিসমাপ্তি ঘটে। ৮০৩ হিজরীতে (আগস্ট ১৪০০-জুলাই ১৪০১ খ্রি) খ্রিস্টান এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যে পুনরায় একটি বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে কে জয়ী আর কে পরাজিত তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানরা সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে এবং আট মাসের জন্য একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই সুলতান সপ্তম মুহাম্মাদ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর তার বড় ভাই তৃতীয় ইউসুফ, যিনি এতদিন নজরবন্দী ছিলেন, সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান ইউসুফ (তৃতীয়)

তৃতীয় ইউসুফ সিংহাসনে আরোহণ করেই আবদুল্লাহ্ নামক তার এক কর্মকর্তাকে ফার্ডিনান্ডের কাছে পাঠিয়ে উল্লিখিত সন্ধিচুক্তির মেয়াদ আরো দু'বছর বৃদ্ধি করেন। এই দু'বছর শেষ হওয়ার পর সুলতান তৃতীয় ইউসুফ তার ভাই আলীকে দূত হিসাবে কাসতালার সম্রাটের কাছে পাঠান এবং সন্ধি চুক্তির মেয়াদ পুনরায় বৃদ্ধি করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। খ্রিস্টানরা সুলতানের ভাই আলীকে বলে— যদি তোমার সুলতান আমাদেরকে কর দানে সম্মত হন তাহলে আমরা তার আবেদন মঞ্জুর করতে পারি। আলী খ্রিস্টানদের এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে গ্রানাডায় ফিরে যান। এরপর ফার্ডিনান্ড একটি বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে গ্রানাডা রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে হামলা চালায়। উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং খ্রিস্টানরা গ্রানাডা রাজ্যের একটি অংশ দখল করে নেয়। এই যুদ্ধ শেষ হয়নি এমনি সময়ে 'ফাশ' (মরক্কো) সাম্রাজ্যের শাহযাদা আবূ সাঈদের অধিনায়কত্বে একটি সেনাবাহিনী জিব্রাল্টার দুর্গ আক্রমণ করে। সেখানে উভয় শাহযাদার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং আবূ সাঈদ শাহযাদা আহমদের সাথে একজন সম্মানিত মেহমান হিসাবে গ্রানাডায় চলে আসেন। তখন মরক্কোর বাদশাহ্, যিনি আবূ সাঈদের বড় ভাই ছিলেন, তৃতীয় ইউসুফকে লিখেন ঃ তুমি কোন না কোন ভাবে আবূ সাঈদকে হত্যা করে ফেল। কিন্তু তৃতীয় ইউসুফ আবূ সাঈদকে পত্রটি দেখিয়ে বলেন ঃ দেখ, 'তোমার ভাই তোমাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যেই জিব্রাল্টার আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতএব আবূ সাঈদ ৮২০ হিজরীতে (১৪১৭ খ্রি.) সুলতান তৃতীয় ইউসুফের সাহায্য নিয়ে এবং স্পেনেই সর্ব প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করে মরক্কোর উপর হামলা চালান এবং তার ভাইকে ক্ষমতাচ্যুত করে স্বয়ং মরক্কোর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ উপলক্ষে তিনি তৃতীয় ইউসুফকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

এই বছরই অর্থাৎ ৮২০ হিজরীতে (১৪১৭ খ্রি.) কাসতালার সম্রাট জন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং তার চাচা ফার্ডিনান্ডকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। তিনি তার মাতার পরামর্শ অনুযায়ী তৃতীয় ইউসুফের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। ইউসুফ এতই ন্যায়বিচারক ছিলেন যে, বেশির ভাগ খ্রিস্টান সামন্ত রাজা তাদের আপোসের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য তৃতীয় ইউসুফকেই বিচারক নিয়োগ করতেন এবং নির্দ্বিধায় তার সিদ্ধান্তই মনে নিতেন। সুলতান তৃতীয় ইউসুফ ৮২২ হিজরীতে (১৪১৯ খ্রি.) পরলোক গমন করেন। তারপর তাঁর পুত্র অষ্টম মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান অষ্টম মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেই কাসতালা, মরক্কো উভয় সাম্রাজ্যের সাথেই বন্ধুত্ব ও সন্ধি চুক্তি নবায়ন করেন এবং আমীর ইউসুফকে যার পূর্ব পুরুষরা গ্রানাডার কাযী (বিচারক) পদে নিযুক্ত ছিলেন, আপন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। আমীর ইউসুফ ছিলেন অত্যন্ত যোগ্যব্যক্তি। কিন্তু অষ্টম মুহাম্মাদ অযোগ্য লোকদের সাথে মেলামেশা এবং তাদের কুপরামর্শ গ্রহণের কারণে জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত নবম মুহাম্মাদ সুযোগ পেয়ে গ্রানাডা দখল করে নেন। অষ্টম মুহাম্মাদ একজন নাবিকের ছদ্মবেশে গ্রানাডা থেকে পালিয়ে তিউনিসের বাদশাহ আবুল ফারিসের কাছে চলে যান। আবুল ফারিস তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দানেরও প্রতিশ্রুতি দেন।

সুলতান মুহাম্মাদ (নবম)

সুলতান মুহাম্মাদ (নবম) সিংহাসনে আরোহণ করে সভাসদ ও কর্মকর্তাদের নিজের পক্ষে টেনে নেন। কিন্তু তিনি একটি ভুল করেন যে, মন্ত্রী ইউসুফকে আপন শত্রুতে পরিণত করেন এবং তাকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত হন। অগত্যা ইউসুফ পনেরশ' লোক সঙ্গে নিয়ে মার্সিয়ায় পালিয়ে আসেন এবং এখান থেকে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে কাস্তালার সম্রাটের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে তার কাছে চলে যান। তিনি সেখানে গিয়ে কাস্তালার সম্রাট জনকে অষ্টম মুহাম্মাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করেন। এতে ঐ খ্রিস্টান সম্রাট মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ পান। তিনি ইউসুফকে বলেন ঃ তুমি তোমার সঙ্গীদের মধ্য থেকে কিছু প্রভাবশালী লোকের একটা প্রতিনিধি দল তিউনিসিয়ার বাদশাহর কাছে পাঠিয়ে তাকেও সাহায্য করার জন্য বলো। যা হোক, প্রতিনিধিদল সেখানে যায় এবং তাদের অনুরোধক্রমে তিউনিসের বাদশাহ আবুল ফারিস পাঁচশ' অশ্বারোহী এবং বেশ কিছু অর্থ কয়েকটি জাহাজে করে অষ্টম মুহাম্মাদের কাছে স্পেনে প্রেরণ করেন। যখন সুলতান মুহাম্মাদ (অষ্টম) স্পেন উপকূলে অবতরণ করেন তখন মন্ত্রী ইউসুফের চেষ্টায় আলমেরিয়া প্রদেশের অধিবাসীরা তাকে সাহায্য প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করে। নবম মুহাম্মাদ যখন অষ্টম মুহাম্মাদের আগমন সংবাদ পান তখন তার মুকাবিলায় সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু যখন দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয় তখন ইউসুফের চেষ্টায় নবম মুহাম্মাদ বাহিনীর একটা বিরাট অংশ অষ্টম মুহাম্মাদের বাহিনীর সাথে এসে যোগ দেয়। অবশিষ্টরা অবস্থা বেগতিক দেখে সেখান থেকে পালিয়ে গ্রানাডা চলে আসে। এবার অষ্টম মুহাম্মাদ গ্রানাডা অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি ৮৩৩ হিজরীতে (অক্টোবর ১৪২৯-সেপ্টেম্বর ১৪৩০ খ্রি) গ্রানাডা জয় করেন এবং মুহাম্মাদকে হত্যা করে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অষ্টম মুহাম্মাদ পুনরায় সাম্রাজ্য লাভ করে মন্ত্রী ইউসুফের পরামর্শ অনুযায়ী তার পূর্বের কর্মধারা পরিবর্তন করেন এবং প্রজাকুলের সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যাপৃত হন। এবার খ্রিস্টান বাদশাহর দিক থেকে নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে অষ্টম মুহাম্মাদ তার সাথে একটি স্থায়ী আপোসচুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করেন। কিন্তু খ্রিস্টান বাদশাহ প্রত্যুত্তরে বলেন, যদি তুমি আমাকে কর দিতে রাযী হও তাহলে এই আপোসচুক্তি হতে পারে। কিন্তু অষ্টম মুহাম্মাদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। যেহেতু তখন কাস্তালা সাম্রাজ্যে কিছুটা আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল তাই সম্রাট জন সঙ্গে সঙ্গে গ্রানাডা আক্রমণ করেন নি। উভয়পক্ষের মধ্যে বেশ

কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে কখনো মুসলমানরা, আবার কখনো খ্রিস্টানরা জয়ী হয়। এই যুদ্ধ অব্যাহত ছিল এমনি সময়ে অষ্টম মুহাম্মাদের, ইউসুফ ইবনুল আহমার নামক জনৈক আত্মীয় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নিজের কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে নিজেকে গ্রানাডা সাম্রাজ্যের অধিকারী দাবি করে আলবীরায় অবস্থান করতে থাকেন। তিনি চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে কাস্তালার সম্রাটের কাছে এই মর্মে অঙ্গীকার করেন ঃ যদি আপনার সাহায্যে আমি গ্রানাডা সিংহাসনে আরোহণ করতে পারি তাহলে বিনাদ্বিধায় আপনাকে বার্ষিক কর প্রদান করব এবং প্রয়োজনবোধে আমার সেনাবাহিনী দিয়েও আপনাকে সাহায্য করবো। খ্রিস্টানরা এটাকে একটা দৈব আশীর্বাদ বলে মনে করে। কাস্তালা সম্রাট ইউসুফের সাহায্যার্থে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার বাহিনী আলবীরায় পাঠিয়ে দেন। এবার অষ্টম মুহাম্মাদ গ্রানাডা আক্রমণ করেন। কাস্তালা সম্রাটও তার সাহায্যার্থে সেখানে এসে হাযির হন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে দুই পক্ষের অনেক লোক নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত জয় পরাজয়ের একটা ফায়সালা হওয়ার পূর্বেই কাস্তালার সম্রাট ইউসুফ ইবনুল আহমারকে সঙ্গে নিয়ে কর্ডোভার দিকে এবং অষ্টম মুহাম্মাদ গ্রানাডার দিকে চলে যান।

কাস্তালার সম্রাট একটি গণদরবার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইউসুফ ইবনুল আহমারকে গ্রানাডার বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন এবং তাকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর তিনি ইউসুফকে একদল সৈন্য দিয়ে এই বলে বিদায় করেন যে, তুমি অবিলম্বে গ্রানাডা দখল কর। ইউসুফ পরিপূর্ণ আনুগত্যের পরিচয় দেন এবং সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গ্রানাডা সীমান্তে গিয়ে খ্রিস্টানদের সাহায্যে লুটপাট শুরু করেন। খ্রিস্টানরা এবার দুই দল মুসলমানের মধ্যে সংঘটিত এই সংঘর্ষ বেশ তৃপ্তির সাথেই লক্ষ্য করছিল। সুলতান অষ্টম মুহাম্মাদ তার মন্ত্রী ইউসুফকে, ইউসুফ ইবনুল আহমার-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ৮৩৯ হিজরী (১৪৩৫-৩৬ খ্রি.) মন্ত্রী ইউসুফ এক সংঘর্ষে ইউসুফ ইবনুল আহমারের হাতে নিহত হন। এই সংবাদ যখন গ্রানাডায় গিয়ে পৌঁছে তখন সেখানকার প্রজাদের মধ্যে ভয়ানক দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। তারা মুহাম্মাদেরও সমালোচনা করতে থাকে। অষ্টম মুহাম্মাদ অবস্থা বেগতিক দেখে আল-হামরা প্রাসাদের সমগ্র ভাণ্ডার সঙ্গে নিয়ে গ্রানাডা থেকে মালাক্কায় চলে যান।

ইউসুফ ইব্ন আল-আহ্মার

এরপর ইউসুফ ইব্ন আল-আহ্মার গ্রানাডা দখল করে নেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি তার আনুগত্য স্বীকারের জন্য কাস্তালা সম্রাটের কাছে পত্র পাঠান এবং অষ্টম মুহাম্মাদকে গ্রেফতার করার জন্য মালাগা অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণের উদ্যোগ নেন। কিন্তু মালাগা অভিমুখে সৈন্য প্রেরণের পূর্বেই মোট ছয় মাস রাজত্ব করে ইউসুফ ইব্ন আল-আহ্মার মৃত্যুবরণ করেন।

অষ্টম মুহাম্মাদ ইউসুফের মৃত্যু সংবাদ শোনার সাথে সাথে গ্রানাডা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং তৃতীয় বারের মত গ্রানাডা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এবার আমীর আবদুল হককে তার মন্ত্রী এবং আমীর আবদুল বারকে সেনাপতি নিয়োগ করেন। খ্রিস্টানরা পুনরায় গ্রানাডা আক্রমণ করে। তবে মুসলিম সেনাপতি তাদেরকে পরাজিত করে গ্রানাডা থেকে

পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। এই আক্রমণের কারণে খ্রিস্টানরা তাদের সাহস হারিয়ে ফেলে এবং মুসলিম সৈন্যরা আরো দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই মুহূর্তে, যখন মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং তাদের অবস্থা শুধরিয়ে নেবার সুবর্ণ সুযোগ ঠিক তখনি মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সুলতান অষ্টম মুহাম্মাদের ইব্ন উসমান নাম্নীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্র আলমেরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি তার চাচার বিরুদ্ধে গ্রানাডার প্রজাসাধারণকে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেন। যখন তার বিশ্বাস হলো যে, এখন গ্রানাডার লোকেরা তারই পক্ষ নেবে তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে গ্রানাডার আল-হামরা প্রাসাদ দখল করে নেন এবং অষ্টম মুহাম্মাদকে তৃতীয়বারের মত সিংহাসনচ্যুত করে বন্দী করে রাখেন। তখন সেনাপতি আমীর আবদুল বার গ্রানাডা থেকে পালিয়ে গিয়ে সুলতান অষ্টম মুহাম্মাদকে মুক্ত করার ব্যাপারে চেষ্টা-তদবীর করতে থাকেন। তিনি চিন্তা করেন, যদি আমি এখন অষ্টম মুহাম্মাদের মুক্তি দাবি করি তাহলে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, ইব্ন উসমান, যিনি সম্প্রতি গ্রানাডা সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, অষ্টম মুহাম্মাদকে হত্যা করে ফেলবেন। অতএব তিনি (আমীর আবদুল বার) সে পথে না গিয়ে অষ্টম মুহাম্মাদের অপর ভাতিজা ইব্ন ইসমাঈলকে তার সহযোগী করে নিয়ে তাকেই সুলতানের দাবি উত্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ইব্ন ইসমাঈল এই প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাযী হয়ে যান। তিনি কাস্তালার সম্রাটের কাছে চিঠিপত্রাদি লিখে এবং তার অনুমতি নিয়ে আবদুল বারের সাথে এসে মিলিত হন। খ্রিস্টানরা এটাকে একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। অতএব একদিকে ইব্ন ইসমাঈল এবং অপর দিকে কাস্তালার সম্রাট ইব্ন উসমানের সীমান্ত আক্রমণ করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চলতে থাকে। কিন্তু ৮৫২ হিজরীতে (মার্চ ১৪৪৮-ফেব্রুয়ারী ১৪৪৯ খ্রি) আরাগন ও আরবুনিয়ার খ্রিস্টান সম্রাটগণ কাস্তালা-সম্রাটের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ ঘটালে কাস্তালা-সম্রাট এমন এক নতুন বিপদে জড়িয়ে পড়েন যে, তখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করার মত সঙ্গতি বা পরিবেশ কোনটাই তার ছিল না। আর এর ফল দাঁড়ায় এই যে, ইব্ন ইসমাইলও তার প্রতিপক্ষ কাস্তালা সম্রাটের গৃহযুদ্ধ থেকে অব্যাহতি পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকেন। সুলতান ইব্ন উসমান যখন জানতে পারেন যে, আরাগন ও আরবুনিয়ার সম্রাটদ্বয় কাস্তালা সম্রাটের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছেন তখন তিনি এ দুই খ্রিস্টান সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন, যখন তোমরা ওদিক থেকে কাস্তালা আক্রমণ করবে তখন আমিও এদিক থেকে তা-ই করব, যাতে তোমরা অনায়াসে তোমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারো। সুতরাং ৮৫৪ হিজরীতে (১৪৫০ খ্রি.) সুলতান ইব্ন উসমান কাস্তালা সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং মার্সিয়া প্রদেশ দখল করেন এবং কাস্তালা বাহিনীকে অনেক দূর তাড়িয়ে দিয়ে প্রচুর মালে গনীমতসহ গ্রানাডায় ফিরে আসেন। পরবর্তী বছর সুলতান ইব্ন উসমান আন্দালুসিয়া প্রদেশের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং মার্সিয়ার ন্যায় এই প্রদেশটিকে একেবারে তছনছ করতে থাকেন। সুলতান ইব্ন উসমান তখন চাইলে কর্ডোভা দখল করে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি কর্ডোভার দিকে ফিরেও তাকান নি। ৮৫৮ হিজরী (১৪৫৪ খ্রি.) পর্যন্ত কাস্তালা সাম্রাজ্যের সাথে আরবুনিয়া ও আরাগণের বিরোধ অব্যাহত থাকে। এই সময়ে ইব্ন উসমান ও উল্লিখিত দু'টি খ্রিস্টান সাম্রাজ্যকে সাহায্য করতে থাকেন। কাস্তালা সম্রাট যখন

তার প্রতিপক্ষের সাথে আপোস চুক্তি সম্পাদন করেন তখন তিনি ইব্‌ন ইসমাঈলকে, যিনি ঐ সময়ে কাস্তালা সীমান্তে চুপচাপ অপেক্ষমাণ ছিলেন, সেনাবাহিনী দিয়ে ৮৫৯ হিজরী (১৪৫৫ খ্রি.) সনে ইব্‌ন উসমানের উপর হামলা পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করেন। যেহেতু ইব্‌ন ইসমাঈলের প্রতি অধিকাংশ মুসলিম শাসকের সহানুভূতি ছিল তাই ইব্‌ন উসমান তার হাতে পরাজিত হন। ইব্‌ন উসমান তার গুটি কয়েক সঙ্গী-সাথীকে নিয়ে গ্রানাডা থেকে পালিয়ে গিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন। আর এই সুযোগে ইব্‌ন ইসমাঈল গ্রানাডা সিংহাসন দখল করে নেন।

সুলতান ইব্‌ন ইসমাঈল

ইব্‌ন ইসমাঈলের সিংহাসন আরোহণের কিছুদিন পরই জন নামীয় কাস্তালা-সম্রাট মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এবার জনের পুত্র এবং পৌত্ররা ইব্‌ন ইসমাঈলের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। ৮৭০ হিজরী (সেপ্টেম্বর ১৪৬৫-আগস্ট ১৪৬৬ খ্রি) পর্যন্ত খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এই সমস্ত যুদ্ধে সুলতান ইব্‌ন ইসমাঈলের পুত্র আবুল হাসান অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। ৮৭০ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ১৪৬৫-আগস্ট ৬৬ খ্রি) ইব্‌ন ইসমাঈল মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তার পুত্র আবুল হাসান সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান আবুল হাসান

সুলতান আবুল হাসান যেহেতু একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি ছিলেন তাই সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি খ্রিস্টানদের সাথে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু এর কিছু দিন পর কাস্তালার রাজকুমার ফার্ডিনান্ড আরাগন সাম্রাজ্যের রাজকুমারী ইসাবেলাকে বিবাহ করেন এবং তখন থেকে আরাগন ও কাস্তালা সাম্রাজ্য একজোট হয়ে একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী খ্রিস্টান সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। ফার্ডিনান্ড এবং ইসাবেলা উভয়েই অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ ও মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন। তারা এক সাথে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, স্পেন উপদ্বীপ থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে হবে এবং মুসলিম নামধারী একটি ব্যক্তিকেও এখানে জীবিত রাখা হবে না। একদিকে ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছিল এবং অপর দিকে সুলতান আবুল হাসান উপস্থিত পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের সাথে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ৮৮০ হিজরীতে (১৪৭৫ খ্রি) ফার্ডিনান্ড সুলতান আবুল হাসানকে লিখেন ঃ যদি তুমি সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী হও তাহলে কোনরূপ ওযর-আপত্তি ছাড়াই আমাকে করদানে রাযী হয়ে যাও। কিন্তু আবুল হাসান এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করে ফার্ডিনান্ডকে লিখেন ঃ তোমার জেনে রাখা উচিত যে, খ্রিস্টানদের নিপাত করার জন্য গ্রানাডার টাকশালে এখন স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে লৌহ তরবারি তৈরি হচ্ছে। এই দুঃসাহসিক উত্তর পেয়ে ফার্ডিনান্ড কিছুদিন পর্যন্ত ভীতিগ্রস্ত এবং কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় থাকেন। তাই কয়েক বছর পর্যন্ত খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যকার যুদ্ধ মুলতবি থাকে। সুলতান আবুল হাসান এই দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন যে, তিনি স্পেনে একজন স্বাধীন নরপতি হিসাবেই থাকবেন এবং খ্রিস্টানদের বশ্যতা স্বীকারের চাইতে মৃত্যুকেই বরং বেছে নেবেন। এদিকে ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা যৌথভাবে দেশ শাসন করছিলেন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার প্রস্তুতিও গ্রহণ করছিলেন।

আবুল হাসান খ্রিস্টানদের যুদ্ধ পরিস্থিতির সংবাদ শুনে ৮৮৬ হিজরীতে (১৪৮১ খ্রি.) কাস্তালা সাম্রাজ্যের দখলাধীন সাখরাহ্ নামক দুর্গটি আক্রমণ করেন এবং একটি মাত্র রাত্র অবরোধ করে রাখার পর খ্রিস্টানদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নেন। ওয়াদিউল কবীরের উপকণ্ঠে অবস্থিত সাখরাহ্ দুর্গটি ছিল অত্যন্ত মজবুত এবং সুদৃঢ়। ফার্ডিনান্ডের পিতামহ একদা এই দ্বীপটি মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুলতান আবুল হাসান যখন গ্রানাডা সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন গ্রানাডা সামাজ্যের আয়তন ছিল চার হাজার বর্গমাইলের চেয়েও কম। আর কাস্তালা সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল সোয়া লক্ষ বর্গমাইলের চেয়েও বেশি। কেননা, আরাগন ও কাস্তালা একজোট হয়ে একটিমাত্র সাম্রাজ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সাখরাহ্ দুর্গ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে ফার্ডিনান্ড যারপর নাই মর্মাহত হন এবং প্রতারণার মাধ্যমে গ্রানাডা সাম্রাজ্যের আলহামাহ্ দুর্গ আক্রমণ করেন। যেহেতু ঐ দুর্গ রক্ষার জন্য তখন কোন সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল না তাই সামান্য চেষ্টার পরই খ্রিস্টানরা ঐ দুর্গটি দখল করে নেয়। মুসলমানরা সাখরাহ্ দুর্গ অধিকার করার পর সেখানকার নিরপেক্ষ খ্রিস্টানরা আলহামাহ্ দুর্গ দখল করে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সেখানকার সকল মুসলমানকে হত্যা করে ফেলে। ফার্ডিনান্ড আলহামায় দশ হাজার খ্রিস্টান সৈন্য রেখে রাজধানীতে ফিরে যান। গ্রানাডায় যখন আলহামার পাইকারী হত্যার সংবাদ পৌঁছে তখন সমগ্র শহরে দারুণ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সুলতান আবুল হাসান ঐ দুর্গ পুনঃদখলের জন্য একজন আরব অধিনায়ককে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছেই দুর্গ অবরোধ করে ফেলেন। তখন ফার্ডিনান্ড আলহামাহ্ দুর্গ রক্ষার জন্য তার একজন অধিনায়ককে প্রেরণ করেন। আরব অধিনায়ক এই সংবাদ পেয়ে তার বাহিনীর একটি অংশ দুর্গ অবরোধে নিয়োজিত রেখে অপর অংশ খ্রিস্টান অধিনায়কের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং খ্রিস্টান অধিনায়ক পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ঠিক ঐ মুহূর্তে অপর দিক থেকে আশবীলিয়ার শাসক তথা অপর একজন খ্রিস্টান অধিনায়ক একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। যেহেতু দুর্গ অবরোধে অতি অল্প সংখ্যক মুসলিম সৈন্য রয়ে গিয়েছিল তাই মুসলমানরা উপস্থিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে অবরোধ তুলে নিয়ে গ্রানাডায় ফিরে যায়। ফলে দুর্গটি মুসলমানদের দখলে আসতে পারে নি। আলহামাহ্ দুর্গটি ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং গ্রানাডার সন্নিকটে। তাই এই দুর্গটি খ্রিস্টানদের দখলে চলে যাওয়াটা ছিল মুসলমানদের জন্য খুবই বিপজ্জনক।

৮৮৬ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল (জুলাই ১৪৮১ খ্রি) মাসে সুলতান আবুল হাসানের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে যে, ফার্ডিনান্ড তার সমগ্র বাহিনী নিয়ে গ্রানাডা অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছে। অতএব সুলতান আবুল হাসানও তার বাহিনী নিয়ে গ্রানাডা থেকে রওয়ানা হন। গ্রানাডা সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী লুশার সন্নিকটে ৮৮৭ হিজরীর ২৭শে জমাদিউল আউয়াল (জুন ১৪৮২ খ্রি) একটি ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে ফার্ডিনান্ড শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং মুসলিম সেনাবাহিনী প্রচুর মালে গনীমত লাভ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একদিকে সুলতান আবুল হাসান তার প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্ডিনান্ডকে লুশার যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন এবং অন্যদিকে সুলতানের পুত্র আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ তার পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

এই বিজয় লাভের পর খ্রিস্টানদেরকে মেরে তাড়িয়ে তার সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি কাজে আবুল হাসানের নিয়োজিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু ঠিক তখনি তার কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, শাহযাদা আবূ আবদুল্লাহ্ আলমেরিয়া, বাস্তাহ এবং গ্রানাডা দখল করে আপন স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। সুলতান বাধ্য হয়ে মালাগায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। এভাবে গ্রানাডা এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্ব অর্ধাংশে আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মালাগা তথা পশ্চিম অর্ধাংশ সুলতান আবুল হাসানের অধীনে থাকে। এই ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রকে দু'ভাগে বিভক্ত হতে দেখে একদিকে খ্রিস্টানদের লালসা বৃদ্ধি পায় এবং অপর দিকে বিদ্রোহী শাহযাদা আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ পিতার কাছ থেকে বাকি অর্ধেক সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। যা হোক সর্ব প্রথম সেভিল, ইস্তিজাহ এবং সারীশের খ্রিস্টান শাসকরা সেনাবাহিনী গঠন করে মালাগায় সুলতান আবুল হাসানের উপর হামলা চালায়। ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে সেভিল এবং সারীশের শাসকদ্বয় তাদের দু'হাজার অশ্বারোহীসহ মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। খ্রিস্টান বাহিনীর অন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় নতুবা পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। একদিকে সুলতান আবুল হাসান এই খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মালাগা থেকে বের হয়েছিলেন এবং অন্যদিকে তার পুত্র মালাগা দখল করার জন্য সেখানে এসে পৌঁছেছিলেন। সুলতান যখন বিজয়ী বেশে মালাগায় ফিরে আসেন তখন আপন পুত্রের সাথেই তার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধেও সুলতান বিজয়ী হন এবং আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ পরাজিত হয়ে গ্রানাডার দিকে পালিয়ে আসেন। সুলতান আবুল হাসান আপন পুত্র আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদকে তাড়িয়ে দিয়ে মালাগায় প্রবেশ করার পর পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন এবং তার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। এদিকে আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ তার পিতার দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে নতুনভাবে সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং খ্রিস্টান এলাকার উপর হামলা চালান। তিনি লুশনীয়ায় পৌঁছে তার বাহিনীকে লুটপাটে নিয়োজিত করেন। সেখানকার খ্রিস্টান বাহিনীর অধিনায়ক এই অনভিজ্ঞ নৃপতিকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার বাহিনীকে নিয়ে একটি পৃথক ঘাঁটিতে অপেক্ষমাণ থাকেন। যখন আবূ আবদুল্লাহ্ প্রচুর মালে গনীমত নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন ঠিক তখনি খ্রিস্টান অধিনায়ক ঐ গিরিপথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে আবূ আবদুল্লাহর বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেন। এতে সমগ্র মুসলিম বাহিনী খ্রিস্টানদের হাতে নিহত এবং আবূ আবদুল্লাহ্ বন্দী হন। আবূ আবদুল্লাহ্কে কাস্তালার সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই সংবাদ শুনে গ্রানাডার অধিবাসীরা মালাগায় গিয়ে সুলতান আবুল হাসানের সাথে সাক্ষাত করে এবং তাকে গ্রানাডায় আসার আমন্ত্রণ জানায়। সুলতান অসুস্থতা ও অক্ষমতার কারণে ঐ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার ভাই আবূ আবদুল্লাহ্ যাগালকে গ্রানাডা সিংহাসনে আরোহণ করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি সংসার ত্যাগ করে নির্জনবাসে চলে যান।

সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্ যাগাল

সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্ যাগাল সিংহাসনে আরোহণ করে শাসন ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করতে শুরু করেন। কিন্তু খ্রিস্টানরা একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে মালাগা প্রদেশ আক্রমণ করে এবং সেখানকার যে সমস্ত দুর্গ অরক্ষিত ছিল সেগুলোকে অতি সহজেই দখল করে নেয়। শেষ

পর্যন্ত তারা বাকওয়ান দুর্গ অবরোধ করে এবং প্রচুর গোলাবর্ষণ করে একটি প্রাচীর ধ্বংস করে ফেলে। মুসলমানদের অতি ক্ষুদ্র যে বাহিনীটি দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল তারা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে খ্রিস্টান বাহিনীর মুকাবিলা করে তাদের বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে হত্যা করে। শেষ পর্যন্ত এক এক করে মুসলিম বাহিনীর সকলেই নিহত হয় এবং ঐ দুর্গটি খ্রিস্টানদের দখলে চলে যায়। ৮৯০ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল (মে ১৪৮৫ খ্রি) মাসে খ্রিস্টানরা রিনদা দুর্গটিও দখল করে নেয়। সেটি তখন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ৮৯০ হিজরীর ১৯শে শাবান (আগস্ট ১৪৮৫ খ্রি) সুলতান যাগাল সীমান্ত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে গ্রানাডা থেকে রওয়ানা হন। তিনি গ্রানাডার নিকটবর্তী মাসলীন দুর্গের ব্যবস্থাপনায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং দুর্গের বাইরের একটি মাঠে তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান করছিলেন এমন সময়ে খ্রিস্টানরা একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে একেবারে অতর্কিতে তাঁর উপর হামলা চালায় এবং মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করে। যেহেতু এই হামলাটি ছিল একেবারে ধারণাতীত তাই মুসলিম বাহিনী একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। খ্রিস্টানরা অবিরাম হত্যাকাণ্ড চালিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। এমনকি, সুলতান যাগালের তাঁবুর নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। মুসলমানরা তাদের সুলতানকে এরূপ অরক্ষিত অবস্থায় দেখে দ্রুত নিজেদের সামলিয়ে নেয় এবং সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে খ্রিস্টানদের উপর হামলা চালায়। শীঘ্রই যুদ্ধের রূপ বদলে যায় এবং খ্রিস্টানরা তাদের হাজার হাজার সহযোগীর লাশ যুদ্ধ ক্ষেত্রে রেখে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে। ফলে খ্রিস্টানদের সম্পূর্ণ তোপখানাটি মুসলমানদের হস্তগত হয়। সম্রাট ফার্ডিনান্ড একটি বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে ঐ আক্রমণকারী খ্রিস্টান বাহিনীর পিছনে পিছনে আসছিলেন। তিনি ঐ পলায়নপর সৈন্যদের কাছে থেকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। এতদসত্ত্বেও তিনি যখন সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সংকল্প নেন তখন জানতে পারেন যে, সুলতান যাগাল খ্রিস্টানদের কাছ থেকে যে সমস্ত কামান কেড়ে নিয়েছিলেন তা মাসলীন দুর্গে স্থাপন করে দুর্গটিকে সুদৃঢ় করে নিয়েছেন এবং খ্রিস্টান বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছেন। এই সংবাদ শুনে ফার্ডিনান্ড সাহস হারিয়ে ফেলেন এবং সেখান থেকেই ফিরে যান। তিনি এবার অরক্ষিত দুর্গসমূহের উপর আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদেরকে ত্যক্ত বিরক্ত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

ফার্ডিনান্ড বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করলেও তার এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয় যে, মুসলিম সাম্রাজ্যকে নির্মূল করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। তিনি একথাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, যদি মুসলমানরা পুনরায় একতাবদ্ধ হয়ে তরবারি হাতে নেয় তাহলে এদের পক্ষেও তারিক ও মূসার মত খ্রিস্টান সাম্রাজ্যসমূহকে ধ্বংস করে সমগ্র স্পেন উপদ্বীপ দখল করে নেওয়া অসম্ভব কিছু নয়। ফার্ডিনান্ডের এই চিন্তাধারা কিছুদিনের জন্য তাকে প্রকাশ্য যুদ্ধাভিযান থেকে বিরত রাখে।

ফার্ডিনান্ড এবার প্রকাশ্যে যুদ্ধ না করে প্রতারণার আশ্রয় নেন। আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন আবুল হাসান, যিনি নূশীলা যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন, ফার্ডিনান্ড তাকে নিজের সামনে ডেকে পাঠিয়ে অত্যন্ত সহানুভূতির সুরে বলেন ঃ গ্রানাডা সাম্রাজ্যের আসল উত্তরাধিকারী তো তুমিই। তোমার চাচা যাগাল জবরদস্তিমূলকভাবে তোমাকে সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত

করেছেন। আমি চাই যে, আমার প্রতিবেশী মুসলিম সাম্রাজ্যটি ভাল অবস্থায়ই থাক এবং আমাদের মধ্যে যেন কোন প্রকার সংঘর্ষই সৃষ্টি না হয়। মোটকথা, তিনি আবূ আবদুল্লাহ্‌কে সাম্রাজ্যের প্রলোভন দেখিয়ে এই প্রতিশ্রুতিও দেন যে, যে সমস্ত শহর তোমার দখলে আসবে আমি সেগুলোর কোন ক্ষতি করবো না, কিন্তু যাগালের দখলে যে সমস্ত শহর রয়েছে আমি তার থেকে সেগুলো ছিনিয়ে আনার চেষ্টা করবো। কেননা যাগালের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই। আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ফার্ডিনান্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা মালাগায় চলে আসেন এবং এখানকার লোকদের কাছে ফার্ডিনান্ডের প্রতিশ্রুতির কথা বলে তাদেরকে তার আনুগত্য স্বীকারের প্রতি আহবান জানান। মালাগাবাসীরা এই মনে করে যে, আমরা যদি আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদকে নিজেদের সুলতান বলে মেনে নেই তাহলে খ্রিস্টানদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকব। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাকে নিজেদের সুলতান বলে স্বীকার করে নেয়। এরপর আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ তার অধিকৃত এলাকার আয়তন বৃদ্ধি করতে থাকেন। যাগাল এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন, কিন্তু ঐ সমস্ত খ্রিস্টান, যারা বেযীন নামক স্থানে বসবাস করছিল, অত্যন্ত জোরেশোরে আবূ আবদুল্লাহ্ সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। তাই যাগালের চেষ্টা ফলবতী হয়নি। শেষ পর্যন্ত আবূ আবদুল্লাহ্ তার চাচা যাগালের কাছে লূশা নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দাবি করে বসেন। অবশ্য তিনি যাগালকে বলেন, যদি আপনি লূশার শাসনক্ষমতা আমার হাতে অর্পণ করেন তাহলে আমি আপনার সাথে মিলে ফার্ডিনান্ডের উপর হামলা চালাব। যাগাল যখন লক্ষ্য করেন যে, তার অধিকাংশ প্রজা এবং কোন কোন অধিনায়ক ও আবূ আবদুল্লাহ্‌র ঐ প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী তখন তিনি আবূ আবদুল্লাহ্‌র হাতে লূশার শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন। এবার একদিকে আবূ আবদুল্লাহ্ লূশা দখল করেন এবং অন্যদিকে ফার্ডিনান্ড তার বাহিনী নিয়ে লূশা অভিমুখে রওয়ানা হন। আবূ আবদুল্লাহ্ ফার্ডিনান্ডকে স্বাগত জানান এবং লূশার শাসনক্ষমতা তার হাতে তুলে দিয়ে ৮৯১ হিজরীর জমাদিউস সানী (জুন ১৪৮৬ খ্রি) মাসে আলবীরা, মাসলীন এবং সাখরাহ্ দুর্গ অবরোধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। খ্রিস্টান সৈন্যদের সহায়তায় আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ এই দুর্গগুলোও দখল করে ফার্ডিনান্ডের হাতে অর্পণ করেন। এভাবে গ্রানাডা রাজ্যের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড, যা দখল করা ফার্ডিনান্ডের জন্য ছিল অত্যন্ত কঠিন, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদের কারণে অনায়াসে তার দখলে চলে আসে। কেননা বেশির ভাগ প্রজা আবূ আবদুল্লাহ্‌কে নিজেদেরই রাজকুমার ও রাজসিংহাসনের অধিকারী মনে করে তার বিরোধিতা থেকে নিরস্ত্র থাকে। কিন্তু যখন এসব গুরুত্বপূর্ণ স্থান ফার্ডিনান্ডের হাতে চলে যায় তখন মুসলমানরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে যে, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ খ্রিস্টান সম্রাটের একজন এজেন্ট ছাড়া কিছু নন। তিনি নিজের জন্য নয়, বরং কাস্তালার সম্রাটের জন্যই বিভিন্ন শহর ও দুর্গ দখল করছেন। নাবীরীন নামক স্থানটি ছিল গ্রানাডা শহরের একেবারে সন্নিকটে। সেখানে শুধু খ্রিস্টানরা বসবাস করত। তাই আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ নাবীরীনে অবস্থান করে গ্রানাডাবাসীদেরকে নিজের পক্ষে টেনে আনার প্রচেষ্টা চালান। এখানে যখন এই টানাপড়েন অবস্থা তখন মালাগাবাসীরা সুলতান যাগালের আনুগত্য স্বীকার করে সেখান থেকে খ্রিস্টানদের যাবতীয় চিহ্নাদি একেবারে মুছে ফেলে। স্বয়ং ফার্ডিনান্ড

৮৯২ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মার্চ ১৪৮৬ খ্রি) মাসে একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে মালাগা আক্রমণ করেন। তার কিছু যুদ্ধ জাহাজও মালাগা উপকূলে গিয়ে পৌঁছে। ফার্ডিনান্ডের এই আক্রমণ সংবাদ শুনে সুলতান যাগাল গ্রানাডা থেকে একটি বাহিনীসহ মালাগা অভিমুখে রওয়ানা হন। এদিকে গ্রানাডাকে খালি দেখতে পেয়ে ৮৯২ হিজরীর ১৫ই জমাদিউল আউয়াল (মে ১৪৮৬ খ্রি) আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ অতি সহজেই তা দখল করে নেন। যাগাল যখন জানতে পারেন যে, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ গ্রানাডা দখল করে নিয়েছেন তখন তিনি মালাগাকে ফার্ডিনান্ডের অবরোধ রেখেই স্বয়ং গ্রানাডা অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে যখন তিনি জানতে পারেন যে, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ গ্রানাডার উপর পরিপূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন তখন তিনি 'ওয়াদিয়ে আশ'-এ অবস্থান গ্রহণ করেন। মালাগা-বাসীরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে খ্রিস্টানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। সেই সাথে তারা মরক্কো, তিউনিসিয়া, মিসর এবং তুরস্কের সুলতানদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। কিন্তু কেউ তাদের আবেদনে সাড়া দেয়নি। মালাগাবাসীরা যখন দেখতে পেল যে, এ পৃথিবীতে তাদের কোন পৃষ্ঠপোষক বা সাহায্যকারী নেই তখন তারা নিরাশ হয়ে ৮৯২ হিজরীর শাবান মাসে (১৪৮৬-৮৭ খ্রি) মালাগাকে ফার্ডিনান্ডের হাতে অর্পণ করে। যখন তারা ফার্ডিনান্ডের কাছে আপোসচুক্তির আবেদন জানায় তখন ফার্ডিনান্ড তাদেরকে বলেন–এখন তোমাদের যাবতীয় রসদসামগ্রী শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া তোমরা সবদিক থেকেই নিরাশ হয়ে পড়েছ। অতএব তোমরা শর্তহীনভাবে নগরীর চাবিসমূহ আমার কাছে পাঠিয়ে দাও এবং শুধু আমার দয়া ও করুণার উপর নির্ভর করে থাক। শেষ পর্যন্ত ফার্ডিনান্ড যখন মালাগা দখল করেন তখন আপন সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন, তোমরা প্রত্যেকটি মুসলমানকে বন্দী কর এবং তাদের যাবতীয় বিষয়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নাও। অতএব খ্রিস্টানরা ১৫ হাজার মুসলমানকে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করে এবং অবশিষ্ট সকল অধিবাসীকে নিঃস্ব অবস্থায় মালাগা থেকে বের করে দেয়। এদের মধ্যে অনেকেই ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় পথিমধ্যে মারা যায়। কিছু সংখ্যক লোক আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় এবং সেখানেই অধিবাস গ্রহণ করে। মালাগা দখল করার পর ফার্ডিনান্ড এর পার্শ্ববর্তী সমগ্র শহর ও দুর্গ জয় করে সেখানকার মুসলিম অধিবাসীদেরকে হয় হত্যা করেন, নয়ত দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন। এরপর তিনি একের পর এক শহর ও দুর্গ দখল করে সেখান থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে শুরু করেন। তিনি 'ওয়াদিয়ে আশ'-এ উপনীত হয়ে সেখানে অবস্থানরত সুলতান যাগালকে নিজের সহযোগী করে নেওয়ার চেষ্টা করেন। আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ গ্রানাডা দখল করে নেওয়ার পর ফার্ডিনান্ডের এই বিজয় অভিযানকে মোটেই সুনজরে দেখছিলেন না এবং গ্রানাডা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা নিজের কর্তৃত্বাধীনে রাখতে চাচ্ছিলেন। উপরন্তু গ্রানাডাবাসীরাও তার পক্ষ নিয়ে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগ্রহ ব্যক্ত করছিলেন। এমতাবস্থায় ফার্ডিনান্ড কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে যাগালের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন এবং তার হাতে পুনরায় গ্রানাডার শাসন কর্তৃত্ব তুলে দেবার প্রলোভন দেখান। শেষ পর্যন্ত অসহায়ত্বের কারণেই হোক কিংবা তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদকে ধ্বংস করার কারণেই হোক, সুলতান যাগাল 'ওয়াদিয়ে আশ'

ফার্ডিনান্ডের হাতে অর্পণ করে তার সঙ্গে মিশে যান। মোটকথা এই খ্রিস্টান সম্রাট একেবারে অন্তিম মুহূর্তেও মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য মুসলমানদেরই সাহায্য গ্রহণকে অপরিহার্য মনে করেন। সুলতান যাগাল তার পক্ষে চলে আসায় অতি সহজেই আলমেরিয়া ফার্ডিনান্ডের দখলে চলে আসে। আর আলমেরিয়া ও ওয়াদিয়ে আশ দখল করা ছিল স্পেন থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলারই শামিল। এখন শুধু গ্রানাডা শহর এবং তার পার্শ্ববর্তী সামান্য কিছু অঞ্চল ছিল মুসলমানদের দখলে। ফার্ডিনান্ড ৮৯৫ হিজরীর সফর (ডিসেম্বর ১৪৮৯ খ্রি) মাসে ওয়াদিয়ে আশ এবং আলমেরিয়া দখল করে সুলতান যাগালকে তার সহযোগী করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক তখনি সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ আল-হামরা প্রাসাদে বসে তার চাচা যাগালের এই অশুভ পরিণতি দেখে এই ভেবে সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন যে, এবার তার (যাগালের) দখল থেকে গোটা দেশটাই বেরিয়ে গেছে। আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ এবার দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছিলেন যে, এবার গ্রানাডায় শুধু তার কর্তৃত্বই বহাল থাকবে। কেননা, ফার্ডিনান্ড কখনো গ্রানাডা দখলের দুঃসাহস করবেন না। কিন্তু ফার্ডিনান্ড আবূ আবদুল্লাহ্কে লিখেন– যেভাবে তোমার চাচা যাগাল তার দখলাধীন সমগ্র এলাকা আমার হাতে অর্পণ করেন ঠিক সে ভাবে তুমিও আল-হামরা প্রাসাদ এবং গ্রানাডা আমার হাতে অর্পণ কর। এই চিঠি পেয়ে আবূ আবদুল্লাহ্ গ্রানাডার প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে একত্রিত করে ফার্ডিনান্ডের অভিপ্রায় সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন এবং বলেন, যাগালই ফার্ডিনান্ডকে গ্রানাডা দখলের জন্য উৎসাহিত করেছেন। এখন আমাদের সামনে শুধু দু'টি পথ খোলা আছে হয় আমরা গ্রানাডা ও আল-হামরা প্রাসাদ ফার্ডিনান্ডের হাতে তুলে দেব, নয়ত তার সাথে যুদ্ধ করব। গ্রানাডাবাসীরা আবূ আবদুল্লাহ্র অবিশ্বস্ততা ও অনুপযুক্ততা সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকিফহাল ছিলেন, কিন্তু উপস্থিত পরিস্থিতিতে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সমীচীন ছিল না। অতএব তারা সকলে যুদ্ধের পক্ষেই রায় দেয়। আবদুল্লাহর মনের ইচ্ছা যাই থাকুক না কেন, সকলকে যুদ্ধের ব্যাপারে একমত হতে দেখে তিনিও নির্দ্বিধায় সে মত গ্রহণ করেন। এখানে যখন এই পরামর্শ হচ্ছিল ঠিক তখনি কাস্তালার সম্রাট ফার্ডিনান্ড একটি দুরন্ত খ্রিস্টান বাহিনী নিয়ে আসেন এবং ৮৯৫ হিজরীর রজব (জুন ১৪৯০ খ্রি) মাসে গ্রানাডা অবরোধ করে ফেলেন। শহরবাসীরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাকে প্রতিরোধ করে। ফলে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ চলতে থাকে। খ্রিস্টানরা গ্রানাডার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দুর্গ দখল করে নেয়। কিন্তু মুসলমানরা এত দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানদের হাত থেকে তাদের সদ্য দখলীকৃত এলাকাসমূহ ছিনিয়ে নিয়ে আসে। ফার্ডিনান্ড এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আপাতত গ্রানাডা জয়ের সিদ্ধান্ত মুলতবি রেখে অবরোধ তুলে নিয়ে আপন রাজধানীতে ফিরে যান। সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ এটাকে একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করেন এবং গ্রানাডাবাসীদের সঙ্গে নিয়ে ঐ সমস্ত এলাকার দিকে অগ্রসর হন, যে সমস্ত এলাকা খ্রিস্টানরা ইতিমধ্যে দখল করে নিয়েছিল। তিনি কোন কোন দুর্গ দখল করে সেখানকার খ্রিস্টান বাহিনীকে হত্যা করেন এবং তাদের স্থলে খ্রিস্টান বাহিনী মোতায়েন করেন। এরপর তিনি গ্রানাডায় ফিরে এসে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেন এবং একটি বাহিনী নিয়ে বাশরাত-এর

দিকে রওয়ানা হন। তিনি সেখানকার কিছু অঞ্চল দখল করেন এবং আন্দরশ দুর্গ দখল করে সেখানে খ্রিস্টান পতাকার স্থলে ইসলামী পতাকা উত্তোলন করেন। বাশরাতের সমগ্র অধিবাসীরা আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদের আনুগত্য স্বীকার করে। ফলে ঐ দেশে নতুনভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘটনাক্রমে বাশরাতেই কোন একটি পল্লীতে আবূ আবদুল্লাহর চাচা যাগাল অবস্থান করছিলেন। তিনি আবদুল্লাহকে এভাবে বিজয়ী বেশে দেখে হিংসায় জ্বলে ওঠেন এবং তার মুকাবিলার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তিনি সেখান থেকে আলমেরিয়ায় গিয়ে খ্রিস্টানদেরকে তার পক্ষে টেনে আনার প্রচেষ্টা চালান। তিনি আবূ আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিয়ে ফার্ডিনান্ডকে এই মর্মে প্ররোচনা দেন যে, আবূ আবদুল্লাহ্ এই পরিমাণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, যদি আরো কিছুদিন তাকে এভাবে বাড়তে দেওয়া হয় তাহলে তাকে প্রতিরোধ করা শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠবে। যাগালের এই ধারণা অমূলক ছিল না। কিন্তু তিনি নিজেই আবূ আবদুল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এবং তার বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ করে আবূ আবদুল্লাহ্ এবং গ্রানাডাবাসীদের এমনভাবে স্তব্ধ করে দেন, যা ছিল খ্রিস্টানদের কল্পনারও বাইরে। কিন্তু এই মুহূর্তে যাগালের উচিত ছিল মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে কাজ করা এবং ব্যক্তিগত হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে মুসলিম ঐক্যকে সর্বোচ্চে স্থান দেওয়া। কিন্তু এটা মুসলমানদেরই দুর্ভাগ্য যে, এ ধরনের পরস্পর শত্রুতা ও অনৈক্য তাদেরকে দিনের পর দিন দুর্বল করে তুলতে থাকে। যা হোক, ৮৯৫ হিজরীর রমযান (আগস্ট ১৪৯০ খ্রি) মাসে যাগাল খ্রিস্টান বাহিনীকে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করে আন্দরশ দুর্গটি মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। অবশ্য ঐ মাসেই আবূ আবদুল্লাহ্ গ্রানাডাবাসীদের বল-বিক্রম কাজে লাগিয়ে হামাদান, মানকাব এবং শালূবানিয়া জয় করেন। শালূবানিয়া দুর্গ তখনো দখলে আসেনি এমন সময় সংবাদ আসে যে, কাস্তালার সম্রাট ফার্ডিনান্ড একটি বিরাট বাহিনীসহ গ্রানাডার সন্নিকটে এসে পৌঁছেছেন। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আবূ আবদুল্লাহ্ শালূবানিয়া দুর্গ থেকে গ্রানাডা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং ৮৯৫ হিজরীর ৩রা শাওয়াল (সেপ্টেম্বর ১৪৯০ খ্রি) গ্রানাডায় এসে পৌঁছেন। খ্রিস্টান বাহিনী মালাহ্ দুর্গ ধ্বংস করে ফেলেছিল। অষ্টম দিনে তারা গ্রানাডা ত্যাগ করে 'ওয়াদিয়ে আশ'-এর পথে রওয়ানা হয় এবং সেখানে পৌঁছে মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করে এবং যারা জীবিত রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত একজন মুসলমানও সেখানে আর অবশিষ্ট ছিল না। খ্রিস্টানরা আন্দরশ দুর্গকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেয়। এভাবে হত্যা ও লুটপাট চালানোর পর খ্রিস্টানবাহিনী তাদের রাজধানী অভিমুখে ফিরে যায়।

ফার্ডিনান্ড কাস্তালা অভিমুখে ফিরে যাবার সময় যাগালকে যিনি ফার্ডিনান্ডের পক্ষাবলম্বন করে আবূ আবদুল্লাহ্র চরম বিরোধিতা করেছিলেন ডেকে নির্দেশ দেন—এখন এদেশে আপনার আর কোন প্রয়োজন নেই। আমি আপনার উপর শুধু এতটুকু অনুগ্রহ করতে পারি যে, যদি আপনি এই দেশ অর্থাৎ স্পেন উপদ্বীপ থেকে বের হয়ে অন্য কোন দেশে চলে যেতে চান তাহলে আমি আপনার সামনে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করব না। যাগাল এই নির্দেশ শোনামাত্র স্পেন থেকে রওয়ানা হয়ে আফ্রিকা গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখানে

তিলমিসান নামক স্থানে অজ্ঞাত ও অখ্যাত অবস্থায় জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেন। এখানে কাস্তালা সম্রাট ফার্ডিনান্ডের দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতার কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। তিনি যেহেতু স্পেন থেকে চিরদিনের জন্য মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে চাচ্ছিলেন তাই তার প্রতিটি পদক্ষেপে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণতা ছিল পরিস্ফুট। তিনি তাড়াহুড়াকে কখনো প্রশ্রয় দেন নি। যা হোক এবারও ফার্ডিনান্ড ফিরে যাবার পর আবূ আবদুল্লাহ্ বার্সিলোনার দিকে অগ্রসর হন এবং তা অবরোধ করে জয় করেন। কিন্তু এর কিছু দিন পরই যুলকাদা মাসের শেষ পক্ষে খ্রিস্টানরা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের হাত থেকে ঐ শহরটি ছিনিয়ে নেয় এবং সেখানে একজন মুসলমানকেও জীবিত রাখেনি। এবার গ্রানাডাবাসীরা নিজেদের সংখ্যাল্পতা এবং অত্যধিক কর্মব্যস্ততার কারণে একেবারে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের এই ক্লান্তির একটি কারণ এও ছিল যে, তারা স্পেনের এখানে সেখানে থেকে মুসলমানদের হত্যা ও বিতাড়নের সংবাদ পাচ্ছিল এবং তাদের অন্তরে এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল যে, তারা বাইরে থেকে কোন সাহায্য আর পাবে না।

স্পেনে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিসমাপ্তি

৮৯৬ হিজরীর ১২ই জমাদিউস সানী (এপ্রিল ১৪৯১ খ্রি) কাস্তালার সম্রাট ফার্ডিনান্ড রাণী ইসাবেলাসহ দুর্গবিধ্বংসী তোপ-কামান এবং অসংখ্য সৈন্য নিয়ে গ্রানাডার সন্নিকটে এসে পৌঁছেন। এখানে পৌঁছেই তিনি সবুজ-শ্যামল উদ্যানরাজি, শস্যক্ষেত ও ঘরদরজা ধ্বংস এবং মুসলিম অধিবাসীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করেন। গ্রানাডার সম্মুখে পৌঁছে তিনি তাঁবু স্থাপন করেন এবং সাথে সাথে শহরও অবরোধ করেন। অবরুদ্ধ শহরবাসীরা অনন্যোপায় হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শহরের একটি অংশ যেহেতু শালীর পর্বতের সাথে সংযুক্ত ছিল তাই খ্রিস্টান বাহিনী শহরকে পুরোপুরি অবরোধ করতে পারেনি। আনুমানিক ৮ মাস পর্যন্ত এই অবরোধ অব্যাহত থাকে। স্পেন উপদ্বীপে এই একটি অবরুদ্ধ শহর ছাড়া মুসলিম অধিকৃত আর কোন ভূখণ্ড ছিল না। যখন শীত মওসুম শুরু হলো এবং তুষারপাতের ফলে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল তখন শালীর পর্বত দিয়ে শহরবাসীদের কাছে যে রসদ পৌঁছাত তা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। তাই ৮৯৭ হিজরীর সফর (ডিসেম্বর ১৪৯১ খ্রি) মাসে শহরবাসীরা সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্র কাছে আবেদন জানাল— "যতক্ষণ আমাদের দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যাব। দুর্গের মধ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণায় মরার চেয়ে আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দেব।

প্রথম স্পেন বিজয়ী সেনাপতি তারিক ইব্ন যিয়াদের সেই অপূর্ব বীরত্বের কথা আমরা ভুলে যাইনি। তিনি একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে এক লক্ষ খ্রিস্টান যোদ্ধার সাথে লড়েছিলেন। এই অবরুদ্ধ অবস্থায় আমাদের সৈন্য সংখ্যা বিশ হাজারের চাইতে সামান্য কম। কিন্তু যেহেতু আমরা মুসলমান তাই এক লক্ষ খ্রিস্টান সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাদের ভীতিগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই।" সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্ যখন দেখলেন, শহরবাসীদের মধ্যে যেভাবে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অবিলম্বে যুদ্ধ অথবা চুক্তির সিদ্ধান্ত না নিলে সাধারণ মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যে কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে, তাই তিনি মন্ত্রী ও অধিনায়কবৃন্দকে ডেকে পাঠিয়ে তাদের নিয়ে আল-হামরা প্রাসাদে একটি পরামর্শ সভার

আয়োজন করেন। শহরের উলামা ও শায়খবৃন্দ উক্ত সভায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, খ্রিস্টানরা শহর দখল না করা পর্যন্ত অবরোধ তুলে নেবে না। অতএব এই সংকটময় মুহূর্তে কি করা উচিত সে সম্পর্কে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্‌র সাহস এতই হ্রাস পেয়েছিল যে, এই কয়েকটি শব্দ ছাড়া তার মুখ দিয়ে আর একটি বাক্যও বের হয়নি। এর জবাবে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বলেন, কাস্তালার সম্রাটের সাথে সন্ধি স্থাপন করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বীর সেনাপতি মূসা ইব্‌ন আবীল গাস্‌সানী এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এখনো আমাদের জয়লাভের আশা আছে। অতএব নিরুৎসাহ হওয়ার কোন কারণ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা খ্রিস্টানদের অবরোধ তুলে দিয়ে তাদেরকে এ শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হব। গ্রানাডার অধিবাসীদের অভিমতও ছিল তাই। কিন্তু যারা উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাদের কেউই মূসাকে সমর্থন করেন নি। অতএব এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যেহেতু খ্রিস্টানরা যুদ্ধে জয়লাভ করলে একজন মুসলমানকেও জীবিত রাখবে না, তাই এমন কিছু শর্তের উপর সন্ধি স্থাপন করা উচিত যাতে সাধারণ লোকের জানমালের কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু যেহেতু সেনাবাহিনী ও প্রজাসাধারণ যুদ্ধের পক্ষে ছিল তাই আবূ আবদুল্লাহ্‌ তার মন্ত্রী আবুল কাসিম আবদুল মালিককে গোপনে ফার্ডিনান্ডের কাছে পাঠিয়ে উক্ত সন্ধি-প্রস্তাব পেশ করেন। শহর এবং দুর্গের অবস্থা সম্পর্কে খ্রিস্টানরা অনবহিত ছিল বিধায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের কোন ক্ষতি করতে পারছিল না। ফলে তারা কিছুটা বিরক্ত ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল। অতএব মন্ত্রী আবুল কাসিম সন্ধি-প্রস্তাব নিয়ে ফার্ডিনান্ডের দরবারে পৌঁছার পর তারা সকলেই আনন্দিত হয়। কাস্তালা সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে আবূ আবদুল্লাহ্‌র আবেদন মঞ্জুর করেন। এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রী আবুল কাসিম রাতের বেলা দুর্গ থেকে বেরিয়ে গিয়ে খ্রিস্টানদের সাথে সাক্ষাত করতেন এবং পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির শর্তাবলী নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালাতেন। অনেক দর কষাকষির পর চুক্তির শর্তাবলী নির্ধারিত হয় এবং আবূ আবদুল্লাহ্‌ ও ফার্ডিনান্ড চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

খ্রিস্টানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র

খ্রিস্টানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. মুসলমানদের এই স্বাধীনতা থাকবে যে, তারা ইচ্ছা করলে শহরের ভিতরে থাকতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে বাইরে চলে যেতে পারবে। কোন মুসলমানের জানমালের কোন ক্ষতি করা হবে না।

২. খ্রিস্টানরা মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না।

৩. কোন খ্রিস্টান মুসলমানদের মসজিদে ঢুকতে পারবে না।

৪. মসজিদ ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহ যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই থাকবে।

৫. মুসলমানদের মামলা-মকদ্দমার ফায়সালা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী মুসলমান বিচারকরাই করবেন।

৬. উভয় পক্ষের বন্দীদেরকে মুক্তি দেওয়া হবে।

৭. কোন মুসলমান স্পেন থেকে আফ্রিকা যেতে চাইলে তাকে সরকারী জাহাজেই সেখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে।

৮. যে সব খ্রিস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদেরকে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করা হবে না।
৯. এই যুদ্ধে যে মালে গনীমত মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে তা যথারীতি তাদের কাছেই থাকবে।
১০. প্রচলিত ট্যাক্স ছাড়া নতুন কোন ট্যাক্স মুসলমানদের উপর ধার্য করা হবে না।
১১. তিন বছর পর্যন্ত মুসলমানদের কাছ থেকে কোন ট্যাক্স আদায় করা হবে না। যে ট্যাক্স এখন তারা দিচ্ছে তাও তিন বছরের জন্য মাফ করে দেওয়া হবে।
১২. আল-বাশরাতের শাসনক্ষমতা সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্র হাতে অর্পণ করা হবে।
১৩. আজ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে দুর্গ, আল-হামরা প্রাসাদ, তোপখানা এবং অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী, যা এখন দুর্গের মধ্যে রয়েছে তা খ্রিস্টানদের হাতে অর্পণ করা হবে।
১৪. আজ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এই চুক্তির শর্তাবলী বাস্তবায়ন করা হবে।
১৫. গ্রানাডা শহরকে এক বছর পর্যন্ত স্বাধীন রাখা হবে এবং এক বছর পূর্ণ হবার সময় উপরোক্ত শর্তানুযায়ী তা খ্রিস্টানদের দখলে চলে যাবে।

এই চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয় ৮৯৭ হিজরীর ১লা রবিউল আউয়াল, মুতাবিক ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী। শহরবাসী এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর কাছে এটা গোপন থাকেনি। তাই স্বাভাবিকভাবেই দুর্গের সর্বত্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি এই শ্লোগানও উঠে যে, সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্ অনর্থক মুসলিম সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেছেন। এতে সুলতান খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। শহরবাসীরা বিদ্রোহ করে আবার সবকিছু ওলট-পালট করে দেয় এই ভয়ে তিনি ৬০ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ ৮৯৭ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল (১৪ জানুয়ারী ১৪৯২ খ্রি) আল-হামরা প্রাসাদ খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেন। ফার্ডিনান্ড স্পেনের প্রধান পুরোহিত মানযূরাকে নির্দেশ দেন, যেন তিনি সেনাবাহিনীসহ সর্বপ্রথম শহরে প্রবেশ করেন এবং আল-হামরা প্রাসাদের সুউচ্চ গম্বুজ থেকে ইসলামী পতাকা নামিয়ে দিয়ে সেখানে ক্রুশ স্থাপন করেন যাতে করে এই পুণ্য কর্মটি প্রত্যক্ষ করতে করতে সম্রাট ফার্ডিনান্ড এবং রাণী ইসাবেলা শহরে প্রবেশ করতে পারেন। যখন সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্ মানযুরাকে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করতে দেখেন তখন তিনি পঞ্চাশজন আমীর ও সভাসদকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে দুর্গ থেকে বাইরে চলে আসেন। ঐ মুহূর্তে সমগ্র শহর কিভাবে নৈরাশ্যের আঁধারে ডুবে গিয়েছিল এবং মুসলমানরা কিরূপ দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল তা যে কেউ অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে। আর ঐ দিন খ্রিস্টানদের তো আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। খ্রিস্টান সম্রাট এবং তার রাণী সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে আপন সেনাবাহিনীসহ ক্রুশ উত্তোলনের অপেক্ষা করছিলেন। সকলেরই দৃষ্টিনিবদ্ধ ছিল আল-হামরা প্রাসাদের সুউচ্চ গম্বুজের উপর। এমনি মুহূর্তে আবূ আবদুল্লাহ্ কাস্তালার সম্রাটের নিকটে এসে তার হাতে শহরের চাবিসমূহ অর্পণ করেন এবং বলেন, "হে মহাপরাক্রমশালী সম্রাট, আমরা এখন আপনার প্রজা। এই শহর এবং সমগ্র রাজ্য আমি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। কেননা এটাই ছিল আল্লাহ্র ইচ্ছা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি সর্বদা প্রজাদের সাথে সদয় ব্যবহার করবেন। ফার্ডিনান্ড চাচ্ছিলেন আবূ আবদুল্লাহ্কে কিছু সান্ত্বনাদায়ক কথা বলতে। কিন্তু এর পূর্বেই আবূ আবদুল্লাহ্ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে রাণী ইসাবেলার সাথে সাক্ষাত করেন। এরপর সোজা আল-বাশারাত অভিমুখে

রওয়ানা হন, যেখানে তার ধন-সম্পদ এবং আত্মীয়-স্বজনকে ইতিপূর্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শীঘ্রই রৌপ্য নির্মিত ক্রুশ আল-হামরা প্রাসাদের সুউচ্চ গম্বুজে স্থাপন করা হয় এবং রৌদ্রের কিরণে তা ঝলমল করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান সম্রাট বিজয়ী বেশে আল-হামরা প্রাসাদে প্রবেশ করেন। অপর দিকে আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বাশারাতের পাহাড়ের একটি চূড়ায় যখন উপনীত হন তখন তিনি অলক্ষ্যে ঘাড় ফিরিয়ে গ্রানাডার দিকে তাকান এবং আপন বংশের অতীত কীর্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করে অঝোরে ক্রন্দন করতে থাকেন। আবূ আবদুল্লাহ্র মাতা, যিনি তখন তার সাথেই ছিলেন বলে উঠেন, পেশাগতভাবে একজন সিপাহী হওয়া সত্ত্বেও যখন তুমি নিজের রাজ্যকে রক্ষা করতে পারলে না তখন মেয়ে মানুষের মত হারিয়ে যাওয়া একটি জিনিসের উপর এরূপ ক্রন্দন করে কী লাভ বলো ?

স্পেনের মুসলমানদের উপর খ্রিস্টানদের জুলুম-অত্যাচার

খ্রিস্টানরা আল-হামরা প্রাসাদ দখল করার সাথে সাথে চুক্তির শর্তাবলী বেমালুম ভুলে বসে। তারা গ্রানাডা নগরীও দখল করে ফেলে। তারা সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্কে আল-বাশারাতেও থাকতে দেয়নি। সামান্য অর্থের বিনিময়ে তারা আবূ আবদুল্লাহ্র কাছ থেকে আল-বাশারাতও কিনে নেয়। সেখান থেকে আবূ আবদুল্লাহ্ মরক্কোর বাদশাহর চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ দিন সেখানে থাকার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। এদিকে খ্রিস্টানরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সমগ্র দেশে ধর্মীয় আদালত প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিদিন হাজার হাজার মুসলমানকে বন্দী করে ঐ সমস্ত আদালতে নিয়ে আসা হতো এবং শুধু এই অপরাধে যে, তারা মুসলমান—তাদেরকে নানা মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে আগুনে নিক্ষেপ করা হতো। এতদসত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের ধর্মের উপর কায়েম ছিল। ফলে এত জুলুম-অত্যাচার সত্ত্বেও স্পেন উপদ্বীপ থেকে মুসলমানদের অস্তিত্ব একেবারে মুছে যায়নি।

৯০৪ হিজরীতে (১৪৯৮-৯৯ খ্রি.) এই মর্মে একটি সাধারণ নির্দেশ জারি করা হয় যে, স্পেনে বসবাসরত প্রত্যেকটি মুসলমানকে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় তাকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা হবে। মুসলমানরা এই অবস্থায় শহর প্রান্তর ত্যাগ করে পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় নেয়, সব রকমের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করে, কিন্তু ইসলাম পরিত্যাগ করেনি। কোন কোন মুসলমানকে খ্রিস্টানরা জোর করে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করে। ঐ সমস্ত লোক আরব কিংবা বার্বার বংশীয় ছিল না বরং তাদের বাপ-দাদারা ছিল ঐ দেশেরই প্রাচীন বাসিন্দা এবং তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ঐ সমস্ত নওমুসলিম গোত্রাদির মধ্যেও কেউ ইসলাম পরিত্যাগ করাকে পছন্দ করেনি। তাই তারা লুকিয়ে লুকিয়ে নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ত।

কিছুসংখ্যক মুসলমানের উপর খ্রিস্টানরা এই অনুগ্রহ করে যে, তাদেরকে আফ্রিকা চলে যাবার অনুমতি প্রদান করে। এমনকি তারা তাদের জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করে দেয়। ঐ সব মুসলমান নিজেদের স্ত্রী-পুত্র বাদে সবচেয়ে মূল্যবান যে জিনিসটি জাহাজে বোঝাই করে তা ছিল অতি মূল্যবান কিতাবাদি এবং কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি। কিন্তু খ্রিস্টানরা আফ্রিকা উপকূলে পৌঁছার পূর্বেই ঐ সমস্ত জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। এভাবে শুধু জ্ঞানী মুসলমানরা নয়, বরং তাদের জ্ঞানভর্তি গ্রন্থাগারসমূহও গভীর সমুদ্রে তলিয়ে যায়। স্পেনের মুসলমানদেরকে

যেভাবে বেছে বেছে হত্যা করা হয় তার দৃষ্টান্ত কোন দেশ বা জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ঐ ঘটনার মাত্র কয়েক বছর পর স্পেন ভূখণ্ডে একজন মুসলমানের অস্তিত্বও বাকি ছিল না। খ্রিস্টানরা তাদের কাউকে হত্যা করে, কাউকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়, আবার কাউকে আগুনে নিক্ষেপ করে। আজকালকার মুসলমানরা যদি চায় তাহলে স্পেনের ঐ হৃদয়বিদারক ইতিহাস পাঠ করে নিজেদের মধ্যকার অনৈক্য ও গৃহযুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করে নিতে পারে এবং এরই আলোকে সংশোধন করে নিতে পারে নিজেদেরকে। এ ক্ষেত্রে একটি কথা স্মর্তব্য যে, গ্রানাডার মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন এবং ফার্ডিনান্ড কর্তৃক সেখানকার শাসনক্ষমতা গ্রহণের পরও স্পেন উপদ্বীপের শহরে, পল্লীতে এবং পাহাড়ে-পর্বতে মুসলমানদের অস্তিত্ব ছিল। অতএব তাদেরকে বন্দী ও হত্যা করার কাজ বরাবরই অব্যাহত থাকে। কখনো দশ-বিশ জন মুসলমান একত্রিত হয়ে খ্রিস্টানদের সাথে লড়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। কেউ কেউ আবার স্পেনের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়-পর্বতে পালিয়ে গেছে এবং নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। কেউ কেউ স্পেন থেকে পালিয়ে গিয়ে ইউরোপের দেশসমূহ অতিক্রম করে সিরিয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। ঈসায়ীরা কোন কোন মৃত ব্যক্তির শিশু সন্তানকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে গিয়ে তাকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেছে। এভাবে ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চল এবং স্পেনের উত্তরাঞ্চলের আরব বংশোদ্ভূত কিছু কিছু গোত্রের অস্তিত্ব রয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন। এ কারণেই কারো কারো মতে, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ছিলেন আরব-বংশোদ্ভূত। স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হলো। এখন আমাদেরকে অন্যান্য দেশের দিকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু স্পেনের ইতিহাস শেষ করার সাথে সাথে একটি বিষয়ের আলোচনা অবশ্যই করতে হবে। আর তা হলো, মুসলমানরা স্পেন শাসন করে ইউরোপ মহাদেশকে কি পরিমাণ উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্য সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

প্রথম যুগের আরবের অন্যান্য সাম্রাজ্যের মত স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যটি বাহ্যত ব্যক্তিশাসিত মনে হলেও সেখানকার শাসনব্যবস্থা ছিল অনেকটা গণতান্ত্রিক। খলীফার নির্দেশ এবং শরীয়তের আইন প্রত্যেকটি লোককে সমভাবে মানতে হতো। ঐ সাম্রাজ্যে মৌরুসী কোন জায়গীরদার বা আমীর-উমারা ছিলেন না। একদা জনৈক খ্রিস্টান উমাইয়া সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে কাযীর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করলে সুলতানকে বাদ্য হয়ে একজন ক্রীতদাসের মত কাযীর হুকুম পালন করতে হয়। ঐ সাম্রাজ্যে শরীয়তের আইন অনুযায়ী কাযী খলীফাকেও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা রাখতেন। পুলিশ বিভাগের ব্যবস্থাপনা ছিল অত্যন্ত উন্নত ধরনের। প্রত্যেক বাজারে একজন পরিদর্শক থাকতেন, যিনি ব্যবসায়ীদের লেনদেনের উপর কড়া নজর রাখতেন। প্রত্যেক শহরে ও পল্লীতে চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়েছিল। মুসলমানরা সমগ্র দেশে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও খাল খননের ব্যবস্থা করেছিল। খলীফা হিশাম ওয়াদিউল কবীর নদীর উপর একটি অতি মনোরম

ও বিরাট পুল নির্মাণ করেছিলেন। এভাবে অন্যান্য অনেক নদীর উপর পুল নির্মাণ করা হয়েছিল। যুদ্ধবিদ্যায় তখন মুসলমানরা ছিল সবচাইতে পারদর্শী। স্পেনের মুসলমানরা দুর্গ বিধ্বংসী হাতিয়ার আবিষ্কার করেছিল। ইউরোপের অসভ্য লোকেরা শত্রুর উপর জয়লাভ করার সাথে সাথে তাদের শহর-বন্দর ও ঘর-দরজা ভস্মীভূত করে ফেলত এবং তাদের শিশু, স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধদেরকেও অবাধে হত্যা করত। মুসলমানরা আটশ' বছর পর্যন্ত ঐ অসভ্য লোকদেরকে এই শিক্ষা দিতে থাকে যে, জয়লাভ করার পর নিরপরাধ প্রজাকে কোন ধরনের কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। মুসলমানরা কৃষির এতই উন্নতি সাধন করে যে, তা একটি পৃথক শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয়। মুসলমানরা প্রত্যেকটি ফলবান বৃক্ষ এবং ভূমির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল। স্পেনের যে হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা অনাবাদ পড়েছিল মুসলমানরা সেগুলোকে ফলবান বৃক্ষের উদ্যান ও ঢেউ খেলানো শস্যক্ষেত্রে পরিণত করে। ধান, আখ, তুলা, জাফরান, আনার, আলু ইত্যাদি যা আজকাল স্পেনে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় তার উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি মুসলমানদের মাধ্যমেই স্পেন তথা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম আমলে আন্দালুসিয়া, সেভিল প্রভৃতি প্রদেশে যায়তুন ও খেজুর এবং সিরীশ, গ্রানাডা, মালাগা প্রভৃতি অঞ্চলে আংগুরের উৎপাদন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। চাষাবাদের সাথে সাথে স্পেনের মুসলমানরা খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের প্রতিও মনোনিবেশ করে। তারা স্পেনের বিভিন্ন জায়গায় সোনা, রূপা, লোহা, ইস্পাত, পারদ, তামা, ইয়াকূত প্রভৃতির খনি আবিষ্কার করে। গ্রানাডা রাজ্য ছিল স্পেনে মুসলমানদের শেষ চিহ্ন। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিও স্থাপত্য বিদ্যায় ও অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখে। মুসলমানরা এমন বিস্ময়কর সিমেন্ট আবিষ্কার করে যে, আল-হামরা প্রাসাদ, যা গ্রানাডা সাম্রাজ্যের সাক্ষীরূপে এখনো দণ্ডায়মান আছে, তাতে অতি মজবুত ধরনের মসল্লার যে প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল তার প্রতি পর্যটকরা এখনো অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। গ্রানাডার সুলতান প্রচুর অর্থ ব্যয় করে শহরের নিকটবর্তী একটি অতি উচ্চ টিলার উপর, শালীর পর্বতের বরফে ঢাকা শৃঙ্গসমূহের ছায়ায় আল-হামরা প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তার ঘেরা প্রাচীরের অভ্যন্তরে সুন্দর ও শস্য-শ্যামল উদ্যান ও স্বচ্ছ পানির নহর তৈরি করা হয়েছিল। ঐ সমস্ত উদ্যানে ফলবান বৃক্ষ সারি এমনভাবে লাগান হয়েছিল, যার দৃষ্টান্ত তখনকার বিশ্বে ছিল বিরল। আল-হামরা প্রাসাদের প্রত্যেকটি জিনিস এতই সুন্দর এবং আকর্ষণীয় যে, আজো বিশ্বের বিখ্যাত কারু শিল্পীরা তা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারেন না। চুন-সুরকির তৈরি এর সুউচ্চ দেওয়ালসমূহ মর্মর পাথরের চাইতে অধিক চকচকে এবং লোহার চাইতে অধিক মজবুত। জালিদার দেওয়াল সমূহে নানা ধরনের সূক্ষ্ম কারুকাজ এবং এর নতুন আকৃতির মিহরাবসমূহ থেকে ঝুলন্ত কলাম, এর সূক্ষ্ম কারুকার্যেরই নিদর্শন। মুসলমানরা স্পেনের শাসনক্ষমতা হাতে নিয়ে সমগ্র দেশে স্কুল, কলেজ, পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এবং বিরাট বিরাট লাইব্রেরী স্থাপন করে। প্রতিটি শহরেই কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিটি জনবসতিতে প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্ডোভা, সেভিল মালাগা, সারাকাস্তা, বেশূনা, জিয়ান, টলেডো প্রভৃতি বড় বড় শহরে যে সব কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেখানে ইতালী, ফ্রান্স, জার্মান, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের ছাত্র ও

বিদ্যানুরাগীরা দলে দলে আসত এবং বছরের পর বছর ধরে শিক্ষা অর্জন করত। আরবরা গ্রীক, ল্যাটিন, স্পেনীশ প্রভৃতি ভাষা অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে আয়ত্ত করে এবং ঐ সমস্ত ভাষায় অনেকগুলো আরবী অভিধান রচনা করে। খলীফা দ্বিতীয় হাকামের যুগে শুধু কর্ডোভার লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় ছয় লক্ষ গ্রন্থ ছিল এবং প্রতিটি গ্রন্থের উপর স্বয়ং খলীফার হস্ত লিখিত টীকা ছিল। মুসলমানরা গ্রীক দর্শনের যাবতীয় গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করে নিয়েছিল। ইবন রুশ্‌দ, যিনি এরিস্টটলের চাইতেও বড় পণ্ডিত ছিলেন, স্পেনেরই একজন মুসলমান ছিলেন। স্পেনের মুসলমানরা জ্যোতিষশাস্ত্রে এতই উন্নতি করেছিল যে, এ ক্ষেত্রে সমগ্র ইউরোপ তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও সার্জারিতে মুসলমানরা এতই উন্নতি করেছিল যে, এই কিছুদিন আগেও সমগ্র ইউরোপ এ বিষয়ে তাদেরই বই-পুস্তক অধ্যয়ন করত। প্রাণিবিদ্যা এবং উদ্ভিদ বিদ্যায়ও মুসলমানরা ছিল অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী। প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা হাতে-কলমে শিক্ষা দানের জন্য কর্ডোভা ও গ্রানাডায় বিশেষ ধরনের উদ্যান ও গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছিল। শণ এবং তূলা থেকে স্পেনের মুসলমানরাই সর্বপ্রথম কাগজ তৈরি করে। আলফান (একাদশ)-এর ইতিহাসে আছে ঃ

"শহরের মুসলমানরা নাশপাতির ন্যায় ভয়ংকর আওয়াজের গোলাসমূহ নিক্ষেপ করত। এই সমস্ত গোলা এতদূর পর্যন্ত যেত যে, কোন কোনটি শত্রুবাহিনীকে ছাড়িয়ে অপর প্রান্তে এবং কোন কোনটি শত্রু বাহিনীর মধ্যেই পতিত হতো।"

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা যে কামান ও বারুদ ব্যবহার করত খ্রিস্টানরা ছিল সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 'সানীনুল ইসলাম'-এর গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ ৪৪১ হিজরীতে (১০৪৯-৫০ খ্রি) স্পেনের কিছু সংখ্যক মুসলমান আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তাদের আবিষ্কারের কথা তেমন জানাজানি হয়নি। কলম্বাসই হচ্ছেন সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি, যিনি এর অনেক দিন পর আমেরিকা আবিষ্কার করে তার আবিষ্কারকর্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানদের অত্যধিক কৌতূহল ও আগ্রহ সমগ্র ইউরোপের সামনে সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য তথা সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরজা খুলে দেয়। আটশ' বছর পর্যন্ত মুসলমানরা ছিল প্রত্যেকটি বিষয়ে ইউরোপবাসীদের শিক্ষকতুল্য। খ্রিস্টান আমীর-উমারারা চলনে-বলনে তথা প্রত্যেকটি বিষয়ে মুসলমানদের অনুসরণ করাকে নিজেদের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করতেন। এমন কি তারা আরবী ভাষায় গদ্য ও পদ্য রচনার চেষ্টা করতেন। এটা হচ্ছে তৎকালীন মুসলমানদেরই প্রভাব যে, ফরাসী ও ইতালী ভাষায় জাহাজ নির্মাণ এবং সামুদ্রিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যে সমস্ত শব্দ রয়েছে তার বেশিরভাগই আরবী ভাষা থেকে উদ্ভূত। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ঐ সমস্ত দেশের লোকেরা মুসলমানদের কাছ থেকেই জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পরিচালনা বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। ঐ সমস্ত দেশের পর্যটনশাস্ত্র, শিকার কৌশল, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কিত বেশির ভাগ শব্দও আরবী ভাষা থেকে উদ্ভূত। মোটকথা, স্পেনের মুসলমানরাই হচ্ছে সমগ্র ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরু। আজ ইউরোপ নিজের এমন

একটি কৃতিত্বপূর্ণ জিনিসও পেশ করতে পারবে না যার উন্নয়ন বা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তারা কোন না কোন ভাবে মুসলমানদের কাছে ঋণী নয়। আর এই ঋণের কি প্রতিদান ইউরোপের খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে দিয়েছে তা তো উপরে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে পুনরায় এ কথাটি স্মরণ করা যেতে পারে যে, মুসলমানরা যখন হিজরী প্রথম শতাব্দীতে স্পেন জয় করেছিল তখন জবরদস্তিমূলকভাবে কোন খ্রিস্টানকেই ইসলামে দীক্ষিত করেনি বরং খ্রিস্টানরা ইসলামের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে নিজে থেকেই ইসলাম গ্রহণ করত। কিন্তু যখন খ্রিস্টানরা শক্তি অর্জন করল এবং পরাজিত মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম থেকে ফিরাতে পারল না তখন তারা স্পেনে অবস্থানরত লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করল, আগুনে নিক্ষেপ করল অথবা পানিতে ডুবিয়ে মারল। এরই ফলশ্রুতিতে ঐ স্পেন, যা মুসলমানদের শাসনামলে অত্যন্ত সবুজ-শ্যামল ও উর্বর দেশ হিসাবে সর্বত্র খ্যাতি লাভ করেছিল, মুসলমানদের পতনের পর তা এমনি পতিত, অনাবাদ ও অনুর্বর হয়ে পড়ে যে, আজ পর্যন্ত তা সেই পূর্বের অবস্থায় পৌঁছতে পারেনি। মুসলমানদের শাসনামলে স্পেনের পাহাড়সমূহের উপর চাষাবাদ হতো এবং এক ইঞ্চি জায়গাও অনুর্বর বা পতিত ছিল না। কিন্তু সেই স্পেনেরই হাজার হাজার বর্গমাইল জমি আজো অনুর্বর ও পতিত পড়ে আছে। যে স্পেন মুসলমানদের আমলে বিশ্বের সব চাইতে সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল আজ তা ইউরোপের সবচাইতে অপয়া ও উপেক্ষিত দেশ।

স্পেনের মুসলমানদের উপর ঐ দুর্যোগ নেমে এসেছিল এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে উপেক্ষা করেছিল যার ফলে তাদের মধ্যে স্বাথপরতা ও অনৈক্য দেখা দেয়। ইসলামী আইনের আনুগত্য ছেড়ে দেওয়ার কারণেই একজন মুসলিম অধিনায়ক অপর একজন মুসলিম অধিনায়কের মুকাবিলা করতে গিয়েই খ্রিস্টানদের সাহায্য প্রার্থনা করতেও ইতস্তত করত না। খোদ মুসলমানরাই খ্রিস্টানদের হাতে আপন মুসলমান ভাইদের যবাই করিয়েছে এবং এভাবে তারা খ্রিস্টানদের অন্তর থেকে ইসলামের পরাক্রম ও ভাবমূর্তি মুছে ফেলেছে। স্পেনের মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদেরই কর্মদোষে একটি অভিশপ্ত মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। এ কারণে তারা বিপদের সময় বিশ্বের কোন অঞ্চল থেকেই কোন সাহায্য পায়নি। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের হাতেই তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। মুসলমানরা যেখানেই দীন ইসলাম থেকে গাফিল হয়েছে এবং কুরআনে করীমের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে সেখানেই এভাবে তাদের উপর বিপদ নেমে এসেছে। আগামীতেও বিশ্বের যে সমস্ত অঞ্চলে মুসলমানরা ধ্বংসের সম্মুখীন হবে তা এই কুরআনকে উপেক্ষা করার কারণেই হবে। এখন স্পেনের মুসলমানদের পতন ও ধ্বংসের উপর মাতম করার পরিবর্তে আমাদের উচিত, ঐ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থা শুধরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা। আমরা যেন প্রকৃত মুসলমান হয়ে পরস্পর ভাই ভাই হিসাবে বসবাস করি, একতাবদ্ধ হয়ে ও আলস্য ছেড়ে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে একনিষ্ঠ হই সে ব্যাপারে আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এর নামই জীবন এবং এটাকেই বলে আল্লাহ্‌র আনুগত্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

মারাকিশ (মরক্কো) ও আফ্রিকা

স্পেন উপদ্বীপের দক্ষিণে এবং আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম কোণে যে দেশটি অবস্থিত তাকে মরক্কো, মারাকিশ অথবা মৌরিতানিয়া বলা হয়। এই দেশে মরক্কো নামের একটি শহরও আছে। মারাকিশের বিশেষ বিশেষ প্রদেশ হচ্ছে সূসুল আদনা, সূসুল আকসা, রালফ, সূ-তা প্রভৃতি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে মারাকিশের প্রদেশসমূহের সীমারেখা এবং নামও সর্বদা পরিবর্তিত হয়ে আসছে। আরবের লোকেরা মরক্কোকে মাগরিবুল আকসা বলত। অনুরূপভাবে তারা আলজিরিয়াকে বলত মাগরিবুল আওসাত। কখনো কখনো আলজিরিয়াকে এবং তিউনিস পর্যন্ত এলাকাসমূহকে মারাকিশ বলা হতো। আরবের ন্যায় মারাকিশেও বার্বার জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রদেশে পৃথক পৃথক বসবাস করত এবং ঐ সম্প্রদায়সমূহের নামে বিভিন্ন প্রদেশের নামকরণ করা হতো। উপরন্তু তাদের বসতির প্রেক্ষিতে প্রদেশসমূহের আয়তনও নির্ধারিত হতো। তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো এই তিন দেশে প্রধানত বার্বার সম্প্রদায় বসবাস করত। এ কারণে মিসর ছাড়া সমগ্র উত্তর আফ্রিকাকে 'বার্বারদের দেশ' বলা হয়ে থাকে। মুসলমানদের আগমনকালে মারাকিশ দেশে যানাতা, মাসমুদা, সানহাজাহ্, কাতামাহ্, হাওয়ারাহ্ প্রভৃতি বার্বার সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করত। বার্বার এলাকা অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকায় এসে কোন কোন ইরানী সম্প্রদায়ের লোক বসতি স্থাপন করে এবং তাদের মাধ্যমে মরক্কো প্রভৃতি অঞ্চলে অগ্নি উপাসনার রীতি প্রচলিত হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর অর্থাৎ বনী ইসরাঈলও এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। অতএব ইহুদী মাযহাবও কোন না কোন যুগে এই অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে থাকবে। রোমান এবং গ্রীকদের হাতেও একদা এই অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা ছিল। কারতাজিনার বিখ্যাত সম্প্রদায় এই বার্বার এলাকা কিংবা তিউনিস কিংবা আফ্রিকার অধিবাসী ছিল। তাদেরকে ফিনিশিয়ার অধিবাসী কানআনীদের একটি শাখা মনে করা হয়। শেষ পর্যন্ত গথ জাতিও এই অঞ্চল শাসন করেছে। মুসলমানরা এই দেশ জয় করা পর্যন্ত তা পূর্ব রোম অর্থাৎ কনসটান্টিনোপলের শাসনাধীন ছিল। মোটকথা, বার্বার জাতি মারাকিশ এবং তৎসংলগ্ন প্রাচ্য অঞ্চলসমূহে বসবাস করত। তারা শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এই জাতিকে আরব, সিরীয়, মিসরীয়, গ্রীক, ইরানী, রোমান প্রভৃতি জাতির একটি মিশ্রিত মানবগোষ্ঠীই বলা চলে। দেশ ও আবহাওয়ার প্রভাবে এই মিশ্রিত জাতির একটি বিশেষ মেযাজ, বিশেষ চরিত্র ও বিশেষ সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। তাই বার্বাররা বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে একটি বিশেষ জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়।

এখানে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষণীয়। আর তা এই যে, কিছু কিছু সভ্য ও উন্নত জাতি উত্তর আফ্রিকা শাসন করা সত্ত্বেও বার্বার জাতির বর্বরতা ও হিংস্রতা, যা ছিল ঐ পরিবেশ ও আবহাওয়ার ফলশ্রুতি তাদের থেকে দূর হয়নি। হ্যাঁ, যদি দূর হয়ে থাকে তাহলে তা হয়েছিল মুসলমান কর্তৃক এই দেশ জয় এবং এখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পর। এখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মুসলমানদের অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বার্বার সম্প্রদায়ের লোকেরা বার বার বিদ্রোহ করেছে এবং বার বার তাদেরকে পরাজিত ও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত গোটা বার্বার জাতি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় না নিয়েছে ততক্ষণ তাদের মধ্যে এই বিদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতা বিদ্যমান ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা নিজেদেরকে আরবদের মত বীর বাহাদুর এবং সভ্যভব্য প্রমাণ করে। পরবর্তীকালে দেখা গেছে, যখনই তাদের মধ্যে ইসলামী অনুশাসন মান্য করার ক্ষেত্রে কিছু না কিছু দুর্বলতা দেখা দিয়েছে তখনি তাদের মধ্যে সেই পুরাতন বর্বরতা, পাশবিকতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ফিরে এসেছে।

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, উকবা ইব্‌ন নাফি সমগ্র মারাকিশ জয় করে নিয়েছিলেন। মারাকিশের কোন কোন প্রদেশের শাসনকর্তারা সানন্দে উকবার আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। তারপর বেশ কয়েকবারই সেখানে বিদ্রোহ হয়েছে এবং প্রতিবারই তা দমন করা হয়েছে। আফ্রিকা ও মারাকিশের গভর্নর মূসা ইব্‌ন নুসায়র নিজের পক্ষ থেকে তারিক ইব্‌ন যিয়াদকে মরক্কোর শাসন ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। তাই তারিক ইব্‌ন যিয়াদ স্পেন জয় করেন। স্পেন অভিযানকালে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বার্বারদেরকে কাজে লাগানো হয়। অতএব এ কথা বললে ভুল হবে না যে, মারাকিশের অধিবাসীরা স্পেন জয় করে তা ইসলামী হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত করেছে। স্পেন জয় করার পরও বার্বাররা মারাকিশ ও স্পেনে বার বার বিদ্রোহ করে। স্পেনে তো তাদের বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু বার্বার দেশে অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকায় তাদের বিদ্রোহ এমন প্রকৃতির ছিল যে, তা দমন করতে দীর্ঘ দিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। বনূ উমাইয়ার পতন এবং খিলাফতে আব্বাসীয়ার পরিপূর্ণ উত্থানের পরও বার্বার সম্প্রদায় তাদের বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। মুসলমানরা প্রতিবারই তাদেরকে দমন করেছে। কিন্তু যখনই শাসকদের মধ্যে কিছুটা শৈথিল্য দেখা দিয়েছে তখনই বার্বাররা পুনরায় বিদ্রোহ করে বসেছে। বার্বার জাতির এই অবস্থা এবং এই মেযাজ লক্ষ্য করে যারাই খিলাফতে আব্বাসীয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে কিংবা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে তারাই মারাকিশ এবং আফ্রিকার ঐ অঞ্চলকে তাদের কর্মতৎপরতার কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত করেছে, যেখানে বার্বার সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করে। আলাভীরা, যারা বার বার আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের সবারই ভরসা স্থল ছিল এই বার্বারভূমি। তাই আলাভীরা যখন সুযোগ পেয়েছে তখন ইরাক, সিরিয়া এবং আরব থেকে পলায়ন করে এই দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মুসলমানরা এই দেশ জয় করার পর থেকেই তারা ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হয় এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রায় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের ঐ বিদ্রোহ স্বভাব কাটেনি। যখনই ধর্মীয় পোশাকে কোন আন্দোলন শুরু হতো তখনি বার্বাররা তাতে অংশগ্রহণ করে পুনরায় বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিত।

ইদরীসী সালতানাত

খুলাফায়ে আব্বাসীয়ার অবস্থান বর্ণনাকালে মক্কায় ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এবং তার বংশের পরাজয় ও ধ্বংসের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই বংশেরই ইদরীস নামীয় জনৈক ব্যক্তি রাশীদ নামীয় তার এক ভৃত্যসহ হিজায থেকে পালিয়ে মিসর ও আফ্রিকা হয়ে মারাকিশে গিয়ে পৌছেন। বুলিয়া নামক স্থানে ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল হামীদ নামীয় জনৈক কর্মকর্তা বা গোত্রপতি ইদরীসকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে যাওয়াগাহ্, লাওয়াতাহ্, যানাতাহ্, মাদরাতাহ্, মকনাসাহ্, গামায প্রভৃতি বার্বার সম্প্রদায় ইদরীসের ভক্ত-অনুরক্তে পরিণত হয়। কোন কোন বার্বার সম্প্রদায় তখনো শালাহ্, মাদালাহ্ প্রভৃতি স্থানে বসবাস করত। ১৭২ হিজরীতে (৭৮৮-৮৯ খ্রি) ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল হামীদের চেষ্টায় বেশির ভাগ মুসলিম বার্বার সম্প্রদায় ইদরীসের হাতে খিলাফতের বায়আত করে এবং ইদরীস ঐ সব সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করে ঐ সমস্ত বার্বার সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যারা তখন পর্যন্ত মুসলমান হয়নি। তিনি ঐ সমস্ত লোককে পরাজিত করে তাদের সামনে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য তুলে ধরেন, যার ফলে তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে ইদরীসকে তাদের সুলতান ও খলীফা বলে মেনে নেয়।

১৭৩ হিজরীতে (৭৮৯-৯০ খ্রি) ইদরীস তিলমিসান আক্রমণ করেন এবং তিলমিসানের শাসনকর্তা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলে তিনি তিলমিসানকেই তাঁর রাজধানী করে সেখানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। ইদরীস দ্রুত তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং কিছু দিন পর তিলমিসান থেকে বূলিয়া বা বূলীলী নামক স্থানে চলে যান এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। ইদরীসের এই ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং আল-মাগরিবে মরক্কো (আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে) তাঁর শাসনক্ষমতা গ্রহণের এই সংবাদ যখন আব্বাসীয় খলীফা হারূনুর রশীদের কাছে গিয়ে পৌছে তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য সুলায়মান ইব্‌ন জারীর ওরফে শাম্মাখকে আল-মাগরিবে পাঠান, যাতে সে ছলে-বলে-কৌশলে ইদরীসকে উৎখাত করে। শাম্মাখ ইদরীসের দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে—আমি হারূনুর রশীদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সাম্রাজ্য ছেড়ে আপনার কাছে চলে এসেছি। এ কথা শুনে ইদরীস তাকে তাঁর সভাসদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

ইদরীসের মৃত্যু

শাম্মাখ ইদরীসকে একটি দাঁতের মাজন দেয়, যা ব্যবহার করার সাথে সাথে ইদরীসের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায় এবং তিনি ১৭৫ হিজরীতে (৭৯১-৯২ খ্রি) পরলোক গমন করেন। শাম্মাখ সেখান থেকে পলায়ন করে। ইদরীসের ভৃত্য রাশীদ তার পশ্চাদ্ধাবন করে। দু'জনের মধ্যে মুকাবিলা হয়। শাম্মাখ তাতে আহত হয় বটে, তবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ইদরীস বূলীলী নামক স্থানে সমাধিস্থ হন।

দ্বিতীয় ইদরীস

ইদরীসের মৃত্যুর পর তাঁর ভৃত্য রাশীদ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কানীযাহ্ নামীয় জনৈক বার্বার ক্রীতদাসীর গর্ভে ইদরীসের ঔরসজাত সন্তান রয়েছে। সন্তানটি ভূমিষ্ঠ না

হলেও তারই পক্ষে সকলকে বায়আত করতে হবে। অতএব বার্বাররা ঐ সন্তানের পক্ষেই বায়আত করে এবং ঐ সমস্ত অঞ্চল, যা ইদরীসের হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সেগুলোর উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। শেষ পর্যন্ত বার্বার দাসীর গর্ভ থেকে একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। রাশীদ সবাইকে নির্দেশ দেন– তোমরা এই ছেলের হাতেই বায়আত কর। অতএব সবাই আনুগত্যের বায়আত করল। রাশীদ এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রতিনিধি হিসাবে দেশ শাসন করছিলেন। এই রাশীদের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার কারণেই ইদরীসের মৃত্যুর পরও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েনি। রাশীদ বার্বারদের মন-মেযাজ সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন বলে তাদেরকে শাসন পরিচালনার কাজে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করেন। যখন ঐ শিশু সন্তানের দুধ ছাড়ানো হলো তখন পুনরায় তার জন্য বায়আত গ্রহণ করা হয়। ১৮৮ হিজরীতে (৮০৪ খ্রি) যখন ছেলেটির বয়স এগারো থেকে বারো বছর তখন বূলীলী জামে মসজিদে পুনরায় তার হাতে বায়আত করা হয়। এই বছরই আফ্রিকার শাসনকর্তা ইব্‌ন আগ্‌লাব রাশীদের বিরুদ্ধে বার্বারদেরকে উত্তেজিত করে তোলেন। ফলে বার্বাররা রাশীদকে হত্যা করে। কিন্তু তারা ইদরীসের ঐ কিশোর পুত্রের আনুগত্য অস্বীকার করেনি। এই পুত্রের নাম ইদরীস রাখা হয় এবং তিনি দ্বিতীয় ইদরীস বা ইদরীস আসগার নামে খ্যাতি লাভ করেন। রাশীদের মৃত্যুর পর আবূ খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন ইলিয়াস আবদী ইদরীস আসগারের গৃহশিক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত হন।

রাজ্য বিস্তার

ইদরীস আসগার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশ পরিচালনার কলাকৌশল আয়ত্ত করে মুসআব ইব্‌ন ঈসা আযদীকে তাঁর মন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করে প্রায় সমগ্র মারাকিশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দেশ শাসন করতে থাকেন। অনেক আরববাসী স্পেন, আফ্রিকা, মিসর ও সিরিয়া থেকে দ্বিতীয় ইদরীসের কাছে এসে সমবেত হতে থাকে এবং তাদের কারণে হুকুমত ও সালতানাতের জাঁকজমক বৃদ্ধি পায়। ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল হামীদ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন সালতানাতে ইদরীসীয়ার একজন শীর্ষ-স্থানীয় ব্যক্তি। তারই প্রাথমিক সাহায্য-সহযোগিতায় প্রথম ইদরীস অতি সহজে নিজস্ব হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯২ হিজরীতে (৮০৭-৮ খ্রি) তাকে এই অভিযোগে হত্যা করা হয় যে, ইবরাহীম আগলাবের সাথে তার দহরম-মহরম রয়েছে এবং তারই ইঙ্গিতে রাশীদ নিহত হয়েছেন। বূলীলী বা বুলিয়া, যেখানে ইদরীসী সালতানাতের রাজধানী ছিল তা ছিল একটি ক্ষুদ্র স্থান। ১৯৩ হিজরীতে (৮০৮-৯ খ্রি) দ্বিতীয় ইদরীস বূলীলী থেকে 'ফাস্' নামক স্থানে চলে আসেন এবং তারই সন্নিকটে একটি নতুন শহর নির্মাণ করে সেটাকেই তাঁর রাজধানীতে রূপান্তরিত করেন। ঐ সময়ে তিলমিসান অঞ্চল তাঁর দখল থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। তিনি ১৯৭ হিজরীতে (৮১২-১৩ খ্রি) তিলমিসান জয় করেন এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ দখল করে ১৯৯ হিজরী (৮১৪-১৫ খ্রি) পর্যন্ত তিলমিসানেই অবস্থান করেন। তারপর যখন তিনি ফাস-এ চলে যান তখন বার্বাররা তাদের জন্মগত স্বভাববশে পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ইবরাহীম আগলাবের আনুগত্য স্বীকার করে

নেয়। এভাবে ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব এবং দ্বিতীয় ইদরীসের মধ্যে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত ইদরীস আসগার এবং ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবের মধ্যে একটি আপোসচুক্তি সম্পাদিত হয় এবং মারাকিশ অঞ্চল আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন ও পৃথক ইদরীসী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস

২১৩ হিজরীতে (৮২৮-২৯ খ্রি) দ্বিতীয় ইদরীস মৃত্যুবরণ করেন। তারপর তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। এটা ছিল সেই যুগ, যখন প্রথম ইদরীসের সহোদর ভাই সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান মুসান্না ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবী তালিব মিসর ও আফ্রিকা হয়ে তিলমিসানে এসে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি যখন নিজেকে প্রথম ইদরীসের সহোদর ভাই বলে প্রকাশ করেন তখন সেখানকার বার্বার গোত্রসমূহ তার হাতে সানন্দে বায়আত করে। ফলে তিলমিসানে সুলায়মানের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এদিকে দ্বিতীয় ইদরীসের মা এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীসের দাদী কানীযা বললেন, শুধু মুহাম্মাদকে সমগ্র সাম্রাজ্য না দিয়ে তার অন্যান্য ভাইকেও এক একটি অংশ দেওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত কানীযারই প্রস্তাব মতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস (দ্বিতীয়)-কে ফাস এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের শাসনক্ষমতা প্রদান করা হয়। দাউদের ভাগে পড়ে বিলাদ, হাওয়ারাহ্ মাতলাসুল, তাযী এবং মীক্‌নাসাহ্ ও গীয়াসার শাসন কর্তৃত্ব। আবদুল্লাহ্‌কে দেওয়া হয় বাগমাত, নাফীস জিবাল, মাসামীদাহ্, বিলাদে লুমতাহ্ এবং সূসুল আকসাহ। ইয়াহইয়ার ভাগে পড়ে বাসীলা, আরাঈশ এবং বিলাদে রওগাহ্। ঈসাকে দেওয়া হয় শালাহ্, সালা, আযমূর এবং তামাসনার শাসন ক্ষমতা। হামযার হাতে অর্পণ করা হয় বূলীলী এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। অন্যান্য অল্প বয়স্ক ছেলেরা তাদের দাদী কানীযার পৃষ্ঠপোষকতায় থাকে। সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তো ইতিপূর্বেই তিলমিসান দখল করে নিয়েছিলেন। তারপর একজন স্ত্রীলোকের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা মারাকিশের মত একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ভাগ করে ফেলেন। কিছুদিন পর ঈসা, আযমূর থেকে তার ভাই মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীসের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ তাঁর ভাই কাসিমকে এই আক্রমণ প্রতিহত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু কাসিম সে নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করে। তখন মুহাম্মাদ উমরকে ঈসার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। উমর ঈসাকে পরাজিত করে তার দখলাধীন সমগ্র এলাকা তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। আর মুহাম্মাদও সন্তুষ্ট চিত্তে উমরকে তা করতে দেন। তারপর মুহাম্মাদ কাসিমকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য উমরকে নির্দেশ দেন। কেননা মুহাম্মাদ তার নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করেছিলেন।

উমর কাসিমের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ ঘটান। উভয় পক্ষের মধ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাসিম উমরের কাছে পরাজিত হয়ে সংসার ত্যাগী হয়ে যান এবং এই অবস্থায়ই বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। উমর কাসিমের রাজ্যও নিজের দখলাধীন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। এভাবে উমরের রাজ্য বেশ বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু তিনি সর্বদা

তার ভাই মুহাম্মাদের আনুগত্য স্বীকার করতে থাকেন। ২২০ হিজরীতে (৮৩৫ খ্রি) উমরের মৃত্যু হলে মুহাম্মাদ তার পুত্র আলী ইব্‌ন উমরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদান করে তার পিতার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীসের মৃত্যু

উমরের মৃত্যুর সাত মাস পর ২২১ হিজরীতে (৮৩৬ খ্রি) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীসেরও মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর নয় বছর বয়স্ক পুত্র আলীকে তার স্থলাভিষিক্ত ও 'অলীআহ্‌দ' নিয়োগ করেন।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ

মুহাম্মাদের পর রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও সভাসদবৃন্দ সন্তুষ্টচিত্তে আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদের হাতে বায়আত করেন এবং অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সালতানাতের কাজকর্ম পরিচালনা করতে থাকেন। আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদের আমলে সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে। তের বছর হুকুমত পরিচালনার পর ২৩৪ হিজরী (৮৪৯-৫০ খ্রি) সনে আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর ভাই ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন।

ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়ার অসদাচরণ ও অনুপযুক্ততা প্রজাসাধারণকে অসন্তুষ্ট করে তোলে এবং তারা আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী সাহলের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শেষ পর্যন্ত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়াকে পদচ্যুত করে ফাস থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই অপমান ও লাঞ্ছনার কারণে কিছুদিন পর ইয়াহ্‌ইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আলী ইব্‌ন উমর তখন পর্যন্ত তার রাজ্যে ক্ষমতাসীন ছিলেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়ার উপরিউক্ত পরিণাম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর আলী ইব্‌ন উমর ফাস্‌-এ এসে সিংহাসনে বসেন এবং এভাবে একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। কিন্তু এর কিছুদিন পরই আবদুর রায্‌যাক খারিজী বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাজ্যের বেশির ভাগ অংশ দখল করে নেন। ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইদরীসী বংশের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ও দুর্বল থাকে।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইদরীস ইব্‌ন উমর

২৯২ হিজরীতে (৯০৫ খ্রি) ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইদরীস উমর ইব্‌ন ইদরীস (দ্বিতীয়) ক্ষমতা সঞ্চয় করে সমগ্র মারাকিশ রাজ্য দখল করে নেন এবং ইদরীসী সালতানাতের পুনরায় উত্থান-পতনের যুগ আসে। তিনি অত্যন্ত শৌর্যবীর্য ও সাফল্যের সাথে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁকে ইদরীসী বংশের সর্ববৃহৎ বাদশাহ মনে করা হয়। এটা হচ্ছে সে যুগের কথা, যখন আফ্রিকায় উবায়দী বংশের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ইয়াহ্‌ইয়া পরাজিত হয়ে ফাস-এ ফিরে আসেন এবং উবায়দীদের সাথে আপোসচুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইদরীস উবায়দী সালতানাতের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে তার নিদর্শন

স্বরূপ প্রতি বছর কিছু নগদ অর্থ প্রদান করবেন। ৩০৯ হিজরীতে (৯২১-২২ খ্রি) যখন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইদরীসের পুত্র তালহা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইদরীস ফাস-এর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তখন তিনি উবায়দী বাহিনীর হাতে বন্দী হন। দু'বছর বন্দী জীবন যাপনের পর ইয়াহ্ইয়া মুক্তিলাভ করে মাহদিয়ায় গিয়ে বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানেই ৩৩১ হিজরীতে (৯৪২-৪৩ খ্রি) মৃত্যু মুখে পতিত হন।

৩০৯ হিজরীতে (৯২১-২২ খ্রি) মারাকিশ ও ফাসে উবায়দী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩১৩ হিজরীতে (৯২৫ খ্রি) হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম ইব্ন ইদরীস ফাস্-এর উবায়দী গভর্নর রায়হান কিতামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তারপর ইদরীসী বংশের আরো কয়েক ব্যক্তি বন্দী ও নিহত হন। ফাস্-এ উবায়দী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হলেও মারাকিশের অধিকাংশ জেলায় ইদরীসী বংশের কিছু কিছু লোক এক একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের উপর দখলদার থাকেন। আর এরা সবাই ছিলেন দ্বিতীয় ইদরীসের সন্তান উমর ও মুহাম্মাদের বংশধর। শেষ পর্যন্ত তারা স্পেনের সুলতানের সাথে যোগাযোগ করে তার আনুগত্য স্বীকার করেন। ফলে স্পেনের উমাইয়া সুলতান অবিলম্বে মারাকিশ দখল করে সেখান থেকে উবায়দীদেরকে তাড়িয়ে দেন। অবশেষে মারাকিশ কর্ডোভা সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। স্পেনের ইতিহাস বর্ণনাকালে যে বনূ হামূদ বংশের উল্লেখ করা হয়েছে তা ছিল এই ইদরীসী বংশেরই একটি শাখা।

ইদরীসী হুকুমতের পরিসমাপ্তি

ইতোপূর্বে সুলায়মান ইব্ন আবদুল্লাহর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন প্রথম ইদরীসের ভাই। তিনি তিলমিসান এবং তাহারত এলাকায় তার হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুলায়মানের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান মাগরিব আল-আওসাত-এর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তারপর বনূ সুলায়মান গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র রাজ্য এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উশকূল অঞ্চল ঈসা ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান এবং জারাওয়ার শাসন ক্ষমতা ইদরীস ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান দখল করে নেন। ইদরীস ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মানের পুত্র আবুল আইশ ঈসা তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তারপর তার পুত্র ইবরাহীম ইব্ন ঈসা, তারপর তার পুত্র ইয়াহইয়া ইব্ন ইবরাহীম, তারপর তার ভাই ইদরীস ইব্ন ইবরাহীম শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। শেষ পর্যন্ত এই বংশের সকল সদস্যকে কর্ডোভার খলীফা আবদুর রহমান নাসিরের সেনাপতিরা বন্দী করে ফেলে। ৩৪২ হিজরী (৯৫৩-৫৪ খ্রি) পর্যন্ত আলী ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান তানস্ প্রদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। এরপরও বনূ সুলায়মানের বেশির ভাগ সদস্য মাগরিব আল-আওসাতের বেশির ভাগ অঞ্চলে নামেমাত্র দখলদার থাকেন। তারপর ক্রমে ক্রমে এই বংশের শাসন ক্ষমতার অবসান ঘটে।

আফ্রিকার আগলাবী সাম্রাজ্য

দ্বিতীয় খণ্ডে আব্বাসীয় খিলাফতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম স্পেন দেশ আব্বাসীয় খিলাফত থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল এবং

সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বনূ উমাইয়া বংশের একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের কথাও ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। স্পেনের পর মারাকিশও আব্বাসীয় খিলাফত থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং সেখানে স্বাধীন সার্বভৌম ইদরীসী সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ইদরীসী হুকুমতের কথাও ইতোপূর্বে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। মারাকিশের পর আফ্রিকা কিংবা তিউনিস কিংবা পশ্চিম তারাবলিস (ত্রিপোলি) খিলাফতে আব্বাসীয়া থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় আগলাবী হুকুমত। এই আগলাবী হুকুমতের কথা এখন সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে। আফ্রিকিয়া দেশ ও বার্বার অঞ্চল তথা উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহের শাসনকর্তা ও ভাইসরয় এই আফ্রিকিয়া অঞ্চলের ত্রিপোলির কায়রোয়ানে অবস্থান করতেন। মারাকিশ ও স্পেনের গভর্নর এই কায়রোয়ানের ভাইসরয়েরই পরামর্শ অনুযায়ী নিযুক্ত হতেন। আব্বাসীয় খিলাফত আমলে যখন স্পেন ও মারাকিশ আব্বাসীয় সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে যায় তখন কায়রোয়ানের ভাইসরয়ের মর্যাদা একজন মামুলী সুবাদার বা গভর্নরের পর্যায়ে চলে আসে। প্রজাসাধারণ এবং আবহাওয়ার দিক দিয়ে এই দেশ মারাকিশের সাথে সামঞ্জস্য রাখত এবং এখানেও বার্বাররা অধিক পরিমাণে বসবাস করত। তাই এই প্রদেশও সর্বদা বিপন্ন অবস্থায়ই থাকত এবং এখানকার কর্মকর্তা বা গভর্নরকেও তড়িঘড়ি বদলী করা হতো। এখানে সব সময়ই বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা অব্যাহত ছিল।

ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব

কর্মকর্তাদের বার বার বদলী করার কারণে যখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুকাতিল দ্বিতীয়বার এই দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন জনসাধারণ তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবকে, যিনি দরবারে খিলাফতে অবস্থান করছিলেন, এই মর্মে পত্র লেখে ঃ আপনি খলীফাকে বলে এই প্রদেশের শাসনভার আপনার হাতে গ্রহণ করুন। এই পত্র পেয়ে ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব খলীফা হারূনুর রশীদের খিদমতে নিবেদন করেন– আপনি মিসরের আমদানী থেকে এক লক্ষ দীনার আফ্রিকিয়া দেশের শাসন পরিচালনার কাজে ব্যয় করছেন। ঐ দেশ থেকে তো আপনার কোন আমদানী হয় না। আপনি আমাকে ঐ দেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠিয়ে দেন। আমি অঙ্গীকার করছি যে, মিসরের কোষাগার থেকে বার্ষিক ঐ এক লক্ষ দীনার তো আমি নেব না, বরং আফ্রিকিয়া থেকে কর হিসেবে বার্ষিক চল্লিশ হাজার দীনার দরবারে খিলাফতে প্রেরণ করতে থাকব। ইবরাহীম্ ইব্‌ন আগলাবের এই আবেদন সম্পর্কে খলীফা হারূনুর রশীদ হারসামা ইব্‌ন আইউনের সাথে পরামর্শ করেন। হারসামা বলেন, আপনি ইবরাহীমের এই আবেদন অবশ্যই মঞ্জুর করুন এবং আফ্রিকিয়া দেশ শাসন করার সনদ তাকে প্রদান করুন। অতএব হারূনুর রশীদ ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবকে সনদ প্রদান করেন। এটা এক ধরনের ঠিকা, যা ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবকে প্রদান করা হয়েছিল। যাহোক, ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুকাতিলের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আর যেহেতু প্রজাসাধারণ ইবরাহীমের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল তাই সমগ্র দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব ১৮৪ হিজরীতে (৮০০ খ্রি) আফ্রিকিয়া দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং কায়রোয়ানের সন্নিকটে একটি নতুন শহর নির্মাণ এবং তার নাম 'আব্বাসীয়া' রাখেন।

যুদ্ধ-বিগ্রহ

১৮৬ হিজরীতে (৮০২ খ্রি) হামদীস নামক জনৈক ব্যক্তি আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইবরাহীম ইমরান ইব্‌ন মুজাহিদকে একটি বাহিনীসহ হামদীসের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। এ ঘোরতর যুদ্ধের পর হামদীস পরাজিত হয় এবং তার দশ হাজার সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রেই প্রাণ হারায়। তারপর ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব তার পরিপূর্ণ শক্তি মাগরিবুল আকসার দিকে নিয়োজিত রাখেন। এটা হচ্ছে সেই যুগ, যখন প্রথম ইদরীস ইতিমধ্যে মারাকিশে দেহ্ ত্যাগ করেছেন এবং তাঁর রাশীদ নামক ভৃত্যটি 'ইদরীসে আসগর' নাম ধারণ করে মারাকিশে হুকুমত করছেন। ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব বার্বারদেরকে উপহার-উপঢৌকন দিয়ে নিজের পক্ষে টেনে নেন। আর ঐ বার্বারদেরই একটি দল রাশীদের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবের কাছে কায়রোয়ানে পাঠিয়ে দেয়। এরপরও ইবরাহীম আগলাব বার্বারদের প্রতি তার দানের হস্ত প্রসারিত রাখেন। ফলে ইদরীসে আসগরের বেশির ভাগ কর্মকর্তা তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু এর একটা উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়ার পূর্বেই ১৭৯ হিজরীতে (৭৯৫ খ্রি) তারাবুলিস (ত্রিপোলী)-এর অধিবাসীরা ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবের কর্মকর্তা সুফইয়ান ইব্‌ন মুহাজিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাকে ত্রিপোলী থেকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। ইবরাহীম ত্রিপোলী অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং ১৮৯ হিজরীতে যিলহজ্জ (নভেম্বর ৮০৫ খ্রি) মাসে পুনরায় ত্রিপোলীর কর্তৃত্ব লাভ করেন। ১৯৫ হিজরীতে (৮১০-১১ খ্রি) ইমরান ইব্‌ন মুজাহিদ রাবয়ী তিউনিসিয়া থেকে ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি একটি বাহিনী নিয়ে কায়রোয়ানের দিকে অগ্রসর হন এবং কায়রোয়ান দখল করে নেন। ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব আব্বাসীয়ার নিকটে গভীর পরিখা খনন করেন এবং আব্বাসীয়ার নিকট অবরুদ্ধ হয়ে বসে থাকেন। ইমরান এক বছর পর্যন্ত ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবকে অবরোধ করে রাখে। অবশ্য এই সময়ে অবরুদ্ধ ও অবরোধকারী প্রক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে প্রধানত ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবই জয়লাভ করেন। কিন্তু বিষয়টির কোন চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি। এই সময়ে ইমরান আসাদ ইব্‌ন ফুরাত কাযীকেও বদ্রোহ ঘোষণার জন্য প্ররোচিত করেন। কিন্তু আসাদ তা করতে অস্বীকার করেন। ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব খলীফা হারূনুর রশীদকে এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে তাঁর কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছিলেন। খলীফা হারূনুর রশীদ সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ প্রেরণ করেন। এই অর্থ এসে পৌছার সাথে সাথে ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব পুনরায় দান-দক্ষিণা শুরু করেন। যার ফলে ইমরানের বাহিনীর বেশির ভাগ লোক ইবরাহীমের কাছে চলে আসে। ইমরান এই অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং সেখান থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে যাব-এর দিকে চলে যান এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব এই বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৬ হিজরীতে (৮১১-১২ খ্রি) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে ত্রিপোলীর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ সেখানে পৌছার কয়েকদিনের মধ্যেই ত্রিপোলীর সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাজধানী ঘেরাও করে ফেলে। তারা আবদুল্লাহ্‌কে নিরাপত্তা প্রদান করে এই শর্তে যে, তিনি ত্রিপোলী ছেড়ে চলে যাবেন। আবদুল্লাহ্ ত্রিপোলী থেকে বেরিয়ে যান সত্য, তবে ঐ

এলাকায় অবস্থান করে বার্বারদেরকে নিজের দলে টানতে থাকেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রচুর অর্থ দান করেন। এভাবে আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে একটি বিরাট বাহিনী গড়ে ওঠে এবং তারা জোর আক্রমণ চালিয়ে ত্রিপোলী দখল করে নেয়। এর খিছু দিন পর ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব আবদুল্লাহ্‌কে পদচ্যুত করে সুফইয়ান ইব্‌ন মুযায়কে ত্রিপোলীর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু ত্রিপোলীবাসীরা পুনরায় বিদ্রোহ করে সুফইয়ানকে সেখান থেকে বের করে দেয়। সুফইয়ান ইবরাহীমের কাছে আব্বাসীয়া চলে যান। এবার ইবরাহীম সুফইয়ানের সাথে তার পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে প্রেরণ করেন এবং তারা উভয়ে ত্রিপোলী গিয়ে পৌঁছেন। উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারপর ত্রিপোলীতে কিছুদিন শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু শীঘ্রই আবদুল ওহ্‌হাব ইব্‌ন আবদুল ওহ্‌হাব ইব্‌ন আবদুর রহমান ত্রিপোলী আক্রমণ করে। ফলে পুনরায় সেখানে রক্তারক্তি শুরু হয়।

মৃত্যু

১৯৬ হিজরীতে (৮১১-১২ খ্রি) ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব আব্বাসীয়ায় ইনতিকার করেন। এই সংবাদ যখন ত্রিপোলীতে আবদুল্লাহ্‌র নিকট গিয়ে পৌঁছে তখন তিনি আবদুল্লাহ্‌র সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। তিনি ত্রিপোলীর পার্শ্ববর্তী এলাকা আবদুল্লাহ্‌কে দিয়ে ত্রিপোলী শহরটি নিজের দখলে রাখেন এবং আপোসচুক্তি সম্পাদনের পর ত্রিপোলী থেকে কায়রোয়ান অভিমুখে রওয়ানা হন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইবরাহীম

ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব মৃত্যুকালে পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে তার অলীআহ্‌দ (স্থলাভিষিক্ত) নিয়োগ করেন এবং অপর পুত্র যিয়াদাতুল্লাহ্‌কে উপদেশ দেন, যেন সে তার ভাইয়ের অনুগত থাকে। অতএব পিতার মৃত্যুর পর যিয়াদাতুল্লাহ্ তার ভাই আবদুল্লাহ্‌র জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব ১৯৭ হিজরীর সফর (৮১২ খ্রি অক্টোবর) মাসে কায়রোয়ানে উপনীত হন এবং শাসনক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করেন। আনুমানিক পাঁচ বছর হুকুমত করার পর ২০১ হিজরীর যিলহজ্জ (৮১৭ খ্রি জুন) মাসে কর্ণরোগে আক্রান্ত হয়ে আবদুল্লাহ্ ইনতিকাল করেন। আবদুল্লাহ্‌র পর তার ভাই যিয়াদাতুল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

যিয়াদাতুল্লাহ্

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবরাহীম আগলাব ঠিকা ভিত্তিতে এই দেশের কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই খুতবায় আব্বাসীয় খলীফার নাম উল্লেখ করা হতো। তবে হুকুমত ছিল স্বায়ত্তশাসিত। যিয়াদাতুল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁর কাছে মামূনুর রশীদ আব্বাসীর পক্ষ থেকে হুকুমতের সনদ এসে পৌঁছে। সেই সাথে এই হুকুমও আসে যে, মিম্বরের উপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের জন্য যেন দু'আ করা হয়। যিয়াদাতুল্লাহ্‌র কাছে এই হুকুমটি অপছন্দনীয় ঠেকে। তাই তিনি আব্বাসীয় খলীফার দূতকে বিদায় দানকালে হাদিয়া ও উপঢৌকনের সাথে ইদরীসী হুকুমতের টাকশালে তৈরি কয়েকটি

দীনার পাঠিয়ে দেন। এর দ্বারা আব্বাসীয় খলীফাকে এটাই বুঝানো হচ্ছিল যে, আমরা আপনার স্থলে ইদরীসী হুকুমতের সাথেও সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারি।

বিদ্রোহ

কিছুদিন পর যিয়াদ ইব্ন সাহ্ল নামক জনৈক অধিনায়ক বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাজাহ্ শহর অবরোধ করে ফেলেন। যিয়াদাতুল্লাহ্ এই সংবাদ পেয়ে ২০৭ হিজরীতে (৮২২-২৩ খ্রি) একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা যিয়াদের বাহিনীকে পরাজিত করে। খোদ যিয়াদও তাদের হাতে বন্দী ও নিহত হন। তারপর মানসূর তিরমিযী তান্‌বাহ্ নামক স্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সেনাবাহিনী গঠন করে তিউনিসের উপর হামলা চালান। তিউনিসের গভর্নর মানসূরের সাথে এক সংঘর্ষে নিহত হন। ফলে তিউনিসের উপর মানসূরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যিয়াদাতুল্লাহ্ তার চাচাত ভাই এবং উযীর আগলাব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আগলাবকে মানসূরের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি তাদেরকে বলেন, যদি তোমরা মানসূরের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে আস তাহলে তোমাদের সাবইকে আমি হত্যা করব। যাহোক, দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মানসূর তার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেন। আগলাব ইব্ন আবদুল্লাহ্ পরাজিত ও পর্যুদস্ত অবস্থায় কায়রোয়ানের দিকে ফিরে আসছিলেন। এমন সময় সৈন্যরা তাদের প্রাণের ভয়ে আগলাব ইব্ন আবদুল্লাহ্কে হত্যা করে এবং নিজেরা মানসূরের কাছে চলে যায়। এবার মানসূর ভীষণ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে কায়রোয়ান অভিমুখে রওয়ানা হন এবং অতি সহজেই কায়রোয়ান দখল করে নেন। যিয়াদাতুল্লাহ্ আব্বাসীয়ায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তারপর উভয়পক্ষের মধ্যে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত যিয়াদাতুল্লাহ্ জয়ী হন এবং মানসূর সেখান থেকে পালিয়ে তিউনিসে চলে যান। এমতাবস্থায় সামরিক অধিনায়কদের মধ্যে কেউ কেউ নিজ নিজ সুবিধামত দেশের এক একটি অংশ দখল করে নেয়। আমির ইব্ন নাফি আরযাক ছিলেন তাদেরই একজন, যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। যিয়াদাতুল্লাহ্ একটি বাহিনী দিয়ে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আগলাবকে আমিরের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। আমির এই বাহিনীকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। মোটকথা, ঐ সময় যিয়াদাতুল্লাহ্‌র দখলে খুব কম বাকি জায়গায় থাকে। অবশিষ্টটুকু বিভিন্ন অধিনায়ক দখল করে ফেলে। কিন্তু কিছু দিন পরই মানসূর ও আমিরের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই সুযোগে যিয়াদাতুল্লাহ্ তার অবস্থাকে চাঙ্গা করে নেন এবং পুনরায় নিজেকে সুসংগঠিত করে তোলেন। এদিকে মানসূর আমিরের হাতে নিহত হন এবং আমির তিউনিসে নিজের একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ২১৮ হিজরীতে (৮৩৩ খ্রি) যিয়াদাতুল্লাহ্ তিউনিসও দখল করে নেন। তারপর অন্যান্য অধিনায়ককেও পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন।

সিসিলী দ্বীপ জয়

সাকলিয়া (সিসিলী) দ্বীপ তখন কনসটান্টিনোপলের কায়সারের অধীনে ছিল। সেখানে কায়সারের পক্ষ থেকে একজন গভর্নর নিয়োজিত হতেন এবং তিনিই দেশ শাসন করতেন। ২১১ হিজরীতে (৮২৬ খ্রি) কায়সার কাসানতিল নামক একজন পুরোহিতকে সিসিলীর শাসক

নিয়োগ করেন। তিনি ফীমী নামক একজন রোমান অধিনায়ককে নৌ-সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। ফীমী আফ্রিকা উপকূলে লুটপাট শুরু করে এবং সমুদ্রের মধ্যে পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু ঠিক ঐ সময়েই কায়সার সিসিলীর গভর্নরকে লেখেন– তুমি তোমার নৌ-সেনাধ্যক্ষকে গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। নৌ-সেনাধ্যক্ষের কাছে যখন এই সংবাদ পৌছে তখন তিনি সিসিলী দ্বীপে প্রবেশ করে সারতূসা শহর দখল করে নেন। তারপর গভর্নর ও নৌ-সেনাধ্যক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে গভর্নর নিহত হন এবং ঐ নৌ-সেনাধ্যক্ষ ফীমী সমগ্র দ্বীপ দখল করে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। দ্বীপের এই রাজা বালাতা নামক জনৈক ব্যক্তিকে দ্বীপের একটি অংশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। বালাতার এক চাচাত ভাই মীখাইলও এই দ্বীপের একটি অংশের শাসনকর্তা ছিলেন। শেষ পর্যন্ত দুই চাচাত ভাই একত্রিত হয়ে ফীমীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর সম্পূর্ণ সারকাসা দখল করে নেন। ফীমী পরাজিত হয়ে ঐ দ্বীপ ছেড়ে চলে আসেন। তারপর যিয়াদাতুল্লাহ্ কায়রোয়ানের কাযী আসাদ ইব্ন ফুরাতকে একটি বাহিনীসহ সিসিলীর বাদশাহ্ ফীমীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন।

মুসলমানরা সর্বপ্রথম হযরত মুআবিয়ার খিলাফত আমলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স ফাযারীর নেতৃত্বে সিসিলী দ্বীপ আক্রমণ করেছিল। কিন্তু রোমানদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা ছাড়া ঐ আক্রমণের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ঐ আক্রমণ পরিচালনা করা হয়েছিল ৩৩ হিজরীতে (৬৫৩-৫৪ খ্রি)। তারপর ৮৫ হিজরীতে (৭০৪ খ্রি) আফ্রিকার ভাইসরয় মূসা ইব্ন নুসায়রও ঐ একই উদ্দেশ্যে সিসিলী দ্বীপের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। তারপর ১০২ হিজরীতে (৭২০-২১ খ্রি) মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ ইদরীস নামক খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের জনৈক অধিনায়ক সিসিলী দ্বীপ আক্রমণ করেন। এই সবগুলো হামলাতে মুসলমানরা জয়লাভ করে এবং সেখান থেকে অনেক কয়েদী ও গনীমতের মাল নিয়ে তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে। ১১০ হিজরীতে (৭২৮ খ্রি) আফ্রিকিয়ার ভাইসরয় উবায়দা ইব্ন আবদুর রহমান কায়সী-এর মুসতানীর ইব্ন হারূস নামক জনৈক অধিনায়ক একদল সৈন্য নিয়ে সিসিলী অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু সমুদ্রে ঝড় ওঠার ফলে অনেকগুলো জাহাজ ডুবে যাওয়ায় ঐ অভিযান ব্যর্থ হয়। মুসতানীর রাস্তা থেকেই কোন মতে ত্রিপোলী ফিরে আসেন। তারপর ১২২ হিজরীতে (৭৪০ খ্রি) আফ্রিকার গভর্নর উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন হিজাব হাবীব ইব্ন মুহাম্মাদকে তার পুত্র আবদুর রহমান ইব্ন হাবীবসহ সিসিলীর উদ্দেশে প্রেরণ করেন। আবদুর রহমান ইব্ন হাবীব উপকূলে উঠে অভিযান শুরু করেন এবং অগ্রসর হতে হতে দ্বীপের অভ্যন্তরে রাজধানী সারাগোসা পর্যন্ত গিয়ে পৌছেন। সিসিলীর শাসক আবদুর রহমান ইব্ন হাবীবকে জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হন এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন। এভাবে আবদুর রহমান বিজয়ী বেশে প্রচুর মালে গনীমত নিয়ে পিতা হাবীব ইব্ন উবায়দুল্লাহ্র কাছে সমুদ্র উপকূলে ফিরে আসেন। কিন্তু আবদুর রহমান ও তার পিতা সিসিলী থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পর ঐ দ্বীপটি পুনরায় মুসলমানদের দখল থেকে বেরিয়ে যায়। তবে এই বের হওয়াটাও ছিল একটি সাময়িক ব্যাপার। ১৩৫ হিজরীতে (৭৫২-৫৩ খ্রি) আফ্রিকার হাকিম পুনরায় এই দ্বীপে সৈন্য প্রেরণ করেন। তারপর ২১২ হিজরী (৮২৭-২৮ খ্রি)পর্যন্ত মুসলমানরা এই দ্বীপের প্রতি মনোনিবেশ করার সুযোগ আর পায়নি।

যিয়াদাতুল্লাহ্‌র কাছে ফীমী এসে ঐ দ্বীপ জয় করার জন্য যখন তাকে উদ্বুদ্ধ করল তখন যিয়াদাতুল্লাহ্‌ কায়রোয়ানের কাযী আসাদ ইব্‌ন ফুরাতকে ফীমীর জাহাজগুলো ছাড়াও আরো একশ' জাহাজ দিয়ে সিসিলীর দিকে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যেন সিসিলী জয় করে সেখানে পৃথকভাবে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেখান থেকে রোমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলা হয়। ২১২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি (৮২৭ খ্রি জুলাই) সময়ে ঐ নৌবহর সিসিলী অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং তিন দিনের মাথায় সিসিলী উপকূলে গিয়ে পৌঁছে। বালাতাহ্‌, যিনি তখন দ্বীপে বাদশাহর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাদের মুকাবিলায় সৈন্য প্রেরণ করেন। বালাতাহ্‌ কায়সারের দরবারে আনুগত্যের দরখাস্ত পেশ করে যথারীতি হুকুমতের সনদ লাভ করেছিলেন এবং কায়সারের কাছে সাহায্যও প্রার্থনা করেছিলেন। যা হোক, উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। প্রতিটি ফ্রন্টেই খ্রিস্টান সেনাপতিকে পরাজিত করে মুসলমানরা অগ্রসর হচ্ছিল। উল্লিখিত ফীমীও মুসলমান সেনাবাহিনীর সাথে ছিল। কিন্তু সে মুসলমানদের হাতে খ্রিস্টানদের পরাজয়ের পর পরাজয় দেখে কিছুটা বিচলিত এবং মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এমন কি শেষ পর্যন্ত গোপনে গোপনে সে খ্রিস্টানদের কাছে মুসলমানদের সংবাদ পৌঁছাতে থাকে এবং উপস্থিত পরিস্থিতিতে কি করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শও দিতে থাকে। যার ফলে মুসলিম বাহিনী কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও কোন একটি যুদ্ধে বালাতাহ্‌ নিহত হন এবং খোদ খ্রিস্টানরাই প্রতারণার মাধ্যমে ফীমীকে মুসলিম বাহিনী থেকে পৃথক করে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। বালাতাহ্‌র স্থলে খ্রিস্টানরা সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন মনোনীত করে এবং সারকূসাকে সবরকম প্রস্তুতির মাধ্যমে সুদৃঢ় করে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে যেতে থাকে। কাযী আসাদ ইব্‌ন ফুরাত সারকূসা অবরোধ করেন। কিন্তু এই অবরোধ চলাকালেই তিনি ২১৩ হিজরী শাবান (৮২৮ খ্রি নভেম্বর) মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কাযী আসাদ ইব্‌ন ফুরাতের মৃত্যুর পর মুসলিম বাহিনী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবুল জাওয়ারীকে তাদের নেতা মনোনীত করে। এরপরই খ্রিস্টানদের সাহায্য এবং মুসলমানদের মুকাবিলায় কনস্টান্টিনোপল থেকে জাহাজে চড়ে সেনাবাহিনী এসে পড়ে। উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর মুসলিম বাহিনী ঐ নবাগত খ্রিস্টান বাহিনীকে তাড়িয়ে দেয় এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অবরোধ অব্যাহত রাখে। কিন্তু এরপরই মুসলিম বাহিনীর মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের জন্য ঐ মহামারীর আক্রমণ খ্রিস্টান বাহিনীর আক্রমণের চাইতেও ছিল ভয়ংকর ও মারাত্মক। এতে অনেক লোক মৃত্যুবরণ করে। এবার মুসলমানরা সারকূসা থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিজেদের অধিকৃত শহরসমূহে ফিরে আসে এবং সেখান থেকে আফ্রিকায় চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে পুনরায় ফিরে এসে ঐ দ্বীপটি দখল করে নিতে পারে। কিন্তু ইতোমধ্যেই কনস্টান্টিনোপলের নৌ-বহর তাকে ঘিরে ফেলেছে। এবার প্রচুর সংখ্যক খ্রিস্টান সৈন্য স্থল ও জলপথে এসে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করে ও ঘাঁটির মধ্যেই তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে। কিছু সংখ্যক মুসলমান, যারা দখলীকৃত শহরসমূহের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ছিল, এই সংবাদ

পেয়ে অবরুদ্ধ মুসলমানদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে, কিন্তু খ্রিস্টানদের অবরোধ ভাংতে না পেরে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত অবস্থায় এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতে থাকে। এই অবরুদ্ধ অবস্থায়ই মুহাম্মাদ ইব্ন আবুল জাওয়ারী ইনতিকাল করেন।

মুসলমানরা সঙ্গে সঙ্গে যুহায়র ইব্ন আউফকে নিজেদের নেতা মনোনীত করে। কিন্তু মাযর নামক স্থানে তারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত এরূপ অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে। ঘটনাচক্রে স্পেনের একটি নৌবহর জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল এবং রোম সাগরে ঘোরাফেরা করছিল। সিসিলীর যে সব মুসলমান অবরোধের বাহিরে ছিল তারা কোন না কোন ভাবে স্পেনের ঐ নৌবহরের কাছে গিয়ে তাদেরকে মুসলিম বাহিনীর এই নাজুক অবস্থার কথা জানায়। তখন ঐ বহর থেকে তিনশ'টি নৌকা সিসিলী উপকূলে প্রেরণ করা হয়। স্পেনের মুসলিম বাহিনী নৌকা থেকে বের হয়ে খ্রিস্টানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খ্রিস্টানরা এই আকস্মিক হামলা প্রতিরোধ করতে না পেরে অবরোধ তুলে পালিয়ে যায়। এটা হচ্ছে ২১৫ হিজরীর জমাদিউস্ সানীর (৮৩০ খ্রি সেপ্টেম্বর) ঘটনা। মুসলমানরা এই অবরোধ থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় বিজয় অভিযান পরিচালনা করে। স্পেনের নৌবহর এই কাজ সেরে ফিরে যায় বটে, তবে আফ্রিকী মুসলিম বাহিনী পালার্মো ঘেরাও করে ফেলে এবং অন্যান্য দখলীকৃত শহরের উপরও নতুনভাবে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ইতিমধ্যে আফ্রিকা থেকেও নৌযোগে সাহায্য এসে পৌঁছে। এর পূর্বে যে বাহিনী আসাদ ইব্ন ফুরাতের সঙ্গে এসেছিল তাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার সাতশ'। তন্মধ্যে দশ হাজার ছিল পদাতিক এবং সাতশ অশ্বারোহী। পালার্মো তখনও বিজিত হয়নি এমনি সময়ে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আগলাব অর্থাৎ যিয়াদাতুল্লাহ্র চাচাত ভাই সিসিলীর গভর্নর হয়ে আসেন। তিনি ২২০ হিজরীতে (৮৩৫ খ্রি) পালার্মো, কাসীরমানা প্রভৃতি শহর রোমানদের কাছ থেকে দখল করে নেন। দ্বীপের দক্ষিণ অর্ধাংশ মুসলমানদের দখলে ছিল এবং উত্তর অর্ধাংশ ছিল তখন খ্রিস্টানদের দখলে। খ্রিস্টানরা কায়সারের কাছ থেকে অনবরত সাহায্য পাচ্ছিল। এতদ্সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের দখলীকৃত এলাকার আয়তন দিনের পর দিন বাড়িয়েই যাচ্ছিল। পালার্মো বিজয়ের পর সিসিলী দ্বীপ আগলবী সুলতানদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। সেখানে কায়রোয়ান থেকে একের পর এক গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসতেন এবং সে প্রদেশ শাসন করতেন। যিয়াদাতুল্লাহ্র শাসনামলের সর্ববৃহৎ কীর্তি হচ্ছে সিসিলী দ্বীপকে ইসলামী হুকুমতের অন্তর্ভুক্তকরণ। আনুমানিক পৌনে তিনশ' বছর পর্যন্ত মুসলমানরা এই দ্বীপটি শাসন করে। শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয় এবং এই সুযোগে খ্রিস্টানরা দ্বীপটি পুনরায় নিজেদের দখলে নিয়ে যায়। তারপর তারা সেখান থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা এমনভাবে মুছে ফেলে যেমনভাবে মুছে ফেলেছিল স্পেন থেকে।

যিয়াদাতুল্লাহ্র মৃত্যু

২২৩ হিজরীতে (৮৩৮ খ্রি) যিয়াদাতুল্লাহ্ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তাঁর ভাই আগলাব ইব্ন ইবরাহীম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর ডাক নাম ছিল আবূ ইকাল।

আগলাব ইব্ন ইবরাহীম আবূ ইকাল

আবূ ইকালের শাসনাধীনে জনসাধারণ সাধারণভাবে সন্তুষ্ট ছিল। সেনাবাহিনীও ছিল তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তখন কেউ বিদ্রোহ করলে তা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে দমন করা হতো। দু'বছর সাত মাস শাসন ক্ষমতা পরিচালনার পর আবূ ইকাল ২২৬ হিজরীর রবীউল আউয়াল (৮৪১ খ্রি জানুয়ারী) মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্ন আগলাব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আগলাব।

আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ

আবুল আব্বাস মুহাম্মাদের শাসনব্যবস্থা ছিল তাঁর পিতারই অনুরূপ। ২৪০ হিজরীতে (৮৫৪-৫৫ খ্রি) আবুল আব্বাসের ভাই আবূ জা'ফর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তার ভাইকে পদচ্যুত করে নিজেই শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আবুল আব্বাস বিভিন্ন সুযোগে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন এবং দেড় বছর পর ২৪২ হিজরীতে (৮৫৬ খ্রি) পুনরায় সিংহাসন দখল করে আবূ জা'ফরকে মিসরের দিকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু এ বছরই আবুল আব্বাস ইনতিকাল করেন এবং তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র আবূ ইবরাহীম আহমদ ইব্ন আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবূ ইবরাহীম আহমদ

আবূ ইবরাহীম আহমদ সিংহাসনে আরোহণ করে সেনাবাহিনীর বেতন বাড়িয়ে দেন। রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে দুর্গ নির্মাণ করা হয়। তখন সিসিলী দ্বীপের রোমান বাহিনীর সাথে অবিরাম যুদ্ধ চলতে থাকে। আবূ ইবরাহীমের যুগে ২৪৭ হিজরী সনের শাওয়াল (৮৬২ খ্রি জানুয়ারী) মাসে মুসলমানরা রোমানদের উপর একটি বিরাট বিজয় লাভ করে এবং অনেক রোমান যুদ্ধবন্দী আফ্রিকায় নিয়ে আসে। ইবরাহীম তখন এই বিজয় সংবাদসহ রোমান বন্দীদেরকে খলীফা মুতাওয়াক্কিলের কাছে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। আগলাব বংশের শাসকরা আফ্রিকিয়া প্রদেশে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করলে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বাগদাদের নেতৃত্ব স্বীকার করতেন এবং কোন না কোনভাবে অবশ্যই দরবারে খিলাফতের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। ২৪৯ হিজরীতে (৮৬৩ খ্রি) আবূ ইবরাহীম আহমদ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র যিয়াদতুল্লাহ্ যিনি যিয়াদাতুল্লাহ্ আসগর নামে খ্যাত ছিলেন, সিংহাসনে আরোহণ করেন।

যিয়াদাতুল্লাহ্

যিয়াদাতুল্লাহ্ আসগরের শাসনকাল তাঁর পূর্বপুরুষদেরই অনুরূপ ছিল। কিন্তু তিনি এক বছরের বেশি সাম্রাজ্য শাসনের সুযোগ পান নি। তারপর তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ ইবরাহীম আহমদ ওরফে আবুল গারানীক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবুল গারানীক

আবুল গারানীক তাঁর ভাই যিয়াদাতুল্লাহ্ আসগরের মৃত্যুর পর ২৫০ হিজরীতে (৮৬৪ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন খেলাধুলার প্রতি অধিক অনুরাগী। তাঁর

শাসনকালে সিসিলী দ্বীপের একটি অংশ রোমানরা মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নেয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমানরা পুনরায় তা রোমানদের কাছ থেকে উদ্ধার করে। আবুল গারানীক মরক্কো সীমান্তে এবং সমুদ্র উপকূলে বেশ কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এগার বছর শাসন পরিচালনার পর আবুল গারানীক ২৪১ হিজরীর জমাদিউস সানী (৮৫৫ খ্রি নভেম্বর) মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তাঁর ভাই ইবরাহীম ইব্ন আবূ ইবরাহীম আহমদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইবরাহীম ইব্ন আহমদ

ইবরাহীম ইব্ন আহমদ অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে শাসন পরিচালনা শুরু করেন এবং দেশের শাসন কাঠামোকে অত্যন্ত মজবুত ভিত্তির উপর গড়ে তুলেন। তিনি বিদ্রোহের যাবতীয় সম্ভাবনাকেও নিশ্চিহ্ন করে দেন। ২৬৭ হিজরীতে (৮৮০-৮১ খ্রি) মিসরীয় বাহিনী আফ্রিকার উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। কিন্তু ইবরাহীমের বাহিনী তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। ২৬৯ হিজরীতে (৮৮২-৮৩ খ্রি) দেশের মধ্যে একটি বিদ্রোহ দেখা দেয়, যে কারণে অনেক লোক নিহত হয়। ২৮০ হিজরীতে (৮৯৩ খ্রি) খারিজীরা বিদ্রোহ করে এবং সমগ্র দেশে সেই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ইবরাহীম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে খারিজীদের সে বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তারপর ইবরাহীম সুদানী লোকদেরকে তার সেনাবাহিনীতে ভর্তি করেন। ঐ সমস্ত সুদানী যুবক, যাদেরকে অশ্বারোহী হিসাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছিল, তাদের সংখ্যা ত্রিশ হাজারে গিয়ে পৌঁছে। ২৮১ হিজরীতে (৮৯৪ খ্রি) ইবরাহীম কায়রোয়ান থেকে তিউনিস নগরীতে চলে আসেন এবং সেখানেই প্রাসাদ তৈরি করে বসবাস শুরু করেন। তিনি ২৮৩ হিজরীতে (৮৯৬ খ্রি) ইব্ন তূলূনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মিসর অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে একটি বিদ্রোহ সংবাদ শুনে সেদিকে রওয়ানা হন এবং সে বিদ্রোহ দমন করেন।

২৮৭ হিজরীতে (৯০০ খ্রি) সিসিলী দ্বীপ থেকে সংবাদ আসে যে, পালার্মোর অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তখন ইবরাহীম তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্কে ১৬০টি নৌকার একটি নৌবহর দিয়ে সিসিলী অভিমুখে প্রেরণ করেন। আবুল আব্বাস সিসিলীতে উপনীত হয়ে খ্রিস্টান বিদ্রোহীদেরকে একের পর এক পরাজিত করে সমগ্র দ্বীপে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করে সিসিলীর নৌযানসমূহে আরোহণ করেন এবং ফ্রান্স উপকূলে হামলা পরিচালনা করেন। এভাবে দেড় বছর পর সেখান থেকে নিরাপদে ও বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। তাঁর ফিরে আসার সাথে সাথে খোদ ইবরাহীম সিসিলী অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেখান থেকে ফ্রান্স উপকূলেও হামলা চালান। ফরাসীরা তাঁকে অত্যন্ত ভয় করত। তিনি সেখানকার কিছু অঞ্চল ঘেরাও করে রেখেছিলেন। এমতাবস্থায় ২৮৯ হিজরীর যিলহজ্জ (৯০২ খ্রি ডিসেম্বর) মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর লাশ (শবদেহ) সেখান থেকে পালার্মো নিয়ে এসে দাফন করা হয়।

এই ইবরাহীমের শাসনামলে শীআ মতাবলম্বী আবূ আবদুল্লাহ্ হুমায়ূন ইব্ন মুহাম্মাদ মরক্কো ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী সীমান্তে আটলাস পর্বতের দক্ষিণে কাতামা শহরে আবির্ভূত হন এবং বার্বার সম্প্রদায়সমূহকে আহলে বায়তের মুহাব্বতের দোহাই দিয়ে নিজের পক্ষাবলম্বী করে নেন এবং এভাবে যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি কাতামা শহর দখল করে আগলাবী সাম্রাজ্যের সীমান্তকে পর্যুদস্ত করতে শুরু করেন। ইতোমধ্যে আগলাবী মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইবরাহীম সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবুল আব্বাস

আবুল আব্বাস সিংহাসনে আরোহণ করে তিউনিসে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং তাঁর পুত্র আবুল খাওলের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহ্র অনুসারীদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করেন। শীআরা পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে আবূ খাওলের উপর আক্রমণ চালায়। চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী এক বিরাট যুদ্ধের পর আবূ খাওল পরাজিত হন এবং তিউনিসে ফিরে আসেন। তিনি সেখান থেকে পুনরায় নৈন্য সংগ্রহ করে শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহ্র মুকাবিলায় রওয়ানা হন। আবূ আবদুল্লাহ্ প্রতারণার মাধ্যমে তাঁর সেনাবাহিনীর উপর হামলা চালান। এই অতর্কিত হামলার ফলশ্রুতিতে আবুল খাওলের বাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। আবুল খাওল 'সাতীফ' নামক স্থানে অবস্থান করে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আবূ আবদুল্লাহ্র মুকাবিলায় রওয়ানা হন। এদিকে আবুল খাওলের অপর ভাই যিয়াদাতুল্লাহ্ ইব্ন আবুল আব্বাস তাঁর পিতার কিছু সংখ্যক চাকর ভৃত্যের সাথে ষড়যন্ত্র করে আবুল আব্বাসকে হত্যা করেন এবং স্বয়ং ২৯০ হিজরীর শাবান (৯০২ খ্রি জুলাই) মাসে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আবুল খাওলের কাছে এই সংবাদ পৌঁছার পর তিনি তিউনিসে ফিরে আসেন এবং সাথে সাথে বন্দী ও নিহত হন। আবুল খাওল ছাড়াও যিয়াদাতুল্লাহ্ তার ভ্রাতা ও পিতৃব্যদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এ কারণেই যিয়াদাতুল্লাহ্র ডাক নাম ছিল আবূ মুযির বা ক্ষতিকারকের বাবা।

আবূ মুযির যিয়াদাতুল্লাহ্

আবূ মুযির যিয়াদাতুল্লাহ্র সিংহাসনে আরোহণের পর শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহ্ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সাতীফ শহর দখল করে নেন এবং তার ক্ষমতা বেশ বৃদ্ধি পায়। আবূ মুযির ছিলেন আরামপ্রিয় এবং কাপুরুষ। তিনি তিউনিস ত্যাগ করে বাকাদা নামক স্থানে বসবাস স্থাপন করেন এবং তার এক অধিনায়ক ইবরাহীম ইব্ন জায়শকে শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহ্র মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। ইবরাহীম ইব্ন জায়শ চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ রওয়ানা হন এবং কাস্তিলায় পৌঁছে সেখানে ছয় মাস অবস্থান করেন। ঐ সময়ে তিনি চতুর্দিক থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তার সেনাবাহিনীর সংখ্যা এক লক্ষে গিয়ে পৌঁছে। এই বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি কাতামা অভিমুখে রওয়ানা হন। উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘটনাচক্রে ইবরাহীম ইব্ন জায়শই পরাজিত হন এবং তিনি সেখান থেকে কায়রোয়ানে পালিয়ে আসেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ তুনবাহ শহর জয় করে সেখানকার কর্মকর্তা ফাতহ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়াকে হত্যা করেন। আবূ আবদুল্লাহ্র এই সমস্ত বিজয় সংবাদ শুনে কায়রোয়ান এবং অন্যান্য শহরে চাঞ্চল্য ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাকে সামাল দেওয়ার জন্য যিয়াদাতুল্লাহ্ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তিনি তার বাহিনীতে অনবরত সৈন্য ভর্তি করতে থাকেন এবং প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় বাহিনীর পর বাহিনী পাঠাতে থাকেন। এতদ্সত্ত্বেও আবূ আবদুল্লাহ্র অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে এবং একটির পর একটি শহর তার দখলে আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আবূ আবদুল্লাহ্ কামূদাহ্ শহরও দখল করে নেয়।

আগলাবী সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি

কামূদাহ্ শহরের পতন সংবাদ শুনে আবূ মুযির যিয়াদাতুল্লাহ্ তার যাবতীয় ধন-সম্পদ জাহাজে ভর্তি করে 'রাকাদা' থেকে পূর্ব দিকে চলে যান। প্রথমে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তারই অধীনস্থ সেখানকার শাসক তাকে সেখানে অবতরণ করতে দেন নি। অতএব তিনি বাধ্য হয়ে সিরিয়া উপকূলে অবতরণ করেন এবং রাক্কাহ্ নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সেখানেই তার মৃত্যু হয় এবং তার মৃত্যুর সাথে সাথে আগলাবী শাসনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। ২৯৬ হিজরীতে (৯০৮-৯ খ্রি) শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহ্ সম্পূর্ণ আগলাবী সাম্রাজ্য দখল করে জনসাধারণের কাছ থেকে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর পক্ষে বায়আত নেন। আর এভাবেই আগলাবী সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং উবায়দিয়্যিন সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। এ বছরই রাকাদাহ্, কায়রোয়ান প্রভৃতি দখল করে আবূ আবদুল্লাহ্ ২৯৭ হিজরীতে (৯০৯-১০ খ্রি) হাসান ইব্ন খাযীর কাতামীকে সিসিলী দ্বীপের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠন। কিন্তু ২৯৯ হিজরীতে (৯১১-১২ খ্রি) সিসিলীবাসীরা হাসান ইব্ন খাযীরের অসদাচরণে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে তাকে বন্দী করে ফেলে এবং উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীকে এই সংবাদ জানিয়ে তার কাছ থেকে নিজেদের এলাকার জন্য অপর একজন গভর্নর নিয়োগ-এর অনুমোদন লাভ করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মিসর ও আফ্রিকায় উবায়দী সাম্রাজ্য

আবূ আবদুল্লাহ্

আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা হওয়ার সাথে সাথে আলীপন্থীরা তার বিরোধিতা করতে থাকে (এ সম্পর্কে দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। তারা বার বার বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যদিও প্রতিবারই তাদেরকে বিফলতার মুখ দেখতে হয়। আহ্লে বায়তের সাথে তাদের ভালবাসার এবং আব্বাসীয়দের সাথে বৈরিতার সর্ম্পক রয়েছে, এই অজুহাত দেখিয়ে আলাভীরা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক আত্মপ্রচারণা (আলীপন্থীরা) শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু আব্বাসীয়দের দৃঢ়তা এবং তাদের অনুসারী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের চেষ্টার ফলে আলীপন্থীরা তাদের মিশনে সাফল্য লাভ করতে পারে নি। ইহুদী আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা এই গোপন ষড়যন্ত্রের সূচনা করেছিল। তাকেই এই ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার গুরু এবং উদ্ভাবক আখ্যা দেওয়া উচিত। এই কাজে মাজূসী (অগ্নিউপাসক) ইহুদী এবং বার্বাররাও নওমুসলিমের ছদ্মবেশে আলীপন্থীদের সহায়তা করে। যখন বিরাট আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ক্ষমতায় শৈথিল্য দেখা দিতে শুরু করে তখন কিছু সংখ্যক ইহুদী এবং মাজূসী বংশের লোক নিজেদেরকে আলাভী পরিচয় দিয়ে এ থেকে ফায়দা লুটতে চায়। যেহেতু বার্বার এলাকা ছিল বাগদাদ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল থেকে অনেক দূরে এবং বার্বারদের প্রকৃতিগত অস্থিরচিত্ততা থেকে ফায়দা উঠানো ছিল খুবই সহজ, তাই তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষ দিকে মুহাম্মাদ হাবীব নামক জনৈক ব্যক্তি যিনি হেম্‌স এলাকার সালমিয়ায় অবস্থান করছিলেন নিজেকে ইমাম জাফর সাদিক (র)-এর পুত্র ইসমাঈলের বংশধর হিসেবে প্রকাশ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেন। ইমাম জা'ফর সাদিক (র)-এর যুগ থেকে তার 'দাঈ' (প্রচারক)-রা ইয়ামান, আফ্রিকার এবং মারাকিশে প্রচার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তারা জনসাধারণের দৃষ্টি এই বলে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করছিলেন যে, শীঘ্রই ইমাম মাহ্দী আবির্ভূত হবেন এবং তিনি হবেন (আলীপন্থী) আলাভী ফাতিমী। মুহাম্মাদ হাবীব তার একান্ত অনুসারীদের মধ্য থেকে রুস্তম ইব্ন হাসান ইব্ন হাওশাব নামক জনৈক ব্যক্তিকে ইয়ামানের দিকে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যে, তিনি সেখানে গিয়ে জনসাধারণকে এই মর্মে তালিম দেবেন যে, ইমাম মাহ্দী শীঘ্রই আবিভূর্ত হবেন। রুস্তয় ইয়ামানে গিয়ে অত্যন্ত সুচারুরূপে নিজের দায়িত্ব পালন করেন এবং সেখানে তার মতানুসারী বেশ বড় একটি দল গঠন করতে সক্ষম হন।

তারপর মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাবীবের কাছে আবূ আবদুল্লাহ্ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন যাকারিয়া নামক জনৈক ব্যক্তি আসে। এই আবূ আবদুল্লাহ্ শীআ মতাবলম্বী ছিল এবং সর্বদা আলাভীদের পক্ষাবলম্বন করত। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাবীব তাকে একজন যোগ্য লোক হিসাবে পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে বলেন– তুমি প্রথম ইয়ামানে গিয়ে রুস্তম ইব্‌ন হাসানের সংস্পর্শে কিছু দিন থেকে তার কাছ থেকে দাওয়াত ও প্রচারের কায়দা-কানূন রপ্ত কর, তারপর সেখান থেকে বার্বার এলাকায় নিজের কাজ শুরু কর। সেখানে ক্ষেত্র তৈরি আছে, তুমি বীজ বপন করতে শুরু কর, অবশ্যই সফলকাম হবে। আবূ আবদুল্লাহ্‌কে মুহাম্মাদ হাবীব এও বলে দিয়েছিলেন, আমার পুত্র উবায়দুল্লাহ্ হচ্ছে ইমাম মাহ্‌দী এবং তোমাকে তারই 'দাঈ' (প্রচারক) করে পাঠানো হচ্ছে। আবূ আবদুল্লাহ্ প্রথমে ইয়ামানে যায়। সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে রুস্তম ইব্‌ন হাসান ও অন্যান্য দাঈর কাছ থেকে দাওয়াত ও প্রচারের কৌশল রপ্ত করে। এরপর হজ্জ উপলক্ষে আগত কাতামার সরদার ও দলপতিদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং ওদের সাথেই কাতামায় চলে যায়। সেখানে পৌঁছে সে দাওয়াত ও প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং বাহ্যিকভাবে তার সংসার-বিমুখতাও জনসাধারণের অন্তরে নিজের একটি স্থান করে নেয়। আবূ আবদুল্লাহ্ ২৮৮ হিজরীর ১৫ই রবিউল আউয়াল (৯০১ খ্রি ১২ মার্চ) কাতামাহ্ শহরে উপনীত হয় এবং অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে মানুষের অন্তরে ইমাম মাহ্‌দীর আগমন সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মাবার প্রয়াস চালায়। যেহেতু আবূ আবদুল্লাহ্‌র পূর্বেই সে দেশে বেশ কিছু সংখ্যক আলাভী প্রচারক ইমাম মাহ্‌দীর আগমন সম্পর্কে প্রচারের কাজ চালিয়ে ছিলেন, তাই আবূ আবদুল্লাহ্‌কে এ ক্ষেত্রে খুব একটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। কাতামাহ্‌বাসীরা 'ফাজ্জুল আখইয়ার' নামক স্থানে আবূ আবদুল্লাহ্‌র জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করে দেয়। সে সেখানে অবস্থান করে ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে তালীম দিতে থাকে। সে কাতামাহ্‌বাসীদেরকে বলে– ইমাম মাহ্‌দী যে স্থানে এসে অবস্থান করবেন সে স্থানের নাম 'কিত্‌মান' ধাতু থেকে নির্গত। অতএব আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস এই যে, কাতামাহ্ই হবে সেই স্থান। ইমাম মাহ্‌দীর অনুসারী ও সাহায্যকারীরা হবে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। অতএব তোমাদের উচিত তার অপেক্ষায় থাকা এবং তার সাহায্য-সহযোগিতার জন্য নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখা। আফ্রিকার সুলতান ইবরাহীম ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আগলাব যখন আবূ আবদুল্লাহ্‌র আগমন এবং তার এ ধরনের তালীম দেওয়ার সংবাদ পান তখন তিনি তার কাছে কড়া নির্দেশ পাঠান ঃ তুমি তোমার এই ভ্রষ্টতাপূর্ণ তালীম বন্ধ কর, অন্যথায় তোমাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। এটা ছিল সেই সময় যখন সমগ্র কাতামাহ্‌বাসী এবং তাদের পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহ আবূ আবদুল্লাহ্‌র একান্ত ভক্তে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে আবূ আবদুল্লাহ্ নিজেকে শক্তিশালী জ্ঞান করে সুলতানের দূতকে একটি শক্ত জবাব দিয়ে ফিরিয়ে দেয়। কাতামাহ্‌বাসীরা এই সংবাদ শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারে যে, আফ্রিকার শাসক এজন্য তাদেরকে শস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না। অতএব তারা একটি পরামর্শ সভা ডেকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, হয় আবদুল্লাহ্‌কে তারা কাতামাহ্ থেকে বের করে দেবে নয়ত আফ্রিকার শাসক ইবরাহীম ইব্‌ন আহমদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। যেহেতু কাতামাহ্‌র অনেক ধর্মীয় নেতাও আবূ

আবদুল্লাহ্‌র ভক্তে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, তাই তারা জনসাধারণের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং আবূ আবদুল্লাহ্‌কে সাহায্য করার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানায়। এই সমস্ত লোকেরই প্রচেষ্টার ফলে ঐ এলাকারই হাসান ইব্‌ন হারূন গাস্‌সানী নামক জনৈক কর্মকর্তা আবূ আবদুল্লাহ্‌কে আশ্রয় দিয়ে তাযরূত শহরে নিয়ে যান। এদিকে কাতামাহ্‌বাসীরাও আবূ আবদুল্লাহ্‌কে সাহায্য-সহায়তার আশ্বাস দেয়। ফলে আবূ আবদুল্লাহ্‌র ক্ষমতা পূর্বের চাইতে অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং পরিস্থিতি যুদ্ধ পর্যন্ত গিয়ে গড়ায়। মাহ্‌দী ইব্‌ন আবী কুমারাহ-এর এক ভাই আবূ আবদুল্লাহ্‌র ভক্ত ছিল। সে আবূ আবদুল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে তার ভাই মাহ্‌দীকে হত্যা করে। এভাবে আবূ আবদুল্লাহ্‌র প্রভাব-প্রতিপত্তি আরো বেড়ে যায় এবং হাসান ইব্‌ন হারূন তাকে তার মনিব বলে ভাবতে শুরু করে। ইবরাহীম ইব্‌ন আহমদের একজন অতি পরাক্রমশালী অধিনায়ক ফাতাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তার বাহিনী নিয়ে আবূ আবদুল্লাহ্‌র উপর হামলা চালান এবং পরাজিত হয়ে কায়রোয়ানের দিকে পালিয়ে যান। তারপর আবূ আবদুল্লাহ্ এখানে সেখানে আপন দাঈদের পাঠাতে থাকেন এবং জনসাধারণকে বাধ্য হয়ে আবূ আবদুল্লাহ্‌র শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়। ফলে পশ্চিমাঞ্চলের একটি ভূ-খণ্ডের উপর অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আবূ আবদুল্লাহ্‌র হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত ঘটনা শুধু এক অথবা দেড় বছর সময়কালের মধ্যে সংঘটিত হয়।

২৮৯ হিজরীতে (৯০২ খ্রি) সুলতান ইবরাহীম আগলাবীর পুত্র আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইবরাহীম সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর পুত্র আবুল খাওলকে শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহ্‌র মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। (আগলাবী সাম্রাজ্য প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে)। আবুল খাওলের মুকাবিলায় আবূ আবদুল্লাহ্ প্রথম প্রথম পরাজিত হলেও ঘটনাচক্রে পরবর্তী সময়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার কারণে আবুল খাওল নিহত হন। ফলে আবূ আবদুল্লাহ্‌র হৃদয় থেকে আবুল খাওলের ভীতি আপনা আপনি দূর হয়ে যায়। আবূ আবদুল্লাহ্ কাতামাহ্‌র নিকটবর্তী আনকাজান নামক স্থানে দারুল হিজরত নামে একটি শহর নির্মাণ করেন। যখন যিয়াদাতুল্লাহ্ আগলাবী-এর বংশের সর্বশেষ শাসক সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন আবূ আবদুল্লাহ্‌র মনে বিভিন্ন শহর জয় করে তার সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে। তিনি প্রচার করতে শুরু করেন যে, অতি শীঘ্রই ইমাম মাহ্‌দী আবিভূর্ত হবেন। এই সাথে তিনি তার কিছু সংখ্যক অনুসারীকে হিম্‌স এলাকার সালমিয়ায় উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ হাবীবের কাছে প্রেরণ করেন। এটা ছিল সেই যুগ, যখন মুহাম্মাদ হাবীবের মৃত্যু হয়ে গেছে এবং এই মৃত্যু সংবাদ আবূ আবদুল্লাহ্‌র কাছেও পৌঁছে গেছে।

আবূ আবদুল্লাহ্‌র দূতেরা উবায়দুল্লাহ্‌র কাছে গিয়ে নিবেদন করলো ঃ পশ্চিমাঞ্চলে আপনার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অতএব আপনি সেখানে গমন করুন। এই নিবেদনের প্রেক্ষিতে উবায়দুল্লাহ্ ওরফে উবায়েদ আল-মাহ্‌দী সালমিয়ার ঐ সমস্ত লোকের সাথে রওয়ানা হয়ে যান। সঙ্গে তার পুত্র আবুল কাসিম এবং এক গোলামও রওয়ানা হয়। এরা সবাই নিজেদেরকে বাহ্যত একটি বণিক কাফেলায় রূপায়িত করে এবং সোজা রাস্তার পরিবর্তে বাঁকা রাস্তা ধরে লক্ষ্য স্থলের দিকে এগোতে থাকে। গুপ্তচরেরা আব্বাসীয় খলীফা মুকতাফীর কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছায় যে, অমুক ব্যক্তি সালমিয়া থেকে পশ্চিমাঞ্চলের

রাস্তা দিয়ে রওয়ানা হয়েছে। খলীফা মুকতাফী আবূ আবদুল্লাহ্‌র বিজয় অভিযান এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ হাবীবের এভাবে রওয়ানা হওয়ার খবর শুনে মিসরের গভর্নর ঈসা নুশতারীর কাছে এই মর্মে একটি নির্দেশ পাঠান ঃ অমুক আকার-আকৃতির এক ব্যক্তি মিসর হয়ে পশ্চিমাঞ্চলে যাবে। একে যেখানে পাও অবিলম্বে বন্দী কর। এই নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে গভর্নর ঈসা উবায়দুল্লাহ্‌র কাফেলাকে বন্দী করে ফেলেন। কিন্তু সাথে সাথে প্রতারিত হন এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যে, এই ব্যক্তি উবায়দুল্লাহ্ নয়। যা হোক তিনি তাকে মুক্ত করে দেন। উবায়দুল্লাহ্ ত্রিপোলী গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে কাতামায় আবূ আবদুল্লাহ্‌র কাছে তার আগমন সংবাদ পাঠান। কিন্তু তখনো উবায়দুল্লাহ্ এবং আবূ আবদুল্লাহ্‌র মধ্যে আফ্রিকার শাসক যিয়াদাতুল্লাহ্ আগলাবী প্রতিবন্ধকরূপে বিরাজ করছিলেন। যিয়াদাতুল্লাহ্‌র কাছে মিসর থেকে এই সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল যে, উবায়দুল্লাহ্ আবূ আবদুল্লাহ্‌র কাছে যাচেছন। অতএব তিনি এখানে সেখানে উবায়দুল্লাহকে বন্দী করার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ যে ব্যক্তির মাধ্যমে আবূ আবদুল্লাহ্‌র কাছে তার আগমন সংবাদ পাঠিয়েছিলেন তিনি ছিলেন আবূ আবদুল্লাহ্‌রই ভাই আবুল আব্বাস। আবূ আবদুল্লাহ্ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সঙ্গী-সাথীসহ উবায়দুল্লাহ্‌কে নিয়ে আসার জন্য আবুল আব্বাসকেই প্রেরণ করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে আবুল আব্বাস পথিমধ্যে কায়রোয়ানে বন্দী হন। যিয়াদাতুল্লাহ্ তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেন। উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীর কাছে যখন আবুল আব্বাসের কায়রোয়ানে গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কাস্তিলায় চলে যান। কিন্তু সেখানে অবস্থানও নিরাপদ মনে না করায় সিজিলমাসা নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। সিজিলমাসার শাসনকর্তা ছিলেন যিয়াদাতুল্লাহ্ আগলাবীর ভৃত্য আল ইয়াসা ইব্‌ন মাদার। প্রথমত তিনি উবায়দুল্লাহ্‌কে একজন নবাগত বণিক মনে করে তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন যিয়াদাতুল্লাহ্‌র নির্দেশ পৌঁছে তখন তিনি উবায়দুল্লাহ্‌কে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করেন। যাহোক, আবুল আব্বাস কায়রোয়ানের জেলখানায় এবং উবায়দুল্লাহ্ মাহদী সিজিলমাসার জেলখানায় তিন-চার বছর পর্যন্ত অশেষ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেন। অবশ্য এই সময়কালে আবূ আবদুল্লাহ্ তার বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। এমনকি তিনি ২৯৬ হিজরী সনের প্রথম দিকে (৯০৮ খ্রি) দু'লাখ সৈন্য সংগ্রহ করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং ২৯৬ হিজরীর রজব (৯০৯ খ্রি এপ্রিল) মাসে কায়রোয়ান শহর দখল করে তার ভাই আবুল আব্বাসকে জেলখানা থেকে মুক্ত করেন এবং গোপনীয়ভাবে তার এই সমস্ত বিজয়-সংবাদ উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীর কাছে সিজিলমাসার বন্দীশালায় পৌঁছিয়ে দেন। আবূ আবদুল্লাহ্‌র সেনাবাহিনীতে কাতামাহ্‌র দু'জন অধিনায়ক ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের একজন হচ্ছেন আরূবা ইব্‌ন ইউসুফ এবং অপরজন হচ্ছেন হাসান ইব্‌ন আবী খাবীর। আবূ আবদুল্লাহ্ কায়রোয়ান দখল করার পর সেখানকার ঘর-বাড়ি ও দালান-কোঠা কাতামাহ্‌বাসীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। শহরটি বিজিত হওয়ার পর জামে মসজিদের খতীব আবদুল্লাহ্‌কে জিজ্ঞেস করেন, খুতবায় কার নাম নেব? তিনি উত্তরে বলেন, আপাতত কারো নামই নিবেন না। তারপর তিনি তার ভাই আবুল

আব্বাসকে কায়রোয়ানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে নিজে সিজিলমাসার দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে যে সমস্ত গোত্রের সাথে তার সাক্ষাৎ হয় তারা সকলেই আনন্দে তার আনুগত্য স্বীকার করে। অবশ্য কেউ কেউ তার রাস্তা থেকে সরে যায়। সিজিলমাসার নিকটবর্তী হওয়ার পর আবূ আবদুল্লাহ্ সেখানকার শাসনকর্তা আল-ইয়াসা ইব্ন আদরারের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। এতে তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আপোসচুক্তির আহবান জানান। এই অনুনয়-বিনয়ের কারণ হলো, উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী তখনো আল-ইয়াসার কাছে বন্দী ছিলেন এবং আশংকা ছিল রূঢ় আচরণ করলে হয়ত তিনি উবায়দুল্লাহ্কে হত্যা করে ফেলবেন। আবূ আবদুল্লাহ্র দূত চিঠি নিয়ে যখন আল-ইয়াসা ইব্ন মাদরারের কাছে পৌঁছেন তখন তিনি সে দূতকে হত্যা করে আবূ আবদুল্লাহ্র পত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন এবং সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করে আবূ আবদুল্লাহ্র মুকাবিলায় বহির্গত হন। দুই পক্ষের মধ্যে মুখোমুখি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং আল-ইয়াসার বাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। আবদুল্লাহ্ ত্বরিত গতিতে শহরে প্রবেশ করেন এবং সর্বপ্রথম জেলখানায় গিয়ে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী এবং তার পুত্র আবুল কাসিমকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে ঘোড়ার পিঠে বসান। বাহিনীর সকল অধিনায়কই তার সাথে ছিলেন। আবূ আবদুল্লাহ্ উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি তখন কাঁদছিলেন এবং বলছিলেন, 'হাযা মাওলাকুম' 'হাযা মাওলাকুম' (ইনিই তোমাদের ইমাম, ইনিই তোমাদের নেতা)। এভাবে তিনি উবায়দুল্লাহ্কে আপন তাঁবুতে নিয়ে এসে সিংহাসনে বসান। প্রথমে নিজে তার হাতে বায়আত করেন। তারপর অন্যদেরকেও বায়আত করতে বলেন। এই মুহূর্তেই আল-ইয়াসা ইব্ন মাদরারকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় সেখানে হাযির করা হয়। আবূ আবদুল্লাহ্ তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সে নির্দেশ কার্যকর করা হয়।

উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী

আবূ আবদুল্লাহ্ এবং উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী চল্লিশ দিন সিজিলমাসায় অবস্থান করার পর পশ্চিম দিকে রওয়ানা হন। তারা ২৯৭ হিজরী সনের রবিউস সানী (৯১০ খ্রি জানুয়ারী) মাসে রূকাদাহ্ এবং কায়রোয়ানে গিয়ে পৌঁছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ এ যাবত যে সমস্ত ধন-সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন তা আবদুল্লাহ্র খিদমতে পেশ করেন। সেখানে যথারীতি উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর জন্য বায়আত গ্রহণ করা হয়। এখন থেকে খুতবাসমূহে উবায়দুল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হতে থাকে এবং সমগ্র বার্বার অঞ্চলে মুবাল্লিগ ও প্রতিনিধি পাঠানো হয়। প্রদেশসমূহেও শাসনকর্তা ও রাজকীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। কাতামাহ্বাসীরা প্রথম থেকেই আবূ আবদুল্লাহকে সাহায্য করেছিল। তাই সেনাবাহিনীর পদমর্যাদায় ও দেশ ক্ষেত্রে তারা ছিল অগ্রণী। আবূ আবদুল্লাহ্ এবং তার ভাই আবুল আব্বাস ছিলেন সাম্রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী। আর প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাদের প্রাপ্যও। কেননা আবূ আবদুল্লাহ্রই বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার কারণে এই বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তিনিই তো আগলাবী বংশকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেছিলেন এবং উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীকে ডেকে এনে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন।

উবায়দুল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করার পর নিজেকে একজন প্রভাবশালী শাসনকর্তা হিসাবেই দেখতে পান। এতদসত্ত্বেও তিনি আবদুল্লাহ্ এবং তার ভাই আবুল আব্বাসের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করতে শুরু করেন। আবূ আবদুল্লাহ্ যখন লক্ষ্য করেন যে, তারই আশ্রিত ব্যক্তি তাকে ঠেংগাতে চাচ্ছে তখন তিনি সাবধান হয়ে যান। কাতামাহ্বাসীরা ছিল আবূ আবদুল্লাহ্র বিশেষ ভক্ত। আবূ আবদুল্লাহ্ই তাদেরকে নিষ্পাপ ইমামের খোঁজ দিয়েছিলেন। অন্য কথায় আবূ আবদুল্লাহ্রই কথায় কাতামাহ্বাসীরা উবায়দুল্লাহকে মাহ্দী ও ইমাম মাসূম (নিষ্পাপ) হিসাবে মেনে নিয়েছিল। এবার আবূ আবদুল্লাহ্ গোপনীয়ভাবে কাতামাহ্বাসীদের বোঝাতে শুরু করলেন যে, ইমাম মাসূমকে চিনতে গিয়ে আমি ধোঁকায় পতিত হয়েছি। প্রকৃত পক্ষে এই ব্যক্তি (উবায়দুল্লাহ্) ইমাম মাসূম নয়, বরং একজন লুণ্ঠনকারী ও অবৈধ মাল ভক্ষণকারী । প্রকৃত ইমাম মাসূম আরো পরে আসবেন। কাতামাহ্বাসীরা এসব কথা বিশ্বাস করে আবূ আবদুল্লাহ্র পক্ষে চলে যায়। উবায়দুল্লাহ্ যখন এ বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি ষড়যন্ত্রকারীদেরকে হত্যা করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত কাতামাহ্বাসী এবং আবূ আবদুল্লাহ্র পরামর্শে কাতামাহ্র একজন অতি পুণ্যবান ব্যক্তিকে যিনি তার ধর্মপরায়ণতা ও সংসার বিমুখতার কারণে সকলের কাছে 'শায়খুল-মাশায়িখ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন— উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর কাছে পাঠানো হয়। মাহ্দীর খিদমতে হাযির হয়ে 'শায়খুল-মাশায়িখ' নিবেদন করেন— আপনি ইমাম মাসূম কিনা সে ব্যাপারে আমরা সন্দিহান হয়ে পড়েছি। অতএব আমরা চাই যে, আপনি আমাদেরকে নিজের ইমামতের কোন চিহ্ন দেখান। এ কথা শুনে উবায়দুল্লাহ্ পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে, এবার নির্ঘাত ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। তিনি তার গোলামের প্রতি একটি বিশেষ ইঙ্গিত করেন এবং সে সাথে সাথে তরবারির এক কোপে শায়খুল মাশায়িখের মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কাতামাহ্বাসীরা উবায়দুল্লাহকে হত্যা করার দৃঢ়-সংকল্প গ্রহণ করে।

আবূ আবদুল্লাহ্কে হত্যা

উবায়দুল্লাহ্ অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করতে পেরে কাতামাহ্র সবচেয়ে বড় নেতা আরূবা ইব্ন ইউসুফ ও তার ভাই হাবাসা ইব্ন ইউসুফকে তার নির্জন কক্ষে ডেকে পাঠান। তাদের সাথে অত্যন্ত মধুময় ও নিষ্ঠাপূর্ণ আলোচনা করেন। তারপর নির্দেশ দেন আবূ আবদুল্লাহ্ ও তার ভাইকে হত্যা করতে। সুতরাং তার নির্দেশ পালনার্থে দু'ভাই আবূ আবদুল্লাহ্র বাড়ির পাশে একটি স্থানে গোপনভাবে অবস্থান নেয়। আবূ আবদুল্লাহ্ যখন বের হয়ে আসে তখন আরূবা আক্রমণ করে। আবূ আবদুল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করে যে, তোমরা কার নির্দেশে এ কাজ করছ? সে উত্তর দেয় যে, তুমি যাকে আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছিলে, তিনিই তোমাদের হত্যার আদেশ দিয়েছেন, এ কথা বলে আবূ আবদুল্লাহ্কে অন্য কোন কথা বলার পূর্বেই হত্যা করে ফেলে। অনুরূপভাবে আবুল আব্বাসকে হত্যা করা হয়। ২৯৮ হিজরীর ১৫ই জমাদিউস সানিতে (৯১১ খ্রি মার্চ) এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

বিদ্রোহ

এই ঘটনার পর আবূ আবদুল্লাহ্‌র সমর্থকরা বিদ্রোহ ঘোষণার সংকল্প নেয়। উবায়দুল্লাহ্ তাদের মুকাবিলা করে সে বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু কিছুদিন পর কাতামাহ্‌বাসীরা পুনরায় উবায়দুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। উবায়দুল্লাহ্ শক্তিবলে পুনরায় তা দমন করেন। এবার দেশের আবহাওয়া নিজের প্রতিকূলে দেখে উবায়দুল্লাহ্ শীআ মাযহাবের দাওয়াত ও প্রচারের কাজ বন্ধ করে দেন। তিনি সকল 'দাঈ' ও প্রচারকের কাছে নির্দেশ পাঠান ঃ তোমরা শীআ মতবাদের প্রতি মানুষকে আর আহ্বান করবে না। কেননা অনুরূপ করলে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সমূহ আশংকা রয়েছে। তারপর উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দী আরূবাকে বানমায়া এবং হাবাসাকে বারকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং তার পুত্র আবুল কাসিম ওরফে আবুল কাসিম নায্‌যারকে নিজের 'অলীআহ্‌দ' বলে ঘোষণা করেন।

কিছুদিন পর কাতামাহ্‌বাসীদের মনে আর একটি নতুন চিন্তার উদয় হয়। তারা একটি যুবককে নিজেদের আমীর মনোনীত করে এবং তাকে 'মাহ্‌দী' আখ্যা দিয়ে উবায়দুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। তারা ঐ যুবককে 'নবী' বলেও ঘোষণা করে। উবায়দুল্লাহ্ তার পুত্র আবুল কাসিম নায্‌যারকে একটি বাহিনীসহ কাতামাহ্‌বাসীদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সে যুদ্ধে আবুল কাসিম কাতামাহ্‌বাসীদেরকে পরাজিত করে তাদের ঘরবাড়ি একেবারে তছনছ করে ফেলেন। 'মাহ্‌দী' ও 'নবী' বলে খ্যাত ঐ যুবককেও ধরে এনে হত্যা করা হয়। ৩০০ হিজরী সনে (৯১২-১৩ খ্রি) ত্রিপোলীবাসীরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উবায়দুল্লাহ্ আবুল কাসিমকে সেদিকে প্রেরণ করেন। দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ করে রাখার পর আবুল কাসিম ত্রিপোলী জয় করেন এবং ত্রিপোলীবাসীদের কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিন লক্ষ দীনার আদায় করেন।

৩০১ হিজরীতে (৯১৩-১৪ খ্রি) আবুল কাসিম কিছু যুদ্ধজাহাজ এবং একটি সুদক্ষ বাহিনী সংগ্রহ করে মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। ঐ অভিযানে হাবাসা ইব্‌ন ইউসুফও তার সাথে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আবুল কাসিম আলেকজান্দ্রিয়াও দখল করে নেন। বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফা মুকতাদিরের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি সবুক্তগীন এবং মুনিস খাদিমকে এক বাহিনীসহ আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর আবুল কাসিম ও হাবাসা বাধ্য হয়ে মিসর সীমান্ত ছেড়ে কায়রোয়ানের দিকে ফিরে আসেন। ৩০২ হিজরীতে (৯১৪-১৫ খ্রি) হাবাসা পুনরায় আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করেন। এবারও বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের পর মুনিস খাদিম হাবাসাকে তাড়িয়ে দেন। এবার হাবাসার সাত হাজার সৈন্য নিহত হয়, হাবাসা নিজে কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দী ঐ বছরই হাবাসাকে হত্যা করেন। হাবাসার ভাই আরূবা এবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহে কাতামাহ্‌বাসীরা আরূবার পক্ষাবলম্বন করে।

উবায়দুল্লাহ্ আরূবাকে শায়েস্তা করার জন্য তার খাদিম গালিবকে প্রেরণ করেন। গালিব এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আরূবার উপর হামলা চালায়। এতে আরূবা পরাজিত ও নিহত হন। আরূবার চাচাত ভাই ও তার সঙ্গী-সাথীদের একটি বিরাট দলকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এরপর সিসিলী দ্বীপে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সিসিলীবাসীরা তাদের শাসনকর্তা আলী ইবন আমরকে (যিনি হুসাইন ইব্ন খুযায়রের পর শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন) সিসিলী থেকে বের করে দেয়। তারপর আব্বাসীয় খলীফা মুকতাদিরের কাছে আবেদন জানায়– আমরা আপনারই আনুগত্য স্বীকার করছি। এই সংবাদ পেয়ে ৩০৪ হিজরীতে (৯১৬-১৭ খ্রি) উবায়দুল্লাহ্ একটি সামরিক নৌবহর দিয়ে হাসান ইব্ন খুযায়রকে সিসিলীবাসীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সিসিলীবাসীদের নেতা আহমদ ইব্ন কুহরাব হাসান ইব্ন খুযায়রকে পরাজিত করেন এবং তাকে ধরে নিয়ে হত্যা করেন। কিন্তু এরপরই সিসিলীবাসীদের অন্তরে এই মর্মে আশংকার সৃষ্টি হয় যে, এভাবে উবায়দুল্লাহ্র বিরোধিতা করলে আমাদের টিকে থাকাটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। এই দুশ্চিন্তারই ফলশ্রুতিতে তারা নিজেদের নেতা আহমদ ইব্ন কুহরাবকে বন্দী করে উবায়দুল্লাহ্র কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। উবায়দুল্লাহ্ আহমদ ইব্ন কুহরাবকে হত্যা করেন এবং আলী ইব্ন মূসা ইব্ন আহমদকে গভর্নর নিয়োগ করে সিসিলীতে পাঠিয়ে দেন।

মাহ্দীয়া নগরী নির্মাণ

উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী যেহেতু ইসমাঈলী শীআ ছিলেন এবং নিজেকে ইমাম মাহ্দী বলে দাবি করেছিলেন তাই সব সময়ই তার আশংকা হতো, না জানি লোকেরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। কেননা আফ্রিকা ও কায়রোয়ানের সমগ্র লোক তার সমমতাবলম্বী ছিল না। তাই তিনি কোন একটি সুবিধাজনক স্থানে একটি শহর নির্মাণ করে সেটাকে নিজের রাজধানী করতে চাচ্ছিলেন। আর এই প্রেক্ষিতে তিনি ৩০৩ হিজরীতে (৯১৫-১৬ খ্রি) উপকূলীয় এক দ্বীপে একটি পৃথক শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তার নাম রাখেন মাহদীয়া। তিনি মাহ্দীয়া শহরের নগর প্রাচীর অত্যন্ত মজবুত করে নির্মাণ করেন এবং সদর দরজাসমূহে লোহার গ্রীল লাগান। ৩০৬ হিজরীতে (৯১৮-১৯ খ্রি) ঐ শহরের নির্মাণ কাজ শেষ হলে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী তৃপ্তির হাসি হেসে বলেন, বনী ফাতিমার ব্যাপারে আমি এখন নিরুদ্বিগ্ন। কেননা এখন তারা শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। ঐ বছরই উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী একটি জাহাজ তৈরির কারখানা স্থাপন করেন এবং প্রথম বছরই নয় শ' জাহাজ তৈরি করে একটি বিরাট সামরিক নৌবহর গড়ে তোলেন। ৩০৭ হিজরীতে (৯১৯-২০ খ্রি) তিনি তার পুত্র আবুল কাসিমকে আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। আবুল কাসিম সেখানে পৌঁছেই আলেকজান্দ্রিয়া ও নীলনদের বদ্বীপ এলাকা দখল করে নিতে সক্ষম হন। এই সংবাদ যখন বাগদাদে গিয়ে পৌঁছে তখন আব্বাসীয় খলীফা মুকতাদির পুনরায় মুনিস খাদিমকে এক বাহিনী দিয়ে মিসর অভিমুখে প্রেরণ করেন। বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের পর মুনিসের হাতে আবুল কাসিম পরাজিত হন। আবুল কাসিম মিসরে

যুদ্ধরত ছিলেন এমন অবস্থায় উবায়দুল্লাহ্ তার সাহায্যের জন্য আশিটি জাহাজ সম্বলিত একটি নৌবহর মাহ্দীয়া থেকে প্রেরণ করেন। ঐ নৌবহরের অধিনায়ক ছিলেন সুলায়মান খাদিম এবং ইয়াকুব কাত্তামী। কিন্তু নৌবহরটি সেখানে পৌঁছার আগেই আবুল কাসিম পরাজিত হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। কিন্তু নৌবহরটি তা জানতে পারেনি। তাই আবুল কাসিম একদিকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন এবং অন্যদিকে সাহায্যকারী নৌবহরটি সেদিকে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মুনিসের নৌবহরের সাথে এই নৌবহরের সংঘর্ষ হয়। মুনিসের নৌবহরে ছিল মাত্র ২৫টি জাহাজ। এতদসত্ত্বেও উবায়দী নৌবহর পরাজিত হয় এবং সুলায়মান ও ইয়াকুব উভয়েই বন্দী হন। মুনিসের সৈন্যরা আগুন লাগিয়ে সমগ্র উবায়দী নৌবহর পুড়িয়ে দেয় এবং তাতে আরোহী সকল সৈন্যকে হত্যা করে।

পরবর্তী বছর অর্থাৎ ৩০৮ হিজরীতে (৯২০-২১ খ্রি) উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী মাযালা ইব্ন হাবূসকে মরক্কোর উপর হামলা পরিচালনার জন্য পশ্চিম দিকে প্রেরণ করেন। সেখানে মাযালা ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইদরীস ইব্ন আমরের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত ইয়াহ্ইয়া উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর আনুগত্য স্বীকার করেন এবং উবায়দুল্লাহ্ মূসা ইব্ন আবিল আফিয়া মাকনাসীকে মরক্কোর বিজিত প্রদেশগুলোর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ৩০৯ হিজরী (৯২১-২২ খ্রি) সনে মরক্কোর অন্য প্রদেশগুলোকেও উবায়দী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। ফাস-এর শাসন ক্ষমতা ছিল ইয়াহইয়া-এর হাতে। তবে তিনি করদানে স্বীকৃত হয়ে উবায়দুল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ঐ বছরই মূসা ইব্ন আবিল আফিয়া ইয়াহইয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং উবায়দুল্লাহ্র নির্দেশে ইয়াহ্ইয়াকে পদচ্যুত করে দেশের ঐ অঞ্চলটিও উবায়দী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এভাবে যখন ইদরীসী সাম্রাজ্যের নাম-নিশানা মুছে গেল তখন ইদরীসী বংশের লোকেরা রীফ ও গামারা অঞ্চলে গিয়ে সেখানে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। বনূ হামূদ বংশ ছিল এদেরই একটি শাখা। কর্ডোভায় উমাইয়া হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই বনূ হামূদরাই সেখানকার কাযী ও শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন– এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মাযালা মরক্কো বিজয় সমাপ্ত করে সিজিলমাসা আক্রমণ করেন এবং সেখানে মুদরার মাকনাসীর পরিবারকে যারা সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন, হত্যা করে সিজিলমাসার শাসন ক্ষমতা তার চাচাত ভাইয়ের হাতে অর্পণ করেন। মাযালা ছিলেন একজন প্রখ্যাত সেনাপতি। মরক্কোয় উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর হুকুমত প্রতিষ্ঠায় তিনিই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারই যুদ্ধাভিযান এবং হত্যা ও বাড়াবাড়ির কারণে বার্বারদের অন্যতম গোত্র যানাতাহ্ বিগড়ে বসে। ফলে যানাতাহ্ ও মাযালার মধ্যে অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তার নিহত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র মরক্কো রাজ্যে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং সমগ্র দেশটি উবায়দীদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

উবায়দুল্লাহ্ ২১৫ হিজরীতে (৮৩০ খ্রি) কাত্তামা বাহিনীর সাথে তার পুত্র আবুল কাসিমকে মরক্কো অভিমুখে প্রেরণ করেন। যানাতাহ্ গোত্রের নেতা মুহাম্মাদ ইব্ন খাযার আবুল কাসিমকে এগিয়ে আসতে দেখে তার বাহিনীসহ দক্ষিণ দিকের মরু অঞ্চলে পালিয়ে

যান। আবুল কাসিম শহরের পর শহর দখল করে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং হাসান ইব্ন আবিল আইশকে জারাদহে শহরে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। হাসান ইদরীসী বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। এই অবরোধ বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। ফলে এই শহর জয় করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে আবুল কাসিমকে সেখান থেকে ফিরে যেতে হয়। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি মাসীলা শহরের শাসনকর্তা বনূ কামলানকে বন্দী করে কায়রোয়ানের দিকে দেশান্তরিত করেন এবং মাসীলা শহরটি পুনঃনির্মাণ করে তার নাম দেন মুহাম্মাদিয়া। তিনি সেখানকার শাসনভার আলী ইব্ন হামদূনের হাতে ন্যস্ত করেন। যার শহরের শাসন ক্ষমতা তারই হাতে অর্পণ করা হয়। আর মরক্কোর সামগ্রিক শাসনক্ষমতা অর্পণ করা হয় মূসা ইব্ন আবিল আফিয়ার হাতে। কিন্তু এর কিছুদিন পর মূসা ইব্ন আবিল আফিয়া উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেকে স্পেনের উমাইয়া সাম্রাজ্যের অনুগত বলে ঘোষণা করেন। ফলে সমগ্র মরক্কোয় জুমুআর খুতবায় স্পেনের খলীফার নাম পঠিত হতে থাকে।

এই সংবাদ পেয়ে উবায়দুল্লাহ্ আহমদ মাকনাসীকে এক বিরাট বাহিনীসহ মরক্কো অভিমুখে প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে বেশ অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত মূসা ইব্ন আবিল আফিয়া মরক্কো থেকে স্পেনের দিকে পালিয়ে যান এবং আহমদ ইব্ন বাসলীন মাকনাসী মরক্কোকে পদানত ও পর্যুদস্ত করে মাহ্দীয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মৃত্যু

৩২২ হিজরীর রবিউল আউয়াল (৯৩৪ খ্রি মার্চ) মাসে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর সাম্রাজ্য পরিচালনার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার স্থলে তার পুত্র আবুল কাসিম মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'কাসিম বিআমরিল্লাহ্' উপাধি গ্রহণ করেন। এই আবুল কাসিম বিআমরিল্লাহ্ আবুল কাসিম নায্যার নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ।

আবুল কাসিম নায্যার

আবুল কাসিম সিংহাসনে আরোহণ করে, ইতিমধ্যে উবায়দুল্লাহ্র মৃত্যু সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তা দমন করেন। তারপর মরক্কোর প্রতি মনোনিবেশ করেন। মূসা ইব্ন আফিয়া পুনরায় মরক্কো দখল করে নিয়েছিলেন। ৩২৪ হিজরীতে (৯৩৬ খ্রি) ফাস্ ব্যতীত সমগ্র মরক্কো রাজ্য আবুল কাসিমের দখলে চলে আসে। তারপর আবুল কাসিম রোম সাগরের উপকূলীয় দেশসমূহ পদানত করার জন্য ইব্ন ইসহাক নামীয় একজন অধিনায়ককে একটি বিরাট নৌবাহিনীসহ প্রেরণ করেন। ইব্ন ইসহাক উপকূলে অবতরণ করে জিনওয়া পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল পর্যুদস্ত করে শেষ পর্যন্ত জিনওয়া দখল করে নেন। তারপর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে মার্দিনিয়া জয় করেন। তিনি সেখান থেকে সিরিয়া উপকূলের দিকে রওয়ানা হন এবং উপকূলবর্তী সমগ্র এলাকার অধিবাসীদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে করতে সম্মুখ দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। সিরিয়া উপকূলে যে কয়টি জাহাজ পাওয়া গিয়েছিল তিনি সেগুলোকে পুড়িয়ে দেন। তারপর ইব্ন ইসহাক যীরান নামীয় আপন এক ভৃত্যকে এক বাহিনী দিয়ে মিসর উপকূলে প্রেরণ করেন। যীরান আলেকজান্দ্রিয়া জয়

করেন। তারপর মিসর থেকে আখশীদের বাহিনী আসে। তারা যীরানের বাহিনীকে পশ্চিমদিকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। এই সমস্ত ঘটনার পর আবুল কাসিম আবূ ইয়াযীদ-সৃষ্ট দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছাড়া অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করার অবকাশ পান নি।

আবূ ইয়াযীদের সাথে সংঘর্ষ

আবূ ইয়াযীদ মুখাল্লাদ ইব্‌ন কীরাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই যে, কাসতিলা শহরের অধিবাসী কীরাদ নামক জনৈক ব্যক্তি বাণিজ্য ব্যাপদেশে প্রায়ই সুদান অঞ্চলে যাতায়াত করতেন। সেখানেই তার পুত্র আবূ ইয়াযীদের জন্ম হয়। আবূ ইয়াযীদ সুদানেই প্রতিপালিত হন এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। সুদানবাসীরা সাধারণত শীআ বিরোধী এবং খারিজী সমর্থক ছিল। আবূ ইয়াযীদও তাদের ঐ চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন। তিনি তাহারাত নামক স্থানে আসেন এবং শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন। এটা হচ্ছে সেই যুগ যখন শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহ্ বার্বার অঞ্চলে এসে তার আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন। আবূ ইয়াযীদ জনসাধারণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে এবং তাদের মধ্যে তার আকীদা-বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হন। তিনি শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহর ক্রমবর্ধমান সাফল্য নীরবে অবলোকন করছিলেন এবং তার অনুসারীদের নীরব একটি দল গঠন করে সেটাকে মজবুত ও শক্তিশালী করে নিচ্ছিলেন। আবূ আবদুল্লাহ্ ও উবায়দুল্লাহ্র কাছে আবূ ইয়াযীদের কথা অবিদিত ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন এই শিক্ষকটির বিরোধপূর্ণ ধ্যান-ধারণা প্রতিরোধ করার প্রতি মনোনিবেশ করার মত অবকাশ তাদের ছিল না। যখন উবায়দুল্লাহ্ মাহদীর মৃত্যু হয় এবং দেশের মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে তখন আবূ ইয়াযীদ তার ধ্যান-ধারণার প্রচার এবং আবুল কাসিমের দখল থেকে একটির পর একটি শহর মুক্ত হয়ে তার অধীনে যেতে থাকে। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় প্রতিরোধের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং নিজেকে 'শায়খুল মু'মিনীন' উপাধিতে ভূষিত করেন। লোকেরা দলে দলে এসে তার মুরীদ হতে থাকে এবং তিনি এই মুরীদদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন। বাগায়া নগরীর শাসনকর্তা যখন আবূ ইয়াযীদের এই রণপ্রস্তুতির অবস্থা জানতে পারেন তখন তার উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। কিন্তু আবূ ইয়াযীদ বাগায়ার শাসনকর্তাকে পরাজিত করে বাগায়া অবরোধ করে ফেলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই অবরোধ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত যখন আবূ ইয়াযীদ বাগায়া জয় করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন তখন সেখান থেকে ফিরে আসেন। এবার বার্বার গোত্রের লোকেরাও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং আবূ ইয়াযীদ জুমুআর খুতবায় স্পেনের খলীফা নাসিরের নাম পাঠ করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত যানাতার গোত্রসমূহ তার আনুগত্য স্বীকার করে। মোটকথা, দিনের পর দিন আবূ ইয়াযীদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আবুল কাসিমের দখল থেকে একটির পর একটি শহর মুক্ত হয়ে তার অধীনে যেতে থাকে। আবুল কাসিম অনেক বড় বড় দলপতি এবং অধিনায়ককে আবূ ইয়াযীদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা সকলেই আবূ ইয়াযীদের কাছে পরাস্ত হন। শেষ পর্যন্ত ৩৩৩ হিজরীর সফর (৯৪৪ খ্রি সেপ্টেম্বর/অক্টোবর) মাসে আবূ ইয়াযীদের বাহিনী কায়রোয়ান দখল করে নেয় এবং আবুল কাসিম মাহদীয়ায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এবার আবূ ইয়াযীদ সমগ্র আফ্রিকিয়া দেশে তার

সেনাবাহিনী ছড়িয়ে দেন এবং সর্বত্র হত্যা ও লুটপাট শুরু হয়। আবুল কাসিমের কোন কোন গভর্নরের দখলে তখন পর্যন্ত যে সমস্ত শহর বা এলাকা ছিল আবুল কাসিম তাদের কাছে সাহায্যের জন্য লেখেন। কাতামাহ্‌বাসীরাও আবুল কাসিমকে সাহায্য করার সংকল্প নেয়। কিন্তু ৩৩৩ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল (৯৪৫ খ্রি জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী) মাসে আবূ ইয়াযীদ কাতামাহ্‌বাসীদেরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। আবুল কাসিমের পক্ষ নিয়ে আরো কয়েকটি বাহিনী আবূ ইয়াযীদের মুকাবিলায় আসে। কিন্তু তাদের সকলকেই পরাজয়বরণ করতে হয়। আবুল কাসিম মাহ্‌দীয়াকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করে নিয়েছিলেন। প্রচুর রসদসামগ্রী সেখানে সংগৃহীত হয়েছিল। আবূ ইয়াযীদের বাহিনী আক্রমণ পরিচালনা করে মাহদীয়ার নগর প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কিন্তু মাহদীয়া জয় করতে পারেনি। অতএব ৩৪৪ হিজরীতে (৯৫৫-৫৬ খ্রি) আবূ ইয়াযীদ বাধ্য হয়ে কায়রোয়ানের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন আবুল কাসিমের বাহিনী মাহদীয়া থেকে বের হয়ে ইয়াযীদের বাহিনীর উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাতে শুরু করে।

মৃত্যু

৩৩৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল (৯৪৫ খ্রি নভেম্বর) মাসে আবূ ইয়াযীদের পুত্র মাহদীয়ার উপর আক্রমণ চালিয়ে তা অবরোধ করে ফেলেন। এই অবরোধ চলাকালনী সময়ে ৩৩৪ হিজরীর জমাদিউস সানী (৯৪৬ খ্রি ফেব্রুয়ারী) মাসে আবুল কাসিম মাহদীয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। এটা হচ্ছে সেই মুহূর্ত যখন ইয়াযীদ মূসা শহর অবরোধ করে রেখেছিলেন।

ইসমাঈল ইব্‌ন আবুল কাসিম

আপন পিতার মৃত্যুর পর ইসমাঈল ইব্‌ন আবুল কাসিম 'আল-মানসূর' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইসমাঈল, আইয়ুব ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদের অবরোধ ভেঙে ফেলেন এবং জাহাজযোগে একটি বাহিনী মূসার সাহায্যার্থে এবং আবূ ইয়াযীদের অবরোধ ভেঙে ফেলার জন্য প্রেরণ করেন। সে নৌবহর যাতে উপকূলে ভিড়তে না পারে, আবূ ইয়াযীদ সে চেষ্টাই করেন। কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ঐ সাহায্যকারী বাহিনী উপকূলে অবতরণ করে সুসাবাসীদের সাথে মিলিত হয় এবং একযোগে আবূ ইয়াযীদের উপর আক্রমণ চালায়। এতে আবূ ইয়াযীদ পরাজিত হন এবং তার সমগ্র সামরিক ঘাঁটি লুণ্ঠন করা হয়। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় কায়রোয়ানের দিকে আসেন। কায়রোয়ানবাসীরা তার এই পরাজয়ের সংবাদ শুনে তার শাসনকর্তাকে কায়রোয়ান থেকে বের করে দেয়। তারা আবূ ইয়াযীদকে শহরে প্রবেশ করতে দেয় নি। উপরন্তু তারা আবুল কাসিমের আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। আবূ ইয়াযীদ বাধ্য হয়ে সাবীহের দিকে চলে যান। এটা হচ্ছে ৩৩৪ হিজরীর শাওয়াল (৯৪৬ খ্রি জুন) মাসের ঘটনা। তারপর ইসমাঈল ইব্‌ন আবুল কাসিম কায়রোয়ানে আসেন এবং শহরবাসীকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। ৩৩৪ হিজরীর যিলকদ (৯৪৬ খ্রি জুলাই) মাসে আবূ ইয়াযীদ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে কায়রোয়ানের উপর হামলা পরিচালনা করেন। ইসমাঈল সে বাহিনীর মুকাবিলা করেন এবং বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের পর ৩৩৫ হিজরীর

মুহাররম (৯৪৬ খ্রি আগস্ট) মাসে ইসমাঈল পরাজিত হন। কিন্তু তিনি তার পরাজিত ও বিক্ষিপ্ত বাহিনীকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় একত্রিত ও সংগঠিত করে ৩৩৫ হিজরীর ১৫ই মুহাররম (৯৪৬ খ্রি ১৬ আগস্ট) এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আবূ ইয়াযীদকে পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের কারণে আবূ ইয়াযীদের যাবতীয় পরিকল্পনা ওলট-পালট হয়ে যায় এবং তিনি পরাজিত ও পর্যুদস্ত অবস্থায় বাগায়ার দিকে চলে যান। কিন্তু বাগায়াবাসীরা তাদের নগরীর দরজা বন্ধ করে দেয়। ফলে আবূ ইয়াযীদ সেখানে প্রবেশ করতে না পেরে শহর অবরোধ করেন।

এই সংবাদ শুনে ইসমাঈল ইব্ন আবুল কাসিম তার বাহিনী নিয়ে বাগায়া অভিমুখে রওয়ানা হন। এটা হচ্ছে ৩৩৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল (৯৪৬ খ্রি নভেম্বর) মাসের ঘটনা। আবূ ইয়াযীদ ইসমাঈলের আগমন-সংবাদ পেয়ে বাগায়ার অবরোধ তুলে নিয়ে অপর একটি দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু সেখানেও তিনি সফলকাম হতে পারেন নি। ইসমাঈল সেখানেও তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। মোটকথা, এভাবে আবূ ইয়াযীদ এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত কুতামা পাহাড়ের নিকটে আবূ ইয়াযীদ ও ইসমাঈলের মধ্যে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৩৩৫ হিজরীর ১০ই শাবানে (৯৪৭ খ্রি এপ্রিল) সংঘটিত এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আবূ ইয়াযীদ আহত হলেও প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তার দশ হাজার সঙ্গী এই যুদ্ধে অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হয়। তারপর আবূ ইয়াযীদ পুনরায় সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু অবস্থা তখন এই দাঁড়িয়েছিল যে, আবূ ইয়াযীদের কর্মকর্তা ও পক্ষাবলম্বী গোত্রসমূহ একের পর এক নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করে ইসমাঈল ইব্ন আবুল কাসিমের দলভুক্ত হতে শুরু করেছিল। ফলে আবূ ইয়াযীদের দখলাধীন সমগ্র অঞ্চল আপনা-আপনি ইসমাঈলের দখলে এসে যায়।

আবূ ইয়াযীদের বন্দী ও মৃত্যু

৩৩৬ হিজরীর মুহাররম (৯৪৭ খ্রি জুলাই/আগস্ট) মাসে সর্বশেষ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে আবূ ইয়াযীদ পরাজিত ও মারাত্মক আহত অবস্থায় বন্দী হন। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। ইসমাঈল তার দেহ থেকে চামড়া খুলে নিয়ে তাতে ভূষি ভরে রাখার নির্দেশ দেন। এই সমস্ত ঘটনার পর ইসমাঈল কায়রোয়ানের দিকে আসেন। কিন্তু তখনই তার কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, মাগরিব প্রদেশের শাসনকর্তা হামীদ ইব্ন বাসলীন উবায়দিয়া সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্পেনের উমাইয়া খলীফার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছেন। ইসমাঈল সঙ্গে সঙ্গে তার বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন এবং তাহারাত নামক স্থানে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে হামীদ পরাজিত হন। এই অবস্থায়ই এই মর্মে একটি সংবাদ আসে যে, ফযল ইব্ন আবূ ইয়াযীদ সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে বাগায়া অবরোধ করে ফেলেছেন। অতএব ইসমাঈল সেদিকে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু কোনরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই ফযলেরই জনৈক সঙ্গী তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইসমাঈলের খিদমতে পেশ করে। এটা হচ্ছে ৩৩৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল (৯৪৭ খ্রি অক্টোবর/নভেম্বর) মাসের ঘটনা। ইসমাঈল এবার কিছু দিনের জন্য স্বস্তি লাভ

করেন। তিনি ৩৩৯ হিজরীতে (৯৫০-৫১ খ্রি) খলীল ইব্‌ন ইসহাককে পদচ্যুত করে তার স্থলে হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবুল হুসাইনকে সিসিলী দ্বীপের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তারপর হুসাইন ইব্‌ন আলীর বংশধররা স্বাধীনভাবে সে দ্বীপ শাসন করতে থাকে।

ইসমাঈলের মৃত্যু

৩৪০ হিজরীতে (৯৫১-৫২ খ্রি) ইসমাঈল এক বিরাট নৌবহর তৈরি করেন এবং সিসিলীর শাসনকর্তা হুসাইন ইব্‌ন আলীকে লেখেন, তুমিও এই রাজকীয় নৌবহরের সাথে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাক। শেষ পর্যন্ত এই নৌবহরই ৩৪২ হিজরীতে (৯৫৩-৫৪ খ্রি) ইতালীর দক্ষিণাঞ্চল জয় করে প্রচুর মালে গনীমতসহ কায়রোয়ান ও মাহদীয়ায় ফিরে আসে। কিন্তু এর আগেই ৩৪১ হিজরীর রমযান (৯৫৩ খ্রি ফেব্রুয়ারী/মার্চ) মাসে ইসমাঈল মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুইয্য ইব্‌ন ইসমাঈল

ইসমাঈলের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুইয্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সিংহাসনে আরোহণের প্রথম বছরই মরক্কোর কোন কোন গোত্র তার বশ্যতা স্বীকার করে। ৩৪২ হিজরীতে (৯৫৩-৫৪ খ্রি) মুইয্য সিসিলীর গভর্নর হুসাইন ইব্‌ন আলীর কাছে নির্দেশ পাঠান ঃ তুমি তোমার নৌবহর নিয়ে স্পেনের উপকূলস্থ মারিয়া আক্রমণ কর। হুসাইন সে নির্দেশ পালন করেন এবং সেখান থেকে প্রচুর মালে গনীমত ও যুদ্ধবন্দী নিয়ে সিসিলীতে ফিরে আসেন। এর প্রত্যুত্তরে, স্পেনের খলীফা নাসির লিদীনিল্লাহ্ তার ভৃত্য গালিবকে এক সামরিক নৌবহর দিয়ে নির্দেশ দেন— তুমি আফ্রিকা উপকূল আক্রমণ কর। কিন্তু মুইয্যের বাহিনী এবং সামরিক নৌবহর প্রথম থেকেই এই আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ফলে গালিবকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। অবশ্য ৩৪৭ হিজরীতে (৯৫৮-৫৯ খ্রি) স্পেনীয় নৌবহর আফ্রিকা উপকূলে সফল হামলা চালায় এবং উপকূলবর্তী সমগ্র শহর ও জনবসতি একেবারে পর্যুদস্ত ও লণ্ডভণ্ড করে দেয়। তারপর অনেক যুদ্ধবন্দী ও মালে গনীমত নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করে।

তারপর মুইয্য তার সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত ও শাসনব্যবস্থা সুসংহত করে তার অধিকৃত এলাকার আয়তন বৃদ্ধি করেন। মুইয্যের অধিকৃত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে নিম্নলিখিত গভর্নরগণ নিয়োজিত ছিলেন ঃ

১. ইফকান	ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদ
২. আশীর	যায়রী ইব্‌ন মুনাদ সানহাজী
৩. মাসীলাহ্	জা'ফর ইব্‌ন আলী আন্দুলুসী
৪. বাগায়া	কায়সার সাকলী
৫. ফাস ও তাহারাত	আহমদ ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আবী সাহ্ল
৬. সিজিলমাসা	মুহাম্মদ ইব্‌ন দাসূল মীকানাসী

৩৪৭ হিজরীতে (৯৫৮-৫৯ খ্রি) মুইয্যের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে যে, ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদ স্পেনের উমাইয়া খলীফার সাথে যোগসাজশ করে উবায়দিয়া সালতানাতের

আনুগত্য অস্বীকার করে নিয়েছেন। তখন তিনি (মুইয্য) তার কাতিব জাওহার সাকলীকে ইয়ালার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন এবং মাসীলার গভর্নর জা'ফর ইব্‌ন আলী ও আশীরের গভর্নর যায়রী ইব্‌ন মুনাদকে তার সাথে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদও এই মুকাবিলার জন্য তৈরি ছিলেন। এই সাথে ফাস ও সিজিলমাসা প্রদেশদ্বয়ের গভর্নররাও স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শেষ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর ৩৪৮ হিজরীতে (৯৫৯-৬০ খ্রি) ইয়ালা পরাজিত ও বন্দী হন। ফাস ও সিজিলমাসা প্রদেশের উপরও মুইয্যের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারাত প্রদেশকে যায়রী ইব্‌ন মুনাদের শাসনাধীনে ন্যস্ত করা হয়। আহমদ ইব্‌ন বকর এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন দাসূল বন্দী হয়ে কায়রোয়ানে আসেন। ৩৪৯ হিজরীতে (৯৬০-৬১ খ্রি) মুইয্য তার খাদিম কায়সার এবং মুযাফ্‌ফরকে অবাধ্যতার কারণে হত্যা করেন।

ইতোপূর্বে আব্বাসীয় খলীফাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। স্পেন থেকে যারা দেশান্তরিত হয়েছিল তাদের একটি দল মিসর উপকূলে অবতরণ করে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে নিয়েছিল। তখন মিসরের গভর্নর ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির ওদেরকে ঘেরাও করে ফেলেন এবং এই শর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেন যে, তারা মিসর সীমান্তের বাইরে অন্য কোথাও চলে যাবে। তারপর ঐ দেশান্তরিত লোকেরা আলেকজান্দ্রিয়া ছেড়ে চলে যায় এবং কারিতাস (ক্রীট) দ্বীপ দখল করে আবূ হাফ্‌স বালূতীকে নিজেদের বাদশাহ বলে ঘোষণা করে। আবূ হাফ্‌সের বংশের লোকেরা ঐ দ্বীপ শাসন করছিল এমনি সময়ে ৩৫০ হিজরীতে (৯৬১ খ্রি) খ্রিস্টানরা সাতশ যুদ্ধ জাহাজের একটি বহর নিয়ে তাদের উপর হামলা চালায়। ৩৫৪ হিজরীতে (৯৬৫ খ্রি) কনসটান্টিনোপলের কায়সার এবং মুইয্যের নৌবহরের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে খ্রিস্টান সৈন্যদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং মুসলমানরা খ্রিস্টানদের বেশ কয়েকটি শহর দখল করে নেয়। শেষ পর্যন্ত তারা কনসটান্টিনোপলের কায়সারকে জিযিয়া এবং কর প্রদানেও বাধ্য করে। এর কিছুদিন পর মুইয্যের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, মিসরের শাসনকর্তা কাফূর আখশিদীর মৃত্যুর কারণে মিসরে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দিয়েছে এবং বাগদাদের খলীফা আদুদুদ্দৌলা এবং বখতিয়ার ইব্‌ন মুইযুদ্দৌলা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে মিসরের দিকে দৃষ্টি দিতে পারছেন না। এই সুযোগে মুইয্য মিসরে সৈন্য প্রেরণের সংকল্প নেন।

মিসর দখল

৩৫৫ হিজরীতে (৯৬৫-৬৬ খ্রি) মুইয্য তার মন্ত্রী জাওহারকে এক বিরাট সেনাবাহিনী দিয়ে মিসরের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। জাওহার পথিমধ্যে যত জায়গা পড়েছিল সেগুলোর শাসনব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করে ধীরে ধীরে মিসরের দিকে অগ্রসর হন। আখশিদী বাহিনী জাওহারের বাহিনীর সামনে টিকে থাকতে পারে নি। ফলে তিনি ৩৫৯ হিজরীর ১৫ই শাবান (৯৭০ খ্রি জুলাই) মিসরে প্রবেশ করে জামে মসজিদে মুইয্যের নামে খুতবা পাঠ করেন। ৩৫৯ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল (৯৭০ খ্রি এপ্রিল/মে) মাসে জাওহার 'জামি ইব্‌ন তুলূন'-এ গিয়ে নামায আদায় করেন এবং আযানের মধ্যে 'হাইয়া আলা খায়রিল আমল'

(পুণ্য কাজের দিকে আস) এ বাক্যটি বাড়াবার নির্দেশ দেন। এটাই ছিল মিসরে প্রথম আযান, যাতে উপরোক্ত বাক্যটি বাড়ানো হয়েছিল। জাওহার সমগ্র মিসর দেশ দখল করে এবং আখশিদী বংশের সদস্যদেরকে গ্রেফতার করে বিভিন্ন ধরনের তুহফা ও উপঢৌকনসহ তাদেরকে মুইয্যের দরবারে প্রেরণ করেন। মুইয্য আখশিদী বংশের সদস্যদেরকে মাহদীয়া জেলে বন্দী করে রাখেন। তারপর জাওহার মুইয্যকে মিসরে আগমনের আহবান জানান এবং তার অধিনায়ক জাফর ইব্‌ন ফালাহ্ কুত্তামীকে একটি দুর্বার বাহিনী দিয়ে ফিলিস্তীন ও সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করেন। যে সময়ে জাওহার সেনাবাহিনী নিয়ে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন ঠিক তখনি আবূ জা'ফর যানাতী নামক জনৈক ব্যক্তি মুইয্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু মুইয্য নিজেই অতি সহজে ঐ বিদ্রোহ দমন করেন। এবার মুইয্যের কাছে এই মর্মে জাওহারের একটি চিঠি পৌঁছে যে, সমগ্র মিসর উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অতএব, এখানে আপনার আসা একান্ত বাঞ্ছনীয়। মুইয্য অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে একটি দরবার আহবান করে প্রথমে পশ্চিমাঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এদিকে ৩৬০ হিজরীর মুহাররম (৯৭০ খ্রি নভেম্বর) মাসে জা'ফর ইব্‌ন ফালাহ্ কুত্তামী দামেশক দখল করে নিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে সে দেশ শাসন করছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে মুইয্য আরো বেশি সন্তুষ্ট হন। তিনি এবার কায়রোকে রাজধানী করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বুলুক্কীন ইব্‌ন যায়রী মুনাদকে আফ্রিকিয়া এবং পশ্চিমের দেশগুলোর ভাইসরয় নিযুক্ত করে কায়রোয় অবস্থানের নির্দেশ দেন। তিনি বুলুক্কীনকে 'আবুল ফুতূহ্' (বিজয়ীদের পিতা) উপাধি দান করেন এবং তার অধীনে সুযোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করে ৩৬১ হিজরীর শাওয়াল (৯৭২ খ্রি সেপ্টেম্বর) মাসের শেষদিকে রাজধানী মাহদীয়া থেকে বের হয়ে কায়রোর সন্নিকটে অবস্থান গ্রহণ করেন।

কায়রোয় রাজধানী স্থানান্তর

কিছুদিন সওয়ারী পরিবহনের মাধ্যমে সমগ্র ধন-ভাণ্ডার ও আসবাব-সামগ্রী কায়রোর সন্নিকটে নিয়ে আসা হয় এবং মুইয্য ঐ ধন-সম্পদ এবং তার লোক-লশ্‌কর নিয়ে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হন। বুলুক্কীন ইব্‌ন যায়রীও তাকে অনুসরণ করেন। এক-দুই মনযিল অগ্রসর হওয়ার পর মুইয্য বুলুক্কীনকে কায়রোর দিকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বারকাহ্ অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি ৩৬২ হিজরীর শাবান ((৯৭৩ খ্রি জুন) মাসে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছেন। শহরবাসীরা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে শহরের অভ্যন্তরে নিয়ে যায়। তারপর মুইয্য সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ৩৬৩ হিজরীর ৫ই রমযান (৯৭৪ খ্রি জুলাই) কায়রোয় প্রবেশ করেন। কায়রোয়ান থেকে রওয়ানা হওয়ার আনুমানিক এক বছর পর তিনি কায়রোয় এসে পৌঁছেন। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, জা'ফর ইব্‌ন ফালাহ্ কাত্তামী দামেশক জয় করে সেটাকে তার শাসনাধীনে নিয়ে এসেছিলেন। এর পূর্বে দামেশক বনী তাবাখের শাসনাধীনে ছিল। ওরা কারামতীয়দেরকে কর প্রদান করত। জা'ফর ইব্‌ন ফারাহ্ যখন দামেশক দখল করেন তখন তিনি কারামতীয়দেরকে কর প্রদান করতে অস্বীকার করেন। ফলে ওদের সম্রাট আসাম দামেশকের উপর হামলা চালান। কিন্তু জা'ফরের কাছে

তিনি পরাজিত হন। তারপর ৩৬১ হিজরীতে (৯৭১-৭২ খ্রি) কারামতীয়রা পুনরায় দামেশক আক্রমণ করে। এবার জা'ফর তাদের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। ফলে কারামতীয়রা দামেশক দখল করে নেয়। দামেশকের পর তারা রামলার উপর হামলা চালিয়ে তা দখল করে নেয় এবং মিসরের উপর হামলা পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। সফরকালীন অবস্থায়ই মুইয্য এই সমস্ত অবস্থার কথা জানতে পারেন। কায়রোয় পৌঁছে তিনি জানতে পারেন যে, কারামতীয়রা ইয়াফা অবরোধ করে রেখেছে এবং মিসর-সীমান্তে তার সেনাবাহিনী এসে জড়ো হয়েছে।

মিসরে কারামতীয়দের হামলা

মুইয্য কায়রো পৌঁছামাত্র কারমাতীয় সম্রাট আসামকে একটি পত্র লিখেন। আসাম তখন তার রাজধানী ইহসায় ছিলেন। মুইয্য তার পত্রে লিখেন– তোমরা প্রথমে আমাদেরই বাপ-দাদার মুনাদ (প্রচারক) রূপে দেশে ঘুরে বেড়াতে এবং আমাদের ভালবাস বলে দাবি করতে। এখন এটাই সঙ্গত যে, তোমরা আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নাও এবং আমাদের বিরোধিতা থেকে বিরত থাক। যাহোক, এ ধরনের আদেশ-উপদেশে ভরপুর একটি দীর্ঘপত্র পাঠানো হলো এবং ঐ পত্র যখন আসামের কাছে ইহ্সায় গিয়ে পৌঁছল তখন তিনি তার উত্তরে মুইয্যকে লিখেন ঃ

"তোমার চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। এতে কাজের কথা কম এবং অকাজের কথা বেশি। যাহোক, আমি তোমার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাচ্ছি। আমার সালাম রইল।"

আসাম মিসরের দিকে এই উত্তর পাঠিয়ে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন এবং স্বয়ং মিসর অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি মিসরে প্রবেশ করে 'আইনে শাম্স' নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে সকল কারামতীয় সৈন্য এসে একত্রিত হয়। আরবের গোত্রপতি হাসসান ইব্ন জাররাহ্ তায়ী 'তাই' গোত্রের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আসামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এবার আসাম ও হাসসান পরস্পর সলাপরামর্শ করে মিসরের বসতিসমূহ লুটপাট ও দখল করার জন্য তাদের বাহিনীকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেন। ফলে মিসরের সর্বত্র হত্যা, লুণ্ঠন ও রক্তারক্তি শুরু হয়। মুইয্য কারামতীয়দের বিপুল সংখ্যক সৈন্য দেখে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ফলে কারামতীয়রা অতি শীঘ্রই কায়রোর উপর হামলা চালায়। মুইয্য কারামতীয়দের এই অকল্পনীয় উন্নতি লক্ষ্য করে এই কৌশল অবলম্বন করেন যে, তিনি হাসসান ইব্ন জাররাহ্র সাথে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে কিছুটা মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেন এবং তাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন— আমি তোমাকে এক লক্ষ দীনার দিতে রাযি আছি, কিন্তু এই শর্তে যে, তুমি আসামকে একাকী ফেলে রেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোমার সেনাবাহিনী নিয়ে ফিরে যাবে। হাসসান মুইয্যের এই শর্ত মেনে নেন এবং পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী যখন মুইয্য তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন এবং কারামতীয়দের উপর হামলা চালান ঠিক তখনই হাসসান তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যান। হাসসান এবং তার বাহিনীকে এভাবে পলায়ন করতে দেখে আসাম এবং তার বাহিনী কিছুটা ভীতিগ্রস্ত হয়ে

পড়ে। এতদসত্ত্বেও তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুইয্যের মুকাবিলা করে, যদিও শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে হয়। মুইয্য সঙ্গে সঙ্গে তার সেনাপতি আবূ মুহাম্মাদকে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে কারামতীয়দের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দেন। আবূ মুহাম্মাদ তাদেরকে কোথাও বিশ্রামের সুযোগ দেন নি। ফলে তারা মিসর সীমান্ত থেকে বের হয়ে ইহসার দিকে চলে যেতে বাধ্য হয়।

দামেশ্‌ক অধিকার

এই বিজয় লাভের পর মুইয্য কারামতীয় বন্দীদেরকে হত্যা করে ফেলেন এবং জালিম ইব্‌ন মাওহুর আকিলীকে দামেশকের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। জালিম দামেশকে পৌঁছে কারামতীয় শাসনকর্তাকে বন্দী করে মিসরে পাঠিয়ে দেন এবং সেখানে তাকে জেলখানায় আটকে রাখা হয়। ৩৬৪ হিজরী (৯৭৪-৭৫ খ্রি) পর্যন্ত দামেশকে উবায়দী সাম্রাজ্যের পতাকা উড্ডীন থাকে। ঐ বছর হজ্জের মওসুমে মক্কা-মদীনার লোকেরা মুইয্যের হুকুমত মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং তার নামে খুতবাও পঠিত হয়। দামেশকবাসীরা উবায়দীদের হুকুমত মেনে নিতে পারে নি। তাই ৩৬৪ হিজরীর (৯৭৫ খ্রি শেষ) শেষ দিকে এবং ৩৬৫ সনের (৯৭৫ খ্রি প্রথম) প্রথম দিকে ইযযুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়াইয়া-এর অন্যতম খাদিম উফতোগীন দামেশক দখল করে মুইয্যের শাসনকর্তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। দামেশকবাসীরা উফতাগীনের আগমনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। মুইয্যের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি উফতোগীনকে লিখেন– তুমি দামেশক শাসন করতে থাক। আমি তোমার কাছে ইমারতের সনদ (শাসনকর্তার নিয়োগপত্র) পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি আমার নামে খুতবা পাঠ কর এবং বাগদাদের খলীফার সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রেখ না। উফতোগীন মুইয্যের এই কূটনীতি ব্যর্থ করে দেন এবং দামেশকে খুতবার মধ্যে বাগদাদের খলীফার নাম যথারীতি পাঠ করতে থাকেন। উপরন্তু তিনি দামেশক থেকে মুইয্যের হুকুমতের যাবতীয় চিহ্ন মুছে ফেলেন। মুইয্য এ সংবাদ শুনে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে স্বয়ং কায়রো থেকে দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হন।

মুইয্যের মৃত্যু

মুইয্য কায়রো থেকে রওয়ানা হয়ে বালবীসে পৌঁছার পরই ৩৬৫ হিজরীর ১৫ই রবিউল আউয়াল (৯৭৫ খ্রি ডিসেম্বর) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর ৬ মাস। তিনি মোট ২৩ বছর সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। মুইয্য ছিলেন উবায়দীদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি মিসর জয় করে কায়রোকে রাজধানীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি ৩১৯ হিজরীর ১১ই রমযান (৯৩১ খ্রি অক্টোবর) মাহদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তারপর তার পুত্র নায্‌যার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 'আযীযবিল্লাহ্' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত পিতার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখেন। শেষ পর্যন্ত ৩৬৫ হিজরীর ঈদুল আযহার দিনে (৯৭৬ খ্রি জুলাই) তার পিতার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আযীয ইব্‌ন উবায়দী

উফতোগীনের সৈন্য সমাবেশ

মুইয্যের মৃত্যু সংবাদ শুনে উফতোগীন মিসর সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটান এবং সায়দা অবরোধ করে ফেলেন। সায়দায় জালিম ইব্‌ন মাওহুব এবং অন্যান্য উবায়দী অধিনায়ক বিদ্যমান ছিলেন। তারা উফতোগীনের মুকাবিলা করেন, কিন্তু তার হাতে পরাজিত হন এবং পলায়ন করেন। উফতোগীন আরো অগ্রসর হয়ে আক্কা জয় করেন। তারপর তিনি তাবারিয়ার উপর চড়াও হন এবং তাও দখল করে নেন। তারপর তিনি দামেশকের দিকে ফিরে যান। আযীয ইব্‌ন মুইয্য তার মন্ত্রী ইয়াকূব ইব্‌ন মাকসের পরামর্শ অনুযায়ী জাওহার কাতিবকে এক বিরাট বাহিনী দিয়ে উফতোগীনের মুকাবিলা এবং দামেশক জয় করার জন্য প্রেরণ করেন। জাওহার ৩৬৫ হিজরীর যিলকদ (৯৭৬ খ্রি জুন) মাসে দামেশক অবরোধ করেন এবং উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। অবরোধের দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে অনন্যোপায় হয়ে আসাম কারামতীয় সম্রাটকে আদ্যোপান্ত ঘটনা লিখে জানান এবং তার কাছে বাহিনী নিয়ে দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি দামেশকের অবরোধ তুলে সেখান থেকে চলে যান। তখন উফতোগীন ও আসাম একজোট হয়ে জাওহারের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং রামলা নামক স্থানে তাকে ঘিরে ফেলেন। জাওহার রামলাকে সুদৃঢ় দেখতে পেয়ে আসকালান চলে যান। এবার উফতোগীন ও আসাম আসকালানে গিয়ে জাওহারকে ঘেরাও করে ফেলেন। জাওহার অনন্যোপায় হয়ে উফতোগীনের সাথে পত্রালাপ শুরু করেন। তিনি উফতোগীনকে লিখেন ঃ তুমি অবরোধ তুলে নিয়ে আমাকে মিসরে যেতে দাও। আমি আমার বাদশাহ্ আযীয ইব্‌ন মুইয্যকে বলে তোমাকে এর যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করবো। উফতোগীন জাওহারকে ছেড়ে দিতে উদ্যত হন। আসাম বিষয়টি জানতে পেরে উফতোগীনকে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেন– তুমি জাওহারের ধোঁকায় পড়বে না। কেননা সে মিসরে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই আপন বাদশাহসহ বিরাট বাহিনী নিয়ে এসে আমাদের উভয়কেই পিষে ফেলার চেষ্টা করবে। কিন্তু উফতোগীন আসামের কথায় কান দেন নি। তিনি শেষ পর্যন্ত উফতোগীনকে আসকালান থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ করে দেন। জাওহার আযীযের কাছে পৌঁছে তাকে আশু বিপদাপদ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং অবিলম্বে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পরামর্শ দেন। আযীয তার সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করে অবিলম্বে শত্রুপক্ষের মুকাবিলায় রওয়ানা হন এবং জাওহারকে তার সম্মুখ বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন।

উফতোগীনকে বন্দী করে মন্ত্রীত্ব প্রদান

৩৬৭ হিজরীতে (৯৭৭-৭৮ খ্রি) আযীয আসাম ও উফতোগীনের বিরুদ্ধে রামলায় সৈন্য সমাবেশ ঘটান। তারপর উফতোগীনের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠান– তুমি আসাম থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে এসো। আমি তোমাকে আমার সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করবো এবং তুমি আমার সাম্রাজ্যের যে অঞ্চলটি পছন্দ করবে আমি তোমাকে সে অঞ্চলেরই

শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করবো। উফতোগীন আযীযের ঐ পয়গামে সাড়া দেন নি, বরং সেনাবাহিনী নিয়ে এসে তাকে আক্রমণ করে বসেন। উভয়পক্ষের মধ্যে যথারীতি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে আযীযের পরাজয়ের আশংকা দেখা দেয়। কিন্তু আযীয নিজেকে এবং নিজের বাহিনীকে সামলে নিয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করে উফতোগীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এক ভয়ানক সংঘর্ষের পর আসাম ও উফতোগীনের বাহিনী পরাজিত হয়। ওদের বাহিনীর বিশ হাজার যোদ্ধা যুদ্ধ ক্ষেত্রেই প্রাণ হারায়। বিজয় লাভ করার পর আযীয ঘোষণা দেন— যে ব্যক্তি উফতোগীনকে জীবিত অবস্থায় আমার কাছে বন্দী করে নিয়ে আসবে আমি তাকে একলক্ষ দীনার পুরস্কার দেব। ঐ ঘোষণার ফলশ্রুতিতে জনৈক ব্যক্তি প্রতারণার মাধ্যমে উফতোগীনকে বন্দী করে নিয়ে আসে এবং আযীযের কাছ থেকে পুরস্কারস্বরূপ এক লক্ষ দীনার লাভ করে। আযীযের সামনে যখন উফতোগীনকে পেশ করা হয় তখন তিনি উফতোগীনের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাকে তার বিশিষ্ট সভাসদ এমন কি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তিনি কারামতীয় সম্রাট আসামের কাছে জনৈক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর আসাম তখন তাবারিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তিনি আসামের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠান— তুমি আমার কাছে এসে আমার সাথে যোগ দাও। কিন্তু আসাম তাতে স্বীকৃত হন নি। তখন আযীয তার কাছে বিশ হাজার দিনার পাঠিয়ে দেন এবং লিখেন– প্রতি বছর তুমি আমার কাছ থেকে এই পরিমাণ অর্থ পেতে থাকবে। এতদসত্ত্বেও আসাম মিসর যেতে অস্বীকার করেন এবং তাবারিয়া থেকে বিদায় নিয়ে ইহসায় চলে আসেন। তারপর আযীয উফতোগীনকে সঙ্গে নিয়ে কায়রো চলে যান। যেহেতু উফতোগীনের প্রতি আযীয অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন তাই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইয়াকূব ইব্ন মাক্স উফতোগীনের শত্রু হয়ে দাঁড়ান এবং তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। আযীয যখন এই বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি ইয়াকূবকে বন্দী করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আটকে রাখেন। তারপর তার কাছ থেকে জরিমানাস্বরূপ পাঁচ লক্ষ দীনার আদায় করেন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তিনি পুনরায় ইয়াকূবকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেছিলেন।

উফতোগীন যখন দামেশক থেকে জাওহারের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হয়েছিলেন তখন তিনি কাস্‌সাম নামক জনৈক ব্যক্তিকে দামেশকে তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে এসেছিলেন। তারপর উফতোগীন তো দামেশকে যাবার সুযোগই পান নি। ফলে কাস্‌সামের শাসন ক্ষমতা সেখানে খুব সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। যখন কাসসাম উফতোগীনের মিসরে চলে যাবার সংবাদ পান তখন তিনি দামেশকে আযীযের নামে খুতবা পাঠ করতে শুরু করেন। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হওয়ার পর আযীয আবূ মাহমূদ ইবন্ন ইবরাহীম নামক জনৈক ব্যক্তিকে মিসরের শাসনকর্তা নিয়োগ করে সেখানে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কাস্‌সাম আবূ মাহমূদকে দামেশকে প্রবেশ করতে দেন নি। এবার আযীয কাসসামকে উচিত শিক্ষাদানের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। সায়ফুদ্দৌলার খাদিম বাকচুর, যিনি হিম্‌সের দখলদার ও শাসনকর্তা ছিলেন, মিসরীয় বাহিনীকে রসদ সরবরাহ করেন। এদিকে তাই গোত্রের সরদার মুফাররাজ ইব্ন জাররাহ্ একটি আরব বাহিনী নিয়ে এসে আযীযের বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়ান। কয়েক বছর পর্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ ও সংঘর্ষ চলে। শেষ পর্যন্ত আযীয নিজের পক্ষ থেকে বাকচুরকে দামেশকের

শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। বাকচুর দামেশকের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার সাথে সাথে ইয়াকূব ইব্‌ন মাক্‌স কর্তৃক নিয়োগকৃত যাবতীয় কর্মকর্তাকে দামেশক থেকে বের করে দেন। কেননা বাকচুরকে দামেশকের শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে ইয়াকূব বাধা প্রদান করেছিলেন। কিছুদিন পর ইয়াকূব নানা অভিযোগ উত্থাপন করে বাকচুরের বিরুদ্ধে আযীযকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। ফলে আযীয বাকচুরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বাকচুর তাতে পরাজিত হন। এদিকে সায়ফুদ্দৌলা সিরিয়া আক্রমণ করেন। অপর দিক থেকে কনসটান্টিনোপলের বাদশাহ সৈন্য সমাবেশ ঘটান। মোটকথা, দামেশক অঞ্চল ৩৮৫ হিজরী (৯৯৫ খ্রি) পর্যন্ত যেন যুদ্ধ ও সংঘর্ষের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

আযীযের মৃত্যু

দামেশকের দিকে রোমান বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে শুনে আযীয ৩৮৫ হিজরীতে (৯৯৫ খ্রি) সেনাবাহিনী নিয়ে স্বয়ং কায়রো থেকে দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হন এবং রোমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু বালবীস নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কী বিস্ময়কর এই যোগসূত্র যে, তার পিতাও যখন দামেশকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছিলেন তখন তিনিও মৃত্যু ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মোটকথা, আযীয বেশ কয়েক মাস অসুস্থ থাকার পর ৩৮৬ হিজরীর রমযান মাসের শেষ দিকে (৯৯৬ খ্রি অক্টোবর) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তার পুত্র আবূ মানসূর 'হাকিম বিআমরিল্লাহ্' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবূ মানসূর হাকিম ইব্‌ন আযীয উবায়দী

হাকিম উপাধিধারী আবূ মানসুর সিংহাসনে আরোহণ করে সাম্রাজ্য শাসনের ক্ষমতা হাসান ইব্‌ন আম্মার ইব্‌ন কাত্তামীর হাতে অর্পণ করেন। কাত্তামী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই জনসাধারণের উপর জুলুম-নির্যাতন শুরু করে। এদিকে পূর্বাঞ্চল থেকে দায়লামী বংশের কিছু লোকও শীআপন্থী হওয়ার কারণে মিসরে এসে পৌঁছেছিল। অপর দিকে উবায়দী সাম্রাজ্যের আনুগত্য প্রকাশের জন্য মাশরিকী (পূর্বাঞ্চলীয়)-দের একটি বিরাট দল মিসরে বিদ্যমান ছিল। শেষ পর্যন্ত মাশরিকী ও মাগরিবী (পশ্চিমাঞ্চলীয়) দলসমূহের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। দামেশক, হিজায প্রভৃতি অঞ্চলেও বিদ্রোহ লেগে থাকে। দামেশক কখনো আরবদের দখলে চলে যেত, আবার কখনো চলে যেত তুর্কী ক্রীতদাস অথবা মিসরীয় অধিনায়কের দখলে। মোটকথা, মিসর, সিরিয়া, হিজায ও আফ্রিকায় তখন অত্যন্ত অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল।

ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশামের বিদ্রোহ এবং তাকে হত্যা

ঐ সময়ে ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশাম ওরফে আরকূহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রসংগত উল্লেখ্য, মানসূর ইব্‌ন আবূ আমির যখন স্পেনের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে উমাইয়া বংশের শাহ্‌যাদাদেরকে বন্দী ও হত্যা করেছিলেন তখন শেষ খলীফার পুত্র ওয়ালীদ প্রাণের ভয়ে

স্পেন থেকে কায়রোয়ানে চলে আসেন। এখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি ইয়ামান, মক্কা প্রভৃতি শহর সফর করে সিরিয়ায় চলে আসেন। তখন এখানে দারুণ অশান্তি বিরাজ করছিল। তাই এই সুযোগে ওয়ালীদ বনূ উমাইয়া খিলাফতের পক্ষে জনসাধারণকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। কিছু লোক তাকে সমর্থন করে। কিন্তু তিনি এখানে সাফল্যের কোন সন্তোষজনক আলামত দেখতে না পেয়ে মিসরের দিকে চলে যান। সেখান থেকে বারকা এলাকায় গিয়ে পৌঁছেন। বারকায় তিনি বেশ সাফল্য লাভ করেন। হাকিম উবায়দী যখন এই সংবাদ জানতে পারেন তখন তিনি প্রথম প্রথম বিষয়টিকে কোন গুরুত্বই দেন নি। কিন্তু হাকিম উবায়দীর হুকুমতের প্রতি যেহেতু জনসাধারণ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল তাই আশেপাশের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশামের চারপাশে এসে জড় হতে থাকে। ফলে ওয়ালীদ এক বাহিনী গঠন করে বারকা দখল করে নেন; তারপর মিসর আক্রমণ করেন। এবার হাকিম উবায়দীর চোখ খুলে যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে উবায়দীর বাহিনী পরাজয়বরণ করে। তারপর উবায়দী বার বার সৈন্য পাঠাতে থাকেন এবং প্রতিবারই তাকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়। শেষ পর্যন্ত সমগ্র আফ্রিকায় ও মিসরের উপর ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এবার উবায়দী কূটকৌশলের আশ্রয় নেন এবং ওয়ালীদের কিছু সংখ্যক অধিনায়ককে অর্থের লোভ দেখিয়ে নিজের পক্ষে আনেন। ফলে অধিনায়করা ধোঁকা দিয়ে ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশামকে বন্দী করে ফেলে। যখন ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশামকে বন্দী অবস্থায় হাকিম উবায়দীর সামনে পেশ করা হয় তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করেন। তারপর ওয়ালীদের লাশটি সাধারণ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে ৩৯৭ হিজরীতে (১০০৬-৭ খ্রি) ওয়ালীদ সৃষ্ট হাঙ্গামার পরিসমাপ্তি ঘটে। হাকিম উবায়দী শীআপন্থী হওয়ার কারণে জনসাধারণ উবায়দী হুকুমতের প্রতি ঘৃণা পোষণ করত বিধায় হাকিম উবায়দী ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশামের হাঙ্গামা চলাকালে জনসাধারণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং সুন্নীদের অন্তরে তার প্রতি যে ঘৃণা বিরাজ করছে তা দূর করার উদ্দেশ্যে একটি ফরমান জারি করেন। তাতে বলা হয়, যে ব্যক্তির ইচ্ছা সে সুন্নী অথবা শীআ যে কোন মাযহাব গ্রহণ করতে পারবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির ইচ্ছা, সে আযানের মধ্যে 'হাইয়া আলা খায়রিল আমল' বলতে পারবে অথবা তা বলা থেকে বিরতও থাকতে পারবে। মোটকথা, মাযহাবের ব্যাপারে কারো উপর কোন জোরজবরদস্তি করা হবে না।

হাকিমের মৃত্যু

হাকিম উবায়দী জগত ও জগদ্বাসীর উপর আকাশের জ্যোতিষ্কেরও প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করতেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি তার ভয়ানক আকর্ষণ ছিল। তিনি কায়রোর নিকটবর্তী মাকতাম পাহাড়ের উপর একটি গৃহ নির্মাণ করে রেখেছিলেন। তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী থেকে 'রূহানিয়াত' তথা 'আধ্যাত্মিক শক্তি' সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সেখানে একাকী যাতায়াত করতেন। ৪১১ হিজরীর ২১শে শাওয়াল (১০২১ খ্রি ফেব্রুয়ারী) তিনি যথারীতি

তার গাধার উপর আরোহণ করে মাকতাম পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হন। সঙ্গে দু'জন আরোহীও ছিল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে দেন এবং একাকী পাহাড়ের দিকে চলে যান। তারপর বেশ কিছুদিন তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন নি। সরকারী কর্মকর্তা ও সভাসদবৃন্দ প্রথম প্রথম তার অপেক্ষায় থাকেন। তারপর অধৈর্য হয়ে তার সন্ধানে বের হন। মাকতাম পাহাড়ে আরোহণ করতেই তারা প্রথমে হাকিমের গাধাটি মৃত অবস্থায় দেখতে পান। তারপর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেখতে পান, হাকিমের পরিধেয় বস্ত্র এখানে সেখানে ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাকে যে ছুরির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে হত্যা করা হয়েছে তা ঐ পরিধেয় বস্ত্র দেখে অনায়াসে বোঝা যায়। কিন্তু সেখানে হাকিমের লাশ পাওয়া যায় নি। হাকিম উবায়দীর হত্যা সম্পর্কে আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। আর তা এই যে, হাকিমের বোনের সাথে কিছু কিছু লোকের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। একথা জানতে পেরে হাকিম তার বোনকে তিরস্কার করেন এবং তিরস্কারের জবাবে তার বোন কিছু সংখ্যক কাত্তামী অধিনায়ককে ডেকে পাঠিয়ে হাকিমের বিরুদ্ধে বদ্-আকীদা ও অধার্মিকতার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং হাকিমকে হত্যা করার জন্য তাদের সাথে ষড়যন্ত্র করে। শেষ পর্যন্ত কাত্তামী অধিনায়করা হাকিমের একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে তাকে মাকতাম পাহাড়ে হত্যা করে। হাকিমের জন্ম হয়েছিল ৩৭৫ হিজরীর ২৩শে রবিউল আউয়াল (৯৮৫ খ্রি সেপ্টেম্বর)। তিনি ৩৬ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হাকিমের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর সভাসদ ও কর্মকর্তাবৃন্দ হাকিমের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র আলীকে সিংহাসনে বসান। আলীকে 'যাহির লিদ্বীনিল্লাহ্' উপাধি প্রদান করা হয়। মূলত শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন যাহিরের ফুফু অর্থাৎ হাকিমের বোন। হাকিম ছিলেন অস্থিরচিত্ত ও পাষাণ প্রকৃতির লোক।

যাহির ইব্ন হাকিম উবায়দী

চার বছর পর যাহিরের ফুফু মৃত্যুমুখে পতিত হন। এবার যাহির সালতানাতের কর্মকর্তাদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। ৪২০ হিজরী সনে (১০২৯ খ্রি) সালিহ্ ইব্ন মারদাস সিরিয়া ও দামেশক দখল করে সেখান থেকে উবায়দী শাসনের নাম-নিশানা মুছে ফেলেন। যাহির ফিলিস্তীনের শাসনকর্তা যাবীরীকে সেদিক থেকে আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দেন। যাবীরী দামেশক ও সিরিয়া দখল করেন বটে, তবে সিরিয়ায় অনবরত যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও বিদ্রোহ চলতে থাকে।

মৃত্যু

৪২৭ হিজরীর ১৫ই শাবান (১০৩৬ খ্রি জুলাই) যাহির মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর তার পুত্র আবূ তামীম সা'দ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাকে 'মুসতানসির' উপাধি প্রদান করা হয়। যাহিরের যুগে আবুল কাসিম আলী ইব্ন আহমদ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মুসতানসির সিংহাসনে আরোহণ করার পর আবুল কাসিম আরো ব্যাপকভাবে সাম্রাজ্য শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মুসতানসির ইব্‌ন যাহির উবায়দী

মুসতানসিরের শাসনামলে ৪৩৩ হিজরীতে (১০৪১-৪২ খ্রি) বিভিন্ন আরব গোত্রের লোকেরা সিরিয়া ও দামেশক দখল করে নেয়। ফলে ঐ দেশ উবায়দী সাম্রাজ্য থেকে বের হয়ে যায়। ৪৪০ হিজরীতে (১০৪৮-৪৯ খ্রি) মুইয্য ইব্‌ন বারীস আফ্রিকিয়ায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে সেখানে বাগদাদের খলীফার নামে খুতবা পাঠ করতে থাকেন। ইতোমধ্যে মুনতানসির প্রধানমন্ত্রী আবুল কাসিমকে অপসারিত করে তার স্থলে হুসাইন ইব্‌ন আলী তাযুরীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং আরবের রুবা, রিবাহ, বুতুন, হিলাল প্রভৃতি গোত্রের লোকদের সমম্বয়ে এক বাহিনী গঠন করে আফ্রিকিয়া অভিমুখে পাঠান। এই সমস্ত লোক বারকা অঞ্চলে গিয়ে সেখানেই অবস্থান করতে থাকে এবং আফ্রিকা আক্রমণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। মুসতানসির এই অবস্থা দেখে দাস ক্রয় করতে শুরু করেন এবং অনতিবিলম্বে ২৩ হাজার দাস ক্রয় করে ফেলেন। ওদিকে আরব গোত্রের লোকেরা বারকায় অবস্থান গ্রহণের পর নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আগে বেড়ে ৪৪৬ হিজরীতে (১০৫৪-৫৫ খ্রি) ত্রিপোলী দখল করে নেয় এবং বনূ রুবা সেখানে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। বনূ রিবাহ আতীজ নামক স্থানে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। আর বনূ আদী সমগ্র আফ্রিকায় হত্যা ও লুটপাট শুরু করে। তারপর ঐ আরব সর্দারগণ মুইয্য ইব্‌ন বারীসের কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। মুইয্য ঐ প্রতিনিধি দলকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এবার তিনি আশান্বিত হন যে, হয়তো এরা এখন থেকে হত্যা, রাহাজানি ও লুটপাট থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু তারা তাদের ঐ স্বভাব পরিত্যাগ করেনি। শেষ পর্যন্ত মুইয্য ইব্‌ন বারীস সানহাজা প্রভৃতি বার্বার গোত্রের ৩০ হাজার লোক নিয়ে ঐ আরবদের দমন করার সংকল্প নেন। তার মুকাবিলায় আরব যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। এতদসত্ত্বেও মুইয্য শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে কায়রোয়ানে আশ্রয় নেন। তারপর মুইয্য পুনরায় বার্বার গোত্রসমূহ থেকে একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে ৪৪৬ হিজরীর ১০ যিলহাজ্জ (১০৫৫ খ্রি মার্চ) ঈদুল আযহার দিন আরবদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। কিন্তু এবারও তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়। পুনরায় তৃতীয় বারের মত তিনি আরবদের উপর হামলা চালান এবং এবারও তিনি পরাজিত হন। আরবরা কায়রোয়ান পর্যন্ত মুইয্যের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং বাজাহ নগরীর উপর আরব সর্দার ইউনুস ইব্‌ন ইয়াহইয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, ৪৪৯ হিজরীতে (১০৫৭-৫৮ খ্রি) মুইয্য ইব্‌ন বারীস কায়রোয়ান ত্যাগ করে মাহদীয়ায় চলে যান। ফলে ইউনুস ইব্‌ন ইয়াহইয়া কায়রোয়ানও দখল করে নেন।

গৃহযুদ্ধ

এদিকে কায়রোর অবস্থা এই ছিল যে, মুসতানসিরের মা তার পুত্রকে দিয়ে যে ফরমান ইচ্ছা জারি করতেন। এভাবে তার প্রভাব ও ক্ষমতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অপর দিকে সুলতানের মন্ত্রীবৃন্দ নিজেদের হিফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে সেনাবাহিনীতে শুধু তুর্কীদের ভর্তি করতেন। ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে একসাথে তিনটি বিরাট শক্তির উদ্ভব

ঘটে। ক্রীতদাসরা ছিল একটি শক্তি। এরা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি। দ্বিতীয় শক্তি ছিল কাত্তামী ও বার্বার যোদ্ধারা। আর তৃতীয় শক্তি ছিল তুর্কীরা। এরা সংখ্যায় ক্রীতদাসের চাইতে কম হলেও যুদ্ধবিদ্যায় ছিল পারদর্শী। ঘটনাচক্রে নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন হামদান সুদানী নামক জনৈক ক্রীতদাস রাজকীয় সভাসদ ও কর্মকর্তাদের সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হন এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতি করে সামরিক অধিনায়কের পদমর্যাদায় উন্নীত হন। তুর্কীরা তাকে নিজেদের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করে। ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যের এক একটি অঞ্চল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আর কায়রোর অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাবৃন্দ, মুসতানসিরের মা এবং মুসতানসির সকলেই একে অন্যের ক্ষমতা হ্রাস করার লক্ষ্যে পরস্পর রশি টানাটানিতে ছিলেন নিমগ্ন। ফলে ক্রীতদাস ও তুর্কীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং মুসতানসিরের সেনাবাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। তুর্কীদের হাতে হাজার হাজার ক্রীতদাস নিহত হয় এবং এই সুযোগে তুর্কীদের সর্দার নাসিরুদ্দৌলা অত্যধিক ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠেন। তিনি মুসতানসিরের উপর প্রভাব বিস্তার করে আপন ইচ্ছানুযায়ী সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। মুসতানসির তার এই অসহায় অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত আপন ক্রীতদাস বদর জামালীর সহায়তা কামনা করেন। বদর জামালী তখন আক্কার শাসনকর্তা ছিলেন। মুসতানসিরের সাহায্যার্থে তিনি সেখানে আর্মেনীয় লোকদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে শুরু করেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই জাহাজযোগে এক বিরাট আর্মেনীয় বাহিনী নিয়ে মিসরে এসে পৌঁছেন। তিনি মুসতানসিরের দরবারে হাযির হলে মুসতানসির তাকে মন্ত্রীত্বের পদ প্রদান করেন এবং কিছু সংখ্যক তুর্কীকে আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন যে, নাসিরুদ্দৌলা তোমাদেরকে অযথা যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। তুর্কীরা খলীফার এই ইঙ্গিত পেয়ে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ সুযোগ-সুবিধার দিকেও লক্ষ্য রেখে প্রতারণার মাধ্যমে নাসিরুদ্দৌলাকে হত্যা করে ফেলে। এবার বদর জামালী তুর্কীদের একচ্ছত্র নেতায় পরিণত হন। তিনি পরিপূর্ণ শক্তি অর্জন এবং সাম্রাজ্যের প্রতিটি বিভাগের শাসন ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করার পর সাম্রাজ্যের সম্মান ও ভাবমূর্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি করেন। তিনি বিদ্রোহী অধিনায়কদেরকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন এবং যে সমস্ত শহর ইতিমধ্যে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল সেগুলো পুনরায় দখল করার চেষ্টা-তদবীর করতে থাকেন। তিনি ত্রিপোলীকেও আরবদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসেন। ফিলিস্তীনের সমগ্র এলাকাও তার দখলাধীনে চলে আসে। আর দামেশকের অবস্থা এই ছিল যে, সেখানে যেই সুযোগ পেত সেই আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করত। কিন্তু খুতবা মিসর সম্রাট উবায়দীর নামেই পাঠ করা হতো। আর কায়রোর রাজদরবার এটাকেই তাদের সৌভাগ্য বলে মনে করত। ৪৬৮ হিজরীতে (১০৭৫-৭৬ খ্রি) যখন বদর জামালী মুসতানসিরের বিগড়ে যাওয়া প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে কিছুটা সংগঠিত করে তোলেন ঠিক তখনি আমীর আকদাস দামেশকের উপর হামলা চালিয়ে সেখানে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং মিসরের বাদশাহর পরিবর্তে বাগদাদের খলীফার নামে খুতবা পাঠ জারি করেন। ৪৬৯ হিজরীতে (১০৭৬-৭৭ খ্রি) ইব্ন উফুক নামক সালজুকী সেনাবাহিনীর জনৈক অধিনায়ক দামেশক আক্রমণ করেন। এই

সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে বদর জামালী দামেশক অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। দামেশকবাসীরা ইব্‌ন উফুকের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল এমনি মুহূর্তে মিসরীয়রা দামেশক অবরোধ করে ফেলে। ৪৭০ হিজরীতে (১০৭৭-৭৮ খ্রি) সুলতান মালিক শাহ সালজুকী তুতুশ সালজুকীর হাতে সিরিয়ার শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে তাকে নির্দেশ দেন– তুমি সিরিয়ার যে অংশটুকু দখল করবে তা তোমারই রাজ্য বলে বিবেচিত হবে। এই নির্দেশ পাওয়ার পর তুতুশ সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করে হলব আক্রমণ করেন। হলববাসীরা তাকে রুখে দাঁড়ায়। ফলে তুতুশ আলেপ্পো অবরোধ করে ফেলেন। ওদিকে ইব্‌ন উফুক তখন পর্যন্ত মিসরীয় বাহিনীর অবরোধের মধ্যে ছিলেন। তিনি তুতুশের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠান ঃ মিসরীয় বাহিনী আমাকে ঘেরাও করে রেখেছে। যদি আপনি আমাকে সাহায্য না করেন তাহলে শেষ পর্যন্ত ওদের হাতে দামেশক তুলে দিতে আমি বাধ্য হব। তুতুশ সঙ্গে সঙ্গে দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হন। তুতুশের আগমন সংবাদ শুনে মিসরীয় বাহিনী দামেশক থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে মিসর অভিমুখে পালিয়ে যায়। তুতুশ মিসরে পৌঁছে ইব্‌ন উফুককে হত্যা করেন এবং মিসরের সর্বময় ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। এ ঘটনা সংঘটিত হয় ৪৭১ হিজরীতে (১০৭৮-৭৯ খ্রি)। তারপর তুতুশ আলেপ্পো দখল করে নেন। ধীরে ধীরে সমগ্র সিরিয়াও তার দখলে চলে আসে। এই সংবাদ শুনে বদর জামালী মিসরে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন এবং এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এসে দামেশ্‌ক আক্রমণ করেন। কিন্তু তুতুশের মুকাবিলায় টিকতে না পেরে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যান। এরপরও বেশ কয়েকবার মিসরীয় বাহিনী সিরিয়ার উপর হামলা চালায়, কিন্তু প্রতিবারই তাদেরকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়। ৪৮৪ হিজরীতে (১০৯১ খ্রি) খ্রিস্টানরা সিসিলী দ্বীপ মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। ৪৮৭ হিজরীর রবিউল আউয়াল (১০৯৪ খ্রি এপ্রিল) মাসে বদর জামালী ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর ৪৮৭ হিজরীর ৮ই যিলহজ্জ (১০৯৫ খ্রি ডিসেম্বর) মুসতানসির উবায়দী পরলোক গমন করেন। মুসতানসিরের প্রাথমিক যুগ ছিল খুবই সঙ্কটজনক। তখন উবায়দী সাম্রাজ্য একেবারে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত বদর জামালী স্বীয় দূরদর্শিতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা সেটাকে বাঁচিয়ে তুলতে সক্ষম হন। আহমদ, নায্‌যার ও আবুল কাসিম নামে মুসতানসিরের তিন পুত্র ছিলেন। মুসতানসির নায্‌যারকে তার অলীআহ্‌দ নিয়োগ করেন।

মুসতানসিরের হাতে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ্-এর বায়আত গ্রহণ

বলা হয়ে থাকে যে, মুসতানসিরের শাসনামলে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ ইরাক থেকে বণিকের বেশে মিসরে আসেন এবং মুসতানসিরের খিদমতে হাযির হয়ে তার হাতে বায়আত করেন। তারপর নিবেদন করেন– আমি আপনার পর কাকে ইমাম বানাব ? মুসতানসির বলেন, আমার পর আমার পুত্র নায্‌যার তোমাদের ইমাম হবে। তারপর হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ ইরাকে মুসতানসিরের খিলাফত ও ইমামতের পক্ষে প্রচারকার্য চালাবার জন্য তার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। মুসতানসির তাকে অনুমতি প্রদান করেন। উপরন্তু তাকে তার 'দাঈ' (প্রচারক) নিয়োগ করে ইরাকে পাঠিয়ে দেন। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ ইরাকে পৌঁছে পুরোদমে

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেন এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা অর্জন করে আলামুত দুর্গ দখল করে নেন। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ্ এবং তার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের অবস্থা যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে। মুসতানসির বদর জামালীর মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মদ মালিককে মন্ত্রীত্বের পদ প্রদান করেছিলেন। যেহেতু মুহাম্মদ মালিক এবং নায্‌যারের মধ্যে কিছুটা শত্রুতা ছিল তাই মুসতানসিরের মৃত্যুর পর মুহাম্মদ মালিক মুসতানসিরের বোনকে একথার উপর রাযী করিয়ে নেন যে, মুসতানসিরের পর আবুল কাসিমকে সিংহাসনে বসানো হবে। আর এই বোঝা-পড়ার ভিত্তিতে মুহাম্মদ মালিকের পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসতানসিরের বোন সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাদের সামনে একথার সাক্ষ্য দেন যে, মুসতানসির আবুল কাসিমকে তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করার জন্য ওসীয়ত করে গেছেন। এই প্রেক্ষিতে জনসাধারণ আবুল কাসিমের হাতে বায়আত করে এবং তিনি 'মুসতালা বিল্লাহ্' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবুল কাসিম মুসতালা উবায়দী

মুসতালা সিংহাসনে আরোহণ করার তিন দিন পর নায্‌যার কায়রো থেকে রওয়ানা হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে যান। তখন আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক ছিলেন নাসীরুদ্দৌলা উফতোগীনের গোলাম বদর জামালী। আবুল কাসিম সিংহাসনে আরোহণ করেছেন শুনে বদর জামালী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নায্‌যারকে উপযুক্ত শাসক মনে করে তার সাহায্যকারীতে পরিণত হন। নাসীরুদ্দৌলা আলেকজান্দ্রিয়ায় নায্‌যারকে সিংহাসনে বসিয়ে তার হাতে বায়আত করেন এবং তাকে 'মুসতালা লিদীনিল্লাহ' উপাধি দেন। এই সংবাদ কায়রোয় পৌঁছামাত্র প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ মালিক সেনাবাহিনী নিয়ে নায্‌যারকে দমন করার জন্য রওয়ানা হন এবং সোজা আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে শহরটি অবরোধ করে ফেলেন। আলেকজান্দ্রিয়াবাসীরা এই শক্ত অবরোধ সহ্য করতে না পেরে মুহাম্মদ মালিকের কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানায় এবং আলেকজান্দ্রিয়াকে তার হাতে সমর্পণ করে। প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ নায্‌যারকে বন্দী করে কায়রোয় পাঠিয়ে দেন। মুসতালা কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সঙ্গে সঙ্গে নায্‌যারকে হত্যা করে ফেলেন। তারপর মুহাম্মদ মালিক নাসীরুদ্দৌলা উফতোগীনকে সঙ্গে নিয়ে কায়রোয় পৌঁছেন। মুসতালা উফতোগীনকেও হত্যা করে ফেলেন। তারপর 'সূর' শহরের শাসনকর্তা কাসীলাহ্ নামক জনৈক ব্যক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাকে দমনের জন্য রাজকীয় বাহিনী রওয়ানা হয় এবং এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর কাসীলাহকে বন্দী করে কায়রোয় নিয়ে আসে। মুসতালার নির্দেশে কাসীলাহকেও সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয়।

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, সমগ্র সিরিয়া তাজুদ্দৌলা তুতুশ সালজুকীর দখলে এসে গিয়েছিল। তাজুদ্দৌলা তুতুশের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র ভিকাক ও রিযওয়ানের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভিকাক দামেশক এবং রিযওয়ান হলব (আলেপ্পো) দখল করে নিয়েছিল। ভিকাকের পক্ষ থেকে সুলায়মান ইব্‌ন আরতাককে বায়তুল মুকাদ্দাসের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল। ৪৯০ হিজরীতে (১০৯৭ খ্রি) ইউরোপের খ্রিস্টানরা, যাদের মধ্যে অনেক বড় বড় সম্রাটও ছিলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুসলমানদের হাত থেকে

ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে যৌথভাবে আক্রমণ পরিচালনা করেন। তারা প্রথমে আনতাকিয়া অবরোধ করেন। ঐ সময়ে বাগীসান নামক এক সালজুকী আনতাকিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় টিকতে না পেরে আনতাকিয়া থেকে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে জনৈক আর্মেনীয় তাকে হত্যা করে এবং তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে তা খ্রিস্টান বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। বাগীসানের হত্যা এবং আনতাকিয়া হাতছাড়া হওয়ার সংবাদ সিরিয়ায় পৌঁছালে সেখানে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মুসেলের শাসনকর্তা কারলুকা নামক জনৈক সালজুকী অধিনায়ক খ্রিস্টান হামলাকারীদের দিকে অগ্রসর হন এবং মারজে ওয়াবিকে পৌঁছে সেখানে অবস্থান নেন। এই সংবাদ শুনে ভিকাক ইব্‌ন তুতুশ ও হিম্‌সের শাসক সুলায়মান ইব্‌ন রাতিক তুগতাগীনও নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে বূকার নিকট এসে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে সবাই একজোট হয়ে খ্রিস্টানদের মুকাবিলার জন্য আনতাকিয়ার দিকে অগ্রসর হন। খ্রিস্টান বাহিনীর মুকাবিলায় এই সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল নেহায়েত কম। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয় এবং হাজার হাজার মুসলমান এতে শাহাদাতবরণ করেন। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সেনা ছাউনিও লুট করে নিয়ে যায়। তারপর খ্রিস্টানরা হিম্‌স দখল করে। তারপর আরো অগ্রসর হয়ে আক্কা অবরোধ করে। আক্কায় অবস্থানকারী তুর্কী-সালজুকী বাহিনী অনেক কষ্ট-যাতনা সহ্য করে খ্রিস্টানদের বাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। খ্রিস্টানরা আক্কা অবরোধ করে রেখেছিল এবং সিরিয়ার সমগ্র মুসলমানের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ ছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে মুসতালার মন্ত্রী মুহাম্মদ মালিক মিসরীয় বাহিনী নিয়ে এসে বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করে বসেন। শীআদের এই আক্রমণ খ্রিস্টানদের জন্য অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হয়। কেননা সিরিয়ার মুসলিম বাহিনী একই সময়ে এই দুই শক্তিশালী আক্রমণকারীর মুকাবিলা করতে পারত না। সুলায়মান এবং এলগাযী বায়তুল মুকাদ্দাসে মিসরীয় শীআ বাহিনীর মুকাবিলায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। ফলে আক্কায় খ্রিস্টানদের হামলা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তিনি কোনরূপ সাহায্য প্রদান করতে পারেননি। অপরদিকে যে সমস্ত লোক খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় অটল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তারাও বায়তুল মুকাদ্দাসবাসীদের কাছে কোন সাহায্য পাঠাতে পারেনি। ফলে বায়তুল মুকাদ্দাস মিসরের প্রধানমন্ত্রীর দখলে চলে যায় এবং সুলায়মান ও এলগাযী সেখান থেকে পূর্বদিকে চলে যান। শেষ পর্যন্ত মিসরীয়দের পক্ষেও বায়তুল মুকাদ্দাস দখলে রাখা সম্ভব হয়নি।

৪৯২ হিজরীর ২৩শে শাবান (১০৯৯ খ্রি জুলাই) ৪০ দিন অবরুদ্ধ করে রাখার পর খ্রিস্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করে। বিজয়ী খ্রিস্টানরা শহরের মধ্যে প্রবেশ করে মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা দাউদ (আ)-এর মিহরাবে আশ্রয় নেয় এই আশায় যে, সেখানে খ্রিস্টানরা হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু খ্রিস্টানরা অবিরাম হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যায়। শুধু মসজিদে আকসা এবং সাখরা-ই-সুলায়মানে ৭০ হাজার মুসলমান শাহাদাতবরণ করে। মসজিদে আকসার অভ্যন্তরস্থ রূপা ও সোনার তৈরি ঝাড়বাতিসহ যাবতীয় মূল্যবান সম্পদ খ্রিস্টানরা লুট করে নিয়ে যায়। এই হাঙ্গামায় অসংখ্য মুসলমান শাহাদাতবরণ করে। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে যে

সমস্ত মুসলমান কোন না কোনভাবে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল তারা অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় বাগদাদে পৌঁছে এবং খ্রিস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অমানুষিক জুলুম করেছে, বাগদাদের খলীফার কাছে তার মর্মস্পর্শী বিবরণ দেয়। খলীফা তখন বারকিয়ারুক, মুহাম্মদ, সানজার প্রমুখ সালজুকী সুলতানদের কাছে পয়গাম পাঠান যেন তারা সিরিয়া রক্ষায় এগিয়ে যান। কিন্তু তারা পরস্পরের বিরোধিতায় এমনি নিমগ্ন ছিল যে, সিরিয়ার দিকে তাকাবার মত অবসর তাদের মোটেই ছিল না। আর এই সুযোগে খ্রিস্টানরা সিরিয়াকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। মিসরের প্রধানমন্ত্রী যিনি মুসলমানদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস কেড়ে নিয়ে বলতে গেলে তা খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন যখন এই সংবাদ পান তখন খ্রিস্টানদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধারের জন্য মিসরীয় বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। কিন্তু খ্রিস্টানরা তার আগমন সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আগে বেড়ে মিসরীয় বাহিনীকে পরাস্ত করে। তখন যে সমস্ত মুসলমান পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, তাদের কাউকেই খ্রিস্টানরা রেহাই দেয়নি। মাত্র কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মিসরে এসে পৌঁছেন। তারপর খ্রিস্টানরা আসকালান অবরোধ করে এবং এক হাজার দীনার জরিমানা আদায় করে সেখান থেকে ফিরে আসে।

মুসতালার মৃত্যু

৪৯৫ হিজরীর ১৫ই সফর (১১০১ খ্রি ১০ ডিসেম্বর) মুসতালার মৃত্যু হয়। তখন তার পুত্র আবূ আলীর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। রাজকীয় সভাসদ ও কর্মকর্তাবৃন্দ 'আমির বিআহকামিল্লাহ' উপাধি দিয়ে তাকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে।

আবূ আলী আমির উবায়দী

আবূ আলী সিংহাসনে আরোহণ করার পর সাম্রাজ্যের যাবতীয় শাসন ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে চলে আসে। অবশ্য তিনি প্রথম থেকেই অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে মুসতালা তার উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতেন না। যাহোক ৪৯৬ হিজরীতে (১১০২-৩ খ্রি) প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনী সুসংগঠিত করে তা তার পিতা বদর জামালীর গোলাম সা'দুদ্দৌলার অধিনায়কত্বে খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। রামলা ও ইয়াফার মধ্যবর্তী স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মিসরীয়দের সেনাছাউনি লুণ্ঠন করা হয় এবং অনেক মিসরীয় সৈন্যকে বন্দী করা হয়। প্রধানমন্ত্রী যখন এই সংবাদ পান তখন তিনি তার পুত্র শারফুল মাআলীকে এক দুর্বার বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেন। রামলার সন্নিকটে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে খ্রিস্টানরা পরাজিত হয়। শারফুল মাআলী এবার আগে বেড়ে রামলা অবরোধ করে ফেলেন। ১৫ দিন অবরোধ করে রাখার পর রামলা বিজিত হয়। সংঘর্ষে চারশ খ্রিস্টান নিহত এবং তিনশ' বন্দী হয়। খ্রিস্টান অধিনায়করা রামলা থেকে ইয়াফায় চলে যান এবং বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করার জন্য যেসব খ্রিস্টান ইউরোপ থেকে সেখানে এসে পৌঁছেছিল তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে, শারফুল মাআলীর দিকে অগ্রসর হন। শারফুল মাআলী খ্রিস্টানদের হামলার খবর শুনে যুদ্ধ না করেই মিসরের দিকে চলে যান। ফলে খ্রিস্টানরা আগে বেড়ে বিনাযুদ্ধে আসকালান দখল করে নেয়। তারপর মিসরীয় বাহিনী পুনরায়

আসকালান আক্রমণ করে এবং খ্রিস্টানদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নেয়। এটা হচ্ছে ৪৯৬ হিজরীর যিলহজ্জ (১১০৩ খ্রি সেপ্টেম্বর) মাসের ঘটনা।

তারপর ৪৯৮ হিজরীতে (১১০৪-৫ খ্রি) মিসরীয় বাহিনী পুনরায় খ্রিস্টানদের উপর হামলা চালায়। দামেশকের তুর্কী বাহিনীও মিসরীয় বাহিনীকে সহায়তা করে। কিন্তু সে যুদ্ধে কোন সুফল পাওয়া যায়নি। সিরিয়া উপকূলের শহরগুলোর মধ্যে ত্রিপোলী, সূর, সায়দা ও বৈরুত মিসরীয় রাষ্ট্রের শাসনাধীনে ছিল। ৫০৩ হিজরী (১১০৯-১০ খ্রি) সনে খ্রিস্টানদের সামরিক নৌবহর সেখানে আসে এবং একের পর এক সবগুলো শহর জয় করে সমগ্র সিরীয় উপকূল পরিপূর্ণভাবে নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয়। খ্রিস্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করে সেখানে নিজেদের একজন বাদশাহ মনোনীত করে এবং সিরিয়ার যে সমস্ত অঞ্চল তারা জয় করেছিল সেগুলোকে বায়তুল মুকাদ্দাসের এই খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এভাবে সিরিয়ার অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সাম্রাজ্যটি ক্ষুদ্র হলেও তার দাপট ছিল অনেক বেশি। কেননা সে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে অনবরত সামরিক ও আর্থিক সাহায্য লাভ করত। এই খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় মিসরের উবায়দী সাম্রাজ্য কিছুই করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টানরা প্রধানত ঐ সমস্ত শহর এবং ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছিল যেগুলো ছিল মিসরীয় সাম্রাজ্যের শাসনাধীন। সালজুকী অধিনায়কদের শাসনাধীন দামেশক ভূখণ্ড খ্রিস্টানরা জয় করতে পারেনি। এমনকি সিরিয়ার পূর্বাংশের দিকে চোখ তুলে তাকাবার মত দুঃসাহসও খ্রিস্টানদের হয়নি। সালজুকী অধিনায়ক এবং সালজুকী সুলতানরা তখন গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। যদি তারা তাদের গৃহযুদ্ধ মুলতবি রেখে খ্রিস্টানদের প্রতি মনোনিবেশ করত তাহলে অতি সহজেই খ্রিটানদেরকে মেরে তাড়িয়ে দিতে পারত। ফলে খ্রিস্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাসে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগই পেত না। মোটকথা সিরিয়ার পশ্চিম উপকূলে খ্রিস্টানদের একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে শুধু এ জন্য যে, তখন সালজুকী অধিনায়করা পরপর গৃহযুদ্ধে নিমগ্ন ছিল এবং অদূরদর্শিতার কারণে খ্রিস্টানদেরকে অনুরূপ বাড়াবাড়ি করার সুযোগ দিয়ে রেখেছিল।

৫১৫ হিজরীতে (১১২১-২২ খ্রি) আমির উবায়দী তার মন্ত্রীকে সীমাহীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দেখে তার প্রতি রুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং প্রতারণার মাধ্যমে তাকে হত্যা করেন। তারপর তিনি অপর এক ব্যক্তিকে 'জালালুল ইসলাম' উপাধি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। চার বছর পর আমির উবায়দী জালালুল ইসলামের প্রতিও রুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং ৫১৯ হিজরীতে (১১২৫ খ্রি) তিনি জালালুল ইসলাম, তার ভাই মুতামিন এবং শুভাকাঙ্ক্ষী নাজীবুদ্দৌলাকেও নির্মমভাবে হত্যা করেন।

আমির উবায়দীকে হত্যা

শেষ পর্যন্ত ৫২৪ হিজরীতে (১১৩০ খ্রি) কারামতীয় কিংবা ফিদায়ীদের একটি দল সওয়ারীতে আরোহণ করার মুহূর্তে অতর্কিত হামলা চালিয়ে আমির উবায়দীকে হত্যা করে। যেহেতু আমির উবায়দীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তাই তার মৃত্যুর পর তার চাচাত ভাই আবদুল মজীদ 'হাফিজ লিদীনিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জনসাধারণ হাফিজ লিদীনিল্লাহ-এর হাতে এই শর্তে বায়আত করে যে, যদি আমীরের গর্ভবতী স্ত্রী পুত্র সন্তান প্রসব করে তাহলে তাকেই এই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলে মেনে নিতে হবে।

হাফিজ উবায়দী

হাফিজ উবায়দী সিংহাসনে আরোহণ করে অনেক মন্ত্রীকেই হত্যা করেন। প্রত্যেক মন্ত্রীই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ার পর সুযোগ বুঝে বাদশাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করতো বলে তিনি তাদেরকে হত্যা করতেন। শেষ পর্যন্ত হাফিজ উবায়দী তার পুত্রকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। সেও সুযোগ বুঝে তার পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণের প্রচেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত হাফিজ উবায়দী রেযওয়ান নামক জনৈক সুন্নী মতাবলম্বীকে তার মন্ত্রী নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর শীআ ও ইমামীদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে রেযওয়ানকেও মন্ত্রীত্ব ছাড়তে হয়। এটা হচ্ছে ৫৪৩ হিজরীর (১১৪৮-৪৯ খ্রি) ঘটনা। তারপর হাফিজ উবায়দী আর কাউকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেননি।

মৃত্যু

শেষ পর্যন্ত হাফিজ লিদীনিল্লাহ্ সত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার স্থলে তার পুত্র আবূ মানসূর ইসমাঈল 'যাফির বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

যাফির ইব্ন হাফিজ উবায়দী

যাফির সিংহাসনে আরোহণ করে আদিল নামক জনৈক ব্যক্তিকে তার মন্ত্রী নিয়োগ করেন। আদিল সাম্রাজ্যের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম নিজের হাতে তুলে নিয়ে যাফিরকে রাতদিন দাবা খেলায় নিমগ্ন থাকার ব্যবস্থা করেন। ৫৪৮ হিজরীতে (১১৫৩-৫৪ খ্রি) খ্রিস্টানরা আসকালান অবরোধ করে। আসকালানবাসীরা অবরুদ্ধ হয়ে সাহায্য-সহায়তার জন্য কায়রো দরবারের কাছে আবেদন জানায়। এখান থেকে প্রধানমন্ত্রী আদিল আসকালান থেকে খ্রিস্টানদের অবরোধ ভেংগে ফেলার উদ্দেশ্যে আপন মন্ত্রীর প্রথম পক্ষের সন্তান আব্বাস ইব্ন আবুল ফুতুহকে একটি শক্তিশালী বাহিনী দিয়ে সেখানে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেখানে যাফির ও আব্বাসের মধ্যে এই ষড়যন্ত্র পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল যে, আদিলকে অবিলম্বে হত্যা করা হবে। অতএব আব্বাস স্বয়ং সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়ে বালবীসে অবস্থান গ্রহণ করেন। এদিকে আব্বাসের কিশোর পুত্র নাসীর আদিলকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে ফেলে। আদিলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আব্বাস কায়রোয় প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাকেই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। আসকালানবাসীদের খোঁজ-খবর আর কেউ নিল না। অতএব তারা বাধ্য হয়ে নিজেদেরকে খ্রিস্টানদের হাতে সমর্পণ করল। খ্রিস্টানরা আসকালান দখল করে উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার রহস্য আরো ভালোভাবে ফাঁস করে দিল। নাসীর ইব্ন আব্বাস, যার নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যাফির উবায়দীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও দিবারাত্রির সঙ্গী ছিল। তার এবং যাফিরের মধ্যকার সম্পর্ককে উপলক্ষ করে জনসাধারণ নানা ধরনের আপত্তিকর ধারণা পোষণ করত।

যাফিরকে হত্যা

৫৪৯ হিজরীর মুহাররম (১১৫৪ খ্রি মার্চ/এপ্রিল) মাসে একদা নাসীর যাফিরকে নিমন্ত্রণ করে। যাফির নাসিরের ঘরে আসে। নাসির তখন যাফির এবং তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করে সেই ঘরেই দাফন করে ফেলে। পরদিন প্রধানমন্ত্রী আব্বাস ইব্ন আবুল ফুতূহ যথারীতি রাজপ্রাসাদে গমন করে এবং চাকর-ভৃত্যদের কাছে বাদশাহ যাফিরের খবরা-খবর জানতে চায়। তারা এ ব্যাপারে কিছু জানে না বলে জানায়। তারপর আব্বাস সেখান থেকে চলে আসে। আব্বাস চলে যাবার পর চাকর-ভৃত্যরা যাফিরের ভাই জিবরীল ও ইউসুফের কাছে গিয়ে যাফিরের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ জানায় এবং এও জানায় যে, যাফির নাসিরের ঘরে গিয়েছিলেন, তারপর সেখান থেকে আর ফিরে আসেন নি। ইউসুফ ও জিবরীল বললেন, তোমরা প্রধানমন্ত্রী আব্বাসকে এ সম্পর্কে অবহিত কর। ভৃত্যরা আব্বাসকে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বলেন, মনে হচ্ছে ইউসুফ ও জিবরীলের ষড়যন্ত্রে বাদশাহ যাফিরকে হত্যা করা হয়েছে। তারপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে যাফিরের ঐ দুই ভাইকে বন্দী করে এনে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেন। এই সাথে হাসান ইব্ন হাফিজের দুই পুত্রকেও হত্যা করা হয়। তারপর আব্বাস রাজপ্রাসাদে গিয়ে যাফিরের পুত্র ঈসা আবুল কাসিমকে জবরদস্তিমূলক কোলে করে নিয়ে এসে সিংহাসনে বসিয়ে দেন। তিনি তাকে 'ফায়িয বিনাসরিল্লাহ্' উপাধি দেন এবং তার নামে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। রাজপরিবারের পাঁচজন লোককে এভাবে নিহত হতে দেখে প্রাসাদের বেগমগণ অনন্যোপায় হয়ে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে সালিহ্ ইব্ন যুরায়কের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে তাকে পূর্বাপর পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং আব্বাসকে শায়েস্তা করার জন্য তার কাছে আবেদন জানান। সালিহ্ ইব্ন যুরায়ক তখন আসমূনীন ও নাবাসার শাসনকর্তা ছিলেন। যাহোক, সালিহ্ ইব্ন যুরায়ক সৈন্য সংগ্রহ করে কায়রো অভিমুখে রওয়ানা হন। আব্বাস যখন লক্ষ্য করলেন যে, কায়রোবাসীরাও তার বিরুদ্ধে চলে গেছে তখন তিনি তার পুত্র নাসীর, বন্ধু উসামা ইব্ন মুনকিদ এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ লোককে নিয়ে বলতে গেলে, দলবলসহ সিরিয়া ও ইরাকের উদ্দেশে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে খ্রিস্টানদের সাথে তাদের সংঘর্ষ বাঁধে এবং তাতে আব্বাস নিহত এবং নাসীর বন্দী হন। উসামা কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান এবং সিরিয়ায় গিয়ে পৌঁছেন। আব্বাস কায়রো থেকে বের হয়ে যাবার পর ৫৫৯ হিজরীর রবিউস সানী (১১৬৪ খ্রি মার্চ) মাসে সালিহ্ সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। নাসীরের ঘর থেকে মাটি খুঁড়ে যাফিরের লাশ উদ্ধার করে তা শাহী কবরস্থানে দাফন করা হয়। তারপর যাফিরের পুত্র ফায়িযের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করা হয়। ফায়িয সালিহকে 'আলমালিকুস সালিহ্' উপাধি দেন।

ফায়িয ইব্ন যাফির উবায়দী

সালিহ্ প্রধানমন্ত্রী হয়ে সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করতে থাকেন। তারপর খ্রিস্টানদের সাথে পত্রালাপ করে নগদ মুদ্রার বিনিময়ে নাসীরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে আসেন। খ্রিস্টানরা যখন অর্থের বিনিময়ে নাসীরকে কায়রোয় পৌঁছিয়ে দেন তখন সালিহ্

তাকে হত্যা করে তার লাশ প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখেন। সালিহ্ ছিলেন ইমামিয়া মাযহাবের কঠোর অনুসারী এবং উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের একজন সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষী। নাসীরকে হত্যা করার পর সালিহ্ ঐ সমস্ত বিদ্রোহী সর্দারের প্রতি মনোনিবেশ করেন, যাদের দিক থেকে বিদ্রোহ বা বিরোধিতার আশংকা ছিল। ঐ সর্দারদের মধ্যে দুজন ছিলেন খুবই উল্লেখযোগ্য। তাদের একজন হচ্ছেন তাজুল মুলূক কাইমায এবং অন্যজন হচ্ছেন ইব্ন গালিব। ঐ দুজনকে বন্দী করার জন্য সালিহ্ তার সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা উভয়ে পূর্বাহ্নে বিষয়টি জানতে পেরে মিসর থেকে পালিয়ে যান। তাদের ঘরবাড়ি লুট করা হয়। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে অন্য সর্দাররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং উবায়দী সাম্রাজ্যের একান্ত অনুগত দাসে পরিণত হন। সালিহ্ রাজপ্রাসাদের দারোয়ান, খাদিম তথা সকল কর্মচারীকে হটিয়ে দিয়ে তাদের স্থলে নিজস্ব লোক নিয়োগ করেন। এভাবে তিনি যাবতীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তগত করে রাজপ্রাসাদের মূল্যবান সব আসবাব-সামগ্রী নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। ফায়িয উবায়দীর ফুফু সালিহের ক্ষমতা এভাবে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে তাকে দমন তথা হত্যা করার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন।

সালিহ্ উক্ত ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে স্বয়ং রাজপ্রাসাদে গিয়ে সালিহের ফুফুকে হত্যা করেন। যে বছর ফায়িযকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয় সেই বছর আল-মালিকুল আদিল সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ যঙ্গী, বনূ তুতুশের কাছ থেকে দামেশক দখল করে নিয়েছেন এবং খ্রিস্টানদেরকে শায়েস্তা করার ব্যাপারেও গভীর চিন্তা-ভাবনা করছেন।

ফায়িয উবায়দীর মৃত্যু

নাম কা ওয়াস্তে ছয় মাস হুকুমত করার পর বাদশাহ ফায়িয উবায়দী ৫৫৫ হিজরীতে (১১৬০ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রধানমন্ত্রী সালিহ্ ইব্ন যুরায়ক রাজপ্রাসাদের খাদিমদেরকে নির্দেশ দেন, রাজপরিবারের যে সমস্ত ছেলেরা রয়েছে তাদেরকে তার সামনে পেশ করতে, যাতে তাদের মধ্য থেকে কোন একজনকে সিংহাসনের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন হাফিজ উবায়দীকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে তাকে 'আদিদ লিদীনিল্লাহ' উপাধি প্রদান করা হয়। আদিদ তখন বয়ঃপ্রাপ্তির নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলেন। তাই প্রধানমন্ত্রী সালিহ্ আদিদকে সিংহাসনে বসিয়ে তার সাথে তার কন্যাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দেন।

আদিদ ইব্ন ইউসুফ উবায়দী

আদিদ ছিলেন সালিহের হাতের পুতুল এবং নাম কা ওয়াস্তে বাদশাহ। প্রকৃত বাদশাহী ছিল প্রধানমন্ত্রী সালিহের হাতে। এটা শাহী অমাত্যবর্গের কাছে ছিল খুবই অপছন্দনীয়। আদিদের ছোট ফুফু তার নিহত বোনের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তাকে (সালিহ্কে) হত্যা করার পরিকল্পনা নেন। তিনি সোভানিয়ার অধিনায়কদেরকে সালিহ্কে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করেন। জনৈক অধিনায়ক সুযোগ পেয়ে সালিহকে বর্শা দ্বারা আঘাত করে। তিনি আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তারপর কোনমতে নিজের ঘরে পৌঁছে কিছুক্ষণ পর

মারা যান। তিনি মৃত্যুর পূর্বে আদিদ উবায়দীকে ওসীয়ত করে যান, যেন তিনি তার পরে তার পুত্র যুরায়রকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। আদিদ সে ওসীয়ত অনুযায়ী সালিহের পুত্রকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে তাকে 'আদিল' উপাধি দেন। আদিল প্রধানমন্ত্রী হয়ে আদিদের অনুমতি ক্রমে তার পিতৃ হত্যার বদলা স্বরূপ প্রথমে আদিদের ফুফু ও সুদানী অধিনায়ককে হত্যা করেন। তারপর শাসন পরিচালনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি সায়ীদ নামক স্থানের শাসনকর্তা শাবির সা'দীকে অপসারিত করে তার স্থলে আমীর ইব্‌ন রুকআকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। শাবির এই সংবাদ শুনে মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং অনতিবিলম্বে সেনাবাহিনী নিয়ে কায়রোয় এসে উপস্থিত হন। আদিল শাবিরের মুকাবিলায় টিকতে না পেরে কায়রো থেকে পলায়ন করেন। ৫৫৮ হিজরীতে (১১৬৩ খ্রি) শাবির বিজয়ী বেশে কায়রোয় প্রবেশ করেন। যুরায়ক আদিল বন্দী হয়ে আসেন এবং এক বছর মন্ত্রীত্বের পর নিহত হন। এবার শাবির প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আদিদও সন্তুষ্টচিত্তে তাকে সে পদে বরণ করে নেন। নয় মাস পর দিরগাম নামক রাজপ্রাসাদের জনৈক দারোগা ক্ষমতা অর্জন করে শাবিরকে কায়রো থেকে বের করে দেন এবং নিজেই মন্ত্রীপদ দখল করে নেন। শাবির মিসর থেকে বের হয়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হন। দিরগাম, শাবিরের পুত্র আলীকে, যিনি কায়রোয় অবস্থান করছিলেন, বন্দী করে এনে হত্যা করেন। এছাড়াও এমন অনেক আমীর-উমারাকে তিনি হত্যা করেন যাদের পক্ষ থেকে কোনরূপ বিদ্রোহ বা বিরোধিতার আশংকা ছিল।

সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ যঙ্গীর মিসরের প্রতি মনোনিবেশ

শাবর সিরিয়ায় গিয়ে 'মালিকে আদিল' নূরুদ্দীন মাহমূদ যঙ্গীর দরবারে হাযির হন। তিনি তার কাছে মিসরের সামগ্রিক অবস্থা বর্ণনা করে তার সাহায্য কামনা করেন এবং এই প্রতিশ্রুতিও দেন যে, যদি তাকে মিসরের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে পুনরায় বহাল করে দেওয়া হয় তাহলে তিনি সেনাবাহিনীর অধিনায়কদেরকে জায়গীর প্রদান ছাড়াও মিসরের একটি অংশের উপর নুরিয়া সাম্রাজ্যের দখল প্রতিষ্ঠা করে দেবেন। সুলতান নূরুদ্দীন অনেক চিন্তাভাবনার পর তার সেনাপতি আসাদুদ্দীন শেরকূহকে ৫৫৯ হিজরীর জমাদিউস সানী (১১৬৪ খ্রি মে) মাসে শাবিরের সাথে একটি বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেন। আসাদুদ্দীনকে নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তিনি মিসরে পৌঁছে দিরগামকে পদচ্যুত করে প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল করেন এবং যে একাজে বাধা দেবে তার সাথে যেন যুদ্ধ করেন। শাবির ও শেরকূহকে মিসর অভিমুখে প্রেরণ করে সুলতান নূরুদ্দীন খ্রিস্টানদের মুকাবিলা করার জন্য স্বয়ং সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন, যাতে করে খ্রিস্টানরা তাদের সীমান্তের নিকটে শেরকূহের বাহিনীর উপর হামলা করে না বসে। শেরকূহ ও শাবির বালবীস পর্যন্ত এগিয়ে যান। সেখানে দিরগামের ভাই নাসিরুদ্দীন ও ফখরুদ্দীন মিসরী তাদের উপর হামলা চালান। শেরকূহ উভয়কে পরাজিত ও বন্দী করে এবং বিজয়ী বেশে কায়রোয় প্রবেশ করেন। দিরগাম মন্ত্রীত্ব ছেড়ে পলায়ন করেন, কিন্তু পথিমধ্যে বন্দী হয়ে নিহত হন। এভাবে নাসিরুদ্দীন ও ফখরুদ্দীনকেও হত্যা করা হয়।

শাবির পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি শেরকূহের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। অতএব শেরকূহ বাধ্য হয়ে মিসর থেকে সিরিয়ায় ফিরে যান। তারপর শাবির সুলতান নূরুদ্দীনকে তার এই বিরাট উপকারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন তো দূরের কথা, উল্টো তার সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য খ্রিস্টানদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই অবস্থা লক্ষ্য করে শেরকূহ সুলতান নূরুদ্দীনের অনুমতি নিয়ে ৫৬২ হিজরীতে (১১৬৬-৬৭ খ্রি) মিসরের উপর আকমণ পরিচালনা করেন। ঐ সময়ে মিসর আক্রমণ করা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা পথিমধ্যে খ্রিস্টান অধিকৃত অঞ্চলসমূহ অতিক্রম করে যেতে হতো। এতদসত্ত্বেও শেরকূহ অত্যন্ত কৌশলের সাথে তাঁর সেনাবাহিনীকে নিয়ে মিসরে গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখানকার বেশ কয়েকটি শহর দখল করে নেন।

খ্রিস্টানদের কাছে মিসরীয়দের সাহায্য প্রার্থনা

শাবির সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টানদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। খ্রিস্টানরা তো এ ধরনের সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে শাবিরের সাহায্যার্থে সেখানে সেনাবাহিনী নিয়ে হাযির হয়। খ্রিস্টান এবং শাবিরের সম্মিলিত বাহিনীর সামনে শেরকূহ বাহিনীকে নিতান্ত দুর্বল ও অসহায় মনে হচ্ছিল। কেননা সে বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল দুই হাজারের চাইতেও কম। কিন্তু শেরকূহ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে উভয় বাহিনীর উপর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদেরকে পরাজিত করে পলায়নে বাধ্য করেন। মিসরে পূর্ব থেকেই শেরকূহের ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল। তিনি তার দখলীকৃত অঞ্চলসমূহের প্রশাসন ব্যবস্থা সংগঠিত করে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হন। আলেকজান্দ্রিয়াবাসী সঙ্গে সঙ্গে তাদের শহর শেরকূহের হাতে সমর্পণ করে। শেরকূহ তার ভাতিজা সালাহুদ্দীন ইব্‌ন নাজমুদ্দীন আইয়ুবকে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং নিজে সাঈদের দিকে অগ্রসর হন। পরাজিত ঐ মিসরীয় বাহিনী কায়রোয় একত্রিত হচ্ছিল। শেরকূহ আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সাঈদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছেন শুনেই মিসরীয় বাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নেয় এবং কায়রো থেকে যাত্রা করে। শেরকূহ যখন জানতে পারেন যে, মিসরীয় বাহিনী এবং খ্রিস্টান বাহিনী সম্মিলিতভাবে আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করেছে তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার ভাতিজা সালাহুদ্দীনের সাহায্যার্থে আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে ফিরে আসেন। ঐ সময়ে শাবির একটি বিশেষ ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করে শেরকূহের বাহিনীর কিছুসংখ্যক সেনা অধিনায়ককে নিজের পক্ষে টেনে নিয়েছিলেন। ফলে ঐ অধিনায়করা যুদ্ধ চলাকালে ঔদার্য প্রদর্শন করতে থাকে। শেরকূহ এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি বুঝতে পারেন। এদিকে শাবিরের পক্ষ থেকে শেরকূহের কাছে এই মর্মে একটি পয়গাম এসে পৌঁছে যে, তুমি আমাদের কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ নগদ বুঝে নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া ছেড়ে চলে যাও। পূর্বাপর পরিস্থিতি বিবেচনা করার পর শেরকূহ শাবিরের ঐ আবেদন মঞ্জুর করাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। অতএব তিনি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করে আলেকজান্দ্রিয়া ছেড়ে সিরিয়ায় ফিরে যান।

অদূরদর্শিতার পরিণাম

খ্রিস্টানদেরকে মিসরে ডেকে এনে শাবির যে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল তার অত্যন্ত খারাপ পরিণাম দেখা দেয়। এ ঘটনা ঘটেছিল ৫৬২ হিজরীর যিলকাদ (১১৬৬ খ্রি আগস্ট) মাসে। শেরকূহ ফিরে যাবার পর খ্রিস্টান বাহিনীর মিসরে স্থায়ী অবস্থান গ্রহণের এবং তাদের দ্বারা মিসর দখলের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তারা শাবিরের কাছে নিম্নলিখিত শর্তগুলো পেশ করে এবং শাবির ও সুলতান আবিদ্ উবায়দীকে তা বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়। শর্তগুলো হলো ঃ

১. খ্রিস্টান বাহিনী কায়রোয় অবস্থান করবে।

২. খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে একজন ব্যবস্থাপক কায়রোয় থাকবেন।

৩. নগর প্রাচীরের দ্বারসমূহ খ্রিস্টানদের দখলে থাকবে এবং

৪. মিসর সরকার বায়তুল মুকাদ্দাসের খ্রিস্টান বাদশাহকে প্রতি বছর এক লক্ষ দীনার প্রদান করবেন।

এভাবে খ্রিস্টানরা নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নেওয়ার পর মিসর সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। তারা বালবীসকে খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তারপর তারা রাজধানী কায়রো দখলের প্রস্তুতি নেয়। তারা শাবিরকে নিজেদের পক্ষে টেনে নিয়ে বিরাট সংখ্যক খ্রিস্টান সৈন্য তলব করে। তারা এক লক্ষ দীনারের পরিবর্তে দুলক্ষ দীনার এবং সেই সাথে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য দাবি করে। মিসরের বাদশাহ আদিদ উবায়দী এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন।

আদিদ কর্তৃক সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা

আদিদ সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের কাছে একজন দূত পাঠান এবং নিবেদন করেন ঃ যে সমস্ত খ্রিস্টান মিসরের উপর চেপে বসেছে তাদেরকে বিতাড়নের জন্য আপনার সাহায্য কামনা করি। আপনি অনতিবিলম্বে সৈন্য প্রেরণ করুন। শাবির যখন জানতে পারলেন যে, আদিদ সুলতান নূরুদ্দীনের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন তখন তিনি আদিদকে নানাভাবে বুঝিয়ে উক্ত সংকল্প থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তিনি আদিদকে বলেন, তুর্কীদের চাইতে খ্রিস্টানদেরই করদাতা হওয়া ভাল। কিন্তু আদিদ তার ঐ সব কথার কোন উত্তর দেন নি। সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ তার সেনাপতি শেরকূহকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন এবং তার সাথে তার ভাতিজা সালাহুদ্দীন এবং অন্যান্য অধিনায়ককেও মিসর অভিমুখে প্রেরণ করেন। আসাদুদ্দীন শেরকূহ তার সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তিনি খ্রিস্টানদের সামরিক ছাউনি লুট করেন এবং অনেক মাল-আসবাব নিয়ে বাদশাহ আদিদের দরবারে হাযির হন। আদিদ শেরকূহকে জোড়া উপহার দেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে গ্রহণ করেন। তিনি শেরকূহ ও তাঁর বাহিনীকে বিশেষ মেহমান হিসাবে আপ্যায়িত করতে থাকেন। একদা সুযোগ বুঝে তিনি শেরকূহকে বলেন, শাবির হচ্ছে খ্রিস্টানদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আমাদের শত্রু। তুমি ওকে হত্যা করে ফেল। শাবিরকে হত্যা করার জন্য শেরকূহ তাদের অধিনায়কদেরকে নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে শাবিরের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তা

আদিদের খিদমতে হাযির করা হয়। এবার আদিদ শেরকূহকে তার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং তাকে 'আমীরুল জুয়ূশ' ও 'মানসূর' উপাধি দেন। সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের সাথেও শেরকূহের সম্পর্ক যথারীতি অব্যাহত থাকে এবং তিনি সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের অনুমতি নিয়েই মিসরে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এর কয়েক মাস পর ৫৬৫ হিজরীতে (১১৬৯-৭০ খ্রি) শেরকূহ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মিসরের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সালাহুদ্দীন আইয়ূবী

আদিদ তার ভাতিজা সালাহুদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। সালাহুদ্দীনও নূরুদ্দীন মাহমূদের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক সর্বদা বহাল রাখেন। শেরকূহের মন্ত্রীত্বের প্রতি আদিদ অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং যাবতীয় ক্ষমতা তাঁর হাতে অর্পণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে সালাহুদ্দীনও সর্বপ্রকার প্রশাসনিক অধিকার লাভ করেছিলেন। শেরকূহ এবং সালাহুদ্দীন উভয়েই ইমাম শাফিঈ (র)-এর খাঁটি ভক্ত ছিলেন। সালাহুদ্দীন আইয়ূব শীআপন্থী কাযীদেরকে অপসারিত করে শাফিঈ পন্থী কাযী নিয়োগ করেন। তিনি মাদরাসা-ই-শাফিঈ ও মাদরাসা-ই-মালিকী এর ভিত্তি স্থাপন করেন। ৫৬৫ হিজরীতে (১১৬৯-৭০ খ্রি) যখন শেরকূহ খ্রিস্টান বাহিনীকে মিসর থেকে বের করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার দাযিত্ব গ্রহণ করেন তখন খ্রিস্টানরা ঐ কর থেকে বঞ্চিত হয়, যা তারা এতদিন যাবত মিসর থেকে পাচ্ছিল। খ্রিস্টানদের মনে এই চিন্তারও উদয় হয় যে, দামেশক ও কায়রোর ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যখন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখন বায়তুল মুকাদ্দাসকেও খ্রিস্টানদের দখলে রাখা কঠিন হবে। এই সব ভেবেচিন্তে সারা সিসিলী ও স্পেনের পাদ্রীদের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠায় যে, বায়তুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা এবং এখানে খ্রিস্টান সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য জরুরী সাহায্যের প্রয়োজন। এই পয়গাম পেয়ে ঐ সমস্ত দেশের পাদ্রীরা ধর্মীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করে। ফলে স্পেন ও অন্যান্য দেশ থেকে খ্রিস্টানরা দলে দলে এসে সিরিয়া উপকূলে অবতরণ করতে থাকে। খ্রিস্টানরা ইউরোপ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য পেয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ৫৬৫ সনে (১১৬৯-৭০ খ্রি) দিমইয়াত অবরোধ করে ফেলে। দিমইয়াতের কর্মকর্তা শামসুল খাওয়াস মানকূর সালাহুদ্দীন আইয়ূবীকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। এদিকে মিসরের শীআপন্থীরা প্রধানমন্ত্রী সালাহুদ্দীন আইয়ূবের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। সালাহুদ্দীন বাহাউদ্দীন কারাকূশ নামক জনৈক অধিনায়ককে এক বাহিনী দিয়ে দিমইয়াতের দিকে প্রেরণ করেন এবং সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদকে লিখেন– আমি শীআ ও সুদানীদের কারণে মিসর ছাড়তে পারছি না। তাই নিজে দিমইয়াতের দিকে যেতে পারলাম না। আপনি দিমইয়াতের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ সঙ্গে সঙ্গে দিমইয়াতের দিকে সামান্য সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন এবং খ্রিস্টানদেরকে দুর্বল ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য সিরিয়া উপকূলের খ্রিস্টান এলাকাসমূহের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে শুরু করেন। ফলে খ্রিস্টান যোদ্ধারা ৫০ দিন অবরোধ করে রাখার পর যখন দিমইয়াত ছেড়ে নিজ নিজ শহরের দিকে ফিরে আসে তখন দেখতে পায় যে, সুলতান নূরুদ্দীনের আক্রমণের ফলে তাদের ঘর-বাড়ি একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তারপর সুলতান সালাহুদ্দীন তার

ভাই নাজমুদ্দীন আইয়ূবকে সিরিয়া থেকে মিসরে ডেকে পাঠান। স্বয়ং বাদশাহ আদিদ নাজমুদ্দীন আইয়ূবের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন এবং তার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। বাদশাহ্ আদিদ সর্বদা সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবের কাজকর্মের প্রশংসা করতেন। উপরন্তু তিনি নিজেকে শাসন পরিচালনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন বলা চলে। মিসরের শীআদের কাছে সালাহুদ্দীনের এই সম্মান, প্রতিপত্তি ও সীমাহীন ক্ষমতা খুবই অপছন্দনীয় ঠেকত। তাছাড়া সালাহুদ্দীনের কারণে মিসরে দিনের পর দিন শীআ মাযহাবের অবনতি ও সুন্নী মাযহাবের উন্নতি হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সালাহ্দ্দীন বিদ্বেষী অধিনায়ক, সভাসদ ও প্রাসাদ কর্মকর্তারা একজোট হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং তারা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মিসরকে খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং খ্রিস্টান রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠিয়ে বাদশাহ আদিদের সাথে তার গোপন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হবে। যাহোক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা একদিকে আদিদকে স্বমতে আনার চেষ্টা করে এবং অন্যদিকে খ্রিস্টানদের সাথে পত্রালাপ করে তাদের রাষ্ট্রদূতকে গোপনে ডেকে পাঠায়। ঘটনাচক্রে তাদের একটি পত্র, যা গোপনে খ্রিস্টান সম্রাটের কাছে পাঠানো হচ্ছিল, পথিমধ্যে ধরা পড়ে এবং তা সালাহুদ্দীনের সামনে পেশ করা হয়। সালাহুদ্দীন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অপরাধীদের নামধাম সংগ্রহ করেন এবং তাদের সকলকে গ্রেফতার করে প্রকাশ্য আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। সাক্ষ্য-প্রমাণে যখন তারা অপরাধী সাব্যস্ত হয় তখন তাদেরকে প্রাণদণ্ড প্রদান করা হয়। তারপর সালাহুদ্দীন বাহাউদ্দীন কাররাশকে রাজ-প্রাসাদের দারোগা নিয়োগ করেন।

সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ প্রথম থেকেই সালাহুদ্দীন আইয়ূবকে লিখে আসছিলেন ঃ তুমি মিসরে বাগদাদের খলীফার নামে খুতবা পাঠের ব্যবস্থা কর। কিন্তু সালাহুদ্দীন এই ওযর পেশ করে তা থেকে বিরত ছিলেন যে, যদি আদিদ উবায়দীর নাম খুতবা থেকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে মিসরে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিতে পারে। সালাহুদ্দীনের ঐ আশংকা অমূলক ছিল না। কেননা মিসরে বিরাট সংখ্যক সুদানী লোক ছিল, যারা সব সময় তুর্কীদের বিরুদ্ধে এবং শীআদের পক্ষে থাকতো। উপরে উল্লিখিত ষড়যন্ত্রকারীদেরকে যখন সালাহুদ্দীন হত্যা করেন তখন এই সুদানীরা, যারা সংখ্যায় ছিল ৫০ হাজার, সালাহুদ্দীন এবং তুর্কী বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। রাজকীয় অফিস ও প্রধানমন্ত্রীর অফিসকে কেন্দ্র করে তুর্কী ও সুদানীদের মধ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এতে তুর্কীরা জয়লাভ করে। সালাহুদ্দীন সুদানীদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। এতে তাদের প্রাণ রক্ষা পায় বটে, তবে ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। যাহোক সুলতান নূরুদ্দীন পুনরায় সালাহুদ্দীনকে লিখেন ঃ তুমি আদিদের নাম স্থগিত রেখে আব্বাসীয় খলীফা মুসতাযীর নামে খুতবা পাঠের ব্যবস্থা কর। এটা ছিল সেই সময়, যখন বাদশাহ আদিদ মরণ-ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। যাহোক উপরোক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে ৫৬৭ হিজরী সনের মুহাররম (১১৭১ খ্রি সেপ্টেম্বর) মাসে কায়রোর জামে মসজিদের মিম্বরে প্রথম বারের মত আব্বাসীয় খলীফার নামে খুতবা পাঠ করা হয় এবং কেউই তা অপছন্দ করেনি। পরবর্তী জুমআ থেকে সালাহুদ্দীনের মৌখিক নির্দেশে মিসরের সকল মসজিদেই বাগদাদের খলীফার নামে খুতবা পাঠ হতে থাকে।

আদিদের মৃত্যু

ঐ সময়ে অর্থাৎ ৫৬৭ হিজরীর ১০ই মুহাররম (১১৭১ খ্রি ১৩ সেপ্টেম্বর) আদিদ উবায়দী ইনতিকাল করেন। এই উপলক্ষে সালাহুদ্দীন শোকসভার আয়োজন করেন এবং সুলতানী প্রাসাদে কি কি মাল-আসবাব রয়েছে তার একটা হিসাব নেন। আদিদের মৃত্যুর সাথে সাথে উবায়দী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং মিসর পুনরায় বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাগদাদের খলীফার পক্ষ থেকে সালাহুদ্দীন আইয়ূব মিসরের সুলতানী সনদ, জোড়া উপহার ও পতাকা লাভ করেন। ফলে মিসরে উবায়দী শাসনের পরিবর্তে আইয়ূবী শাসনের সূচনা হয়।

একনজরে উবায়দী শাসনামল

উবায়দী শাসন দু'শ সত্তর বছর পর্যন্ত টিকেছিল। এর সূচনা হয় আফ্রিকায় তথা আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলে, তারপর মিসরে। উবায়দীরা মিসর জয় করার পর কায়রোকে তাদের রাজধানীতে রূপান্তর করে। মরক্কোর ইদরীসী সালতানাতকেও সাধারণভাবে আলাভী ও শীআদের সালতানাত মনে করা হয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে ইদরীসী সালতানাত বংশগত দিক দিয়ে বার্বারী ছিল বলে সেটা আধা শীআ বা শুধু নামেমাত্র শীআ সালতানাত ছিল। ইদরীসীদের আমল-আখলাক ও ইবাদত-আকায়িদের মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না যেটাকে সুন্নীদের চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ইদরীসীদের সাথে সুন্নীদের না কোন শত্রুতা ছিল, আর না ছিল তাদের আকায়িদ ও ইবাদতের মধ্যে কোন পার্থক্য। ইদরীসী সালতানাতের সূচনা হয় প্রথম ইদরীস থেকে, যিনি আহলে বায়ত-প্রীতির বিখ্যাত হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে জনসাধারণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন। তারপর ইদরীসীদের মধ্যে আর কোন শীআ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়নি। তবে উবায়দী হুকুমত অবশ্যই শীআপন্থী হুকুমত ছিল। কিন্তু বংশগত দিক দিয়ে সেটা আলাভী হুকুমত কখনো ছিল না।

সুয়ূতী প্রণীত 'তারীখুল খুলাফা'-এর বর্ণনা অনুযায়ী উবায়দুল্লাহর দাদা ধর্মগত দিক দিয়ে মাজুসী (অগ্নি উপাসক) এবং পেশাগত দিক দিয়ে কর্মকার ও তীর প্রস্তুতকারক ছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী পশ্চিম দেশে গিয়ে নিজেকে ফাতিমী বলে দাবি করেন। কিন্তু বংশ তালিকা বিশেষজ্ঞরা তার এই দাবিকে মেনে নিতে পারেন নি। একদা আযীয উবায়দী স্পেনের উমাইয়া খলীফার নামে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে বনূ উমাইয়াকে বিশ্রী গালিগালাজ করা হয়েছিল। উমাইয়া খলীফা এর উত্তরে আযীয উবায়দীকে লিখেন, আমাদের বংশ তালিকা যেহেতু তোমার জানা ছিল তাই তুমি আমাদের বংশের নাম ধরে গালিগালাজ করতে পেরেছ। তোমার বংশ তালিকা যদি আমাদের জানা থাকত তা হলে আমরাও তোমার মত তোমাদের পূর্ব পুরুষদের নাম ধরে গালিগালাজ করতে পারতাম। আযীযের কাছে উমাইয়া খলীফার এই উক্তি খুবই অপমানকর ঠেকে। কিন্তু এর কোন উত্তর তিনি দিতে পারেন নি। উবায়দীদেরকে সাধারণভাবে ফাতিমী নামে স্মরণ করা হয়।

উবায়দীরা সাধারণভাবে ইসমাঈলী শীআ ছিল। ওদেরকে বাতিনীও বলা হয়ে থাকে। তাদেরই একটি শাখা ছিল পারস্যের ঐ সালতানাত যা হাসান ইব্ন সাব্বাহ্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐ হুকুমতের রাজধানী ছিল 'আলামূত দুর্গ'। ওটাকে ফিদায়ীদের হুকুমতও বলা হয়ে থাকে। ফিদায়ীরাও আলাভী ছিল না।

উবায়দীদের রাষ্ট্রে হাজার হাজার পুণ্যবান ও ধর্মপ্রাণ লোক শুধু এজন্য নিহত হন যে, তারা সাহাবা কিরামকে মন্দ বলতেন না। উবায়দীদের দ্বারা ইসলামের কোন উপকার হয় নি। সামরিক, জ্ঞানগত এবং চারিত্রিক দিক দিয়ে তাদের এমন কোন কীর্তি নেই, যার উপর গর্ববোধ করা যেতে পারে। কোন কোন আলীম উবায়দীদেরকে ইসলাম বহির্ভূত ও মুরতাদ আখ্যা দিয়েছেন। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আযীয উবায়দী নিজেকে 'আলিমুল গায়ব' (অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা) বলে দাবি করতেন। আর উবায়দী মাত্রই মনে করত যে, মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে বৈধ। উবায়দী সাম্রাজ্যের এ ধরনের আরো কিছু ইতিকাদ-বিশ্বাস ও কার্যকলাপের অস্তিত্ব ছিল, যার কারণে উলামা সমাজ তাদেরকে 'ইসলামের কলংক' বলে মনে করেন। উবায়দী সালতানাত সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করা হলো। এবার আমরা কারামতীয় এবং তাদের হুকুমত সম্পর্কে আলোচনা করব।

চতুর্দশ অধ্যায়

বাহরাইনের কারামতীয় সম্প্রদায়

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ফারজ কারমাত

বাহরাইন একটি ক্ষুদ্র দেশ। এর পূর্বে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে উমান, পশ্চিমে ইয়ামামা এবং উত্তরে বসরা অবস্থিত। এই দেশ বাহরাইন নামে পরিচিত। এই দেশে হিজর নামক আর একটি শহর আছে। এ কারণে বাহরাইনকে কখনো কখনো হিজর নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই দেশে হাফীর নামক তৃতীয় আর একটি শহর ছিল, সেটাকে কারামতীয়রা ধ্বংস করে তার স্থলে ইহসা নামক শহর গড়ে তুলেছে। তাই এই দেশকে ইহসাও বলা হয়ে থাকে। ইহসা শহরই ছিল কারামতীয়দের কেন্দ্র ও উৎস স্থল। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে কারামতীয়দের সম্পর্কে মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হয়েছে। একই সময়ে উবায়দী ও কারামতীয়দের আবির্ভাব হয়েছিল। এরা উভয়েই ছিল ইসমাঈলী শীআ এবং একই আকীদা আমলের অনুসারী। ২৭৫ হিজরীতে (৮৮৮-৮৯ খ্রি) কূফা এলাকায় ইয়াহইয়া ইব্‌ন ফারজ নামক জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তিনি বলতেন যে, তার নাম কারমাত এবং তিনি প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীর দূত। তিনি তার অধিকাংশ সময় ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাতেন এবং পার্থিব আয়েশ-আরাম থেকে দূরে থাকতেন। ফলে তার প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। তিনি তার প্রত্যেক মুরীদ এবং ভক্তের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দীর জন্য এক দীনার করে চাঁদা আদায় করতেন। যখন তার শিষ্যদের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন তিনি তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন, যাতে তারা জনসাধারণকে তার দিকে প্রলুব্ধ করে। কূফার গভর্নর একথা জানতে পেরে কারমাতকে বন্দী করে রাখেন। কিন্তু কিছুদিন পর কারারক্ষীদের অন্যমনষ্কতার সুযোগ নিয়ে কারমাত জেলখানা থেকে পালিয়ে যান। তখন কেউ জানতে পারেনি তিনি কোথায় গেছেন বা তার কি হয়েছে? এভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর তার মুরীদ এবং শিষ্যরা তার প্রতি আরো বেশি ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তিনি অবশ্যই ইমাম মাহ্‌দীর দূত।

কারমাত তার অনুসারীদেরকে যে সমস্ত আকীদা ও আমলের শিক্ষা দিতেন তা ছিল বিস্ময়কর এবং অভিনব। তার নামাযও ছিল অন্য রকমের। তিনি রমযান মাসে নয় বরং কয়েকটি বিশেষ মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে রোযা পালন করতেন। তিনি মদ্যপানকে হালাল এবং নিদ্রাকে হারাম বলতেন। তার মতে 'জানাবত' (স্ত্রী সহবাস)-এর গোসলের জন্য ওযূই যথেষ্ট ছিল। লেজওয়ালা ও পাঁচ আংগুল বিশিষ্ট জন্তুকে তিনি হারাম বলে মনে করতেন।

কিছুদিন পর ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফারজ অর্থাৎ কারমাত পুনরায় আবির্ভূত হন এবং নিজেকে 'কায়িম বিলহাক' উপাধিতে ভূষিত করে জনসাধারণকে পুনরায় নিজের আশেপাশে জড়ো করতে থাকেন। তখন কূফার শাসনকর্তা আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ তায়ীর অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য তার উপর আক্রমণ চালায় এবং তার সঙ্গী-সাথী ও অনুসারীদের একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। তারপর কিছু কিছু আরব গোত্র তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং একজোট হয়ে ২৯০ হিজরীতে (৯০৩ খ্রি) দামেশকের শাসনকর্তা বলখ বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর ইয়াহ্ইয়াকে হত্যা এবং তার দলকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেন।

হুসাইন মাহ্দী

ইয়াহ্ইয়ার পর তার ভাই হুসাইন, 'মাহ্দী আমীরুল মু'মিনীন' উপাধি গ্রহণ করে জনসাধারণকে সংগঠিত করতে থাকেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি বেদুঈন আরবদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন এবং দামেশক ও সিরিয়া অঞ্চলে ব্যাপকভাবে লুটপাট চালান। শেষ পর্যন্ত তাকে দমন করার জন্য আব্বাসীয় খিলাফতের অধিনায়কদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়। উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে এবং এতে স্বয়ং 'মাহ্দী আমীরুল মু'মিনীন' বন্দী হয়ে নিহত হন। অবশ্য তার পুত্র আবুল কাসিম কোন মতে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। এটা হচ্ছে ২৯১ হিজরী (৯০৩-৪ খ্রি) সনের ঘটনা। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেদুঈনদের একটি বাহিনী গঠন করে তাবারিয়ায় লুটপাট শুরু করে দেন। যখন তাকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয় তখন তিনি ইয়ামানের দিকে পালিয়ে যান এবং ইয়ামানের একটি এলাকা দখল করে নেন। তারপর তিনি সানআ শহরে লুটপাট চালান। আবূ গালিব নামক জনৈক কারামতীয় তাবারিয়ার আশেপাশেও লুটপাট শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত ২৯৩ হিজরীতে (৯০৫-৬ খ্রি) আবূ গালিবও নিহত হন। এদিকে ইয়ামান, হিজায এবং সিরিয়ায়ও কারামতীয়রা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে রেখেছিল।

দ্বিতীয় ইয়াহ্ইয়া

যখন কারমত তথা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফারজ জেলখানা থেকে অদৃশ্য হয়ে যান তখন ইয়াহ্ইয়া নামেরই অন্য এক ব্যক্তি বাহরাইন শহরের নিকটবর্তী কাতীফ নামক স্থানে আবির্ভূত হয়ে ২৮১ হিজরীতে (৮৯৪ খ্রি) নিজেকে প্রতিশ্রুত 'ইমাম মাহ্দীর দূত' বলে দাবি করেন। তিনি এও দাবি করেন যে, ইমাম মাহ্দী শীঘ্রই আবির্ভূত হবেন এবং আমি তাঁর একটি পত্র নিয়ে এসেছি। এ কথা শুনে 'খালী' শীআপন্থী আলী ইব্ন মুআল্লা ইব্ন হামদান কাতীফের সকল শীআকে একত্র করে ইমাম মাহ্দীর ঐ চিঠি পড়ে শুনান যা ইয়াহ্ইয়ার কাছে ছিল। এটা শুনে শীআরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় এবং বাহরাইনের আশেপাশে এ খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এবার জনসাধারণ ইমাম মাহ্দীর পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। আবূ সাঈদ হাসান ইব্ন বাহরাম জানাবীও এতে অংশগ্রহণ করেন। আবূ সাঈদ ছিলেন একজন অতি সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। কিছুদিন পর ইয়াহ্ইয়া অদৃশ্য হয়ে যান এবং মাহ্দীর অপর একটি পত্র নিয়ে আসেন। এই পত্রে জনসাধারণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যেন তারা প্রত্যেকে ইয়াহ্ইয়াকে ছত্রিশ দীনার করে চাঁদা প্রদান করে। সকলেই

সন্তুষ্টচিত্তে এই নির্দেশ মেনে নেয়। ইয়াহ্ইয়া এই অর্থ আদায় করে পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যান এবং কিছু দিন পর আর একটি পত্র নিয়ে ফিরে আসেন। এই তৃতীয় পত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি যুগের ইমামের জন্য নিজ নিজ সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ ইয়াহ্ইয়ার কাছে সমর্পণ করে। জনসাধারণ এই নির্দেশও সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়।

আবূ সাঈদ জানাবী

আবূ সাঈদ জানাবী ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি বাহরাইন শহরে গিয়েও তাবলীগ ও প্রচারের কাজ শুরু করেন। তার কথায় প্রভাবিত হয়ে জনসাধারণ যুগের ইমামের প্রতীক্ষায় দিন গুণতে থাকে। ধীরে ধীরে বিপুল সংখ্যক আরব বেদুঈন আবূ সাঈদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঐসব কারামতীয়, যারা ইয়াহ্ইয়া কারামতীর দলের সাথে সম্পর্ক রাখত তারাও ইয়াহ্ইয়ার চারপাশে জড়ো হতে থাকে। আবূ সাঈদ এই সমস্ত লোককে নিয়ে একটি নিয়মিত বাহিনী গঠন করেন এবং বাহিনী নিয়ে কাতীফ থেকে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হন। বসরার শাসনকর্তা আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়ার এই সমস্ত প্রস্তুতির সংবাদ শুনে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং এ সম্পর্কে দরবারে খিলাফতকে অবহিত করেন। দরবারে খিলাফতের পক্ষ থেকে ফারিসের শাসনকর্তা আব্বাস ইব্ন উমর গানাবীকে নির্দেশ দেওয়া হয়– তুমি বসরাকে রক্ষা কর। আব্বাস ইব্ন গানাবী অবিলম্বে দু'হাজার অশ্বারোহী নিয়ে রওয়ানা হন। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে আবূ সাঈদ আব্বাসকে বন্দী করেন এবং তার সেনাছাউনিও লুণ্ঠন করেন। কিছু দিন পর আব্বাসকে মুক্ত করে দেওয়া হয় সত্য, কিন্তু তার যে সব সঙ্গী-সাথী বন্দী হয়েছিল তাদের সকলকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই সাফল্য আবূ সাঈদকে অত্যন্ত সাহসী করে তুলে। তিনি এবার হিজর আক্রমণ করে বসেন এবং তা জয় করে সেখানে নিজের একটি স্বাধীন হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। আবূ সাঈদ এবং তার দলের আকীদা-বিশ্বাস ছিল কারমাত ইয়াহ্ইয়ার অনুরূপ। তাই এরাও কারামতীয় নামে অভিহিত হয়ে থাকে। আবূ সাঈদ তার হুকুমতের ভিত্তি স্থাপন করে তার পুত্র সাঈদকে 'অলীআহদ' নিয়োগ করেন। এ বিষয়টি আবূ সাঈদের ছোট ভাই আবূ তাহির সুলায়মানের কাছে খুবই অপছন্দনীয় ঠেকে। তাই তিনি আবূ সাঈদকে হত্যা করে স্বয়ং কারামতীয়দের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হন।

আবূ তাহির

আবূ তাহির শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার পর ২৮৭ হিজরীতে (৯০০ খ্রি) বসরা আক্রমণ করেন এবং সেখানে প্রচুর ধন-সম্পদ লুটে নিয়ে বাহরাইনে ফিরে আসেন। বাগদাদের খলীফা মুকতাদির এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি বসরার নগর প্রাচীর মজবুত ও সুদৃঢ় করার নির্দেশ দেন। আবূ তাহির বেশ সাফল্যের সাথে বাহরাইন এলাকা শাসন করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর সাথেও চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেন। উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী আবূ তাহিরের হুকুমতকে সম্মতিসূচক দৃষ্টিতেই দেখেন। ৩১১ হিজরীতে (৯২৩-২৪ খ্রি) আবূ তাহির পুনরায় বসরার উপর আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার হাট-বাজার লুট করে সমগ্র শহরকে একেবারে লণ্ড-ভণ্ড করে দেন। এমন কি বসরার জামে মসজিদও তার এই ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পায়নি।

আবূ তাহিরের দস্যুবৃত্তি

৩১২ হিজরী (৯২৪-২৫ খ্রি) সনে আবূ তাহির হাজীদের কাফিলা লুণ্ঠন করার জন্য বহির্গত হন। তিনি কাফিলা থেকে রাজকীয় অশ্বারোহী আবুল হায়জা ইব্ন হামদূনকে গ্রেফতার করেন এবং হাজীদের সমগ্র ধন-সম্পদ লুটে নিয়ে হিজরে প্রত্যাবর্তন করেন। ৩১৪ হিজরী (৯২৬-২৭ খ্রি) আবূ তাহির ইরাকের দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং বসরার ন্যায় কূফা অঞ্চলেও হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট চালান। তারপর সেখান থেকে বাহরাইনে গিয়ে ইহসা শহরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি সেখানে তার সঙ্গী-সাথীদের জন্য বিরাট বিরাট মহল ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং ইহসাকে তার রাজধানী বলে ঘোষণা করেন। ৩১৫ হিজরীতে (৯২৭-২৮ খ্রি) আবূ তাহির ওমান আক্রমণ করেন। ওমানের শাসনকর্তা সেখান থেকে পলায়ন করে সমুদ্র পথে ফারিসে চলে যান। এই সুযোগে আবূ তাহির ওমান প্রদেশকে তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ৩১৬ হিজরী (৯২৮ খ্রি) আবূ তাহির উত্তরাঞ্চলে আক্রমণ চালাতে শুরু করেন। এবার খলীফা মুকতাদির আব্বাসী ইউসুফ ইব্ন আবিস সাজকে আযারবায়জান থেকে ডেকে পাঠিয়ে তার হাতে ওয়াসিতের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং আবূ তাহিরের মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন। কূফার বাইরে ইউসুফ ও আবূ তাহিরের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় এবং তাতে ইউসুফ পরাজিত ও বন্দী হন। এই সংবাদ বাগদাদে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। আবূ তাহির কূফা থেকে 'আনবার' অভিমুখে রওয়ানা হন। তাকে প্রতিরোধ করার জন্য দরবারে খিলাফতের পক্ষ থেকে মুনিস খাদিম, মুযাফ্ফর, হারূন প্রমুখ অধিনায়ককে নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু এরা সকলেই আবূ তাহিরের কাছে পরাজিত হয়ে বাগদাদে ফিরে আসেন। এবার আবূ তাহির রাহবা অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি সেখানে ক্রমাগত লুটপাট চালিয়ে তারপর জাযীরা প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং বিজয় লাভের মাধ্যমে সেখানকার বেশির ভাগ গোত্রের উপর বার্ষিক কর নির্ধারণ করে ইহসায় ফিরে যান। তার এই অসাধারণ পরাক্রম লক্ষ্য করে অনেক লোকই কারামতীয় মাযহাব গ্রহণ করে।

পবিত্র মক্কা আক্রমণ

৩১৭ হিজরীতে (৯২৯ খ্রি) আবূ তাহির পবিত্র মক্কা আক্রমণ করেন। তিনি সেখানে বহু সংখ্যক হাজীকে হত্যা করেন,মক্কা শহরে লুটপাট চালান, কা'বা ঘরের দরজার চৌকাঠ উপড়ে ফেলেন, কাবার গিলাফ খুলে তার বাহিনীর মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং 'হাজরে আসওয়াদ' খুলে নিয়ে হিজরে চলে আসেন। আসার সময় তিনি ঘোষণা করেন– পরবর্তী হজ্জ আমার ওখানেই হবে। হাজরে আসওয়াদ ফিরিয়ে দেবার জন্য অনেকেই আবূ তাহিরের সাথে পত্রালাপ করে। কোন কোন সর্দার ওটাকে ফিরিয়ে দেবার বিনিময়ে আবূ তাহিরকে পঞ্চাশ হাজার দীনার প্রদানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু আবূ তাহির তা ফিরিয়ে দেননি। তারপর আবূ তাহির ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে ইরাক ও সিরিয়াকে বার বার পর্যুদস্ত করতে থাকেন– এমনকি দামেশকবাসীদের উপরও তিনি বার্ষিক কর ধার্য করেন।

আবুল মানসূর

তারপর আবূ তাহিরের বড় ভাই আহমদ কারামতীয়দের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করেন। তাকে আবুল মানসূর উপাধিতে স্মরণ করা হয়। কারামতীয়দের একটি দল আবুল মানসূরের

হুকুমতকে অস্বীকার করে আবূ তাহিরের জ্যেষ্ঠপুত্র সাবূরকে তাদের নেতা বলে ঘোষণা করে। এই আভ্যন্তরীণ ঝগড়ার একটি মীমাংসা করার জন্য কারামতীয়রা আবুল কাসিম উবায়দীর শরণাপন্ন হয় এবং তার কাছে আফ্রিকিয়ায় একজন দূত প্রেরণ করে। আবুল কাসিম উবায়দী লিখিতভাবে বিষয়টির মীমাংসা এভাবে করেন যে, আবুল মানসূর আহমদকে আপাতত বাদশাহ বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে। অবশ্য তার পরে সাবূর ইব্ন আবূ তাহির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন। কারামতীয়রা যেহেতু নিজেদেরকে মাহ্দীর দূত ও তার পক্ষাবলম্বী বলত এবং উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীকে, তার দাবি অনুযায়ী ইমাম ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর সাদিকের বংশধর মনে করে অত্যন্ত সম্মান করত তাই উবায়দীরা করামতীয়দেরকে নিজেদের বন্ধু এবং কারামতীয়রা উবায়দীদেরকে খিলাফতের যোগ্য মনে করত। আর এ কারণেই কারামতীয়রা আবুল কাসিমের ফায়সালাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় এবং আহমদ মানসূর সর্বসম্মতিক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর ৩৩৪ হিজরীতে (৯৪৫-৪৬ খ্রি) যখন আবুল কাসিম উবায়দীর মৃত্যু হয় এবং তার স্থলে ইসমাঈল উবায়দী আফ্রিকার সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন আবূ মানসূর আহমদ কারামতী তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আফ্রিকায় একজন দূত প্রেরণ করেন। ৩৩৯ হিজরী (৯৫০-৫১ খ্রি) সনে ইসমাঈল উবায়দী কায়রোয়ান থেকে বার বার আবূ মানসূরকে লিখেন– তুমি হাজরে আসওয়াদটি কা'বায় ফিরিয়ে দাও। এর ফলেই আবূ মানসূর আহমদ কারামতী হাজরে আসওয়াদটি কা'বায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। আবূ মানসূরের শাসনামলে কারামতীয়রা বহির্দেশ আক্রমণ করে খুব কম। ঐ সময় তারা প্রধানত আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত থাকে।

সাবূরকে হত্যা

৩৫৮ হিজরী (৯৬৯ খ্রি) সনে সাবূর ইব্ন আবূ তাহির তার ভাই-বেরাদার ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাহায্য নিয়ে আবূ মানসূরকে বন্দী করে ফেলেন এবং স্বয়ং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু সাবূরের ভাইরা সাবূরেরও বিরোধিতা করে এবং জেলখানার উপর হামলা চালিয়ে চাচাত ভাই আবূ মানসূরকে সেখান থেকে যুক্ত করে পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করে সাবূরকে হত্যা করেন এবং তার শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে আদাল দ্বীপে নির্বাসিত করেন। ৩৫৯ হিজরী (৯৭০ খ্রি) সনে আবূ মানসূরের মৃত্যু হয়। আবূ মানসূরের পর তার পুত্র আবূ আলী হাসান ইব্ন আহমদ 'আযম' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই আবূ তাহিরের সকল পুত্রকেই আদাল দ্বীপে নির্বাসন দেন।

হাসান আযম কারামতী

হাসান আযম কারামতী তার আকাঈদ ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ছিলেন উদার ও মধ্যপন্থী। উবায়দীদের সাথে যেমন তার কোন হৃদ্যতা ছিল না, তেমনি ছিল না খিলাফতে আব্বাসীয়ার সাথে তার কোন শত্রুতা। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ তাহির দামেশকের উপর বার্ষিক কর ধার্য করেছিলেন। অতএব যে ব্যক্তিই দামেশকের শাসক হতো তাকেই ঐ কর কারামতীয় বাদশাহর কাছে প্রেরণ করতে হতো। কেননা কারামতীয়দের লুটপাট, হত্যা ও দস্যুতা থেকে রক্ষা পাওয়ার এটাই ছিল একমাত্র উপায়। আযমের সিংহাসনে আরোহণকালে জা'ফর ইব্ন ফালাহ কাত্তামী তাগাজের কাছ থেকে দামেশক জয় করে সেখানে তার হুকুমত

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আযম দামেশকের শাসকের কাছে যথারীতি কর তলব করেন। যেহেতু তখন পর্যন্ত কারামতীয় ও উবায়দী হুকুমতের মধ্যে ঐক্য ও ভালবাসা ছিল তাই এটাই সমীচীন ছিল যে, দামেশক যখন উবায়দী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে তখন কারামতীয় বাদশাহ উবায়দী সরদার জা'ফর ইব্‌ন ফালাহের কাছ থেকে কর তলব করবেন না। কিন্তু ঘটনা দাঁড়ালো তার ঠিক উল্টো। আযম অত্যন্ত কঠোর ভাষায় কর তলব করলেন এবং জা'ফর ইব্‌ন ফালাহ্ তা প্রদানে অস্বীকার করে বসলেন। ফলে আযম দামেশকের দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন। অপর দিকে মুইয্য উবায়দী, যিনি কায়রোয়ান থেকে কায়রোর দিকে আসছিলেন, এই অবস্থা জানতে পেরে কারামতীয় কর্মকর্তা ও সভাসদদের কাছে চিঠি লিখলেন– তোমরা আযমকে বুঝাও, সে যেন দামেশকের সাথে এরূপ বাড়াবাড়ি না করে। অন্যথায় আমরা আবূ তাহিরের বংশধরকে কারামতীয় সালতানাতের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করে আযমের পদচ্যুতি ঘোষণা করব। আযম যখন এই অবস্থা জানতে পারেন তখন তিনি বিনাদ্বিধায় উবায়দীদের খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং অধিকৃত দেশসমূহে আব্বাসীয় খলীফার খুতবা পাঠ করতে শুরু করেন। প্রথম বাহিনী, যেটাকে দামেশকের দিকে প্রেরণ করেছিলেন, ৩৬০ হিজরী (৯৭০-৭১ খ্রি) সনে জা'ফর কাত্তামীর কাছে পরাজিত হয়। তারপর ৩৬১ হিজরী সনে (৯৭১-৭২ খ্রি) স্বয়ং আযম সেনাবাহিনী নিয়ে দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই জা'ফর কাত্তামীকে হত্যা করে দামেশক দখল করে নেন। তিনি দামেশকবাসীদেরকে নিরাপত্তা দান করে দেশের প্রশাসন–কাঠামো গড়ে তোলেন এবং সেনাবাহিনী নিয়ে মিসর সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন। পরবর্তী সময়ে মিসর সীমান্তে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল এবং মুইয্য উবায়দীর সাথে আযমের যে পত্রালাপ হয়েছিল সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যে সময়ে আযম কারামতী সিরিয়া ও মিসর অভিযানে নিয়োজিত ছিলেন তখন মুইয্য উবায়দী আদাল দ্বীপে নজরবন্দী আবূ তাহিরের পুত্রদের সাথে পত্রালাপ করে তাদেরকে প্ররোচনা দেন যেন তারা বাহরাইনে এসে ইহসা দখল করে নেয় এবং নিজেরাই সিংহাসনে আরোহণ করে। উপরন্তু তিনি নিজে বাহরাইনে এই মর্মে একটি ঘোষণা দেন যে, আমি আযমকে পদচ্যুত করে আবূ তাহিরের পুত্রদেরকে বাহরাইনের হুকুমত প্রদান করলাম। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, আবূ তাহিরের পুত্ররা ইহসায় এসে তা পর্যুদস্ত করে দিল। এই অবস্থা লক্ষ্য করে বাগদাদের খলীফা তায়ী' আব্বাসী আবূ তাহিরের পুত্রদের কাছে পত্র লিখেন– তোমরা আপোসের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না, আমার নির্দেশাবলী পালন কর এবং এই বিদ্রোহ থেকে বিরত থাক। কিন্তু তাহিরের পুত্রদের উপর এর কোন প্রভাবই পড়ল না। শেষ পর্যন্ত আযম ইহসার দিকে ফিরে এসে সবাইকে শায়েস্তা করেন। উপরন্তু খলীফা তায়ী আব্বাসীর দূতেরা এসে ওদের মধ্যে একটা আপোস মীমাংসা করে দেয়। ৩৬৩ হিজরীতে (৯৭৩-৭৪ খ্রি) মুইয্য উবায়দীর বাহিনী সমগ্র সিরিয়া দখল করে নেয়। আযম কারামতী তার সেনাবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করে সিরিয়ার দিকে আসেন এবং সমগ্র সিরিয়া থেকে উবায়দী বাহিনীকে তাড়িয়ে দেন। তারপর তিনি মিসরের বালবীস নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হন। মুইয্য উবায়দী আযম কারামতীর সৈন্যদের একটি বিরাট অংশ এবং কিছু আরব অধিনায়ককে অর্থের লোভ দেখিয়ে নিজের পক্ষে টেনে নেন। ফলে হাসান আযম পরাজিত হয়ে ইহসায় ফিরে আসেন। আরব সর্দাররা সিরিয়া দখল করে নেয়। কিছু সংখ্যক তুর্কী সরদার তখন দামেশক দখলের চেষ্টা করেছিলেন। যা হোক, মুইয্য

উবায়দী ৩৬৬ হি. সনে (৯৭৬-৭৭ খ্রি) স্বয়ং দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যেই হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। আযম কারামতী ৩৬৬ হি. সনে (৯৭৬-৭৭ খ্রি) হামলা চালিয়ে পুনরায় সিরিয়া দখল করে নেন। এই হামলায় তুর্কী অধিনায়ক উফতোগীনও তার সঙ্গে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আযীয উবায়দীর সাথে মিসর সীমান্তে সংঘর্ষ বাধে, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাতে উফতোগীন বন্দী হন এবং আযম আপন রাজধানী ইহসা অভিমুখে যাত্রা করেন। যেহেতু আযম আব্বাসীয় খিলাফতের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং উবায়দীদেরকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন তাই কারামতীয়রা তার প্রতি বিরক্ত ও মনঃক্ষুণ্ণ ছিল। এদিকে উবায়দীদের পক্ষ থেকে কারামতীয় জনসাধারণের মধ্যে আযমের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান অব্যাহত ছিল। ফলে কারামতীয়রা আযমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। আর এই বিদ্রোহ বহুলভাবে সাফল্য লাভ করে এ কারণে যে, তখন আযম তার রাজধানী থেকে অনেক দূরে, সিরিয়ায় যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি রাজধানী ছেড়ে না গেলে তার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহই সাফল্য লাভ করতে পারত না। যা হোক যখন আযম সিরিয়া থেকে ইহসায় ফিরে আসেন তখন সমগ্র শহরবাসীকে তিনি বিদ্রোহী ও অবাধ্য দেখতে পান। তার অশ্বারোহী বাহিনীও বিদ্রোহীদের সাথে মিশে গিয়েছিল। তারা আযমকে বন্দী করে আবূ সাঈদ জানাবীর সমগ্র খান্দানকে হুকুমত ও সালতানাত থেকে বঞ্চিত করে নিজেদেরই দল থেকে জা'ফর ও ইসহাক নামীয় দু'ব্যক্তিকে যৌথভাবে সিংহাসনে বসায়। তারা আযম, তার পুত্র-কন্যা এবং আত্মীয়-স্বজনকে আদাল দ্বীপে নির্বাসন দেয়। এই দ্বীপে আবূ তাহিরের পুত্ররা প্রথম থেকেই নির্বাসিত অবস্থায় বন্দী ছিল এবং তাদের সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। তাই এই নির্বাসিতরা দ্বীপে পা রাখতেই তাহিরের পুত্ররা আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাদের হত্যা করে ফেলেন।

জা'ফর ও ইসহাক

জা'ফর ও ইসহাক যৌথভাবে কারামতীয়দের উপর হুকুমত চালাতে থাকেন। তারা নিজেদের হাতে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে সাথে আব্বাসীয় খিলাফতের আনুগত্য অস্বীকার করে নিজেদের সাম্রাজ্যে উবায়দী সম্রাটের নামে খুতবা পাঠ করতে থাকেন। তারপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে তারা কূফা দখল করে নেন। সামসামুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়াইয়া কারামতীয়দেরকে দমন করার জন্য একটি বাহিনী কূফার দিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু কারামতীয়রা ঐ বাহিনীকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয় এবং কাদিসিয়া পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। অতএব জা'ফর ও ইসহাকের মধ্যে বিরোধ ও মনোমালিন্য দেখা দেয় এবং তারা প্রত্যেকেই একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে এককভাবে বাদশাহী করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। ফলে কারামতীয়দের মধ্যে দুর্বলতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। শেষ পর্যন্ত অন্যান্য কারামতীয় অধিনায়কের মধ্যেও বাদশাহী করার কামনা জাগে এবং এরই ফলশ্রুতিতে আসগর ইব্ন আবুল হাসান তাগলবী বাহরাইনের উপর এবং বনী মুকাররম আম্মানের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তারা খিলাফতে আব্বাসীয়ার বশ্যতা স্বীকার করে নেন এবং ৩৭৫ হিজরী (৯৮৫-৮৬ খ্রি) নাগাদ তাগলবী খান্দান বাহরাইন থেকে কারামতীয়দের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফারিসের (পারস্য) কারামতীয় ও বাতিনী সাম্রাজ্য

বাহরাইনের কারামতীয়দের অবস্থা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কারামতীয়দের সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর তাদের আমল ও আকীদায় একটি বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। যদিও বাহরাইনের কারামতীয়দের বাদশাহ আযমের আমল ও আকীদা অন্যান্য কারামতীয়র থেকে পৃথক ছিল এবং তিনি মিসরের উবায়দী বাদশাহকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। যদিও সাধারণ কারামতীয়রা মিসরের উবায়দী শাসককে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চোখে দেখত এবং তাকে নিজেদেরই খলীফা বলে মনে করত। এবার যখন বাহরাইনের হুকুমত তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল এবং ইরাক ও সিরিয়ায় তাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকল না তখন তারা গোপনে নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলে এবং বাহ্যত সাধারণ মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে কালাতিপাত করতে লাগল। ঐ সমস্ত গোপন সংগঠনের মাধ্যমে তারা তাদের জামাআতের প্রচার ও উন্নয়নে মনোনিবেশ করল। উবায়দীদের মত তারাও এখানে সেখানে নিজেদের তৎপরতাকে কঠোরভাবে গোপন রাখত। তারা সংসারত্যাগী পীর-ফকীরের বেশ ধরে জনসাধারণের সাথে মেলামেশা করত এবং তাদেরকে নিজেদের শিষ্য তালিকাভুক্ত করত। ঐ সমস্ত মুরীদের মধ্যে যাকে তারা নিজেদের পছন্দমত পেত তাকে 'রফীক' উপাধি প্রদান করত এবং তাকেই নিজেদের বিশেষ আকীদাসমূহ শিক্ষা দিত। এভাবে তাদের মধ্যে দুই স্তরের লোক ছিল। এক স্তর দাঈদের এবং অন্য স্তর রফীকদের। সিরিয়া, ইরাক, ফারিস, খুরাসান সর্বত্রই দাঈরা ছড়িয়ে পড়ল। মিসরের উবায়দী সম্রাট তাদেরকে সর্বপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। এই সমস্ত দাঈর কাছে গোপনে গোপনে মিসর থেকে সব ধরনের সাহায্য এসে পৌঁছাত। এভাবে উবায়দীরা ইসলামী সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কারামতীয় দাঈদের একটি বিরাট জাল ছড়িয়ে দেয়। এদিকে সালজুকী বংশ ইসলামী দেশসমূহ দখল করে যাচ্ছিল এবং এই গোপন শত্রুদের সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ বেখবর। বাহরাইনে কারামতীয়দের হুকুমত ধ্বংস হওয়ার পর সমগ্র শিক্ষিত ও বিচক্ষণ কারামতীয়রা এক একজন কর্মচাঞ্চল্য দাঈতে পরিণত হয়। ফলে মিসর থেকে ইরাক ও খুরাসানের দিকে লোক পাঠাবার কোন প্রয়োজন উবায়দী সালতানাতের হয়নি। যেহেতু এই সব লোক একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যের জন্য মাতম করে যাচ্ছিল। তাই সুযোগ পেলেই তারা ডাকাতি ও লুটপাট করত এবং নির্বিবাদে হত্যাকাণ্ড চালাত। ঐ সমস্ত দাঈ ও পীরেরা তাদের বিশিষ্ট মুরীদ ও ভক্তদেরকে এই শিক্ষাই দিত যে, যে ব্যক্তি আমাদের আকীদা পোষণ করে না তাকে হত্যা করা কোন অপরাধ নয়। ফলে কারামতীয়দের অস্তিত্ব মুসলমানদের জন্য খুবই

ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। যেহেতু সূচনাকালে তাদেরকে শায়েস্তা করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি তাই তাদের দুঃসাহস বেশি রকম বেড়ে গিয়েছিল। এখন মুসলমান সর্দার ও অধিনায়কদেরকে গোপনে হত্যা করা তাদের একটি নিত্যনৈমিত্তিক কাজে পরিণত হয়। যেখানে খুব কঠোর ও বিচক্ষণ শাসনকর্তা থাকতেন সেখানে কারামতীয়রা একদম চুপচাপ থাকত। কিন্তু যেখানেই তারা প্রশাসন ব্যবস্থার মধ্যে একটু ঢিলেমী লক্ষ্য করত সেখানেই নির্বিবাদে লুটপাট ও হত্যাকাণ্ড চালাত। যেহেতু কারামতীয়রা ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল এবং মুসলমানদের প্রতারণা করা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল তাই তারা কখনো কখনো বিভিন্ন সালতানাত ও হুকুমতের বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন হওয়ার সুযোগও পেয়ে যেত। তাদেরই জনৈক ব্যক্তিকে হামাদানের একটি দুর্গের অধিপতি নিয়োগ করা হয়েছিল। কারামতীয়রা ঐ দুর্গকে তাদের আশ্রয়স্থল করে নিয়ে চতুর্দিকে অত্যন্ত জোরেশোরে ডাকাতি ও লুটপাট শুরু করে। যেহেতু ঐ দলটি অত্যন্ত গোপনে তাদের কাজ আঞ্জাম দিত, তাই তাদেরকে বাতিনী ফিরকা বলা হতে থাকে। এই বাতিনীরা ধীরে ধীরে উন্নতি করে ইসপাহানের শাহ্দার দুর্গ দখল করে নিতে সক্ষম হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, বাতিনী দাঈদের মধ্যে একজন অতি বিচক্ষণ ও বিখ্যাত ব্যক্তির নাম ছিল আত্তাশ। তিনি ছিলেন প্রখর জ্ঞান ও বিজ্ঞতার অধিকারী। তিনি হাসান ইব্ন সাব্বাহকে তার আকাঈদ শিক্ষা দেন এবং আপন বিশেষ শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

আহমদ ইব্ন আত্তাশ

আত্তাশের এক পুত্রের নাম ছিল আহমদ। তাকে তার পিতার জায়গায় এবং গোটা জামাআতের মধ্যে অত্যন্ত মান্যবর ব্যক্তি বলে মনে করা হতো। আহমদ তার দল থেকে বিদায় নিয়ে একজন আমীরযাদার বেশ ধরে শাহ্দার দুর্গের অধিনায়কের খিদমতে হাযির হন এবং তার অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। তারপর তিনি এমন পারদর্শিতার সাথে আপন দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন যে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ঐ অধিনায়ক তাকে তার নায়েব নিয়োগ করেন এবং তার হাতেই যাবতীয় শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন। কিছুদিন পর ঐ অধিনায়ক মৃত্যুমুখে পতিত হলে আহমদ স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন শাসকের কাছ থেকে দুর্গের অধিকার ও শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। এবার তিনি বাতিনী দলের যে সমস্ত লোক তার শাসনের আওতাধীনে বন্দী ছিল তাদের সকলকে মুক্ত করে দেন এবং তারা মুক্তি লাভ করেই ইসপাহান এলাকায় লুটপাট ও হত্যাকাণ্ড শুরু করে দেয়। এদিকে যখন আহমদ ইসপাহানের শাহ্দার দুর্গের ক্ষমতা লাভ করেন তখন আহমদ ইব্ন সাব্বাহ তালিকান ও কাযভীন এলাকায় তার ষড়যন্ত্র বিস্তার করে যাচ্ছিলেন।

হাসান ইব্ন সাব্বাহ

হাসান ইব্ন সাব্বাহ এককালে মালিক শাহ ইব্ন আলপ-আরসালান সালজুকীর প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুল্ক তূসীর সহপাঠী ছিলেন। তিনি নিযামুল মুল্কের মাধ্যমে সুলতানের দরবারে নিজের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। কিন্তু পরে সেখানে থাকাটা সমীচীন মনে না করে নিযামুল মুল্কের জনৈক আত্মীয় রাই দুর্গের অধিনায়ক আবূ মুসলিমের কাছে চলে

আসেন এবং তার সংসর্গে থেকে আপন ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতে শুরু করেন। ঘটনাচক্রে আবূ মুসলিম জানতে পারেন যে, হাসান ইব্ন সাব্বাহর কাছে মিসরের উবায়দী সাম্রাজ্যের গুপ্তচরেরা আসা-যাওয়া করে থাকে। তিনি এ ব্যাপারে হাসান ইব্ন সাব্বাহকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। হাসান ইব্ন সাব্বাহ্ যখন বুঝতে পারেন যে, তার ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে গেছে তখন তিনি সেখান থেকে পালিয়ে মুসতানসির উবায়দীর কাছে মিসরে চলে যান। মুসতানসির উবায়দী হাসান ইব্ন সাব্বাহকে সাদরে গ্রহণ করেন। হাসান মুসতানসিরের হাতে বায়আত করার পর তিনি তাকে তার প্রধান 'দাঈ' নিয়োগ করেন এবং তার ইমামত ও খিলাফতের দাওয়াত প্রদানের জন্য হাসানকে পারস্য ও ইরাকের দিকে প্রেরণ করেন। আহমদ নাযযার ও আবুল কাসিম নামে মুসতানসির উবায়দীর তিন পুত্র ছিলেন। বিদায়কালে হাসান ইব্ন সাব্বাহ মুসতানসিরকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার পরে আমার ইমাম কে হবেন? মুসতানসির উত্তর দেন, আমার পুত্র নায্যারই তোমার ইমাম হবে। শেষ পর্যন্ত মুসতানসির নায্যারকেই আপন 'অলীআহ্দ' নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার প্রধানমন্ত্রী ও তার বোন ষড়যন্ত্র করে আবুল কাসিমকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন। কিন্তু হাসান ইব্ন সাব্বাহ আবুল কাসিমের ইমামত স্বীকার করে নেননি, বরং নায্যারকেই তিনি ইমামতের যোগ্য মনে করতে থাকেন। এ জন্য হাসান ইব্ন সাব্বাহের ইমামতকে নায্যারিয়া নামে অভিহিত করা হয়। হাসান ইব্ন সাব্বাহ মিসর থেকে বিদায় নিয়ে এশিয়া মাইনর এবং মুসিল হয়ে খুরাসানে এসে পৌঁছান। এখানে তালিকান ও কোহিস্তানের যে শাসনকর্তা ছিলেন তিনি নিজের পক্ষ থেকে 'আলামূত' দুর্গের জনৈক আলাভীর হাতে অর্পণ করেছিলেন। হাসান ইব্ন সাব্বাহ ঐ আলাভীর কাছে যান। তিনি হাসান ইব্ন সাব্বাহের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাকে নিজের সাথে রাখেন। হাসান ইব্ন সাব্বাহ একজন অতি সম্মানিত মেহমান হিসাবে এবং একজন সংসার ত্যাগী আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির ছদ্মবেশে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আলামূত দুর্গে অবস্থান করে তলে তলে ঐ দুর্গ নিজের দখলে নিয়ে আসার ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তার ষড়যন্ত্র সফল হয় এবং তিনি আলাভীকে দুর্গ থেকে বের করে দিয়ে নিজেই তার দখলকার বনে বসেন। এটা ছিল মালিক শাহ্ সালজুকীর শাসনামল। মালিক শাহের মন্ত্রী নিযামুল মুল্ক তূসী এই সংবাদ শুনে হাসান ইব্ন সাব্বাহকে দমন এবং আলামূত দুর্গ অবরোধ করার জন্য এক বাহিনী প্রেরণ করেন। হাসান ইব্ন সাব্বাহ স্বমতাবলম্বী অনেক লোক সংগ্রহ করে ইতিমধ্যে একটি বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং এই যুদ্ধ ক্রমাগত চলতে থাকে। ঠিক এমনি মুহূর্তে হাসান ইব্ন সাব্বাহ নিযামুল মুল্ককে হত্যা করার জন্য বাতিনিয়া ফিরকার একদল লোক নিয়োগ করেন। ওরা সুযোগ পেয়ে নিয়ামুল মুল্ককে হত্যা করে ফেলে। ফলে হাসানের বিরুদ্ধে প্রেরিত নিযামুল-মুল্কের বাহিনী আলামূতের অবরোধ তুলে নিজেদের রাজধানীতে ফিরে যায়। এই সাফল্যের পর হাসান ইব্ন সাব্বাহ ও তার সঙ্গী-সাথীদের সাহস অনেক বেড়ে যায় এবং তারা বিনাদ্বিধায় আশেপাশের এলাকা দখল করতে শুরু করে। ঐ সময়েই সামানী বংশোদ্ভূত মুনাওয়ার নামীয় জনৈক ব্যক্তির সাথে, যিনি কোহিস্তানের গভর্নর বা নাযির ছিলেন, সালজুকী ভাইসরয়ের বিরোধ সৃষ্টি হয়। উভয়ের মধ্যকার এই বিরোধ এতই দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করে যে, শেষ পর্যন্ত মুনাওয়ার হাসান ইব্ন সাব্বাহের কাছে সাহায্য

প্রার্থনা করেন। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ অনতিবিলম্বে তার সেনাবাহিনী পাঠিয়ে কোহিস্তান দখল করে নেন। এভাবে দিনের পর দিন হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এদিকে মালিক শাহের মৃত্যুর পর সালজুকী অধিনায়কদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় হাসান ইব্‌ন সাব্বাহকে শায়েস্তা করা তো দূরের কথা, তারা একে অপরকে পরাস্ত করার জন্য হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে। এভাবে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের হুকুমত ও সালতানাত দিন দিন সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। সুলতান বারকিয়ারুক তার ভাই মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে এই বাতিনীদের সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের সম্মান ও মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দেন। অবশ্য কিছু দিন পরই এই বাতিনীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করার জন্য বারকিয়ারুককে একটি জরুরী ফরমান জারি করতে হয়।

এদিকে আহমদ ইব্‌ন আত্তাশ 'শাহ দুর্গ' দখল করে নিজের হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সালজুকীরা আহমদ ইব্‌ন আত্তাশ এবং তার সংগীদের চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে ফেলে। তখন অনেক বাতিনী সালজুকী সুলতানের কাছে এই শর্তে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে যে, তারা ইসপাহান এলাকা একেবারে খালি করে দিয়ে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের কাছে আলামূত দুর্গে চলে যাবে। অতএব এই শর্তে তাদেরকে হাসান ইবন সাব্বাহের কাছে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। আহমদ ইব্‌ন আত্তাশকে বন্দী করে হত্যা করা হয় এবং তার দেহ থেকে চামড়া তুলে নিয়ে তাতে ভূষি ভরে দেওয়া হয়। আহমদের স্ত্রী আত্মহত্যা করে। এভাবে ইসপাহানের বাতিনীরা ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের ক্ষমতা পূর্বের চাইতে অনেক বৃদ্ধি পায়। কেননা এখন তিনিই সমগ্র বাতিনীদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসাবে টিকে আছেন। বাতিনীর হাজার হাজার লোক 'দাঈ' হিসাবে সিরিয়া, ইরাক এবং পারস্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কোথাও কোথাও তারা প্রকাশ্যে নিজেদের প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছিল। কোন কোন দুর্গও তাদের দখলে এসে গিয়েছিল। পরে মুসলমানরা ধীরে ধীরে চতুর্দিক থেকে তাদের উপর হামলা চালায় এবং সব দুর্গই তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু আলামূত দুর্গ এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা বরাবরই হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের দখলে থাকে। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের নাম ও বংশতালিকা হচ্ছে, হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ আল-হামীরী। সালজুকীদের গৃহযুদ্ধ, দুর্বলতা ও লক্ষ্যভ্রষ্টতা বাতিনীদের হুকুমত স্থায়ী ও সুদৃঢ় করে দেয়। পরবর্তীকালে বাতিনীদের এই হুকুমতকে সালতানাতে ফিদায়ীন, সালতানাতে ইসমাঈলীয়া, সালতানাতে হাশশাশীন প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ যেমন এই সালতানাত ও হুকুমতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তেমনি তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তার ফিরকা ও মাযহাবেরও। তিনি সাধারণ বাতিনীদের বিপরীত কিছু কিছু নতুন আমল ও ইবাদতের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তার শিষ্যরা তাকে 'সাইয়িদুনা' বলত। সাধারণভাবে তাকে 'শায়খুল জাবাল' নামে স্মরণ করা হয়। তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আলামূত দুর্গের দখলদার ও শাসনকর্তা ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে এক দিনের জন্যও তিনি দুর্গ থেকে বের হননি।

হাসান ইব্‌নে সাব্বাহর মৃত্যু

৫১৮ হিজরী সনের ২৮শে রবিউল আখির (১১২৪ খ্রি জুন) নব্বই বছর বয়সে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বর্বর পাহাড়িয়া লোকদের নিয়ে এমন একটি বাহিনী গঠন করেছিলেন, যারা তার (হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের) ইঙ্গিতে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াকে

তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করত। ওদেরকে বলা হতো 'জামাআতে ফিদায়ীন'। এই ফিদায়ীদের মাধ্যমেই হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ তার বিরুদ্ধবাদী বিশ্বের বড় বড় বাদশাহ ও সেনাপতিকে তাদের ঘরের মধ্যেই হত্যা করিয়েছিলেন। আর এ কারণেই সকলের অন্তরে ফিদায়ীদের ভয়ভীতি এমনভাবে ঢুকে গিয়েছিল যে, বড় বড় রাজা-বাদশাহও তাদের রাজধানীতে, এমনকি আপন রাজপ্রাসাদেও শান্তিতে ঘুমাতে পারতেন না। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ ও তার জামাআতকে সাধারণভাবে মুসলমান বলে গণ্য করা হয় না। আর প্রকৃত ব্যাপারও এই যে, এটা হচ্ছে মুলহিদ তথা কাফিরদেরই একটি দল। দীন ইসলামের সাথে এদের কোনই সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আমাদেরই যুগের এক পণ্ডিত মূর্খ, যাকে ইসলামের দুশমন একটি ফিরকার নেতা মনে করা হয়, তিনি হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ এবং তার অনুসারীদের কার্যকলাপকে ইসলামী কার্যকলাপ বলে আখ্যায়িত করে থাকেন এবং লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে এ বিষয়ের উপর পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধও প্রকাশ করে থাকেন। অপর দিকে মুসলমানরাও এমনি গাফিল যে, হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নায্‌যারিয়া ফিরকা সম্বন্ধে কিছুই জানে না এবং জানার চেষ্টাও করে না। ফলে তারা ঐ পণ্ডিত মূর্খ ব্যক্তির প্রবন্ধাদি পড়ে বাহ বাহ দেয় এবং হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ ও তার অনুসারীদেরকে মুসলমান বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ এবং তার অনুসারীরা ছিল মুসলমানদের জঘন্যতম শত্রু। তারা গোপনে, ছদ্মবেশে কিংবা যে করে হোক প্রসিদ্ধ লোকদেরকে হত্যা করত। আজকালও আমরা কখনো কখনো পত্র-পত্রিকায় ইউরোপের এনার্কিস্টদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ লক্ষ্য করি। এক কথায় বলতে গেলে, হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ প্রতিষ্ঠিত সালতানাতকে এনার্কিস্টদেরই একটি সালতানাত মনে করতে হবে।

কারা বুযুর্গ উমীদ

হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের মৃত্যুর পর কারা বুযুর্গ উমীদ নামক তার একজন শিষ্য আলামূত দুর্গের শাসক এবং হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত হন। কারা বুযুর্গ উমীদের বংশে এই হুকুমত ৬৫৫ হিজরী সাল (১২৫৭ খ্রি) পর্যন্ত টিকে থাকে। কারা বুযুর্গ উমীদের পর তার পুত্র হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ, তারপর তার পুত্র মুহাম্মাদ ছানী ইবন হাসান, তারপর জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ছানী ওরফে হাসান ছালিছ, তারপর আলাউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ, তারপর রুকনুদ্দীন খুরশাহ ইব্‌ন আলাউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রুকনুদ্দীন খুরশাহ

রুকনুদ্দীন খুরশাহ ছিলেন ফিদায়ীদের সর্বশেষ বাদশাহ। হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংস করার এক বছর পূর্বে, ৬৫৪ হিজরী সনে (১২৫৬ খ্রি) খুরশাহকে বন্দী করে ফিদায়ী সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটান। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের পর আলামূত দুর্গ এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ফিদায়ীদের হুকুমত অব্যাহত থাকে। কিন্তু একশ' বছরেও তারা তাদের সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি করতে পারেনি বা এর বিস্তৃতি ঘটাতে পারেনি। যখন চেঙ্গিয খান বর্বর তাতারীদের নিয়ে একের পর এক ইসলামী সাম্রাজ্যের ধ্বংস করেছিলেন ঠিক তখনি

এই ফিদায়ী নিজেদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধনে তৎপর হয়। কিন্তু তাদের লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পূর্বেই জালালুদ্দীন ইব্‌ন আলাউদ্দীন খারিযম শাহ্ একটি আকস্মিক হামলার মাধ্যমে তাদের শক্তিকে খর্ব করে দেন এবং শেষ পর্যন্ত আলমূত দুর্গে তাদেরকে ঘেরাও করে রেখে তাদের অন্য দুর্গগুলো দখল করে সঙ্গে সঙ্গে ধূলিসাৎ করে ফেলেন। এতে ফিদায়ীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত হালাকু খান তাদেরকে ধ্বংস করে এই পৃথিবী থেকে তাদের নাম-নিশানা চিরতরে মুছে ফেলেন।

ফিদায়ীদের হাতে নিহত ব্যক্তিবৃন্দ

ফিদায়ীদের হাতে যাঁরা নিহত হন তাঁরা হচ্ছেন, সুলতান আলপ-আরসালান ও মালিক শাহ্ সালজুকীর প্রধানমন্ত্রী খাজা নিযামুল মুল্‌ক তুসী, ফখরুল মালিক ইব্‌ন খাজা নিযামুল মুল্‌ক, জনাব শামসে তাবরিযী পীরে তরীকত মওলভী রূমী, খারিয্‌ম শাহাবুদ্দীন ঘুরী এবং ইউরোপের কিছুসংখ্যক খ্রিস্টান সম্রাট। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী এবং হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীকেও ফিদায়ীরা হত্যার হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তাঁরা তাদের হাত থেকে রক্ষা পান।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

চেঙ্গিযী মুঘল

হালাকু খানের আক্রমণ এবং বাগদাদ ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। স্পেনের ইসলামী সুলতানদের অবস্থাদিও ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মিসরের আব্বাসীয় খলীফাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মিসরের উবায়দীরাও খিলাফত ও ইমামতের দাবি করত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাদের সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। হিজরী দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে সর্বশেষ আব্বাসীয় খলীফা সুলতান সালীম উসমানীর হাতে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন। আর তখন থেকেই উসমানী বংশের সুলতানদেরকে খুলাফায়ে ইসলাম আখ্যা দেওয়া হতে থাকে। একজন ঐতিহাসিকের জন্য এটা অসমীচীন নয় যে, তিনি ইসলামী খিলাফত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইসলামী হুকুমতসমূহের কথা বাদ দিয়ে শুধু উসমানীয় খিলাফত সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং এভাবে বর্তমান যুগ পর্যন্ত তার ঐতিহাসিক বর্ণনাকে টেনে নিয়ে আসবেন। কিন্তু আমি সুলতান সালীম উসমানী পর্যন্ত ইসলামী খিলাফতের অবস্থাদি বর্ণনা করার পর অতীত যুগের দিকে ফিরে গিয়ে ঐ ধরনের কিছু সংখ্যক মধ্যবর্তী ইসলামী হুকুমত সম্পর্কেও জরুরী ভিত্তিতে আলোচনা করছি, যে সমস্ত হুকুমত কোন না কোন দিক দিয়ে লক্ষণীয় এবং ইতিহাস পাঠকদের জন্যও তা অধ্যয়ন করা জরুরী। যাহোক আমরা প্রথমে উসমানী হুকুমতের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক অবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করব। তারপর আলোচনা করব সালতানাতে উসমানিয়া-ই-রূম এবং তার সমকালীন সালতানাতসমূহের অবস্থাদি সম্পর্কে।

এ প্রসঙ্গে আমরা নিবেদন করতে চাই যে, হিন্দুস্থানের ইসলামী হুকুমতের অবস্থাদি সম্পর্কে এই গ্রন্থে কোন আলোচনা করা হবে না। কেননা হিন্দুস্থানের একটি পৃথক ইতহাস রচনার ইচ্ছা আমাদের আছে। তাতে হিন্দুস্থানের ইসলামী হুকুমতের বিস্তারিত আলোচনা করব। প্রথমে মুঘলদের আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তারপর সিরিয়া ও ইরানের কিছু সংখ্যক ইসলামী সালতানাতের অবস্থাদি বর্ণিত হবে। তারপর আলোচনা করা হবে উসমানীয় সালতানাত সম্পর্কে।

তুর্ক, মুঘল ও তাতার

একটি সন্দেহ নিরসন

ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায়ই তুর্ক, মুঘল, তাতার, তুর্কমান, কারা-তাতার প্রভৃতি জাতির মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না বা এই সমস্ত জাতির উৎস কি তাও জানতে

পারে না। তারা কখনো ইতিহাসগ্রন্থ পড়ে, সালজুকী লোক—যেমন আলপ-আরসালান, তুগ্রিল বেগ তুর্ক ছিলেন। তারপর তারা চেঙ্গিয খান সম্পর্কে অপর একটি ইতিহাস গ্রন্থে পড়ে যে, তিনি মুঘল ছিলেন। আবার অন্য একটি ইতিহাস গ্রন্থে পড়ে যে, তিনি তুর্কী ছিলেন। তারপর তারা যখন দেখে যে, চেঙ্গিয খানের ফিতনাকে তাতারের ফিতনা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে যখন তারা অনুমান করে যে, মুঘল, তুর্ক ও তাতার একই জাতির নাম। তারপর তখন তারা মুঘল ও তুর্কদের যুদ্ধ ও সংঘর্ষের বিবরণ পড়ে তখন তাদের এই বিশ্বাস জন্মায় যে, মুঘল ও তুর্ক দু'টি আলাদা জাতি। তারা হিন্দুস্থানের মুঘলদের ইতিহাস পড়ে এবং তাতে দেখে যে, কোন কোন অধিনায়ককে তুর্ক বলা হয়, অথচ মুঘল সুলতানদের সাথেই তার বংশগত সম্পর্ক রয়েছে। তারা আরও দেখে যে, মুঘলদের মির্যা বলা হচ্ছে এবং তাদের নামের সাথে বেগ উপাধি অবশ্যই জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার যখন তারা ইতিহাস গ্রন্থে ইরানের বাদশাহদের নাম পড়ে তখন দেখে যে, তাদের নামের সাথেও মির্যা শব্দ যুক্ত রয়েছে। তারা উসমানী তুর্কদের নামের সাথে বেক, বে অথবা বেগ দেখতে পায়। তারা এও দেখতে পায় যে, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা কখনো কখনো হিন্দুস্থানের মুঘল সাম্রাজ্যকে তুর্কী সাম্রাজ্য নামে উল্লেখ করে থাকেন। অতএব ইতিহাসের ছাত্রদের সুবিধার্থে তুর্ক ও মুঘলদের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

'তুর্ক' শব্দের প্রয়োগ

দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আ)-এর তিন পুত্র ছিলেন। তাদের নাম ছিল হাম, সাম এবং ইয়াফিস। ইয়াফিসের বংশধররা চীন এবং অন্যান্য প্রাচ্য দেশে বসতি স্থাপন করে। ইয়াফিসের বংশধরদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তির নাম ছিল তুর্ক। তার বংশধররা চীন ও তুর্কিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। ওরাই তুর্ক নামে পরিচিত। কেউ কেউ ভুলবশত আফ্রাসিয়াবকেও তুর্ক মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি ইরানের শাহী বংশ 'কায়ানী'-এর সাথে সম্পর্ক রাখতেন এবং ফারীদূন-এর বংশধরদের মধ্যে ছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন তুর্কিস্তানের বাদশাহ, তাই ভুলবশত লোকেরা তাকে তুর্কী জাতির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। তুর্ক ইব্‌ন ইয়াফিসের বংশধররা যখন চীন, তুর্কিস্তান প্রভৃতি দেশে খুব বিস্তার লাভ করল তখন তারা শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য এক ব্যক্তিকে নিজেদের নেতা মনোনীত করা অপরিহার্য বলে মনে করল। ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে অনেক গোত্র ও গোষ্ঠীর সৃষ্টি হলো। প্রত্যেক গোত্র এবং গোষ্ঠী নিজেদের এক একজন সর্দার বা নেতা মনোনীত করল। এই সর্দাররা আবার একজন প্রধান সর্দারের অধীনস্থ থাকতেন। এই প্রেক্ষিতে তুর্ক ইব্‌ন ইয়াফিসের বংশধরদের প্রত্যেকটি গোত্রের উপর তুর্ক শব্দ প্রয়োগ করা হতো এবং সমগ্র চীন ও তুর্কিস্তানের অধিবাসীদেরকে তুর্ক বলা হতো।

গায তুর্ক

উপরে উল্লিখিত তুর্ক গোত্রগুলোর কোন কোন গোত্র ইসলামী যুগে জায়হূন নদী অতিক্রম করে পারস্য, খুরাসান প্রভৃতি দেশে ডাকাতি ও লুটপাট চালাতে থাকে। ঐ সমস্ত গোত্রকে

গায তুর্ক নামে অভিহিত করা হয়। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং মরক্কো পর্যন্ত এই সব তুর্কের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলে।

সালজুকী

ঐ সব তুর্ক গোত্রসমূহের একটি গোত্রকে সালজুকী বলা হয়। খুব সম্ভবত ইব্‌ন ইয়াফিসের বংশধরদের মধ্যে এই গোত্রই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে। এই গোত্রে তুগ্রিল, আলপ-আরসালান প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সুলতানরা জন্মগ্রহণ করেছেন।

মুঘল ও তাতার

সালজুকীরা ইসলাম গ্রহণ করে খুরাসানের দিকে বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে তুর্কদের মধ্যে আরো দু'টি নতুন গোত্রের উদ্ভব হয়েছিল। দুই সহোদর ভাইয়ের নামে ঐ দু'টি গোত্রের নামকরণ করা হয়েছিল মুঘল ও তাতার। সালজুকীদের ইসলাম গ্রহণ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ও খ্যাতি অর্জনকালে এই দুই গোত্র উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল না। ধীরে ধীরে মুঘল ও তাতারের বংশধরদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে তারা পৃথক পৃথক প্রদেশ বা ভূখণ্ডে বসবাস করতে শুরু করে এবং তাদের মধ্যে পৃথক পৃথক নেতৃত্বও সৃষ্টি হয়। তুর্ক ইব্‌ন ইয়াফিসের বংশধর তথা তুর্কদের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম ছিল আলানজা খান। তার ঘরে দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয় এবং তিনি তাদের নাম রাখেন মুঘল ও তাতার। পরবর্তীকালে এই দুই পুত্র থেকেই উদ্ভব হয় মুঘল ও তাতার জাতির। মুঘল খানের পুত্রের নাম ছিল কারাখান আর কারাখানের পুত্রের নাম ছিল আরগুন খান। আরগুন খানকে তার গোত্রের সর্দার মনে করা হতো। এই আরগুন খানেরই যুগে তার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি গাড়ি আবিষ্কার করে, যা মালামাল বহনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়। আরগুন খান এই আবিষ্কারকে অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং এর আবিষ্কারককে 'কানকালী' উপাধিতে ভূষিত করেন। তুর্কী ভাষায় গাড়িকে 'কানকালী' বলা হয়। আর যে ব্যক্তি কানকালী আবিষ্কার করেছিল তার বংশকে কানকালী বংশ বলা হয়। আরগুন খানের অনেক পুত্র ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল চেঙ্গিয খান। চেঙ্গিয খানের পুত্রের নাম ছিল মাঙ্গলী খান, মাঙ্গলী খানের পুত্রের নাম ছিল ঈল খান এবং ঈল খানের পুত্রের নাম কায়ান। কায়ান খানের বংশধর থেকে মুঘল বংশ কায়াত নাম ধারণ করে। কায়ান খানের পুত্র তাইমূর তাশ তার স্থলাভিষিক্ত হয়। তাইমূর তাশের পুত্রের নাম ছিল মাঙ্গলী খান এবং মাঙ্গলী খানের পুত্রের নাম ছিল ইয়ালদুয খান জুনিয়া বাহাদুর। জুনিয়া বাহাদুরের ঘরে এক কন্যার জন্ম হয়, যার নাম রাখা হয় আলান কাওঁয়া। আলান কাওয়ার বিবাহ হয় তার চাচাত ভাই দূবূবিয়ানের সাথে। দূবূবিয়ানের ঔরসে ও আলান কাওয়ার গর্ভে এলকাদায়ী ও এলকজাদায়ী নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। আলান কাওয়ার স্বামী দূবূবিয়ান ছিলেন তার গোত্রের সর্দার ও অধিনায়ক। দূবূবিয়ান তার দুই পুত্রকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় রেখে মারা যান। তার মৃত্যুর পর মুঘল গোত্র তার বিধবা স্ত্রী আলান কাওয়াকেই তাদের নেত্রী হিসাবে বরণ করে নেয়।

একদা রাত্রিবেলা আলান কাওয়া আপন কক্ষে শুয়েছিল। তখনো ঘুম আসেনি এমন সময় দেখতে পেল তার জানালা অথবা ভেন্টিলেটর দিয়ে আলো প্রবেশ করেছে। আলো সূর্যের থালার আকারে কক্ষে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে আলান কাওয়ার মুখের মধ্যে ঢুকে গেল। আলান কাওয়া ভীতিগ্রস্ত অবস্থায় শয্যা ত্যাগ করে তার মা এবং সখীদেরকে এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করল। কিছুদিন পর আলান কাওয়ার গর্ভধারণের চিহ্ন ফুটে উঠল। লোকেরা যখন এ বিষয়টি জানতে পারল তখন তারা আলান কাওয়াকে দোষারোপ ও গালিগালাজ করতে শুরু করল। তখন রাণী আলান কাওয়া তার গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে একত্র করে বলল, তোমরা কয়েকদিন রাতের বেলা যদি আমার কক্ষের কাছে অবস্থান কর তাহলে তোমাদের কাছে সব রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। তারা তাই করল এবং দেখতে পেল যে, এক জ্যোতি আসমান থেকে নেমে এসে রাণীর কক্ষে প্রবেশ করে, তারপর কক্ষ থেকে বের হয়ে আসমানে উঠে যায়। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর সকলেই স্বীকার করল যে, রাণী 'রুহুল কুদ্দুস' দ্বারাই গর্ভবতী হয়েছেন। গর্ভকাল শেষ হওয়ার পর আলান কাওয়ার গর্ভে তিনটি ছেলের জন্ম হয়। তাদের নাম রাখা হয় বূকূন কায়মী, ইউসফীন সালজী এবং বুযুবখর কাযান। এ ভাবে আল-কাওয়ার পুত্রদের সংখ্যা পাঁচে গিয়ে পৌছাল। এই পাঁচজনের মধ্যে দু'জনের জন্ম দূবূবিয়ার ঔরসে এবং বাকি তিনজনের জন্ম বিনা বাপে। এলকাদায়ী ও এলকজাদায়ীর বংশধররা দারলেকীন বংশ নামে খ্যাতি লাভ করে। অনুরূপভাবে বূকূন কায়কীর বংশধররা কায়কীন বংশ এবং ইউসফীন সালজীর বংশধররা সালজিউত বংশ নামে অভিহিত হয়। আর বূযখর কাআনের বংশধররা বুযুবখরী নামে খ্যাতি লাভ করে। আলান কাওয়ার মৃত্যুর পর বুযুবখর আপন মাতার স্থলাভিষিক্ত এবং মুঘল বংশের শাসক মনোনীত হন। বুযুবখর নিজেকে 'সূর্যের সন্তান' বলতেন। এই বুযুব খরের বংশেই চেঙ্গিয খান, তাইমূর এবং অন্যান্য বিখ্যাত মুঘল ব্যক্তিবর্গ জন্মগ্রহণ করেছেন। চেঙ্গিয খান এবং তাইমূরের বংশগত সম্পর্ক জানতে নিচের বংশ তালিকা দেখুন।

মাআতুল আনকাওয়া

↓

জুয়ানজার অর্থাৎ বিনা বাপের সন্তান

↓

বুকা খান

↓

তুমীন খান

↓

কাইদূ খান
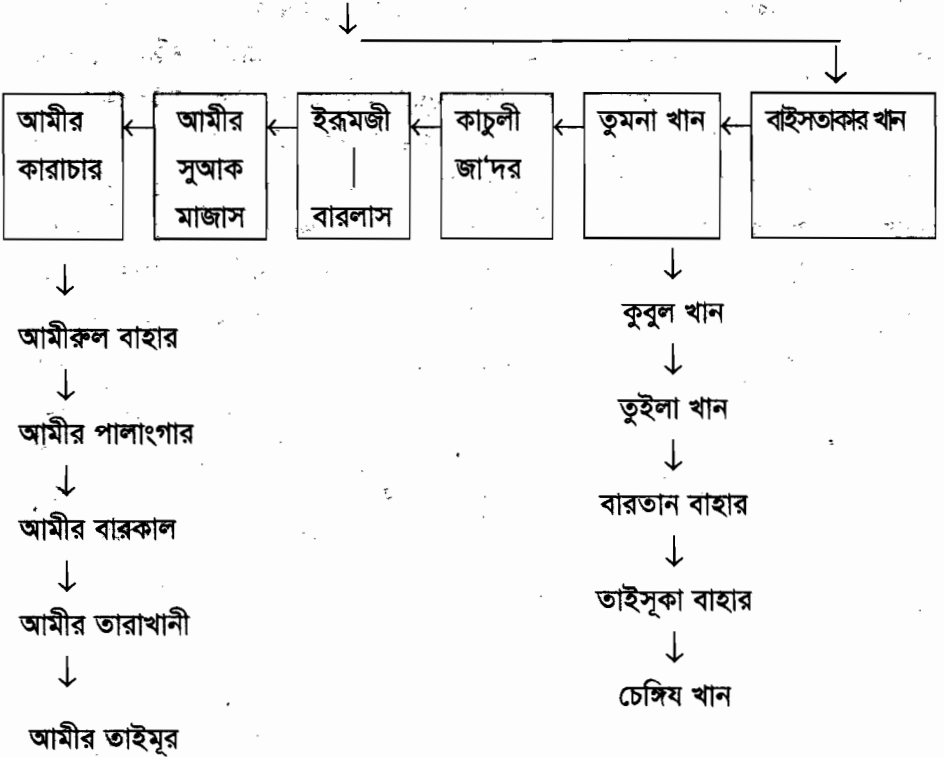
উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, তুর্কী ইব্‌ন ইয়াফিসের সন্তানদের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম ছিল আলানজা খান।

তার ঘরে মুঘল খান ও তাতার খান নামক দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। এই দুই ভাইয়ের বংশধররা মুঘল, তাতার এই দুই বংশে বিভক্ত হয়েছে। উপরে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই দুই বংশের লোকেরা পৃথক পৃথক অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। মুঘল বংশের লোকেরা চীন দেশে বসতি স্থাপন করে এবং তাদের নাম থেকেই ঐ দেশ মুঘলিস্তান বা মঙ্গোলিয়া নামে খ্যাত। তাতার বংশ জাইহূন নদীর তীরে বসতি স্থাপন করে। আর তাদের নাম থেকেই ঐ দেশ তাতার কিংবা তুর্কিস্তান নামে খ্যাত। ঐ দেশে একদা ফরীদূনের পুত্র তূরের হুকুমত ছিল বলে তা তুরান নামেও পরিচিত।

এই কায়ানী শাসক বংশের মধ্যে ইফরাস ইয়া অত্যন্ত বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ফেরদৌসীর শাহনামার মধ্যে তার উল্লেখ রয়েছে। কায়ানী বংশের এই শাখা অর্থাৎ ইফরাস ইয়াবের বংশধরও এই তুর্কিস্তান বা তুরানে বসবাস করে তাতার বংশের মধ্যে একাত্ম হয়ে গেছে। যেহেতু তুর্কিস্তান ইসলামী দেশসমূহের অধিক নিকটবর্তী ছিল এবং ইসলামী বিজয় অভিযানও সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল তাই তুর্কদের যে গোত্রটি সর্বপ্রথম ইসলামী সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সেটা ছিল এই তাতার গোত্র। তাতার গোত্র ছিল অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রের সমষ্টি। আর এই গোত্রগুলোর মধ্যে প্রধানত ইফরাস ইয়াবের বংশধর ঐ কায়ানী

গোত্রকে মনে করা হতো সব চাইতে বেশি সম্পদশালী ও সম্মানিত। কেননা তারা ছিল একটি বিরাট সাম্রাজ্যের স্মৃতি চিহ্ন। অতএব মহান সালজুকের ঐ উক্তিটি সঠিক বলেই মনে করা হয় যাতে তিনি বলেছিলেন, আমরা হচ্ছি ইফরাস ইয়াবের বংশধর। সর্বপ্রথম সালজুক নামীয় এক ব্যক্তি আপন গোত্রের লোকসহ বুখারায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। এই সালজুকের বংশধরকে 'তুর্কীদের সালজুক গোত্র' বলা হয়। সালজুকের ছিল পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল ইসরাঈল এবং অপর একজনের নাম ছিল ইসমাঈল। ইসমাঈলকে সুলতান মাহমূদ গযনভী কালিঞ্জর দুর্গে বন্দী করে রেখেছিলেন। মাহমূদ গযনভীর পুত্র সুলতান মাসউদ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ইসরাঈল জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আপন গোত্রে ফিরে যান। মিকাঈলের পুত্র ছিলেন সুলতান তুগ্রিল। আর সুলতান আলপ-আরসালান সালজুকী ছিলেন তুগ্রিলের অপর ভাই চাঘযী বেগের পুত্র। এভাবে সালজুকী গোত্রকে যদি ইফরাস ইয়াবের বংশধর বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে তারা তুর্ক ছিল না, বরং ছিল কায়ানী গোত্রের লোক। তুর্কিস্তানে বসবাসকারী তুর্করা অর্থাৎ তাতারীরা বার বার ইরান ও খুরাসানে নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। তাদের মধ্যেই একটি গোত্র ছিল যারা উসমানীয় সালতানাতের ভিত্তি স্থাপন করে। উসমানী তুর্ক নামে খ্যাত এই বংশের অবস্থাদি আগামীতে বর্ণিত হবে।

মুঘল শব্দের ব্যাখ্যা

মুঘল খানের বংশধরকে মুঘল গোত্র বলা হয়। মুঘল হচ্ছে মুঘুল-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যারা মুঘলকে মুঘুল-এর এক বচন মনে করেন তারা ভ্রান্তিতে রয়েছেন, কেননা মুঘুল বহুবচন নয় বরং এক বচন।

ফারাতাতার

মুঘল ও তাতাররা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারপর পৃথক পৃথক দেশে বসতি স্থাপন করে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত কায়ানী বংশ তুরান দেশের শাসনক্ষমতার অধিকারী ছিল। কায়ানীরা তাতারীদের পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে মুঘলরা সর্বদা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয় এবং তাতারীদের উপর বাড়াবাড়ি করার কোন সুযোগ পায়নি। ঐ সমস্ত যুদ্ধে মুঘলদের বেশিরভাগ স্ত্রীলোক তাতারীদের দখলে এসে যেত। আর এই স্ত্রীলোকদের গর্ভে যে সব সন্তান জন্ম নিত তাদেরকে তাতারীরা দাসীপুত্র মনে করত। এই দাসীপুত্ররা তাতারীদের সম্পত্তির অধিকারী হতো না। ধীরে ধীরে এ জাতীয় লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং তাদের বিবাহ-শাদীও তাদেরই বর্ণের লোকদের সাথে হতে লাগল। আর এর ফলে তৃতীয় আর একটি জাতির উদ্ভব হয়, যাদের উপাধি দেওয়া হয় ফারাতাতার। কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা, এই সমস্ত লোককে তুর্কমান বলা হয়ে থাকে। মুঘলদের প্রতি তাতারীদের ঘৃণা পোষণের কারণেই তারা মুঘল স্ত্রীলোকদের সন্তানদের সন্তানকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করত না। অন্যথায় মুঘল এবং তাতার তো একই পিতার বংশধর।

একটি ভুল ধারণা ও তার অপনোদন

কেউ কেউ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে উযবেক জাতিকে তাতারী জাতি বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে উযবেকরা হচ্ছে চেঙ্গিয খানের বংশধরদের একটি গোত্রের নাম। খুব সম্ভবত এই ভুল ধারণা এই জন্য সৃষ্টি হয়েছে যে, হিন্দুস্থানের মুঘল বাদশাহদের সাথে বেশ কয়েকজন উযবেক শাসকের যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। ঐ উযবেকরা তখন তুর্কিস্তানে বাদশাহী করত। আর ওদেরকে তুর্কিস্তানে বাদশাহী করতে দেখে আজকালকার ঐতিহাসিকরা ধরে নিয়েছেন যে, ওরা ছিল তাতারী। হ্যাঁ, তাতারীদের সুলতানতো হচ্ছে উসমানীয় সুলতান। মুঘল গোত্রগুলোর কাচাক, ঈগুর, খিল্জ, কাচার, ইফশার, জালায়ির, আরলাত, দুগলাত, কালতারাও, সালদূয, আরগুন, কুচীন, তারখানী, তুগায়ী, কাকশান প্রভৃতি অনেক শাখা রয়েছে। এই সমস্ত শাখার বিস্তারিত বিবরণ দানের প্রয়োজন এখানে নেই।

অতএব একথা এখন ভালভাবে বোঝা গেল যে, তুর্ক হচ্ছে এমন একটি সাধারণ শব্দ, যা মুঘল তাতার উভয় গোত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা, তাতার এবং মুঘলরা হচ্ছে একই তুর্ক গোত্রের দু'টি শাখা। মুঘলদের মূল বাসস্থান ছিল চীন এবং মঙ্গোলিয়ায় আর তাতারীদের বাসস্থান ছিল তুর্কিস্তানে। পরবর্তীকালে তাতারীদেরকে তুর্ক বলা হতো এবং ধীরে ধীরে তুর্ক শব্দের ব্যাপকতা হ্রাস পেয়ে তা তাতারের সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপ তাতার শব্দের প্রচলিত অর্থও অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তুর্ক, মুঘল উভয় জাতির নামই বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এখন কোন কোন ঐতিহাসিক মূল উৎসের প্রেক্ষিতে তুর্ক নামে মুঘলদের উল্লেখও করে থাকেন। কেননা, তারা হচ্ছে মূলত তুর্ক ইব্ন ইয়াফিসের বংশধর। কেউ কেউ সালজুকীদেরকেও তুর্ক বলে থাকেন। এ কারণেই কেউ কেউ আবার উসমানীয় সুলতানদেরকেও মুঘলদের স্বগোত্রীয় আখ্যা দিয়ে থাকেন। যা হোক উপরের বর্ণনাটি মনোযোগ সহকারে পড়ে নিলে ইতিহাস পাঠকদের অনেক সন্দেহেরই নিরসন হয়ে যাবে। এবার আমরা চেঙ্গিযী মুঘলদের ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করবো। তবে এর পূর্বে আর একটি কথা হৃদয়ঙ্গম করে নিতে হবে যে, তাতারী জাতি ছিল অধিক ক্ষমতাশালী। তারা মুঘলদেরকে তাদের এলাকার বাইরে পা রাখার কোন সুযোগই দিত না। ফলে মুঘলরা তুর্কিস্তান থেকে বের হয়ে খুরাসান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে এই জাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষী বীর বাহাদুর লোকেরা ইসলামী সাম্রাজ্যসমূহে বড় বড় পদ লাভ করে তাদের প্রাচীন বাসভূমি তুর্কিস্তানের কথা ভুলে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে হরেক ধরনের সভ্যতা সংস্কৃতির উদ্ভবও ঘটেছিল। তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রুরাও তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছিল। অতএব স্বাভাবিকভাবে সেই মুহূর্তটি এসে গিয়েছিল, যখন এই জাতিও তাদের চূড়ান্ত মূর্খতা, অশিষ্টতা, পাশবিকতা ও দুর্দান্ত স্বভাব নিয়ে নিজেদের প্রাচীন পাহাড়িয়া জন্মভূমি ছেড়ে সভ্য দুনিয়ায় বেরিয়ে পড়বে এবং যারা অলস ও অকর্মণ্য তাদের আতংক ও ত্রাসে পরিণত হবে।

চেঙ্গিয খান

মুঘলদের আকার-আকৃতি

ঐতিহাসিকরা এই মুঘলদের যে আকার-আকৃতি বর্ণনা করেছেন তা হলো, এদের আকার-আকৃতির সাথে তুর্কদের অনেক মিল রয়েছে। এরা হচ্ছে প্রশস্ত বক্ষ, খোলামেলা চেহারা, অপেক্ষাকৃত ছোট উরু ও পিঙ্গল বর্ণের অধিকারী। এরা খুবই চটপটে এবং বিচক্ষণ। যখন কোন কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে তখন সে কথা কারো কাছে প্রকাশ করে না। শত্রুদের জন্য অন্যমনষ্কতার সুযোগ নিয়ে তীর বেগে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আত্মরক্ষার কোন সুযোগই তাদেরকে দেয় না। তারা নানা ধরনের কলাকৌশল জানে এবং শত্রুর পালিয়ে যাবার সব পথ বন্ধ করে দেয়। এদের স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে এবং অস্ত্র চালনায় বলতে গেলে, তারা পুরুষদেরই সমকক্ষ। এরা যে কোন জন্তুর গোশত ভক্ষণ করে। কোন জিনিসেরই বাছ-বিচার করে না। কোন ব্যক্তি গুপ্তচররূপে তাদের দেশে যেতে পারে না। কেননা, আকার-আকৃতি দ্বারা তারা তাকে চিনে ফেলে। বিজয়ী হলে ওরা প্রতিপক্ষের স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলকেই নির্বিবাদে হত্যা করে। ওদের হত্যাকাণ্ড দেখে পাইকারী হত্যা কাকে বলে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়। ওরা যখন আক্রমণ করে তখন জনবসতি একদম ধ্বংস করে দেয়। ওদের ক্রিয়াকাণ্ড দেখে মনে হয়, ধন-সম্পদ নয়,বরং ধ্বংসই যেন তাদের জীবনের লক্ষ্য।

মুঘলদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা

মুঘলদের দেশ ছয়টি প্রদেশ বা অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশেরই ছিলেন এক একজন শাসক বা রাজা। আর এই সমস্ত শাসক বা রাজা ছিলেন একজন সম্রাটের অধীন। ঐ সম্রাট থাকতেন তামগা আচে। বুযবাখরা উল্লিখিত ছয়টি প্রদেশের একটিকে শাসন করত। তুমনাহ খান ইব্ন বাইসুনকুর খানের আমল পর্যন্ত তাদের শাসনের এই ধারা অব্যাহত থাকে। তুমনাহ খানের ছিল এগার পুত্র। তন্মধ্যে নয়জন এক স্ত্রীর গর্ভে এবং অপর দু'জন অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মলাভ করেছিল। পরবর্তী দু'পুত্র ছিল যমজ। তুমনাহ খান এদের দু'জনের নাম রাখল কুবুল খান ও কাচূলী বাহাদুর।

কাচূলীর স্বপ্ন

একদা রাতের বেলা কাচূলী বাহাদুর স্বপ্ন দেখল, একটি তারা তার ভাই কুবুল খানের গলাবন্ধ থেকে বের হয়ে আকাশে গিয়ে পৌঁছাল এবং সেখান থেকে পৃথিবীর উপর আলো ছড়াতে শুরু করল। অল্প কিছুক্ষণ পর ঐ তারা অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তার স্থলে অন্য একটি তারার অভ্যুদয় ঘটল। অল্প কিছুক্ষণ পর এটাও অদৃশ্য হয়ে গেল এবং এর স্থলে তৃতীয় আর একটি তারার অভ্যুদয় ঘটল। এই তৃতীয় তারা অদৃশ্য হওয়ার পর যে চতুর্থ তারাটির অভ্যুদয় ঘটল তা এত প্রকাণ্ড ও উজ্জ্বল ছিল যে, সমগ্র বিশ্ব তার আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল। এই প্রকাণ্ড তারাটিও অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার আকাশে উদিত হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো

উজ্জ্বল তারা। এই দৃশ্য দেখে কাচূলী বাহাদুরের চোখ খুলে গেল। সে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করল এবং চিন্তা করতে করতে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়ল। এবার সে স্বপ্নে দেখল, স্বয়ং তার গলাবন্ধ থেকে একটি তারা বের হলো এবং আসমানে গিয়ে আলো বিকিরণ করতে লাগল। তারপর দ্বিতীয় তারা, তারপর তৃতীয় তারা। মোটকথা, একের পর এক সাতটি তারা বের হলো। সপ্তম তারার পর একটি প্রকাণ্ড এবং উজ্জ্বল তারা উদিত হলো, যার আলোয় সমগ্র বিশ্ব ঝলমলিয়ে উঠল। এই প্রকাণ্ড ও উজ্জ্বল তারা অদৃশ্য হওয়ার পর কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা উদিত হলো। তারপর কাচূলী বাহাদুরের চোখ খুলে গেল। পরদিন ভোর বেলা সে এ দু'টি স্বপ্নই তার পিতার কাছে বর্ণনা করল।

তুমনাহ্ খানের ব্যাখ্যা

তুমনাহ্ খান স্বপ্নের বিবরণ শুনে বললেন, কুবুল খানের বংশধরদের চতুর্থ স্তরে একজন বিরাট বাদশাহর জন্ম হবে এবং তোমার বংশধরদের অষ্টম স্তরে জন্ম হবে আর একজন বিরাট বাদশাহর। তারপর তুমনাহ্ খান কুবুল খান এবং কাচূলী বাহুদুরকে আপোসে মিলেমিশে থাকার উপদেশ দেন। তিনি উভয় পুত্রের মধ্যে একটি অঙ্গীকারনামা লিখিয়ে নিয়ে তাতে উভয়ের স্বাক্ষর নেন এবং নিজের ও মুহর লাগিয়ে তা খাজাঞ্চীর হাতে অর্পণ করেন এবং উপদেশ দেন, যেন এই অঙ্গীকারনামা বংশ-পরম্পরায় অক্ষত ও সংরক্ষিত থাকে। উক্ত অঙ্গীকারনামায় লেখা হয়েছিল, হুকুমত ও বাদশাহী কুবুল খানের বংশধরদের মধ্যে থাকবে এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব থাকবে কাচূলী বহাদুরের বংশধরদের মধ্যে। তুমনাহ্ খানের মৃত্যুর পর কুবুল খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুবুল খানের পর যথাক্রমে কুভায়লা খান, বরতান বাহাদুর এবং মাইসূকা সিংহাসনে আরোহণ করেন।

চেঙ্গিয খানের জন্ম

৫৪১ হিজরীর ২০শে যিলকাদ (১১৪৭ খ্রি মে) মাইসূকা বাহাদুরের ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ঐ বছরই মুঘলিস্তানের কাআন আকবর তথা মহান বাদশাহর মৃত্যু হয়। তার নাম ছিল তামূচীন। তাই মাইসূকা বাহাদুর তার এই পুত্রের নাম রাখলেন তামূচীন। পরবর্তীকালে সে চেঙ্গিয খান নামে খ্যাতি লাভ করে। ৫৬২ হিজরী সনে (১১৬৬-৬৭ খ্রি) যখন মাইসূকা বাহাদুরের মৃত্যু হয় তখন তামূচীনের বয়স ছিল মাত্র তের বছর। মাইসূকা বাহাদুরের পর তামূচীন আপন ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি মনোনীত হন। কিন্তু অল্প বয়স্ক ও অনভিজ্ঞ দেখে জনসাধারণ তার নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে। ফলে দেশে বিদ্রোহের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

চেঙ্গিয খানের স্বপ্ন

এই পরিস্থিতিতে তামূচীন স্বপ্নে দেখেন, তার উভয় হাতে তরবারি রয়েছে। তিনি যখন তার দুই হাত পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে প্রসারিত করলেন তখন তরবারির অগ্রভাগ পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তিনি এই স্বপ্নটি তার মায়ের কাছে বর্ণনা করেন। এতে তার মায়ের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, তার এই ছেলেটি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমগ্র লোককে

কাঁপিয়ে তুলবে এবং তার হাতে প্রচুর রক্ত ঝরবে। এ কথাটি তার মায়ের পূর্ব থেকেই জানা ছিল। কেননা তামূচীন যখন তার মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ ছিল। মা এই মুঠি খুলে দেখতে পান যে, তাতে থোকা থোকা জমাট বাঁধা রক্ত রয়েছে। এই জমাট রক্ত দেখে উপস্থিত সকলেই এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, এই ছেলে ভবিষ্যতে অত্যন্ত রক্তপিপাসু হবে। যাহোক, বিদ্রোহ এমনি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে,একমাত্র আমীর কারাচা ছাড়া কাচূলী বাহাদুরের বংশের সকলেই তামূচীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় তামূচীন তার সংলগ্ন রাজ্যের অধিপতি আভাঙ্গ খানের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং নিজে তারই আশ্রয়ে চলে যান। আভাঙ্গ-খান তামূচীনকে সাদরে গ্রহণ করেন, তাকে সান্ত্বনা দেন এবং আপন পুত্রের ন্যায় তার যত্ন-আত্তি করতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিন পর একটি বাহিনী গঠন করে চেঙ্গিয খান আপন আশ্রয়দাতা আভাঙ্গ খানের বিরুদ্ধে গোপন তৎপরতা শুরু করেন। এমনকি আপন সঙ্গীদের নিয়ে একটি গিরিগর্তে অবস্থান নিয়ে আভাঙ্গ খানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয় এবং তাতে ঘটনাচক্রে আমীর কারাচের তীরের আঘাতে ভীষণভাবে আহত হয়ে আভাঙ্গ খান পলায়ন করেন এবং ইয়াঙ্গ খান নামক অপর একজন অধিনায়কের হাতে পলায়নকালে নিহত হন। এবার এই সম্ভাবনা ছিল যে, ইয়াঙ্গ খান ও তামূচীনের মধ্যে সদ্ভাব বজায় থাকবে। কেননা আভাঙ্গ খানকে হত্যা করে ইয়াঙ্গ খান তামূচীনকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এই বিজয়ের পর চেঙ্গিয খান তার চারপাশে অনেক উপজাতিকে একত্র করেন। জনসাধারণও তার বীরত্ব প্রত্যক্ষ করে। সন্তুষ্টচিত্তে তাকে নেতা বলে মেনে নিতে শুরু করে। এমতাবস্থায় চেঙ্গিয খান একটি সুসংগঠিত বাহিনী নিয়ে ইয়াঙ্গ খানের এলাকায় সৈন্য সমাবেশ ঘটান। যুদ্ধে ইয়াঙ্গ খানও নিহত হন। ফলে চেঙ্গিয খান একটি বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। এই সমস্ত বিজয়ের পর হঠাৎ করে তামূচীন মুঘল গোত্রসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন এবং তার ক্ষমতা মুঘলিস্তানের মহান কাআনের সমপর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে।

নামের পরিবর্তন

ইতোমধ্যে তানকীরী নামীয় জনৈক ব্যক্তি চেঙ্গিয খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তানকীরীকে মুঘলরা একজন সংসার ত্যাগী সাধু এবং অত্যন্ত সম্মানিত লোক বলে মনে করত। তানকীরী চেঙ্গিয খানকে বলেন, আমি লাল বর্ণের জনৈক ব্যক্তিকে লাল পোশাকে একটি লাল ঘোড়ার পিঠের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পাই। সে আমাকে বলল, তুমি মহিসূকা বাহাদুরের পুত্রকে গিয়ে বল, সে যেন আজ থেকে তার নাম তামূচীনের পরিবর্তে চেঙ্গিয খান রাখে। চেঙ্গিয খানকে অনেক দেশের শাহানশাহ করাই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা। তানকীরীর এই কথা শুনে চেঙ্গিয খান তাকে একজন প্রতারক বলে ধারণা করে; তবে তার কথাটি মনমত হওয়ায় তা মেনে নিয়ে নিজেকে চেঙ্গিয খান নামে সাধারণ্যে পরিচিত করে তুলে। তুর্কী ভাষায় চেঙ্গিয খান অর্থ শাহানশাহ্। কিংবা এও হতে পারে যে, চেঙ্গিয খানের পর এই নাম শাহানশাহের সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন পর তানকীরীর কোন একটি কথাকে উপলক্ষ করে চেঙ্গিয খানের জনৈক সভাসদের সাথে তার ঝগড়া বাঁধে। সে

তানকীরীর ঘাড় ধরে শূন্যে উঠিয়ে এমন ভাবে তাকে ছুঁড়ে মারে যে, সে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তারপর ধীরে ধীরে সমগ্র মুঘল গোত্রে এবং মুঘলিস্তানে চেঙ্গিয খানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কাআনে আকবর তার সাথে মুকাবিলা করে নিহত হন। তারপর চেঙ্গিয খানকেই সকলে কাআনে আকবর হিসাবে মেনে নেয়। এবার চেঙ্গিয খান তাতার গোত্রসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তাতারীদের সম্রাট চেঙ্গিয খানের মুকাবিলায় নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল দেখতে পান এবং চেঙ্গিয খানের কাছে আপন মেয়েকে বিয়ে দিয়ে তার সাথে একটি আপোস-চুক্তি সম্পাদন করেন। তারপর তাতারী অধিনায়করা নিজেদের বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বাদশাহ বাধ্য হয়ে চেঙ্গিয খানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত তাতারী বাদশাহ বিষপানে আত্মহত্যা করেন এবং সেই সাথে চেঙ্গিয খান আপন শ্বশুরের সাম্রাজ্যের বেশির ভাগ অংশ দখল করে নেন। প্রকৃতপক্ষে চেঙ্গিয খান মুঘলদের মধ্যে অত্যন্ত সজাগ মস্তিষ্ক ও বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি তার জীবনে যে সমস্ত কাজ সম্পাদন করেছেন তাতে তার বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার স্বাক্ষর মিলে। তিনি তার হত্যাকাণ্ডের কারণে অত্যন্ত কুখ্যাতি অর্জন করেন। তবে ঐ যুগে দুনিয়ার অবস্থা ও পরিবেশ এমনি ছিল যে, তিনি তাতে ইচ্ছা করলেও নিজেকে রক্তারক্তি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

মুঘলদের ধর্ম

মুঘলদের ধর্মের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ওরা অবশ্য অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা ও ক্ষমতাশীল সত্তার ধারণা পোষণ করত। অর্থাৎ ওরা আল্লাহ্ তা'আলাকে বিশ্বাস করত। তবে ওদের ইবাদত-বন্দেগী ছিল অনেকটা হিন্দুস্থানের অনার্য তথা প্রাচীন অধিবাসীদের ইবাদত-বন্দেগীর মত। মুঘলদের ঐ দেশে কোন না কোন নবী অবশ্যই প্রেরিত হয়েছিলেন এবং মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে হিদায়াতনামাও নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু কালক্রমে নিজেদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে মুঘলরা তাদের নবী ও আসমানী হিদায়াতনামার কথা ভুলে বসেছিল। তাদের মধ্যে হারাম-হালালের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তারা যা পেত তাই খেত এবং যা ইচ্ছা তাই করত। তাদের দেশের আবহাওয়া, তাদের মধ্যে বিরাজিত গোত্রীয় হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা এসব কিছুর প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিকরা মুঘলদের সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন যে, তাদের ধর্মই ছিল মানুষকে হত্যা করা। তাদের মধ্যে জ্যোতিষ্ক পূজা এবং বিভিন্ন জড় বস্তুর পূজাও প্রচলিত ছিল। তাদেরকে অগ্নিপূজারী আখ্যায়িত করা না গেলেও তাদের মধ্যে কিছু কিছু অগ্নিপূজার অস্তিত্বও ছিল। ধর্ম ও মাযহাবের দিক দিয়ে এত পশ্চাৎপদ একটি গণ্ডমূর্খ জাতির মধ্যে চেঙ্গিয খানের আবির্ভাব ছিল একজন সংস্কারকেরই আবির্ভাবতুল্য। তিনি সর্বপ্রথম সমগ্র মুঘলিস্তানে, বলতে গেলে একেবারে রাতারাতি নিজের একটি সুদৃঢ় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তিনি মনোনিবেশ করেন মুঘলদের চারিত্রিক ও সামাজিক সংস্কার সাধনে।

সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহ

এটা ছিল সেই যুগ, যখন সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহ ইরান, খুরাসান, কাবুল, তুর্কিস্তান প্রভৃতি দেশ দখল করে বাগদাদ সাম্রাজ্য ধ্বংস করার কথা চিন্তা করছিলেন। তখন তাকে এশিয়া মহাদেশে সর্বাধিক শক্তিশালী মুসলমান বাদশাহ মনে করা হতো। আব্বাসীয় খলীফা নাসির লিদীনিল্লাহ এবং মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহের মধ্যে মনোমালিন্য এত চরমে গিয়ে পৌছেছিল যে, খাওয়ারিযম শাহ বাগদাদ আক্রমণের সংকল্প নেন। তখন আব্বাসীয় খলীফা, হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (র)-কে দূত হিসাবে খাওয়ারিযম শাহের কাছে পাঠান। শায়খ সুলতানের দরবারে পৌছে যথাযোগ্য বক্তৃতার মাধ্যমে তাকে বাগদাদ আক্রমণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তখন খাওয়ারিযম শাহ বলেন, শায়খ সাহেব, আপনি আব্বাসীয়দের বড় বেশি প্রশংসাকারী ও শুভাকাঙ্ক্ষী। অতএব আপনি বাগদাদে ফিরে যান। আমিতো আলাভীদেরকে আব্বাসীয়দের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি। তাই আব্বাসীয় খিলাফত ধ্বংস করে আলাভীদেরকে সাহায্য করতে চাই। আমি অবশ্যই বাগদাদ আক্রমণ করব।

খাওয়ারিযমের জন্য তিনজন মহাপুরুষের বদদু'আ

শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী বিফল হয়ে খাওয়ারিযম শাহের নিকট থেকে ফিরে আসেন। তখন তিনি তার জন্য এই বদ দু'আ করেন– হে আল্লাহ্! এর উপর জালিমদেরকে জয়ী কর। খাওয়ারিযম শাহ সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে এত তুষারপাত হয় যে, তাঁর চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তিনি বাধ্য হেয় পরবর্তী বছরের জন্য তাঁর বিজয় অভিযান স্থগিত রাখেন এবং রাস্তা থেকেই আপন রাজধানীতে ফিরে আসেন। ঘটনাচক্রে একদিন নেশার ঘোরে তিনি নির্দেশ দেন ঃ হযরত শায়খ মাজদুদ্দীনকে হত্যা কর। তাঁর এই নির্দেশ অনুযায়ী শায়খ সাহেবকে হত্যাও করা হয়। পরদিন যখন তার চৈতন্য ফিরে আসে তখন তিনি আপন কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়ে হযরত শায়খ মাজদুদ্দীনের রক্তমূল্য হযরত শায়খ নাজমুদ্দীন কুবরার খিদমতে প্রেরন করেন। শায়খ কুবরা তখন বলেন, শায়খ মাজদুদ্দীনের রক্তমূল্য পরিশোধ করতে গিয়ে হাজার হাজার মুসলমানের মস্তক কাটা যাবে। লোকের ধারণা, শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী, শায়খ মাজদুদ্দীন ও শায়খ নাজমুদ্দীনের বদদু'আর কারণে শাহের উপর বিপদ নেমে আসে।

চেঙ্গিয খান কর্তৃক সুলতান খাওয়ারিযম শাহের সাথে আপোসচুক্তির উদ্যোগ

চেঙ্গিয খান যখন মুঘলিস্তানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো নিচিহ্ন করে নিজের একটি বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি আপন প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি আপোসচুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কেননা উভয়ের সাম্রাজ্যের সীমান্ত রেখা ছিল অভিন্ন। চেঙ্গিয খান আপন দূতের

মাধ্যমে মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন--আমি এত বিরাট সংখ্যক দেশ জয় করেছি এবং আমার অধীনে এত বিরাট সংখ্যক যুদ্ধাভিজ্ঞ গোত্র রয়েছে যে, এখন আর অন্য কোন দেশ জয় করার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। অনুরূপভাবে তুমি বিরাট সংখ্যক দেশের দখলকার ও একচ্ছত্র শাসনক্ষমতার অধিকারী এক মহান সম্রাট। অতএব এটাই সমীচীন যে, আমি এবং তুমি উভয়ে পরস্পর বন্ধুত্ব ও ভালবাসার অঙ্গীকারে আবদ্ধ থাকব, যাতে আমরা একে অন্যের দিক থেকে নিশ্চিত থেকে মানব জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারি। ঐ পত্রে চেঙ্গিয খান আরো লিখেন– আমি তোমাকে আপন পুত্রের মতই স্নেহাস্পদ মনে করব। পত্র পাঠ করে মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহ্ বাহ্যত চেঙ্গিয খানের দূতদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং বন্ধুত্বের একটি অঙ্গীকারপত্র লিখে তাদের হাতে দেন। কিন্তু চেঙ্গিয খানের পত্রের একবারে শেষ লাইনটি 'আমি তোমাকে আপন পুত্রের মতই স্নেহাস্পদ মনে করব' তার পছন্দ হয়নি। তিনি এটাকে বরং নিজের জন্য কিছুটা অপমানজনক বলেই মনে করেন। অঙ্গীকার পত্রে উভয়েই অবাধ বাণিজ্যের কথা স্বীকার করেন এবং সে অনুযায়ী এক দেশের বণিক অন্যদেশে যাতায়াত করতে শুরু করে। চেঙ্গিয খান যদিও কাফির ছিলেন তা সত্ত্বেও তার বিচার-বুদ্ধির কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কেননা একজন বিরাট বাদশাহের দিক থেকে আশংকামুক্ত থাকার জন্যই তিনি তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এটাও তার বুদ্ধিমত্তার একটি বড় প্রমাণ যে, তিনি আপোস চুক্তিতে বণিকদের অবাধে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াতের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। বাহ্যত মনে হয়, তখন পর্যন্ত ইসলামী দেশসমূহকে পর্যুদস্ত করার কোন ইচ্ছা চেঙ্গিয খানের ছিল না।

কথিত আছে, উপরোক্ত আপোস চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর আব্বাসীয় খলীফা নাসির লিদীনিল্লাহ এক ব্যক্তির মাথা নেড়া করে তার উপর তরবারির আগা দিয়ে ক্ষত করে একটি চিঠি লিখেন। তারপর ক্ষতস্থানসমূহের মধ্যে সুরমা ভরে দেন। ঐ অভিনব চিঠিতে লেখা হয়েছিল– তুমি সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহকে আক্রমণ কর এবং আমাকে নিজের একজন সহানুভূতিশীল বন্ধু মনে কর। এভাবে নেড়া মাথার উপর চিঠি লেখার পর কিছুদিন অপেক্ষা করা হলো। যখন মাথায় চুল গজালো তখন লোকটিকে চেঙ্গিয খানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। লোকটি চেঙ্গিয খানের দরবারে পৌঁছে নিবেদন করে– আমি আব্বাসীয় খলীফার দূত। আপনার প্রতি খলীফার একটি পয়গাম আমার মাথার উপর অংকিত রয়েছে। আমার মাথা মুড়িয়ে ফেলুন এবং খলীফার পয়গাম পড়ুন। যাহোক ঐ ব্যক্তির মাথা মুড়িয়ে চেঙ্গিয খান খলীফার পত্র পাঠ করলেন। তারপর তিনি দূতের কাছে ওযর পেশ করে বললেন : আমি তো খাওয়ারিযম শাহের সাথে আপোসচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গেছি। অতএব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাকে আক্রমণ করতে পারি না। খলীফার দূত শেষ পর্যন্ত বিফল হয়ে নেড়া মাথায় দেশে ফিরে গেল। এবার চেঙ্গিয খান খাওয়ারিযম শাহের যে মৈত্রী ও ভালবাসার চুক্তি ইতিপূর্বে সম্পাদিত হয়েছিল সেটাকে আরো স্থায়ী ও সুদৃঢ় করার জন্য তার কাছে আরো একটি পত্র লেখেন। উক্ত চিঠিতে তিনি খাওয়ারিযম শাহের প্রতি আপন ভালবাসাকে আরো ফুটিয়ে তুলেন। এর কারণ ছিল এই যে, খাওয়ারিযম শাহ ছিলেন তার নিকট-প্রতিবেশী।

দুজনের সাম্রাজ্যের সীমারেখা ছিল অভিন্ন। একমাত্র এ কারণেই চেঙ্গিয় খান খাওয়ারিযম শাহ সম্পর্কে সব সময়ই ভীতিগ্রস্ত থাকতেন। চেঙ্গিয খান এ কথাও জানতেন যে, বাগদাদের খলীফা খাওয়ারিযম শাহের চাইতে অধিক প্রতিপত্তিশালী। তবে তাকে ভয় করার কোন কারণ নেই। কেননা তার সাম্রাজ্যের সীমারেখা এখান থেকে অনেক দূরে।

খাওয়ারিযম শাহের ভ্রান্তি

এটা খাওয়ারিযম শাহের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, চেঙ্গিয খান জনৈক দূত মারফত তার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। ঐ দূতকে সাড়ে চারশ' মুসলমান সওদাগরের একটি কাফেলার সাথে পাঠানো হয়। ঐ সওদাগররা বাণিজ্য ব্যাপদেশে মুঘলিস্তানে বেশ কিছু দিন অবস্থান করে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছিল। সওদাগরদের ঐ পুরো কাফেলাটিকে চেঙ্গিয খান নিজেরই প্রতিনিধিদল বলে ঘোষণা করেন। কেননা তাতে এমন কিছু লোক ছিলেন,যারা বেশ মর্যাদাসম্পন্ন ও সমঝদার। যখন কাফেলাটি আনযার নামক স্থানে পৌঁছে তখন খাওয়ারিযম শাহের নায়েবে সালতানাত, যিনি ওখানে বিদ্যমান ছিলেন, কাফেলার সব সদস্যকে বন্দী করে ফেলেন। কাফেলার লোকেরা অনেক করে বলল ঃ আমরা মুসলমান। শুধু বাণিজ্য ব্যাপদেশে মুঘলিস্তানে গিয়েছিলাম। এখন দেশে ফিরে আসছি এবং মুঘলিস্তানের বাদশাহর প্রতিনিধি হয়ে আসছি। কিন্তু খাওয়ারিযম শাহের ঐ শাসক এ সব কথায় কান দেননি। তিনি বরং খাওয়ারিযম শাহকে লিখেন– মুঘলিস্তান থেকে কিছু গুপ্তচর সওদাগর রাজপ্রতিনিধির বেশ ধরে এসেছে। আমি তাদেরকে বন্দী করে ফেলেছি। এখন তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করবো সে সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কামনা করি। সুলতান খাওয়ারিযম শাহ উত্তর দেন– ওদেরকে হত্যা করে ফেল। অতএব আনযারের শাসক ঐ সাড়ে চারশ সওদাগরকে হত্যা করে তাদের মালপত্র দখল করে নিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায় এবং চেঙ্গিয খানের কাছে গিয়ে সম্পূর্ণ কাফেলার নিহত হওয়ার ঘটনা ব্যক্ত করেন।

তারপর চেঙ্গিয খান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খাওয়ারিযম শাহের কাছে আর একটি পত্র পাঠান। তিনি তাতে লিখেন– আনযারের শাসক অত্যন্ত অযোগ্যের মত একটি কাজ করেছে। সে নিস্পাপ লোকদেরকে হত্যা করে জঘন্য অপরাধ করেছে। এটাই সমীচীন যে, হয় তাকে আমার কাছে সমর্পণ করুন অথবা আপনি নিজে তাকে কোন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন। চেঙ্গিয খান এই পত্র যে দূতের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন তাকে হত্যা করে ফেলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা, চেঙ্গিয খান এরপরও জনৈক দূত মারফত খাওয়ারিযম শাহের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি লিখেন ঃ দূতকে হত্যা করা কোন বাদশাহর কাজ নয়। উপরন্তু সওদাগরদের নিরাপত্তা দান বাদশাহের জন্য ফরজ। আমার এই দাবি সম্পর্কে আপনি পুনরায় চিন্তা-ভাবনা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যে দূত এই পত্রটি নিয়ে গিয়েছিল খাওয়ারিযম শাহ তাকেও হত্যা করে ফেলেন। এই সব পরিস্থিতি লক্ষ্য করে চেঙ্গিয খান মুঘলিস্তান ও তুর্কিস্তানের যুদ্ধ পারদর্শী বিভিন্ন গোত্র থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তারপর তিনি খাওয়ারিযম শাহকে বাদশাহ বলেও সম্বোধন করতেন না বরং তার সামনে যখন খাওয়ারিযম শাহের প্রসংগ উঠত তখন তিনি বলতেন, সে বাদশাহ

নয় বরং একজন চোর। কেননা যারা বাদশাহ তারা কখনও দূতকে হত্যা করে না। ঘটনাক্রমে ঐ সময়ে তূকতাগান নামীয় জনৈক সীমান্ত সর্দারের মধ্যে বিদ্রোহের কিছু আলামত প্রত্যক্ষ করে তাকে শায়েস্তা করার জন্য চেঙ্গিয খান আপন পুত্র জূজী খানকে প্রেরণ করেন। তূকতাগান তখন মাওরাউন নাহর এলাকায় চলে আসেন যেখানে খাওয়ারিযম শাহও কোন না কোন কারণে অবস্থান করছিলেন। জূজী খান তূকতাগানের পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে বন্দী করে ফেলেন। এটা দেখে খাওয়ারিযম শাহ আপন বাহিনীসহ জূজী খানের দিকে অগ্রসর হন। তখন জূজীখান খাওয়ারিযম শাহের কাছে এই মর্মে একটি পত্র লিখেন– আপনি আমাকে আক্রমণ করবেন না। আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হইনি। আমি শুধু আপন বিদ্রোহীকে বন্দী করতে এসেছিলাম। আমার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু খাওয়ারিযম শাহ জূজী খানের ঐ সব কথায় কর্ণপাত না করে তার উপর হামলা চালান। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে, কিন্তু কোন ফায়সালা হয়নি। রাতের বেলা জূজী খান আপন সেনা শিবিরে আগুন লাগিয়ে মুঘলিস্তানের দিকে ফিরে যান এবং পূর্বাপর অবস্থা সম্পর্কে চেঙ্গিয খানকে অবহিত করেন। চেঙ্গিয খান এই সমস্ত সংবাদ শোনার সাথে সাথে মুঘলদের বিরাট বাহিনী নিয়ে ইরান ও অন্যান্য ইসলামী সাম্রাজ্যাভিমুখে রওয়ানা হন। এখানে অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে আমাদের চিন্তা করে দেখা উচিত, একজন মুসলমান বাদশাহ বার বার কিরূপ অধমের মত আচরণ করেছেন এবং একজন কাফির বাদশাহ কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ বাধ্যবাধকতার কারণে ইসলামী দেশসমূহের উপর হামলা করেছেন। যদি সত্য ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে চেঙ্গিয খানকে অপরাধী সাব্যস্ত করা মোটেই সম্ভব হবে না।

ইসলামী দেশসমূহের উদ্দেশে চেঙ্গিয খানের অভিযান

৬১৫ হিজরীতে (১২৬৬-৬৭ খ্রি) চেঙ্গিয খান ইসলামী দেশসমূহের উদ্দেশে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি আনযারের নিকটবর্তী হয়ে তার তিন পুত্র জূজী খান, উকতাই খান ও চুগতাই খানকে আনযার অবরোধে মোতায়েন করেন। তারপর আলাক নূইয়া ও মননকূ বূকাকে এক এক বাহিনী দিয়ে খোজান্দ ও নাবাকত অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং আপন কনিষ্ঠ পুত্র তূলীখানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি স্বয়ং বুখারা অভিমুখে রওয়ানা হন। মুঘলদের এই হামলার খবর পেয়ে খাওয়ারিযম শাহ ষাট হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী আনযারের দিকে এবং ত্রিশ হাজার অশ্বারোহীর এক বাহিনী বুখারার দিকে প্রেরণ করেন। তারপর দুই লক্ষ দশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনীকে সমরকন্দের হিফাযতের জন্য এবং ষাট হাজার লোককে বুরুজ ও দুর্গ মেরামতের জন্য মোতায়েন করে স্বয়ং সমরকন্দ থেকে খুরাসানের উদ্দেশে রওয়ানা হন।

খাওয়ারিযম শাহের কাপুরুষতা

এক্ষেত্রে খাওয়ারিযম শাহের যে বিরাট ভ্রান্তি বা কাপুরুষতা লক্ষ্য করা গেছে তা হলো, এত বিরাট এক সেনাবাহিনীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং চেঙ্গিয খানের মুকাবিলা

করেননি, বরং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে আসেন। নিজেদের বাদশাহকে সমরকন্দ ছেড়ে খুরাসানের দিকে যেতে দেখে নিশ্চয়ই খাওয়ারিযম শাহের সৈন্যদের অন্তরে কিছু না কিছু হতাশার সৃষ্টি হয়ে থাকবে। এর চাইতেও দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, যখন তিনি সমরকন্দ ছেড়ে যাচ্ছিলেন তখন একটি পরিখার পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, আমাদের উপর এত বিরাট এক জাতি হামলা করেছে যে, যদি তারা শুধু নিজেদের চাবুকগুলো একত্র করে ফেলে দেয় তাহলে সমরকন্দের এই পরিখা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ কথা শুনে সমরকন্দের হিফাজতে নিয়োজিত সৈন্যরা মুঘলদের সম্পর্কে আরো বেশি ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। খাওয়ারিযম শাহ সমরকন্দ থেকে বলখে গিয়ে পৌঁছেন এবং আপন পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ মাযেন্দানে পাঠিয়ে দেন। বলখে পৌঁছে তিনি মুঘলদের মুকাবিলায় কি কৌশল অবলম্বন করতে হবে সে সম্পর্কে আপন আমীর-উমারা ও অধিনায়কদের সাথে পরামর্শ করেন। খাওয়ারিযম শাহের ছিল সাত পুত্র। তন্মধ্যে জালালুদ্দীন নামক পুত্র পিতাকে ভীতিগ্রস্ত অবস্থায় দেখে বলল ঃ আপনি যদি ইরাকের দিকে যেতে চান তাহলে সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব আমার হাতে অর্পণ করে নিশ্চিন্তে যেতে পারেন। আল্লাহ্ চাহে তো আমি শত্রুদের উপর হামলা চালাবো এবং জাইহূন নদীর ওপারে গিয়ে আমার তাঁবু স্থাপন করব। মাওরাউন নাহ্র আমার দায়িত্বে অর্পণ করুন এবং আপনি শুধু ইরাক ও খুরাসান সামলান। কিন্তু খাওয়ারিযম শাহ তার পুত্রের একথা পছন্দ করলেন না। তিনি বলখ থেকে হিরাত অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ এসে পৌঁছল যে, মুঘলরা বুখারা জয় করে সেখানকার সমগ্র অধিবাসীকে হত্যা করে ফেলেছে। এ সংবাদ শুনে খাওয়ারিযম শাহ্ আরো বেশি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং হিরাত থেকে নিশাপুর চলে যান। মুঘলরা তখন পর্যন্ত জাইহুন নদী অতিক্রম করার সাহস পায়নি বরং মাওরাউন নাহরেই লুটপাট চালাতে থাকে। এদিকে খাওয়ারিযম শাহ নিশাপুরে আরাম-আয়েশে লিপ্ত থাকেন।

৬১৭ হিজরীর সফর (১২২০ খ্রি মে) মাসে চেঙ্গিয খানের জনৈক অধিনায়ক ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে জাইহূন নদী অতিক্রম করেন। এই সংবাদ শুনে খাওয়ারিযম শাহ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পরিবার-পরিজন ও ধনভাণ্ডার কারূন দুর্গে পাঠিয়ে দিয়ে স্বয়ং নিশাপুর থেকে ইসফারাইনে চলে যান। মুঘলরা যখন লক্ষ্য করল যে, খাওয়ারিযম শাহ তাদের মুকাবিলায় আসছেন না বরং তাদের ভয়ে এদিক-সেদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন তাদের সাহস আরো বৃদ্ধি পায়। তারা এবার আগে বেড়ে খাওয়ারিযম শাহের পশ্চাদ্ধাবন করতে শুরু করে। খাওয়ারিযম শাহ মুঘলদের থেকে পালাতে পালাতে কারূনে গিয়ে পৌঁছেন, যেখানে তার পরিবার-পরিজন ও ধনভাণ্ডার ছিল। কিন্তু তার সেখানে পৌঁছার পূর্বেই মুঘলরা অপর দিক থেকে এসে কারূন দুর্গ অবরোধ করে ফেলেছিল। তারপর খাওয়ারিযম শাহ সেখান থেকে পালিয়ে আস্তারাবাদ, তারপর আস্তারাবাদ থেকে আমল গিয়ে পৌঁছেন।

খাওয়ারিযম শাহের মৃত্যু

শেষ পর্যন্ত খাওয়ারিযম শাহ একটি দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তার কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, মুঘলরা কারূন দুর্গ জয় করে তার সমগ্র ধনভাণ্ডার এবং পরিবার-পরিজনের উপর

নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। এই সংবাদ শুনে তিনি এতই দুঃখিত ও মর্মাহত হন যে, সেই দুঃখেই তার জীবন প্রদীপ নিভে যায়। তিনি যে পোশাক পরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেই পোশাকেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। কোন কাফন তার ভাগ্যে জুটেনি। এবার মুঘলরা সমগ্র খুরাসান ও ইরানে লুটপাট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশের শাসন ক্ষমতায় নিয়োজিত খাওয়ারিযম শাহের পুত্ররা মুঘলদের হাতে নিহত হন। শুধু একজন পুত্র অবশিষ্ট থাকেন। তার নাম ছিল জালালুদ্দীন। তিনি তাঁর ভাইদের মধ্যে অধিকতর বিচক্ষণ বিদ্যোৎসাহী ও বীর পুরুষ ছিলেন।

এই সময়ে বুখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে মুঘলরা সমগ্র খুরাসানে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ৬১৭ হিজরীর রবিউল আউয়ালের শেষ দিকে (১২২০ খ্রি জুনের প্রথম দিকে) চেঙ্গিয খান জাইহূন নদী অতিক্রম করে বলখ ও হিরাতে পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালান। যখন খাওয়ারিযম শাহের পরিবার-পরিজন বন্দী হয়ে চেঙ্গিয খানের সামনে নীত হন তখন ঐ পাষাণ ব্যক্তিটি স্ত্রীলোক এবং শিশুদের প্রতিও কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করেননি, বরং সকলকে হত্যার নির্দেশ দেন। বলখ ও হিরাতের পর মুঘলরা নিশাপুর, মায়েন্দাস্নান, আমল, রাই, হামদান, কুম, কাযভীন, তাবরীয, তিফলীস, মারাগাহ্ প্রভৃতি স্থানে এমন পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড চালায় যে, তাদের হাত থেকে শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ কেউই রক্ষা পায়নি। যেহেতু আল্লাহ্র বান্দাদেরকে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার দৃশ্য ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি তাই জনসাধারণ মুঘলদের সম্পর্কে এতই ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, একজন মুঘল স্ত্রীলোকও কোন ঘরে ঢুকে লুটপাট শুরু করে দিলে তাকে বাধা দান তো দূরের কথা, তার দিকে চোখ তুলে তাকাবার মত সাহসও কারো হতো না। হামদানবাসীরা, যারা মুঘলদের পাইকারী হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে গিয়েছিল, একত্রিত হয় এবং মুঘলদের স্থানীয় শাসনকর্তাকে দুর্বল পেয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাকে হত্যা করে। এই ঘটনার পর মুঘলরা হামদানবাসীদেরকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করে। তারপর মুঘলদের মুকাবিলা করার দুঃসাহস আর কারো হয়নি।

জালালুদ্দীন ইব্ন খাওয়ারিযম

জালালুদ্দীন ইব্ন খাওয়ারিযম শাহ আপন পিতার মৃত্যুর পর কাস্পিয়ান সাগরের একটি দ্বীপ থেকে রওয়ানা হয়ে তাবরীয শহরে আসেন। এখানে এসে তিনি তার কিছু সংখ্যক দুঃসাহসী বন্ধু-বান্ধবকে একত্র করেন। মুঘলরা তাকে বন্দী করার জন্য ঘেরাও করে। কিন্তু তিনি আপন সঙ্গী-সাথীসহ মুঘলদের ঘেরাও থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি গাযনীনে যান। সেখানে তার চারপাশে বেশ কিছুসংখ্যক সহানুভূতিশীল ও সমব্যথী বন্ধু এসে জোটে। জালালুদ্দীন কিছুটা দুঃসাহস করে ঐ অঞ্চলে যে মুঘল বাহিনী ছিল তাদের উপর হামলা চালান এবং তাদেরকে পরাজিত করেন। খুব সম্ভবত এই প্রথম বারের মত মুঘলবাহিনী জালালুদ্দীনের মুকাবিলায় পরাজয় বরণ করে। এই সংবাদ শুনে চেঙ্গিয খান তাইফান দুর্গ থেকে রওয়ানা হয়ে বামিয়ান এসে পৌঁছেন। সেখানে তার এক নাতি অর্থাৎ দুঘতাই খানের পুত্র তীরবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। চেঙ্গিয খান বামিয়ানের স্ত্রী-পুরুষ সবাইকে হত্যা করার এমনি কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোককে হত্যা করা হলে তার গর্ভ থেকে

বাচ্চা বের করে সে বাচ্চারও গর্দান মারা হতো। সুলতান জালালুদ্দীন মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করার পর অনতিবিলম্বে আপন অবস্থাকে মজবুত ও সুদৃঢ় করে তুলেন এবং চেঙ্গিয খানের মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। যদি খাওয়ারিযম শাহের পরিবর্তে জালালুদ্দীন বাদশাহ হতেন তাহলে মুঘলরা এরূপ বাড়াবাড়ি করার সুযোগ নিশ্চয়ই পেত না। খাওয়ারিযম শাহেরই ভীরুতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে তার বিরাট সেনাবাহিনী কোন কাজে লাগেনি। তিনি তার অধীনস্থ শহর, বন্দর ও বসতিসমূহকে মুঘলদের সহজ শিকারে পরিণত করে এখান থেকে সেখানে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। যাহোক, সুলতান জালালুদ্দীন এক বাহিনী গঠন করে চেঙ্গিয খানের মুকাবিলায় উদ্যত হয়েছেন ঠিক এমনি মুহূর্তে বাহিনীর কিছু সংখ্যক অধিনায়ক ধোঁকা দিয়ে মুঘলদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। ফলে জালালুদ্দীনের কাছে শুধু সাতশ লোক থাকে। ওদেরকে নিয়েই লড়তে লড়তে সুলতান জালালুদ্দীন সিন্ধু নদের উপকূল অভিমুখে রওয়ানা হন। চেঙ্গিয খানও আপন বিরাট বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছেন। জালালুদ্দীন সিন্ধুনদকে পটভূমিতে রেখে মুঘল বাহিনীর মুকাবিলা করেন। মুঘলরা ধনুক আকারে ঘেরাও করে জালালুদ্দীনের উপর হামলা চালায়। এতদসত্ত্বেও জালালুদ্দীন অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুঘলদের মুকাবিলা করেন এবং তাদেরকে বিপর্যস্ত করে তোলেন। সুলতান জালালুদ্দীন যখন বিপুল বিক্রমে মুঘলদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন তখন তারা অনেক দূর পিছনে হটে যেত। কিন্তু প্রচুর জনবল থাকায় তারা পুনরায় এগিয়ে এসে হামলা করত। নিজের জনবলের স্বল্পতার কারণে এই যুদ্ধে সুলতান জালালুদ্দীন জয়ী হতে পারেননি সত্য, তবে এর মাধ্যমে তাঁর বীরত্ব, তেজস্বিতা ও দুঃসাহসিকতার যে ছবি চেঙ্গিয খানের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল তা বোধ করি তিনি কোনদিন বিস্মৃত হতে পারেননি। জালালুদ্দীন বাহিনীর এই সাতশ বীর যোদ্ধার মধ্যে মাত্র একশ জনের মত যখন অবশিষ্ট থাকে তখন জালালুদ্দীন আপন দেহ থেকে বর্ম খুলে দূরে নিক্ষেপ করেন এবং নিজের মুকুটটি হাতে নিয়ে সিন্ধু নদে ঘোড়া ছুটিয়ে দেন। বাকি সঙ্গীরাও তাদের নেতাকে অনুসরণ করে। চেঙ্গিয খান চেয়েছিলেন মুঘলবাহিনীও যেন ওদেরকে অনুসরণ করে এবং জালালুদ্দীনকে বন্দী করে নিয়ে আসে। কিন্তু ঐ উত্তাল সমুদ্রে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া যে যার তার কাজ নয়। যাহোক, চেঙ্গিয খান এবং মুঘল বাহিনী সিন্ধু নদের তীরে দাঁড়িয়ে ঐ সামান্য কয়েকজন সৈন্যের উপর অবিরাম তীর বর্ষণ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সুলতান জালালুদ্দীনসহ মাত্র সাত ব্যক্তি সাঁতরিয়ে তীরে উঠতে সক্ষম হন। বাকি সবাই মুঘলদের তীরের আঘাতে নিহত হয়। সুলতান জালালুদ্দীন এপারে পৌঁছে দেহ থেকে কাপড় খুলে তা শুকাবার জন্য ঝোঁপের উপর দেন। তারপর নিজের বর্শাটি ভূমির উপর গেড়ে তার উপর মুকুটটি রাখেন এবং তার নিচে বসে বিশ্রাম নিতে থাকেন। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে জিনটিও খুলেন এবং তা শুকাবার জন্য সামনে রেখে দেন।

চেঙ্গিয খান অপর পারে দাঁড়িয়ে বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে জালালুদ্দীনের এসব ব্যাপার লক্ষ্য করেন। এক সময় তিনি তার সকল পুত্র এবং অধিনায়কদেরকে, যারা সেখানে তার সাথে ছিল, সম্মুখে ডেকে এনে বলেন– আমি আজ পর্যন্ত এমন একজন বাহাদুর ও দুঃসাহসী ব্যক্তি দেখিনি। তাঁর সঙ্গীরাও তাঁরই মত অতুলনীয় বীর। এত বিরাট নদী এভাবে সাঁতরিয়ে অতিক্রম করা তাঁদের পক্ষেই সাজে। যদি এই ব্যক্তি জীবিত থাকে তাহলে আমার আশঙ্কা

হচ্ছে, সে একদিন দুনিয়া থেকে মুঘলদের নাম-নিশানা মুছে তবে ক্ষান্ত হবে। অতএব একে হত্যার ব্যাপারে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কিন্তু চেঙ্গিয খানের পক্ষে সেদিন সিন্ধু নদের তীরে দাঁড়িয়ে শুধু আক্ষেপ করাটাই সার হলো। সিন্ধু নদ অতিক্রম করা তার বা তার বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হলো না। এটা হচ্ছে ৬২০ হিজরীর (১২২৩ খ্রি) ঘটনা।

তারপর সুলতান জালালুদ্দীন সিন্ধুর কিছু অঞ্চল জয় করেন। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা সেখানে এসে তাঁর সাথে মিলিত হতে থাকে। কিছুদিন পর সুলতান জালালুদ্দীন সিন্ধু নদ অতিক্রম করে কিরমানে এসে পৌছেন। সেখান থেকে শীরাযে যান। ঐ সময়ে তিনি ফিদায়ীদেরকে একের পর এক পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে আলামূত দুর্গ ছাড়া তাদের প্রায় সবগুলো দুর্গই ধ্বংস করে ফেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফিদায়ী বা বাতিনী সম্প্রদায় ইতিপূর্বে বর্ণিত মুঘলদের হামলা চলাকালে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত ছিল। মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হচ্ছে, এ খবর শুনে তারা আনন্দ প্রকাশ করছিল। যেহেতু মুঘলদের মত ওরাও মুসলমানদের কট্টর শত্রু ছিল। তাঁদের মুঘলদের দিক থেকে তাদের কোন আশঙ্কা ছিল না। তারা মুসলমানদের বিপর্যস্ত অবস্থা লক্ষ্য করে নিজেদের দখলাধীন ভূখণ্ড অনেক বিস্তৃত করে নিয়েছিল। কারামতীয়দের মুকাবিলার ক্ষেত্রে সুলতান জালালুদ্দীনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। তখন ছিল ঐ যুগ যখন মুঘলদের অভিযাত্রা উত্তরমুখী হয়ে গিয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীন সেটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, মুঘলদেরকে ইসলামী দেশ থেকে বিতাড়ন এবং তাদের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে খলীফা নাসির লিদীনিল্লাহ্-এর কাছে গিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা। জালালুদ্দীনের পিতার সাথে যেহেতু খলীফার বিদ্বেষ ছিল তাই তিনি জালালুদ্দীনকেও ঘৃণার চোখে দেখেন এবং তাঁকে অবিলম্বে বাগদাদ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য তাঁর উমাবা ও অধিনায়কদেরকে নির্দেশ দেন। এই তামাশা দেখে সুলতান জালালুদ্দীন মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন এবং বাগদাদের উমারা ও অধিনায়কদেরকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। তারপর তিনি বাগদাদে না এসে সেখান থেকে তাবরীয অভিমুখে রওয়ানা হন এবং তাবরীয দখল করে গারাজিস্তানের দিকে যাত্রা করেন। গারাজিস্তানের আমীর-উমারা অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং সেখানে তাঁর আগমনকে অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে অভিমত প্রকাশ করে।

এবার সুলতান জালালুদ্দীনের অবস্থা বেশ আশাব্যঞ্জক হয়ে ওঠে এবং তা দেখে বিরাট মুঘলবাহিনী তার মুকাবিলায় ধেয়ে আসে। ইসপাহানের সন্নিকটে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে সুলতান জালালুদ্দীন মুঘলদেরকে পরাজিত করে পলায়নে বাধ্য করেন এবং এই বিরাট বিজয়ের মাধ্যমে সমগ্র গারাজিস্তান ও তার আশেপাশের এলাকা দখল করে নেন। তারপর মুঘলরা পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এসে সুলতান জালালুদ্দীনের উপর হামলা চালায়। পূর্বাহ্নে এই হামলার প্রস্তুতি-সংবাদ শুনে সুলতান জালালুদ্দীন বাগদাদ এবং অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে দূত মারফত আবেদন জানান– এই মুহূর্তে আমাদের সাধারণ শত্রুকে ধ্বংসের ব্যাপারে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। কিন্তু যেহেতু জালালুদ্দীনের বীরত্ব বাহাদুরীর খ্যাতি তখন দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল তাই ঈর্ষাবশত কোন রাষ্ট্রনায়কই

জালালুদ্দীনের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেননি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তিনি একাই মুঘলদের মুকাবিলা করার জন্য তৈরি হয়ে যান। ঐ মুহূর্তে জালালুদ্দীন হয়ত মুঘলদের পরাজিত করে মুঘলদের মনে এমনি ভীতির সঞ্চার করতেন যে, তারা পরবর্তী সময়ে ইসলামী সাম্রাজ্যসমূহ আক্রমণ করার সাহস পেত না। কিন্তু এটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল না। তাই দেখা যায়, মুঘল বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য জালালুদ্দীন যে সমস্ত গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন তারা তাকে এই সংবাদ দিল যে, মুঘল বাহিনী এখনও অনেক দূরে অবস্থান করছে। অথচ মুঘল বাহিনী তখন একেবারে সন্নিকটে এসে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মুঘলরা ঠিক অর্ধেক রাতে অকস্মাৎ এমনভাবে হামলা চালাল যে, তখন শত্রুদের এভাবে আগমনের কথা জালালুদ্দীন কল্পনাও করতে পারেননি। এভাবে তিনি হঠাৎ নিজেকে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখে বাধ্য হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কিন্তু যখন জয়ের কোনই সম্ভাবনা দেখতে পেলেন না তখন প্রবল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে শত্রুর ঘেরাও থেকে বের হয়ে গেলেন। তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ। তাঁর সন্ধান আর পাওয়া যায়নি।

সুলতান জালালুদ্দীনের পরিণাম

সুলতান জালালুদ্দীনের পরিণাম সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা খুবই বিখ্যাত। একটি বর্ননা এই যে, পলায়নরত অবস্থায় যখন তিনি পাহাড়ের কোন একটি জায়গায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন তখন তার ঘোড়া ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে কোন একটি পাহাড়ী লোকের ভয়ানক লোভ হয় এবং সে তাঁকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করে ফেলে। অপর বর্ণনা এই যে, তিনি তাঁর পোশাক পরিবর্তন করে অলী-আল্লাহ্দের খিদমতে গিয়ে হাযির হন এবং একজন সূফী ও আবিদ হিসাবে বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। ঐ সময়ে তিনি দূর-দূরান্তের দেশসমূহ সফর করেন। এই সংসার ত্যাগী অবস্থায় তিনি নাকি দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন।

ইসলাম সম্পর্কে চেঙ্গিষ খানের চিন্তা-গবেষণা

চেঙ্গিয খান সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিযমীর হাঙ্গামা মিটিয়ে এবং তার পুত্র চুঘতাই খানকে মাকরানে রেখে স্বয়ং তুর্কীস্তান হয়ে ৬২১ সনের যিলহজ্জ (১২২৪ খ্রি জানুয়ারী) মাসে দীর্ঘ সাত বছর পর আপন জন্মভূমি মুঘলিস্তানে ফিরে যান। পথিমধ্যে বুখারা পৌঁছে তিনি নির্দেশ দেন– মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বড় আলিম এবং যিনি ধর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁকে আমার সামনে নিয়ে আস। আমি তাঁর কাছ থেকে ইসলামধর্মের হাকীকত ও মূল তত্ত্ব জানতে চাই। গত সাত বছর অনেক রক্তারক্তি করে এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশ পরিভ্রমণ করে চেঙ্গিয খান এ কথা বুঝে নিয়েছিলেন যে, যদিও মুসলমানরা এখন দুর্বল হয়ে গেছে, কিন্তু ইসলাম প্রকৃতপক্ষে কোন মামুলী ধর্ম নয় বরং এটা হচ্ছে একটি সুন্দর জীবন-ব্যবস্থা এবং উন্নত চারিত্রিক সংগঠন। যা হোক তার নির্দেশ অনুযায়ী কাযী আশরাফ এবং আর একজন সুবিজ্ঞ আলিমকে তার দরবারে হাযির করা হয়। চেঙ্গিয খানের

জিজ্ঞাসার উত্তরে ঐ দু'জন আলিম সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ ও একত্ব সম্পর্কিত আকীদার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। চেঙ্গিয খান তখন বলেন, আমি এ আকীদাকে স্বীকার করে নিচ্ছি।

তারপর আলিমদ্বয় রিসালত সম্পর্কিত আকীদার ব্যাখ্যা দেন। চেঙ্গিয খান বলেন, আমি এই আকীদাকেও গ্রহণীয় বলে মনে করি যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য দুনিয়ায় আপন দূত বা পয়গাম্বর পাঠিয়ে থাকেন। তারপর আলিমদ্বয় নামায ও রোযা কেন অবশ্য পালনীয় তার ব্যাখ্যা দেন। চেঙ্গিয খান বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর ইবাদত করা এবং এগারো মাস পর একমাস রোযা রাখা খুবই বিবেকসম্মত। তারপর আলিমদ্বয় বায়তুল্লাহ্র হজ্জ ফরয হওয়ার যুক্তি পেশ করেন। চেঙ্গিয খান বলেন, হজ্জের প্রয়োজনীয়তা আমি স্বীকার করছি। এই পটভূমিতে কাযী আশরাফ চেঙ্গিয খান সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, তিনি মুসলমান হয়ে গেছেন।

তারপর চেঙ্গিয খান সমরকন্দে গিয়ে পৌছেন এবং সেখানকার মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন। এখানে অবশ্যই লক্ষণীয় যে, সাত বছর পর যে বিজয়ী বীরপুরুষ অনেকগুলো ইসলামী দেশ দখল করে এবং লক্ষ কোটি মুসলমানের রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিয়ে আপন জন্মভূমিতে ফিরে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে ইসলামের আকীদাকে মেনে নেওয়ার কারণে তিনি (ধর্মের দিক দিয়ে) বিজয়ী হিসাবে নন বরং বিজিত বেশেই দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন। চেঙ্গিয খানের পৌত্র এবং তূলি খানের পুত্র ঈলা খান ও ইলাকূ খানের বয়স তখন ছিল যথাক্রমে দশ ও এগারো বছর। চেঙ্গিয খানের এই দুই পৌত্র দাদার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ শুনে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আসে। রাস্তায় তারা একটি খরগোশ ও একটি ভালুক শিকার করে। যেহেতু এটাই ছিল এই ছেলেদের প্রথম শিকার, তাই চেঙ্গিয খান সে খুশিতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে আপন সেনাবাহিনীকে ভুঁরিভোজে আপ্যায়িত করেন। চেঙ্গিয খানের মুঘলিস্তানে ফিরে আসার একটি কারণ এও ছিল যে, সেখানে কিছু সংখ্যক মুঘল আমীর তার সম্পর্কে বিদ্রোহ ভাব প্রকাশ করেছিলেন। চেঙ্গিয খান মুঘলিস্তানে পৌছেই বিদ্রোহী ও বিরুদ্ধবাদী মুঘলদেরকে খুব ভালভাবে শায়েস্তা করেন।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

সমস্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা মিটিয়ে ফেলার পর চেঙ্গিয খান আপন পুত্র, পৌত্র ও অধিনায়কদের একত্র করে বললেন, খুব সম্ভবত আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। আমি তোমাদের জন্য একটি বিরাট দেশ জয় করে দিয়েছি। এখন বলো, আমি এমন কাকে আমার স্থলাভিষিক্ত মনোনয়ন করব, যাকে তোমরা সবাই সানন্দচিত্তে মেনে নেবে এবং তার আনুগত্য স্বীকার করবে। সবাই এক বাক্যে বলে ওঠে, আমরা আপনার অনুগত। আপনি যাকেই আপনার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করবেন আমরা তারই আনুগত্য স্বীকার করে নেব। চেঙ্গিয খান বলেন, যদি তোমরা এ বিষয়টি আমার উপর ছেড়ে দিয়ে থাক তাহলে আমি উকতাই খানকেই

আমার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করছি। এখন তোমাদের অবশ্য কর্তব্য তার আনুগত্য স্বীকার করা। তারপর তিনি নির্দেশ দেন, কুবুল খান ও কাচূলী বাহাদুরের ঐ অঙ্গীকার পত্র বের কর, যার উপর তূমনাহ খানের মুহর রয়েছে। যা হোক অঙ্গীকার পত্রটি বের করে তিনি সবাইকে দেখান এবং তার উপর সকলের স্বাক্ষর নেন। তারপর তিনি নির্দেশ দেন, কারচান, দাশতে খাযর, আলান, রুশ এবং বালগারের (বুলগেরিয়ার) উপর জূজী খানের এবং মাওরাউন নাহর, খাওয়ারিযম, কাশগড়, বাদাখশান, বল্খ, গযনী ও সিন্ধুনদের উপকূল এলাকার উপর চুঘতাই খানের হুকুমত থাকবে। আর কারাচার চুঘতাই খান ও আমীর কারাচারের মধ্যে সেই সম্পর্ক বহাল থাকবে, যে সম্পর্ক আমার এ কারাচারের মধ্যে ছিল। অর্থাৎ চুঘতাই খান বাদশাহ এবং আমীর কারাচার তার সেনাপতি থাকবে এবং তারা একে অপরের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলবে। তিনি কারাচার ও তুঘতাই খানের মধ্যে এই মর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র লেখিয়ে নিয়ে তার উপর নিজেও স্বাক্ষর করেন। আমীর কারাচার ছিলেন কাচূলী বাহাদুরের প্রপৌত্র। তিনি মুঘলিস্তানের একটি অংশ তুলি খানের হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং নির্দেশ দেন, উকতাই খানের সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনা ও অধিনায়কত্ব তুলি খানের সাথে সম্পর্কিত থাকবে। তিনি আরো নির্দেশ দেন, তোমরা সকলে তোমাদের বড় ভাই উকতাই খানকে নিজেদের বাদশাহ মনে করবে এবং সর্বদা তার বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করবে। এভাবে আপন পুত্রদের সম্পর্কে ওসীয়ত করার পর তিনি আপন ভাই উতাগীন, মাগূজীন, আদাল জানকীন এবং অন্যান্যকে তৎকালীন 'খাতা' অঞ্চলটি দান করেন।

চেঙ্গিয খানের মৃত্যু

তারপর ৬২৪ হিজরীর রমযান (৬২৭ খ্রি সেপ্টেম্বর) মাসে চেঙ্গিয খান পঁচিশ বছর হুকুমত করার পর তিহাত্তর বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তার অন্তিম উপদেশ অনুযায়ী তাকে একটি গাছের নীচে সমাধিস্থ করা হয়। তার কবরের পার্শ্ববর্তী সমগ্র ভূখণ্ডে প্রথম বছরই এত গাছ জন্মায় যে, তা একটি অনতিক্রম্য জঙ্গলে পরিণত হয়। তারপর কেউই বলতে পারত না, তার কবরটি ঠিক কোথায় রয়েছে। উল্লিখিত চার পুত্র ছাড়া চেঙ্গিয খানের আরো পুত্র ছিল। তারা ঐ চারপুত্রের কারো না কারো কাছে প্রতিপালিত হয়। চেঙ্গিয খান রাশিয়া, মস্কো, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশও জয় করেছিলেন। যেহেতু ইসলামী ইতিহাসের সাথে ঐ সমস্ত দেশের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই তাই ঐ বিজয় অভিযানের বর্ণনা এর সাথে সংযুক্ত করা হলো না।

চেঙ্গিয খানের শাসনামল সম্পর্কে একটি সমীক্ষা

চেঙ্গিয খান মুঘল বংশের একজন অতি বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী লোক ছিলেন। তার কারণেই মুঘল বংশ সমগ্র বিশ্বে খ্যাতিলাভ করে। তিনি দেশ শাসনের অত্যন্ত সুন্দর ও সুদৃঢ় বিধানাবলী রচনা করেন। তিনি এটা ভালভাবে জানতেন যে, মুঘল বংশের মত একটি বর্বর ও মূর্খ জাতিকে কখনো অকর্মণ্য করে রাখা উচিত নয়। অন্যথায় তারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-

বিগ্রহ করে আপনা-আপনি ধ্বংস হয়ে যাবে। এসব কথা চিন্তা করে তিনি একদিকে মুঘলদেরকে অত্যন্ত যত্নসহকারে একতার ঐক্যের গুরুত্ব বোঝারার চেষ্টা করেন এবং অন্যদিকে এমন সব আইন-কানুন চালু করেন, যাতে মুঘলবাহিনী কখনো বেকার বসে না থাকে। তিনি একটি সার্বিক আইন গ্রন্থও রচনা করেন, যার নাম হচ্ছে 'তাওরায়ে চেঙ্গিযী তাযীরাতে চেঙ্গিযী'। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুঘলদের কাছে তাওরায়ে চেঙ্গিযীর মর্যাদা ছিল একটি ধর্মীয় তথা আসমানী কিতাবের মত। তাওরায়ে চেঙ্গিযীর মধ্যে শিকারের আইন-কানুনও লিপিবদ্ধ আছে। তাই মুঘল বাদশাহদের জন্য এটা অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যখন বিজয় অভিযান ও যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে অবসর পাবে তখন যেন অবশ্যই আপন সেনাবাহিনীসহ শিকারে বর্হিগত হয়।

চেঙ্গিয খানের নির্বিবাধ খুনখারাবীর সাথে যখন এ বিষয়টির উপরও চিন্তা-ভাবনা করা হয় যে, তিনি খুব কমই দাম্ভিকের মত কথাবার্তা বলতেন তখন বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। চেঙ্গিয খান যখন কোন বাদশাহের কাছে চিঠি লিখতেন তখন প্রথমত তাকে আনুগত্য স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করতেন। পরিশেষে লিখতেন, যদি তুমি আনুগত্য স্বীকার না কর তাহলে এর পরিণাম কি হবে তা আল্লাহই জানেন। তিনি কখনো একথা লিখতেন না যে, আমি একটি দুর্বার বাহিনীর অধিকারী, তোমাকে ধ্বংস করে ফেলব ইত্যাদি ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তিনি দেশ জয়কেও নিজের বা নিজের বাহিনীর দিকে সম্পর্কিত করতেন না বরং বলতেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিজয় দিয়েছেন এবং তিনিই আমাকে বাদশাহ বানিয়েছেন। তিনি তার নামের সাথে লম্বা চওড়া উপাধি ও উচ্চ প্রশংসা সম্বলিত শব্দাদি ব্যবহার করার অনুমতি কাউকে দিতেন না। অন্যান্য সিপাহীর মত তিনি নিজেও সব কাজে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি স্বয়ং ঘোড়ার পিঠে চড়ে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতেন এবং আপন সঙ্গী অশ্বারোহীদেরকে দূর-দূরান্তের মনযিলসমূহ অতিক্রম করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, আমাদেরকে সব সময়ই কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত থাকতে হবে। কেননা এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আমাদের নেতৃত্ব ও মর্যাদার আসল রহস্য।

চেঙ্গিয খান নিজে ছিলেন দীর্ঘ ও মজবুত দেহের অধিকারী। যুদ্ধ চলাকালে তাকে সব সময়ই সম্মুখ সারিতে দেখা যেত। তিনি যেভাবে হামলা করতেন তাতে প্রতিপক্ষের সারিসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। তার অসাধারণ বিজয় লাভের রহস্য একথার মধ্যেও নিহিত ছিল যে, তার পুত্রও তারই মত বীরযোদ্ধা ছিলেন। তার বিজয় লাভের একটি বড় কারণ এও ছিল যে, তিনি মুঘল গোত্রগুলোর মধ্যে যারা তার প্রধান সাহায্যকারী ছিল তাদের মধ্যে ঐক্য ও পরস্পর ভালবাসার পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন।

চেঙ্গিয খান পাঁচটি বিবাহ করেছিলেন। তার পাঁচজন স্ত্রী ছিলেন পাঁচটি গোত্র ও পাঁচটি বংশের সাথে সম্পর্কিত। তাই স্বাভাবিকভাবে তার পাঁচটি শ্বশুর বংশ তাকে নিজেদের আপন লোক বলে মনে করত এবং সব সময় তার সাহায্যে এগিয়ে আসত। 'তাওরায়ে চেঙ্গিযী'-এর মধ্যে একটি কানুন বা বিধান এও ছিল যে, বাদশাহ যখন কোন শহর জয় করবেন তখন প্রথমে সেখানে পাইকারী হত্যা চালাবেন। যখন সেনাবাহিনী অবাধে হত্যাকাণ্ড চালাবার

সুযোগ পেয়ে যায় এবং অনেক লোক তাদের হাতে নিহত হয় তখন শান্তি ও নিরাপত্তার ফরমান জারি করে সেখানে যথারীতি শাসনকর্তা নিয়োগ করা উচিত। এর পিছনে খুব সম্ভবত এই যুক্তি রয়েছে যে, সেখানকার প্রজারা বিজয়ীদের সম্পর্কে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং ভবিষ্যতে কখনো বিদ্রোহ বা অবাধ্যতার চিন্তাও করবে না। চেঙ্গিয খান তার এই নীতি সব সময়ই কার্যকর করেছেন। যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, ঐ যুগের সভ্য দুনিয়ায় অবাধ্যতা ও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এমনি একটি সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়ে গিয়েছিল যে, কোন বাদশাহই বিদ্রোহীদের ফিতনা থেকে রক্ষা পেতেন না। ফলে সব দেশেই, বলতে গেলে রাত-দিন যুদ্ধ ও সংঘর্ষ লেগে থাকত। আলাভী, ইরানী, শীআ ও ফাতিমীদের বিদ্রোহী তৎপরতা কোন যুগেই বন্ধ হয়নি। ইসলামী বিশ্বের এই পরিস্থিতি এবং বহির্বিশ্বের ঘটনাবলী থেকেও চেঙ্গিয খান এই শিক্ষালাভ করেছিলেন যে, প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে হলে তাদেরকে অবশ্যই ভীতিগ্রস্ত রাখতে হবে। এই নীতি অনুসরণ করার মাধ্যমে চেঙ্গিয খান যথেষ্ট সুফলও পেয়েছিলেন।

মুঘলরা বাগদা, ইরাক এবং আরব ও হিন্দুস্থান ছাড়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশ এবং ইউরোপ মহাদেশেরও কিছু অংশ দখল করে নিয়েছিলেন। মুঘলদের হাতে ইসলামী সাম্রাজ্যই বেশি ধ্বংস হয়েছে এবং তাদের তরবারির তলে মুসলমানরাই বেশি শাহাদাতবরণ করেছে। তখন বাহ্যত মনে হচ্ছিল যে, মুঘলদের হাতে ইসলামের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে যাবে। কিন্তু ইসলামের রক্ষক যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং শরীয়তে ইসলামও এমন বস্তু নয় যে, কোন জড়শক্তি তাকে ধ্বংস করে ফেলবে। তাই দুষ্কৃতিকারী মুসলমানরা মুঘলদের হাতে ধ্বংস হয়েছে এবং মুঘলদের তরবারি তাদেরকে অলস নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের কোন ক্ষতি মুঘলরা করতে পারেনি, বরং কিছু দিন পর স্বয়ং তারাই ইসলামের গোলাম ও খাদিমরূপে প্রতিভাত হয়েছে। মুঘলদের এই ক্রমবর্ধমান শক্তি ও পরাক্রম দেখে খ্রিস্টানরাও এই চেষ্টা করেছিল যে, যেন মুঘলরা খ্রিস্টধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের মধ্যে সেই আকর্ষণ শক্তি কোথায় যে, সে বিজয়ী ও বীরযোদ্ধা জাতিকে নিজের খাদিম ও দাসে পরিণত করার এবং তাকে নিজের মধ্যে একাত্ম করে নেবে? প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ও মাযহাবের দিক দিয়ে মুঘলরা ছিল অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে। তাদের পিতৃপুরুষ– যাদের বিস্তারিত ইতিহাস আমাদের জানা নেই– কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বা অযথা শত্রুতা পোষণ করত না। এই জাতিকে আল্লাহ তা'আলা মুঘলিস্তানের পাহাড় থেকে এ জন্য বের করে এনেছিলেন যাতে তারা বিজয়ী বেশে এশিয়া মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে তারপর দীন ইসলামের আলোকে নিজেদের আলোকিত করার সুযোগ পায়। চেঙ্গিয খান এবং তার জাতির অস্তিত্বও ইসলামের সত্যতার একটি বিরাট দলীল। ইসলাম যেমন একটি বিজিত জাতির উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করে ঠিক সেরূপ প্রভাব বিস্তার করে একটি বিজয়ী জাতির উপর। আরবরা বলতে গেলে সমগ্র সভ্য জগত জয় করে এবং প্রত্যেক দেশেই বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে ইসলামের এক একজন শিক্ষকে পরিণত হয়। কিন্তু

মুঘলরা মুসলমানদেরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে ইসলামের ঐ প্রভাবকে গ্রহণ করে এবং ইসলামের সামনে পরাজিতের ন্যায় নিজেদের গর্দান ঝুঁকিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে আগামীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

উকতাই খান

চেঙ্গিয খানের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র উকতাই খানকে মুঘলদের শাহানশাহ হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। আর তার ভাই ঐ সমস্ত এলাকা বা দেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন, যা চেঙ্গিয খান তার জন্য চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। দু'বছর পর উকতাই খান তার সকল ভাইকে তলব করেন এবং সে উপলক্ষে একটি বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেন। যখন সকলে এসে উপস্থিত হন তখন তিনি তার ভাইদেরকে সম্বোধন করে বলেন, আমি কাআন তথা শাহানশাহের পদে ইস্তফা দিচ্ছি। তোমরা যাকে ভাল মনে কর তাকেই নিজেদের শাহানশাহ মনোনীত কর। কিন্তু চুঘতাই খান এবং অন্যান্য ভাই ও সর্দাররা তাকে জোর করে সিংহাসনের উপর বসিয়ে দেন এবং সে উপলক্ষে (মুঘলদের প্রচলিত প্রথামতে) সূর্যের পূজা করেন। তারপর জূজী খানের পুত্র হাতু খান, পৌত্র কুয়ূক খান এবং তুলি খানের পুত্র মালূক খানের অধিনায়কত্বে রুশ, চারকাস ও বুলগেরিয়ার দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়। এই রাজকুমাররা হিজরী ৬৩৩ সনে (১১৩৫-৩৬ খ্রি) সাত বছর অবিরাম চেষ্টার পর ঐ সমস্ত দেশ জয় করেন। সেনাপতি আরগুন খানকে খুরাসানের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করা হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন তিনি ঐ সমস্ত শহর পুনরায় গড়ে তোলেন যেগুলো মুঘলদের আক্রমণের ফলে জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে।

চেঙ্গিয খানের পুত্র উকতাই খান অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ও পুণ্যবান লোক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন ও জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হন। মুসলমানদের সাথে উকতাই খানের অত্যন্ত ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি মুসলমানদেরকে সম্মানের পাত্র মনে করতেন এবং তাদের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন। কথিত আছে, একদা উকতাই খান ও চুঘতাই খান একসাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। তারা দেখতে পান যে, একজন মুসলমান ডুব দিয়ে নদীতে গোসল করছে। চুঘতাই সঙ্গে সঙ্গে ঐ মুসলমানকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। (কেননা মুঘলদের প্রচলিত প্রথা মতে ডুব দিয়ে গোসল করা মহাপাপ)। কিন্তু উকতাই খান তখন বললেন, ওকে বন্দী করে নিয়ে চল। এখানে একাকী নয়, বরং সাধারণ্যে তাকে হত্যা করা হবে। পথিমধ্যে উকতাই খান চুঘতাই খান থেকে পৃথক হয়ে ঐ মুসলমান বন্দীকে বললেন, তুমি এ কথা বলবে যে, আমার কাছে স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে ছিল। ডাকাতদের ভয়ে সেটা লুকিয়ে রাখার জন্য আমি নদীতে ডুব দিয়েছিলাম। যা হোক ঐ মুসলমানকে বিচারের জন্য যখন সর্বসমক্ষে হাযির করা হয় তখন সে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে গিয়ে সে কথাই বলে, যা উকতাই খান তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এ কথা শুনে চুঘতাই খান ঐ স্বর্ণ মুদ্রার থলে খুঁজে বের করার জন্য সেখানে লোক পাঠান। কিন্তু যেহেতু উকতাই খান পূর্ব থেকেই সেখানে একটি থলে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তাই সন্ধানীরা সত্যি সত্যি সেখান থেকে একটি থলে

বের করে নিয়ে আসে, যার ফলে মুসলিম বন্দীর জবানবন্দী সত্য বলে প্রমাণিত হয়। আর এই সূত্র ধরে উকতাই খান ঐ স্বর্ণমুদ্রার থলে এবং পুরস্কার স্বরূপ সেই সাথে আরো কয়েকটি থলে দিয়ে ঐ মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করে দেন। এভাবে তিনি যখনই সুযোগ পেতেন তখনই মুসলমানদের উপকার সাধন করতেন। কিন্তু অন্য মুঘলরা ছিল মুসলমানদের শত্রু এবং যে কোন ছলছুঁতায় তাদের ক্ষতিসাধনে আগ্রহী।

একদা জনৈক ব্যক্তি উকতাই খানের কাছে এসে বলল, আমি রাতের বেলা মহান কাআন চেঙ্গিয খানকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার পুত্র উকতাই খানকে আমার এই পয়গাম পৌছিয়ে দাও যে, আমার একান্ত ইচ্ছা, দুনিয়া থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা যেন মুছে ফেলা হয় এবং তাদের হত্যার ব্যাপারে যেন কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা না হয়। উকতাই খান তখন বলে উঠেন, তুমি কি মুঘলাই ভাষা জান? সে উত্তর দিল— জানি না, আমি শুধু ফারসী ভাষা বুঝি এবং ফারসী ভাষায় কথা বলতে পারি। উকতাই খান তখন বললেন, চেঙ্গিয খান তো মুঘলাই ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতেন না। আর ফারসী ভাষায় তো তিনি মোটেই কথা বলতে পারতেন না। তাহলে তুমি তার কথা বুঝলে কি করে? এই বলেই তিনি নির্দেশ দেন, একে হত্যা করে ফেল। কেননা সে একজন মিথ্যাবাদী এবং চেঙ্গিয খানের প্রতি মিথ্যা আরোপকারী। অতএব ঐ লোকটিকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয়।

উকতাই খান সম্পর্কে সাধারণভাবে এই ধারণা করা হয় যে, তিনি প্রকাশ্যে মুসলমান না হলেও গোপনীয়ভাবে ইসলামকে একটি সত্য মাযহাব বলে বিশ্বাস করতেন এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তার রাজধানী ছিল কারাকোরাম। সমগ্র বিশ্বের ধনসম্পদ নিয়ে কারাকোরামে একত্র করা হয়েছিল। তাই কারাকোরামের ধন-ভাণ্ডার ছিল হীরা-জহরতে একেবারে টইটম্বুর। উকতাই খানের বদান্যতা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, সুদূর খুরাসান এবং সিরিয়ার লোকও তার বদান্যতার খ্যাতি শুনে কারাকোরামে চলে আসত এবং উকতাই খানের নিকট থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে খুশি মনে দেশে ফিরে যেত। পিতা যেভাবে জুলুম ও রক্তারক্তির মাধ্যমে ধন-দওলত সংগ্রহ করেছিলেন পুত্র তেমনি প্রেম-ভালবাসা ও আল্লাহভীরুতার পথে তা জনসাধারণের মধ্যে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং ফলশ্রুতিতে মুঘলদের বাড়াবাড়ি ও পাষাণ হৃদয়তার কারণে জনসাধারণ তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করলেও উকতাই খানের বদান্যতা ও ঔদার্যের কারণে পুনরায় তাদেরকে ভালবাসতে শুরু করে। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিয খান হলেও সেটার ভিত্তি স্থায়ী ও সুদৃঢ় করছিলেন উকতাই খান।

কুয়ূক খান

যখন উকতাই খানের মৃত্যু হয় তখন তার পুত্র কুয়ূক খান কারাকোরামে ছিলেন না। মুঘলরা তাদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী উকতাই খানের স্ত্রী তূরকীনা খাতুনকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করে, যাতে কুয়ূক খান রাজধানীতে এসে না পৌছা পর্যন্ত রাষ্ট্রের মধ্যে কোনরূপ গোলযোগের সৃষ্টি না হয়। কুয়ূক খান যখন কারাকোরামে আসেন তখন মুঘলদের

প্রচলিত রীতি এবং তাওরায়ে চেঙ্গিযীর বিধান অনুযায়ী রাজসিংহাসন সম্পর্কে কিছু বলেননি, বরং সাধারণভাবে কালযাপন করতে থাকেন। স্বয়ং সুলতানা তূরকীনা খাতুন সব দেশে দাওয়াতনামা পাঠান এবং তৎকালীন বিশ্বের সকল সুলতানকেই আমন্ত্রণ জানান। অতএব খুরাসান, ইরান, কাবচাক, রোম, বাগদাদ, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে সুলতানের দূতেরা কারাকোরামে আসেন। চেঙ্গিয খানের সন্তান-সন্ততিরা তো সকলেই রাজধানীতে বিদ্যমান ছিলেন। বাগদাদের খলীফা ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য নিজের পক্ষ থেকে 'কাযিউল কুযাত' (প্রধান বিচারপতি) ফখরুদ্দীনকে পাঠান। খুরাসান থেকে আমীর আরগূন, রোম থেকে সুলতান নূরুদ্দীন সালজুকী, আলামূত ও কুহিস্তান থেকে শিহাবুদ্দীন উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ইউরোপের খ্রিস্টান বাদশাহদের পক্ষ থেকেও দূতেরা আসে। মুসলমান অধিনায়কদের জন্য দু'হাজার তাঁবু স্থাপন করা হয়। এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে,উক্ত অনুষ্ঠানটি কত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। তারপর মজলিস বসে এবং বাদশাহ নির্বাচনের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়। সবাই কুয়ূক খানকে নির্বাচন করেন। তুলি খানের পুত্র মানকূ খান কুয়ূক খানকে হাত ধরে সিংহাসনে বসান এবং তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন। কুয়ূক খানের স্ত্রী ছিলেন একজন খ্রিস্টান মহিলা। এ কারণে ইউরোপের খ্রিস্টান দূতদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু বাতিনীদের দূতদের প্রতি কুয়ূক খান অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে মজলিস থেকে বের করে দেন।

মুসলমানদেরকেও আদর-আপ্যায়ন করা হয়। কিন্তু খ্রিস্টানরা কুয়ূক খানকে মুসলিম বিদ্বেষী করে তোলার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয় যে, তারা একদা কুয়ূক খানের হাত দিয়ে এই মর্মে একটি ফরমান লিখিয়ে নেয় যে, মুসলমানদেরকে হত্যা এবং দুনিয়া থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে ফেলার জন্য যেন সকল সর্দার ও অধিনায়ক নিজেদের প্রস্তুত করে নেয়। কিন্তু এই নির্দেশ লিপিবদ্ধ করে যখন তিনি বাইরে বের হন তখন তার শিকারী কুকুর অকস্মাৎ তার উপর হামলা করে বসে এবং তার দু'টি অণ্ডকোষই কামড়িয়ে দেয়। কুয়ূক খান কুকুরের এই আক্রমণে মরেন নি, বরং মারাত্মকভাবে আহত হন। তারপর খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলার দুঃসাহস করেনি।

কুয়ূক খানের মৃত্যু

কিছু দিন পর কুয়ূক খান সমরকন্দে গিয়ে মারা যান। যে সময়ে উকতাই খান জীবিত ছিলেন তখন তার ছোট ভাই তুলি খান (যিনি চেঙ্গিয খানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন) তার সাথে থাকতেন এবং তিনি সেনাবাহিনীর অধিনায়কও ছিলেন। তুলি খানের সাথে উকতাই খানের অত্যন্ত ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। একদা উকতাই মারাত্মকভাবে পীড়িত হয়ে পড়লে তুলি খান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানান– হে প্রভূ! আমার ভাইকে বাঁচিয়ে তোল। যদি তার মৃত্যুর সময় এসে গিয়ে থাকে তাহলে তার জায়গায় আমাকে উঠিয়ে নাও। আশ্চর্যের বিষয়, ঐদিন থেকে উকতাই খান ক্রমশ আরোগ্য লাভ করতে থাকেন এবং একদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। অপরদিকে তুলি খান রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং রোগ

ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হন। তুলি খানের চারপুত্র ছিল। যথা–মানকূ খান, কুবালাঈ খান, আরতাক বুকা এবং হালাকূ খান। উকতাই খান তার এই চার ভাতিজাকে খুবই স্নেহ করতেন। তারপর কুয়ূক খানও আপন এই চাচাত ভাইদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। কুয়ূক খানের মৃত্যুর পর চেঙ্গিযী বংশের মধ্যে বাতূখান ইব্‌ন জূজী খান বাদশাহ কাবচাক সর্বাধিক শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। সবাই বাতূখানকে বলল, এখন বলুন, কাকে সিংহাসনে বসানো হবে। বাতূখান এই সিদ্ধান্ত দিলেন যে, কুয়ূক খানের পর মানকূ খানের চাইতে রাজসিংহাসনের যোগ্য আর কেউ নেই। বেশির ভাগ অধিনায়কই তার এই সিদ্ধান্তকে পছন্দ করেন। কিন্তু কেউ কেউ এর বিরোধিতা করে। পরে অবশ্য কিছুটা তর্ক-বিতর্কের পর মানকূ খানকেই সিংহাসনে বসানো হয়।

মানকূ খান

মানকূ খান আপন ভাই কুবলাঈ খানকে 'খাতা' অঞ্চলের হুকুমত প্রদান করেন। আর অপর ভাই হালাকূ খানকে এক বাহিনী দিয়ে ইরান অভিমুখে প্রেরণ করেন। মানকূ খানের সিংহাসন আরোহণ অনুষ্ঠান পালিত হয় ৬৪৮ হি. (১২৫০ খ্রি) সনে। মানকূ খান মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলন এবং তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন।

মানকূ খানের মৃত্যু

সাত বছর রাজত্ব করার পর মানকূ খান ৬৫৫ হি. (১২৫৭ খ্রি) মৃত্যু মুখে পতিত হন। মানকূ খান তার শাসনামলের শেষ বছরে চীন সম্রাটকে লিখেন– তুমি আমার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার কর। কিন্তু চীন-সম্রাট তা অস্বীকার করেন। ফলে মানকূ খান চীনদেশ আক্রমণ করেন।

কুবলাঈ খান

এই সফরেই চানকান্দ নামক স্থানে মানকূ খানের মৃত্যু হয়। তার ভাই কুবলাঈ খান সঙ্গে ছিলেন। সেনা-অধিনায়করা সর্বসম্মতিক্রমে চানকান্দ নামক স্থানে তাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। কিন্তু এই খবর পৌঁছার পর আরতাকী বুকা রাজধানী কারাকোরামে রাজমুকুট আপন মস্তকে ধারণ করেন। কুবলাঈ খান যখন কারাকোরাম অভিমুখে রওয়ানা হন তখন আরতাক বুকা কারাকোরাম থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে তার মুকাবিলায় এগিয়ে আসেন। কালূরাম নামক স্থানে দুই ভাইয়ের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে আরতাক বুকা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। কুবলাঈ খান বিজয় বেশে কারাকোরামে প্রবেশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আরতাক বুকা 'খাতায়' গিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং পুনরায় ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়তে আসেন। এবারও তিনি পরাজিত হন এবং কাশগড়ের দিকে পলায়ন করেন। সেখান থেকে পুনরায় নিজের অবস্থাকে শুধরিয়ে আসেন। মোট কথা, চার বছর পর্যন্ত আরতাক বুকা এবং কুবলাঈ খানের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত আরতাক বুকা বন্দী হন এবং এই বন্দী অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়।

কুবলাঈ খান ৬৫৫ হিজরীতে (১২৫৬ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথে হালাকূ খানের কাছে নির্দেশ পাঠান– জাইহূন নদী থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সমগ্র এলাকার শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব তোমার এবং এই এলাকা তোমার কর্তৃত্বাধীনে দেওয়া হলো। আরতাক বুকা এবং কুবলাঈ খানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, মুঘলদের কেন্দ্রীয় হুকুমত ও কারাকোরাম দরবারের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পায় এবং বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত সর্দার বা অধিনায়ককে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল তারা নিজেদেরকে আপন আপন এলাকার স্বাধীন বাদশাহ বলে ভাবতে শুরু করে। এটা হচ্ছে সেই যুগ, যখন চেঙ্গিযী বংশের কয়েকজন শাহযাদা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সাধারণ মুঘলদের মধ্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছে।

আরতাক বুকার হাঙ্গামা শেষ হওয়ার পর কুবলাঈ খান চীনের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং কয়েক বছর যুদ্ধ করার পর সমগ্র চীন দেশ জয় করে সেখানে 'খান বালীগ' নামক একটি শহরের পত্তন করেন এবং কারাকোরাম থেকে সেখানেই আপন রাজধানী স্থানান্তর করেন। তারপর তিনি মাইল্যান্ড, বার্মা, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে কর আদায় করেন।

কুবলাঈ খান চারটি ধর্ম ও চারটি জাতি থেকে চারজন মন্ত্রী নিয়োগ করেন। তন্মধ্যে আমীল আহমদ বানাকতী নামীয় একজন মুসলমান মন্ত্রীও ছিলেন। সব সুলতানই কুবলাঈ খানের হুকুমত ও সাম্রাজ্যকে স্বীকার করতেন। মুঘলদের সালতানাত চীন থেকে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন ইসলামী সালতানাত খুবই দুর্বল অবস্থায় ছিল। তাই খ্রিস্টান, মাজুসী ও ইহুদীরা মুঘল দরবারে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে ক্ষমতাসীন মুঘলদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল। সম্ভবত এ কারণেই একদা হালাকূ খানের পুত্র আবা খান খুরাসান থেকে কুবলাঈ খানের খিদমতে এই মর্মে একটি পয়গাম পাঠান যে, আমাকে ইহুদী ও মাজুসীরা বলেছে, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনে নাকি লেখা আছে, মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর। কুরআনের এই শিক্ষা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ? অর্থাৎ মুসলমানদের বিশ্বাস যদি এই হয় যে, তারা আমাদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে তাহলে তো মুসলিম জাতিকে দুনিয়ায় বাঁচিয়ে রাখা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। কুবলাঈ খান ঐ স্মারক পত্রটি পড়ে কিছু সংখ্যক উলামাকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন– কুরআনে কি সত্যি সত্যি এ ধরনের নির্দেশ রয়েছে? তারা উত্তর দেন, হ্যাঁ এ ধরনের নির্দেশ রয়েছে। কুবলাঈ খান তখন জিজ্ঞেস করেন, তাহলে তোমরা হত্যা করছ না কেন ? তারা উত্তর দেন, আমাদের সে শক্তি নেই। যখন শক্তি অর্জন করতে পারব তখন তোমাদেরকে হত্যা করব। কুবলাঈ খান বলেন, এখানে যেহেতু আমাদের শক্তি রয়েছে অতএব আমাদের উচিত তোমাদেরকে হত্যা করা। এই বলে কুবলাঈ খান ঐ উলামাবৃন্দকে হত্যা করেন এবং সেই সাথে এই মর্মে নির্দেশ জারি করেন– মুসলমানদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। এই খবর পেয়ে মাওলানা বদরুদ্দীন বায়হাকী এবং মাওলানা হাকীমুদ্দীন সমরকন্দী কুবলাঈ খানের দরবারে যান এবং তাকে বলেন, আপনি মুসলমানদের পাইকারী হত্যার নির্দেশ জারি করেছেন কেন? কুবলাঈ খান উত্তর দেন, 'উকতুলুল মুশরিকীন'

(মুশরিকদের হত্যা কর) কুরআনের এই আয়াতের অর্থ কি? উভয় উলামাই উত্তরে বলেন, আরবের মূর্তি পূজারীরা মুসলমানদের হত্যা করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকত, তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা আপন নবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ওদেরকে হত্যা কর। আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ তো তোমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা তোমরা আল্লাহ্‌র ওয়াহদানিয়াত তথা একত্বে বিশ্বাসী এবং তোমরা তোমাদের ফরমানসমূহের শিরোনামে সর্বদা আল্লাহ্‌র নাম লিখে থাক। তাদের এ কথা শুনে কুবলাঈ খান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তখনি সর্বত্র এ নির্দেশ জারি করেন ঃ আমার প্রথম নির্দেশ, যা মুসলমানদের সম্পর্কে জারি করেছিলাম তা এতদ্দ্বারা রহিত বলে মনে করবে।

এই ঘটনা থেকে অনুমিত হয় যে, ধর্মের মুকাবিলায় মুঘলদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক ও ভয়ংকর। তাদের মধ্যে সভ্যতা ও মনন শক্তি যতই উন্নতি লাভ করতে থাকে তারা ইসলামকে জানার প্রতি ততই আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং দলে দলে তা গ্রহণও করতে থাকে। মুঘলদেরকে ইসলাম থেকে রুখে রাখার জন্য অন্য সকল ধর্মের পুরোহিতরা আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু মুঘলরা যেহেতু খোলা মনের অধিকারী ছিল এবং তাদের চোখে সকল ধর্মেরই মর্যাদা ছিল সমান, তাই যে কোন ধর্মকে খতিয়ে দেখার ব্যাপারে তাদের প্রবঞ্চিত হওয়ার কোন অবকাশ ছিল না। আর এ কারণেই দেখা যায়, তাদের মধ্যে যারা ছিল বুদ্ধিমান ও অভিজাত শ্রেণীর তারা ইসলামকেই একটি গ্রহণযোগ্য ধর্ম হিসাবে বিবেচনা করেছিল।

কুবলাঈ খানের মৃত্যু

কুবলাঈ খান পঁয়ত্রিশ বছর সাম্রাজ্য শাসন করার পর তিহাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার স্থলে তার পৌত্র তাইমূর খান চীন দেশের সম্রাট হন। তার যুগে সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা একবারে ভেঙ্গে পড়ে। ৭০০ হিজরী (১৩০০-০১ খ্রি) সনে কাআন তাইমূর খান মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার পরেও এই বংশের কয়েক ব্যক্তি নামকা ওয়াস্তে হুকুমতের অধিকারী হন। প্রকৃতপক্ষে তাইমূর কাআনের যুগ থেকেই কুবলাঈ খানের বংশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়। এবার আমরা তুলি খানের পুত্র হালাকূ খান সম্পর্কে আলোচনা করব। হালাকূ খান ছিলেন ইরান ও খুরাসানের শাসন ক্ষমতার অধিকারী এবং তার হাতেই বাগদাদ ধ্বংস হয়।

হালাকূ খান

যখন কারাকোরামে মানকূ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তার কাছে এই অভিযোগ পৌছে যে, বাতিনী ইসমাঈলী ফিরকার দুষ্কর্ম একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ওরা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এ ধরনের প্রতিটি ব্যক্তিরই শত্রু, যিনি কোন রাজত্ব বা সিংহাসনের মালিক কিংবা যিনি সফল নেতৃত্ব ও অধিনায়কত্বের কারণে বিখ্যাত ও গৌরবান্বিত। ফলে আমীর-উমারা ও সামরিক অধিনায়করা এসব ফিদায়ী তথা বাতিনীদের ভয়ে সদা-সন্ত্রস্ত। এই সাথে মানকূ খানের কাছে এই সংবাদও পৌছে যে, বাগদাদের খলীফাকে যদিও বাহ্যত দুর্বল মনে হয়, কিন্তু তাঁর সম্মান ও ক্ষমতা এই পর্যায়ের যে, যদি তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান তাহলে তাকে দমন করা মুঘলদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। অতএব মানকূ

কাআন আপন ভাই হালাকূ খানকে এক লক্ষ বিশ হাজার মুঘল সৈন্যের এক চৌকস বাহিনীসহ প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন— জাইহূন নদী থেকে মিসর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড তোমার অধীনে দেওয়া হচ্ছে। যদি বাগদাদের খলীফা আপোস চুক্তির উপর কায়েম থাকেন তবে তুমি তার সাথে যুদ্ধ করবে না। আর যদি তার মতিগতি খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার মূলোৎপাটনে তুমি মোটেই ইতস্তত করবে না। আর হ্যাঁ, ইসমাঈলীদের বাদশাহ আলামূত দুর্গে অবস্থান করছেন। তুমি তাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এই ইসমাঈলীদেরকে খুব ভালভাবে শায়েস্তা করা দরকার। হালাকূ খানের সাথে সেনাধিনায়ক আমীর কারাচারের পুত্র আমীর ঈচলকে পাঠানো হয়।

হালাকূ খান ৬৫১ হি. সনে (১২৫৩ খ্রি) খুরাসান ও ইরানে এসে পৌঁছেন। সেখানে আযারবায়জান, গার্জিস্তান প্রভৃতি দেশের সুলতানরা তার খিদমতে হাযির হয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। হালাকূ খান খুরাসান পৌঁছে এখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে প্রথমে বেদীন ইসমাঈলীদের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং একের পর এক তাদের দুর্গগুলো দখল করতে শুরু করেন। তখন ইসমাঈলীদের বাদশাহ রুকনুদ্দীন খুরশাহকে বন্দী করে হালাকূ খানের সামনে হাযির করা হয়। হালাকূ খান খুরশাহকে কারাকোরামে মানকূ খানের খিদমতে প্রেরণ করেন। তবে যে সব লোকের হিফাযতে তাকে প্রেরণ করা হয় তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন তারা রাস্তায়ই তাকে খতম করে ফেলে। বাস্তবেও তাই ঘটল। রুকনুদ্দীন খুরশাহের পরিবার-পরিজন এবং সঙ্গী-সাথীদের সবাইকে পথিমধ্যেই হত্যা করে ফেলা হয়। কিন্তু খাজা নাসীরুদ্দীন তুসী, যিনি খুরশাহের অন্যতম মুসাহিব ছিলেন, আপন কথার মারপ্যাচে এবং কুটচালের মাধ্যমে হালাকূ খানের মুসাহিবদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। ইসমাঈলীদের সমগ্র ধনভাণ্ডার মুঘলরা হাতিয়ে নেয় এবং তাদের সাম্রাজ্যও ধ্বংস করে ফেলে। তারপর নাসীরুদ্দীন তুসী হালাকূ খানকে বাগদাদ আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেন এবং বাগদাদের খলীফার মন্ত্রী আলকামীও বিশ্বাসঘাতকতা করে নাসীরুদ্দীনের মাধ্যমে হালাকূ খানের সাথে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ফলে বাগদাদ অচিরেই একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে তারীখ-ই-ইসলামের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতএব এখানে ঐ হৃদয় বিদারক ঘটনার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। হালাকূ খান বাগদাদ থেকে কল্পনাতীত ধন-সম্পদ নিয়ে মারাগা অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি সেখান থেকে প্রচুর সোনাদানা ও হীরা-জহরত এবং অসংখ্য দাসী-বাঁদী মানকূ খানের খিদমতে কারাকোরামে প্রেরণ করেন। তখন পারস্যের শাসনকর্তা আতাবেক সাদ ইব্ন আবূ বকর, মুসিলের শাসনকর্তা বদরুদ্দীন লূলূ এবং রূমের শাসনকর্তা সুলতান আযীযুদ্দীন সালজুকী হালাকূ খানের খিদমতে হাযির হয়ে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ৬৫৭ হি. সনের ২০শে রমযান (সেপ্টেম্বর ১২৫৯ খ্রি) জুমুআর দিন হালাকূ খান কয়েকজন বিখ্যাত অধিনায়কের নেতৃত্বে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে সিরিয়ার দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। ঐ দলটি নাসীবীন, হার্রান, আলেপ্পো প্রভৃতি শহর জয় এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করে দামেশকে গিয়ে পৌঁছে। তারা দামেশক জয় করে সেখানকার অধিবাসীদের সাথেও অনুরূপ আচরণ করে।

তারপর সমগ্র সিরিয়া দখল করে। হালাকূ খান কাসূকা নামক জনৈক ব্যক্তিকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করে খুরাসানে ফিরে আসেন। মিসরীয় বাহিনী সিরিয়া আক্রমণ করে মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয়। ঐ সংবাদ শুনে হালাকূ খান অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং সিরিয়া আক্রমণ করে মিসরীয়দেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবার সংকল্প নেন। কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে তার কাছে মানকূ খানের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছে। এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটে। আর তা এই যে, বাদশাহ্ কাবচাক বারাকাহ্ খান ইব্ন জূজী খান এবং হালাকূ খানের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্য ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, হালাকূ খানের কাছে বারাকাহ খানের জনৈক নিকটাত্মীয় ছিল। হালাকূ খান তাকে হত্যা করে ফেলেন। বারাকাহ্ খান এই সংবাদ শুনে বললেন, হালাকূ খান বাগদাদের খলীফাকে হত্যা করেছেন এবং বিনা কারণে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকেও হত্যা করেছেন। আমি তার উপর থেকে ঐ সমস্ত নিরপরাধ লোকের প্রতিশোধ নেব। এই বলে তিনি হালাকূ খানের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। ৬৬০ হি. (১২৬১-৬২ খ্রি) সনে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং হালাকূ খান তাতে পরাজিত হন। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত ৬৬১ সনে (১২৬২-৬৩ খ্রি) স্বয়ং হালাকূ খান বারাকাহ্ খানের মুকাবিলা করতে আসেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বারাকাহ খানের বাহিনী পরাজিত হয়। হালাকূ খান জয়ী হন বটে, কিন্তু এর কিছুদিন পরই বারাকাহ্ খান হালাকূ খানের উপর হামলা চালিয়ে তাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের কারণে হালাকূ খান মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। ঐ সময়ে আমীর ঈচল মারাগায় মৃত্যুবরণ করেন। মুঘলরা সিরিয়া জয় করে সেখানে কারামাতার সম্প্রদায়সমূহের বসতি গড়ে তোলে।

হালাকূ খানের মৃত্যু

এবার বারাকাহ্ খান পরাজিত হওয়ার পর হালাকূ খান তার একজন অধিনায়ককে সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করেন, যাতে তিনি সেখান থেকে কারামাতার গোত্রসমূহের লোকদেরকে সাথে করে নিয়ে আসেন। ঐ লোকদেরকে বারাকাহ খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। যাহোক, ঐ অধিনায়ক সিরিয়ায় গিয়ে কারামাতার গোত্রসমূহের লোকদেরকে নিজের পক্ষে টেনে নেন এবং খোদ হালাকূ খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই সংবাদ হালাকূ খানের কাছে যখন মারাগায় গিয়ে পৌঁছে তখন তিনি এতই দুঃখিত ও মর্মাহত হন যে, একেবারে মৃত্যু ব্যাধিতেই আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত ৬৬৩ হি. সনের রবিউল আউয়াল (জানুয়ারী ১২৬৫ খ্রি) মাসের শেষ দিকে, মোট আট বছর সাম্রাজ্য শাসন করে আটচল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মারাগাহ নগরী ছিল তার রাজধানী। তিনি সেখানে নাসীরুদ্দীন তুসী এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীর সাহায্যে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। হালাকূ খান আপন পুত্র আবাকা খানকে ইরাক, খুরাসান প্রভৃতি দেশের শাসন ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। তিনি তার অপর পুত্রকে আযারবায়জানের, সালদূযকে দিয়ারে বকর ও দিয়ারে রাবীআর শাসনকর্তা পদে এবং খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ জুইনীকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি শামসুদ্দীনের ভাই আতাউল মুল্‌ক আলাউদ্দীনকে

বাগদাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। হালাকূ খানের মৃত্যুর পর তার দাফন কার্য মুঘলদের রীতি অনুযায়ী অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে সম্পন্ন করা হয়। আর তা এইভাবে যে, কবরের পরিবর্তে একটি পাতাল কক্ষ নির্মাণ করে তাতে হালাকূ খানের লাশ রাখা হয়। তারপর তাকে সঙ্গদানের জন্য বেশ কয়েকজন যুবতী মেয়েকে আকর্ষণীয় পোশাক ও অলংকারে সুসজ্জিত করে ঐ কক্ষে ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর খুব শক্তভাবে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। একটি লাশের সাথে এভাবে বেশ কয়েকটি নিষ্পাপ যুবতীকে একটি কক্ষের মধ্যে আটকিয়ে দেওয়া এমন একটি পাশবিক রীতি, যার কথা চিন্তা করলেও শরীর শিউরে ওঠে। হালাকূ খানের সমসাময়িককালে হিন্দুস্থানে ছিল সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের হুকুমত। হালাকূ খান সর্বদা সুলতান বলবনের অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতেন। কিন্তু হিন্দুস্থান আক্রমণ করার সাহস তার হয়নি। কোন কোন মুঘল অধিনায়ক হিন্দুস্থান আক্রমণ করেছেন বটে, তবে এটা হিন্দুস্থানের দাসবংশের সম্রাটদের কৃতিত্ব যে, তারা প্রতিবারই মুঘলদের পরাজিত করে হিন্দুস্থান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে এমন মুহূর্তও আসে যে, মুঘলরা হিন্দুস্থানের রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কিন্তু সেখানে টিকে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এটা হচ্ছে সেই যুগ, যখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। যখন সর্বত্রই ছিল মুঘলদের দুর্বার আক্রমণ, অমানুষিক নির্যাতন ও জয়জয়কার অবস্থা, তখন শুধু হিন্দুস্থানই ছিল এমন একটি দেশ, যেখানে একটি অতি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র ছিল এবং যা মুঘলদের হস্তক্ষেপ থেকে বলতে গেলে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অক্ষত ছিল।

হালাকূ খানের মন্ত্রী ও সভাসদদের মধ্যে খাজা নাসীরুদ্দীন তুসী ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি যিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি ছিলেন ইসমাঈলী ও বাতিনীদের দ্বারা প্রতিপালিত ও প্রশিক্ষিত। তার এক গ্রন্থের নাম 'আখলাকে নাসিরী'। আলামূতের বাদশাহ নাসিরুদ্দীনের নামে তিনি এই গ্রন্থটির নামকরণ করেছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মাহবাতী'ও তারই রচিত।

আবাকা খান

হালাকূ খান মারাগায় মৃত্যুবরণ করার পর আমীর ও সভাসদরা সেখানে একটি বিরাট মজলিসের আয়োজন করে হালাকূ খানের পুত্র আবাকা খানকে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। আবাকা খান সিংহাসনে বসতে অস্বীকার করেন এবং বলেন– মুঘলদের শাহানশাহ কুবলাঈ খান যতক্ষণ অনুমতি না দেন ততক্ষণ আমি সিংহাসনে আরোহণ করতে পারি না। কিন্তু সর্দাররা তার এই আপত্তি গ্রহণ করেনি। তারা জোর করেই তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন। আবাকা খান হিজরী ৬৬৩ সনের ২রা রমযান (জুলাই ১২৬৫ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে সেনাধিনায়ক ও সাধারণ সৈন্যদেরকে পুরস্কৃত করেন এবং আপন ভাই বাশমূতকে শেরওয়ানীর শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। তিনি তার অপর ভাই তাশীনকে মাযিন্দারান ও খুরাসানের এবং তূরান বাহাদুর ইব্‌ন সানজাককে রূমের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি তূরান ইব্‌ন এলাকানকেও রূমেরই একটি অঞ্চলের

শাসনকর্তা করে পাঠান। আবাকা খান আরগূন আকাকে আপন অর্থমন্ত্রী এবং খাজা শামসুদ্দীন জুইনীকে আপন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তিনি আপন পুত্র আরগূন খানের 'আতালিকী' তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মানসে মেহেরতাক নূইয়া বারলাস-এর হাতে ন্যস্ত করেন। আবাকা খান সিংহাসনে আরোহণ করার পর বারাকাহ্ খানের সাথে অবিরাম যুদ্ধ চলতে থাকে। এভাবে যুদ্ধ চলাকালেই বারাকাহ খানের মৃত্যু হয়। তারপর আবাকা খানের অধিনায়ক ও আত্মীয়-স্বজনরা চতুর্দিক থেকে তার দেশের উপর হামলা চালায়। বুরাক খান চুঘতাঈ খুরাসান দখল করে নেন। এ কারণে তার সাথে কয়েকটি যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত আবাকা খান জয়ী হন এবং ধীরে ধীরে তার ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। কিন্তু যখনই তিনি মিসরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করেন তখনই তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মিসর এবং হিন্দুস্থান আবহাওয়া ও অধিবাসীদের দিক দিয়ে বীরত্বের ক্ষেত্রে খুব একটা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী না হলেও এবং উভয় দেশই দাস বংশের দ্বারা শাসিত হলেও দুর্বার মুঘল বাহিনীকে আর কোন দেশে নয় বরং শুধু এ দু'টি দেশেই বার বার পরাজয়বরণ করতে হয়েছিল।

আবাকা খানের মৃত্যু

সতর বছর রাজত্ব করার পর আবাকা খান ৬৮০ হি. সনে (১২৮১ খ্রি) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন শায়খ সাদী সিরাজী এবং মাওলানা জালালুদ্দীন রূমীর অত্যন্ত ভক্ত। তিনি স্বয়ং ঐ দুই ব্যক্তির দরবারে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করতেন। আবাকা খানের পর তার পুত্র তেকূদার আগলান সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তেকূদার আগলান ওরফে আহমদ খান

তেকূদার আগলান শাহযাদা থাকাকালে ইসলামী চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি নিজের জন্য আহমদ খান উপাধি গ্রহণ করেন এবং শায়খ কামালুদ্দীন আবদুর রহমান রাফিয়ীকে নিজের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। সুলতান আহমদ খান মুসলমানদেরকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে বড় বড় পদ দান করেন। তাছাড়া তিনি মুঘলদের কুফরী রীতি পদ্ধতির উচ্ছেদ সাধন করে তার পরিবর্তে ইসলামী আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। সুলতান আহমদ খানের কারণে অন্য মুঘলরাও ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। মুঘল অধিনায়করা বিশেষ করে সুলতান আহমদ খানের ভাই আরগূন খান যখন লক্ষ্য করলেন যে, সুলতান আহমদ খানের কারণে মুঘলদের সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তখন তারা বিদ্রোহ ঘোষণার ষড়যন্ত্র শুরু করে।

তেকূদার আগলানের শাহাদাত

আবাকা খানের পুত্র আরগূন খান ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর সকল অধিনায়ককে নিজের পক্ষে এনে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে সুলতান আহমদ খান তিন বছর হুকুমত করার পর নিজের পুত্রের হাতে বন্দী ও শহীদ হন।

আরগূন খান

আরগূন খান সিংহাসনে আরোহণ করে সা'দুল্লাহ নামীয় জনৈক ইহুদীকে তার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং তার পরামর্শে প্রত্যেক শহরে মুসলিম উলামাবৃন্দকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এভাবে হাজার হাজার উলামা অত্যন্ত নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। আরগূন খান একজন হিন্দু যোগীর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। ঐ হিন্দু যোগী আরগূন খানকে এক প্রকার ওষুধ খাওয়ান এবং বলেন, এর প্রভাবে তোমার আয়ু বেড়ে যাবে। কিন্তু ঐ ওষুধে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আরগূন খান একের পর এক বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত হিজরী ৬৯০ সনে (১২৯১ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আরগূন খানের পুত্র কীখাতূ খান

আরগূন খানের পর তার পুত্র কীখাতূ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার শাসনামলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, তিনি ৬৯৩ হি. সনে (১২৯৪ খ্রি) টাকার নোট আবিষ্কার করেন যাকে মুঘলরা 'ইউত' বলত। এটা ছিল একটা কাগজ যার উভয় পিঠে কালিমা-ই-তাইয়িবাহ্ লেখা থাকত। কালিমার নিচে লেখা থাকত বাদশাহর নাম ও নোটের মূল্য। এ ভাবে কাগজী মুদ্রা প্রচলিত হওয়ার কারণে সমগ্র দেশে দারুণ হৈ চৈ-এর সৃষ্টি হয় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। মানুষ অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে এই কাগজ দেখত এবং বলত, আমি স্বর্ণমুদ্রা অথবা রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে এটাকে কিভাবে গ্রহণ করতে পারি? যা হোক, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে কীখাতূ খান বাজার থেকে এই সমস্ত কাগজী মুদ্রা তুলে নেন।

কীখাতূ খানের মৃত্যু

৬৯৪ হি. সনে (১২৯৪-৯৫ খ্রি) মুঘল আমীর-উমারা কীখাতূ খানকে হত্যা করে ফেলে। তারা তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছিল যে, তিনি সব সময় ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষপাতিত্ব করেন।

বায়দূ খান ইব্ন কারাকায়ী ইব্ন হালাকূ খান

কীখাতূ খানের পর তার চাচাত ভাই বায়দূ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৬৯৬ হি. (১২৯৬-৯৭ খ্রি) আরগূন আকা আভীরাত, যিনি আনুমানিক ত্রিশ বছর ধরে মুঘল বাদশাহদের পক্ষ থেকে খুরাসান প্রভৃতি এলাকা শাসন করছিলেন, মৃত্যুবরণ করেন। তার পুত্র আমীর নওরোয বেগ, শাহযাদা গাযান খান ইব্ন আরগূন খান ইব্ন আবাকা খান–এর কাছে চলে যান এবং তার পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। গাযান খান ঐ সময়ে খুরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন। বায়দূ খান ও গাযান খানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এ জন্য যে, গাযান খান নিজেকে সালতানাতের জন্য অধিক যোগ্য মনে করতেন। গাযান খান আত্মীয় নওরোয বেগের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শায়খ সদরুদ্দীন হামূভীকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের ইসলামী নাম মাহমূদ

খান রাখেন। গাযান খান ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে অনেক মুঘল অধিনায়কও ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর বায়দূ খান এবং সুলতান মাহমূদ খান (গাযান খান)-এর মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।

বায়দূ খানকে হত্যা

সুলতান মাহমূদ খান এক যুদ্ধে জয়লাভ করে বায়দূ খানকে হত্যা করেন এবং হিজরী ৬৯৪ সনের যিলহজ্জ (অক্টোবর ১২৯৫) মাসে স্বয়ং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

সুলতান মাহমূদ গাযান খান

সুলতান মাহমূদ খান সিংহাসনে আরোহণ করে আমীর নওরোয বেগ আভীরাতকে আপন মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন। তিনি মুদ্রার উপরে কালিমা তাইয়িবাহ খোদাই করার এবং মহর ও সরকারী ফরমান সমূহের শিরোনামে 'আল্লাহ্ তা'আলা' লেখার নির্দেশ দেন। কিছুদিন পর তিনি নওরোয বেগকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে সেখানে প্রেরণ করেন। ঈসতাহিমূর ও আরসালান নামীয় দু'জন মুঘল অধিনায়ক আপোসে এই মর্মে অঙ্গীকার করেন যে, তাদের একজন সুলতান মাহমূদ খানকে এবং অন্যজন আমীর খানকে এবং নওরোয বেগকে একই তারিখে হত্যা করবেন। তারা নিজেদের অঙ্গীকার পালনে যথাসম্ভব চেষ্টা করেন, তবে সফলকাম হতে পারেননি বরং উল্টো নিজেরাই সুলতান মাহমূদ খান এবং আমীর নওরোয বেগের হাতে নিহত হন। এর কিছুদিন পর কিছু সংখ্যক আমীর ও মন্ত্রী সুলতান মাহমূদ খানের কাছে আমীর নওরোয বেগের নিন্দাবাদ করেন। তারা সুলতানের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে যে, আমীর নওরোয বেগ খুরাসানে বিদ্রোহ ঘোষণার পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই গোপন ষড়যন্ত্রের কারণে সুলতান মাহমূদ গাযান খান আমীর নওরোযের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে সমগ্র পরিবার-পরিজনসহ তাকে হত্যা করেন। অনুরূপ পদ্ধতিতে মন্ত্রী খাজা সদরুদ্দীনও সুলতান মাহমূদ গাযান খানের হাতে নিহত হন এবং তার স্থলে 'জামী রাশীদী'-এর লেখক খাজা রাশীদুদ্দীন মন্ত্রী হন। এটা ৬৯৯ হিজরীর (১২৯৯-১৩০০ খ্রি) ঘটনা।

তারপর সুলতান মাহমূদ গাযান খান মিসরের সুলতানকে লিখেন : আমার পূর্ব পুরুষরা সিরিয়া জয় করেছিলেন। তাই এটা আমার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি। মিসরীয় সৈন্যরা অন্যায়ভাবে তা দখল করে রেখেছে। আমার পূর্ব পুরুষরা যেহেতু কাফির ছিলেন এবং দীন ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখতেন না তাই তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে অপরাধ করেছেন তা ক্ষমারযোগ্য। আল্লাহ্র ফযলে আমি মুসলমান এবং মুসলমান হওয়ার কারণে তোমাদেরকে আপন ভাই মনে করি। অতএব তোমাদের কর্তব্য এই যে, তোমরা সিরিয়া অঞ্চল আমার জন্য খালি করে দাও এবং মিসর থেকে এই পয়গামের যে উত্তর আসে তা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না বরং এই পত্রালাপের ফল এই দাঁড়ায় যে, মিসরীয়রা তাদের সীমান্ত অতিক্রম করে সুলতান মাহমূদ গাযান খানের অধিকৃত অঞ্চলে হামলা

চালায়। এমন কি তারা মসজিদসমূহের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন এবং মুসলমানদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। এই সংবাদ পেয়ে সুলতান মাহমূদ গাযান খান ৬৯৯ হিজরীতে (১২৯৯-১৩০০ খ্রি) নব্বই হাজার মোঙ্গল সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে সিরিয়া আক্রমণ করেন। তার মুকাবিলার জন্য মিসরের সুলতানও এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আসেন। হিমসের নিকটে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে গাযান খান মিসরীয়দেরকে পরাজিত করেন। তিনি সিরিয়ার বড় বড় শহরে নিজের প্রতিনিধি হিসাবে এক-একজন আমীর নিয়োগ করে রাজধানীতে ফিরে আসেন। মিসরের সুলতান নাসির সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে পুনরায় সিরিয়া আক্রমণ করেন। সিরিয়ার মোঙ্গল অধিনায়করা সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার মুকাবিলা করে। কিন্তু জয়লাভ করতে পারেনি। আমীর তীতাক যুদ্ধক্ষেত্রে তার অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করতে গিয়ে মিসরীয়দের হাতে বন্দী হন। এই সংবাদ শুনে গাযান খান পুনরায় সিরিয়া আক্রমণের সংকল্প নেন। কিন্তু তিনি এই মর্মে আর একটি সংবাদ পান যে, জুজী খানের বংশধর, যিনি কাবচাকের পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতায় রয়েছেন, তিনি দাবি করেছেন, হালাকূ খান এবং তার বংশধরদের ইরান, খুরাসান প্রভৃতি দেশে স্বাধীনভাবে শাসন করার কোন অধিকার নেই।

"এটা হচ্ছে আমাদের অধিকার এবং আমরা গাযান খানকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে ছাড়বো।" যা হোক মুঘলদের এই আত্মবিরোধের কারণে গাযান খান সিরিয়ার দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগ আর পাননি।

সুলতান মাহমূদ গাযানের মৃত্যু

৭০৩ হিজরীর ১১ই শাওয়াল রোববার (১৩০৩-০৪ খ্রি) সুলতান মাহমূদ গাযান খান কাযবীন অঞ্চলে ইনতিকাল করেন। এই সুলতানের যুগে অনেক মুঘল ইসলাম গ্রহণ করে। সাধারণ মুসলমানরাও তা থেকে বহুলভাবে উপকৃত হয়। মৃত্যুকালে তিনি ওসীয়ত করে যান ঃ আমার পরে আমার ভাই উলজাইতূ ওরফে সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দা সিংহাসনের অধিকারী হবে।

সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দাহ উলজায়তূ

সুলতান মাহমূদ খানের মৃত্যুর পর উলজায়তূর প্রতি অসন্তুষ্ট আমীর মারকাদাক অন্য একজন শাহযাদা আল-আফরাঈকে সিংহাসনে বসাবার উদ্যোগ নেন। আমীর ইসমাঈল তুরখান বিষয়টি জানতে পেরে এ সম্পর্কে উলজায়তূকে অবহিত করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আল-আফরাঈও মারকাদাককে বন্দী করে হত্যা করেন এবং ৭০৩ হিজরীর যিলহজ্জ (আগস্ট ১৩০৪ খ্রি) মাসে সুলতান মুহাম্মদ 'খোদাবান্দাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বড় বড় আমীর-উমারা যেমন আমীর বাতলাক শাহ, আমীর চুপান সালাদূয, আমীর ফুলাদ, আমীর হুসাইন বেগ, আমীর সুনজ, আমীর মালোয়ী, আমীর সুলতান, আমীর রমাযান, আমীর লাঘূ প্রমুখ সুলতানের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করেন। সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দাহ সিংহাসনে আরোহণ করেই এই মর্মে নির্দেশ জারি করেন যে, সমগ্র

দেশে ইসলামী শরীয়ত অনুসরণের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং শরীয়ত বিরোধী যাবতীয় রীতি-নীতির উচ্ছেদ সাধন করতে হবে। শীঘ্রই সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দাহর হুকুমত ও সালতানাত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং রাশিয়া, খাওয়ারিযম, বুলগেরিয়া, রূম ও সিরিয়া থেকে কারাকোরাম, সিন্ধু ও ইরাক পর্যন্ত সমগ্র দেশ তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দাহর শাসনামলে মুঘল সালতানাত উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে। তাঁর সালতানাতের বিরোধিতা করার মত কেউ ছিল না।

সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দাহর মৃত্যু

মোট তের বছর হুকুমত করার পর সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দাহ ৭১৬ হিজরীতে (১৩১৬ খ্রি) ঈদুল ফিতরের রাতে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তিনি 'শহরে সুলতানিয়া' নামে একটি নতুন শহর নির্মাণ করে সেখানে আপন রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। মৃত্যুর পর ঐ শহরেই তাঁকে দাফন করা হয়। তারপর তাঁর পুত্র সুলতান আবূ সাঈদ বাহাদুর খান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

সুলতান আবূ সাঈদ বাহাদুর খান

সিংহাসনে আরোহণকালে সুলতান আবূ সাঈদের বয়স ছিল ১৪ বছর। মুঘলদের আমীরদের মধ্যে প্রথম প্রথম অনৈক্যের সৃষ্টি হলেও পরবর্তী সময়ে এর ক্ষতিকারক দিকটা বিবেচনা করে তারা একতাবদ্ধ হয়ে যান। সুলতান আবূ সাঈদ বাহাদুর খান আমীর চূবানকে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ দান করে তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আমীর চূবানের পুত্র আমীর হাসান জালায়িরের বিবাহ হয় বাগদাদ খাতুনের সাথে। সুলতান আবূ সাঈদ এই স্ত্রীলোকটির প্রেমে মত্ত হয়ে পড়েন। তিনি চান যেন আমীর হাসান বাগদাদ খাতুনকে তালাক দিয়ে দেন। কিন্তু আমীর চূবান তা মেনে নিতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত ঘটনাটি এই পর্যন্ত গিয়ে গড়ায় যে, আমীর চূবান বিদ্রোহ ঘোষণা করে খুরাসান দখলের সংকল্প করেন। হিরাতে ছিল চুঘতাই বংশের সালতানাত। হালাকূ খানের বংশের সাথে এই চূঘতাই বংশের লোকদের মনোমালিন্য ছিল। যদিও তারা বাহ্যত আনুগত্য প্রকাশ করত। এই চুঘতাই অধিনায়কদের একজন ছিলেন তুরমাহ শীরীন খান। আমীর চূবান তাকে সহায়তা করার জন্য শীরীন খানকে উদ্বুদ্ধ করেন। সুলতান আবূ সাঈদ বাহাদুর খান যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত আমীর চূবান খান বন্দী হন এবং তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়। এবার আমীর হাসান জালায়ির বাগদাদ খাতুনকে তালাক দিয়ে আবূ সাঈদকে তার সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ করে দেন। ৭৩৫ হিজরীতে (১৩৩৪-৩৫ খ্রি) বাদশাহ দাশতে কিবচাকের উযবেক খান এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ইরান আক্রমণ করেন।

আবূ সাঈদের মৃত্যু

এদিক থেকে সুলতান আবূ সাঈদ সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। কিন্তু শিরওয়ান নামক স্থানে পৌঁছার পর প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সুলতান অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৭৩৬

হিজরীর ১৩ই রবিউল আখির (ডিসেম্বর ১৩৩৫ খ্রি) তাঁর ইনতিকাল হয়। যেহেতু তিনি নিঃসন্তান ছিলেন তাই তাঁর ইনতিকালের পর মুঘল সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

আরতাক বূকা ইব্ন তুলি খানের উত্তর পুরুষ আরপা খান

সুলতান আবূ সাঈদের ইনতিকালের পর কিছু সংখ্যক আমীরের ঐকমত্য অনুযায়ী আরপা খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর তিনি ঘোষণা করেন ঃ রাজকীয় আরাম-আয়েশ ও জাঁকজমকের কোন প্রয়োজন আমার নেই। আহারের জন্য সামান্য ডালরুটি এবং পরনের জন্য সাধারণ দু-একটি বস্ত্রই আমার জন্য যথেষ্ট। যেহেতু উযবেক খান তার সেনাবাহিনী নিয়ে ইরান পর্যন্ত এসে গিয়েছেন। তাই আরপা খান তাঁর মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন এবং তাকে প্রতিরোধ করার জন্য স্থানে স্থানে সেনাবাহিনী নিয়োগ করেন। ঠিক এমনি সময়ে উযবেক খানের কাছে সংবাদ পৌছে যে, দাশতে কিবচাকে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। এই ভয়ংকর সংবাদ শোনার সাথে সাথে উযবেক খান রাজধানীতে ফিরে যান। এদিকে আমীর আলী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তাতে তিনি জয়লাভ করেন এ জন্য যে, আরপা খান হালাকূ খানের বংশধরদের যত্রতত্র হত্যা করার কারণে বেশিরভাগ আমীর তার উপর ক্ষিপ্ত ছিলেন।

আরপা খানের হত্যা

শেষ পর্যন্ত ৭৩৬ হিজরীর রমযান (মে ১৩৩৬ খ্রি) মাসে মারাগা নামক স্থানে আমীর আলীর সাথে আরপা খানের যুদ্ধ হয় এবং তাতে শেষোক্তজন বন্দী ও নিহত হন। আমীর আলী জয়লাভ করে মূসা খান ইব্ন বায়্যূদ খান ইব্ন তারকাঈ খান ইব্ন হালাকূ খানকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

মূসা খান ইব্ন বায়দূ খান

মূসা খান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আমীর আলী এবং ক্ষমতাবলম্বী আমীরগণ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন। রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি আমীর হাসান জালায়ীর মূসা খানকে আক্রমণ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে দেন এবং আমীর আলীকে হত্যা করেন। মূসা খান পালিয়ে হাযারা জেলায় চলে আসেন এবং এখানে বন্দী হয়ে নিহত হন। তার পরে সুলতান মুহাম্মদ খান ইব্ন কুতলুক খান ইব্ন তাইমূর ইব্ন আনবারজী ইব্ন মানকূর তাইমূর ইব্ন আনবারজী ইব্ন মানকূয তাইমূর ইব্ন হালাকূ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার হুকুমতও মূসা খানের ন্যায় অত্যন্ত দুর্বল ছিল। তারপর শুধু নামেমাত্র হালাকূ খানের বংশের আরো বেশ কয়েক ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৭৪৪ হিজরী (১৩৪৩ খ্রি) নাগাদ হালাকূ খানের বংশধরদের নাম-নিশানা মুছে যায় এবং তিনি যে সমস্ত দেশ জয় করেছিলেন তাতে অনেকগুলো স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

চেঙ্গিয খানের পুত্র জূজী খানের বংশধর

চেঙ্গিয খানের পুত্রদের মধ্যে জূজী খান ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। খাওয়ারিযম জয়ের পর জূজী খান দাশতে কিবচাক জয় করে সেখানে আবাস স্থাপন করেছিলেন। তার সাথে চেঙ্গিয খানের অবশিষ্ট পুত্রদের কোন মিল-মহব্বত ছিল না। তিনি সব সময় অন্য ভাইদের থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন থাকতেন। এই প্রেক্ষিতে তার রাজ্যও ছিল পৃথক এবং সবার থেকে দূরে। জূজী খানের বংশধরকে প্রধানত উযবেক নামে সম্বোধন করা হয়। জূজী খান চেঙ্গিযের সামনেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাই তিনি জূজী খানের রাজ্য তার পুত্র বাতূ খানকে দান করেন। জূজীর ছিল সাত পুত্র। তন্মধ্যে বাতূ খান ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ।

বাতূ খান ইব্ন জূজী খান

বাতূ খান দাশতে কিবচাক থেকে রুশ চারকাস, ফারঙ্গ প্রভৃতি দেশে সেনা প্রেরণ করেন তখন চেঙ্গিয খানের পুত্র উকতাই খান নিজ পুত্র কুযূক খান, তুলি খানের পুত্র মানকূ খান এবং চুঘতাই খানের এক পুত্রকে নির্দেশ দেন যেন তারা বাতূ খানের সাথে অবস্থান করে দেশ জয়ে তাকে সাহায্য করে।

বাতূ খান সমগ্র রাশিয়া জয় করে মস্কোর উপর হামলা চালান এবং তা জয় করে পোল্যান্ডও নিজের দখলে নিয়ে আসেন। এই অবস্থা লক্ষ্য করে সমগ্র ইউরোপের রাজন্যবর্গ একে অন্যের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন এবং একটি যৌথবাহিনী গঠন করে বাতূ খানের মুকাবিলার উদ্যোগ নেন। বাতূ খানের বাহিনীতে অনেক মুসলমান সৈন্যও ছিল। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, খ্রিস্টান সৈন্যদের সংখ্যা তার সৈন্যদের চাইতে বহুগুণ বেশি তখন তিনি নির্দেশ দেন— আমার বাহিনীর সকল মুসলমান একত্রিত হয়ে যেন আমাদের জয়লাভের জন্য প্রার্থনা করে। তারপর যুদ্ধ শুরু হয় এবং তাতে খ্রিস্টানরা শোচনীয় পরাজয়বরণ করে। বাতূ খান সমগ্র হাঙ্গেরী দখল করে নেন। তিনি ইউরোপে একটি শহর নির্মাণ করেন, যার নাম ছিল সরায়ে। তার সমগ্র শাসনামল ফিরিঙ্গি দেশ জয় এবং সেখানে শাসন প্রতিষ্ঠায় কেটে যায়। তিনি ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খ্রি) মৃত্যুবরণ করেন।

বারাকাহ্ খান ইব্ন জূজী খান

বাতূ খানের মৃত্যুর পর তার ভাই বারাকাহ্ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাতূ খান তো চেঙ্গিয খানের মত নামেমাত্র মুসলমান ছিলেন। কিন্তু বারাকাহ্ খান প্রকৃতই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে মুসলমানরা মুঘলদের সব ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে নিরাপদ থাকে। বারাকাহ্ খান রাগান্বিত হয়ে বুকা খানের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী হালাকূ খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হালাকূ খান বুকা খানের মুকাবিলায় একজন অধিনায়ককে পাঠান। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে হালাকূ খান পরাজিত হন। ৬৬১ হিজরীতে (১২৬৩ খ্রি) স্বয়ং হালাকূ খান এক বাহিনী নিয়ে বুকা খানের রাজ্য আক্রমণ করেন। ঐ যুদ্ধে প্রথমে হালাকূ খান পরাজিত হলেও শেষ পর্যন্ত বারাকাহ্ খানের বাহিনী পলায়ন করে।

বারাকাহ্ খানের পর জূজী খানের বংশধরদের মধ্যে বত্রিশ ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন। বারাকাহ্ খানের পর তাঁর পুত্র মানকূর তাইমূর খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেন তুকতাঈ খান। ৭০৩ হিজরীতে (১৩০৩-০৪ খ্রি) তুকতাঈ খান ও তূকাই খানের মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে তুকতাঈ খান বেশ নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে দেশ শাসন করতে থাকে। তিনি গাযান খানকে লিখেন : হালাকূ খান এবং তার বংশধর জবরদস্তিমূলকভাবে আযারবায়জানকে নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, অথচ চেঙ্গিযের বণ্টন অনুযায়ী এটা হচ্ছে জূজী খানের বংশধরদের প্রাপ্য। এখন আপনার উচিত আযারবায়জানকে আমাদের হাতে সমর্পণ করা। অন্যথায় আপনার তো জানা থাকার কথা যে, আমরাতো অস্ত্রবলে দখল করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখি। গাযান খান এর নেতিবাচক উত্তর দেন এবং তুকতাঈ খানের মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কোন যুদ্ধ হয়নি এবং ধীরে ধীরে তুকতাঈ খান আযারবায়জানের দাবি ভুলে যান।

তুকতাঈ খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র তুগরিল খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর তুগরিল খানের পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তার পুত্র উযবেক খান। উযবেক খান অত্যন্ত বিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল জূজী খানের বংশধরদের সাতটি গোত্রের মধ্যেই বিস্তৃত। তাঁর নামেই উযবেক জাতির নামকরণ হয়েছে। উযবেক খানের অনেক সন্তান-সন্ততি ছিল এবং তারা উযবেক জাতি নামে পরিচিত। ৭১৮ হিজরীতে (১৩১৮ খ্রি) উযবেক ইরানের বাদশাহ সুলতান আবূ সাঈদ বাহাদুর খানের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। বাহাদুর খানও মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু উযবেক খান শুধু লুটপাট করে ঝটপট দেশে ফিরে যান। ৭৩৫ হিজরীতে (১৩৩৪-৩৫ খ্রি) উযবেক খান পুনরায় ইরানে সৈন্য সমাবেশ ঘটান।

সুলতান আবূ সাঈদ এই সংবাদ শুনে মুকাবিলার জন্য এগিয়ে আসেন। এই সফরেই সুলতান আবূ সাঈদ বাহাদুর খানের মৃত্যু হয় এবং আরপা খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আরপা খান সিংহাসনে আরোহণ করেই উযবেক খানের মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয়নি। উযবেক খান সেখান থেকে ফিরে আসেন এবং দীর্ঘদিন সাম্রাজ্য পরিচালনার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তারপর জানী বেগ খান উযবেক সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে জূজী খানের বংশধর তথা উযবেক গোত্রের বেশ কয়েক ব্যক্তি নিজেদের পৃথক পৃথক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। জানী বেগের পর তার পুত্র ইযদী বেগ খান উযবেক নামক জনৈক বাদশাহ তিবরিয শাসন করতেন। অনুরূপভাবে তাইমূর সাহিবকারানের যুগে উরুস খান উযবেক বিদ্যমান ছিলেন। উরুস খান উযবেকের পুত্র ছিলেন তাইমূর মালিক খান। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তুকতামিশ খান উযবেক। এই তুকতামিশের হুকুমত ছিল দাশতে কিবচাক। তিনি কারানের সম্রাট আমীর তাইমূরের সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছিলেন। ৮১৫ হিজরীতে (১৪১২ খ্রি) ফুলাদ খান উযবেক ছিলেন তুর্কিস্তানের দখলদার ও হাকিম। সুলতান সাঈদ মির্যা শাহরুখ এই বংশেরই এক মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। ফুলাদ খানের পর মুহাম্মদ খান উযবেক সিংহাসনে আরোহণ করেন। বুরাক খান উযবেক, যিনি উরুস খানের বংশধর ছিলেন। মির্যা উলূগ বেগ তাইমূরীর সাহায্য নিয়ে মুহাম্মদ খান উযবেকের উপর হামলা চালান এবং ৮২৮ হিজরীতে (১৪২৫ খ্রি) জয়লাভ করে তুর্কিস্তান নিজের দখলে নিয়ে

যান এবং সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর উলুগ বেগ তাইমূরী এবং বুরাক খানের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয় এবং তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। ঘটনাচক্রে উলুগ বেগ প্রেরিত বাহিনী পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের সংবাদ শুনে সুলতান সাঈদ মির্যা শাহরুখ আত্মহত্যা করেন। মির্যা শাহরুখের সৈন্য সমাবেশের সংবাদ শুনে বুরাক খান সমরকন্দ থেকে ফিরে যান এবং শাহরুখের মুকাবিলা করা সমীচীন মনে করেননি। ৮৩২ হিজরীতে (১৪২৯ খ্রি) সুলতান মাহমূদ খান ও বুরাক খান নিহত হন এবং এখানেই উযবেক সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ ৮৫৫ হিজরীতে (১৪৫১ খ্রি) আবুল খায়ের খান এবং বাদাক খান উযবেক সমরকন্দ দখল করে সেখানে নিজ হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। আবুল খায়ের খানের পুত্র ছিলেন বাদাক খান এবং বাদাক খানের পুত্র ছিলেন সুলতান আবুল ফাত্‌হ মুহাম্মদ খান। এই মুহাম্মদ খান ছিলেন যহীরুদ্দীন বাবরের সমসাময়িক। এই সুলতান আবুল ফাত্‌হ মুহাম্মদ খান উযবেককে শায়বানী খান উযবেক নামে স্মরণ করা হয়। ইনি ইসমাঈল সাফাভীর সাথে মুকাবিলা করতে গিয়ে নিহত হন। তিনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং দুঃসাহসী ছিলেন। এই আবুল ফাত্‌হই বাবরকে তুর্কিস্তান ও ফারগানা থেকে বেদখল করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অথচ তারই মাথার খুলি সোনার পাতে মুড়িয়ে ইসমাঈল সাফাভী সেটাকে মদ্যপানের পাত্রে পরিণত করেন। তাকে শায়য়াবানী খান এ জন্য বলা হতো যে, তার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির নাম শায়বানী খান ছিলেন। সুলতান আবুল ফাত্‌হ মুহাম্মদ খান উযবেক ৯১৭ হিজরীতে (১৫১১ খ্রি) নিহত হন। তারপর তার পুত্র তাইমূর সুলতানকে উযবেকরা নিজেদের বাদশাহ মনোনীত করে। ৯৩৫ হিজরীতে (১৫২৮-২৯ খ্রি) উযবেকরা তাহমাসপ সাফাভীর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। কিন্তু জয়লাভ করেই তারা এমন ভাবে লুটপাটে মেতে উঠে যে, তাহমাসপ সুযোগ বুঝে অকস্মাৎ প্রতিআক্রমণ চালিয়ে উযবেকদের বিজয়কে পরাজয়ে পরিণত করেন।

জানী বেগ খানের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তার পুত্র ছিলেন ইসকান্দার খান। আর ইসকান্দার খানের পুত্র ছিলেন আবদুল্লাহ্ খান। আবদুল্লাহ্ খান উযবেক ইরানীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

তিনি ছিলেন হিন্দুস্থানের বাদশাহ আকবরের সমসাময়িক। আকবরের সাথে তাঁর প্রায়ই পত্রালাপ হতো। আবদুল্লাহ খান ১০০৬ হিজরীতে (১৫৯৭-৯৮ খ্রি) ইনতিকাল করেন। তারপর তার পুত্র আবদুল মু'মিন খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি আপন চাচা রুস্তাম সুলতানের হাতে নিহত হন। তারপর উযবেকী সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। আবদুল্লাহ্ খানের ভাগ্নে ওয়ালী মুহাম্মদ খান আবদুল মু'মিন তুর্কিস্তান দখল করে ইমাম কুলী খানকে মাওরাউন নাহর-এর এবং আপন ভাগ্নে নযর মুহাম্মদ খানকে বাদখ্শান প্রভৃতি এলাকার শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন। কিছুদিন পর নযর মুহাম্মদ খান ওয়ালী মুহাম্মদ খানকে উৎখাত করেন। তিনি সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে ইরানে শাহ্ আব্বাসের কাছে আশ্রয় নেন। এখানে খাওয়ারিযমেও উযবেকদের একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা কোনদিনই খুব একটা উল্লেখযোগ্য বা শক্তিশালী হয়নি। চেঙ্গিয খানের পুত্র জূজী খানের বংশধরদের অবস্থা ঐতিহাসিকগণ ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করেননি।

এখানে উযবেকদের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, পরবর্তীতে যখন সমসাময়িক সুলতানদের বর্ণনা প্রসঙ্গে এদের নামও আসবে তখন তা বুঝে নেওয়াটা খুব সহজ হবে। জূজী খানের বংশধরদের মধ্যে উযবেক গোত্র ছাড়াও কাযাক নামে আর একটি বিখ্যাত গোত্র ছিল। কাযাক গোত্রের কোন কোন ব্যক্তি দাশতে কিবচাক কিংবা তার কোন কোন অংশের উপর হুকুমত করেছে। এই গোত্রেরই এক বাদশাহ কায়িম সুলতান কাযাকের সাথে শায়াবানী খান অর্থাৎ সুলতান মুহাম্মদ খান উযবেকের যুদ্ধ হয়েছিল। এখন আমরা চেঙ্গিয খানের পুত্র চুঘতাই খানের বংশধরদের সম্পর্কে আলোচনা করবো।

চেঙ্গিয খানের পুত্র চুঘতাই খানের বংশধর

চেঙ্গিয খান তুর্কিস্তান, খুরাসান, বল্খ ও গযনী থেকে আরম্ভ করে সিন্ধু নদ পর্যন্ত সমগ্র এলাকা আপন পুত্র চুঘতাই খানকে দান করেছিলেন এবং আমীর কারাচার বারসালকে প্রধান সভাসদ নিয়োগ করে তার সঙ্গী করে দিয়েছিলেন। চেঙ্গিয খানের মৃত্যুর পর চুঘতাই খান সবসময়ই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উকতাই খানের আনুগত্য স্বীকার করে চলতেন। চুঘতাই খান অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ৬৪০ হিজরীতে (১২৪২-৪৩ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর আমীরুল উমারা কারাচার চুঘতাই খানের পৌত্র কারাবালাকূ খানকে সিংহাসনে বসান। এ খবর শুনে কুয়ূক খান ইব্ন উকতাই খান বলেন, চুঘতাই খানের পুত্র মহিসূ মানকূ খান বর্তমান থাকতে তার পুত্রকে কেন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করা হলো ? যেহেতু কারাকোরামের শাহী দরবারের হাতে সমগ্র মুঘলের শাসন কর্তৃত্ব ছিল তাই কুয়ূক খানের নির্দেশ মুতাবেক কারাবালাকূ খানকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে মহিসূ মানকূ খানকে তাতে বসানো হয়। ৬৫২ হিজরীতে (১২৫৪ খ্রি) আমীর কারাচারও মৃত্যুবরণ করেন। এর কিছুদিন পর যখন কারাবালাকূ খান মৃত্যুবরণ করেন তখন মুঘলরা তার স্ত্রী ওরমানা খাতুনকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। তারপর আলঘূ খানকে চুঘতাই গোত্রের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু একবছর হুকুমত করার পর তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তার পুত্র মুবারক শাহ চুঘতাই গোত্রের নেতা নির্বাচিত হন।

রাজত্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে চুঘতাই গোত্র তুলি খানের বংশধরদের সাথে শরীক থাকে। প্রথম প্রথম এই দুই গোত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব অব্যাহত থাকে। হালাকূ খানের কারণে চেঙ্গিয খানের পুত্র তুলি খানের বংশধররা বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। ফলে চুঘতাই খানের বংশধররা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে টিকে থাকতে পারেনি। চুঘতাইরা হিরাত ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার উপর সর্বদা নিজেদের অধিকার বহাল রাখে। কিন্তু তিনি কখনো হালাকূ খান ও তার বংশধরদের নেতৃত্ব স্বীকার করতেন এবং নিজেকে নায়েবে সুলতান বলতেন। আবার কখনো নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। মুবারক শাহের পর এদের মধ্যে সুলতান গিয়াসুদ্দীন মুহাম্মদ বুরাক খান ইব্ন মইসুন তাওয়ান খান ইব্ন মুওয়াতূ খান বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন মুহাম্মদ বুরাক খান আবাকা খানের সাথে খুরাসানে এক ভয়াবহ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। গিয়াসুদ্দীনের পুত্র দাওয়া খান, দাওয়া খানের পুত্র আলসীনূ খান এবং আলসীনূ খানের পুত্র কীক খানও অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রান্তশালী সুলতান ছিলেন। দাওয়া খানের দুই পুত্র তাইমূর খান এবং তুরমা শীরীন খানও শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। তুরমা শীরীন খান কান্দাহার আক্রমণ করেন এবং ৭১৬

হিজরীতে (১৩১৬ খ্রি) আমীর হাসান সালাদুয এবং তুরমা শীরীন খানের মধ্যে গযনী এলাকায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে তুরমা শীরীন খান পরাজিত হন। তুরমা শীরীন খান হিন্দুস্থান আক্রমণ করেছিলেন। তুরমা শীরীন খানের পর তার ভাই ফুলাদ খান চুঘতাই গোত্রসমূহের সুলতান হন। তিনি ৭৩৫ হিজরীতে (১৩৩৪-৩৫ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফুলাদ খানের পর গাযান ইব্‌ন মাহসূর আগলান ইব্‌ন দাওয়া খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। এরপর দানিশমন্দ আগালান, তারপর কুলীখান ইব্‌ন সূরুগদূ ইব্‌ন দাওয়া খান ইব্‌ন বুরাক খান চুঘতাই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর তুগলক তাইমূর খান ইব্‌ন আলসূনূর খান ইব্‌ন দাওয়া খান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তারপর সাম্রাজ্যের অধিকারী হন ইলীয়াস খাজা খান ইব্‌ন তুগলক তাইমূর খান। এরপর সিংহাসন লাভ করেন খিয্‌র খাজা খান তুগলক তাইমূর খান। তার দখল থেকে সমগ্র খুরাসান চলে গেলেও মুঘলিস্তানের বেশির ভাগ অংশ তারই দখলে ছিল।

তারই শাসনামলে কারানের অধিকারী আমীর তাইমূর খুরাসানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শেষ পর্যন্ত খিয্‌র খাজা আমীর তাইমূরের মুকাবিলায় টিকতে না পেরে তার সাথে আপন কন্যা তুগল খানমের বিবাহ দেন। ফলে আমীর তাইমূরের সাথে তার আত্মীয়তার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিবাহের কারণে আমীর তাইমূরকে গুরকান বলা হতে থাকে। অর্থাৎ চেঙ্গিযী বংশের সাথে আমীর তাইমূরের জামাই-শ্বশুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘলদের ভাষায় জামাতাকে গুরকান বলা হয়। খিযর খাজা খানের পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ খান মুঘলিস্তানের বাদশাহ হন। তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর ভাই জাহান আগলান ইব্‌ন খিয্‌র খাজা খান। জাহান আগলান খানের পর শহর মুহাম্মদ খান ইব্‌ন খিযর খাজা খান বাদশাহ হন। মুঘলিস্তানের বাদশাহ শের মুহাম্মদ খান এবং খুরাসান ও মাওরাউন নাহর-এর বাদশাহ উলুগ বেগ তাইমূরীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে শের মুহাম্মদ খান পরাজিত হন। শের মুহাম্মদ খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র উওয়ায়স খান, তারপর উওয়ায়স খানের পুত্র ইউনুস খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইউনুস খানের পর তার পুত্র মাহমূদ খান ও আহমদ উলজাই খান মুঘলিস্তানের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। শায়বানী খান উযবেকের মুকাবিলায় যহীরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবর এই ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তারা বাবরকে সাহায্য করেন। এমনকি যুদ্ধ করতে করতে দুই ভাইই প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হন। শায়বানী খানের সামনে তাদেরকে উপস্থিত করা হলে তিনি তাদের উভয়কেই মুক্ত করে দেন। কিন্তু মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে লজ্জাবশত দুই ভাইই আত্মহত্যা করেন এবং চুঘতাই বংশের সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এরপরও মানসূর খান ইব্‌ন সুলতান আহমদ উলজাঈ খান নামমাত্র মুঘলিস্তানের বাদশাহ হন। প্রকৃত পক্ষে মুঘলিস্তান তখন ছিল শায়বানী খানের হুকুমতের অধীন। মুঘলদের হুকুমতকে দুটি ভাগে বা দুটি স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে। একটি হচ্ছে চেঙ্গিযী মুঘল এবং অপরটি হচ্ছে তাইমূরী মুঘল। চেঙ্গিযী মুঘলদের সম্পর্কে ইতিমধ্যে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এবার মুঘলদের সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তবে তাইমূরী মুঘলদের আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমরা চেঙ্গিযী বংশের বংশতালিকা পেশ করার প্রয়োজনবোধ করছি, যাতে পাঠকরা পরিষ্কার বুঝতে পারেন, মোট কয়টি বংশস্তর অতিক্রম করার পর চেঙ্গিয খান এবং আমীর তাইমূর একত্রে গিয়ে মিলিত হয়েছেন।

জূজী খান ইবন চেঙ্গিয খান অর্থাৎ উযবেক জাতির বংশ লতিকা

চুঘতাই খান ইবন চেঙ্গিয খানের বংশ লতিকা
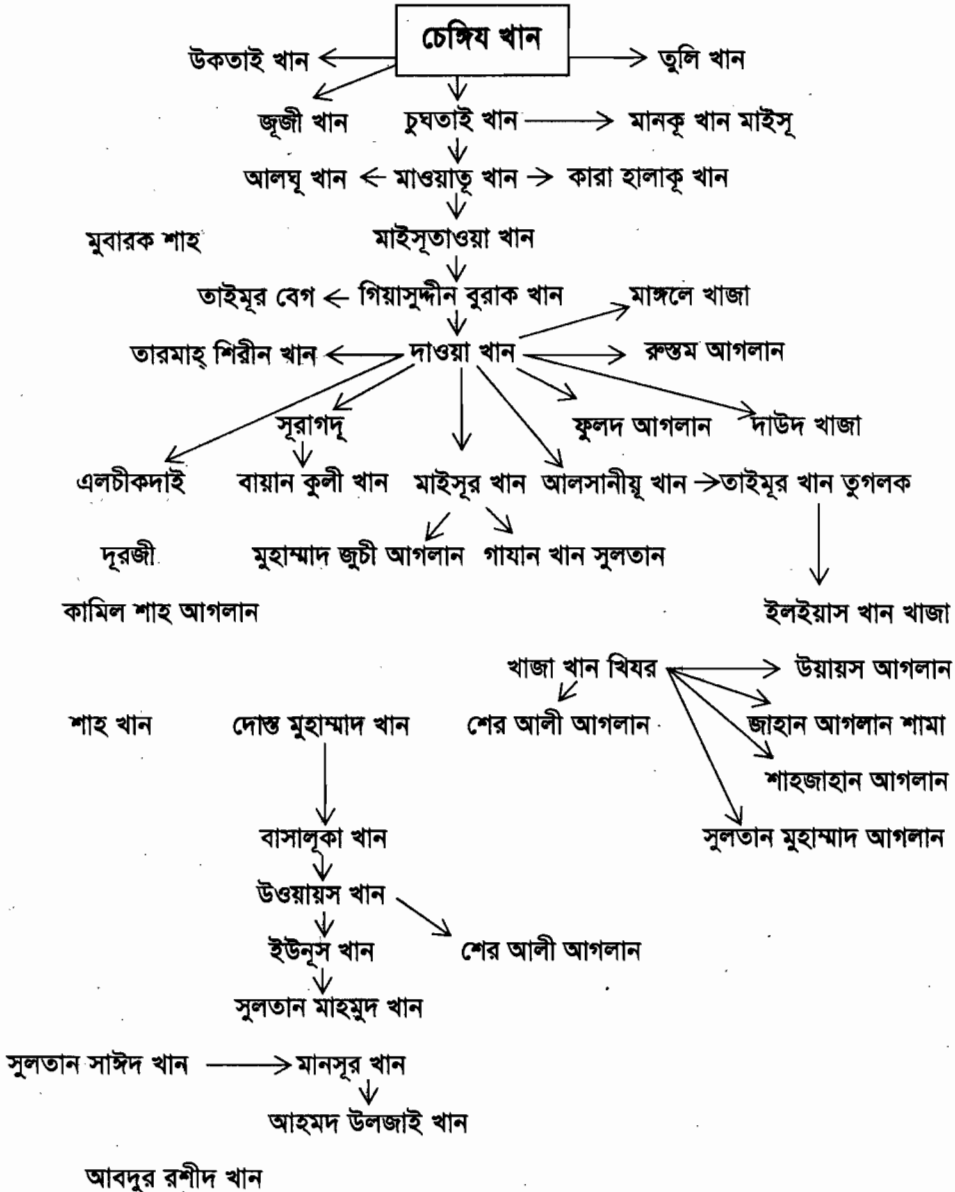
তুলি খান ইব্‌ন চেঙ্গিয খানের বংশ লতিকা
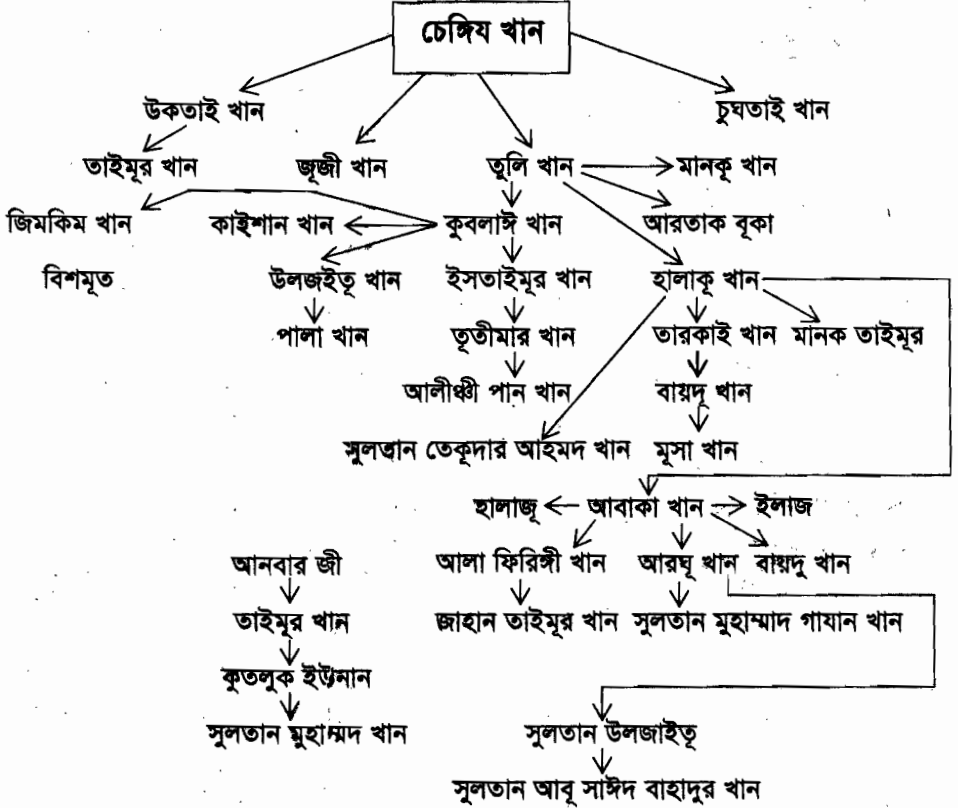
চেঙ্গিযী মোঙ্গলদের সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

বাগদাদের ধ্বংস ইসলামী বিশ্বের সবচাইতে ভয়ংকর ও মর্মান্তিক ঘটনা। আর এর নায়ক ছিলেন হালাকূ খান। ইতিপূর্বে হালাকূ খানের পিতামহ চেঙ্গিয খানও ইসলামী বিশ্বে বিশেষ করে ইরান ও খুরাসানে মুসলমানদের রক্ত বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। চেঙ্গিয খান ও হালাকূ খানের ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটপাট সাধারণভাবে চেঙ্গিযী মুঘলকে মুসলমানদের চোখে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত করে রেখেছে। তবে আমরা এ পর্যন্ত মুসলমানদের ইতিহাস যতটুকু অধ্যয়ন করেছি তাতে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ইসলামী হুকুমতের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারিত্ব ও বংশগত অধিকারের বিষয়টি যেদিন থেকে গুরুত্ব লাভ করেছে সেদিন থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যেও সিংহাসনে এমন সব অযোগ্য ও অশিষ্ট ব্যক্তিরা সমাসীন হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, যাদের মধ্যে ইসলামী হুকুমত পরিচালনার মত জ্ঞান, যোগ্যতা, দূরদৃষ্টি কিংবা মন-মানসিকতা কোনটিই ছিল না। এই অযোগ্য ব্যক্তিদের নেতৃত্বে ও নির্দেশে মুসলিম জাতির মধ্যে নানা ধরনের চারিত্রিক ব্যাধি ঢুকে পড়ে। তারপর তা এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, তখনকার বিরূপ পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে এর প্রতিকারার্থে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন, বলতে গেলে সম্ভবই ছিল না।

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলিম সাম্রাজ্য, বিশেষ করে খিলাফতে বাগদাদের অবস্থা নিশ্চিতভাবে সংশোধন-বহির্ভূত হয়ে গিয়েছিল। দায়লামী, সালজূকী প্রভৃতি সালতানাত প্রচুর ক্ষমতা ও শান-শওকতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আব্বাসী বংশের খিলাফত গ্রাস করার মত মনোবল বা দুঃসাহস তাদের ছিল না। তাছাড়া মুসলমানদের মধ্যে এই কুবিশ্বাস, বলতে গেলে ধর্মেরই একটি অঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছিল যে, আব্বাসী বংশ ছাড়া অন্য কোন বংশের লোক মুসলমানদের খলীফা বা শাহানশাহ হতে পারে না। এই কু-বিশ্বাস মুসলমানদেরকে যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। কেননা দীর্ঘদিন পর্যন্ত আব্বাসী বংশে এভাবে হুকুমত কায়েম থাকার ফলে তাদের মধ্য থেকে যোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে বীরত্ব, দৃঢ়তা, দুঃসাহসিকতা প্রভৃতি জাতিগত গুণাবলী থেকে মুসলমানরা একেবারে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। এমনি মুহূর্তে মুসলমানদের এই ভয়ংকর ও নাজুকতার অবস্থা সংশোধনের দায়িত্ব যেন আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেন। চেঙ্গিয খান ও চেঙ্গিযী মুঘলরা এমন একটি দেশ ও এমন একটি পরিবেশে বসবাস করত যে, তাদের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাবারও প্রয়োজন বোধ করত না। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বে তাদেরকে সভ্যভব্য মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না। এ ধরনের মূর্খ ও অসভ্য লোকদের সম্পর্কে কখনও কি এ ধারণা করা সম্ভব ছিল যে, এরাই তৎকালীন বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য ও উন্নত ইসলামী সাম্রাজ্যকে পর্যুদস্ত এবং তার অধিবাসীদেরকে একেবারে কচুকাটা করে ছাড়বে। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা আপন মর্জিমত এই বর্বর ও অসভ্য মুঘলদেরকে তাদের জন্মভূমি থেকে বের করে এনে তাদেরই মাধ্যমে পাপিষ্ঠ ও দুষ্কৃতিকারী মুসলমানদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন। চেঙ্গিয খান ও হালাকূ খানের রক্তক্ষয়ী আক্রমণ ঠিক যেন ঐ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের রক্ত মোক্ষনের মত, যিনি রোগীর দেহে অস্ত্র চালিয়ে ক্ষতিকারক উপাদান বের করে ফেলে রোগীকে সুস্থ-সবল করে তোলার প্রয়াস

পান। চেঙ্গিযী মুঘলরা খিলাফতে বাগদাদের ধ্বংস সাধন করে এবং সেখানে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিয়ে ঐ সমস্ত কুবিশ্বাস পোষণকারী মুসলমানদেরকে শাসন ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেয়, যারা কোনরূপ দলীল-প্রমাণ ছাড়াই ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনাকে নিছক বংশগত উত্তরাধিকার বলে মনে করত। ইসলাম হচ্ছে ঐ শক্তি এবং ঐ শাসন ব্যবস্থার নাম, যা আরবের নিঃস্ব ও অসভ্য বেদুঈনদেরকে কায়সার ও কিসরার সাম্রাজ্যের অধিকারী এবং সমগ্র বিশ্বের শিক্ষকে পরিণত করেছিল। মুসলমানরা ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ ছেড়ে দিয়েছিল। এমনকি তারা তখন নামেমাত্রও মুসলমান ছিল না। এর চাইতে মুসলমানদের বড় অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতা আর কি হতে পারে যে, তারা মুঘলদের হাতেই পর্যুদস্ত হলো। চেঙ্গিয খান এবং তার বাহিনী কোন অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিল না। এতদসত্ত্বেও তারা কি কারণে মুসলমানদের উপর জয়লাভ করতে পারল ? জয়লাভ করতে পারল শুধু এ কারণে যে, ঐ যুগের মুসলমানরা তাদের আসল শক্তি তথা ইসলামী চরিত্র হারিয়ে ফেলেছিল। মুঘলরা তাদের কোন অসাধারণ যোগ্যতা বলে জয়লাভ করেনি, বরং আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে জয়ী করে দিয়ে মুসলমানদেরকে তাদের অকর্মণ্যতার প্রতিফল দান করেছিলেন। মুঘলরা খিলাফতে বাগদাদকে ধ্বংস করে দেওদয়ায় মুসলমানরা বাধ্য হয়ে বুঝতে শিখেছিল যে, এ বিশ্বে মান-সম্মান নিয়ে টিকে থাকতে হলে ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মাযহাবে ইসলামের সাথে মুঘলদের যেমন কোন অন্তরঙ্গতা ছিল না তেমনি ছিল না কোন শত্রুতাও। মুঘল বাদশাহরা যখন তাদের অধীনস্থ মুসলমানদের ধর্ম সম্পর্কে অবহিত হতে চাইল তখন এর যে কথা বা যে বিষয়টি তাদের বোধগম্য হলো না সে সম্পর্কে তারা আপত্তি উত্থাপন করল, আর যেটি তাদের বোধগম্য হলো তারা তার প্রশংসা করল। মুঘলদের এই আপত্তি উত্থাপন বা অস্বীকার, তাদের জন্য তাদের প্রজাদের পক্ষ থেকে কোন বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে পারত না। অথচ মুসলমানদের কোন কোন কুবিশ্বাস ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে যদি কোন মুসলমান বাদশাহ এভাবে আপত্তি উত্তাপন করতেন তাহলে তাকে তার মুসলমান প্রজাদের দিক থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হতো। কিন্তু মুঘল বাদশাহদের এ ধরনের কোন আশঙ্কাই ছিল না। অপর দিকে এই পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হয়ে মুসলিম ধর্মীয় নেতা ও নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা নিজেদের হীন মানসিকতার অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা থেকে পবিত্র হয়ে ইসলামের সেই আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সবার সামনে পেশ করার সুযোগ পান, যে আদর্শ কুরআন মানবজাতির সামনে পেশ করেছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে যে আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন। এই বিশুদ্ধ ইসলামের উপর গ্রহণযোগ্য আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না। আর যখন এই বিশুদ্ধ ইসলাম কোন নিরপেক্ষ ও সরলপ্রাণ ব্যক্তি বা জাতির সামনে পেশ করা হবে তখন তাকে ইসলামের সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। যাহোক মুঘলদের বাড়াবাড়ির কারণে খোদ মুসলমানদের চোখের সামনে ইসলামের আসল রঙ ভেসে ওঠে।

অতএব অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই একথা বলা যেতে পারে যে, চেঙ্গিয খান ও হালাকূ খানের মাধ্যমে মুসলমানরা যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঠিক সে পরিমাণ উপকৃত হয়েছে ইসলাম ও মুসলমানরা। ক্ষতি যা হয়েছে তা দৈহিক ও বস্তুগত, আর উপকার যা হয়েছে তা আত্মিক ও

ধর্মীয়। যদি মুঘলদের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে ইসলামী হুকুমতের নাম-নিশানা মুছে যেত তাহলে নিঃসন্দেহে এর চাইতে বড় আত্মিক ও ধর্মীয় ক্ষতি আর কিছুই ছিল না। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে তা হলো, কিছুদিন পরই মুঘলরা মুসলমান হয়ে স্বয়ং ইসলামের সেবকে পরিণত হয় এবং বিশ্ববাসী দেখতে পায় যে, যে মুঘলরা খিলাফতে বাগদাদকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল সেই তারাই ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা তথা ইসলামের জন্য নির্দ্বিধায় নিজেদের গর্দান কেটে ফেলছে।

অনেক কম ঐতিহাসিক এ বিষয়টি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, মুঘলিস্তান, চীন ও তুর্কিস্তানে ইসলাম তার প্রচার ও প্রসারের সুযোগ পেয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশি। সিরিয়া, রোম, ত্রিপোলী, মরক্কো, চীন, ইরান, খুরাসান, বেলুচিস্তান প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা নিজেদের মূর্খতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে পদে পদে মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছে এবং তাদের মুকাবিলা করেছে। প্রথম প্রথম প্রায় প্রতিটি দেশেই রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। তারপর লোকেরা ইসলামকে বোঝার বা ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু চীন ও তুর্কিস্তানে যখনই ইসলাম পৌঁছেছে তখনই সেখানকার অধিবাসীরা ইসলামকে বোঝার ক্ষেত্রে নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেককে কাজে লাগিয়েছে অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের চাইতে অপেক্ষাকৃত বেশি। হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিলাফত আমলে মাওরাউন নাহর-এর অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব তুর্কিস্তান এবং তিব্বত পর্যন্ত ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল। এরই নিকটবর্তী যুগে আরবরা বণিক ও সৈনিক হিসাবে চীনের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছিল এবং তাদের মাধ্যমে চীনে ইসলাম প্রচারও শুরু হয়ে গিয়েছিল। চীন ও তুর্কিস্তানে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে প্রচারিত হয়ে ইসলাম হিজরী প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই সমস্ত দেশের সমগ্র অধিবাসীকে নিজের ছায়াতলে টেনে নিয়ে আসতে পারত। কিন্তু আলভীদের ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলন এবং বনূ উমাইয়াদেরকে ধ্বংস করার তাদের অবিরাম প্রচেষ্টা ইসলাম প্রচারের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তাছাড়া উলামা সমাজের স্বার্থপরতা, মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধ ও গৃহযুদ্ধ ইসলাম প্রচারকে বিঘ্নিত করে এবং অমুসলিমকে অমুসলিম থাকারই অনুপ্রেরণা যোগায়। অন্যথায় চীন ও তুর্কিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের সাধারণ যোগ্যতা অনেক বেশি ছিল। সালজূকীদের দুঃসাহসী গোত্রসমূহ কোনরূপ ভয়ভীতি বা লোভ-লালসার বশবর্তী না হয়েই সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তারা প্রত্যেকেই ইসলামের এক একজন বড় সেবকে পরিণত হয়। গযনীর তুর্কীরাও, যারা ডাকাত ও লুটেরা হিসাবে মুসলিম দেশসমূহে প্রবেশ করেছিল, সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করে এবং নিজেদেরকে ইসলামের সেবক হিসাবে প্রতিপন্ন করে। আজো চীনাদের একটি বিরাট অংশ মুসলমান। এই চীনারা কিন্তু কোন যুদ্ধাভিযানের ফলশ্রুতি নয়। তারা সকলেই চীনের প্রাচীন অধিবাসীদের বংশধর। চেঙ্গিয খান এবং তার সঙ্গীরা বিজয়ীবেশে মুসলিম দেশসমূহে প্রবেশ করে। এই মুঘলরা কিন্তু প্রথম থেকেই ইসলামকে বোঝা এবং তার সত্যতা স্বীকার করে নেওয়ার প্রতি নিজেদের আগ্রহ প্রদর্শন করে এবং কিছুদিন পরই চেঙ্গিয খানের বংশধররা ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামেরই খাদিমে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে একটি বিরাট

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, পশ্চিমের শেষ প্রান্তের দেশগুলোতে পর্যন্ত (অর্থাৎ মরক্কো ও স্পেনে) ইসলাম যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে পৌছেছে, অথচ প্রাচ্যের শেষ প্রান্তের দেশগুলোতে (অর্থাৎ চীনে) এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে তা পৌছেছে বণিক অথবা ওয়ারিয ও মুবাল্লিগদের মাধ্যমে। মুসলমানরা একদিকে যেমন বিজয়ী হয়ে আপন বিজিতদেরকে ইসলাম দ্বারা ধন্য করেছে, অন্যদিকে তেমনি বিজিত হয়ে আপন বিজয়ীদেরকে ইসলামের খাদেমে পরিণত করেছে। যদি চেঙ্গিয খান ও হালাকূ খানের দেশ-আক্রমণ ও পাইকারী হত্যাকাণ্ডের ঘটনা না ঘটত তাহলে ইসলাম যে শুধু তার সত্যতা ও মাহাত্ম্য দ্বারা আপন বিজয়ীকেও বিজিতে পরিণত করতে পারে এ সত্য ও তথ্য এত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ত না। অতএব মুঘলদের বাড়াবাড়িকে যেমন ইসলামী বিশ্বের একটি 'মহা-বিপদ' আখ্যা দেওয়া চলে তেমনি আখ্যা দেওয়া চলে এটা একটি 'মহা-রহমতও'।

এটি মানব জাতির স্বভাব যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে মূর্খতা ও অজ্ঞতার দিকটি প্রবল থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ব্যক্তি শাসনের মাধ্যমেই সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। তাই তো দেখা যায়, ব্যক্তি শাসনের ধারণা মানুষের আদি যুগ তথা জাহিলিয়া যুগের সাথে ওতপ্রোত। জাহিলিয়া যুগে গণতন্ত্রের অর্থ ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই হতে পারত না। মুঘলরাও চীন, তিব্বত ও তুর্কিস্তানের পাহাড়ে-পর্বতে জংলী ও অসভ্য জীবন যাপন করত। ওদের কাছে গোত্রের নেতা ও বাদশাহর ধারণা ছিল অত্যন্ত বিরাট ও জাঁকজমকপূর্ণ। গোত্রপতির অধিকার এবং তার প্রতিপত্তি ও পরাক্রম এত উপরে ছিল যে, গোত্রের লোকেরা তাকে রূপকখোদা মনে করত। হিন্দুস্থানের রাজা-মহারাজার মর্যাদা ছিল ঐ একই রূপ বরং একথাও বলা চলে যে, রাজন্যপূজা হচ্ছে প্রাচ্য দেশসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুঘলরা যেহেতু অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রাচ্য দেশসমূহের মুকুট-সিংহাসন দখল করে নিয়েছিল তাই তাদের শাসনামলের রাজন্য পূজার প্রাথমিক ধারণা যথারীতি বিদ্যমান ছিল। ইসলাম এবং মানুষের স্বভাবধর্ম রাজন্য পূজার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িকে মনুষত্বের জন্য ক্ষতিকারক বিবেচনা করে বটে, তবে মুঘলদের রাজন্যপূজা ইসলামের এই বিরাট উপকার সাধন করে যে, মুঘলদের শুধু কয়েকজন বাদশাহর ইসলাম গ্রহণ সমগ্র মুঘল জাতির ইসলাম গ্রহণের কারণে পরিণত হয়। এমনকি ঐতিহাসিকরা প্রথম প্রথম শুধু দু'তিন জন মুঘল সুলতানের ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর দেখা যায় প্রত্যেক মুঘল বাদশাহ এবং তার আমীর-উমারা মুসলমান। অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে কে কখন ইসলাম গ্রহণ করল, ঐতিহাসিকরা সে কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনই বোধ করেন নি। কেননা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সকলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। কেবল জূজী খানের বংশধররা কিছুটা বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করে। আর তা এ কারণে যে, তারা ইসলামী দেশসমূহ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমগ্র উযবেক জাতি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। কোন ঘটনা থেকেই এটা প্রমাণিত হয়নি যে, মুঘলরা ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং শুধু ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা যদি মুসলমান হওয়ার প্রেক্ষিতে বাদশাহর

বিরোধিতা করে কিংবা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তবে তা ছিল শুধু বৈষয়িক ও পার্থিব কারণে, ধর্ম পরিবর্তনের কারণে নয়। মুঘলরা যেহেতু শাসক ও বিজেতা হিসাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাই হুকুমত ও নেতৃত্ব তাদেরকে যথাযথভাবে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ দেয়নি। ফলে দেখা যায় কয়েক পুরুষ অতিবাহিত হওয়ার পরও তারা সেই অবস্থায়ই রয়েছে। মুঘলদের মধ্যে সেই যোগ্যতা সৃষ্টি হয়নি। যার মাধ্যমে তারা অন্যান্য জাতিকে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারে। এ বিষয়টিও অনস্বীকার্য যে, মুঘলদের বেশির ভাগ গোষ্ঠী ও সর্দার দীর্ঘদিন পর্যন্ত কুফরীর অবস্থায় ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা কখনো ঐ সমস্ত গোত্র বা সর্দারের সাথে অবস্থান করতে বা তাদের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে অস্বীকার করেনি, যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু মুঘলদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়নি, তাই তাদের শাসনামলে অমুসলিম গোত্রগুলো নয় বরং প্রাচীন মুসলমান এবং তাদের মুসলিম প্রজারাই ইসলামের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়েছে।

উপরিউক্ত বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে হিন্দুস্থানের বাদশাহ আকবরের কিছু কিছু ধর্মীয় দুষ্কৃতিতে বিস্মিত হবার কিছু থাকে না। মুঘলদের অনুপাতে তাতারীরা ইসলামকে খুব ভালভাবে বুঝত। তাদের ধর্মীয় জ্ঞান ও অনুভূতি কোন সময়েই এত নিম্নমানের ছিল না যেমন ছিল মুঘলদের ইসলামের ছায়াতলে তাদের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও। এ কারণেই তাতারী ও সালজুকীরা ইসলাম প্রচারে এমনি চেষ্টা করেছে এবং ইসলামের জন্য এমনি আত্মদান করেছে যার সামান্য দৃষ্টান্তই মুঘলদের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। তুর্কী তাতারী ও মুঘলদের মধ্যে কি মিল ও কি অমিল রয়েছে সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর মুঘলদের মধ্যে মুসাম্মৎ আল আলকাওয়া পুত্রদের বংশধর থেকে পৃথক পৃথক জাতি সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে বুয়ানজার ইব্ন আল-আনকাওয়া-এর বংশধররা বুযানজারী নামে পরিচিত। এরা অন্যান্য জাতির চাইতে বিখ্যাত এবং সর্বক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিল। এই বুযানজারী গোত্রের জনৈক ব্যক্তির নাম ছিল তুমনাহ খান। তুমনাহ খানের ছিল দুই পুত্র। একজন কুবলাঈ খান এবং অন্যজন কাচুলী বাহাদুর। চেঙ্গিয খান ছিলেন কুবলাঈ খানের বংশধর। চেঙ্গিয খানের বংশধরকে চেঙ্গিযী মুঘল বলা হয়। এদের সম্পর্কেও আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। অপর পুত্র কাচূলী বাহাদুরের পুত্রের নাম ছিল ঈরুমজী বারলাস। এই ঈরুমজী বারলাসের বংশধরদের বারশাম জাতি বলা হয়। ঈরুমজী বারলাসের পৌত্র হচ্ছেন আমীর কারাচার। এর সম্পর্কেও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই কারাচার ছিলেন চেঙ্গিয খানের পুত্র চুঘতাই খানের প্রধান সভাসদ ও সেনাপতি। কারামের শাসনকর্তা আমীর তাইমূর গুরকান এই আমীর কারাচারের বংশধর। অতএব আমীর তাইমূর ছিলেন বারলাস জাতির অন্তর্ভুক্ত। আমীর তাইমূরের উপাধি যেহেতু গুরকান ছিল, তাই তাঁর বংশধরকে গুরকানিয়া বলা হয় এবং তাদেরকে একটি পৃথক জাতি গণ্য করা হয়। বুখানজারী মুঘলদের মধ্যে প্রথমত কুবলাঈ খানের বংশধর জ্ঞানবুদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সিংহাসনের অধিকারী ছিল। যখন তাদের ভাগ্যসূর্য অস্তমিত হলো তখন কাবলী বাহাদুরের বংশধর অর্থাৎ বারলাস মুঘলদের উন্নতির যুগ এল। এই বংশেরই আমীর তাইমূর গুরকান

চেঙ্গিয খানের বিজয়কে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তোলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, চেঙ্গিয খান ছিলেন একজন অমুসলিম পিতার অমুসলিম্ সন্তান। আর আমীর তাইমূর ছিলেন এক মুসলমান আল্লাহ-ওয়ালা পিতার মুসলমান সন্তান। চেঙ্গিয খান যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং যাদের হত্যা করেছেন তারা ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চেঙ্গিয খানের অনুরূপ ছিলেন না। কিন্তু আমীর তাইমূরকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারই মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। চেঙ্গিয খানের মৃত্যুর পর এশিয়ার একটি বিরাট অংশ যেমন তাঁর বংশধরদের শাসনাধীন ছিল তেমনি এশিয়ার বেশির ভাগ দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিল আমীর তাইমূরের বংশধর। অতএব অত্যন্ত সঙ্গতভাবে বলা চলে যে, তুমনাহ খানের সন্তানরা একাধারে প্রায় ছয়শ বছর এশিয়া মহাদেশের একটি বিরাট অঞ্চল শাসন করেছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

ইরানের ইসলামী ইতিহাসের পরিশিষ্ট

ইসলামী ইতিহাসের ঘটনাবলী এ যাবত যে পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে ইরানের ইতিহাসের একটি বিরাট ও অপরিহার্য অংশ আমাদের আলোচনায় এসে গেছে। কিন্তু যে সব ঐতিহাসিক শুধু ইরানের ইসলামী ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন তারা অন্য ধারা অবলম্বন করেছেন। আর এটা তাদের জন্য সঙ্গতও ছিল। অন্যান্য ইসলামী দেশের তুলনায় ইরানের ইতিহাসের সাথে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তাই এ যাবত বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে বিন্যাসগত বিভিন্নতার কারণে যে ঘাটতি রয়ে গেছে নিম্নে অতি সংক্ষেপে হলেও আমরা তা পূরণের প্রয়াস পাব।

সাফ্ফারিয়া সাম্রাজ্য

ইরানের ইতিহাসসমূহে খলীফাদের সরাসরি হুকুমতের পর সর্বপ্রথম সাফ্ফারিয়া বংশের স্বাধীন সাম্রাজ্য পরিচালনার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এই বংশের শাসকদের অবস্থা ইতিপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে এখানে আর অধিক বর্ণনার প্রয়োজন নেই। তবে একটি কথা এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আব্বাসীয় বংশ তাদের খিলাফত লাভের ক্ষেত্রে যেহেতু ইরানীদের কাছ থেকে সর্বাধিক সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছিল তাই ইরানীদের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি এবং আরবদের উপর তাদেরকে দুঃসাহসী করে তোলার ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেদিকে আব্বাসীয়দের কোন দৃষ্টি ছিল না। এর ফলে বিজিত ইরানীদের মনে পুনরায় বিজয়ী হওয়ার এবং নিজেদের স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আব্বাসীয় বংশের মধ্যে বিজয়ী ও বীরসুলভ মনোবৃত্তি অবশিষ্ট ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত ইরানীরা পুরোপুরিভাবে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হতে পারেনি। তারপর আব্বাসীয় খলীফাদের ভোগবিলাস দুর্বলতা ইরানীদের জন্য তাদের দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করে দিলে সর্বপ্রথম ইয়াকুব ইব্ন লায়ছ আপন স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হন। তাঁর বংশগত পেশা ছিল লোহার পাত্র তৈরি করা। তাই তাকে সাফ্ফার (লোহার পাত্র প্রস্তুতকারী) নামে সম্বোধন করা হতো। ইয়াকুব শুধু নিজের বীরোচিত স্বভাব-প্রকৃতি ও উদ্যম-উৎসাহের কারণে নিজের একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, বদান্য ও সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত। আর এই সমস্ত গুণ ও আচরণ ছিল তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি। তাঁর কাছে যাই থাকত তিনি আপন বন্ধুদের মধ্যে তা অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। তিনি নিজে কষ্টের মধ্যে থেকেও বন্ধুদের আরাম-আয়েশের প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। এ

কারণেই নিজের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ একদল সাথী সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁকে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। তিনি বাদশাহ হওয়ার পরও ছোট কালের বন্ধুদের কথা ভুলে যাননি বরং সকলকেই উচ্চ মর্যাদাদান করেছেন। বাদশাহ হওয়ার পরও তাঁকে একজন সাধারণ সিপাহীর পোশাকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত। মাটিতে শয়ন করতেও তিনি লজ্জাবোধ করতেন না। তাঁর এবং একজন সাধারণ সিপাহীর তাঁবুর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। আরামপ্রিয়তা ও অসদাচরণকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। তাঁর প্রত্যেকটি তৎপরতা ও প্রত্যেকটি উদ্যোগে দৃঢ়তা ও বিদ্যোৎসাহিতা পরিদৃষ্ট হতো। আর এসব কারণেই তিনি অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে উন্নতি করে ইরানের একটি বিরাট ভূখণ্ডের স্বাধীন নরপতি হতে পেরেছিলেন এবং তাঁকে প্রতিরোধ বা তাঁর মূলোৎপাটন করা বাগদাদের খলীফাদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি।

ইয়াকুব ইব্‌ন লায়ছের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁরই আপন ভাই আমর ইবন লায়ছ। আমর সাফ্‌ফারিয়া সাম্রাজ্যের আয়তন আরো বৃদ্ধি করেন। বিবেক-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে আমর তাঁর ভাইয়ের চাইতে কিঞ্চিৎ অগ্রণী হলেও সাদাসিধা জীবন যাপনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তাঁর ভাইয়ের ঢের পিছনে। খলীফা মুতামিদের ভাই মুওয়াফ্‌ফাক তো তাঁকে একবার পরাজিতই করেছিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই আপন অবস্থা শুধরে নেন এবং বাগদাদের দরবারে খিলাফতের জন্য আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়ান। শেষ পর্যন্ত বাগদাদের খলীফা মাওরাউন নাহরের শাসনকর্তা ইসমাঈল সামানীকে আমর ইবন লায়ছের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। আমর ইব্‌ন লায়ছ সত্তর হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ইসমাঈল সামানীর মূলোৎপাটনে অগ্রসর হন এবং জায়হূন নদী অতিক্রম করে শত্রুর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ান। ইসমাঈল সামানী শুধু বিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে আমরের মুকাবিলায় এসেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে দুর্ভাগ্যবশত আমরের বাধাদান সত্ত্বেও তাঁর ঘোড়াটি তাকে নিয়ে ঈসমাঈল সামানীর সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। ফলে অতি সহজেই তিনি বন্দী হন।

ইসমাঈল সামানী আমরকে বন্দী করে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। বলতে গেলে দৈব-দুর্বিপাকে সাফ্‌ফারিয়া সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি এভাবে প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে পৌঁছে। ইয়াকুব এবং আমরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য ছিল এই যে, ইয়াকুব ছিলেন একজন অতি পরিশ্রমী, শুকনো রুটি খেতে অভ্যস্ত, সহজ-সরল জীবনের অধিকারী একজন সৈনিক। আর আমর ছিলেন আরামপ্রিয় ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত একজন শাহানশাহ। এ প্রসংগে একটি রসালো কাহিনীর উদ্ধৃতি পেশ করা যেতে পারে।

যেদিন আমর ইব্‌ন লায়ছ বন্দী হন সেদিন সকালবেলা তাঁর বাবুর্চি তাঁর কাছে নিবেদন করেছিল ঃ হুযূর, বাবুর্চি খানায় যাবতীয় আসবাবপত্র বহন করার জন্য তিনশ' উট যথেষ্ট নয়। অতএব এ কাজের জন্য আমাকে আরো কিছু উট দেওয়া হোক। কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যায়ই যখন আমর বন্দী অবস্থায় অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন তখন তাঁর বাবুর্চি সৌভাগ্যক্রমে সেখানে ঘোড়ার খাবার সিদ্ধ করার একটি পাত্র পেয়ে তাতে সামান্য পানির সাথে কিছু নিকৃষ্টমানের

মটরদানা ঢেলে দিয়ে সেটাই সিদ্ধ করার প্রয়াস চালায়। এ ছাড়া কোন জিনিসই তো তার নাগালের মধ্যে ছিল না। আমর অত্যন্ত অধৈর্যের সাথে মটরদানা সিদ্ধ হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। বাবুর্চি এক সময় হাঁড়িটি চুলা থেকে নামিয়ে রাখে এবং কোন প্রয়োজনে অন্যদিকে মনোনিবেশ করতেই একটি কুকুর এসে হাঁড়ির পার্শ্ব কামড়ে ধরে তা নিয়ে উধাও হয়ে যায়। আমর কুকুরকে হাঁড়ি নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখে বাবুর্চিকে চিৎকার দিয়ে বলেন, সকালবেলা তো অভিযোগ করছিলে যে, বাবুর্চিখানার আসবাবপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনশ' উট যথেষ্ট নয়, এখন দেখ শুধু একটি কুকুরই আমার সমগ্র বাবুর্চিখানা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমর ইব্‌ন লায়ছের পর তার বংশধররা কয়েক বছর পর্যন্ত সীস্তান এলাকার কয়েকটি সীমিত ভূখণ্ডে নামমাত্র নিজ নিজ শাসন কায়েম রাখেন। ইয়াকুব ইব্‌ন লায়ছের প্রপৌত্র খালাফ মাহমূদ গাযনাবীর যুগ পর্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। খালাফের পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পিতা পুত্রের মুকাবিলায় নিজেকে দুর্বল দেখতে পেয়ে প্রতারণার মাধ্যমে তাকে হত্যা করেন। সীস্তানের অধিবাসীরা সুলতান মাহমূদ গাযনাবীর খিদমতে হাযির হয়ে তার কাছে খালাফের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে এবং তার জুলুম-অত্যাচার বন্ধের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তাঁর কাছে বিনীত আবেদন জানায়। সুলতান মাহমূদ গাযনাবী খালাফের উপর আক্রমণ চালান। খালাফ যখন দেখতে পেলেন যে, তিনি নির্ঘাত পরাজিত হয়ে গেছেন এবং তার দুর্গও সৈন্যরা দখল করে নিয়েছে তখন তিনি সোজা সুলতান মাহমূদের খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর ঘোড়ার জিনের পাদানীতে চুমু খান এবং তাঁর পায়ে আপন দাড়ি ঘষতে ঘষতে নিবেদন করেন : হে সুলতান, আপনি আমাকে মাফ করে দিন। মাহমূদ গাযনাবী নিজের সম্পর্কে খালাফের মুখ দিয়ে 'সুলতান' উপাধি উচ্চারিত হতে শুনে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং সেদিন থেকে এটাকেই নিজের উপাধি হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি খালাফকেও কোন শাস্তি দেননি। তবে তাকে সঙ্গে করে গযনীতে নিয়ে যান। চার বছর পর খালাফ গযনীতেই মৃত্যুবরণ করেন এবং তার মৃত্যুর সাথে সাথে সাফ্‌ফারী সাম্রাজ্যেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

সামানী সাম্রাজ্য

আসাদ ইব্‌ন সামান নিজেকে বাহরাম চূবীনের বংশধর দাবি করতেন। একদা তিনি আপন চার পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মার্ভে মামূনুর রশীদ আব্বাসীর খিদমতে হাযির হন। মামূন তখন মার্ভে অবস্থান করছিলেন। মামূন আপন ভাই আমীনের কাছ থেকে সিংহাসন লাভের ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তাতে ইরানীদের সাহায্য-সহযোগিতা সব চাইতে বেশি। অতএব আসাদ ইব্‌ন সামান এবং তার বংশধরদের প্রতি মামূনুর রশীদের সদয় থাকাটা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। ফলে ঐ সময়ে সামানীদের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। যেহেতু এই পরিবারটি ছিল ইরানের একটি বিখ্যাত সর্দারের বংশধর, তাই মাওরাউন নাহর ও খুরাসানে এদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের সম্ভাবনা দিন দিন

একেবারে ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। আসাদ ইব্‌ন সামানের পৌত্র ইসমাঈল সামানী আমর ইব্‌ন লায়ছের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার পর খুব শীঘ্রই বাদশাহর মর্যাদায় উপনীত হন। পার্থক্য শুধু এই ছিল যে, সাফ্‌ফারী বংশ খিলাফতে বাগদাদের প্রতিপক্ষ থেকে যায় আর ইসমাঈল এবং তাঁর স্থলাভিষিক্তরা শুধু নামমাত্র খিলাফতে বাগদাদের নেতৃত্ব স্বীকার করতে থাকে।

ইসমাঈল সামানী সাত-আট বছর মাওরাউন নাহ্‌র ও খুরাসানে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। খলীফা মুতাদিদ বিল্লাহ আব্বাসী তাঁকে খুরাসান রাজ্যের শাসন ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। ইসমাঈলের মৃত্যুর পর আবূ নাযীর আহমদ ইব্‌ন ইসমাঈল সামানী আপন পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ইসমাঈল সামানী অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং আল্লাহর উপর সদা নির্ভরশীল ছিলেন। সমর কৌশল ও শাসন পরিচালনা সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। প্রজারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। তিনি তাঁর আচার-আচরণ দ্বারা সকলকে এ কথা বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ইরানের একটি অত্যন্ত অভিজাত নেতৃস্থানীয় বংশের সাথে তাঁর রক্ত সম্পর্ক রয়েছে।

আহমাদ ইব্‌ন ইসমাঈল সিংহাসনে আরোহণ করার পর তার অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহারের কারণে তার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন তার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট ছিল। ছয়-সাত বছর পর্যন্ত তিনি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বলতে গেলে এই সমগ্র সময়টুকু তিনি দরবারে খিলাফতের বিরুদ্ধাচরণ এবং আপন আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষেপিয়ে তোলার কাজে ব্যয় করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের মামার হাতেই নিহত হন।

তারপর তার পুত্র নাস্‌র ইব্‌ন আহমাদ সামানী মাত্র আট বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন অবিকল আপন দাদা ইসমাঈলের মত। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই আপন সালতানাতের আয়তন বৃদ্ধি করেন এবং ত্রিশ বছর পর্যন্ত অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁর দরবারে রূদ-এর কবি, যিনি অন্ধ ছিলেন, অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে অবস্থান করছিলেন। নাস্‌র ইব্‌ন আহমাদ আপন রাজধানী বুখারায় মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন।

তারপর তাঁর পুত্র নূহ ইব্‌ন নাস্‌র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তের বছর সাম্রাজ্য পরিচালনা করে ৩৪৩ হিজরীতে (৯৫৪ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নূহের পর তাঁর পুত্র আবদুল মালিক ইব্‌ন নূহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর অধিকৃত সাম্রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চল অর্থাৎ খুরাসান প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব আপন এক অধিনায়ক আলপ্তগীনের হাতে অর্পণ করেছিলেন। তিনি সাত বছর সাম্রাজ্য পরিচালনার পর পোলো খেলার সময় ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে মারা যান।

আবদুল মালিকের পর তাঁর ভাই মানসূর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রুকনুদ দাওলা দায়লামীর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাই ইরাক এবং পারস্যেও তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। মানসূরের মন্ত্রী আবূ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ফারসী ভাষায় তারীখে তাবারীর অনুবাদ করেছিলেন। মানসূর ইব্‌ন নূহ পনের বছর সাম্রাজ্য শাসন করেন।

মানসূরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবুল কাসিম নূহ (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে সালতানাতে বুখারা তথা সামানী সাম্রাজ্যের পতন

শুরু হয়। তাঁর সভাসদরা তাঁর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেয়। তাঁরাই মুঘলিস্তানের বাদশাহ বুগরা খানকে আবুল কাসিমের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে অনুপ্রাণিত করে। বুখারার সন্নিকটে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বুগরা খান দ্বিতীয় নূহকে পরাজিত করে বুখারা দখল করেন। কিন্তু এই বিজয় লাভের পর পরই বুগরা আকস্মিকভাবে বুখারায় মৃত্যুবরণ করেন। তারপর তাঁর সৈন্যরা নিজেদের দেশে ফিরে যায়। দ্বিতীয় নূহ পুনরায় বুখারায় নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে আপন সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করে গড়ে তোলেন। এটা হচ্ছে সেই যুগ যখন সবুক্তগীন গযনীতে নিজের একটি পৃথক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় নূহের সিংহাসনে আরোহণের কিছুদিন পরই আলপ্তগীনের মৃত্যু হয়েছিল। সবুক্তগীন বুগরা খানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় নূহকে যে সাহায্য করেছিলেন তার বিনিময়ে দ্বিতীয় নূহ তাকে নাসিরুদ্দীন উপাধি প্রদান করেছিলেন। কবি ওয়াফিকী, যিনি গুশতাসপ উপাখ্যানের একশটি কবিতা লিখেছিলেন, নাসিরুদ্দীনের সমসাময়িক ছিলেন। বুগরা খানের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি লাভের পর দ্বিতীয় নূহ তাঁর বিদ্রোহী ও অবিশ্বস্ত আমীর ও সভাসদকে শাস্তি প্রদানের সংকল্প নেন যারা সমগ্র দেশে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে রেখেছিল। ঐ সব বিদ্রোহী আমীর তার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে ফখরুদ্দৌলা দায়লামীর শরণাপন্ন হন এবং তাঁর সাহায্য নিয়ে বুখারা সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় নূহ পুনরায় সবুক্তগীনের সাহায্য তলব করেন। সবুক্তগীন হিরাতের সন্নিকটে বিদ্রোহীদের মুকাবিলা করেন এবং একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে সবুক্তগীনের পুত্র মাহমূদ গাযনাবী অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দেন। ফলে দ্বিতীয় নূহ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সাইফুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেন। কোন কোন ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে যে, এই যুদ্ধে সবুক্তগীন 'নাসিরুদ্দৌলা' উপাধি পেয়েছিলেন এবং যুদ্ধের পরই দ্বিতীয় নূহের দরবার থেকে তাঁকে খুরাসান রাজ্যের শাসনক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। দ্বিতীয় নূহ বাইশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর শাসনামলের বেশির ভাগ সময় যুদ্ধে ও বিদ্রোহ দমনে অতিবাহিত হয় এবং একের পর এক প্রদেশ তাঁর দখলচ্যুত হতে থাকে।

দ্বিতীয় নূহের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মানসূর সিংহাসনে আরোহণ করেন। যে সমস্ত আমীর ও সভাসদ তাঁর পিতাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল, তারা তাঁকেও ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, এমন কি তাঁকে বুখারা থেকে বেদখল করে দেয়। তারপর তারাই আবার তাঁকে বাদশাহ বলে স্বীকার করে। তবে শাসনকার্য নিজেদের হাতে নিয়ে তারা খুরাসানে একজন নতুন শাসনকর্তা নিয়োগ করে। কিন্তু মাহমুদ গাযনাবী শীঘ্রই ঐ নতুন শাসনকর্তাকে খুরাসান থেকে বহিষ্কার করে সেখানে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

ঐ সময়ে আমীর ও সভাসদরা মানসূরকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর চোখ উপড়ে ফেলে এবং তাঁর স্থলে তাঁর ভাই দ্বিতীয় আবদুল মালিক ইব্ন দ্বিতীয় নূহকে সিংহাসনে বসায়। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে তারা মাহমূদ গাযনাবীর উপর হামলা চালায়। মাহমূদ গাযনাবী দ্বিতীয় আবদুল মালিক ও তাঁর বাহিনীকে পরাজিত করে বুখারার দিকে তাড়িয়ে দেন। এদিকে কাশগড়ের শাসনকর্তা এলজ খান খাওয়ারিযম দখল করে বুখারার উপর হামলা করেন এবং দ্বিতীয় আবদুল মালিকের তৃতীয় ভাই মুনতাসির ছদ্মবেশ ধারণ করে বুখারা

থেকে পালিয়ে যায় এবং কিছুদিন পর্যন্ত লক্ষ্যহীনভাবে একদল ডাকাতের সাথে ঘুরাফেরা করে তাদেরই কারো হাতে নিহত হয়। আর এখানেই সমাপ্তি ঘটে সামানী শাসনামলের।

দায়লামী শাসনামল

আব্বাসীয় খলীফাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে নবম অধ্যায়ে দায়লামী রাজত্ব সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, দায়লামীদের সম্পর্কে অবগতির জন্য তাই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, দায়লামী ও সামানীয় রাজত্ব ছিল সমসাময়িক এবং পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সামানীয়রা ছিল মাওরাউন নাহ্‌র, খুরাসান প্রভৃতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দেশসমূহের অধিকারী। অপর দিকে দায়লামীদের দখলে ছিল পারস্য, ইরাক, আযারবায়জান প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের দেশসমূহ। এভাবে সমগ্র ইরান কিছুদিন পর্যন্ত এই দুই বংশের মধ্যে বণ্টিত ছিল। সামানীয়দের পতনের পরও দায়লামী রাজত্ব দুর্বল অবস্থায় হলেও বেশ কিছুদিন টিকেছিল। তখন সামানীয় সাম্রাজ্যের স্থলে পূর্বে ইরানে গাযনাবীদের মহাশক্তিশালী এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গাযনাবী সাম্রাজ্য

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, আবদুল মালিক ইব্‌ন নূহ আলপ্তগীনকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। আবদুল মালিকের পর যখন তাঁর ভাই মানসূর ৩৫০ হিজরীতে (৯৬১ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন আলপ্তগীন, যিনি মানসূরের সিংহাসন আরোহণের বিরোধিতা করেছিলেন, রাজধানী খুরাসান থেকে গযনীতে চলে আসেন, যা ঐ যুগে একটি নগণ্য লোকবসতি ছাড়া কিছু ছিল না। আলপ্তগীন এখানে এসে সুদৃঢ় হয়ে বসেন এবং নিজের একটি পৃথক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

৩৬৭ হিজরীতে (৯৭৭-৭৮ খ্রি) আলপ্তগীনের মৃত্যু হয়। তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র ইসহাক গযনীর শাসনকর্তা হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর অযোগ্যতা সকলের চোখে ধরা পড়ে। ফলে সামরিক অধিনায়করা তাঁকে পদচ্যুত করে আলপ্তগীনের সেনাপতি ও জামাতা সবুক্তগীনকে গযনীর সম্রাট ঘোষণা করে।

সবুক্তগীন সম্পর্কে একটি কথা বহুলভাবে প্রচারিত যে, তিনি আলপ্তগীনের ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই দাসত্ব একটা দুর্ঘটনা মাত্র। কিছুসংখ্যক ডাকাত তাঁকে রাস্তায় একাকী পেয়ে বন্দী করে এবং বুখারায় নিয়ে গিয়ে দাস হিসাবে বিক্রি করে। সবুক্তগীনের বংশতালিকা ইরানের বাদশাহ ইয়ায্‌দর্গিদ পর্যন্ত পৌঁছে। যেমন সবুক্তগীন ইবন জাওক কারাইয়াহকাম ইব্‌ন কারা আরসালান ইব্‌ন কারা মিল্লাত ইব্‌ন কারা মূমান ইব্‌ন ফীরুয ইব্‌ন ইয়ায্‌দর্গিদ। কিন্তু এই বংশ-লতিকার বিশুদ্ধতার প্রমাণ পেশ করা কঠিন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সবুক্তগীন ছিলেন তুর্কী। আবার কারো কারো মতে তিনি পিতার দিক থেকে ছিলেন তুর্কী এবং মাতার দিক থেকে ইরানী। যাহোক, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বংশগত দিক দিয়ে তিনি একজন অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন। এশীয় দেশসমূহের প্রথানুযায়ী কোন বাদশাহর আমীর, সর্দার এবং শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের পক্ষে নিজেদেরকে বাদশাহর

গোলাম আখ্যা দেওয়ার মধ্যে অসম্মানের কিছু ছিল না। অতএব এটাও সম্ভব যে, আলপ্তগীনের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হওয়ার কারণে সবুক্তগীন নিজেকে আলপ্তগীনের গোলাম আখ্যায়িত করে থাকবেন (ম্যালকম এই অভিমতই ব্যক্তি করেছেন)। সবুক্তগীন আনুমানিক বিশ বছর গযনী শাসন করেন। তিনিই সেই বাস্‌ত নগরী জয় করেন, যা গযনী থেকে কয়েকশ' মাইল দূরে হেলেমন্দ নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। সবুক্তগীন হিরাত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পাঞ্জাব ও সিন্ধুর রাজা জয়পাল তার রাজ্য আক্রমণ করলে তিনি তাকে পরাজিত ও বন্দী করেন এবং কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে মুক্তি দেন। জয়পাল তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং পুনরায় তিন লক্ষ সৈন্যের একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে সবুক্তগীনের রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু সবুক্তগীন মাত্র কয়েক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে জয়পালের মুকাবিলা করেন এবং এবারও তাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বন্দী করেন। তারপর জয়পাল আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়ে এ যাত্রাও নিজেকে মুক্ত করে নেয়। (জয়পালের বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে হিন্দুস্থানের ইতিহাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)। নূহ ইব্‌ন মানসূর সবুক্তগীনকে নাসিরুদ্দীন এবং তাঁর পুত্র মাহমূদকে সাইফুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেন। সবুক্তগীন গযনী সাম্রাজ্যের আয়তন বহুলভাবে বৃদ্ধি করেন এবং ৩৮৭ হিজরীতে (৯৯৭ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। সবুক্তগীনের পর তাঁর পুত্র আমীর ইসমাঈল বল্‌খের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মাত্র ছয়মাস পর আপন ভাই মাহমূদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হন।

৩৮৭ হিজরীতে (৯৯৭ খ্রি) মাহমূদ ইব্‌ন সবুক্তগীন গযনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। আব্বাসীয় খলীফা কাদির বিল্লাহ তাঁকে ইয়ামীনুদ্দৌলা এবং আমীনুল মিল্লাত উপাধি প্রদান করেছিলেন। মাহমূদ গাযনাবী সিংহাসনে আরোহণ করে অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। জনসাধারণ বুখারার বাদশাহ আবদুল মালিক সামানীকে মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত করে। মাহমূদ বাধ্য হয়ে আবদুল মালিকের মুকাবিলা করেন এবং তাকে পরাজিত করে বুখারার দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। কাশগড়ের বাদশাহ ইলিজ খান অথবা ইলেক খান বুখারা আক্রমণ করে তা দখল করে নেন এবং আবদুল মালিক সামানী তার হাতে বন্দী হন। অবশ্য মাহমূদ গাযনাবী ইলিজ খান ইব্‌ন বুগরা খানের উপর হামলা চালিয়ে তাকে বুখারা থেকে তাড়িয়ে দেন এবং তা নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তারপর সুলতান মাহমূদ মোঙ্গল সর্দার তাঘা খান ইবন আলতু খানকে পরাজিত করে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত আপন সাম্রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করেন। তিনি খারিযম সাম্রাজ্যও দখল করেন। সীস্তান ও খুরাসান অঞ্চল সবুক্তগীনের যুগ থেকে গযনী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবার সুলতান মাহমূদ মাজদুদ্দৌলা দায়লামীকে পরাজিত ও বন্দী করে রায় ও ইসপাহানের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এদিকে সুলতান মাহমূদকে বাধ্য হয়ে বার বার হিন্দুস্থান আক্রমণ করতে হয়। এ সম্পর্কে হিন্দুস্থানের ইতিহাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। মোটকথা মাহমূদ গাযনাবী শতদ্রু নদী থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত এবং মাওরাউন নাহর থেকে বেলুচিস্তান ও ইরাক পর্যন্ত একটি বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মাহমূদ গাযনাবী ছিলেন এশিয়া মহাদেশের একজন পরাক্রমশালী ও বিখ্যাত শাহানশাহ। তাঁর যুগে ফারসী ভাষার প্রচলন ও প্রচারে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ যে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন সুলতান মাহমূদ সেই ভূমিকা পালন করেছিলেন ফারসী ভাষার প্রচলন, প্রচার ও উন্নয়নে। মাহমূদ গাযনাবী ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও বিদগ্ধজনের পৃষ্ঠপোষক এবং অত্যন্ত উদার প্রকৃতির। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপারে যে, ঈর্ষা, পক্ষপাতিত্ব ও স্বার্থান্ধতার বশবর্তী হয়ে একটি বিশেষ মহল আজ তাঁকে পক্ষপাতদুষ্ট, জালিম, রক্তপিপাসু এবং হিন্দুদের প্রাণঘাতী শত্রু প্রমাণিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এই সমস্ত অমূলক কথাবার্তার আসল রহস্য হিন্দুস্থানের ইতিহাসে উদঘাটন করা হবে ইনশাআল্লাহ। সুলতান মাহমূদের যুগেই কবি ফিরদাউসী বিশ্বসাহিত্যের অমর কাব্য 'শাহনামা' রচনা করেন। মাহমূদ গাযনাবী ৪২১ হিজরীতে (১০৩০ খ্রি) ইনতিকাল করেন। সামানী রাজদরবারের পক্ষ থেকে সবুক্তগীন ও মাহমূদ গাযনাবী আমীরুল উমারা উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু ৩৮৯ হিজরীতে (৯৯৯ খ্রি) সুলতান মাহমূদ নিজেকে স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করেন এবং আবদুল মালিক সামানীর নাম খুতবা থেকে বাদ দেন। ঐ বছরই আব্বাসীয় খলীফা কাদির বিল্লাহ সুলতান মাহমূদকে ইয়ামীনুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেছিলেন। মাহমূদ গাযনাবী ছিলেন স্বীয় যুগের সর্বাধিক ক্ষমতাশালী মুসলিম বাদশাহ। তিনি তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা ঠিক সেইভাবে নিজ পুত্রদের হাতে অর্পণ করেছিলেন যেভাবে অর্পণ করেছিলেন খলীফা হারূনুর রশীদ তাঁর সাম্রাজ্য আপন দুই পুত্র মামূন ও আমীনের হাতে। মাহমূদ গাযনাবীর দুই পুত্রও ঠিক সেভাবে আপোসে লড়েছিলেন যেভাবে লড়েছিলেন হারূনের দুইপুত্র আমীন ও মামূন। কিন্তু মামূনুর রশীদ যেভাবে আপন ভাই আমীনুর রশীদের উপর জয়লাভ করে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের শান-শওকত বহাল রাখতে পেরেছিলেন, মাহমূদের পুত্র মাসউদ আপন ভাই মুহাম্মদের উপর জয়লাভ করে ঠিক সেভাবে গযনী সাম্রাজ্যের শান-শওকত টিকিয়ে রাখতে পারেন নি। মাহমূদ গাযনাবী মাওরাউন নাহর, খুরাসান, গযনী, পাঞ্জাব প্রভৃতি এলাকা আপন কনিষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদকে দিয়েছিলেন আর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাসউদকে দিয়েছিলেন খাওয়ারিয্‌ম, ইরাক, পারস্য, ইস্পাহান প্রভৃতি এলাকা। মাহমূদের মৃত্যুর সাথে সাথে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে যায়। মুহাম্মাদ বসেন গযনীর সিংহাসনে, আর মাসউদ বসেন রায়ের সিংহাসনে। প্রথম ঝগড়ার সূত্রপাত এভাবে হয় যে, মাসউদ বয়সে বড় হওয়ার কারণে চাচ্ছিলেন যেন খুতবায় তাঁর নাম মুহাম্মাদের আগে পঠিত হয়। কিন্তু মুহাম্মাদ বলছিলেন, যেহেতু আমি পিতারই সিংহাসনে (গযনীতে) বসেছি, অতএব দেশের সর্বত্র জুমুআর খুতবায় মাসউদের পূর্বে আমার নামই পঠিত হতে হবে। পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই একটা বাহানা মাত্র। আসলে এক ভাই অন্য ভাইকে পরাস্ত করে সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিপতি হতে চাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, মাসউদ এক হামলার মাধ্যমে গযনী জয় করে আপন ভাই মুহাম্মাদকে বন্দী করেন এবং তার দুই চোখ উপড়ে ফেলা হয়। গযনীর সিংহাসনে আরোহণ করে মাসউদ বেলুচিস্তান ও মাকরানের উপর হামলা চালিয়ে ঐ সমস্ত এলাকা নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কোন সাম্রাজ্যে দুই রাজকুমার সিংহাসন দখলের জন্য পরস্পর যুদ্ধে

লিপ্ত হলে সাম্রাজ্যের প্রতিটি অংশেই বিদ্রোহী শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মুহাম্মাদকে অন্ধ করে দেওয়ার পর সুলতান মাসউদের পক্ষে বিরাট গযনী সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। সালজুকী তুর্কীরা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে খাওয়ারিয্‌ম এলাকায় লুটপাট শুরু করে দেয়। এদিকে হিন্দুস্থান ও পাঞ্জাব ও কোন কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তা বিদ্রোহ ঘোষণার সংকল্প নেন। ফলে সমগ্র সাম্রাজ্যের ভীত একসাথে নড়বড়ে হয়ে ওঠে। সুলতান মাসউদ অত্যন্ত সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করেন। তিনি খাওয়ারিয্‌ম ও খুরাসানে সালজুকীদেরকে একের পর এক পরাজিত করেন এবং মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে হিন্দুস্থানের উপরও হামলা চালান। তিনি সরস্বতী ও হাঁসির সুদৃঢ় দুর্গসমূহ দখল করে সেগুলোকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেন। তারপর দ্রুতবেগে হিন্দুস্থান থেকে গযনী ফিরে এসে দেখতে পান যে, সালজুকীরা প্রথম বারের চাইতেও অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাঁর মুকাবিলার জন্য তৈরি হয়ে আছে। মাসউদ প্রতিবারই তাদেরকে পরাজিত করেন এবং তারাও প্রতিবার নিজেদের পুনর্গঠিত করে মাসউদের মুকাবিলা করতে থাকে। সুলতান মাসউদের সেনাবাহিনীতে বিরাট সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। বেশ কয়েকজন হিন্দু তার বাহিনীতে অধিনায়কের পদেও অধিষ্ঠিত ছিল। ঐ সমস্ত অধিনায়কের অধীনে ছিল অনেকগুলো হিন্দু প্লাটুন ও পার্শ্ব বাহিনী। মাসউদ হিন্দুদের বাহিনী গঠন এবং তাদেরকে সামরিক শিক্ষা দিয়ে যোগ্য সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকজন হিন্দু অধিনায়ককে শুধু এইজন্য হিন্দুস্থানে পাঠান, যাতে তারা সেখান থেকে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে সেনাবাহিনীতে ভর্তির জন্য গযনীতে এসে পৌঁছলে মাসউদ তাদের জন্য ইরানী ও আফগান সৈন্যদের চাইতে অধিক ভাতা নির্ধারণ করেন। এমনকি তিলক নামীয় জনৈক হিন্দুকে তিনি মহারাজা উপাধি দিয়ে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন। এই মহারাজা তিলক ছিলেন একজন হিন্দু নাপিতের সন্তান। অতএব তার মর্যাদা সকলের উপরে দেখে বেশির ভাগ আমীর ও সভাসদ সুলতান মাসউদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় এবং তাঁর সমালোচনা করতে শুরু করে। সুলতান মাসউদের এই হিন্দু-তোষণনীতি সবাইকে এজন্য বিস্মিত করে যে, মাকরানের যুদ্ধে হিন্দুরা যে ভীরুতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছিল তাতে কোন মানুষ কল্পনা করতে পারে নি যে, সুলতান মাসউদ তারপর হিন্দু-প্রেমে এভাবে মত্ত হবেন। শেষ পর্যন্ত খুরাসানের এক জঙ্গলে সালজুকীদের সাথে সুলতান মাসউদের বাহিনীর মুকাবিলা হলে এই হিন্দু সৈন্যরাই সর্বাগ্রে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে সুলতান মাসউদ এবং তার আফগান বাহিনীকে দারুণ সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করে। কয়েকজন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মুসলিম সৈন্যের অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শনের কারণে সুলতান মাসউদ কোন মতে প্রাণে বেঁচে গেলে তাঁকে শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে হয়। এই পরাজয়ের পর সুলতান মাসউদের মনে এমনি অবিশ্বাস ও হীনম্মন্যতা ঢুকে পড়ে যে, তিনি আপন মন্ত্রী এবং আপন পুত্র মাওদূদকে গযনীতে রেখে যাবতীয় ধনরত্ন উট, হাতি ও ঘোড়ার পিঠে ও শ্রমিকদের মাথায় উঠিয়ে হিন্দু সর্দারদের সাথে নিয়ে হিন্দুস্থান অভিমুখে এজন্য রওয়ানা হন যাতে লাহোরকে রাজধানী করে সেখানেই স্থায়িভাবে বসবাস করতে পারেন। যেহেতু সুলতান মাসউদ তাঁর এই সংকল্পের কথা প্রথমেই গযনীতে প্রকাশ

করে দিয়েছিলেন তাই সেখানকার অধিনায়ক ও আমীর-উমারা তাকে তাঁর এই সংকল্প থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তারা তাঁকে বলেন, আপনি আরো কিছুদিন ধৈর্য ধরুন। আমরা শীঘ্রই আমাদের গত পরাজয়ের প্রতিশোধ নেব এবং সালজুকীদের খুরাসান থেকে মেরে তাড়িয়ে তবে ক্ষান্ত হব। আপনি আপনার পিতার রাজধানী ত্যাগ করবেন না। কিন্তু মাসউদের উপর ঐসব কথার কোনই প্রভাব পড়ল না। তিনি গযনীর ধনভাণ্ডারের যাবতীয় হীরা-জহরত, সোনা-দানা, নগদ মুদ্রা, কাপড়-চোপড়, এমনকি যাবতীয় আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে গযনী থেকে রওয়ানা হন এবং আপন পুত্র মাওদূদের কাছে, যিনি তখন বল্‌খ ও বাদাখশানে অবস্থান করছিলেন, একটি পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত পত্রে তিনি লিখেছিলেন– আমি তোমাকে গযনী, খুরাসান এবং এতদসংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করলাম। এখন থেকে তোমার নামে আমার আদেশ-নির্দেশ আসতে থাকবে। তুমি যে অনুযায়ী কাজ করবে এবং তুর্কীদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে সদা-সচেষ্ট থাকবে। যা হোক মাসঊদ হিন্দুস্থান অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু সিন্ধু নদ অতিক্রম করার সাথে সাথে হিন্দু সর্দার ও সাধারণ সৈন্যরা, যারা মাসউদের সাথেই ছিল, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত শাহী ধনভাণ্ডারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐ সমস্ত ধনরত্ন, যা সবুক্তগীন ও মাহমূদ গাযনাবী দীর্ঘ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে সংগ্রহ করেছিলেন, তা বলতে গেলে এক নিমিষেই হিন্দু লুটেরারা হজম করে ফেলে। আর তখন সুলতান মাহমূদের উত্তরাধিকারী সুলতান মাসউদকে আপন কিছু মুসলিম সাঙ্গপাঙ্গসহ অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে সে মর্মন্তুদ দৃশ্য অবলোকন করতে হয়।

এই করুণদৃশ্য সুলতান মাসউদের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা জানা না গেলেও তার সঙ্গের মুসলমানরা সুলতান মাসউদকে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে পদচ্যুত করে তাঁর অন্ধ ভাই মুহাম্মাদকে, যিনি বন্দী অবস্থায় ঐ সফরে সুলতান মাসঊদের সাথে ছিলেন, তাঁকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করে। মুহাম্মাদ বাদশাহ মনোনীত হয়েছেন শুনে হিন্দু-বাহিনীর অনেক যোদ্ধা পুনরায় মুহাম্মাদের আশেপাশে ভিড় জমায়। কেননা এখন তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের কোন ক্ষমতা মাসঊদের ছিল না। মাসঊদকে বন্দী করে যখন তার ভাই মুহাম্মাদের সামনে হাযির করা হয় তখন মুহাম্মাদ তার চোখ উপড়ে ফেলার বদলা মাসঊদের উপর থেকে নেন নি বরং তাকে শুধু জিজ্ঞেস করেন, এখন তুমি নিজের জন্য কি পছন্দ কর? মাসঊদ উত্তরে বলেন, আমাকে ক্রীট দুর্গে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হোক। মুহাম্মাদ তখন তাকে সপরিবারে ক্রীট দুর্গে পাঠিয়ে দেন। তারপর পাঞ্জাব ও সীমান্ত এলাকায় নিজের নামে মুদ্রা ও খুতবা জারি করেন। মুহাম্মাদের পুত্র আহমদ পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে এবং তাকে কোন কিছু না জানিয়ে ক্রীট দুর্গে গিয়ে আপন চাচা মাসঊদকে হত্যা করে আপন পিতার চোখ উপড়ে ফেলার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এই সংবাদ শুনে মুহাম্মাদ অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং বল্‌খে আপন ভাতিজা মাওদূদের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠান যে, আমি তোমার পিতা মাসঊদকে হত্যা করাই নি, বরং আহমদ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই জঘন্য কাজ করেছে। মাওদূদ তখন বলখে সালজুকীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছিলেন। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি তার বাহিনী নিয়ে হিন্দুস্থান অভিমুখে রওয়ানা হন। এদিকে সিন্ধু নদের তীরে মুহাম্মাদ তার বাহিনী নিয়ে মাওদূদের অপেক্ষা

করছিলেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মাওদূদ তাতে জয়লাভ করেন। মাওদূদ মুহাম্মাদকে বন্দী করে এনে আপন পিতার খুনের বদলে তাদের সবাইকে হত্যা করেন। তারপর মাওদূদ গযনীতে ফিরে গিয়ে ৪৩৫ হিজরীতে (১০৪৩-৪৪ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মাওদূদও আপন পিতা মাসঊদের মত সালজুকীদের বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মাওরাউন নাহ্‌র, গযনী এবং হিন্দুস্থানের মধ্যেই নিজের সাম্রাজ্য গুটিয়ে ফেলেন। অন্যান্য সব দেশ, যেমন খুরাসান, খওয়ারিযম, ইরাক প্রভৃতি চিরদিনের জন্য গযনী সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে যায় এবং সালজুকীরা সেগুলোকে নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়।

৪৪০ হিজরীতে (১০৪৮-৪৯ খ্রি) মাওদূদ ইব্‌ন মাসঊদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তার পুত্র আলী সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৪৪৩ হিজরীতে (১০৫১-৫২ খ্রি) আলীর পর আবদুর রশীদ ইব্‌ন মাওদূদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এর কিছুদিন পরই তুগ্রিল নামীয় জনৈক অধিনায়ক আবদুর রশীদকে হত্যা করে শাহী মুকুট আপন শিরে ধারণ করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের আমীর-উমারা শীঘ্রই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তুগ্রিলকে হত্যা করে এবং ৪৪৪ হিজরীতে (১০৫২-৫৩ খ্রি) ফররুখ যাদ ইব্‌ন মাসঊদকে গযনীর সিংহাসনে বসায়।

ফররুখ যাদ সিংহাসনে আরোহণ করে অত্যন্ত যোগ্যতা ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করে সালজুকীদের হাত থেকে খুরাসান রাজ্য মুক্ত করার চেষ্টা চালান। প্রথম প্রথম বেশ কয়েকটি যুদ্ধে ফররুখ যাদ সালজুকীদের উপর জয়লাভ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন আলপ-আরসালান সালজুকীর সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়, তখন গযনী বাহিনী পরাজয় বরণ করে। ফলে খুরাসানের উপর ফররুখ যাদ তাঁর অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।

৪৫০ হিজরীতে (১০৫৮ খ্রি) ফররুখ যাদের পর তাঁর ভাই ইবরাহীম ইব্‌ন মাসঊদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান ইবরাহীম গাযনাবী অত্যন্ত পুণ্যবান, বিচক্ষণ ও বীর পুরুষ ছিলেন। সিংহাসনে বসার পর তিনি সালজুকীদের সাথে আপোস করাকেই সমীচীন মনে করলেন। সালজুকীরাও অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর সাথে আপোস চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির পর তিনি নিজেকে খুরাসানের বৈধ শাসক মনে করতে থাকেন। উপরন্তু ভবিষ্যতের জন্য গযনী ও সালজুকীদের মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়ে যায়। এই দিক থেকে নিশ্চিন্ত হবার পর সুলতান ইবরাহীম হিন্দুস্থানের দিকে মনোনিবেশ করেন। কেননা আপোসের মধ্যে ঝগড়াঝাটি এবং সালজুকীদের সাথে অবিরাম যুদ্ধ চলার কারণে দীর্ঘদিন থেকে হিন্দুস্থানের দিকে মনোনিবেশ করা গযনীর সুলতানের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে সেখানকার অধিকাংশ সর্দার এবং রাজা স্বাধীনতা ঘোষণা করে গযনীর সুলতানকে করদানে বিরত ছিল। সুলতান ইবরাহীম হিন্দুস্থানের এই অবাধ্য শাসকদের উপর হামলা চালান এবং ধীরে ধীরে নিজের সাম্রাজ্যকে খুব মজবুত ও সুদৃঢ় করে তুলেন। সুলতান ইবরাহীম বেয়াল্লিশ অথবা তেতাল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। ৪৯৩ হিজরীতে (১১০০ খ্রি) তাঁর মৃত্যু হয়।

তারপর মাসউদ ইব্ন ইবরাহীম সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ষোল বছর সাম্রাজ্য শাসন করে ৫০৯ হিজরীতে (১১১৫-১৬ খ্রি) মৃত্যুবরণ করেন। মাসউদ ইব্ন ইবরাহীম কিছু দিনের জন্য লাহোরকেও নিজের রাজধানীতে পরিণত করেছিলেন।

মাসউদের পর তাঁর পুত্র আরসালান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মোট তিন বছর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। ৫১২ হিজরীতে (১১১৮-১৯ খ্রি) সুলতান সাঞ্জার সালজুকী গযনী জয় করে আরসালানের ভাই বাহরাম ইব্ন মাসউদ ইব্ন ইবরাহীমকে গযনীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

বাহরাম পঁয়ত্রিশ বছরের অধিককাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। তিনি বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য বেশ কয়েকবার হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন এবং বেশির ভাগ সময় লাহোরেই কাটান। তাঁরই শাসনামলে 'কালীলা দিমনা' লিখিত হয়। 'খামসা নিযামী'ও তাঁরই শাসনামলের গ্রন্থনা। সুলতান বাহরামের শাসনামলের শেষভাগে ঘুরীরা গযনীর উপর হামলা চালিয়ে বাহরামকে গযনী থেকে বেদখল করে দেয়। বাহরাম সেখান থেকে পালিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে চলে আসেন এবং ৫৪৭ হিজরীতে (১১৫২-৫৩ খ্রি) মৃত্যুবরণ করেন। এখন গযনীদের দখলে শুধু হিন্দুস্থান তথা পাঞ্জাব রয়ে গিয়েছিল এবং গযনী প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরীদের হাতে চলে গিয়েছিল।

বাহরামের মৃত্যুর পর লাহোরে তার পুত্র খসরু শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি গযনীকে ঘুরীদের হাত থেকে পুনর্দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। শেষ পর্যন্ত আট বছর পাঞ্জাবে হুকুমত করার পর তিনি লাহোরে পরলোকগমন করেন।

তারপর তার পুত্র খসরু মালিক ইব্ন খসরু শাহ ৫৫৫ হিজরীতে (১১৬০ খ্রি) লাহোরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঘুরীরা খসরু মালিককে বন্দী করে পাঞ্জাব অধিকার করে নেয়। আর এখানেই গযনী সাম্রাজ্যের চির বিলুপ্তি ঘটে।

সালজুক সাম্রাজ্য

আব্বাসীয় খলীফাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে সালজুকদের অবস্থা সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে আলোচনা করা হয়েছে তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল বিধায় এখানে তাদের সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। তুর্কী বংশোদ্ভূত জনৈক ব্যক্তির নাম ছিল ভিকাক এবং তার উপাধি ছিল তাইমূর তালীনা। তিনি ছিলেন তুর্কিস্তান তথা দাশতে কাবচাকের বাদশাহ পেঘূর অন্যতম সভাসদ। তাঁর পুত্রের নাম ছিল সালজুক। সালজুক নিজেকে ইফরাসইয়াবের ৩৪তম অধঃস্তন পুরুষ বলে দাবি করতেন। তিনিও তার পিতার পর পেঘূর রাজদরবারে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। একদা কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সালজুক আপন পিতার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে নিজ পুত্রদের নিয়ে সমরকন্দ ও বুখারার দিকে চলে আসেন। তার এই ক্ষুদ্র কাফেলাটি জুনদের নিকটে অবস্থান গ্রহণ করে। জুনদ ছিল তুর্কিস্তানের বাদ্শাহ পেঘূর একটি করদ রাজ্য। কিছুদিন পর পেঘূর কর্মচারীরা যখন কর আদায় করার জন্য জুনদে আসে তখন সালজুক সেখানকার শাসনকর্তাকে বলেন, কাফিররা মুসলমানদের কাছ থেকে কর আদায় করুক এটা আমার কাছে খুবই অসহনীয় ঠেকছে। সালজুকের এই সাহস প্রত্যক্ষ করে সেখানকার মুসলিম অধিবাসীরাও তাকে সমর্থন করে

এবং সালজুকের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পেঘূর কর্মচারীদের উপর আক্রমণ চালায়। এই হামলায় সালজুক বিজয় লাভ করেন। ফলে তাঁর বীরত্বের কাহিনী দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর গোত্রের লোকেরাও তাঁর সাথে এসে মিলিত হতে থাকে। যখন ঈলক খান দ্বিতীয় নূহকে আক্রমণ করেন তখন সালজুক দ্বিতীয় নূহের পক্ষ নিয়ে ঈলক খানের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এই যুদ্ধেই সালজুকের পুত্র মীকাঈল নিহত হন। মীকাঈলের দুই পুত্র তুগ্রিল বেগ এবং চাগার বেগ তাদের পিতামহ সালজুকের ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত হতে থাকে। সালজুকের আরো চার পুত্র ছিলেন। তারা হচ্ছেন– ইসরাঈল, ইউনুস, ইয়ানাল ও মূসা। তুর্ক ও মুঘল গোত্রসমূহে কোন ব্যক্তি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারলে তিনি অনায়াসে আপন গোত্রের নেতা হতে পারতেন। এই প্রেক্ষিতে সালজুক এবং তাঁর পুত্ররাও শীঘ্রই নেতৃত্ব পদ লাভ করেন এবং তাঁদের চারপাশে তুর্কীরা এসে ভিড় জমায়। ঈলক খান এবং পেঘূর একত্রে সালজুক নামে খ্যাত এই নতুন গোত্রটির ধ্বংস সাধন করতে চান। ঐ সময়েই সালজুক মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পৌত্র চাগার বেগ বাহিনী নিয়ে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আর্মেনিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে মাহমূদ গাযনাবীর এলাকা তথা তূস প্রদেশ পড়ে। তূসের কর্মকর্তা আল্লাহর পথে জিহাদকারী হিসাবে চাগার বেগকে তার শাসনাধীন এলাকা অতিক্রম করার অনুমতি দেন। সুলতান মাহমূদ গাযনাবী ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী বাদশাহ। সালজুক বাহিনী তার এলাকা দিয়েই অতিক্রম করছে জানতে পেরে তিনি তূসের কর্মকর্তার কাছে এর কৈফিয়ত তলব করেন। তাঁর ভয় ছিল হয়ত এই লুটেরার দল তাঁর সাম্রাজ্যেও লুটপাট শুরু করে দেবে। চাগার বেগ আর্মেনিয়া থেকে অনেক গনীমত নিয়ে ফিরে এলেন। তারপর সালজুকদের সংখ্যা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পেল। এবার তারা বল্‌খ প্রান্তরে নিজেদের মেষপাল চরাতে শুরু করল এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করল। মাহমূদ গাযনাবী এই সব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর স্থানীয় কর্মকর্তার মাধ্যমে সালজুকদের নেতাকে আপন দরবারে তলব করেন। তখন সালজুকদের মধ্যে সালজুকের পুত্র ইসরাঈলই ছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং সব চাইতে দূরদর্শী। অতএব তাঁকেই মাহমূদের দরবারে পাঠানো হলো। মাহমূদ গাযনাবী অত্যন্ত মর্যাদার সাথে ইসরাঈলকে আপন দরবারে গ্রহণ করেন। অনেক কথাবার্তার পর তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমার সৈন্যের প্রয়োজন পড়ে তাহলে তুমি কত লোক দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবে? ইসরাঈল তাঁর তীরটি সামনে রেখে দিয়ে বললেন, আপনি এই তীরটি আমাদের পার্বত্য গোত্রসমূহে পাঠিয়ে দিন। দেখবেন, দুই লক্ষ লোক এসে আপনার খিদমতে হাযির হয়েছে। এই উত্তর শুনে সুলতান মাহমূদ তাদের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে অবহিত হন এবং নিজের সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ইসরাঈলকে নিরাপত্তার যামানতস্বরূপ হিন্দুস্থানের কালিঞ্জর দুর্গে পাঠিয়ে দেন। সেখানে ইসরাঈল সাত বছর পর্যন্ত নজরবন্দী অবস্থায় কাটান। ইসরাঈলের অবর্তমানে তুগ্রিল বেগ ও চাগার বেগ সালজুকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই দুই ভাই পরস্পর ঐক্য সহযোগিতার সাথে নিজেদের সাথে সংশ্লিষ্ট গোত্রসমূহের উপর হুকুমত চালাতে থাকেন। মাহমূদ গাযনাবী প্রথম প্রথম সালজুকদেরকে চারণভূমি হিসাবে মাওরাউন নাহরে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। তারপর তিনি তাদেরকে এই অনুমতিও দেন যে, তারা জায়হূন নদী অতিক্রম করে খুরাসানে এসেও

বসবাস করতে পারবে। তূস ও বল্খের শাসনকর্তা আরসালান জাদিব এতে আপত্তি উত্থাপন করে মাহমূদের কাছে নিবেদন করেন ঃ এরা হলো যোদ্ধা জাতি। তাই যে কোন সময় তারা আমাদের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আপনি কেন এদেরকে জায়হূন নদীর এপারে আসার অনুমতি দিচ্ছেন ? কিন্তু মাহমূদ তো নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাছাড়া তিনি এটাও জানতেন যে, এদেরকে মাঝে-মধ্যে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নিয়ে জরুরী প্রযোজন মেটানো সম্ভব হবে। ইসরাঈল তো যামানতস্বরূপ নজরবন্দী আছেই। মাহমূদ গাযনাবীর মৃত্যু হলে সুলতান মাসঊদ ইসরাঈলকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কালিঞ্জর দুর্গ থেকে মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ইসরাঈল ভাতিজাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তার পৌঁছার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই সালজুকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ওদিকে সুলতান মাসঊদ সিংহাসনে আরোহণ করার পর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি নিজের আওতাধীনে আনতে পারেন নি এমনি সময়ে চাগার বেগ মার্ভ ও হিরাত অধিকার করেন এবং তুগ্রিল বেগ নিশাপুর দখল করে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন। মাসঊদ গাযনাবী এদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলে দুই ভাই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবিলা করেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁকে এমনি ব্যতিব্যস্ত রাখেন যে, বাধ্য হয়ে সুলতান মাসঊদকে সমগ্র খুরাসান থেকে তাঁর অধিকার গুটিয়ে নিতে হয়।

তারপর তুগ্রিল বেগ রায়-এ আপন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য তুগ্রিল বেগ মার্ভেই অবস্থান করতে থাকেন। জুমুআর খুতবায় উভয় ভ্রাতার নামই পঠিত হতে থাকে। তুগ্রিল বেগ খুরাসানে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর খাওয়ারিযমকেও নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তারপর তিনি রোমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং সেখান থেকে বিজয়ীবেশে ফিরে আসেন। এরপর তিনি বাগদাদে গিয়ে দায়লামী সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটান এবং বাগদাদের খলীফার 'মাদারুল মুহাম' ও 'হামীয়ে খিলাফত' নিযুক্ত হন। এই উপলক্ষে খলীফার দরবার থেকে তাঁকে খেতাব ও উপঢৌকন দেওয়া হয়। ৪৪৭ হিজরীতে (১০৫৫ খ্রি) বাগদাদের অভ্যন্তরে তুগ্রিল বেগের নামে খুতবা পঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত তুগ্রিল বেগ খান্দানে খিলাফতের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনও প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৪৫৫ হিজরীর ৮ই রমযান (অক্টোবর ১০৬৩ খ্রি) শুক্রবার ৭০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। চাগার বেগ এর চার বছর পূর্বেই ৪৫১ হিজরীর ১৮ই রজব (সেপ্টেম্বর ১০৫৯ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তুগ্রিল বেগ ছিলেন নিঃসন্তান। অতএব তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাতিজা সুলতান আল্প আরসালান ইব্ন চাগার বেগ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৪৯৫ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল (ডিসেম্বর ১১০১ খ্রি) সুলতান আল্প-আরসালান নয় বছর আড়াই মাস হুকুমত করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুলতান আল্প-আরসালান ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, পরাক্রমশালী এবং তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ। একদা আল্প-আরসালান শুধু বার হাজার অশ্বারোহী নিয়ে খ্রিস্টানদের তিন লক্ষ সৈন্যের বিরাট বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে রোমের কায়সারকেও বন্দী করেন। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্প-আরসালানের পর তাঁর পুত্র মালিক শাহ সালজুকী সিংহাসনে আরোহণ করেন। আল্প-আরসালানের ভাই কাদির বেগ (কাদরূ) আপন ভাতিজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন,

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্দী হয়ে নিহত হন। এই কাদির বেগের বংশধররাই কিরমানে সালজুক হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে। মালিক শাহ্ সিরিয়া এবং মিসরকেও আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ওদিকে জায়হূন নদীর অপর তীর পর্যন্ত তাঁর নামে খুতবা পঠিত হতে থাকে। মালিক শাহের সাম্রাজ্যের আয়তন আল্প-আরসালানের চাইতেও অধিক প্রশস্ত ছিল। জনৈক ঐতিহাসিকের মতে চীনের প্রাচীর থেকে শুরু করে লোহিত সাগর পর্যন্ত মালিক শাহের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সর্বত্রই তাঁর নামে খুতবা পঠিত হত। ৪৪৪ হিজরীতে (১০৫২-৫৩ খ্রি) মালিক শাহ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মালিক শাহের পর তাঁর পুত্র বারকিয়ারূক সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং এখান থেকে সালজুকীদের পতন শুরু হয়। বারকিয়ারূকের পর তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন শাহ ৪৯৬ হিজরীতে (১১০২-৩ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তারপর সাঞ্জার ইব্ন মালিক শাহ ৫০৯ হিজরীতে (১১১৫-১৬ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করে 'সুলতানুস সালাতীন' উপাধি গ্রহণ করেন। সুলতান বাহরাম গাযনাবী-এর কাছেই পরাস্ত হয়ে করদানে অংগীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন। যখন সুলতান আলাউদ্দীন ঘূরী বাহরামকে তাড়িয়ে দিয়ে গযনী দখল করেন তখন সুলতান সাঞ্জার সালজুকী সেখানে পৌঁছে আলাউদ্দীন ঘূরীকে বন্দী করেন। একবার 'ঘায'-এর তুর্কীরা সুযোগ পেয়ে বলখের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সুলতান সাঞ্জারকে বন্দী করে ফেলেছিল। সুলতানকে ওদের ওখানে চার বছর পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় থাকতে হয়। এই সময়কালে 'ঘায'-এর তুর্কীরা অনবরত লুটপাট চালিয়ে সমগ্র খুরাসানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। শেষ পর্যন্ত ওদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে সুলতান সাঞ্জার পুনরায় সমগ্র খুরাসান দখল করে নিয়েছিলেন।

তারপর খাওয়ারিযম নামক তাঁর এক ভৃত্য ও কর্মচারী বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং খাওয়ারিযমে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এই সাম্রাজ্যকে খাওয়ারিযম শাহী নামে অভিহিত করা হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, খাওয়ারিযম শাহী সাম্রাজ্য ও ঘূরী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল একেবারে নিকটবর্তী। সুলতান সাঞ্জারের মৃত্যুর পর তাঁর ভাগ্নে মাহমূদ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান সাঞ্জার ৫৫০ হিজরীতে (১১৫৫ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ বছরই মাহমূদ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়কালে খুরাসানের এক অংশের উপর ঘূরীরা এবং অপর অংশের উপর খাওয়ারিযম শাহীরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র খুরাসান থেকে সালজুকীদের নাম-নিশানা মুছে ফেলে। মালিক শাহ্ সালজুকীর বংশধর, যারা 'ইরাকে আরব'-এর শাসন ক্ষমতার অধিকারী এবং খিলাফতে বাগদাদের সাথে সম্পর্কিত ছিল, 'খুলাফায়ে বাগদাদ' অধ্যায়ে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বিধায় এখানে পুনরায় সে সম্পর্কে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

কাদির বেগের বংশধরদের মধ্যে একের পর এক দশজন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। হামাদান ছিল তাদের রাজধানী। তাদেরকে কিরমানী সালজুকী বলা হতো। কাদির বেগকে ৪৬৫ হিজরীতে (১০৭২-৭৩ খ্রি) বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। তারপর মালিক শাহ্ ইব্ন আল্প-আরসালানের নির্দেশে তাঁর পুত্র সুলতান শাহ্ কিরমানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। বার বছর হুকুমত করার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর পুত্র তূরান শাহ

সিংহাসনে আরোহণ করেন। তূরান শাহ্ তের বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর তাঁর পুত্র ইরান শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মোট বিয়াল্লিশ বছর সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। এরপর তাঁর পুত্র মুগীসুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মোট চৌদ্দ বছর হুকুমত পরিচালনার পর তার পুত্র তুগ্রিল শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মোট বার বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র বাহরাম শাহ, তারপর আরসালান শাহ্, তারপর তুরান শাহ্, তারপর মুহাম্মাদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। খাওয়ারিযম শাহী সম্রাটদের উত্থানকালে এরা কিরমানে হুকুমত পরিচালনা করেন; এরপর চিরদিনের জন্য বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যান।

সুলতান আল্প-আরসালান সালজুকী সুলায়মান কাতলামুশ ইব্ন ইসরাঈল ইব্ন সালজুককে এশিয়া মাইনরের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সুলায়মান সেখানে গিয়ে নিজের একটি পৃথক হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বংশধরদের মধ্যে একের পর এক চৌদ্দজন বাদশাহ হন। তারা রোমান সালজুকী নামে প্রসিদ্ধ। কূনিয়া শহর ছিল তাদের রাজধানী। তারা হিজরী সপ্তম শতাব্দীর (১৩০০-১৩০০১ খ্রি) শেষ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোমানদের সাথে যুদ্ধরত থাকতেন। তাদের পরই উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

সালজুকী এবং গাযনাবীদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে খাওয়ারিযম শাহী ও ঘূরীদের প্রতি সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে বিধায় এখানে তাদের সম্পর্কে কিছুটা খোলামেলা আলোচনা করতে চাই।

খাওয়ারিয্‌ম শাহী সালতানাত

মালিক শাহ সালজুকীর নুশতাগীন নামীয় একজন ক্রীতদাস ছিল। তারই পুত্র কুতুবুদ্দীন ইব্‌ন নুশতাগীন সুলতান সাঞ্জারের দরবারে বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। সুলতান সাঞ্জার সালজুকী তার এই ভৃত্য কুতুবুদ্দীনকে খারিযমের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এতদসত্ত্বেও কুতুবুদ্দীন যখন সুলতান সাঞ্জারের দরবারে হাযির হতেন তখন শাহী পোশাক পরিহিত অবস্থায় সুলতানের সেরূপ খিদমতই করতেন, যেরূপ খিদমত করতেন ভৃত্য থাকাকালীন সময়ে। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত খাওয়ারিযমের শাসনকর্তা ছিলেন। তাই খাওয়ারিযম নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি খাওয়ারিযম শাহ নামে খ্যাতি লাভ করেন। তারপর তার বংশধরদের মধ্যে যারা শাসক নিযুক্ত হন তারাও খাওয়ারিযম শাহী শাসক বলে পরিচিত হন। কুতুবুদ্দীন প্রথম প্রথম সুলতান সাঞ্জারের একান্ত অনুগতই ছিলেন। কিন্তু যখন সুলতানের সৌভাগ্য-সূর্য অস্তমিত হয় এবং তিনি ঘায-এর তুর্কীদের হাতে বন্দী হন তখন কুতুবুদ্দীন স্বাধীনতা ঘোষণা করে মাওরাউন নাহ্‌র আক্রমণ করেন। সুলতান সাঞ্জারের দরবারে যেমন কবি আন্‌ওয়ারী অবস্থান করতেন, তেমনি কুতুবুদ্দীনের দরবারে অবস্থান করতেন প্রসিদ্ধ কবি রশীদুদ্দীন ওয়াত্‌ওয়াত।

কুতুবুদ্দীনের পর তাঁর পুত্র আতসায খাওয়ারিযম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রশীদুদ্দীন ওয়াত্ ওয়াতকে আপন 'দারুল ইনশা'-এর হাকিমে আলা নিয়োগ করেছিলেন।

৫৪০ হিজরীর (১১৪৫-৪৬ খ্রি) দিকে আতসাযের মৃত্যু হলে তার স্থলে তাঁর পুত্র আরসালান শাহ ৫৫৭ হিজরীতে (১১৬২ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর এবং তাঁর

ভাই তাকাশ খানের মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাকাশ খান বিজয় লাভ করে ৫৮৩ হিজরীতে (১১৮৭ খ্রি) আপন শিরে রাজমুকুট ধারণ করেন। 'যাখীরা-ই-খাওয়ারিযম শাহ'-এর গ্রন্থকার ইসমাঈল ইব্‌ন হাসান এবং কবি খাকানী তাঁরই যুগের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তাকাশ খান তৃতীয় তুগ্রিলকে হত্যা করেন এবং খুরাসান ও ইরাক দখল করে আপন সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন।

তাকাশ খানের মৃত্যু হলে তার স্থলে তাঁর পুত্র সলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহ ৫৯০ হিজরীতে (১১৯৪ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আনুমানিক একুশ বছর সাম্রাজ্য শাসন করেন এবং আপন সাম্রাজ্যের আয়তন বহুলাংশে বৃদ্ধি করেন। তাঁর এবং খলীফায়ে বাগদাদের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। শিহাবুদ্দীন ঘুরীর মৃত্যুর পর গযনী পর্যন্ত সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহের সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ে। তিনি পারস্যের বাদশাহ আতাবেক সাদ এবং আযারবায়জানের বাদশাহ আতাবেক উযবেককেও পরাজিত করেন। তিনি বাগদাদের খলীফাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে তার স্থলে আপন পীর সাইয়িদ আলাউল মুল্‌ক তিরমিযীকে বসাবার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। খলীফা তখন হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীকে খাওয়ারিযম শাহের কাছে এই উদ্দেশ্যে পাঠান, যাতে তিনি উপদেশ দিয়ে তাকে এই সংকল্প থেকে বিরত রাখেন এবং তাদের উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু এই দূতালীতে কোন কাজ হয় নি। সুলতান খাওয়ারিযম শাহ তাঁর সংকল্প থেকে বিরত হননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৈবক্রমে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। অবিরাম তুষারপাত হতে থাকে। যার ফলে খাওয়ারিযম শাহ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ইরাক থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তিনি তখন ইরাকেই ছিলেন এমন সময়ে চেঙ্গিয খান তাঁর দেশ আক্রমণ করে বসেন। চেঙ্গিয খানের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে এর আগে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহ তাঁর যুগে সব চাইতে পরাক্রমশালী বাদশাহ ছিলেন। দূর-দূরান্তের রাজা-বাদশাহরাও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু উপরিউক্ত তুষারপাতের ঘটনা থেকে তাঁর সৌভাগ্য-সূর্য দ্রুত ঢলে পড়তে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তিনি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন যে, তাঁর লাশের জন্য একটু খানি কাফনও জুটেনি।

সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহের সাত পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে রুকুনুদ্দীন, গিয়াসুদ্দীন ও জালালুদ্দীন পৃথক পৃথক প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। পিতার মৃত্যু এবং পতনের পর তিন ভাই সম্মিলিতভাবে চেঙ্গিয খানের মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হন। তাদের মধ্যে পরস্পর ভুল বোঝাবুঝি বিদ্যমান ছিল বিধায় তাঁরা পৃথক পৃথকভাবে চেঙ্গিয খানের মুকাবিলা করেন এবং তারা প্রত্যেকেই পরাজিত হন।

সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহের পুত্রদের মধ্যে জালালুদ্দীন খাওয়ারিযম শাহ ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি সিন্ধুনদের তীরে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে চেঙ্গিয খানের মুকাবিলা করেন। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় নি। তিনি হিন্দুস্থান সীমান্তে প্রবেশ করে কিছুদিন সিন্ধুতে ছিলেন। তারপর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি আলামূত দুর্গের ধর্মদ্রোহী ফিদায়ীদের ক্ষমতা অনেকখানি খর্ব করেন। তিনি একাধারে মুঘল ও

ফিরিঙ্গীদের (রোমানদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। ইরাকেও তিনি বিজয় লাভ করেন। তবে কিছু কিছু পরিস্থিতি এমনি প্রতিকূল হয়ে ওঠে যে, তিনি তাঁর হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি ফকিরী পোশাকে অদৃশ্য হয়ে যান এবং অজ্ঞাত অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিকরা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে জালালুদ্দীন খাওয়ারিযম শাহের উল্লেখ এজন্য করেন যে, তিনি সত্যিকার অর্থে একজন বীরপুরুষ ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে তিনি সবার শ্রদ্ধা কুড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। জালালুদ্দীন খাওয়ারিযম শাহের পরই খাওয়ারিযম শাহী সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঘূরী সাম্রাজ্য

হিরাতের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ী এলাকায় ঘূর নামক একটি প্রশস্ত ভূখণ্ড রয়েছে। মাহমূদ গাযনাবী এই এলাকা জয় করে একটি প্রদেশ হিসাবে এটাকে আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। ঘূরের অধিবাসীরা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এখানে আফগানী গোত্রসমূহ বসবাস করত। মাহমূদ গাযনাবী ঘূর প্রদেশের সুবেদার হিসাবে ঐ সমস্ত আফগানের মধ্য থেকেই জনৈক অভিজাত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। তারপর ঐ ব্যক্তির বংশধররাই ঘূরের সুবেদারী তথা শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। ঘটনাচক্রে সুলতান বাহরাম গাযনাবী এবং ঘূরের গভর্নর কুত্‌বুদ্দীনের মধ্যে কোন এক ব্যাপারে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা যুদ্ধ ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। ঐ যুদ্ধে কুত্‌বুদ্দীন নিহত হন। কুত্‌বুদ্দীন ঘূরীর ভাই সাইফুদ্দীন আপন ভাইয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে গযনী আক্রমণ করে বাহরাম আযনাবীকে সেখান থেকে বের করে দেন এবং নিজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এবার বাহরাম গাযনাবী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাহায্য লাভ করে গযনী আক্রমণ করেন এবং সাইফুদ্দীনকে বন্দী করে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করেন।

যখন তৃতীয় ভাই আলাউদ্দীন ঘূরীর কাছে আপন দুই ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে গযনী আক্রমণ করেন। আলাউদ্দীন ঘূরী এবং তাঁর স্বদেশবাসীরা যখন অত্যন্ত আবেগ-উদ্দীপনার সাথে গাযনাবীর দিকে অগ্রসর হয় তখন বাহরাম গাযনাবী তাদেরকে মনি-মাণিক্যের লোভ দেখিয়ে সে অভিযান থেকে বিরত রাখতে চান। তিনি একটি আপোস-চুক্তিরও প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু তখন আলাউদ্দীন ঘূরী ও তাঁর সঙ্গীদের চোখে ঐ দৃশ্যটি ভেসে উঠতে থাকে, যখন সাইফুদ্দীনকে একটি ষাঁড়ের উপর বসিয়ে অত্যন্ত অপমানজনক অবস্থায় গযনীর অলিতে গলিতে ঘোরানো হচ্ছিল। তারপর অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। অতএব তারা রাগে-ক্রোধে এবং প্রতিশোধ-স্পৃহায় একেবারে পাগলপারা হয়ে ওঠে। ফলে বাহরামের কোন কূটকৌশলই আর কাজে লাগেনি। যা হোক আলাউদ্দীন গযনী জয় করেন এবং বাহরাম গাযনাবী হিন্দুস্থানের দিকে পালিয়ে আসেন। আলাউদ্দীন ঘূরী আপন ভাইয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে গযনীর অধিবাসীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করেন। তিনি গযনীর সুলতানদের কোন কোন কবরও ধ্বংস করে ফেলেন, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ফেলেন এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত অনবরত

হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকেন। আর এ কারণেই তিনি 'আলাউদ্দীন জাহাঁসূয' নামে খ্যাতি লাভ করেন। এছাড়া তিনি গযনীর বহুলোককে বন্দী করে আপন রাজধানীতে নিয়ে যান, তাদেরকে হত্যা করে রক্তকাদা তৈরি করেন এবং সে কাদা ব্যবহার করেন নগর প্রাচীর নির্মাণে। এটা হচ্ছে ৫৪৭ হিজরীর (১১৫২ খ্রি) ঘটনা। আলাউদ্দীন জাহাঁসূয ঘূরী গযনী জয় করার পর সেখানে একজন 'নায়িবুস্-সালতানাত' নিয়োগ করেন এবং নিজ রাজধানী ফিরূযকুহের উদ্দেশে ঘূর অভিমুখে চলে যান। এভাবে গযনী ঘূর সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। বাহরাম গাযনাবী যেহেতু সুলতান সাঞ্জার সালজুকীর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তাই তিনি হিন্দুস্থান থেকে সুলতান সাঞ্জার সালজুকীর কাছে ফরিয়াদনামা প্রেরণ করেন। সুলতান সাঞ্জার সালজুকী পরবর্তী বছর হামলা চালিয়ে ঘূর ও গযনী জয় করে বাহরাম গাযনাবীকে সেখানকার শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং আলাউদ্দীন জাঁহাসূয ঘূরীকে বন্দী করে নিজের সাথে নিয়ে যান। আলাউদ্দীন ঘূরী গযনী ধ্বংস করতে গিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছিলেন তা একান্ত প্রতিশোধ বশেই করেছিলেন। অন্যথায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং যোগ্য ব্যক্তি। কিছুদিনের মধ্যেই সুলতান সাঞ্জার আলাউদ্দীনের এই সমস্ত গুণ ও যোগ্যতার পরিচয় পান এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাকে মুক্ত করে দেন। তারপর আলাউদ্দীন ঘূরে ফিরে এসে পুনরায় হুকুমত চালাতে থাকেন। এর পর পরই 'ঘায'-এর তুর্করা সুলতান সাঞ্জারকে বন্দী করে ফেলে। ফলে সালজুকীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও হ্রাস পায়। সুলতান সাঞ্জার চার বছর পর্যন্ত তুর্কীদের হাতে বন্দী থাকেন। তবে ঠিক সে রকম বন্দী ছিলেন, যে রকম বন্দী ছিলেন হিন্দুস্থানের বাদশাহ জাহাঙ্গীর মহাব্বত খানের হাতে। অর্থাৎ ঘায-এর তুর্করা দিনের বেলা সুলতান সাঞ্জারকে সিংহাসনে বসিয়ে অনুগত প্রজার মত তাঁর সামনে হাত বেঁধে দাঁড়াত, আর রাতের বেলা আটকিয়ে রাখত তাকে একটি লোহার খাঁচায়। তারা মূলত সাঞ্জারকেই নিজেদের বাদশাহ ও সুলতান বলে মান্য করত এবং যেখানে ইচ্ছা তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করত। সুলতান সাঞ্জার বন্দী হওয়ার পর আলাউদ্দীন ঘূরী বাহরাম গাযনাবীকে তাড়িয়ে দিয়ে গযনী দখল করে নেন এবং এর কিছু দিন পরই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আলাউদ্দীন ঘূরী হচেছন ঘূরী সাম্রাজ্যের প্রথম স্বাধীন বাদশাহ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় সাইফুদ্দীন ঘুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দেড় বছর হুকুমত পরিচালনার পর ঘায-এর তুর্কদের সাথে একটি যুদ্ধে নিজেরই এক অধিনায়কের হাতে নিহত হন।

আলাউদ্দীন ঘূরীর দুই ভাতিজা গিয়াসুদ্দীন ঘূরী ও শিহাবুদ্দীন ঘূরী ঠিক সেরূপ যৌথভাবে হুকুমত পরিচালনা করেছিলেন যেভাবে পরিচালনা করেছিলেন তুগ্রিল বেগ সালজুকী ও চাঘার বেগ সালজুকী ভ্রাতৃদ্বয়। গিয়াসুদ্দীন ও শিহাবুদ্দীনের মধ্যকার সম্প্রীতি ও ভালবাসা ছিল অত্যন্ত প্রগাঢ়। তাঁদের উভয়কেই বাদশাহ মনে করা হতো।

শিহাবুদ্দীন ঘূরী আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াসুদ্দীন ঘূরীকে নিজের মনিবের মতই সম্মান করতেন। তাঁর প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করাকে তিনি সব সময় নিজের কর্তব্য বলেই মনে করতেন। খুরাসানের বেশির ভাগ অংশ নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পর ঘূরীরা হিন্দুস্থানের প্রতি মনোনিবেশ করেন। কেননা তারা নিজেদেরকে গযনবী সালতানাতের প্রতিনিধি মনে করতেন। সেই হিসাবে যে সমস্ত দেশ সুলতান গযনবীর দখলে ছিল সেগুলো

পুনর্দখল করাকেও তাঁরা নিজেদের বৈধ অধিকার বলে মনে করতেন। তখন পাঞ্জাবের শাসনক্ষমতা ছিল সুলতান গযনবীর সুলতানদের হাতে। ঘূরীরা ওদের কাছ থেকে পাঞ্জাব ছিনিয়ে নেওয়াটা নিজেদের জন্য একটি অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করেন। হিজরী ৫৮২ সনে (১১৮৬ খ্রি) শিহাবুদ্দীন ঘূরী খসরু মালিক গাযনাবীকে লাহোর থেকে বন্দী করে আপন ভাই গিয়াসুদ্দীন ঘূরীর কাছে ঘূরে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে রাজধানী লাহোরে শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

৫৯৯ হিজরীতে (১২০২-৩ খ্রি) গিয়াসুদ্দীন ঘূরীর মৃত্যু হয়। তাঁর স্থলে তার ভাই শিহাবুদ্দীন ঘূরী সিংহাসনে আরোহণ করেন। গিয়াসুদ্দীন ঘূরীর জীবনকালেই শিহাবুদ্দীন ঘূরী হিন্দুস্থানের রাজা পৃথ্বী রাজকে পরাজিত ও বন্দী করে হত্যা করেছিলেন। এবার যখন তিনি ফিরূযকূহে ঘূরের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর পক্ষ থেকে হিন্দুস্থানের শাসনকর্তা ছিলেন তারই দাস কুতুবুদ্দীন আইবেক। আপন বাদশাহী আমলে সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘূরী একবার হিন্দুস্থানে এসেছিলেন। এখান থেকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনকালে ৬০২ হিজরীতে (১২০৫-৬ খ্রি) ফিদায়ীরা প্রতারণার মাধ্যমে তাঁকে তার তাঁবুর মধ্যেই হত্যা করেছিল। শিহাবুদ্দীন ঘূরীর মৃত্যুর পর ঘূরী সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। হিন্দুস্থানে কুতুবুদ্দীন আইবেক একজন স্বাধীন নরপতি হিসাবে শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি হলেন হিন্দুস্থানের দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তখন ফিরূযকূহের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁরই ভাতিজা সুলতান মাহমূদ ঘূরী ইব্‌ন গিয়াসুদ্দীন ঘূরী।

৬০৭ হিজরীতে (১২১০-১১ খ্রি) মাহমূদ ঘূরীও নিহত হন। এরপর তাঁর পুত্র বাহাউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। খাওয়ারিযম শাহ বাহাউদ্দীনকে বন্দী করে ফেলেন। তারপর এই বংশের লোকেরা ঘূর সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব লাভ করে বটে, তবে তা শুধু নামকাওয়াস্তে। কেননা শীঘ্রই তাঁদের শাসনামলের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শীরাযের আতাবেকবৃন্দ

সালজুকী সুলতানরা জ্ঞান, শিষ্টাচার ও সদাচরণ শিক্ষার জন্য শাহ্‌যাদাদেরকে যে সমস্ত শিক্ষকের কাছে পাঠাতেন তাদেরকে আতাবেক বলা হতো। ধীরে ধীরে এই শিক্ষক বা আতাবেকবৃন্দ সাম্রাজ্যের মন্ত্রীত্ব ও শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে থাকেন। আর সালজুকী বংশ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন এই আতাবেকরা বিভিন্ন দেশে অথবা প্রদেশে নিজেদের স্বাধীন হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। এই আতাবেকদেরই অনেকগুলো বংশ সিরিয়া, ইরাক, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো ইসলামী বিশ্বে অত্যন্ত খ্যাতির অধিকারী হয়। সিরীয় আতাবেকদের সম্পর্কে আগামীতে আলোচনা করা হবে। এখানে শীরাযের আতাবেকদের সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এদের সাম্রাজ্যকে সালমারিয়া সাম্রাজ্য বলা হয় এবং এরা হচ্ছে ইরানের ইতিহাসের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

সুলতান সাঞ্জার সালজুকীর শাসনামলে মুযাফ্‌ফর উদ্দীন সুনকুর ইব্‌ন মাওদূদ সালমারী ছিলেন পারস্যের শাসনকর্তা। সুলতান সাঞ্জারের মৃত্যুর পর তিনি নিজের জন্য আতাবেক উপাধি গ্রহণ করেন এবং পারস্যের উপর স্বাধীনভাবে হুকুমত পরিচালনা করতে থাকেন। মুযাফ্‌ফর উদ্দীন ৫৫৬ হিজরীতে (১১৬১ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুযাফ্ফর উদ্দীন সুনকুরের পর তার ভাই মুযাফ্ফর উদ্দীন আতাবেক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৫৭১ হিজরীতে (১১৭৫-৭৬ খ্রি) তার মৃত্যু হলে তার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বিশ বছর সাম্রাজ্য পরিচালনার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তারপর আতাবেক সা'দ ইব্ন যঙ্গী আটাশ বছর পর্যন্ত সাম্রাজ্য পরিচালনা করে ৬২২ হিজরীতে (১২২৫ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। আতাবেক সা'দের নাম থেকেই শায়খ মুসলিহুদ্দীন সিরাযী নিজে 'সাদী' উপাধি গ্রহণ করেন।

সা'দের মৃত্যুর পর তার পুত্র আতাবেক আবূ বকর ইব্ন সা'দ যঙ্গী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁরই শাসনামলে হালাকূ খানের হাতে বাগদাদ ধ্বংস হয়। তিনি মুঘলদেরকে কর দানে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

আবূ বকরের পর তাঁর পৌত্র আতাবেক মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মোট কথা হিজরী ৬৬৩ সন (১২৬৪-৬৫ খ্রি) পর্যন্ত এই বংশ শীরায ও পারস্যের শাসনক্ষমতার অধিকারী ছিল। তবে মুঘলদেরকে তারা কর প্রদান করত। তারপর মুঘলদের পক্ষ থেকে তারা ভাইসরয় নিযুক্ত হয়ে শীরাযের শাসনকার্য পরিচালনা করত। অবশ্য যখন মুঘলদের সাম্রাজ্যে দুর্বলতার চিহ্ন ফুটে ওঠে তখন আতাবেকরা পুনরায় কিছুদিনের জন্য শীরাযে নিজেদের স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করে। তারপর শুরু হয় তাইমূরী আমল।

সীস্তানের রাজন্যবর্গ

সীস্তান দেশকে নীমরূযও বলা হয়। সুলতান সাঞ্জার সালজুকী আবুল ফযল তাজুদ্দীন নামীয় জনৈক ব্যক্তিকে এই দেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। সালজুকী সাম্রাজ্যের দুর্বলতা লক্ষ্য করে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপর তার পুত্র শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার জুলুম-অত্যাচারে সীস্তানের প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সবাই একজোট হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। তারপর এই বংশেরই তাজুদ্দীন হরব ইব্ন ইয্যুল মুল্ক নামীয় জনৈক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসানো হয়। ইনি একজন সৎ ও ধর্মপরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। তাঁর শাসনামলে খুরাসান ঘূর সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইয়ামীনুদ্দীন বাহরাম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই মুলহিদদের হাতে তিনি নিহত হন। তারপর তাঁর পুত্র নুসরাতুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অপর পুত্র রুকনুদ্দীন আপন ভাইয়ের বিরোধিতা করে নিজেই রাজসিংহাসনের দাবি করে বসেন। শেষ পর্যন্ত উভয় ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং নুসরাতুদ্দীন আপন ভাই রুকনুদ্দীনের হাতে মারা যান। তারপর তাজুদ্দীন হারবের পুত্র শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দু'বছর মুঘলদের হাতে অবরুদ্ধ থাকার পর নিহত হন এবং এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে সীস্তানের রাজন্যবর্গের শাসনামলের।

কুরত বংশের রাজন্যবর্গ

কথিত আছে যে, গিয়াসুদ্দীন ঘূরীর মন্ত্রী ইয্যুদ্দীন উমর সালজুকী বংশের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। গিয়াসুদ্দীন ঘূরী তাকে হিরাতের গভর্নর করে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তারই তত্ত্বাবধানে অনেক শাহী ইমারত ও মসজিদ নির্মিত হয়। তিনি ইয্যুদ্দীন কুরত নামে

পরিচিত ছিলেন। তারপর ৬৪৩ হিজরীতে (১২৪৫-৪৬ খ্রি) রুকনুদ্দীন কুরত হিরাতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ঘূরী সাম্রাজ্যের পতনের পর তাকে হিরাতের স্বাধীন বাদশাহ মনে করা হতো। মালিক রুকনুদ্দীন কুরতের মৃত্যুর পর শামসুদ্দীন কুরত হিরাতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এবং তাঁর পিতাও শীরাযের আতাবেকদের মত মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এ কারণে মুঘলরা তার সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি করে নি, বরং তারা তাকে 'নায়িবুস সালতানাত' হিসাবে হিরাতের শাসনকর্তা পদে বহাল রাখে।

শামসুদ্দীন কুরতের মৃত্যুর পর তার পুত্র রুকনুদ্দীন হিরাতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুঘল সম্রাট আবাকা খান তাকে 'শামসুদ্দীন কুহীন' উপাধি দান করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র শামসুদ্দীন ৭২৯ হিজরীতে (১৩২৯ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন। শামসুদ্দীনের পর তার ভাই মালিক হাফিয, তার পর অপর ভাই মুয়িযুদ্দীন হুসাইন ৭২৯ হিজরীতে হিরাতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুয়িযুদ্দীন হুসাইন ৭৭১ হিজরীতে (১৩৬৯-৭০ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তার পুত্র গিয়াসুদ্দীন বাবর আলী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার যুগে তাইমূর হিরাতে এসে পৌঁছলে তিনি তার সাথে আপন মেয়ের বিবাহ দেন।

ইরানের অপরাপর অংশেও এ ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। যেমন আতাবেকদের লুরিস্তান রাজ্য ইত্যাদি। তবে এই সমস্ত রাজ্য খুব একটা খ্যাতিলাভ করতে পারেনি।

আযারবায়জানের আতাবেকবৃন্দ

সুলতান মাসউদ সালজুকীর ঈলাকয নামীয় তুর্ক বংশীয় একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি প্রথম প্রথম অতি সাধারণ ধরনের সেবাকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে আতাবেকীর মর্যাদায় উন্নীত হন এবং সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারেও দক্ষতার পরিচয় দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় তুগ্রিলের বিধবা স্ত্রীর সাথে তাঁর বিবাহ হয় এবং তিনি আযারবায়জানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তারপর তিনি সালজুকী সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন এবং ইরানের শাসনক্ষমতাও তাঁর হাতে চলে আসে। হামাদানে যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আতাবেক পিতার স্থলে প্রধানমন্ত্রী এবং তৃতীয় তুগ্রিল (যার বয়স তখন সাত বছর ছিল)-এর মুরব্বি ও অভিভাবক নিযুক্ত হন। আতাবেক তের বছর পর্যন্ত ইরান শাসন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই কিযিল আরসালান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিযিল আরসালান তৃতীয় তুগ্রিলকে হত্যা করে নিজেই রাজমুকুট পরিধান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন ইহা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ঠিক সেদিনই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। তারপর তাঁর পুত্র আতাবেগ আবূ বকর হুকুমত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আযারবায়জানের মধ্যেই আপন সাম্রাজ্যকে সীমাবদ্ধ রেখে তা সুদৃঢ় ও সুসংগঠিত করে তোলেন এবং বেশ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে দেশ শাসন করতে থাকেন। তখন এই হুকুমতের প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু হঠাৎ করে তাঁর ভাই কুতলুগ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে কুতলুগ পরাজিত হয়ে খাওয়ারিযম শাহের নিকট পালিয়ে যান এবং তার আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সেখানে

অবস্থানকালে কুতলুগ খাওয়ারিযম শাহকে আযারবায়জান আক্রমণের জন্য প্রলুব্ধ করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠিক তখনি খাওয়ারিযম শাহের জনৈক সর্দারের হাতে কুতলুগ নিহত হন। কিছুদিন পর আতাবেগ আবূ বকরের মৃত্যু হলে তাঁর অপর ভাই আতাবেগ মুযাফ্ফর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইরাকের একটি অংশও নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি মোট পনের বছর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তারপর খাওয়ারিযম শাহ হামলা চালিয়ে আযারবায়জান দখল করে নেন।

আলামূতের ধর্মদ্রোহী সাম্রাজ্য

হাসান ইব্ন সাবাহ কোহিস্তান অঞ্চলের আলামূত, কাযভীন প্রভৃতি দুর্গ দখল করে সালজুকী সাম্রাজ্যের ঠিক যৌবনকালে সেখানে একটি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। হাসান ইব্ন সাব্বাহ এবং তার ধর্মদ্রোহী সাম্রাজ্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাসান ইব্ন সাব্বাহ্ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা অনেক কথাই বর্ণনা করেছেন। তিনি কিরূপ শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন তা নিচের একটি ঘটনা থেকে অনায়াসে অনুমান করা যেতে পারে। ঘটনাটি হলো, একদা তার দুই পুত্র কোন ব্যাপারে তার অবাধ্য হলে তিনি রাগান্বিত হয়ে তাদের প্রত্যেককে মাত্র এক একটি থাপ্পড় মারেন, যার ফলে তাদের উভয়েরই মৃত্যু হয়।

সালজুকীদের আক্রমণ এবং অবরোধ চলাকালে একবার হাসান ইব্ন সাব্বাহ্ আপন স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সতর্কতামূলক অপর একটি দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেন। কিন্তু ঐ দুর্গের হাকিমকে কড়া নির্দেশ দেন ঃ আমার স্ত্রী নিজেই সূতা কেটে তার জীবিকার ব্যবস্থা করবে। তুমি তার প্রতি কোনরূপ আতিথ্য প্রদর্শন করবে না। এ থেকে অনায়াসে বোঝা যাচ্ছে, হাসান ইব্ন সাব্বাহ শুধু নিজেই সরল জীবন যাপন করতেন না, বরং নিজের পরিবার-পরিজনকেও আরামপ্রিয়তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন।

হাসান ইব্ন সাব্বাহের মৃত্যুর পর কারাবুযুর্গ উমীদ আলামূতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান মুহাম্মাদ সালজুকীর মৃত্যু পর্যন্ত তার এবং কারা বুযুর্গ উমীদের মধ্যে যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলতে থাকে। মুহাম্মাদ সালজুকীর মৃত্যুর পর কারা বুযুর্গ উমীদ সালজুকীদের বেশ কয়েকটি দুর্গ দখল করে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। গীলানেও বার বার লুটপাট চালান।

কারা বুযুর্গ উমীদের পর তার পুত্র মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার শাসনামলে ফিদায়ীরা এখানে সেখানে রাজা-বাদশাহ এবং বিখ্যাত লোকদের হত্যা করতে শুরু করে। যখন এসব হত্যাকাণ্ড ঘন ঘন সংঘটিত হতে থাকে তখন ইরানের জনসাধারণ সুলতান সাঞ্জার সালজুকীর কাছে এর ফরিয়াদ জানায়। উলামা সমাজও এই ফিদায়ীদেরকে হত্যা করার ফতওয়া দেন। কিন্তু সুলতান সাঞ্জার ফিদায়ীদের আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাক জানার জন্য সেখানে একদল প্রতিনিধি পাঠান। দুই পক্ষের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। মুলহিদরা নিজেদেরকে নিরপরাধ প্রমাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত এই বোঝাবুঝির ব্যাপারটি কোন ফল বয়ে আনতে পারে নি। সুলতান সাঞ্জার ফিদায়ীদেরকে হত্যা করার সাধারণ নির্দেশ প্রদানে সতর্কতা অবলম্বনকেই জরুরী মনে করেন।

তিন বছর পর মুহাম্মাদ ইব্‌ন কারা বুযুর্গ উমীদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার স্থানে হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তার সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদীনীর অত্যন্ত প্রসার ঘটান। ৫৬১ হিজরীতে (১১৬৬ খ্রি) হাসানের মৃত্যু হলে তার পুত্র আলাউদ্দীন মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী আযারবায়জান থেকে রাই-এ এসে শিক্ষা প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তাঁর শিক্ষাদান মজলিসে প্রায়ই ফিদায়ীদের সমালোচনা করতেন, যাতে জনসাধারণ তাদের খপ্পরে না পড়ে। ফিদায়ীরা রাই-এ গিয়ে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীকে হত্যার হুমকি দেয়। তারা তাঁকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয় ঃ যদি তুমি আমাদের বিরূপ সমালোচনা থেকে বিরত না হও তাহলে তোমাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। তারপর ইমাম সাহেব রাই থেকে 'ঘূর'-এ গিয়াসুদ্দীন ঘূরী এবং তার ভাই শিহাবুদ্দীন ঘূরীর কাছে চলে আসেন। তারপর তিনি সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘূরীর সাথে হিন্দুস্থান সফরেও যান। তখন তিনি সুলতান শিহাবুদ্দীনের সেনাবাহিনীতে নামাযের ইমামতি করতেন। শেষ পর্যন্ত হিজরী ৬০২ সনে (১২০৫-০৬ খ্রি) সুলতান শিহাবুদ্দীন ফিদায়ীদের হাতে নিহত হলে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী খাওয়ারিযম শাহের কাছে চলে যান।

আলাউদ্দীন মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তার পুত্র জালালুদ্দীন হাসান আলামূতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তার পিতা ও পিতামহের আকাঈদ থেকে তাওবা করেন এবং একথা সমস্ত মুসলিম সুলতানকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেন। এ কারণে জালালুদ্দীন হাসান মুসলিম বিশ্বে 'নওমুসলিম' নামে খ্যাতি লাভ করেন। খলীফা নাসির আব্বাসীও জালালুদ্দীনের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ফলে যখন জালালুদ্দীন হাসানের হজ্জ করার জন্য কা'বা শরীফে যান তখন খলীফার নির্দেশে সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহের পতাকা জালালুদ্দীন হাসানের মায়ের পতাকার পিছনে রাখা হয়। এভাবে খলীফা জালালুদ্দীন হাসানের মন জয় করেন বটে, তবে সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহ তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন। আর একারণেই তিনি বাগদাদের খলীফার বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনার উদ্যোগ নেন। জালালুদ্দীন হাসানের মৃত্যুর পর তার নয় বছর বয়স্ক পুত্র আলাউদ্দীন ছিলেন প্রাপ্ত বয়স্ক, তাই তার সময়ে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নানা গোলযোগ দেখা দেয়। নাসীরুদ্দীন তূসী এই যুগেরই লোক ছিলেন। ৬৫৩ হিজরীতে (১২৫৫ খ্রি) তার মৃত্যু হয়। তারপর তার পুত্র রুকনুদ্দীন খুরশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। হালাকূ খান হামলা চালিয়ে রুকনুদ্দীন খুরশাহকে বন্দী করেন এবং তার দুর্গসমূহ ধ্বংস করে দেন। আর এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে ফিদায়ী সাম্রাজ্যের। বলা হয়ে থাকে, বর্তমান যুগে স্যার আগা খান, যাকে বোম্বে ও অন্যান্য এলাকায় বোহরা সম্প্রদায় নিজেদের পীর বলে মনে করে, এই বংশেরই সাক্ষাত উত্তর পুরুষ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মিসর ও সিরিয়ার ইসলামী ইতিহাসের পরিশিষ্ট

সালজুকী সাম্রাজ্য দুর্বল হওয়ার পর স্বয়ং সালজুকী বংশও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় এবং তারা পৃথক পৃথক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে আতাবেকদের অনেকগুলো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর এর ফলে স্বাভাবিকভাবে ইরান, খুরাসান, ইরাক, পারস্য, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরে মুসলমানদের অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই সমস্ত সাম্রাজ্যেরই একটি ছিল এশিয়া মাইনর। সালজুকী বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কূনিয়া শহরে। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাদেরকে 'রোমান সালজুকী' বলা হতো। তুর্কীদের উসমানীয় সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। অনুরূপভাবে সিরিয়ায় আতাবেকদের একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাদেরকে 'সিরীয় আতাবেক' বলা হতো।

সিরীয় আতাবেক

৫২১ হিজরীতে (১১২৭ খ্রি) আতাবেক ইমাদুদ্দীন যঙ্গী সিরিয়ায় স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইমাদুদ্দীন যঙ্গী সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ৫৪৪ হিজরীতে (১১৪৯-৫০ খ্রি) যখন ইমাদুদ্দীন যঙ্গী ইনতিকাল করেন তখন তাঁর তিনপুত্র বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন নূরুদ্দীন যঙ্গী, সাইফুদ্দীন যঙ্গী ও কুতবুদ্দীন যঙ্গী। এই তিন ভাই সিরিয়ায় পৃথক পৃথক শহরে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তবে নূরুদ্দীন যঙ্গী তাদের নেতা ও সুলতান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এশিয়া মাইনরের রোমান সালজুকরা যেমন খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধরত ছিল তেমনি সিরীয় আতাবেকরাও খ্রিস্টানদের হামলা প্রতিরোধের জন্য ছিল সদা প্রস্তুত। বিশেষ করে সুলতান নূরুদ্দীন খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হন। হলব, মুসিল ও দামেশক ছিল এই বংশের অধিকারভুক্ত। সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গী অত্যন্ত বীরপুরুষ, আল্লাহভীরু ও পুণ্য স্বভাবের লোক ছিলেন। হিজরী ৪৯০ (১০৯৭ খ্রি) সন থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস খ্রিস্টানদের দখলে ছিল এবং সেখানে তারা তাদের নিজস্ব একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের এই খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক। বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিভাবে খ্রিস্টানদের দখল থেকে মুক্ত করা যায় সুলতান নূরুদ্দীন তাঁর যাবতীয় শক্তি ও উদ্যম এই প্রচেষ্টায়ই নিয়োজিত রাখেন। কিন্তু তিনি তাঁর জীবনকালে বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করে যেতে পারেন নি।

তারপর সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এই কাজ সম্পন্ন করেন। বাগদাদের আব্বাসী খলীফা নূরুদ্দীনকে 'সুলতান' উপাধি এবং যথারীতি সিরিয়ার 'সনদে হুকুমত' প্রদান করেছিলেন। এই সুলতানেরই শাসনামলে ফিরিঙ্গীরা মিসরের উপর হস্তক্ষেপ করতে চায়। তখন সেখানকার শাসক ছিলেন উবায়দী বংশের শেষ সুলতান আদিদ। আদিদ সুলতান নূরুদ্দীনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে নূরুদ্দীন নিজ সেনাপতি শেরকূহ এবং ভাতিজা সালাহুদ্দীনকে মিসরে পাঠান। কয়েকদিন পর মিসরের উবায়দী শাসক মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানে সালাহুদ্দীনের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কিছুদিন পর সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গীও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন দামেশকের সিংহাসনে আরোহণ করেন নূরুদ্দীনের পুত্র মালিক সালিহ্। কিছুদিন পর সাইফুদ্দীন ইবন কুত্‌বুদ্দীন মুসিলে পৃথক হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে সিরিয়ার উপরও সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীরই দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। সালাহুদ্দীন আইয়ূবী সুলতান নূরুদ্দীনের বংশধরদের সাথে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং হালাকু খানের হামলা পর্যন্ত সিরিয়ার শাসনক্ষমতা এদের হাতে থাকে। তবে তা ছিল একেবারে নামকা ওয়াস্তে। প্রকৃতপক্ষে সুলতান নূরুদ্দীনের পর হুকুমত ও সালতানাত সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে।

মিসর ও সিরিয়ায় আইয়ূবী সাম্রাজ্য

নাজমুদ্দীন আইয়ূব জাতিগতভাবে ছিলেন কুর্দী। তিনি ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর সেনাবাহিনীতে অধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নাজমুদ্দীন আইয়ূবের পুত্র সালাহুদ্দীনকে ইমাদুদ্দীন যঙ্গী অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সালাহুদ্দীনের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন। ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর মৃত্যুর পর সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গী নাজমুদ্দীন আইয়ূবকে দামেশকের দুর্গাধিপতি ও কোতোয়াল নিযুক্ত করেন এবং তার পুত্র সালাহুদ্দীনকে নিযুক্ত করেন তারই সহকারী। নাজমুদ্দীন আইয়ূবের মৃত্যুর পর নূরুদ্দীন যঙ্গী তার ভাই শেরকূহকে নিজ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন এবং সালাহুদ্দীনকে দামেশকের দুর্গাধিপতি রাখেন। আদিদ উবায়দীর প্রার্থনা অনুযায়ী যখন মিসরের দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয় তখন শেরকূহের সাথে নূরুদ্দীন তার ভাতিজা সালাহুদ্দীনকেও প্রেরণ করেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ৫৬৭ হিজরীতে (১১৭১-৭২ খ্রি) সালাহুদ্দীন ইব্‌ন নাজমুদ্দীন আইয়ূব, আদিদ উবায়দীর পর মিসরের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হন। ৫৬৯ হিজরীতে (১১৭৩-৭৪ খ্রি) যখন সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গীর মৃত্যু হয় তখন কাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হবে সে ব্যাপারে সেখানকার রাজকীয় কর্মকর্তা ও সভাসদদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। সালাহুদ্দীন তখন মিসর থেকে দামেশকে এসে সুলতান নূরুদ্দীনের পুত্র মালিক সালিহ্‌কে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং সেই দিন থেকে সিরিয়ার সালতানাতও সুলতান সালাহুদ্দীনের অধিকারে চলে আসে। ঐ বছর ইয়ামান এবং হিজাযেও সুলতান সালাহুদ্দীনের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এটা ছিল ইসলামী বিশ্বের জন্য একটি দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত। কেননা ইউরোপের খ্রিস্টানরা তখন সম্মিলিতভাবে সিরিয়া ও মিসরের উপর হামলা চালায়। এই হামলা প্রতিরোধে

সালাহুদ্দীন পাহাড়ের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অপর দিকে আলামূতের মুলহিদ তথা ফিদায়ীরা, যারা গুপ্তভাবে হামলা চালাত এবং বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করাকে পুণ্যের কাজ বলে মনে করত—একটি বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে রেখেছিল। এই ফিদায়ীদের কারণে জনসাধারণ ছিল অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত। এই জালিমরা সুলতান সালাহুদ্দীনকেও হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহর অসীম কৃপায় তিনি রক্ষা পান।

শেষ পর্যন্ত মুসলিম সর্দাররা সর্বসম্মতিক্রমে সালাহুদ্দীনকে সিরিয়ার বাদশাহ বলে স্বীকার করে নেয়। এবার সুলতান সালাহুদ্দীন ঈসায়ীদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত করার চেষ্টা শুরু করেন। ৫৮৩ হিজরীতে (১১৮৭ খ্রি) একটি বিরাট যুদ্ধের পর সুলতান সালাহুদ্দীন বায়তুল মুকাদ্দাসের খ্রিস্টান সম্রাটকে যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী করে ফেলেন। তারপর সুলতানের বিরুদ্ধে আর কখনো যুদ্ধ করবেন না— এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাকে মুক্ত করে দেন। তারপর সুলতান সালাহুদ্দীন আক্কা এবং ৫৮৮ হিজরীতে (১১৯২ খ্রি) বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেন। ৪৯০ হিজরী (১০৯৭ খ্রি) থেকে ৫৮৮ হিজরী (১১৯২ খ্রি) পর্যন্ত প্রায় ৯৮ বছর বায়তুল মুকাদ্দাস ঈসায়ীদের দখলে থাকে। খ্রিস্টানরা যখন মুসলমানদের কাছ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেছিল তখন মুসলমানদের রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছিল বায়তুল মুকাদ্দাস এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইয়ূবী যখন খ্রিস্টানদের কাছ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করলেন তখন সেখানকার খ্রিস্টান বাসিন্দাদের কোন ক্ষতিই করলেন না। বায়তুল মুকাদ্দাস খ্রিস্টানদের হাতছাড়া হয়ে গেছে শুনে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে অত্যন্ত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুনরায় ঘরে ঘরে যুদ্ধ প্রস্তুতি চলতে থাকে এবং ফ্রান্সের সম্রাট ফিলিপ, বৃটেনের সম্রাট রিচার্ড, জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা-মহারাজা সমগ্র এশিয়া মহাদেশ জয় করে সেখান থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হয়। খ্রিস্টান বাহিনীর এই তরঙ্গায়িত জনসমুদ্র এমনি জাঁকজমকের সাথে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয় যে, তা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন এশিয়া মহাদেশ একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সুলতান সালাহুদ্দীন একাধারে চার বছর কয়েকশত লড়াই লড়ে খ্রিস্টানদের এই বিরাট বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান সম্রাটরা বায়তুল মুকাদ্দাসের ধারেকাছেও যেতে পারেন নি বরং লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যান। এতদসত্ত্বেও সুলতান সালাহুদ্দীন খ্রিস্টানদের জন্য এই বিশেষ সুবিধা প্রদান করেন যে, শুধু যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাদ্দাসে আসলে তাদেরকে কোনরূপ বাধা প্রদান করা হবে না।

উল্লিখিত যুদ্ধসমূহে সালাহুদ্দীন খ্রিস্টানদের সাথে যে ভদ্রজনোচিত ও মানবিক আচরণ করেন এবং যে অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দেন তাতে খ্রিস্টানরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়ে এবং এরই ফলশ্রুতিতে আজ পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ সুলতান সালাহুদ্দীনকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে স্মরণ করে থাকে। ৫৮৯ হিজরীতে (১১৯৩ খ্রি) সুলতান সালাহুদ্দীন ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁর ঐকান্তিক তাক্ওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির কারণে মুসলিম বিশ্বে আল্লাহর অন্যতম ওলী হিসাবে পরিচিত হয়ে আছেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উসমান ওরফে 'আল-মালিকুল আযীয' সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছয় বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে সাম্রাজ্য পরিচালনা করে ৫৯৫ হিজরীতে (১১৯৯ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তাঁর পুত্র মালিক মানসূর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এক বছর পরই তিনি পদচ্যুত হন। তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেন সুলতান সালাহুদ্দীনর ভাই মালিক আদিল। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান ও সুযোগ্য সুলতান ছিলেন। তিনি ৬১৫ হিজরীতে (১২১৮ খ্রি) ইনতিকাল করেন। তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র মালিক কামিল। তিনিও অত্যন্ত পুণ্যবান বাদশাহ ছিলেন। ৬৩৫ হিজরীতে (১২৩৭ খ্রি) তিনি ইনতিকাল করেন। তারপর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তাঁর পুত্র মালিক আদিল আবূ বকর। কিন্তু দু'বছর পর মিসরের আমীর-উমারা তাকে বন্দী করে তার ভাই মালিক সালিহ্ ইব্ন মালিককে মিসরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। দশ বছর সাম্রাজ্য পরিচালনার পর খ্রিস্টানদের সাথে একটি যুদ্ধে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। তারপর ৬৪৭ হিজরীতে (১২৪৯ খ্রি) মালিক মুয়ায্যম তূরান শাহ ইব্ন মালিক সালিহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কয়েক মাস হুকুমত করার পর তিনি নিহত হন। তারপর ৬৪৮ হিজরীতে (১২৫০ খ্রি) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন মালিক আশরাফ। কিন্তু ৬৫২ হিজরীতে (১২৫৪ খ্রি) এই বংশেরই দাসরা তাঁকে পদচ্যুত করে। আর এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে কুর্দী আইয়ূবী বংশের শাসনামলের।

সুলতান সালাহুদ্দীন তাঁর সমগ্র শাসনামল সিরিয়া সাম্রাজ্য, দামেশক নগরী অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্তরা মিসরকেই তাদের রাজধানী করে নেয়। ফলে তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়লে সিরিয়া সাম্রাজ্য আইয়ূবীদের অধিকার থেকে চলে যায় এবং আইয়ূবীরা শুধু মিসরের উপরই দখলদার থাকে। এই সাম্রাজ্যের শেষ সুলতানরা এই কূটকৌশল অবলম্বন করেছিলেন যে, তারা খারজিয়া ও আর্মেনিয়া থেকে অনবরত দাস খরিদ করে এনে তাদের দ্বারা একটি বিরাট বাহিনী গড়ে তোলেন। উদ্দেশ্য ছিল, এদেরই কারণে, কোন অধিনায়ক ভবিষ্যতে যেন বিদ্রোহ করার দুঃসাহস না পান আর করলেও এই দাসবাহিনী দ্বারা যেন তাদেরকে দমন করা সম্ভব হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই দাসরা, যাদেরকে মামলুক বলা হতো, এতই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত মিসর সাম্রাজ্য তাদেরই করতলগত হয়ে পড়ে।

মিসরের মামলূক সাম্রাজ্য ঃ প্রথম স্তর

যখন আইয়ূবী বংশের পতন দেখা দেয় এবং দাসদের হাতে সাম্রাজ্যের যাবতীয় শাসন ক্ষমতা চলে আসে তখন তারা নিজেদেরই মধ্য থেকে মালিক মুয়িয্য আযীযুদ্দীন আইবেক নামীয় জনৈক ব্যক্তিকে বাদশাহ নির্বাচিত করে। মালিক মুয়িয্য মালিকা শাজারাতুত দূর-এর সাথে, যিনি সালিহ্ আইয়ূবীর দাসী ছিলেন এবং কয়েকমাস শাসনক্ষমতায়ও অধিষ্ঠিত ছিলেন, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু হিজরী ৬৫৫ সনে (১২৫৭ খ্রি) মালিক মুয়িয্য নিহত হন।

তারপর সাম্রাজ্যের উমারাবৃন্দ মালিক মুয়িয্যের পুত্র মালিক মানসূরকে বাদশাহ নির্বাচিত করে। তিনি দু'বছর পর ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তার স্থলে মালিক মুযাফ্ফরকে বাদশাহ

নির্বাচিত করা হয়। তিনি প্রায় এগারো মাস শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারই শাসনামলে হালাকূ খানের বাহিনী মিসরের উপর হামলা চালায়, কিন্তু মিসরীয় বাহিনীর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। মালিক মুযাফ্ফরকে হত্যা করে ৬৫৮ হিজরীতে (১২৬০ খ্রি) মালিক আযযাহির রুকনুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সতেরো বছর পর্যন্ত অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সাম্রাজ্য শাসন করেন। ৬৭৬ হিজরীতে (১২৭৭-৭৮ খ্রি) তাঁর মৃত্যু হলে মালিক সাঈদ নাসীরুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। এক বছর পর তাকেও পদচ্যুত করা হয়। তারপর মালিক আদিল বদরুদ্দীনকে সিংহাসনে বসানো হয়। কিন্তু মাত্র চার মাস পর তিনি পদচ্যুত হন। এভাবে ৬৭৮ হিজরীতে (১২৭৯-৮০ খ্রি) মিসরের মামলূক সাম্রাজ্যের প্রথম স্তরের শাসনকালের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাদের শাসনকাল ছিল সর্বমোট ২৬ বছর। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য এই সংক্ষিপ্ত সময়কালও উল্লেখযোগ্য। প্রথমত তারা নির্বাচন পদ্ধতি চালু করে। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তারা তাদের বাদশাহ্ নির্বাচন করত। দ্বিতীয়ত তারাই ঐ সমস্ত মুঘলকে, যারা সমগ্র সভ্য দুনিয়াকে তছনছ করে দিয়েছিল, বার বার পরাজিত করে মিসর থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারা যুদ্ধে পরাজিত মুঘল বাহিনীর অনেক লোককে বন্দী করে এনে নিজেদের দাসে পরিণত করে এবং ওরাই আইয়ূবী দাস নামে পরিচিত হয়।

মামলূক সাম্রাজ্য ঃ দ্বিতীয় স্তর বা কালাউনী সাম্রাজ্য

মালিক আদিল বদরুদ্দীনের পর আবুল মাআনী মালিক মানসূর কালাউন মিসরের বাদশাহ নির্বাচিত হন। কিন্তু তারপর যেহেতু তারই বংশধরদেরকে জনসাধারণ মিসরের বাদশাহ পদে নির্বাচিত করতে থাকে তাই তাকে এই মামলূকদের দ্বিতীয় স্তরের প্রথম বাদশাহ মনে করা হয়। তিনি ৬৭৮ হিজরী (১২৭৯ খ্রি) থেকে ৬৮৯ হিজরী (১২৯০ খ্রি) পর্যন্ত মোট এগারো বছর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সময়ে মিসর সাম্রাজ্যের আয়তন কিছুটা বৃদ্ধি পায়। তারপর মালিক আশরাফ সালাহুদ্দীন খলীল সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি নিজে থেকে সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। জনসাধারণ তাঁকে জবরদস্তিমূলকভাবে পুনরায় সিংহাসনে বসায়। তারপর চুয়াল্লিশ বছর হুকুমত পরিচালনার পর তিনি ৭৩৭ হিজরীতে (১৩৩৬-৩৭ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর বাদশাহ হিসাবে নির্বাচিত হন মালিক আদিল কুতবুঘা মানসূরী। কিন্তু তিনি এক মাসও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেন নি। তারপর মালিক মানসূর হিশামুদ্দীনকে বাদশাহ নির্বাচিত করা হয়। দু'বছর পর তিনিও নিহত হন। তারপর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন নাসির মুহাম্মাদ ইব্ন কালাউন। নাসিরের পর মালিক মুযাফ্ফর রুকনুদ্দীন এক বছরের জন্য বাদশাহ নির্বাচিত হন। তারপর ৭৪১ হিজরীতে (১৩৪০-৪১ খ্রি) মালিক মানসূর আবূ বকরকে বাদশাহ নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু মাত্র দু'মাস পর তাকে নির্বাসন দেওযা হয়। তারপর মালিক আশরাফ বাদশাহ নির্বাচিত হন। কিন্তু আটমাস পর তাকেও নির্বাসন দেওয়া হয়। তারপর ৭৪২ হিজরীতে (১৩৪১-৪২ খ্রি) মালিক নাসির আহমদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৭৪৫ হিজরীতে (১৩৪৪-৪৫ খ্রি) তিনি নিহত হলে আবুল ফিদা মালিক সালিহ্

ইসমাঈল বাদশাহ নির্বাচিত হন। তিনি মাত্র এক বছর ক্ষমতায় ছিলেন। ইনিই হচ্ছেন সেই আবুল ফিদা, যিনি 'তারীখ-ই-আবুল ফিদা' নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের লেখক। তাঁর এই গ্রন্থটি একটি অতি প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। ৭৪৬ হিজরীতে (১৩৪৫-৪৬ খ্রি) মালিক কামিল শাবানী সিংহাসনে আরোহণ করে মাত্র কয়েক মাস পর পদচ্যুত হন। ৭৪৭ হিজরীতে (১৩৪৬-৪৭ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন মালিক মুযাফ্ফর হাজী। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাঁকে হত্যা করা হয়। ৭৪৮ হিজরীতে (১৩৪৭-৪৮ খ্রি) নাসির হাসান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রায় চৌদ্দ বছর ক্ষমতায় থাকার পর শেষ পযন্ত তিনিও নিহত হন। তারপর ৭৬২ হিজরীতে (১৩৬১ খ্রি) বাদশাহ নির্বাচিত হন মালিক সালিহ্। ৭৬৫ হিজরীতে (১৩৬৩-৬৪ খ্রি) তাঁকে পদচ্যুত করে তার স্থলে মানসূর ইব্ন হাজীকে বাদশাহ নির্বাচন করা হয়। দু'বছর পর তিনিও পদচ্যুত হন। তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেন মালিক আশরাফ শাবান। এগারো বছর পর তিনি নিহত হন এবং তাঁর স্থলে ৭৭৮ হিজরীতে (১৩৭৬-৭৭ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন মালিক মানসূর আলী। পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ৭৮৩ হিজরীতে (১৩৮১ খ্রি) বাদশাহ নির্বাচিত হন সালিহ্ হাজী। আট-নয় বছর পর তিনি নিজে থেকেই সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে কালাউনী সাম্রাজ্যের। এই সাম্রাজ্য আনুমানিক ১১৪ বছর পর্যন্ত টিকেছিল। হুকুমত ও সালতানাতের ক্ষেত্রে এই স্তর এবং প্রথম স্তরের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

মিসরের মামলূক সাম্রাজ্য ঃ তৃতীয় স্তর বা চারকাসী সাম্রাজ্য

মালিক সালিহ্ হাজীর পর মালিক তাহির বারকুক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন চারকাস গোত্রের লোক এবং আইয়ূবী দাসদের অন্যতম। যেহেতু পরবর্তী সময়ে এই গোত্রেরই লোক মিসরের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাই মালিক তাহির বারকুককে আইয়ূবী মামলূক সাম্রাজ্যের তৃতীয় স্তরের বাদশাহ মনে করা হয়। তিনি ৭৯২ হিজরী (১৩৯০ খ্রি) থেকে ৮০১ হিজরী (১৩৯৮-৯৯ খ্রি) পর্যন্ত নয় বছর মিসরীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তারপর মালিক নাসির সিংহাসনে আরোহণ করে চার বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তারই শাসনামলে তাইমূর মিসরে সৈন্য সমাবেশ ঘটায়, কিন্তু মামলূক সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি করতে পারে নি। এই মালিক নাসিরই খানায়ে কাবায় হানাফী, নাফিঈ, মালিকী, হাম্বলী– এই চারটি মুসাল্লা স্থাপন করেন। প্রথম প্রথম উলামায়ে ইসলাম তাঁর এই কাজকে বিদআত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এটাকে নিয়ে আর খুব একটা উচ্চবাচ্য করা হয়নি। কেননা এর দ্বারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন ফিতনা বা ঝগড়াঝাটির সৃষ্টি হয়নি। তারপর যথাক্রমে মালিক মানসূর, আবুন্নাস্‌র শায়খ, মালিক মুযাফ্ফর আহমদ, মালিক আয-যাহির আবুল ফাত্‌হ এবং মালিক সালিহ্ মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মালিক সালিহ্ ৮২২ হিজরীতে (১৪১৯ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করে মাত্র চার মাস পর স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। তারপর মালিক আশরাফ আবূ নাস্‌রকে বাদশাহ মনোনীত করা হয়। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও আল্লাহ্‌ভীরু ছিলেন। কুরআন মজীদের প্রতি ছিল তাঁর অত্যন্ত

আসক্তি। বেশির ভাগ সময়ই তিনি কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি ৮৪১ হিজরী (১৪৩৭-৩৮ খ্রি) পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আবুল মাহাসিন আবদুল আযীয সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তিন মাস যেতে না যেতেই তিনি পদচ্যুত হন। তারপর মালিক আবূ সাঈদ ওরফে মালিক আয-যাহির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং পনেরো বছর সাম্রাজ্য শাসনের পর ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন গরীবের বন্ধু এবং অত্যন্ত পুণ্যবান বাদশাহ। তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেন মালিক মানসূর উসমান। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস পর ৮৫৭ হিজরীতে (১৪৫৩ খ্রি) তিনি পদচ্যুত হন।

তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেন মালিক আশরাফ আবূ নাস্র। তিনি ৮৬৫ হিজরী (১৪৬০-৬১ খ্রি) পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন মালিক মুয়াইয়িদ আহমদ কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। এরপর মালিক যাহির আবূ সাঈদ খোশকদম ৮৬৫ হিজরী (১৪৬০ খ্রি) থেকে ৮৯৩ হিজরী (১৪৮৭-৮৮ খ্রি) পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। তারপর মালিক যাহির আবূ সাঈদ মিলাইয়ায়ী সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কয়েকমাস পরই নির্বাসিত হন। তারপর মালিক যাহির আবূ সাঈদ তামরীমা সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই তাঁকে বন্দী করা হয়। তারপর মালিক আশরাফ আবূ নাস্রকে বাদশাহ মনোনীত করা হয়। তিনি ৯০২ হিজরী (১৪৯৬-৯৭ খ্রি) পর্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। তারপর মালিক আবুস-সা'দাত সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আড়াই বছর হুকুমত পরিচালনার পর নিহত হন। এরপর ৯০৪ হিজরীতে (১৪৯৮-৯৯ খ্রি) মালিক আশরাফ কালযূহ সিংহাসনে আরোহণ করে মাত্র এগারো দিন পর নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর মালিক যাহির আবূ সাঈদ কালযূহ ৯০৬ হিজরী (১৫০০-০১ খ্রি) পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর মালিক আদিল ৯০৭ হিজরীতে (১৫০১-০২ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং চার মাস পর নিহত হন। তারপর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন মালিক আশরাফ আবূ নাস্র কালযূহ। তিনি ৯২২ হিজরী (১৫১৬ খ্রি) পর্যন্ত পনেরো বছর সাম্রাজ্য শাসন করেন।

সুলতান সালীম উসমানী (প্রথম) ৯২২ হিজরীতে (১৫১৬ খ্রি) মিসর আক্রমণ করেন এবং মালিক আশরাফ তুখনেকে, যিনি ঐ বছরই হিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, পরাজিত করে চারকাসী সাম্রাজ্যের ইতি টানেন এবং মিসর উসমানী হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই সাথে আব্বাসীয় খিলাফতের সেই ধারাও, যা শুধু নামকা ওয়াস্তে মিসরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, রুদ্ধ হয়ে যায়। আইয়ূবী মামলূকী শাসনের এই তৃতীয় স্তর যা চারকাসী সাম্রাজ্য নামে খ্যাত, মোট একশ' ত্রিশ বছর অব্যাহত ছিল। আইয়ূবী বংশের পর মিসরে মামলূকদের তিন স্তরের শাসনকাল ছিল মোট দুশ' সত্তর বছর। এই মামলূকদের প্রারম্ভিক যুগে হালাকূ খান বাগদাদ ধ্বংস করে সেখানকার আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। কিন্তু কিছুদিন পর, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, এই মামলূকদের মাধ্যমে মিসরে আব্বাসীয় খিলাফতের একটি নতুন ধারার সূচনা হয় এবং তা মামলূকদের পতন তথা ৯২২ হিজরী (১৫১৬ খ্রি) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবশ্য মিসরে আব্বাসীয় খলীফাদের চাইতে বেশি কিছু ছিল না। কিন্তু যেহেতু সমগ্র

মুসলিম বিশ্বে আব্বাসীয় খলীফাদের ধর্মীয় মর্যাদা ছিল সর্বজনস্বীকৃত এবং তাদেরকে 'মাযহাবী ইমাম' মনে করা হতো, তাই তাদের অস্তিত্ব মামলূকদের জন্যও ছিল উপকারী। কেননা এই অবস্থায় সমগ্র মুসলিম সুলতান মামলূকদেরকে আব্বাসীয় খলীফাদের খাদিম মনে করার কারণে তাদের বিরোধিতা করার সাহস পেত না। অপরদিকে আব্বাসীয় খলীফাদের জন্যও মামলূকদের অস্তিত্ব ছিল বেশ মূল্যবান। কেননা তাঁরা মামলূকদের সাম্রাজ্যে অত্যন্ত আয়েশ-আরামের সাথে কালাতিপাত করছিলেন।

মিসরের খলীফাদের সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করা হলো। নিচে তাঁদের একটি তালিকাও পেশ করা হচ্ছে, যাতে মিসরের কোন বাদশাহের যুগে কোন আব্বাসীয় খলীফা সেখানে বিদ্যমান ছিলেন তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। প্রসঙ্গত একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মিসরে এক বাদশাহের পর অপর বাদশাহকে যেমন আব্বাসীয় খলীফাদের কাছ থেকে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সনদ লাভ করতে হতো তেমনি এক খলীফার মৃত্যুর পর যখন অপর খলীফা সিংহাসনে আরোহণ করতেন তখন তাঁকেও মিসরের বাদশাহর অনুমোদন নিতে হতো। কেননা এক্ষেত্রে বাদশাহ বেশ কিছুটা ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রাখতেন। এতদসত্ত্বেও কখনো কখনো আব্বাসীয় খলীফারা এমনি গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে যেতেন যে, মিসরের বাদশাহ তাঁর বিরোধিতা করার সাহস পেতেন না। মিসরের খলীফা ও বাদশাহের মধ্যে কখনো কখনো অসন্তোষেরও সৃষ্টি হতো। খলীফারা সাধারণ মুসলমানের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জনকে যেমন নিজেদের গৌরবের বিষয় বলে মনে করতেন, তেমনি বাদশাহরাও রাজকীয় ক্ষমতা ও পরাক্রমকে মনে করতেন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দলীল। শেষ পর্যন্ত সালীম উসমানী খিলাফত ও সালতানাতকে নিজের মধ্যে একত্রিত করে উপরোক্ত দু'মুখী মানসিকতা সৃষ্টির পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেন। ফলে পৌনে তিনশ' বছর ধরে একজন পীর বা গদ্দীনশীন হিসাবে খলীফা-ই-ইসলামের যে মর্যাদা ছিল তা পরিবর্তিত হয়ে শাহানশাহী রূপ ধারণ করে।

মিসরের আব্বাসী খলীফাবৃন্দ

ক্রমিক নং	খলীফার নাম	যে সনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন	
১	মুসতানসির বিল্লাহ ইব্ন যাহির বি-আমরিল্লাহ্ ইব্ন নাসির লি দী-নিল্লাহ	হিজরী	৬৫৯ সন (১২৬১ খ্রি)
২	হাকিম বিআমরিল্লাহ্ ইব্ন মুসতারশিদ বিল্লাহ্	"	৬৬০ (১২৬২ খ্রি)
৩	মুসতাকফী বিল্লাহ ইব্ন হাকিম বি আমরিল্লাহ্	"	৭০১ (১৩০১-০২ খ্রি)
৪	ওয়াছিক বিল্লাহ	"	৭০২ (১৩০২-০৩ খ্রি)
৫	হাকিম বিআমরিল্লাহ্ ইব্ন মুসতাকফী বিল্লাহ্	"	৭৪২ (১৩৪২-৪৩ খ্রি)
৬	মুসতানসির বিল্লাহ	"	৭৫৩ (১৩৫২ খ্রি)
৭	মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্	"	৭৬২ (১৩৬১ খ্রি)

৮	মুতাসিম বিল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইবরাহীম	"	৭৭৮ (১৩৭৬-৭৭ খ্রি)
৯	মুসতাঈন বিল্লাহ	"	৮০৮ (১৪০৫-০৬ খ্রি)
১০	মু'তাদিদ বিল্লাহ	"	৮১৫ (১৪১২-১৩ খ্রি)
১১	মুসতাকফী বিল্লাহ	"	৮৪৫ (১৪৪১-৪২ খ্রি)
১২	কাসিম বি আমরিল্লাহ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল	"	৮৫৮ (১৪৫৪ খ্রি)
১৩	মুসতায়িদ বিল্লাহ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল	"	৮৫৮ (১৪৫৪ খ্রি)
১৪	মুতাওয়াক্কিল আলী ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন মুতাওয়াক্কিল	"	৮৭২ (১৪৬৭-৬৮ খ্রি)
১৫	মুসতাসির বিল্লাহ	"	৯০৩ (১৪৯৭-৯৮ খ্রি)

সুলতান সালীম উসমানী যখন মিসর জয় করেন তখন খলীফা মুসতাসির যষ্টি, চাদর এবং অন্যান্য যেসব তবাররূক খিলাফতের নিদর্শন স্বরূপ তার হাতে ছিল তার সব কিছুই সুলতান সালীমের কাছে অর্পণ করেন এবং নিজেও তার হাতে খিলাফতের বায়আত নেন। সুলতান সালীম উসমানী মুসতাসিরকে নিজের সঙ্গে করে কনসটান্টিনোপলে নিয়ে যান এবং সেখানেই মুসতাসিরের মৃত্যু হয়।

উনবিংশ অধ্যায়

উসমানীয় সাম্রাজ্য

উপরের অধ্যায়ে আমরা হিজরী দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে পৌঁছে গিয়েছিলাম। বিষয়বস্তুর ক্রমধারা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আমরা পুনরায় এশিয়া মাইনরের প্রান্তরসমূহে এবং হিজরী সপ্তম শতাব্দীর সেই প্রারম্ভিক যুগে ফিরে আসতে চাই, যখন উসমানীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছিল। উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রথম তিনশ' বছরের ইতিহাস বর্ণনা করার পর অর্থাৎ হিজরী দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে পৌঁছে খুব সম্ভবত আমাদেরকে পুনরায় পিছনে ফিরে আসতে হবে, যাতে তাইমূর এবং ইরানের সাফাভী বংশের ইতিহাস শেষ করে পুনরায় হিজরী দশম শতাব্দীতে প্রবেশ করতে পারি। উসমানীয় সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট তিনশ' বছরের ইতিহাস পরবর্তী কোন এক অধ্যায়ে শেষ করার প্রতিশ্রুতি রইল।

লুটপাটকারী তুর্কী সম্প্রদায়সমূহ, যারা 'গায বা গাযানের তুর্ক' নামে পরিচিত, একদা খুরাসান ও ইরানে প্রবেশ করে সালজুকী সাম্রাজ্যের সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির উপর আঘাত হানে। এই তুর্কীদের দস্যুপনার কথা চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ থেকে শুরু করে মরক্কো পর্যন্ত সব দেশের ইতিহাসেই বর্ণিত হয়েছে। ওরা সুলতান সাঞ্জার সালজুকীকে বন্দী করে নিজেদের সম্পর্কে জনসাধারণের মনে দারুণ আতংকের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু যখন চেঙ্গিষ খানের আবির্ভাব হয় তখন ওদের বলবিক্রম অনেকাংশে হ্রাস পেয়ে যায়। আর চেঙ্গিষ খান যখন রক্ত বন্যা বহাতে শুরু করে তখন তো ওদের পরাক্রমের কথা সবাই বিস্মৃতই হয়ে যায়। এই সমস্ত লোক প্রথম থেকেই বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। যখন তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে তখন তারা আরো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের কোন কোন গোত্র মিসরের দিকে গিয়ে সেখানকার সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়। কোন কোন গোত্র সিরিয়ায় এবং কোন কোন গোত্র আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। যেহেতু তাদের মধ্যে কোন পরাক্রমশালী সম্রাটের আবির্ভাব হয় নি, তাই এই সমস্ত লোকের অবস্থা ইতিহাস গ্রন্থাদিতে যথাযথভাবে স্থান পায় নি। তবে তারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিজয়ীর বেশে খুরাসান ও ইরানে অবস্থান করার কারণে তাদের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষ অবশ্যই ঘটেছিল। তাদের প্রত্যেকটি গোত্র ও পরিবার ছিল বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার প্রতীক। বিজেতা ও শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করা সত্ত্বেও তারা তাদের পশুপালের কথা বিস্মৃত হয়ে যায় নি। তাই চেঙ্গিয খানের আবির্ভাব ঘটলে তাদের কিছু লোক চেঙ্গিষ খানের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয় এবং বেশির ভাগ লোক খুরাসান, ইরান এবং অন্যান্য দেশের সবুজ-শ্যামল বন-জঙ্গল ও চারণ ভূমিতে বসবাস করতে থাকে। তাদেরই একটি গোত্র খুরাসানে বসতি স্থাপন করেছিল।

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভে, যখন চেঙ্গিযী মুঘলরা খুরাসান আক্রমণ করতে শুরু করে তখন গায তুর্কদের ঐ সমস্ত লোক, যারা খুরাসানে বসতি স্থাপন করেছিল, খুরাসান ছেড়ে আর্মেনিয়া অঞ্চলে চলে যায় এবং বিশ-পঁচিশ বছর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। ঐ গোত্রের নেতার নাম ছিল সুলায়মান খান। সুলায়মান খানের সঙ্গী-সাথীরা ছিল সালজুকীদের মতই খাঁটি মুসলমান। সুলায়মান খানের যোগ্যতা লক্ষ্য করে আর্মেনিয়ায় অবস্থানকারী গায তুর্কদের ঐ সমস্ত লোকও তার চারপাশে একত্রিত হতে থাকে, যারা এতদিন বিভ্রান্তের মত এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছিল। এভাবে দিনের পর দিন তাদের দল ভারী হতে থাকে। এটা ছিল ঐ যুগ, যখন চেঙ্গিয খানের দস্যুপনার কারণে বিভিন্ন দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের সহায়-সম্পদ রক্ষার জন্য নিজেরই বাহুবলের উপর নির্ভর করতে হচ্ছিল। তখন অত্যাসন্ন বিপদ-আপদের মুকাবিলা করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকা প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য ছিল অপরিহার্য। তাই সুলায়মানের লোকেরা যারা আর্মেনিয়ার পাহাড়সমূহে অবস্থান করছিল, নিজেদের শক্তি ও প্রভাব সমুন্নত রাখার প্রতি ছিল যত্নশীল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আর্মেনিয়ায় অবস্থানকালীন সময়ে, যখন চারদিকে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল, সুলায়মান খান সুষ্ঠুভাবে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং আপন জনগোষ্ঠী যাতে বিনা প্রয়োজনে কোনরূপ ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। খাওয়ারিযম সাম্রাজ্যের পতন সুলায়মান খানের সামনে আর একটি সুন্দর সুযোগ এনে দেয়। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা ও প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধ-সামগ্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম হন।

চেঙ্গিয খান তার মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে ৬২১ হিজরীতে (১২২৪ খ্রি) সালজুকীদের একটি বিরাট বাহিনী ঐ সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন, যার রাজধানী ছিল কূনিয়া। কূনিয়ার শাসনক্ষমতার অধিকারী ছিলেন আলাউদ্দীন কায়কুবাদ সালজুকী। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এই সালজুকী রাষ্ট্রের শাসক তথা রোমান সালজুকীদেরকে সর্বদা রোমান খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকতে হতো। কালের পরিক্রমায় এই সাম্রাজ্য অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুলায়মান খানের কাছে এই সংবাদ পৌঁছল যে, মোঙ্গলরা আলাউদ্দীন কায়কুবাদের উপর হামলা চালিয়েছে তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। কেননা কূনিয়ার সুলতান ছিলেন মুসলমান, আর মোঙ্গলরা ছিল কাফির। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল এবং মোঙ্গলরা মুসলিম বিশ্বকে ইতিমধ্যে ধ্বংস করে ফেলেছিল। সুলায়মান খান আলাউদ্দীন কায়কুবাদকে সাহায্য প্রদান এবং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাকে শাহাদাত লাভের শ্রেষ্ঠ সুযোগ মনে করে আপন গোত্রকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন। সুলায়মান খানের এই বাহিনীর সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি, তবে সুলায়মান খান এই বাহিনীর যে অংশটিকে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে আপন পুত্র আর তুগ্রিলের নেতৃত্বে রওয়ানা করেছিলেন তার সংখ্যা ছিল চারশ চুয়াল্লিশ। দুনিয়ার বড় বড় এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো যেমন প্রায় ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে ঘটে থাকে, তেমনি সুলায়মান খানের এই ঘটনাও আকস্মিক ঘটেছিল। এদিকে আর্মেনিয়ার দিক থেকে যখন এই মুজাহিদ বাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল ঠিক তখন মোঙ্গল

বাহিনী আলাউদ্দীন কায়কুবাদ সালজুকীর বাহিনীর একেবারে সম্মুখে গিয়ে পৌঁছেছিল। যখন সালজুক বাহিনী ও মোঙ্গল বাহিনীর মধ্যে জোর লড়াই চলছিল এবং মোঙ্গলরা অতি শীঘ্রই আলাউদ্দীনের বাহিনীকে পরাস্ত করতে চাচ্ছিল ঠিক তখন সুলায়মানের পুত্র আর তুগ্রিল আপন বাহিনীসহ সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। তিনি দেখতে পান, দু'টি বাহিনী যুদ্ধরত রয়েছে এবং মনে হচ্ছে এক বাহিনী অতি শীঘ্রই পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে। আর তুগ্রিল জানতেন না, এই দুই পক্ষের যোদ্ধারা কারা, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ মনস্থির করেন যে, তিনি দুর্বল পক্ষকেই সমর্থন করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপন চারশ চুয়াল্লিশ জন সঙ্গী নিয়ে দুর্বল পক্ষের দিক থেকে সবল পক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এত দৃঢ়তা ও দুঃসাহসিকতার সাথে এই আকস্মিক হামলা চালানো হয় যে, মোঙ্গলরা শেষ পর্যন্ত টিকতে না পেরে তাদের অসংখ্য লাশ যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে পলায়ন করে। আলাউদ্দীন কায়কুবাদ সালজুকী খানিকক্ষণ পূর্বেই আপন পরাজয় ও ধ্বংসকে একেবারে নিশ্চিত মনে করেছিলেন। হঠাৎ এই অকল্পনীয় সাহায্য এবং বিজয় প্রত্যক্ষ করে তিনি যারপর নাই উল্লসিত হন এবং যে আর তুগ্রিল রহমতের ফেরেশতারূপে অবতীর্ণ হয়ে সমস্ত পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে নিয়ে এসেছিলেন তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। সেখানে ঠিক সময়মত পৌঁছতে পেরেছেন বলে আর তুগ্রিলও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি আরো বেশি সন্তুষ্ট হন এই ভেবে যে, যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি রওয়ানা হয়েছিলেন তা পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে। আর তুগ্রিল এবং আলাউদ্দীন কায়কুবাদ বিজয়ের আনন্দ উল্লাসে মত্ত ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে সুলায়মান খানও আপন বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পৌঁছেন। আলাউদ্দীন সালজুকী, সুলায়মান খান এবং তার পুত্র আর তুগ্রিলকে মূল্যবান পরিধেয় উপহার দেন। তিনি আর তুগ্রিলকে আংকারা শহরের নিকটে একটি জায়গীর প্রদান করেন এবং সুলায়মান খানকে আপন বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করেন।

এখানে আলাউদ্দীন সালজুকীর তীক্ষ্নবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি আর তুগ্রিলকে জায়গীর হিসাবে প্রদানের জন্য সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ এলাকাটি নির্বাচন করেন। কূনিয়া সাম্রাজ্য প্রথমে অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এই পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল যে, এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম এলাকা রোমানরা দখল করে নিয়েছিল এবং তারা এই সালজুক সাম্রাজ্য পুরোপুরি গ্রাস করার জন্য ক্রমেই এগিয়ে আসছিল। অপর দিকে দক্ষিণপূর্ব এলাকাসমূহ মোঙ্গলদের দখলে চলে গিয়েছিল এবং বাকি এলাকা দখলের জন্য তারা তৎপর ছিল। মোট কথা, এভাবে দু'দিক থেকে দু'টি শক্তিশালী শত্রুর চাপে পড়ে কূনিয়ার একেবারে চিড়া চেপ্টা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল এবং চৌহদ্দি ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে তা এমনি একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের আকার ধারণ করেছিল যার অস্তিত্ব যে কোন মুহূর্তে বিলীন হয়ে যেতে পারত। যা হোক, এই দুর্দান্ত বাহিনীর অধিনায়কদের দুঃসাহসিকতা প্রত্যক্ষ করে আলাউদ্দীন সুলায়মানের পুত্রকে এমন একটি অঞ্চলে জায়গীর প্রদান করেন, যার অবস্থান ছিল একেবারে রোমান সীমান্তে। অপর দিকে পিতা সুলায়মানকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে তিনি পশ্চিম দিক থেকে মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পরই আর তুগ্রিল একটি রোমান বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে রোমান

এলাকার দিকে আপন জায়গীরের আয়তন বৃদ্ধি করেন। তাঁর এই কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য আলাউদ্দীন সালজুকীও নিজের সাম্রাজ্য থেকে ঐ অঞ্চল সংলগ্ন আরো কিছু এলাকা আর তুগ্রিলের জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর শক্তি ও উদ্যম উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেন। ফলে আর তুগ্রিল শক্তিশালী হয়ে ওঠায় রোমানদের দিক থেকে যে আশংকা ছিল তা একেবারে লোপ পায়। কিন্তু কিছুদিন পর সুলায়মান খান, যিনি ফুরাত নদীর তীর দিয়ে আপন বাহিনীসহ সফর করছিলেন এবং মোঙ্গলদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, ফুরাত অতিক্রমকালে পানিতে ডুবে মারা যান। আর তুগ্রিল আপন এলাকা শাসন করে যাচ্ছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে নিজের শক্তিও বৃদ্ধি করছিলেন। যেহেতু আর তুগ্রিল খ্রিস্টানদের সাথে বরাবর যুদ্ধরত ছিলেন এবং একের পর এক তাদের এলাকা ছিনিয়ে এনে নিজের রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করছিলেন, তাই তার ঐ অঞ্চলে শক্তিশালী হওয়াটা ছিল কূনিয়া সম্রাটের জন্য কিছুটা শান্তি ও স্বস্তির কারণ। কাজেই আর তুগ্রিলের ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রত্যক্ষ করে আলাউদ্দীন সালজুকী আত্মতৃপ্তি লাভ করছিলেন।

৬৩৪ হিজরীতে (১২৩৬-৩৭ খ্রি) আলাউদ্দীন কায়কুবাদের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন কায়খসরূ কূনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মোঙ্গলরা বার বার আক্রমণ করে কায়খসরূকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। ফলে তিনি ৬৪১ হিজরীতে (১২৪৩-৪৪ খ্রি) মোঙ্গলদেরকে কর প্রদানে স্বীকৃত হন। কূনিয়ার এভাবে করদ রাজ্যে পরিণত হওয়াটা আর তুগ্রিলের জন্য খুব একটা মাথাব্যথার কারণ ছিল না। কেননা তিনি এমন একটি প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, যা বাহ্যত মোঙ্গলদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিল। তারপর মোঙ্গলদের এশিয়া মাইনরের দিকে মনোনিবেশ করার অবকাশ ছিল না। ৬৫৬ হিজরীতে (১২৫৮ খ্রি) চেঙ্গিয খানের পৌত্র হালাকূ খান বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য মুছে ফেলেন।

৬৫৭ হিজরীতে (১২৫৯ খ্রি) আংকারার জায়গীরদার আর তুগ্রিলের ঘরে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় এবং তাঁর নাম রাখা হয় উসমান খান। ইনি হচ্ছেন সেই উসমান খান, যাঁর নামানুসারে তুর্কী বাদশাহদেরকে সালাতীনে উসমানিয়া বা উসমানী সম্রাট বলা হয়। ৬৮৭ হিজরীতে (১২৮৮ খ্রি) যখন উসমানের বয়স ত্রিশ বছর তখন তুগ্রিলের মৃত্যু হয়। এ সময় কূনিয়া-সম্রাট আর তুগ্রিলের সমগ্র এলাকার শাসনক্ষমতা উসমান খানকে প্রদান করেন এবং এই মর্মে একটি সনদও লিখে দেন। উসমান খানের যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে কূনিয়ার বাদশাহ গিয়াসুদ্দীন কায়খসরূ ঐ বছরই তাঁকে আপন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করে তাঁর সাথে আপন কন্যার বিবাহ দেন। এবার উসমান খান কূনিয়া শহরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী পদে উন্নীত হন। এমনকি জুমুআর দিন কূনিয়ার জামে মসজিদে গিয়াসুদ্দীন কায়খসরূর স্থলে উসমান খানই খুতবা পাঠ করতে থাকেন।

উসমান খান

৬৯৯ হিজরীতে (১২৯৯-১৩০০ খ্রি) মোঙ্গলদের সাথে একটি সংঘর্ষে গিয়াসুদ্দীন কায়খসরূ নিহত হন। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, মাত্র একটি কন্যা সন্তান ছিল। তার সাথেই উসমান খান পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কাজেই সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ

কর্মকর্তারা সর্বসম্মতিক্রমে উসমান খানকে কূনিয়ার সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। এভাবে ইসরাঈল ইব্ন সালজুকের বংশধররা যেই সাম্রাজ্য ৪৭০ হিজরীতে (১০৭৭-৭৮ খ্রি) কায়েম করেছিল তার বিলুপ্তি ঘটে এবং তদস্থলে উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যার অস্তিত্ব এই শতাব্দীর প্রথমভাগেও ছিল। ইসরাঈল ইব্ন সালজুক ছিলেন সেই ব্যক্তি যাকে সুলতান মাহমূদের নির্দেশে হিন্দুস্থানের কালিঞ্জর দুর্গে একদা বন্দী জীবন যাপন করতে হয়েছিল।

উসমান খানের সিংহাসনে আরোহণের সময় কূনিয়া সাম্রাজ্য ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তাই রোমান ও মোঙ্গলদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে ওঠা এই সাম্রাজ্যটির অস্তিত্ব মুছে যাওয়াটাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু উসমান খান সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথে মৃতপ্রায় এই সাম্রাজ্যটি পুনরায় সজীব হয়ে উঠতে শুরু করে। তার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল এই যে, উসমানের প্রতি তাঁর সঙ্গী-সাথী, সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সৈন্যসামন্ত, প্রজাসাধারণ সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। তাঁর মার্জিত ব্যবহারের কারণে তাঁকে সকলেই ভালবাসত। উসমান খানের মধ্যে ছিল যেমন নিষ্কলুষ ধর্মপরায়ণতা, তেমনি ছিল অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহসিকতা। উসমান খান সর্বপ্রথম রোমানদের কাছ থেকে 'কারা হিসার' শহর জয় করেন এবং সেখানেই আপন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন সাম্রাজ্যের এই নতুন রাজধানী সৌভাগ্যের একটি আলামত হিসাবে পরিদৃষ্ট হয়। সিংহাসনে আরোহণ করার পর উসমান খান হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণকারীদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করেন এবং তাতে জয়ী হন। ফলে হিংসুটেদের বিষদাঁত ভেংগে যায়। এতদসত্ত্বেও সালজুকীদের পুরাতন খান্দানের লোকেরা উসমান খানকে তাদের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবেই দেখত। অবশ্য এজন্য বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। তবে উসমান খান যদি কোন না কোন মুহূর্তে নিজের দুর্বলতা কিংবা বিপদাশংকার কথা প্রকাশ করতেন তাহলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিশ্চয়ই তাঁর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াত। কিন্তু উসমান খান প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে নিজেকে নির্ভীক ও নিঃশংকচিত্ত প্রমাণ করেছেন। তাই দেখা যায়, যখন খ্রিস্টানরা একেবারে সূচনাকালে কূনিয়া আক্রমণের জন্য সেনাবাহিনী পাঠায় তখন উসমান খান সাম্রাজ্যের পদস্থ কর্মকর্তাদের একত্র করে তাদের সাথে পরামর্শ সভায় বসেন। ঐ সভায় উসমান খানের চাচা তথা আর তুগ্রিলের ভাই উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় এই মুহূর্তে সৈন্য প্রেরণ সঙ্গত হবে না। যতদূর সম্ভব আপোসের মাধ্যমে এই যুদ্ধ থেকে দূরে থাকাই হবে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। কেননা যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তাহলে এই আশংকা রয়েছে যে, মোঙ্গল এবং অন্যান্য তুর্কী অধিনায়কও খ্রিস্টানদের আক্রমণকে সফল করে তোলার জন্য একযোগে আমাদের দেশের উপর হামলা চালাবে। তখন একসাথে সকল শত্রুর মুকাবিলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। উসমান খান আপন চাচার মুখে এই কাপুরুষোচিত কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ধনুকে তীর জুড়ে তাকে লক্ষ্য করেই সজোরে তা নিক্ষেপ করেন। ফলে চিরদিনের জন্য তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এই দৃশ্য দেখে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান কিংবা সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করার মত দুঃসাহস আর কারো হয় নি। যা হোক, উসমান খান খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে 'কারা হিসার' দখল করেন, তারপর কূনিয়ার পরিবর্তে এখানেই আপন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তিনি

অনবরত খ্রিস্টানদের উপর হামলা চালাতে থাকেন এবং একের পর এক শহর দখল করে খ্রিস্টানদেরকে এশিয়া মাইনর থেকে তাড়িয়ে দিতে থাকেন। খ্রিস্টান সম্রাট কাইজার কনস্টানটিন যখন উসমান খানকে প্রবল বন্যার আকারে তাদের দিকে ধাবিত হতে দেখলেন তখন তিনি উপস্থিত কূটকৌশল হিসাবে মোঙ্গলদের সাথে যোগাযোগ শুরু করে দিলেন এবং তাদেরকে অনবরত প্ররোচিত করতে থাকলেন, যেন তারা পূর্ব দিক থেকে উসমান খানের উপর হামলা চালায়। কেননা মোঙ্গলরা এরূপ করলে উসমান খানের দৃষ্টি খ্রিস্টানদের উপর থেকে স্বভাবতই মোঙ্গলদের উপর গিয়ে পড়বে। কনস্টানটাইনের এই প্রচেষ্টায় কিছুটা সাফল্যও অর্জিত হয়েছিল। কেননা তারই প্ররোচনায় মোঙ্গলরা উসমান খানের সাম্রাজ্য আক্রমণ করে বসে। যেহেতু উসমান খান খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে একের পর এক জয়লাভ করছিলেন তাই তাঁর বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈন্যই সিংহ হৃদয় হয়ে উঠেছিল। আর বিজয় হচ্ছে এমন বস্তু, যা প্রতিটি যুদ্ধপ্রিয় জাতির মধ্যে সাহসিকতার সৃষ্টি করে। উসমান খান আপন পুত্র আরখানকে মোঙ্গলদের মুকাবিলায় পাঠান। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবেষ্টনী ভেদ করার ক্ষেত্রে আরখানের কোন জুড়ি ছিল না। তারপর স্বয়ং উসমান খান আপন বাহিনীর বাকি সৈন্যদের নিয়ে পূর্বের চাইতে অধিক তীব্রতার সাথে রোমানদের উপর হামলা চালাতে থাকেন। আরখান অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মোঙ্গলদের প্রতিটি আক্রমণ প্রতিরোধ করেন এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধেই জয়ী হন। শেষ পর্যন্ত মোঙ্গলরা ক্লান্ত-শ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে আরখানের মুকাবিলা করা থেকে সরে দাঁড়ায়। যাহোক, আরখান তাঁর মিশন সফল করে পিতার সাথে গিয়ে মিলিত হন। এবার পিতাপুত্র উভয়েই খ্রিস্টানদের উপর হামলা চালান এবং বিজয়ী বেশে ক্রমাগত এগিয়ে চলেন। একদিকে উসমান খান এশিয়া মাইনর জয় করে উত্তর দিকে কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে গিয়ে পৌঁছেন, অপর দিকে আরখান খ্রিস্টানদেরকে পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যান এবং বারূসা জয় করেন। বারূসা হচ্ছে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলের নিকটবর্তী রোম সম্রাটের একটি অতি সমৃদ্ধিশালী শহর। আরখান যখন এই শহরটি জয় করেন তখন উসমান খান কৃষ্ণ সাগরের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছেন এবং অনেক মালে গনীমত লাভ করে 'কারা হিসারে' ফেলে এসেছেন। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু বারূসা বিজয়ের সংবাদ শুনে অবিলম্বে সেদিকে রওয়ানা হন এবং আপন অধিনায়কদেরকে নির্দেশ দেন ঃ যদি আমি বারূসায় পৌঁছার পূর্বে রাস্তায় মারা যাই তাহলে তোমরা আমার লাশ বারূসায় নিয়ে গিয়ে দাফন করবে এবং সেখানেই আমার সমাধি রচনা করবে। ভবিষ্যতে আমার পুত্র আরখানও যেন বারূসায় বসবাস করে এবং সেই শহরকেই আপন রাজধানীতে রূপান্তরিত করে। শেষ পর্যন্ত উসমান খান বারূসায় পৌঁছার বেশ কয়েকদিন পর মারা যান এবং সেখানেই তাঁর সমাধি রচনা করা হয়। এটা হচ্ছে হিজরী ৭২৭ সনের (১৩২৭ খ্রি) ঘটনা। উসমান খান মৃত্যুকালে আপন পুত্রকে ওসীয়ত করতে গিয়ে বলেন ঃ আজ আমার দুঃখ নেই এজন্য যে, তোমার মত একটি উপযুক্ত ছেলেকে আমি আমার স্থলাভিষিক্ত করে যাচ্ছি। তুমি কখনো ধর্মপরায়ণতা, পুণ্যকামিতা, সহৃদয়তা, করুণা ও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করবে না। তুমি প্রজাসাধারণের নিরাপত্তা ও সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখবে এবং শরীয়তের বিধান জারি করবে। তুমি বারূসাকেই আপন রাজধানী করবে। উসমান খান যে অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন এই ওসীয়ত থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি জানতেন, কূনিয়ায় এমন সব লোক

রয়েছে যারা কোন না কোন সময় তাঁর বংশের ক্ষতি সাধন করতে পারে। তিনি এও জানতেন, মোঙ্গলরা শুধু ইসলামের কারণে মুঘলদের শত্রু নয়। কেননা তারাও স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতএব কূনিয়ায় যদি রাজধানী থাকে তাহলে আমার বংশধরদের সাথে মোঙ্গল এবং অন্যান্য সর্দারের মধ্যে সব সময় সংঘাত লেগে থাকবে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য খ্রিস্টান দেশসমূহই হচ্ছে উৎকৃষ্টতম ক্ষেত্র। এই প্রেক্ষিতে যদি বারুসাকে রাজধানী করা হয় তাহলে এটা নিশ্চিত যে, খ্রিস্টানরা এশিয়া মাইনর থেকে চিরদিনের জন্য হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে এবং দানিয়াল উপত্যকা থেকে কখনো অগ্রসর হওয়ার সাহস পাবে না। উপরন্তু বারুসার বাদশাহরা অতি সহজে ইউরোপ আক্রমণ ও বলকান জয়ের সুযোগ পাবে। উসমানের এই ধারণা ছিল খুবই যুক্তিসঙ্গত। উসমানের এই আদর্শের প্রতি তাঁর বংশধরদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং এই আদর্শ বাস্তবায়নের ফলেই কিছুদিন পর উরনা তথা আদরিয়ানোপলে তাঁরা তাঁদের রাজধানী স্থানান্তর এবং কনসটান্টিনোপল জয় করতে সক্ষম হয়।

ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, উসমান খান ছিলেন অনন্যসাধারণ বীর পুরুষ। তাঁর একটি প্রমাণ এই যে, যখন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তখন তাঁর হাত হাঁটু পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছত। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার। তাঁর আকার-আকৃতিও ছিল সুন্দর ও আকর্ষণীয়। তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল অপূর্ব। অত্যন্ত জটিল বিষয় সম্পর্কেও তিনি ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন এবং পরিণামে তাঁর সিদ্ধান্তই হতো সঠিক। তিনি ছিলেন প্রখর প্রতিভার অধিকারী। দয়া ও বদান্যতার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ছিল অনেক উপরে।

কূনিয়ার সালজুক বাদশাহদের পতাকায় অর্ধচন্দ্র অংকিত ছিল। এটাকে উসমান খানও যথারীতি তাঁর পতাকায় বহাল রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত এটাই উসমানী সাম্রাজ্যের জাতীয় প্রতীক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। উসমান খান উনসত্তর বছর কয়েক মাস বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মোট সাতাশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যে কত ধর্মপরায়ণ, সংসার বিরাগী ও মুত্তাকী ছিলেন তার একটি প্রমাণ এই যে, মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে একটি বর্ম, একটি তরবারি এবং একটি পাগড়ি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এটাই হচ্ছে সেই তরবারি, যা প্রত্যেক উসমানীয় সুলতান সিংহাসনে আরোহণের সময় আপন কটিদেশে বাঁধতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উসমান খান যখন কূনিয়া ত্যাগ করেন তখন তিনি পুরাতন সালজুক বংশের লোকদেরকে সেখানকার শাসনকর্তা ও কর্মকর্তা নিয়োগ করে ঐ সমস্ত সম্মানসূচক পদবীর ব্যবহারও তাদের জন্য বৈধ করে দেন, যা সালজুক বংশের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অন্য কথায় বলতে গেলে, উসমান খান কূনিয়ায়, কেন্দ্রের অধীন একটি সাম্রাজ্যের অধীন পুরাতন রোমান সালজুকদের বংশের মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বহাল ছিল। এই কর্মধারা থেকেও উসমান খানের দূরদর্শিতা ও কৌশলের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিংশ অধ্যায়

রোমান সাম্রাজ্য

উসমান খানের পর তাঁর পুত্র আরখান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় উসমানীয় সুলতান। আরখান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে রোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রযোজন আছে। এতে আরখানের যুগে যে সমস্ত বিজয় অভিযান পরিচালিত হয়েছে এবং যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তা অনুধাবন করা সহজ হবে।

হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের পৌনে চয়শ বছর পূর্বে ইতালীতে সেলূইয়া নামীয় এক কুমারী মেয়ের গর্ভে দু'টি যমজ পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাদের একজনের নাম রূমূলিস এবং অন্যজনের নাম রীমূস রাখা হয়। কথিত আছে যে, এই দু'টি সন্তান মিররীখ (Mars) দেবতার ঔরসে জন্মলাভ করেছিল। সেলূইয়া নামীয় কুমারী মেয়েটি ছিল ভেস্টা দেবীর মন্দিরের পূজারিণী। সেখানেই মিররীখ দেবতা দ্বারা সে গর্ভবতী হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর রূমূলিস এবং রীমূসকে কোন একটি নৌকায় কিংবা টুকরীতে রেখে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এবং সমুদ্রের ঢেউ তাদেরকে কোন একটি জঙ্গল কিংবা পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী উপকূলে নিয়ে নিক্ষেপ করে। সেখানে একটি বাঘিনী তাদেরকে স্তন্য দান করে এবং তাদের যত্নও নিতে থাকে। এভাবে বাঘিনীর দুধ পান করে শিশু দু'টি প্রতিপালিত হয়। বড় হওয়ার পর দুই ভাই মিলে একটি শহরের ভিত্তি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে এই শহরই রোম বা রোমা নামে পরিচিত হয়। এই দুই ভাইয়ের বংশধররা এমন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, যা পরবর্তীকালে বিশ্বের বিরাট ও পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যসমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়। রোম নগরী আজো ইতালীর রাজধানী। কিন্তু রূমূলিস ও রীমূসের প্রতিষ্ঠিত সেই রোমান সাম্রাজ্যের কোন নাম-নিশানা এখন অবশিষ্ট নেই।

এই সাম্রাজ্য যখন উন্নতির শীর্ষে গিয়ে পৌঁছে তখন তা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর এক ভাগকে বলা হতো পূর্ব রোম এবং অপর ভাগকে বলা হতো পশ্চিম রোম। সেই রোম বা রোমাই পশ্চিম রোমের রাজধানী হিসাবে বহাল থাকে। আর পূর্ব রোমের রাজধানী হয় কনসটান্টিনোপল। উত্তর ইউরোপ এবং রাশিয়ার বর্বর জাতিসমূহ বার বার আক্রমণ চালিয়ে একদা পশ্চিম রোমকে একেবারে দুর্বল ও অকেজো করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য সীমিত আকার ধারণ করে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ জেনেভা এবং ভেনিসে দু'টি পৃথক পৃথক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর সেগুলো বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। কালক্রমে ঐ দুই সাম্রাজ্যের স্থলে নতুন নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্ব রোমের উপর উত্তরাঞ্চলীয় আক্রমণকারীদের সৃষ্ট বিপদ খুব কমই পতিত হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে, ইউরোপীয় বর্বরদের হাতে তাদেরকে খুব একটা

ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় নি। অবশ্য এক যুগ এমনও আসে যখন কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের শহর রোমও বেদখল হয়ে যায়। আরব ও ইরানের অধিবাসীরা সেই পশ্চিম রোম সম্পর্কে অনবহিত ছিল, যার নামে রোমান সাম্রাজ্যের নামকরণ করা হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপ অর্থাৎ কনসটান্টিনোপলের শাসকরা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে যখন ইউরোপে তা প্রচার করতে শুরু করে তখন ইউরোপের ঐ সমস্ত রাজন্য, যারা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করত তারা কনসটান্টিনোপলের সম্রাটকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখত। শেষ পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ খ্রিস্ট ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং ইউরোপবাসী মাত্রেই রোমের কায়সারকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখে থাকে। যখন কনসটান্টিনোপল দরবারে সভাসদরা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাদের অধিকৃত এলাকাসমূহেও খ্রিস্ট ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে তখন আরব ও ইরানের লোকেরা প্রত্যেকটি খ্রিস্টানকে রোমীয় বা রোমান নামে অভিহিত করতে থাকে। কনসটান্টিনোপলের কায়সারের সাম্রাজ্য যেহেতু গ্রীক সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠেছিল এবং তিনি রোমের কায়সার মহান আলেকজান্ডারের অধিকৃত দেশসমূহেরও মালিক ছিলেন তাই কনসটান্টিনোপল সাম্রাজ্যকে ইউনানী তথা গ্রীক সাম্রাজ্যও বলা হয়ে থাকে। একারণেই ঐতিহাসিকগণ রোমান এবং গ্রীক উভয় শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেহেতু এশিয়া মাইনর এবং সিরিয়াও কনসটান্টিনোপলের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই ইসলামের প্রাথমিক যুগে এশিয়া মাইনরকেও রোম দেশ বলা হতো। শীঘ্রই সিরিয়া থেকে খ্রিস্টান শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও এশিয়া মাইনর মুসলিম শাসনামলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত রোমান সম্রাটের শাসনাধীন থাকে। একারণে এশিয়া মাইনরকেও সাধারণভাবে রোম দেশ বলা হয়ে থাকে। যখন এশিয়া মাইনরের একটি অংশে সালজুকদের একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেটাকে রোম দেশের সালজুক সাম্রাজ্য বলা হতো। আর ঐ সাম্রাজ্যের সুলতানদের বলা হতো রোমান সালজুক সুলতান। এই রোমান সালজুকদের পর প্রথম উসমান খান এশিয়া মাইনরে আপন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রায় সমগ্র এশিয়া মাইনরে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁকেও রোমান সুলতান বলা হতো। পরবর্তীকালেও উসমানীয় সুলতান-দেরকে রোমান সুলতান বলা হতে থাকে।

কনসটান্টিনোপলের কায়সার যখন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন তখন খ্রিস্টান সাম্রাজ্য ও ইরানের মাজূসী (অগ্নিউপাসক) সাম্রাজ্যের মধ্যে বার বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই সব যুদ্ধ ও সংঘাত অব্যাহত থাকাকালে আরবে ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যা মাজূসী এবং খৃস্টান উভয় রাজশক্তিকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলে। মাজূসী সাম্রাজ্য তো অতি অল্প কালের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু কনসটান্টিনোপলের খ্রিস্টান সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত টিকে থাকে। আমরা যে কালের ইতিহাস বর্ণনা করছি সে কালেও এই খ্রিস্টান সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল। খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনামলে সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিসর থেকে রোম তথা খ্রিস্টান সাম্রাজ্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারপর উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে রোম-সম্রাটের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। মুসিলম খলীফাদের বর্ণনা প্রসংগে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও এ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এশিয়া মাইনর একাধারে প্রায়

সাতশ বছর মুসলমান ও খ্রিস্টানদের রণক্ষেত্র রূপে বিরাজ করে। কখনো কখনো মুসলমানরা খ্রিস্টানদেরকে তাড়াতে তাড়াতে দানিয়াল উপত্যকা পর্যন্ত নিয়ে যেত, আবার কখনো খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে ঠেলতে ঠেলতে ইরান ও কুর্দিস্তান পর্যন্ত নিয়ে আসত। মুসলমানদের মুকাবিলায় এই খ্রিস্টান সাম্রাজ্যটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত টিকে থাকার সুযোগ পায় এজন্য যে, মুসলমানরা আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে, অরা এই খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধনের অবকাশই পায় নি।

এই অবশিষ্ট কাজটি উসমানীয় তুর্করা সম্পন্ন করে। এ কারণে তাদেরই ইসলামী বিশ্বের নেতারূপে মান্য করা হতে থাকে। আমরা যে যুগের কথা বলছি সেটা ছিল ঐ যুগ, যখন ইউরোপের ক্রুসেড যুদ্ধের বন্যা দ্বারা সিরিয়া ও ফিলিস্তীন প্রান্তর বার বার প্লাবিত হয়ে গেছে এবং খ্রিস্টান যোদ্ধারা মুসলমানদের মুকাবিলায় বারবার পরাজিত হয়ে এবং তাদের জ্ঞানগত ও চারিত্রিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফিরে গিয়ে সেখানকার খ্রিস্টান সাম্রাজ্যসমূহকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে এবং মুসলমানদের এই অভাবিত উন্নতির প্রতি খ্রিস্টান জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ঐ যুগ সম্পর্কে খ্রিস্টানদের একথা বলা মোটেই ঠিক নয় যে, রোমান সাম্রাজ্য তখন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রকৃত পক্ষে তখন মুসলমানদের বিরোধিতা করার জন্য খ্রিস্টানদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ঐক্য পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আর ইতোপূর্বে ইউরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্য কনসটান্টিনোপলকে তার সামরিক শক্তির কারণে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখলেও ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ধর্মীয় ও জাতিগত স্বার্থ রক্ষার্থে সমগ্র ইউরোপ কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল।

কনসটান্টিনোপলের সম্রাট তখন শুধু ইউরোপের সম্রাটদের সাথেই যোগসূত্র স্থাপন করেন নি, বরং মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য তাদের সম্ভাব্য প্রতিটি শত্রুর সাথেও ভালবাসা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেন। চেঙ্গিয খান এবং তার বংশধরদেরকে বিজয়ী এবং অমুসলিম দেখে কনসটান্টিনোপলের সম্রাট কারাকোরাম এবং চীন পর্যন্ত মুঘলদের দরবারে দূত প্রেরণ করেন। পরবর্তী ঘটনাবলী এটাও প্রমাণ করবে যে, কনসটান্টিনোপলের সম্রাট আপন বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিজের পক্ষে টানতে গিয়ে এবং তার দিক থেকে আশংকামুক্ত হতে গিয়ে তার হাতে আপন কন্যাকে তুলে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি এবং তাদেরকে দুর্বল ও ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন কূটকৌশল অবলম্বন শুধু বর্তমান যুগের খ্রিস্টানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এবং কনসটান্টিনোপলের খ্রিস্টান সম্রাটও বার বার এই কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং প্রত্যেক যুগের খ্রিস্টানদেরকেও এভাবে সদাসতর্ক দেখা গেছে। যদি মুসলমানরা তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করে এবং পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে যায় তাহলে বিশ্বের কোন শক্তিই মুসলমানদের সামনে টিকে থাকতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত শত্রুদের পরাজিত ও পর্যুদস্ত হতেই হবে। উসমান খান এবং তাঁর বংশধররা এই গূঢ় রহস্যটি বেশ ভালভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। এ কারণেই তাঁরা অন্তর্দ্বন্দ্ব, গৃহযুদ্ধ ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সব সময়ই নিজেদের দূরে রেখেছেন। তাঁরা খ্রিস্টানদের

মুকাবিলায় ছিলেন সদাপ্রস্তুত। তাই তো তাঁরা এমন সব কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিতে পেরেছিলেন, যা তাঁদের পূর্ববর্তী কারো পক্ষেই সম্ভব হয় নি। এবার উসমান খানের পুত্র আরখানের আলোচনায় আসা যাক।

আরখান

উসমান খানের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল আলাউদ্দীন এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল আরখান। জ্ঞান, বিচক্ষণতা, দৃঢ়তা, সাহসিকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আলাউদ্দীন অনন্য হলেও আরখানের সামরিক কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলী উসমান খানকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করেছিল যে, আরখানই হবেন তাঁর যোগ্যতম উত্তরসূরি। তাই তিনি এ ব্যাপারে একটি ওসীয়ত লিপিবদ্ধ করে যান। উসমান খানের মৃত্যুর পর পুরোপুরি এ আশংকা ছিল যে, দুই ভাইয়ের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এমনকি সংঘর্ষ পর্যন্ত দেখা দেবে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলাউদ্দীন, যিনি সব দিক দিয়েই সিংহাসনের যোগ্য ছিলেন, আপন বয়ঃজ্যেষ্ঠতার অধিকারকে পিতার ওসীয়তের সামনে ত্যাগ করে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর হাতে সর্বাগ্রে নিজেই বায়আত করেন। তিনি নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য জায়গীর হিসাবে বারুসা সংলগ্ন একটি গ্রাম ছাড়া আপন ভাইয়ের কাছে আর কিছুই চান নি। আরখানও ভাইয়ের যোগ্যতা ও পবিত্রচিত্ততা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার আহ্বান জানান এবং এ ব্যাপারে তাঁকে রাযী করানোর জন্য সভাসদদেরকেও তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাতে বলেন। আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণ করা আলাউদ্দীনের জন্য মর্যাদার কোন বিষয় ছিল না। কিন্তু বার বার অনুরোধের কারণে তিনি তাতেও রাযী হয়ে যান। তারপর তিনি মন্ত্রী হিসাবে অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠতা ও মঙ্গল-কামিতার সাথে যেরূপ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক দায়িত্বসমূহ আনজাম দেন তাতে তিনি বিশ্বের পবিত্রচেতা, বিচক্ষণ ও ন্যায়নিষ্ঠ মন্ত্রীদের মধ্যে শীর্ষস্থান পাবার যোগ্য।

সুলতান আরখান সিংহাসনে আরোহণ করেই এক বছরের মধ্যে সমগ্র এশিয়া মাইনর জয় করে দানিয়াল উপত্যকা পর্যন্ত আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তারপর তিনি তাঁর ভাই প্রধানমন্ত্রী আলাউদ্দীনের পরামর্শ অনুযায়ী আপন সাম্রাজ্যের মধ্যে এমনভাবে আইন-কানুন জারি করেন যার ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। তখন পর্যন্ত এই নিয়মই চলে আসছিল যে, খ্যাতিমান বাহিনীর অধিনায়কদেরকে দেশের মধ্যে একটি করে ক্ষুদ্র এলাকা জায়গীর হিসাবে দেওয়া হতো। এর বিনিময় হিসাবে ঐ সমস্ত জায়গীরদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল এই যে, প্রয়োজনের সময় তলব করা মাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যসহ তাদেরকে বাদশাহর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে হাযির হতে হতো। তাই যে অধিনায়ককে একদা জমিদার বা জায়গীরদার রূপে দেখা যেত তাকেই পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যেত একজন সেনাধ্যক্ষরূপে। এশিয়া মাইনরে প্রথম থেকেই মুসলমানদের অনেক বসতি ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল তুর্ক বংশোদ্ভূত। কেননা আব্বাসীয় খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর যুগ থেকে এশিয়া মাইনরের সীমান্ত শহরসমূহে তুর্কদের বসতি স্থাপনের ধারা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সালজুকদের শাসনামলে অনেক সম্প্রদায় তুর্কিস্তান থেকে এসে এশিয়া মাইনরে বসতি

স্থাপন করে। রোমান সালজুকদের সাম্রাজ্যও তাদের অনেক জ্ঞাতিগোষ্ঠী তথা তুর্ককে এশিয়া মাইনরের দিকে টেনে নিয়ে এসেছিল। গায-এর তুর্কদের লুটপাট এবং মোঙ্গলদের অনবরত আক্রমণও তুর্কদেরকে খুরাসান, ইরান ও ইরাকের দিক থেকে এদিকে ঠেলে দিয়েছিল। এভাবে এশিয়া মাইনরের সমগ্র পূর্বাংশ, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমানদের দখলে ছিল, তুর্ক সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা ছিল পূর্ণ। অতএব শুধু উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় এশিয়া মাইনরেই ছিল খ্রিস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

নেগচারী বাহিনী

এবার যখন উত্তর-পশ্চিমাংশও খ্রিস্টান সাম্রাজ্য থেকে বের হয়ে গেল তখন উসমানীয় তুর্কদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং তাদের সংগীরা উল্লিখিত জায়গীরদারদের মাধ্যমে সমগ্র এশিয়া মাইনরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে উসমানীয় তুর্করা এমন এক সময়ে এশিয়া মাইনরে তাদের পরিপূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে যখন ঐ দেশে তাদের জন্য সীমাহীন আনুকূল্য সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন যুদ্ধে বন্দী হয়ে অনেক খ্রিস্টান সেখানে এসেছিল এবং অনেক খ্রিস্টান যিম্মী হিসাবে এশিয়া মাইনরে বসবাস করতে শুরু করেছিল। প্রধানমন্ত্রী আলাউদ্দীন তাঁর ভাইকে বুঝিয়ে বলেন যে, বড় বড় জায়গীরদার, যাদের অধীনে বিরাট বিরাট সেনাবাহিনী রয়েছে, তারা হয়ত এক সময়ে আশংকার কারণও হতে পারে। আর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্ররোচনার শিকার হয়ে আমাদের জায়গীরদার খ্রিস্টান প্রজাদের তো আমাদের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হওয়াটা একেবারেই স্বাভাবিক। তাই এটাই যুক্তিযুক্ত যে, আমরা খ্রিস্টান বন্দী ও খ্রিস্টান প্রজাদের মধ্য থেকে শুধু কিশোর ও যুবকদেরকে বাছাই করে আমাদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসব। তারপর স্বয়ং রাষ্ট্র ওদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করবে। ওদেরকে মুসলমান বানিয়ে যথাযথভাবে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হবে এবং যথাযথভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দ্বারা একটি পৃথক বাহিনী গড়ে তোলা হবে। আর এই বাহিনীকেই আখ্যা দেওয়া হবে রাজকীয় তথা সরকারী বাহিনী হিসেবে। কেননা এদের দিক থেকে বিদ্রোহের কোন আশংকা থাকবে না। আর এদের আত্মীয়-স্বজনরাও কখনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করার মত সাহস পাবে না বরং তারা তাদের ছেলেদের মাধ্যমে নিজেরাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। যখন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হাত দেওয়া হয় এবং কয়েকশ খ্রিস্টান ছেলেকে রাষ্ট্রীয় হিফাযতে এনে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করা হয় তখন এদের সম্মান, মর্যাদা ও শানশওকত প্রত্যক্ষ করে খ্রিস্টানরা নিজ থেকে তাদের ছেলেদেরকে এই বাহিনীতে ভর্তি করার জন্য জোর চেষ্টা-তদবীর শুরু করে। কেননা তারা পরিষ্কার দেখতে পায় যে, এই সেদিনও যেই খ্রিস্টান ছেলেদের মান-মর্যাদা বলতে কিছু ছিল না; অথচ রাজকীয় বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার পর আজ তাদের সাথে উসমানীয় সুলতানের পুত্রতুল্য আচরণ করা হচ্ছে। প্রথম প্রথম যখন আনুমানিক দুই হাজার নওজোয়ানকে যথাযোগ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের পর সুলতানের দেহরক্ষী বাহিনীতে নিয়োগ করা হয় তখন সুলতান তাদেরকে নিয়ে একজন মহান সূফীর দরবারে গিয়ে হাযির হন এবং তাঁর কাছে দু'আ চান। ঐ আল্লাহওয়ালা সূফী একজন যুবকের কাঁধের উপর আপন হাত রেখে তাদের সকলের কল্যাণ কামনা করেন। আর সুলতান এটাকেই ঐ

বাহিনীর ভবিষ্যৎ সাফল্যের একটি শুভ ইঙ্গিত বলে ধরে নেন। এই যুবকদের সকলেই ছিল খাঁটি মুসলমান। তাদেরকে সজ্জিত করা হয়েছিল সর্বাধিক যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা। সর্বোপরি 'শাহী সন্তান' আখ্যা দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছিল। এই বাহিনীটি নেগচারী বাহিনী নামে খ্যাত ছিল। এই বাহিনীর লোকেরা পরবর্তীকালে আপন আত্মীয়-স্বজনের সাথে, বলতে গেলে কোন সম্পর্কই রাখত না বরং সকলেই সত্যিকার অর্থে ইসলামের এক একজন খাঁটি সেবকে পরিণত হয়েছিল। এভাবে প্রতি বছর খ্রিস্টান কয়েদী ও যিম্মীদের মধ্য থেকে এক হাজার যুবককে নির্বাচিত করে বিশেষ বাহিনীতে ভর্তি করা হতো এবং উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের পর তাদেরকে সুলতানের দেহরক্ষী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হতো। অভিনব ধরনের এই বাহিনী, সামরিক অধিনায়ক ও জায়গীরদারদের দিক থেকে তুর্কী সুলতানদের জন্য যে বিপদাশংকা ছিল, তা চিরতরে মুছে ফেলে। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী আলাউদ্দীন সমগ্র দেশে এখানে সেখানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রিস্টানদেরকে মোটামুটিভাবে ঐ সমস্ত অধিকার প্রদান করা হয়, যা মুসলমানরা ভোগ করত। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়, গির্জাসমূহের জন্য নানা ধরনের রেয়াত ও জায়গীর প্রদান করা হয় এবং সর্বাবস্থায় প্রজাসাধাণের আরাম-আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। এর ফলে খ্রিস্টানরা সন্তুষ্টচিত্তে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। কেননা উক্ত পরিবেশে তারা ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছিল। আজকাল নেগচারী বাহিনী সম্পর্কে কারো কারো ধারণা এই যে, এটা ছিল খ্রিস্টানদের উপর একটি অত্যাচারমূলক আচরণ। তাদের শিশুদেরকে তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে মুসলমান বানানো হতো। তারপর খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধেই তাদেরকে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। প্রকৃত ব্যাপার হলো, নেগচারী বাহিনী যেরূপ জাঁকজমকের সাথে থাকত, যেভাবে তাদের প্রতি সুলতানের শুভদৃষ্টি ছিল তা লক্ষ্য করে খোদ খ্রিস্টানদের মনেই এই আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছিল যে, যে করে হোক তারা তাদের সন্তানদেরকে রাজকীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করাবে। কেননা সেখানে ভর্তি হওয়ার পর তারা উচ্চ মান-মর্যাদার অধিকারী হবে, আয়েশ-আরামে থাকবে এবং তাদের সম্পর্কে আমাদের কোন আশংকা বা দুশ্চিন্তা থাকবে না। এ কারণেই প্রতি বছর ভর্তির সময় আপনা-আপনি বাৎসরিক কোটা পূর্ণ হয়ে যেত, এমন কি ভর্তির সুযোগ না পেয়ে কাউকে নিরাশ হয়ে ফিরেও যেতে হতো।

নেগচারী বাহিনী ছিল একটি আধুনিক বাহিনী। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নিয়ম-কানুনও এখানে বিদ্যমান ছিল। প্রধানমন্ত্রী আলাউদ্দীন এই বাহিনীর মধ্যে অনেক সংস্কার সাধন করেন। তিনি সৈন্যদের ইউনিফরম নির্ধারণ করেন। সংখ্যানুপাতে তাদেরকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে তদনুযায়ী আইন-কানুনও বেঁধে দেন। একশ, পাঁচশ, হাজার প্রভৃতি মনসবধারী অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়, পদাতিক ও অশ্বারোহীদের পৃথক বাহিনী গঠন করা হয় এবং স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য পৃথক আইন রচনা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী আলাউদ্দীন সরকারী সম্পদ বিভাগেরও সংস্কার সাধন করেন এবং শহরে এমনকি গ্রামাঞ্চলেও ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। পুলিশ বিভাগ এবং পৌরবিভাগের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। দেশের ঐ সমস্ত সম্প্রদায়, যারা লক্ষ্যহীনভাবে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করত এবং

চুরিডাকাতিও করত, প্রধানমন্ত্রী আলাউদ্দীন তাদেরকে এমন ধরনের কাজে নিয়োগ করেন যা তাদের কাছে ছিল খুবই পছন্দসই। অর্থাৎ তিনি একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন শুধু তাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী ও সেনাপল্টন গঠন করেন, যাদের কাজ ছিল, যে দেশের উপর সরকারী বাহিনী হামলা চালাবে, এই সমস্ত ক্ষুদ্র বাহিনী ও সেনাপল্টন যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশে এবং সেসব শত্রু রাজ্যের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে প্রতিপক্ষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে।

প্রধানমন্ত্রী আলাউদ্দীন পূর্তবিভাগের কাজকর্মের প্রতিও বিশেষভবে নজর দেন। ফলে শহরে, গ্রামে, পল্লীতে সর্বত্র মসজিদ, মেহমান ও মুসাফির খানা, মাদরাসা এবং চিকিৎসালয় গড়ে ওঠে। বড় বড় শহরে নির্মিত হয় বিরাট বিরাট প্রাসাদ, নদীসমূহের উপর নির্মিত হয় সেতু এবং রাস্তাসমূহের উপর পাহারা-চৌকি। পণ্যদ্রব্য পরিবহন এবং সেনাবাহিনীর চলাচলের সুবিধার জন্য নতুন নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়। মোটকথা, এশিয়া মাইনরের জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা এবং ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি সর্বোপরি সেখানে উসমানীয় সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার জন্য যত ধরনের প্রচেষ্টার দরকার তার সবই করা হয়। এর ফলে আজ সে দেশ তুর্কদের স্থায়ী আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে এবং সুদীর্ঘ ছয়শ' বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন জাতি বা কোন সাম্রাজ্য সেখান থেকে ইসলাম বা ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কদের তাড়িয়ে দিতে পারে নি।

আলাউদ্দীন যেহেতু আরখানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এবং স্বনামধন্য প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন, তাই আরখানের শাসনামল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আলাউদ্দীন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন ছিল। এবার আরখান সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। আরখান যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন কনসটান্টিনোপলের কায়সার (সম্রাট) ছিলেন এন্ডোনিকাস। যখন তার কাছ থেকে তার অধিকৃত এশিয়ার সব কয়টি দেশই ছিনিয়ে নেওয়া হলো তখন তিনি আশংকা করছিলেন, না জানি মুসলমানরা আবার কোন দিন তুর্ক সমুদ্র পাড়ি দিয়ে একেবারে ইউরোপ উপকূল আক্রমণ করে বসে। কিন্তু আরখান ইউরোপ আক্রমণের চাইতে আপন ভাই আলাউদ্দীনের সংস্কারমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে এশিয়া মাইনরকে আরো সুসংগঠিত ও সুদৃঢ় করার প্রতিই বেশি মনোযোগী ছিলেন। তিনি প্রায় বিশ বছর আপন দেশ ও সাম্রাজ্যের সংস্কারমূলক কার্যে নিয়োজিত থাকেন। যদি পরবর্তী তুর্কী সুলতানরাও তাদের নব অধিকৃত দেশগুলোকে গড়ে তোলার জন্য আরখান এবং তাঁর ভাই আলাউদ্দীনের মত সচেষ্ট হতেন তাহলে এশিয়া মাইনর যেমন আজ পর্যন্ত তুর্কীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে বিরাজ করছে তেমনি মিসর, বলকান, হিজায, ত্রিপোলী প্রভৃতি দেশও আজ পর্যন্ত তাদের আশ্রয়স্থল হিসাবেই বিরাজ করত।

৭৩৯ হিজরীতে (১৩৩৮-৩৯ খ্রি) কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের পৌত্র রাজকুমার কেন্টা কুজিনস তার (সম্রাটের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। খ্রিস্টানদের এই গৃহযুদ্ধের কারণে স্বাভাবিকভাবেই উসমানীয়দের সামনে তাদের সাফল্যের একটি চমৎকার সুযোগ আসে। বিদ্রোহীরা ইদন প্রদেশের তুর্কী গভর্নর শাহযাদা উমর বে-র কাছে সম্রাটের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি ৩৮০টি জাহাজের একটি নৌবহর ও আটাশ হাজার সৈন্য নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেন এবং ইউরোপে প্রবেশ করে প্রথমে ডিসোটিকা শহরের অবরোধ ভেংগে ফেলেন। তারপর তিনি দুই হাজার বাছাই করা অশ্বারোহী নিয়ে সার্দিয়া আক্রমণ করে। কায়সার

(রোম সম্রাট) প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়ে উমরকে বা উমর পাশাকে বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত রাখেন। ফলে তিনি (উমর পাশা) ইউরোপ থেকে নিজের প্রদেশে ফিরে আসেন। কিন্তু তার এই আক্রমণের ফল এই দাঁড়াল যে, সম্রাট এন্ডোনিকাসের পৌত্র বেপরোয়া হয়ে আপন পিতামহকে সিংহাসনচ্যুত করে স্বয়ং তাতে আরোহণ করেন। ৭৪২ হিজরীতে (১৩৪১-৪২ খ্রি) তার মৃত্যু হলে জন প্লালোগস কনসটান্টিনোপলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ৭৪৮ হিজরীতে (১৩৪৭-৪৮ খ্রি) কেন্টা কুজিন্স জন প্লালোগসকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৭৯৪ হিজরী (১৩৯১ খ্রি) পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকেন। তারপর আরো দু'জন সম্রাট ৮৫৭ হিজরী (১৪৫৩ খ্রি) পর্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। তারপর কনসটান্টিনোপল তুর্কীদের দখলে চলে আসে। সম্রাট কেন্টাকুজিন্স (কেন্টকোজিনী) সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথে সুলতান আরখানকে এশিয়া মাইনরের মহান সুলতান বলে স্বীকৃতি দেন এবং তুর্কদের আক্রমণ থেকে ইউরোপীয় এলাকাসমূহ রক্ষার জন্য সুলতানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সুলতান আরখানের কাছে প্রস্তাব পাঠান ঃ আমি আমার অতি সুন্দরী কন্যা থিউডোরাকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই। কায়সার জানতেন যে, সুলতান ষাট বছরের বৃদ্ধ এবং তার কন্যা উঠতি বয়সের যুবতী। তাছাড়া এখানে ধর্মের বিভিন্নতার প্রশ্নও রয়েছে। যা হোক, সুলতান কায়সারের ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং স্বয়ং কনসটান্টিনোপলে গিয়ে অত্যন্ত ধুমধামের সাথে রাণী থিউডোরাকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই বিবাহের পর কায়সার নিশ্চিন্ত হয়ে যান যে, এখন আর তুর্করা তার দেশ আক্রমণ করবে না। অতএব তিনি নিজেকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন। কিন্তু এর আট বছর পর এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা তুর্কদের হাতে ইউরোপে প্রবেশের একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। অর্থাৎ ৭৫৬ হিজরীতে (১৩৫৫ খ্রি) উপকূলীয় এলাকা এবং বন্দরসমূহকে উপলক্ষ করে ভেনিস এবং জেনেভা রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে একটি ভয়ানক বিরোধ দেখা দেয়। উভয় রাষ্ট্রই ছিল বিরাট নৌ-শক্তির অধিকারী। তারা সমগ্র রোম সাগরের উপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল। জেনেভাবাসীদের এলাকা ছিল কনসটান্টিনোপলের কায়সার অধিকৃত সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত। তাই স্বভাবতই কনসটান্টিনোপলের কায়সার জেনেভাবাসীদেরকে একান্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখতেন। এ কারণে তিনি ভেনিসবাসীদের সাফল্যই কামনা করছিলেন। ভেনিসবাসীরাও ছিল কনসটান্টিনোপলের কায়সারের শুভাকাঙ্ক্ষী। এদিকে আরখান ভেনিসবাসীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন এজন্য যে, ওরা এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ উপকূলে প্রায়ই মুসলমানদের নানা অসুবিধার কারণ হতো। তাছাড়া তারা আরখানের সাম্রাজ্যকেও হেয় নজরে দেখত। ফলে এই পরিস্থিতিতে আরখান স্বাভাবিকভাবেই জেনেভাবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাছাড়া জেনেভাবাসীরা আরখানের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখত।

হঠাৎ বসফোরাস উপত্যকার সন্নিকটে ভেনিস এবং জেনেভাবাসীদের মধ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়। এদিককার উপত্যকা সংলগ্ন প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান আরখানের পুত্র সুলায়মান খান।

একদিন সুলায়মান খান জেনেভাবাসীদের একটি নৌকায় শুধু চল্লিশজন লোক সঙ্গে নিয়ে রাতের বেলা দানিয়াল খাড়ি অতিক্রম করে ইউরোপীয় উপত্যকায় অবতরণ করেন এবং

সেখানকার দুর্গটি, যা ভেনিসবাসীদের শক্তির উৎস হিসাবে পরিগণিত হতো, অধিকার করেন। তারপর ত্বরিতগতিতে কয়েক হাজার তুর্ক ঐ দুর্গে গিয়ে তাদের শাহযাদার সাথে মিলিত হয়। এতে জেনেভাবাসীরা অত্যন্ত উপকৃত হয়। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কনসটান্টিনোপলের কায়সার অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি চিন্তা করছিলেন, সুলতান আরখানকে লিখবেন, যেন তিনি সুলায়মানকে ঐ দুর্গটি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন, ঠিক সেই মুহূর্তে স্বয়ং কায়সারের রাজধানীতে তার অপর জামাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে কায়সারের পক্ষে আপন রাজধানী রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব তিনি অবিলম্বে সুলতান আরখানের সাহায্য কামনা করেন। সুলতান আরখান তখন আপন পুত্র সুলায়মান খানকে লিখেন, তুমি অর্থ আদায় কর এবং ঐ দুর্গ ছেড়ে দিয়ে চলে এসো। সুলায়মান খান পিতার নির্দেশ পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। ফলে গ্যালিপোলী শহরের প্রাচীর ভেংগে পড়ে এবং শহরবাসীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক সেদিক ছুটে পালাতে থাকে। কিন্তু এই ভূমিকম্পেরই সুযোগ নিয়ে সুলায়মান খানের দুই অধিনায়ক আযদী বেগ ও গাযী ফাযিল ভগ্ন প্রাচীর অতিক্রম করে গ্যালিপোলী শহর দখল করেন। শহর দখল করার সাথে সাথে সুলায়মান খান প্রাচীর মেরামত করে সেখানে একটি শক্তিশালী তুর্কী বাহিনী মোতায়েন করেন। কায়সারের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি আরখানের কাছে এ সম্পর্কে একটি লিখিত অভিযোগ পেশ করেন। আরখান উত্তরে লিখেন, আমার পুত্র গ্যালিপোলী শহর অস্ত্রবলে জয় করেনি, বরং আকস্মিক ভূমিকম্পই তার জন্য ঐ শহর দখল করার সুযোগ এনে দিয়েছে। যা হোক আমি তাকে সেখান থেকে ফিরে আসার জন্য লিখবো এবং প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কেও তদন্ত করে দেখব। যেহেতু কায়সারের বার বার আরখানের সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল এবং ঘরোয়া বিবাদের কারণে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার প্রতিই তাকে অধিক মনোযোগী হতে হচ্ছিল তাই তিনি গ্যালিপোলী শহর ছেড়ে দেওয়ার জন্য ঐ সময়ে আরখানের উপর আর কোন ধরনের চাপ সৃষ্টি করেননি। ফলে সুলায়মান খানও গ্যালিপোলী শহর ছেড়ে আসেননি। তাছাড়া সুলায়মানের জন্য গ্যালিপোলী শহর নিজের দখলে রাখারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কেননা ভেনিসবাসীদের হস্তক্ষেপ থেকে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূল রক্ষা করতে হলে গ্যালিপোলীর উপর মুসলমানদের দখল থাকা অপরিহার্য। এটা হচ্ছে ৭৫৭ হিজরীর (১৩৫৬ খ্রি) ঘটনা। এর দু'বছর পর ৭৫৯ হিজরীতে (১৩৫৮ খ্রি) আরখানের পুত্র সুলায়মান খান ঈগল শিকার করতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। সুলায়মান খান ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও অসম সাহসী শাহযাদা। তাঁর মৃত্যুতে আরখান অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি বেঁচে থাকলে অবশ্যই আরখানের পর সিংহাসনে আরোহণ করতেন। পুত্রের এই অকাল মৃত্যুতে আরখান একেবারে মুষড়ে পড়েন এবং আটত্রিশ বছর সাম্রাজ্য শাসন করে ৭৬১ হিজরীতে (১৩৬০ খ্রি) পঁচাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আরখান তাঁর পিতার ওসীয়ত ও কৌশলসমূহ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করেন। তিনি তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করে ইউরোপ উপকূল পর্যন্ত তা বিস্তৃত করেন। আরখানের সম্পূর্ণ দৃষ্টি ছিল ইউরোপের উপর নিবদ্ধ। নিম্নোক্ত ঘটনা এর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যখন তাঁর পুত্র সুলায়মান খান বারুসার সন্নিকটে ঈগল শিকার করতে

গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যান তখন আরখান তাকে বারুসায় দাফন করেন নি, বরং তাঁর লাশ দানিয়াল খাড়ির অপরদিকে ইউরোপ উপকূলে নিয়ে যান, যা ছিল সুলায়মান কর্তৃক বিজিত ও উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত এলাকা এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করেন যাতে তুর্করা ইউরোপ উপত্যকা ছেড়ে আসার কথা কখনো চিন্তা না করে।

মুরাদ খান (প্রথম)

জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলায়মান খানের মৃত্যুর পর আরখান আপন কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ খানকে 'অলীআহ্দ' (পরবর্তী উত্তরাধিকারী) নিয়োগ করেন। অতএব আরখানের মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর বয়স্ক মুরাদ খান ৭৬১ হিজরীতে (১৩৬০ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুরাদ খানের আকাঙ্ক্ষা ছিল ইউরোপে আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করার। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করার পরপরই তাঁকে এশিয়া মাইনরের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কিরমানের তুর্কী সালজুক রাজ্যের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকতে হয়। তারপর ৭৬২ হিজরীতে (১৩৬১ খ্রি) তিনি আপন সেনাবাহিনী নিয়ে ইউরোপ উপকূলে অবতরণ করেন এবং আদ্রিয়ানোপল জয় করে সেখানেই আপন রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অর্থাৎ ৭৬৩ হিজরী (১৩৬১-৬২ খ্রি) থেকে কনসটান্টিনোপল জয় পর্যন্ত অর্থাৎ সুলতান মুহাম্মাদ খানের যুগ পর্যন্ত আদ্রিয়ানোপলই থাকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী। মুসলিম বাহিনী কর্তৃক আদ্রিয়ানোপল বিজিত হওয়ার সংবাদ শুনে বুলগেরিয়া এবং সার্দিয়াবাসীরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। তখন কনসটান্টিনোপলের কায়সার (সম্রাট) রোমের পোপের কাছে পয়গাম পাঠান ঃ আপনি ধর্মযুদ্ধের জন্য খ্রিস্টান জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করুন এবং মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠান। তখন পোপ একের পর এক সেনাবাহিনী পাঠাতে থাকেন। অপর দিকে হাঙ্গেরী, বসনিয়া প্রভৃতি রাজ্যের খ্রিস্টান রাজারাও সার্দিয়া ও বুলগেরিয়ায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং এই সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনী ৭৬৫ হিজরীতে (১৩৬৩-৬৪ খ্রি) আদ্রিয়ানোপলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। মুরাদ খান আপন সেনাপতি লালা শাহীনের নেতৃত্বে বিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। আদ্রিয়ানোপলের দুই মনযিল আগে প্রায় এক লক্ষ সৈন্যের বিরাট খ্রিস্টান বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা হয়। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানরা পরাজিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবার সময় হাজার হাজার খ্রিস্টান সৈন্য নিহত অথবা বন্দী হয়। লালা শাহীন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আরো অনেক দেশ জয় করেন। তিনি থারিস, দারুমিলিয়া প্রভৃতি প্রদেশে সামরিক জায়গীরদারীর প্রাচীন প্রথানুযায়ী আপন তুর্ক সম্প্রদায় এবং মুসলিম অধিনায়কদের অনেককেই জায়গীর প্রদান করেন। ঐ দেশকে সুসংগঠিত এবং আপন ক্ষমতা সেখানে সুদৃঢ় করার কাজে সুলতান মুরাদ খান বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত অবিরাম প্রচেষ্টা চালান। যুদ্ধবন্দী এবং খ্রিস্টান প্রজাদের নওজোয়ান ছেলেদের মাধ্যমে নেগচারী বাহিনীর আকারও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

খ্রিস্টানরা যখন লক্ষ্য করল যে, তুর্কী সুলতান তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করে আদ্রিয়ানোপলে পরিপূর্ণভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছেন তখন ৭৭৮ হিজরীতে (১৩৭৬-৭৭ খ্রি) তারা পুনরায় ইউরোপের সমগ্র শক্তিকে সুলতান মুরাদ খানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে এবার সার্দিয়া, বুলগেরিয়া হাঙ্গেরী, বসনিয়া, পোল্যান্ড, কনসটান্টিনোপল এবং রোমের পোপের বাহিনী সুলতান মুরাদ খান এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে

দেওয়ার জন্য সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হয়। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এবারও খ্রিস্টান বাহিনীর অনুপাতে এক-ষষ্ঠাংশ অথবা পঞ্চমাংশের চাইতে বেশি ছিল না। এই যুদ্ধেও খ্রিস্টানরা পূর্বের ন্যায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তখন সার্দিয়ার সম্রাট সুলতানকে বার্ষিক বারো মন বিশুদ্ধ রৌপ্য প্রদান এবং তলব করা মাত্র এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সম্বলিত একটি সাহায্য বাহিনী প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন। বুলগেরিয়ার সম্রাট সুলতানের খিদমতে আপন কন্যাকে পেশ করেন এবং ভবিষ্যতে সুলতানের অনুগত থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কনসটান্টিনোপলের কায়সার আপন তিনটি কন্যাকে এই আশা নিয়ে সুলতানের খিদমতে পেশ করেন যাতে তিনি স্বয়ং এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং অপর দুই কন্যাকে আপন দুই পুত্রের সাথে বিবাহ দেন। এই দুই যুদ্ধের পর কনসটান্টিনোপলের কায়সার যখন দেখলেন যে, মুরাদ খানকে ইউরোপ থেকে বিতাড়িত করা মোটেই সম্ভব নয় তখন তিনি একটা আপোস-রফার মাধ্যমে তার সাথে সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করেন। তিনি একদিকে মুরাদ খানকে তাঁর অধিকৃত ইউরোপীয় ভূখণ্ডসহ কনসটান্টিনোপলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতে দিয়ে নানাভাবে তার তোষামোদ করতে থাকেন, আবার অন্যদিকে গোপনে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও আঁটতে থাকেন। কনসটান্টিনোপলের কায়সার ৭৮২ হিজরীতে (১৩৮০-৮১ খ্রি) তাঁর যাবতীয় আভিজাত্য ও মানমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে রোম শহরে পোপের দরবারে গিয়ে হাযির হন এবং তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি সমগ্র ইউরোপের খ্রিস্টানদেরকে ধর্মযুদ্ধের নামে এক পতাকাতলে সমবেত করে সুলতান মুরাদের বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করাবেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা সফল না হলে তিনি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং সুলতানের রোষানল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপন পুত্র থিউডোরাসকে সুলতানের খিদমতে পাঠিয়ে আবেদন জানান, যেন ওকে (থিউডোরাসকে) নেগচারী বাহিনীতে ভর্তি করে সম্মানিত করা হয়। তিনি তাঁর এই কূটকৌশলের মাধ্যমে নিজের দিক থেকে সুলতানকে পুরোপুরি আশ্বস্ত রাখতে সক্ষম হন।

ঐ সময়ে এশিয়া মাইনরে সংঘটিত কয়েকটি বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতান মুরাদ খানকে সেখানে যেতে হয়। তখন তিনি তাঁর দখলকৃত ইউরোপ ভূখণ্ডের শাসন ক্ষমতা আড্রিয়ানোপলে আপন পুত্র সাওজীর হাতে অর্পণ করেন। সুলতানের এই অনুপস্থিতির সুযোগে কনসটান্টিনোপলের কায়সারের অপর পুত্র এন্ড্রোনিকাস আড্রিয়ানোপলে আসেন এবং মুরাদ খানের পুত্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু সেজে তাকে তার পিতা মুরাদ খানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি একদিন অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সুরে শাহযাদাকে বলেন, আমার পিতা সাম্রাজ্য পরিচালনার কোন যোগ্যতা রাখেন না এবং আমাকে নানাভাবে নির্যাতন করে থাকেন। অনুরূপভাবে আপনার পিতাও আপনার অন্যান্য ভাইয়ের অনুপাতে আপনার সাথে যথার্থ ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেন না। আজ এর প্রতিবিধানের একটা সুবর্ণ সুযোগ আপনার হাতে এসেছে। আমিও আমার বাহিনীর একটি বিরাট অংশকে আমার পক্ষে টেনে নিয়েছি। আসুন এবার আমরা উভয়ে মিলে কনসটান্টিনোপল জয় করে সেখানকার বর্তমান কায়সারকে বন্দী করি। এভাবে যখন কনসটান্টিনোপলের সিংহাসন আমার অধিকারে এসে যাবে তখন আমরা উভয়ে মিলে সুলতান মুরাদ খানের মুকাবিলা করতে সক্ষম হব। ফলে আপনি অতি সহজেই আড্রিয়ানোপলের সিংহাসন অধিকার করে তুর্কীদের সুলতান হয়ে বসবেন। খ্রিস্টান

রাজকুমারের এই যাদুকরী প্রলোভন মুসলিম শাহযাদাকে পথভ্রষ্ট করে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আপন সেনাবাহিনী নিয়ে খ্রিস্টান রাজকুমারের সাথে কনসটান্টিনোপলের উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং তা অবরোধ করেন। তারপর উভয়ে নিজ নিজ স্বাধিকার ঘোষণা করেন। মুরাদ খান এই বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার কথা জানতে পেরে অনতিবিলম্বে এশিয়া মাইনর থেকে আড্রিয়ানোপলে চলে আসেন। উভয় শাহযাদা কনসটান্টিনোপল ছেড়ে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে একটি নদীর তীরে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সুলতান মুরাদ খানের মুকাবিলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। মুরাদ খান আড্রিয়ানোপল পৌঁছেই কায়সার প্লেলোগাসকে লিখেন ঃ তুমি অবিলম্বে আমার দরবারে এসে হাযির হও এবং জবাব দাও, কেন এরূপ ঘটনা ঘটল এবং তুমি তোমার পুত্রকে আমার পুত্রের কাছে পাঠিয়ে কেনই বা এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলে? কায়সার সুলতানের এই লেখা পেয়ে একেবারে আতংকিত হন। তিনি উত্তর দেন, মহান সুলতান! আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। আপনি উভয় শাহযাদাকেই বন্দী করুন এবং তাদেরকে এই দুষ্কর্মের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি দিন। আমিও এ ব্যাপারে আপনার সাথে রয়েছি। আমি চাই যেন এই বিদ্রোহীদেরকে বন্দী করে হত্যা করা হয়। এই উত্তর পেয়ে সুলতান স্বয়ং ঐ বিদ্রোহীদের উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং তারা নদীর যে তীরে অবস্থান করছিল তিনি তার অপর তীরে অবস্থান গ্রহণ করেন। তারপর রাতের বেলা একাকী অপর তীরে গিয়ে পৌঁছেন এবং বিদ্রোহীদের ক্যাম্পে ঢুকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিদ্রোহীদের সঙ্গ ছেড়ে এখনো আমার সাথে যোগ দেবে তার সমস্ত অপরাধ মাফ করে দেওয়া হবে। সুলতানের এই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে সকল সৈন্য এবং পুঁজিপতি, যারা শাহযাদাদের সঙ্গে ছিল, সুলতানের চারপাশে এসে সমবেত হয়। এই অবস্থা দেখে উভয় শাহযাদা সামান্য কয়েকজন তুর্ক এবং খ্রিস্টানকে সাথে নিয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন এবং কিছুদূর যেতে না যেতেই উভয়ে সুলতানের সৈন্যদের হাতে বন্দী হন। তাদেরকে সুলতানের সামনে পেশ করা হলে সুলতান মুরাদ খান আপন পুত্রকে সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ করে ফেলেন; তারপর তাকে হত্যারও নির্দেশ দেন। এবার তিনি কায়সারের পুত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দেন এবং লিখেন— তুমি নিজ হাতেই আপন পুত্রকে শাস্তি দাও যেমন আমি আমার পুত্রকে দিয়েছি। কায়সারের জন্য এটি ছিল একটি অতি কঠিন পরীক্ষা। তিনি কি করে নিজ হাতে আপন পুত্রকে শাস্তি দিবেন? আর শাস্তি না দিলে সুলতানের রোষানল থেকে কিভাবে রক্ষা পাবেন ? শেষ পর্যন্ত তিনি আপন পুত্রের চোখে এসিড ঢেলে দিয়ে তাকে অন্ধ করেন, তবে প্রাণে বধ করেন নি। সুলতান যখন শুনতে পান য, কায়সার তাঁর নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তার পুত্রকে অন্ধ করে ফেলেছেন তখন তিনি আনন্দিত হন। তবে তিনি কেন তার পুত্রকে জীবিত রাখলেন সে ব্যাপারে আর কোন আপত্তি তুললেন না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই ছিল যে, কায়সার তার পুত্রকে সম্পূর্ণ অন্ধ করেন নি, বরং তার দৃষ্টিশক্তি বাকি ছিল এবং কিছুদিন পর ঘা শুকিয়ে গিয়ে দুই চোখই সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গিয়েছিল।

৭৮৯ হিজরীতে (১৩৮৭ খ্রি) কারাকয়ূনলু কামানুন এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাঞ্চলে শক্তিশালী হয়ে উঠেন এবং সুলতান মুরাদ খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কূনিয়ার নিকটে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সুলতান মুরাদ খানের পুত্র বায়াযীদ খান অত্যন্ত

ক্ষিপ্রতার সাথে হামলা চালিয়ে প্রতিপক্ষকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করেন। বায়াযীদ খানের এই বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার জন্য সুলতান তাকে বায়াযীদ ইয়ালদিরিম (বিদ্যুৎ) উপাধি প্রদান করেন। ঐ দিন থেকে বায়াযীদ 'ইয়ালদিরিম' নামেই খ্যাতি লাভ করেন। তুর্কমানীদের অধিনায়কদের মধ্যে সুলতান মুরাদ খানের জামাতাও ছিলেন। কিন্তু জামাতার স্ত্রী তথা মুরাদ খানের কন্যা আপন পিতার কাছে সুপারিশ করলে তিনি জামাতাকে প্রাণদণ্ড থেকে রেহাই দেন। তারপর ঐ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যের সাথে পুনরায় মুরাদ খানের সুসম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। যা হোক এবার সুলতান কিছুদিন বারূসায় অবস্থান করে এশিয়া মাইনরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরো সুদৃঢ় করে তোলার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এদিকে ইউরোপে মুসলমানদের বিরোধিতা এবং তাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করার উৎসাহ-উদ্দীপনা পূর্বের মতই বিদ্যমান ছিল। ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ এবং পাদ্রীদের উত্তেজনাকর ধর্মীয় বক্তৃতামালা সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে মুসলমানদের একটি ভয়ংকর ও ঘৃণিত ছবি উপস্থাপন করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল ঘৃণা-বিদ্বেষের আগুন। এবার যখন খারীস দারুমিলিয়া এবং তারও সম্মুখবর্তী দেশ সুলতান মুরাদ খানের দখলে আসল এবং সেখানে মুসলমানদের নতুন বসতি গড়ে উঠতে লাগল তখন স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র ইউরোপে একটি বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। এদিকে সার্বিয়ার সম্রাট কনসটান্টিনোপলের কায়সার এবং রোমের পোপ ইউরোপের সব দেশেই তুর্কদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য রাষ্ট্রদূত, প্রতিনিধি এবং প্রচারক দল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এটা ছিল ঠিক সে ধরনেরই তৎপরতা, যা একদা মুসলমানদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস ছিনিয়ে নেওয়া এবং সমগ্র সিরিয়ায় ক্রুসেড যুদ্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে চালানো হয়েছিল। তুর্করা বলকানে পৌঁছার পর খ্রিস্টানরা সিরিয়ার কথা ভুলে যায়। এবার তারা নিজেদের দেশকে বাঁচাবার জন্য জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সুলতান মুরাদ খান এশিয়া মাইনরে এমন এক পরিবেশে ছিলেন যে, খ্রিস্টানদের এসব অপতৎপরতার কোন খোঁজই তিনি রাখতেন না। কেননা ঐ যুগে সংবাদ আদান-প্রদানের এমন কোন মাধ্যম ছিল না, যার দ্বারা জানা যেতে পারত যে, তাঁর বিরুদ্ধে কোথায় এবং কিভাবে ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে। ৭৯১ হিজরীতে (১৩৮৯ খ্রি) সুলতান মুরাদ খান বারূসায় অবস্থান করছিলেন। এই বছরই খাজা হাফিজ শিরাযী এবং হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (র) ইনতিকাল করেন। এদিকে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী, গ্লিশিয়া, পোল্যান্ড, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ইতালী, বসনিয়া প্রভৃতি দেশ ও জাতি একজোট হয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্য উৎখাত করার ব্যাপারে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। ৭৯১ হিজরীতে (১৩৮৯ খ্রি) বারূসায় সুলতান মুরাদ খানের কাছে এই সংবাদ এসে পৌঁছে যে, তার চব্বিশ হাজার সৈন্যের যে তুর্কী বাহিনী রূমেলিয়ায় অবস্থান করছিল, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার খ্রিস্টান বাহিনীর হামলায় তা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বর্তমানে রাজধানী আদ্রিয়ানোপলসহ মুসলিম অধিকৃত সমগ্র ইউরোপ এলাকার অধিবাসীরা দারুণ আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সুলতান মুরাদ খান বারূসা থেকে রওয়ানা হন এবং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আদ্রিয়ানোপলে গিয়ে পৌঁছেন। তিনি সেখান থেকে ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী আপন সেনাপতি

আলী পাশার নেতৃত্বে অগ্রে প্রেরণ করেন যাতে তারা শত্রুদের অগ্রযাত্রায় বাধা প্রদান করে এবং নিজে আদ্রিয়ানোপলে অবস্থান করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেন। ৭৯২ হিজরীতে (১৩৯০ খ্রি) আলী পাশা বুলগেরিয়ার সম্রাট সাসওয়ালকে পরাজিত করেন। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে পুনরায় সুলতানের বশ্যতা স্বীকারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। সার্দিয়ার সম্রাট খ্রিস্টান দেশসমূহের সম্মিলিত বাহিনীকে সার্দিয়া ও বসনিয়ার সীমান্তবর্তী কাসূদা নামক স্থানে একত্র করেন। ইউরোপের এই বিশাল বাহিনী অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে আগে ভাগেই সুলতান মুরাদ খানের কাছে যুদ্ধের পয়গাম পাঠায়। মুরাদ খানও তখন একটি চূড়ান্ত ফায়সালাকারী যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। এবার তিনি নিজেরই অধিনায়কত্বে সমগ্র বাহিনী নিয়ে আদ্রিয়ানোপল থেকে রওয়ানা হন এবং দুর্গম পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে কাসূদার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হন। এই যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে সানতাজা নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। ঐ নদীর উত্তর পার্শ্বে খ্রিস্টান বাহিনী পূর্ব থেকে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। ৭৯২ হিজরীতে (১৩৯০ খ্রি) সুলতান মুরাদ আপন বাহিনী নিয়ে নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করেন। খ্রিস্টানরা যখন লক্ষ্য করল যে, মুসলিম বাহিনী সংখ্যা ও রসদপত্রের দিক দিয়ে তাদের বাহিনীর এক-চতুর্থাংশের সমান তখন তাদের সাহস আরো বেড়ে গেল। তাছাড়া সেখানে পূর্ব থেকে অবস্থান করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই খ্রিস্টান সৈন্যরা ছিল সুস্থ-সজীব। আর মুসলমানরা দুর্গম ও দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সদ্য সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিল বলে তারা তখন ছিল শ্রান্ত-ক্লান্ত। তাছাড়া খ্রিস্টানদের কাছে ঐ এলাকা নতুন বা অপরিচিত কোন ভূখণ্ড ছিল না। কেননা ঐ এলাকার অধিবাসীরা ছিল তাদের বন্ধু, স্বজাতীয় ও স্বধর্মাবলম্বী। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা ছিল তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু মুসলমানদের জন্য ঐ দেশটি ছিল একটি ভিন্ন দেশ। সেখানকার অধিবাসীরা ছিল তাদের কাছে অপরিচিত এবং স্বাভাবিকভাবে শত্রুভাবাপন্ন। সুলতানী বাহিনী সেখানে গিয়ে পৌঁছার দিন রাতের বেলা উভয় বাহিনীই নিজ নিজ কর্মপন্থা সম্পর্কে সলাপরামর্শ করতে বসে। কোন কোন খ্রিস্টান অধিনায়ক এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এখন এই রাতের বেলায়ই আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু যেহেতু খ্রিস্টানরা তাদের বিজয় সম্পর্কে পুরোপুরি আস্থাশীল ছিল, তাই তাদের অধিকাংশ অধিনায়ক উপরোক্ত অভিমতের বিরোধিতা করেন এই বলে যে, এই সময়ে হামলা করলে মুসলিম বাহিনীর একটি বিরাট অংশ অন্ধকারের সুযোগে পালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। অথচ এবার আমরা তাদের একটি প্রাণও জীবিত রাখতে চাই না। আর আমাদের এই লক্ষ্য একমাত্র দিনের বেলায়ই অর্জিত হতে পারে।

এদিকে খ্রিস্টান বাহিনীর আধিক্য লক্ষ্য করে মুসলমানদের মধ্যেও কিছুটা ভীতি পরিলক্ষিত হয়। সুলতান যে পরামর্শ সভা আহ্বান করেছিলেন তাতে কোন কোন অধিনায়ক এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, মালবহনকারী উটসমূহকে সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তাদের দ্বারাই একটি জীবন্ত প্রাচীর গড়ে তোলা হোক। এতে একটি বড় উপকার এই হবে যে, শত্রুরা আক্রমণ করতে এগিয়ে আসলে তাদের অশ্বসমূহ এই সমস্ত উট দেখে ভীতিগ্রস্ত হয়ে এদিক সেদিক পালাতে থাকবে। ফলে শত্রুদের

সম্মুখসারি তথা রক্ষাব্যূহ ভেঙে পড়বে। কিন্তু সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াযীদ ইয়ালদিরিম এই অভিমতের বিরোধিতা করে বলেন, এটা হচ্ছে দুর্বলতা ও ভীতিগ্রস্ততার চিহ্ন। আমাদের জন্য সেরূপ কোন কর্মকৌশল অবলম্বন করা মোটেই বাঞ্ছনীয় হবে না, যা শত্রুদের কাছে আমাদেরকে দুর্বল ও ভীতিগ্রস্ত প্রতিপন্ন করে। এদিকে সুলতান হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, অত্যন্ত প্রবল বেগে ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে এবং তা শত্রুদের পিছন দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর দিকে এগিয়ে আসছে এবং তাদের চেহারা প্রথমে ধূলিতে ধূসরিত, তারপর বৃষ্টির পানিতে জবুথবু করে দিচ্ছে। এটা ছিল মুসলমানদের সর্বনাশেরই একটি আলামত। আপন বাহিনীর সংখ্যাল্পতা এবং দুর্বলতা লক্ষ্য করে সুলতান মুরাদ খান আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত কামনা করতে থাকেন। তিনি ভোর পর্যন্ত আল্লাহ্র দরবারে শুধু এই দু'আই করতে থাকেন– প্রভু! আজ ইসলাম ও কুফরের মুকাবিলা হচ্ছে। তুমি আমাদের ভুলভ্রান্তি ও অপরাধের দিকে তাকিয়ো না, বরং আপন রাসূল ও দীনে হকের সম্ভ্রম রক্ষা কর। আল্লাহ্ তা'আলা সত্যি সত্যি সুলতানের এই দু'আয় সাড়া দিলেন। তাই দেখা গেল ভোর হওয়ার সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ধূলোবালি কেটে গিয়ে একটি আনন্দদায়ক ও অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি ও বাতাস বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে উভয় পক্ষ সারিবদ্ধভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হলো। সুলতান মুরাদ খান আপন ইউরোপীয় এলাকার জায়গীরদারদের সরবরাহকৃত সৈন্যদেরকে ডান পাশের বাহিনীতে মোতায়েন করেন এবং শাহযাদা বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের হাতে সেই বাহিনীর অধিনায়কত্ব অর্পণ করেন। বাম পাশের বাহিনীতে মোতায়েন করা হয় এশীয় অঞ্চলের সৈন্যদেরকে এবং সেই বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয় শাহযাদা ইয়াকূবকে। সুলতান মুরাদ খান আপন দেহরক্ষীদের নিয়ে মধ্যবর্তী বাহিনীতে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি অনিয়মিত অশ্বারোহী, পদাতিক ও বিদ্যোৎসাহী যোদ্ধাদেরকে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত করে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার জন্য সামনে বাড়িয়ে দেন। অপরদিকে খ্রিস্টানদের মধ্যবর্তী বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন সম্রাট লাযরাস। তাদের ডানপাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন লাযরাসের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বাম পাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন বসনিয়ার সম্রাট স্বয়ং। উভয় পক্ষের সৈন্যরাই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অগ্রসর হয় এবং একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুপুর পর্যন্ত উভয় বাহিনীই অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে। তখনও জয়-পরাজয়ের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয়নি। শেষ পর্যন্ত সুলতানের পুত্র ইয়াকূবের বাহিনীতে অস্থিরতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। তিনি মধ্যবর্তী বাহিনীর দিকে পশ্চাদপসরণ করতে থাকেন। এই অবস্থা লক্ষ্য করে স্বয়ং মুরাদ খান সেদিকে মনোনিবেশ করেন এবং বিচলিত ও বিক্ষিপ্ত সারিগুলোকে পুনরায় সংগঠিত করে সামনের দিকে এগিয়ে দেন। ঐ দিন সুলতান মুরাদ খানের হাতে ছিল একটি বিরাট লৌহদণ্ড। শত্রুপক্ষের কেউ তার সামনে আসা মাত্র তিনি ঐ লৌহদণ্ডের আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলতেন। অত্যন্ত জোরেশোরে যুদ্ধ চলছিল। লাশে ভরে উঠেছিল সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র। হঠাৎ খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। খ্রিস্টান যোদ্ধারা পিছন দিকে পালাতে শুরু করে। এই অবস্থা লক্ষ্য করে মুসলিম যোদ্ধারা আরো মারমুখী হয়ে ওঠে এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে হামলা চালিয়ে খ্রিস্টানদের

সর্বাধিনায়ক সার্বিয়া সম্রাটকে বন্দী করে। এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হয় এবং তাদের প্রায় সকল সেরা অধিনায়ক মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। সার্বিয়া সম্রাটকে বন্দী অবস্থায় সুলতানের সামনে হাযির করা হলে তিনি তাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আটক রাখার নির্দেশ দেন। ঠিক ঐ মুহূর্তে যখন খ্রিস্টান যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়ে গিয়েছিল তখন খ্রিস্টানদের রূবাহ নামীয় জনৈক অধিনায়ক মুসলমানদের এই বিরাট বিজয়ানন্দকে একেবারে বিষাদে পরিণত করে দেয়।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সার্বিয়ার এই অধিনায়ক পলায়নকারী খ্রিস্টান যোদ্ধাদের মধ্য থেকে হঠাৎ আপন ঘোড়ার মুখ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে পশ্চাদ্ধাবনকারী মুসলমানদের প্রতি বিনীত আহ্বান জানায়ঃ তোমরা আমাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে তোমাদের বাদশাহের কাছে নিয়ে চলো। আমি খ্রিস্টানদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েই নিজেকে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আমি এ সম্পর্কে সুলতানের কাছে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই এবং সেই সাথে ইসলামও গ্রহণ করতে চাই। অতএব মুসলমানরা তাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে নিয়ে আসে। বিজয় ঘোষিত হওয়ার পর সুলতানের সামনে বিশিষ্ট বন্দীদের পেশ করা কালে এই অধিনায়ককেও পেশ করা হয়। তারপর তার বন্দী হওয়ার কারণ ও অবস্থা সম্পর্কেও সুলতানকে অবহিত করা হয়। সুলতান তার কথাবার্তা শুনে আনন্দিত হন এবং তাকে আপন সান্নিধ্য লাভেরও সুযোগ দেন। তখন ঐ সার্বীয় অধিনায়ক অত্যন্ত শিষ্টতার সাথে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সুলতানের পায়ের উপর আপন মাথা রাখে। ফলে সুলতান ও তার সভাসদরা তার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আরো বেশি আশ্বস্ত হন। কিছুক্ষণ পর অধিনায়ক সুলতানের পায়ের উপর থেকে আপন মাথা উঠায় এবং ত্বরিত বেগে আপন কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখা একটি ছোরা বের করে তার দ্বারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে সুলতানের বুকে আঘাত করে। এতে সুলতান ভীষণভাবে আহত হন এবং উপস্থিত সৈন্যরা রূবাহকে একেবারে টুকরা টুকরা করে ফেলে। সুলতান পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে, তাঁর বাঁচার আর কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি অবিলম্বে সার্বিয়া-সম্রাটকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং তা সঙ্গে সঙ্গে পালন করা হয়। কিছুক্ষণ পর সুলতান মুরাদ খানও এই দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেন। এটা ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ আগস্টের ঘটনা। সুলতান মুরাদ খানের মৃত্যুর পর বাহিনী অধিনায়করা পরবর্তী সুলতান হিসাবে সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের হাতে বায়আত করেন। কসোভা যুদ্ধকে বিশ্বের অন্যতম বিরাট যুদ্ধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই যুদ্ধ প্রমাণ করে যে, সমগ্র ইউরোপ একত্র হয়েও উসমানীয়দেরকে ইউরোপ থেকে বের করতে পারবে না। মুসলমানরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর খ্রিস্টানদের ধর্মীয় যুদ্ধের উন্মাদনা হ্রাস পায়। এবার তারা নিজেদের ঘর নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সিরিয়া জয়ের আকাঙ্ক্ষাও তাদের অন্তর থেকে মুছে যায়। এই যুদ্ধ এটাও প্রমাণ করে যে, খ্রিস্টান বাহিনীর সংখ্যাধিক্য মুসলিম বাহিনীর বীরত্ব ও উৎসাহ-উদ্দীপনাকে কখনো দমাতে পারবে না। খ্রিস্টানদের এই পরাজয় বিশ্বের বিরাট পরাজয়সমূহের অন্যতম। উসমানীয় সালতানাতের এই বিজয় ইউরোপের মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে আরো

সুদৃঢ় করে। এদিকে স্পেন ও ফ্রান্সের খ্রিস্টানরা, যারা গ্রানাডার মুসলিম সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য বলতে গেলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মুসলমানদের এই বিজয়ের কারণে কিছুটা দমে যায়। ফলে সাময়িকভাবে হলেও গ্রানাডার মুসলমানদের জীবনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে।

সুলতান মুরাদ খান পঁয়তাল্লিশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে তেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুত্র বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম পিতার লাশ বারূসায় নিয়ে এসে সমাধিস্থ করেন। সুলতান মুরাদ খান অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিদ্যোৎসাহী, বিচক্ষণ, সূফী হৃদয় ও আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন।

সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিম

বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম সিংহাসনে আরোহণ করার পর পিতার লাশ বারূসায় দাফন করে কিছুদিন পর্যন্ত মাইনরে অবস্থান করেন। তখন তিনি তুর্কমানের বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতার প্রতিবিধান করতে থাকেন। এটা ছিল সেই যুগ, যখন চেঙ্গিযী মুঘলদের পতনের পর এশিয়ার আর একজন বিজয়ীর অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং তার নাম ছিল তাইমূর। পরবর্তীতে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তার সিংহাসন আরোহণ করার দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ ৭৯৩ হিজরীতে (১৩৯১ খ্রি) বায়াযীদ ইয়ালদিরিম শুনতে পান যে, ইউরোপে তুর্কদের বিরুদ্ধে পুনরায় ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে এবং সার্বিয়া ও বসনিয়া অঞ্চলে পুনরায় বিদ্রোহের অবস্থা দেখা দিয়েছে। অতএব, বায়াযীদ খান ঝড়ের বেগে ইউরোপে এসে আবির্ভূত হন এবং বসনিয়া থেকে শুরু করে দানিয়ূব নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফুরাত নদী থেকে দানিয়ূব নদী পর্যন্ত আপন অধিকার বিস্তৃত করেন। ওয়াল্লাশিয়া, সার্বিয়া, বসনিয়া প্রভৃতি ছিল সুলতান বায়াযীদের করদরাজ্য। এদিকে এশিয়া তথা ইরানে চেঙ্গিযী মুঘলদের ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার পর যেভাবে এখানে সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যেভাবে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছিল তাতে তাইমূরের বিজয় অভিযানের পথ অত্যন্ত সুগম হয়। বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের এই শান-শওকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে কনসটান্টিনোপলের কায়সার বায়াযীদ খানের কাছে আবেদন জানান : কনসটান্টিনোপল, মেসিডোনিয়া প্রদেশ এবং সেই সাথে গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের মাত্র কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আমার অধীনে রয়েছে। আপনি এই সামান্য ভূখণ্ডটুকু অনুগ্রহপূর্বক আমারই অধিকারে থাকতে দিন এবং আমার সাথে আপনার আপোস চুক্তি বহাল রাখুন। বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম একান্ত দয়াপরবশ হয়ে কায়সারের ঐ প্রার্থনা মনযুর করেন এবং তাঁকে তাঁর অধিকৃত ভূখণ্ড স্বাধীনভাবে শাসন করার অধিকার দিয়ে নিজে মধ্য ইউরোপের প্রতি মনোনিবেশ করেন। কায়সার নিজের দিক থেকে বায়াযীদকে এভাবে আশ্বস্ত করে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতে শুরু করেন। তিনি গোপনীয়ভাবে ইরান, খুরাসান, পারস্য, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশে নিজের দূত পাঠাতে থাকেন। এশিয়ার মুসলিম সুলতানদের সাথেও তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেন। আমাদের এই যুগে তো এ ধরনের ষড়যন্ত্র প্রায় সাথে সাথেই ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু ঐ যুগে তখনকার অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ সম্পর্কে বায়াযীদ খানের অনবহিত থাকাটা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। যা হোক, কনসটান্টিনোপলের কায়সার একদিকে অনুরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং অপর দিকে

আর্মেনিয়া, কুর্দিস্তান ও আযারবায়জানের মুসলিম শাসকরা সম্ভবত ঐ যুগের পরিস্থিতিতে এক-তরফাভাবে এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছিল। এসব কার্যকারণ একত্র হয়ে শেষ পর্যন্ত এমনি এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, তুর্কমানরা বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের এশীয় এলাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বায়াযীদ খান যদি চাইতেন তাহলে ইরাক, খুরাসান প্রভৃতি এলাকার প্রতি মনোনিবেশ করে আপন এশিয়া মাইনরের সাম্রাজ্যটি আরো অনেক বিস্তৃত করতে পারতেন। কিন্তু উসমান খান ও তাঁর বংশধরদের মধ্যে ধর্মপরায়ণতা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ কারণে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে কিংবা মুসলিম অধিকৃত এলাকা দখল করাকে মোটেই বাঞ্ছনীয় মনে করতেন না। প্রথম থেকেই উসমানীয় সাম্রাজ্যের পলিসি ছিল, যতদূর সম্ভব খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং খ্রিস্টান অধিকৃত এলাকা জয় করা, যাতে খ্রিস্টান অধিকৃত সমগ্র ইউরোপে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমও তাঁর পূর্বপুরুষদের এই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে যাচ্ছিলেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতি তাঁর কোনই আগ্রহ ছিল না। এবার যখন তুর্কমানরা একতরফাভাবে আক্রমণ চালিয়ে বারুসা ও আংকারার মধ্যবর্তী কোন এক স্থানে মোতায়েনকৃত বায়াযীদের আঞ্চলিক এশীয় বাহিনীকে পরাজিত করে এক বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তখন বায়াযীদ খান বাধ্য হয়ে ইউরোপের খ্রিস্টানদের মুকাবিলা ছেড়ে দিয়ে ৭৯৫ হিজরীতে (১৩৯৩ খ্রি) এশিয়া মাইনরের দিকে রওয়ানা হন এবং এখানে এসে পৌছার সাথে সাথে শত্রুবাহিনীকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন। তাদের অনেকেই তাঁর হাতে বন্দী হয়। যেহেতু এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, তাই বায়াযীদ ঐ দিকের রাজ্যগুলোকে আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে সেখানে যথারীতি শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বছরই তিনি মিসরের আব্বাসীয় খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবরাহীমের কাছে উপহার-উপঢৌকন পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকে 'সুলতান' উপাধি লাভ করেন। ইতিপূর্বেকার উসমানীয় শাসকদেরকে ঐতিহাসিকরা 'সুলতান' উপাধিতে স্মরণ করলেও প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে 'আমীর' বলা হতো। যেমন আমীর উসমান খান, আমীর আরখান, আমীর মুরাদ খান ইত্যাদি।

৭৯৫ হিজরীতে (১৩৯৩ খ্রি) আব্বাসীয় খলীফাদের ধর্মীয় মর্যাদা, যা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে সর্বজনস্বীকৃত ছিল, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বায়াযীদ খান আব্বাসীয় খলীফার কাছ থেকে 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করাটা নিজের জন্য জরুরী মনে করেন। অথচ তিনি জানতেন যে, আব্বাসীয় খলীফা মিসরের মামলূক শাসকদের আশ্রয়েই কালাতিপাত করছেন। মোট কথা, বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমকে সর্বপ্রথম উসমানীয় সুলতান বলা যেতে পারে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ধারণা, সুলতান বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম একজন বীরযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও উসমানীয় সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুলতান, যিনি ইউরোপের দুরাচার-দুষ্কর্ম এবং নিজের কিছুসংখ্যক অসৎ উপদেষ্টার প্রভাবে পড়ে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। এই বর্ণনা যদি সত্য হয় তাহলে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের শেষ কীর্তিকাণ্ড তথা আংকারা যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর অদূরদর্শিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তাতে তাঁর মদ্যপানের কিছু আলামত এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। ইউরোপীয়

ঐতিহাসিকগণ সুলতান বায়াযীদকে আরামপ্রিয় ও বদস্বভাবী বলেও আখ্যায়িত করেছেন। এর মধ্যেও আমরা আশ্চর্যের কিছু দেখি না। কেননা যেখানে মদ্যপান থাকবে সেখানে আরামপ্রিয়তা ও বদস্বভাবের অস্তিত্ব থাকবে। এতদসত্ত্বেও আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, একজন দিগ্বিজয়ী সুলতান হিসাবে বায়াযীদ খান ছিলেন অনন্য। তিনি ছিলেন একজন অতুলনীয় বীরপুরুষ। ফলে শত্রুরা তাঁর ভয়ে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত। বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের মধ্যে যদি মদ্যপানের অভ্যাস ও আরাম-প্রিয়তা ঢুকেই থাকে তাহলে এটাও ছিল খ্রিস্টান সম্রাটদের কূটকৌশল ও গোপন তৎপরতার ফল। কেননা প্রথম থেকেই খ্রিস্টান সম্রাটরা তাদের কন্যাদেরকে বলতে গেলে উপঢৌকনস্বরূপ উসমানীয় সুলতানদের প্রাসাদে পাঠাতে শুরু করেছিলেন। অতএব মদ্যপানের প্রতি প্ররোচনাদানকারিণী খ্রিস্টান রাজকুমারীরা বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের রাজপ্রাসাদে বিদ্যমান ছিল। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানরা তাদের ঈমানী শক্তি ও ধর্মপরায়ণতার কারণে খ্রিস্টান শয়তানদের প্ররোচনা থেকে নিজেদের পবিত্র রাখতে সক্ষম হলেও যে বায়াযীদ খান যুদ্ধক্ষেত্রে আপন প্রবল থেকে প্রবলতর শত্রুকেও কোন পাত্তা দিতেন না, তিনি দুর্ভাগ্যবশত আপন প্রাসাদের অবলাদের কাছে এ ক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করেছিলেন।

বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম ৭৯৫ হিজরী (১৩৯৩ খ্রি) থেকে ৭৯৯ হিজরী (১৩৯৭ খ্রি) পর্যন্ত আপন রাজধানী আড্রিয়ানোপল এবং ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনুপস্থিত থাকেন। এই পুরো সময়টাই তিনি এশিয়া মাইনরে কাটান। ৭৯৯ হিজরীতে (১৩৯৭ খ্রি) তিনি শুনতে পান যে, হাঙ্গেরীর সম্রাট সাজান্ড-এর অনবরত প্রচেষ্টার ফলে ইউরোপের সমগ্র রাজশক্তি একত্রিত হয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে ফেলেছে এবং ইতিমধ্যে তাদের সেনাবাহিনীর আনাগোনাও শুরু হয়ে গেছে। এবার ফ্রান্স এবং বৃটেনও তাদের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে খ্রিস্টান রাজন্যবর্গ ও জাতিপুঞ্জের সাথে যোগ দিয়েছে। অর্থাৎ ইতালী, ফ্রান্স, বৃটেন, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, জার্মানী, এশীয় বসনিয়া প্রভৃতি দেশ ও জাতি গত কয়েক বছরের অবকাশে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে। কনসটান্টিনোপলের কায়সার তাদের সাথে প্রকাশ্যে যোগ দেননি এ কারণে যে, তাঁকে সব সময়ই সুলতান বায়াযীদের শ্যেনদৃষ্টির আওতায় কালাতিপাত করতে হচ্ছিল। তবে গোপনভাবে এবং আদর্শগত দিক দিয়ে তিনিই ছিলেন এই যুদ্ধ প্রস্তুতির মূল হোতা। কেননা একমাত্র তিনিই ছিলেন তুর্কী সুলতানদের প্রতি সর্বাধিক বিদ্বেষভাবাপন্ন। অথচ বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম ছিলেন কায়সারের দিক থেকে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত এবং তাঁর প্রতি সর্বাধিক উদারভাবাপন্ন। যাহোক খ্রিস্টানদের এই যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ শুনে বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম বিদ্যুৎগতিতে ইউরোপ ভূখণ্ডে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, রোমান পোপ ইউনিফাস ইউরোপের দেশসমূহে এই মর্মে একটি ফতওয়া (ধর্মীয় বিধান) জারি করেছেন যে, যে খ্রিস্টান হাঙ্গেরীতে পৌঁছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে সে সমস্ত গুনাহ্ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। এর কিছু পূর্বে যখন ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল তখন পোপ ও অন্যান্য প্রভাবশালী খ্রিস্টান উভয় দেশের সম্রাটদেরকে বুঝিয়ে এ ব্যাপারে রাযী করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের মূলোৎপাটন না করা পর্যন্ত ঐ যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। অতএব কাউন্ট দি নিউবাস ডিউক অব

বারগান্ডী-এর অধীনে বারগান্ডী এলাকার বীরযোদ্ধাদের একটি বিরাট বাহিনী হাঙ্গেরী সম্রাট সাজান্ডের সাহায্যের জন্য হাঙ্গেরী অভিমুখে পাঠানো হয়। ফরাসী সম্রাটের তিন পিতৃব্য জেম্‌স, ফিলিপ ও হেনরীর নেতৃত্বে ফ্রান্সের সেনাবাহিনীও হাঙ্গেরী অভিমুখে রওয়ানা হয়। জার্মানীর টিউটাংক রাজকুমারবৃন্দ এবং বড় বড় কাউন্ট আপন আপন বাহিনী নিয়ে হাঙ্গেরী এসে পৌঁছেন। বুমেরিয়ার একটি বিরাট বাহিনী এক্টর পিলটন এবং কাউন্ট অব মিঙ্গপাল গ্রেডের অধিনায়কত্বে হাঙ্গেরী অভিমুখে রওয়ানা হয়। অস্ট্রিয়ার একটি অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন কাউন্ট দি সিলী। অনুরূপভাবে ইতালী এবং দূর-দূরান্তের দ্বীপসমূহ থেকেও অভিজ্ঞ বীর যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীসমূহ হাঙ্গেরী অভিমুখে রওয়ানা হয়। সেন্টজন জেরুজালেমের অধীনেও খ্রিস্টানদের একটি বিরাট বাহিনী হাঙ্গেরীতে আসে। এভাবে হাঙ্গেরীতে যখন খ্রিস্টান বাহিনীসমূহের বিরাট সমাবেশ ঘটে তখন হাঙ্গেরী সম্রাট সাজান্ড আপন সাম্রাজ্যের সব দিক থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে এক বিরাট বাহিনী গড়ে তোলেন, তারপর তিনি ওয়াল্লাশিয়ার খ্রিস্টান বাদশাহকে যিনি সুলতান বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন, লিখেন– এখন তোমার জন্য এটাই সমীচীন যে, তুমি বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের আনুগত্য অস্বীকার করে তোমার সম্পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে আমাদের সাথে যোগদান কর। ওয়াল্লাশিয়ার সম্রাট অত্যন্ত আনন্দের সাথে উপরোক্ত আহ্বানে সাড়া দেন। তারপর সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনীর বাঁধভাঙ্গা বন্যা যখন তার দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে তখন তিনিও তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে তাতে একাত্ম হয়ে যান। কিন্তু সার্বিয়ার সম্রাট, যিনি তার পূর্ববর্তী সম্রাটের বন্দী ও নিহত হওয়ার পর বায়াযীদ ইয়ালদিরিমকে করদানে স্বীকৃত হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সার্বিয়ার সম্রাট, কাসূদার যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের হাতে বন্দী, তারপর নিহত হয়েছিলেন। যাহোক সার্বিয়ার সম্রাট ছাড়া ইউরোপের সকল রাজা-বাদশাহই মুসলমানদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হন। এই সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনীর আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এতে বিভিন্ন দেশের যে খ্রিস্টান যোদ্ধারা অংশগ্রহণ করেছিল, সাধারণ যোদ্ধা থেকে শুরু করে অধিনায়ক পর্যন্ত তাদের সকলেই ছিলেন বীর পুরুষ এবং সামরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এক কথায় বলতে গেলে, এই বাহিনীর সকল অধিনায়ক এবং যোদ্ধারা ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম এবং বাছাইকৃত বীরসেনানী। তাদের অধিনায়করা বলতেন, যদি আসমানও আমাদের উপর ভেংগে পড়ে তাহলে আমরা আমাদের বর্শার অগ্রভাগ দ্বারা তাও ঠেকিয়ে রাখতে পারব। এই খ্রিস্টান বাহিনী ওয়াল্লাশিয়া ও সার্বিয়ার দু'টি পৃথক পৃথক পথে উসমানী সাম্রাজ্যের সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। হাঙ্গেরী সম্রাট সাজান্ড, যিনি ঐ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন,উসমানীয় সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে পৌঁছে আপন বাহিনীকে আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দেন।

খ্রিস্টান যোদ্ধারা একের পর এক মুসলিম অধিকৃত শহরসমূহ দখল করতে থাকে। তারা যে শহর বা গ্রাম দখল করত সেটাকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলত। সেখানকার মুসলিম অধিবাসী এবং নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে তারা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করত। নিরাপত্তার আবেদন এমনকি আনুগত্যের অঙ্গীকারও খ্রিস্টানদের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে পারত না। এই পাইকারী হত্যায় স্ত্রী-পুরুষ কিংবা শিশু-বৃদ্ধের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হতো না। বিরাট

খ্রিস্টান বাহিনী এক সর্বনাশী ধ্বংসের রূপ ধরে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে একেবারে ওলট-পালট করে দেওয়ার জন্য যখন এগিয়ে আসছিল তখন বায়াযীদ ইয়ালদিরিম এশিয়া মাইনরে ছিলেন। তিনি এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে অনতিবিলম্বে আড্রিয়ানোপল এসে পৌঁছেন। সাজান্ডের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি দানিয়াল উপত্যকার অপর পাড়ে পৌঁছে এশিয়া মাইনর জয় করবেন। তারপর সিরিয়ায় গিয়ে পৌঁছবেন। এদিকে কনসটান্টিনোপলের কায়সার এই ভেবে আনন্দিত হচ্ছিলেন যে, কসোভার যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তার যে মহান লক্ষ্য অর্জন করতে পারেননি এবার তা অতি সহজেই অর্জিত হবে। ফলে উসমানীয়দের আশঙ্কা থেকে খ্রিস্টানরা চিরদিনের জন্য মুক্তি পাবে। ঐ মুহূর্তে এই সম্ভাবনাই প্রবল ছিল যে, সুলতান বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম আড্রিয়ানোপল পৌঁছার সাথে সাথে অপর দিক থেকে সাজান্ডও আপন বিরাট বাহিনীসহ আড্রিয়ানোপলে এসে উপনীত হবেন এবং শ্রান্ত-ক্লান্ত মুসলিম বাহিনীকে বিশ্রামের কোনরূপ সুযোগ না দিয়েই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এরূপ করা হলে বায়াযীদ খানের দুর্গতির সীমা থাকত না। কিন্তু খ্রিস্টান বাহিনী পাইকারী হত্যা ও লুটপাট চালাতে চালাতে যখন নিকোপোলিস শহরের সামনে গিয়ে পৌঁছে তখন সেখানকার প্রাদেশিক শাসনকর্তা বুগলন বেগ অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে তাদের মুকাবিলা করেন এবং পূর্বপরিকল্পিত কূটকৌশলের অধীনে নিজেকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। খ্রিস্টান বাহিনী নিকোপোলিস অবরোধ করে রাখে এবং এটাকে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণের একটা সুযোগ বলেই মনে করে। এভাবে খ্রিস্টানবাহিনী নিকোপোলিস অবরোধ করে বসে থাকার ফলে সুলতান বায়াযীদ খান আড্রিয়ানোপলে পৌঁছতে সক্ষম হন এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে নিকোপোলিসের দিকে এগিয়ে আসারও সুযোগ পান। খ্রিস্টানরা কিন্তু তখনো এই ধারণা করে বসেছিল যে,সুলতান বায়াযীদ খান এশিয়া মাইনরে বসে আছেন। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এবার বায়াযীদ খান ইউরোপে অবতরণের সাহসই পাবেন না। কিন্তু ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর (৭৯৯ হিজরী) 'কাউন্ড দি নিউরাস ডিউক অব বারগান্ডী' যখন আপন তাঁবুতে খাবার খাচ্ছিলেন তখন কিছু সংখ্যক গুপ্তচর তার কাছে এই সংবাদ পৌঁছায় যে, তুর্কী বাহিনী একেবারে নিকটে এসে পৌঁছে গেছে। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে উল্লিখিত ডিউক এবং অন্যান্য ফরাসী অধিনায়ক নিজেদের তাঁবু ছেড়ে সাজান্ডের কাছে যান এবং নিজেদের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব দেন ঃ তুর্কীদের মুকাবিলায় তাদের বাহিনীকেই যেন সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনীর অগ্রবর্তী বাহিনী ঘোষণা করা হয়, যাতে তারা সর্বপ্রথম বায়াযীদের বাহিনীর উপর তরবারি চালনার গৌরব অর্জন করতে পারে। তুর্কীদের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী সাজান্ড বলেন, সর্বপ্রথম তুর্কীদের অনিয়মিত ও স্বল্প অস্ত্রধারী খণ্ডবাহিনী এগিয়ে আসবে। আপনারা যেহেতু খ্রিস্টান বাহিনীর গৌরব তাই আপনাদেরকে সেই বাহিনীর মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যারা সুলতান বায়াযীদ খানের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং তুর্কী বাহিনীর মধ্যে সর্বাধিক বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার অধিকারী। অগ্রবর্তী বাহিনীর হামলার পরই তারা হামলা চালাবে। 'ডিউক অব বারগান্ডী' এ কথা শুনে নীরব হয়ে যান। কিন্তু ফরাসী অধিনায়করা (যেমন লর্ড দি কূরসী, নৌ সেনাধ্যক্ষ মার্শাল বূসী প্রমুখ) প্রায় এক সাথে বলে উঠেন, আমরা কখনো এ কথা বরদাশত করতে পারব না যে, যুদ্ধক্ষেত্রে হাঙ্গেরীবাসীরা ফ্রান্সবাসীদের অগ্রে থাকবে। এই

উত্তেজনাকর ও উচ্ছ্বাসভরা কথা শুনে সাধারণ সৈন্যরাও সাড়া দেয় এবং যে সমস্ত তুর্কী বন্দীকে তারা তখনো হত্যা করেনি তাদেরকে সেই মুহূর্তেই অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করে। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাদের উপর একটি সাংঘাতিক বিপদ যে নেমে আসছে তা তারা তখনো ঠাহর করতে পারেনি।

সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিম খ্রিস্টান বাহিনীর নিকটে পৌঁছে একটি উঁচু বাঁধের আড়ালে অবস্থান গ্রহণ করেন। ফলে বাঁধের অপরদিকে অবস্থানকারী খ্রিস্টান সৈন্যরা মুসলিম সৈন্যদের দেখতে পাচ্ছিল না। সুলতান তাঁর বাছাইকৃত ও সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত চল্লিশ হাজার সৈন্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে রেখে বাকি সব (অনিয়মিত) সৈন্যকে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত করে সম্মুখে বাড়িয়ে দেন। ওদিক থেকে ফরাসী অশ্বারোহীরা অগ্রবর্তী বাহিনীরূপে এগিয়ে আসে এবং সাজান্ড বাকি সৈন্যদের নিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকেন। ফরাসী বাহিনী তুর্কী অনিয়মিত দল-উপদলগুলোকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে সেই বাঁধের উপর এসে পৌঁছে, যেখানে সুলতান বায়াযীদ খানের নেতৃত্বে সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যরা অবস্থান করছিল। অনিয়মিত তুর্কী সৈন্যরা, যারা ফরাসীদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে নিজেদের কিছুসংখ্যক সৈন্যের লাশ ফেলে রেখে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়েছিল, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। অর্থাৎ তারা ক্ষিপ্র গতিতে একত্র হয়ে সারিবদ্ধভাবে ঐ অগ্রবর্তী ফরাসী বাহিনীকে তাদের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে, যারা সুলতানের মূল বাহিনীর একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে খ্রিস্টানদের অগ্রবর্তী বাহিনী, যারা সাজান্ডের মূল বাহিনী থেকে বেশ দূরে চলে গিয়েছিল, ইসলামী সৈন্যদের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে যায় এবং তাদের অধিকাংশই নিহত অথবা বন্দী হয়। অবশ্য সামান্য সংখ্যক লোক কোন রকমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তারা যখন মূল ফরাসী বাহিনীর কাছে তাদের এই ধ্বংসের কাহিনী ব্যক্ত করে, তখন সমগ্র খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়। এমতাবস্থায় সুলতান বায়াযীদ খান মূল খ্রিস্টান বাহিনীর উপর হামলা চালান। সামান্য সংখ্যক মুসলিম সৈন্য খ্রিস্টানদের সেনা-সমুদ্রের উপর প্রবল ঝঞ্ঝা-বাত্যার ন্যায় এভাবে আছড়ে পড়বে তা ছিল খ্রিস্টানদের কল্পনাতীত। কথিত আছে যে, সেদিন বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের বাহিনী এমন একটি লৌহদণ্ডে পরিণত হয়, যা বালু প্রাচীরের ন্যায় মাইলের পর মাইল বিস্তৃত খ্রিস্টান বাহিনীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। বুওয়াইরিয়া,অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর বাহিনীসমূহ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ভক্ষিত তৃণের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এভাবে যে দেশের যে বাহিনীই মুসলমানদের মুখোমুখি হয়েছে তারা হয় মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে, নয়তো প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে অথবা পালাতে গিয়ে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছে। মোটকথা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যায় এবং সুলতান বায়াযীদ খান নিকোপোলিসের যুদ্ধক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের এমন একটি বিশাল বাহিনীকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন, যে বাহিনীর মত সবদিক দিয়ে শক্তিশালী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বাহিনী ইতিপূর্বে কখনো কোন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেনি। হাঙ্গেরী সম্রাট সাজান্ড কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু ফ্রান্স, ইতালী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের বড় বড় শাহযাদা, নবাব ও অধিনায়কগণ হয় বন্দী হন, নয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান।

ডিউক অব বারগান্ডীও ছিলেন ঐসব বন্দীর অন্যতম। উপরে যে সমস্ত খ্রিস্টান অধিনায়কের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের প্রায় সকলেই মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। নিকোপোলিসের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হয়। বিজয় লাভের পর সুলতান স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিটি অংশ পরিদর্শন করেন। সেখানে খ্রিস্টান সৈন্যদের লাশের সাথে কিছু কিছু মুসলিম সৈন্যের লাশও পড়েছিল। সুলতান সে দৃশ্য দেখে আক্ষেপের সুরে বলেন, হায়! এই বিজয় রাভ করতে গিয়ে আমাদেরকে কী বিরাট মূল্যই না দিতে হয়েছে। আমি আমার এই বীর বাহাদুরদের প্রতিশোধ হাঙ্গেরীবাসীদের কাছ থেকেই নেব। এই বলে সুলতান নির্দেশ দেন, বন্দীদেরকে আমার সামনে পেশ কর। ঐ বন্দীদেরকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যাদেরকে সাধারণ সিপাহী বলে মনে হলো তাদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কিছুসংখ্যককে হত্যার জন্য জল্লাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। যারা ছিল অধিনায়ক তাদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে বড় বড় শহরে ঘোরানো হলো, যাতে সাধারণ মানুষ মুসলমানদের এই বিরাট বিজয়ের চিহ্ন স্বচক্ষে দেখতে পায়। খ্রিস্টান শাহযাদা, নবাব এবং স্বাধীন নরপতিদেরকে একটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তাদের সংখ্যা ছিল পঁচিশ। ডিউক অব বারগান্ডীও ছিলেন তাদের অন্যতম। সুলতান ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপ থেকে নিজের এশীয় রাজধানী বারুসায় চলে আসেন। এখানে আসার পর তিনি ঐ পঁচিশ ব্যক্তিকে সামনে ডেকে এনে বলেন : তোমরা অন্যায়ভাবে আমার দেশের উপর হামলা করেছ। আমি দৃঢ় সংকল্প নিয়েছি যে, আমি নিজেই হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইতালী জয় করব। আমি এ সিদ্ধান্তও নিয়েছি যে, রোম শহরে পৌঁছে সেন্ট পিটারের কুরবান গাহে (পশু বলি দেওয়ার স্থানে) আমার ঘোড়াকে দানা খাওয়াব। তাই তোমাদের সাথে তোমাদের দেশেই পুনরায় আমার সাক্ষাত হবে। আর আমি খুবই খুশি হব যদি তোমরা পূর্বের চাইতেও অধিক সৈন্য ও অধিক প্রস্তুতি নিয়ে আমার মুকাবিলায় যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে আস। তোমাদের দিক থেকে যদি আমার সামান্য ভয়ভীতিও থাকত তাহলে আমি এখন তোমাদের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করতাম যে, তোমরা ভবিষ্যতে কখনো আমার মুকাবিলায় আসবে না। তোমরা নিজ নিজ দেশে পৌঁছেই নিজ নিজ সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত কর এবং আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সদাপ্রস্তুত থাক। এই বলে সুলতান বায়াযীদ খান সকল শাহযাদা ও অধিনায়ককে মুক্ত করে দেন।

তারপর সুলতান বায়াযীদ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে ইউরোপ অভিমুখে রওয়ানা হন এবং আপন সংকল্প বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেন। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। যা হোক, সুলতান বায়াযীদ সর্বপ্রথম গ্রীস অভিমুখে রওয়ানা হন। কেননা গ্রীসের নিকোপোলিসের যুদ্ধে খ্রিস্টান যোদ্ধারা কনসটান্টিনোপলের কায়সারের ইঙ্গিতে নিজে থেকেই খ্রিস্টান বাহিনীতে যোগদান করেছিল। সুলতান বায়াযীদ খান থার্মোপলী উপত্যকা থেকে বিজয়ী বেশে অগ্রসর হয়ে একেবারে এথেন্সের দোরগোড়ায় গিয়ে উপনীত হন। তিনি ৮০০ হিজরীতে (১৩৯৭-৯৮ খ্রি) এথেন্স জয় করে ত্রিশ হাজার গ্রীককে এশিয়ায় বসত করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। সুলতান স্বয়ং থ্রেসলী জয় করে যখন এথেন্স অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন তখন তাঁর অধিনায়কদের নেতৃত্বে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর দিকে পৃথক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। অধিনায়করা ঐ সমস্ত দেশের বেশির ভাগ অংশই জয় করে

নিয়েছিলেন। সুলতান বায়াযীদ খানের চোখে ইতিমধ্যে কনসটান্টিনোপলের কায়সারের প্রকৃত চেহারা ফুটে উঠেছিল। অতএব এথেন্স জয় করার পর তিনি এই কপট সম্রাটকেও সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার সংকল্প নেন। কিন্তু এবারও কায়সার সুলতানকে কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করেন– আমি আপনাকে প্রতিবছর দশ হাজার ডুকাট (তৎকালীন মুদ্রা) কর দেব। তাছাড়া কনসটান্টিনোপলে মুসলমানদের জন্য একটি মসজিদও নির্মাণ করে দেব এবং একজন কাযীও নিয়োগ করব, যিনি মুসলমানদের যাবতীয় মামলা-মকদ্দমার ফায়সালা করবেন। তাছাড়া মুসলিম বণিকদের যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় আমি সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখব। সুলতান বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম কায়সারের উপরোক্ত আবেদন মঞ্জুর করে তার হাতেই কনসটান্টিনোপলের শাসনভার অর্পণ করেন। অন্যথায় যে কাজ সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-এর হাতে পরবর্তীকালে সম্পন্ন হয়েছিল তা ৮০০ হিজরীতে (১৩৯৭-৯৮ খ্রি) বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের হাতে সম্পন্ন হয়ে যেত। এটা ছিল ঐ যুগ যখন তাইমূর খুরাসান ও ইরানে আপন সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন, তুর্কমানদের পর্যুদস্ত করেন এবং আপন অধিকৃত অঞ্চলের সীমারেখা সুলতান বায়াযীদের অধিকৃত অঞ্চলের সীমারেখা পর্যন্ত টেনে এনে হিন্দুস্থান আক্রমণ করেছেন। আর কনসটান্টিনোপলের কায়সার যিনি ইউরোপে নিজের ধূর্তামি এবং খ্রিস্টানদের শক্তি পরীক্ষার ফলাফল কসোভা এবং নিকোপোলিস যুদ্ধক্ষেত্রে ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বর্তমান অপমান ও লাঞ্ছনার প্রেক্ষিতে তা ভুলে গিয়ে পুনরায় সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন।

সুলতান বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম যখন গ্রীক ও এথেন্স জয় করেন এবং কায়সারের অবস্থা অনেক হীন হতে শুরু করে তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের একজন দূতকে তাইমূরের কাছে পাঠান। তাইমূরের কাছে প্রেরিত এক পত্রে তিনি লিখেন– আমার সাম্রাজ্য অনেক পুরাতন। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগেও কনসটান্টিনোপলে আমাদের সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল। তারপর বনূ উমাইয়া ও বনূ আব্বাসের যুগেও খলীফাদের সাথে বার বার আমাদের সন্ধি হয়। তাদের কেউই কনসটান্টিনোপল দখল করেননি। কিন্তু বর্তমানে উসমানীয় সাম্রাজ্য আমার বেশির ভাগ এলাকাই দখল করে নিয়েছে এবং রাজধানী কনসটান্টিনোপলেও তার দাঁত বসিয়েছে। এমতাবস্থায় নেহাত বাধ্য হয়ে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থী হয়েছি। আর এটা জানা কথা যে, আপনি ছাড়া আমি অন্য কারো সাহায্যপ্রার্থী হতেও পারি না। বায়াযীদ খান মুসলমান এবং আমরা খ্রিস্টান। যদি আপনি এ বিষয়টি চিন্তা করেন তাহলে আপনার অবগতির জন্য বলছি যে, বায়াযীদ খান এদিকে ইউরোপে ক্রমাগত জয়লাভ করছেন এবং দিন দিন তার ক্ষমতা বেড়েই চলেছে। তিনি এদিককার কাজ সম্পন্ন করে শীঘ্রই আপনার অধিকৃত সাম্রাজ্যে হামলা পরিচালনা করবেন। তখন তাঁকে দমন করতে গিয়ে আপনাকে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। সুলতান আহমাদ জালায়িরি এবং কারা ইউসুফ তুর্কমান, যারা আপনার কাছ থেকে পলায়নকারী বিদ্রোহী, তাদেরকে বায়াযীদ খান জামাতা আদরে নিজের মেহমান করে রেখেছেন। এ দু'জন বিদ্রোহীই বায়াযীদ খানকে সব সময় আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উস্কানি দিচ্ছে। এটা আপনার জন্য কিছু কম অসম্মানের কথা নয় যে, আপনারই বিদ্রোহী সুলতান বায়াযীদ খানের কাছে এভাবে সম্মান ও মর্যাদার সাথে অবস্থান করবে এবং আপনি তাদেরকে বায়াযীদ খানের কাছে ফেরত চাইতে পারবেন

না। অতএব সবদিক দিয়ে এটাই যুক্তিসম্মত মনে হচ্ছে যে, আপনি এশিয়া মাইনর আক্রমণ করুন। প্রকৃতিগত দিক দিয়েও এদেশটি আপনারই দখলে থাকা উচিত। সর্বোপরি আপনি বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের বিপর্যয় থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আমরা যথাসম্ভব আপনাকে সাহায্য করব। কায়সারের এই পত্র তার একান্ত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য লিখেছিলেন এবং তাইমূরও এত নির্বোধ ছিলেন না যে, অতি সহজেই কায়সারের ফাঁদে ধরা পড়ে যাবেন, কিন্তু ঐ পত্রে কায়সার বায়াযীদ খান কর্তৃক তাইমূরের বিদ্রোহীদেরকে আশ্রয়দানের ব্যাপারটি এমন এক ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছিলেন যে, তাতে তাইমূরের মনে এক বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। কায়সারের পত্র তাইমূরের কাছে এমন এক সময়ে গিয়ে পৌঁছে, যখন তিনি গঙ্গার তীরবর্তী হরিদ্বারে অবস্থান করছেন এবং হিন্দুস্থানের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহ জয় করার পরিকল্পনা নিচ্ছেন। তিনি কায়সারের ঐ পত্র পড়ে দূতের কাছে তার সন্তোষজনক কোন উত্তর দেননি এবং তাকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দেন। কিন্তু পত্রের বিষয়বস্তু অতি সঙ্গোপনে হলেও তাঁর অন্তরে এমনি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যে, হিন্দুস্থানের প্রতি তার কোন আগ্রহই আর বাকি থাকে নি। এমন কি তিনি হিন্দুস্থানের নব বিজিত রাজ্যসমূহের কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা না করেই রাতারাতি তল্পিতল্পা গুটিয়ে হরিদ্বার থেকে পাঞ্জাব এবং পাঞ্জাব থেকে সমরকন্দ অভিমুখে রওয়ানা হন। হিন্দুস্থানের এক লক্ষ বন্দী, যারা তাঁর সাথে ছিল এবং সফরের মধ্যে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল তিনি তাদেরকে পথিমধ্যে হত্যা করেন। সমরকন্দ পৌঁছে তিনি সব সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন, উসমানীয় সালতানাতের সাথে একটা বোঝাপড়া করে বিশ্ববাসীকে বাস্তবে দেখিয়ে দেবেন, কে বিশ্ববিজয়ী হতে চায়, বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম, না তিনি ? এই সময়ে তাইমূরের কাছে ইয়ালদিরিমের একটার পর একটা বিজয় সংবাদ আসতে থাকে এবং তিনি তাঁর এই প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে লড়ার জন্য আরো বেশি প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এ দিকে বায়াযীদ ইয়ালদিরিম কনসটান্টিনোপলের কায়সারকে আপন করদাতা বানিয়ে এবং হাঙ্গেরী ও অস্ট্রিয়া বিজয় শেষ করে রোম শহরের দিকে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এমন সময় তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, কনসটান্টিনোপলের কায়সার উসমানী সাম্রাজ্য আক্রমণের উস্কানি দিয়ে তাইমূরের কাছে দূত পাঠিয়েছেন এবং সুলতান বায়াযীদ খানকে কর দেওয়া নিজের জন্য অপমানজনক মনে করছেন। আর এই অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাইমূরের শরণাপন্ন হয়েছেন। সুলতান বায়াযীদ খান কখনো কল্পনাও করেননি যে, কায়সারের উস্কানিতে এবং তারই সাহায্যার্থে তাইমূর এভাবে তাঁর (বায়াযীদের) সাথে লড়তে আসবেন। তাছাড়া তাইমূর সম্পর্কে তিনি কোনদিন ভীতিগ্রস্তও ছিলেন না। যা হোক উপস্থিত পরিস্থিতিতে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, সর্বপ্রথম কায়সারের ব্যাপারটি রফাদফা করবেন, তারপর ইতালীর উপর হামলা চালাবেন। তিনি প্রথমে কায়সারের কাছে উপরোক্ত ব্যাপারে একটা উত্তর চান এবং কোন সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে কনসটান্টিনোপল আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

এদিকে তাইমূর সমরকন্দ থেকে রওয়ানা হয়ে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম সীমান্তে এসে পৌঁছেন। তিনি রক্তবন্যা বইয়ে দিয়ে আযারবায়জান ও আর্মেনিয়া দখল করেন। এ দু'টি দেশ দখলের পর তিনি সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ

পেয়ে যান। কেননা, এখন তাঁরও উসমানী সাম্রাজ্যের মধ্যে আর কোন বাঁধা ছিল না। আযারবায়জান, যা একটি বাফার স্টেট হিসাবে বিদ্যমান ছিল, তাইমূর তা দখল করেছেন। এখন আযারবায়জানের শাসকরা যে পলিসি গ্রহণ করেছিল, তা দুই মুসলিম সম্রাটকে, তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দেওয়ার ইন্ধন যোগাচ্ছিল। সীমান্তবর্তী ঐ শাসকরা যখন উসমানী সাম্রাজ্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হতো তখন তাইমূরের কাছে, আর যখন তাইমূরের প্রতি অসন্তুষ্ট হতো তখন উসমানীয় সম্রাটের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত। এই পটভূমিতেই আযারবায়জানের শাসক কারা ইউসুফ তুর্কমান তাইমূরের দ্বারা ভীতিগ্রস্ত হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের কাছে চলে গিয়েছিলেন। তিনি এই আশা পোষণ করছিলেন যে, উসমানীয় সুলতান তাইমূরের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করবেন এবং তিনি পুনরায় তার হৃত সিংহাসন ফিরে পাবেন। তাইমূর যখন আযারবায়জান জয় করেন তখন বায়াযীদ একটি সংক্ষিপ্ত বাহিনীসহ আপন পুত্র তুগ্রিলকে নিজেরাই সীমান্ত শহর সিউয়াসে প্রেরণ করেন, যাতে তাইমূর এদিকে এগিয়ে আসলে তাকে বাধা প্রদান করা হয়। তাইমূর উসমানীয় সুলতানের সাথে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে কোনরূপ তাড়াহুড়া না করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি তার সমগ্র অধিকৃত এলাকায় ফরমান পাঠিয়ে অভিজ্ঞ যোদ্ধা ও বাছাই করা সেনাবাহিনী তলব করেন। এদিকে ফকীর, দরবেশ, সূফী, ওয়ায়িয, বণিক ও পর্যটকের ছদ্মবেশে তিনি বিপুল সংখ্যক গুপ্তচর উসমানীয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দেন। তিনি একদল অতি অভিজ্ঞ গুপ্তচর সুলতান বায়াযীদ খানের সেনাবাহিনীর মধ্যেও ঢুকিয়ে দেন, যাতে তারা ঐ সমস্ত মোঙ্গলকে, যারা এশিয়া মাইনরে বসবাস করার কারণে সুলতান বায়াযীদ খানের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং যারা এশিয়া মাইনরে বসবাস করার কারণে সুলতান বায়াযীদ খানের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে এবং যারা বায়াযীদের এশীয় বাহিনীর একটি বিরাট অংশ, তাদেরকে এই বলে পথভ্রষ্ট করে যে, মোঙ্গলদের জাতীয় নেতা ও একমাত্র শাসক হচ্ছেন তাইমূর। অতএব তাইমূরের মুকাবিলায় তুর্কী সুলতান বায়াযীদের পক্ষাবলম্বন, প্রকৃত পক্ষে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। তাইমূরের এই গোপন হামলা খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়। বায়াযীদের সেনাবাহিনীর একটি বিরাট অংশ তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায় এবং বিদ্রোহের পরিকল্পনা আঁটতে থাকে। তাইমূরের গুপ্তচররা সুলতানী বাহিনীর মধ্যে একথাও ছড়িয়ে দেয় যে, সুলতান তাঁর বাহিনীকে বড় অংকের বেতন-ভাতা এবং প্রচুর পরিমাণ মালে গনীমত প্রদানে কার্পণ্যের আশ্রয় নিয়ে থাকেন, অথচ তাইমূর তাঁর সেনাবাহিনীকে সর্বদা প্রাচুর্যের মধ্যে রাখেন।

এইসব ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে তাইমূর প্রথমে সিরিয়া ও মিসর জয়ের সিদ্ধান্ত নেন। কেননা তিনি জানতেন যে, মিসরের চারকাসী বাদশাহ ফারাজ ইব্‌ন বারকূক হচ্ছেন বায়াযীদ খানের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারপর সিরিয়ার উপর হামলা করা হলে তিনি দামেশক রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই সিরিয়ায় চলে আসবেন। আর যেহেতু তিনি একাকী অবস্থায় দুর্বল হবেন তাই তাঁকে পরাজিত করা খুবই সহজ হবে। অন্ততপক্ষে দামেশক ও সিরিয়া যদি দখল করা যায় তাহলে বায়াযীদ খানের কাছে মিসরীয় ও সিরীয়দের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য পৌঁছতে পারবে না। অতএব তিনি একদিকে বায়াযীদ খানকে পত্র লিখলেন ঃ আপনি আপনার কাছে অবস্থানরত

আমার বিদ্রোহী কারা ইউসুফ তুর্কমানকে অতি শীঘ্র আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, অন্যথায় আমি আপনার সাম্রাজ্য আক্রমণ করব এবং অন্যদিকে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে ৮০৩ হিজরীতে (১৪০০-১৪০১ খ্রি) হালাবের পথ ধরে সিরিয়ার উপর আক্রমণ চালালেন। তাইমূরের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হলো। তিনি সবেমাত্র হালাবে গিয়ে পৌঁছেছেন এমন সময় মিসর সম্রাট দ্রুতগতিতে দামেশকে এসে পৌঁছেন। উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে মিসরের চারকাসী শাসক পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। মিসরীয় বাহিনী তাইমূরী বাহিনীর দ্বারা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাইমূরও সিরিয়ার প্রতিটি শহরে পাইকারী হত্যা চালান এবং এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন মস্তকের স্তূপ তৈরি করে মানুষের মধ্যে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করেন। এভাবে আপন উদ্দেশ্য সফল করে তাইমূর বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। তরবারির জোরে তিনি বাগদাদও জয় করেন। এখানেই তিনি সুলতান বায়াযীদের কাছ থেকে তাঁর পত্রের উত্তর পান। তাতে দেখা যায়, বায়াযীদ তাইমূরের আবেদনকে অত্যন্ত ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বায়াযীদ ইয়ালদিরিম কি উত্তর দেবেন তা তাইমূর প্রথম থেকেই জানতেন। তাই তিনি যথাসাধ্য এর প্রতিবিধানেরও ব্যবস্থা করছিলেন। এই উত্তর পেয়ে তিনি বাগদাদেও বেশিক্ষণ অবস্থান করাটা সমীচীন মনে করলেন না। তিনি সোজা আযারবায়জান অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌঁছে আপন অধিকৃত দেশসমূহ থেকে জরুরী সাহায্য তলব করেন। তিনি সেখানে অবস্থান করেই অত্যন্ত সতর্কতা ও দূরদর্শিতার সাথে রসদ সরবরাহ, তথ্য সংগ্রহ, গুপ্তচরবৃত্তি প্রভৃতি বিভাগকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সমরাস্ত্র ও রসদ সরবরাহের জন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সুযোগ্য কর্মকর্তা ও প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। এটা হচ্ছে সেই সময়, যখন বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম কনসটান্টিনোপল ঘেরাও করে রেখেছেন এবং যে কোন মুহূর্তে কনসটান্টিনোপলের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তিনি তাইমূর কর্তৃক সিরিয়া বিজয় এবং মিসর সম্রাট ফারাজ ইব্‌ন বারকূককে পরাজিত করার খবর শুনে কারা ইউসুফ তুর্কমানকে একটি বাহিনীসহ সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন, তুমি তাইমূর কর্তৃক নিয়োগকৃত সকল কর্মকর্তাকে হত্যা অথবা বন্দী করে সিরিয়ার উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা কর। তারপর তিনি স্বয়ং তাইমূরের মুকাবিলায় রওয়ানা হন। কনসটান্টিনোপল জয়ের ব্যাপারটি তিনি সাময়িকভাবে মুলতবি রাখেন। তখন এই সম্ভাবনা ছিল যে, বায়াযীদ সিরিয়া অধিকার করেই থেমে যাবেন এবং তাইমূরের সাথে যুদ্ধ করা অথবা তাকে একতরফা আক্রমণ করা থেকেও বিরত থাকবেন। কেননা মুসলমান সম্রাটদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁর কোনই আগ্রহ ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল, ইউরোপের অবশিষ্ট দেশসমূহ জয় করা, খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করা এবং হাঙ্গেরী ও অস্ট্রিয়া জয়ের পর কনসটান্টিনোপল ও রোম অধিকার করা। কিন্তু তাইমূর বায়াযীদের মুকাবিলা এবং তাঁকে পরাস্ত করার জন্য বেশ কয়েক বছর থেকেই সচেষ্ট ছিলেন। অন্য কথায়, বায়াযীদ ছিলেন পৃথিবী থেকে খ্রিস্টান শক্তিকে মুছে ফেলার কাজে সদা তৎপর, আর তাইমূর ছিলেন বায়াযীদকে ধ্বংস করে খ্রিস্টানদেরকে রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত।

তাইমূর নিজের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার পর বায়াযীদের সীমান্ত শহর সিভাস আক্রমণ করেন। বায়াযীদের পুত্র আর তুগ্রিল ছিলেন সেখানকার দুর্গাধিপতি। তিনি দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তাইমূরকে প্রতিরোধ করেন। তাইমূর সর্বপ্রথম এই দুর্গের উপরই আপন দুর্গবিধ্বংসী অস্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষা করেন। তিনি দুর্গ অবরোধ করে বাইরের দিক থেকে দুর্গের ভিত্তিমূল খুঁড়তে শুরু করেন। তিনি প্রথমে সামান্য দূরত্বে গভীর গর্ত খুঁড়ে এবং প্রাচীর ভিত্তির নিচ থেকে মাটি সরিয়ে শক্ত কাঠের খুঁটির উপর প্রাচীরকে দাঁড় করিয়ে রাখেন। তারপর সবগুলো কাঠের খুঁটিতে একসাথে আগুন লাগিয়ে দেন। খুঁটিগুলো পুড়ে যাওয়ার সাথে সাথে গোটা প্রাচীর এক সাথে ধসে পড়ে। এভাবে হঠাৎ নিজেদেরকে অরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে অবরুদ্ধ বাহিনী তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে এবং চার হাজার সৈন্যের সকলেই প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হয়। তাইমূর যেমন সিভাস দুর্গ ধূলিসাৎ করতে গিয়ে একটি বিস্ময়কর পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন তেমনি ঐ তুর্কী বন্দীদের সাথে তিনি যে নির্দয়তা ও পাশবিক আচরণ করেছিলেন তাও ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর ও লোমহর্ষক। প্রচলিত যুদ্ধরীতি অনুযায়ী আত্মসমর্পণকারী হিসাবে বন্দীদেরকে নিরাপত্তা দান তো দূরের কথা, তাদের মাথা পেঁচিয়ে বেঁধে বাহ্যত তাদেরকে এক একটি বোচকায় পরিণত করা হয়। তারপর অনেকগুলো গভীর গর্ত খুঁড়ে সেগুলোতে তাদেরকে নিক্ষেপ করে তার উপর কাঠের তক্তা বিছিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তক্তার উপর মাটিচাপা দিয়ে জীবন্ত অবস্থায় তাদের সমাধিস্থ করা হয়। এই নৃশংস ঘটনার কথা চিন্তা করলে আজো মানুষ মাত্রেরই অন্তর শিউরে ওঠে।

বায়াযীদ ইয়ালদিরিম আপন পুত্র এবং স্বজাতীয় চার হাজার তুর্কের নৃশংস মৃত্যুর এই হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা জানতে পেরে একেবারে অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পূর্বাপর পরিস্থিতি বিবেচনা না করেই প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় সিভাস অভিমুখে পাগলপারা হয়ে ছুটে আসেন। খুব সম্ভব তাইমূরের ইচ্ছাও ছিল তাই এবং এই লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি উপরোক্ত লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বায়াযীদের দিক থেকে তারপর যে সব অসতর্কতা ও অদূরদর্শিতামূলক ঘটনা ঘটতে থাকে তা ছিল তাঁর বাঁধভাঙ্গা ক্রোধেরই ফল। কিংবা এও হতে পারে যে, এটা ছিল তাঁর উপর আরোপিত মদ্যপান সম্পর্কিত অভিযোগেরই বাস্তব প্রতিফলন। যা হোক, এরপর থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, তাইমূর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এবং ধীরস্থির মস্তিষ্কে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিচ্ছেন, আর বায়াযীদ পদে পদে ভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইতিপূর্বে বায়াযীদ সামরিক ব্যাপারে কখনো কোন ভুল পদক্ষেপ নেননি। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি নিজেকে একজন সুযোগ্য অধিনায়ক হিসাবে প্রমাণ করেছেন। বায়াযীদ তাইমূরের ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, ঊনসত্তর বছর বয়স্ক এই বৃদ্ধ তার সারাটি জীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটিয়েছেন। তাঁর কাছে এ সংবাদও পৌঁছেছিল যে, তাইমূরের কাছে পাঁচ লক্ষেরও অধিক বাছাইকৃত বীরযোদ্ধা রয়েছে। যা হোক বায়াযীদ তাড়াহুড়ার মধ্যেই যতটুকু সম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করে সিভাস অভিমুখে, যেখানে তার পুত্রকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল এবং যেখানে তার প্রতিপক্ষ অবস্থান করছিল, দ্রুতগতিতে ছুটে যান। এ অভিযানে তাঁর খ্রিস্টান

স্ত্রীর ভাই সার্বিয়া সম্রাট, অপর বর্ণনামতে বিশ হাজার অশ্বারোহীর অধিনায়ক তাঁর ফরাসী স্ত্রীর ভাইও অংশগ্রহণ করেছিলেন। বায়াযীদ দ্রুতবেগে আসছেন, এ সংবাদ পেয়ে তাইমূর তাঁর পূর্ব-পরিকল্পিত একটি মোক্ষম সামরিক চাল চালেন। বায়াযীদ আপন বাহিনীর কিছু অংশ প্রথমেই সিভাস অভিমুখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি নিজেও সর্বপ্রকার যুদ্ধসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে অনুসরণ করেন। বায়াযীদের বাহিনী সিভাসের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত তাইমূর নিজ অবস্থাতেই অনড় থাকেন। যখন তিনি জানতে পারেন যে, বায়াযীদ তাঁর মূল বাহিনী নিয়ে এতদূর অগ্রসর হয়ে গেছেন যে, এখন আর রাস্তা পরিবর্তন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, ঠিক তখন তিনি সিভাস পরিত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে চলে যান এবং কিছুদূর যাওয়ার পর পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরিয়ে সোজা আংকারা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌছেই আংকারা শহর অবরোধ করেন। বায়াযীদ ইয়ালদিরিম যখন সিভাসে গিয়ে পৌছেন তখন আপন পুত্রের হত্যাকাণ্ডের পূর্বাপর অবস্থা জেনে এবং রাগে ও দুঃখে একেবারে অস্থির হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাইমূর ও তার বাহিনীকে তিনি সেখানে পাননি বরং তিনি জানতে পারেন যে, তাইমূর আপন বাহিনী নিয়ে সিভাস থেকে দুশ পঞ্চাশ মাইল পশ্চিম দিকে তাঁরই সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আংকারা শহরে ঢুকে পড়েছেন। আংকারা ধ্বংসের ব্যাপারটি ছিল বায়াযীদের কাছে সিভাস ধ্বংসের চাইতেও অধিকতর দুঃখজনক। তাছাড়া তাইমূরের এভাবে এশিয়া মাইনরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়াটাও তাঁর জন্য অসহ্যকর ঠেকে। এমতাবস্থায় তাঁর উচিত ছিল ধৈর্যহারা না হওয়া এবং বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন দূতদের মাধ্যমে কারা ইউসুফ তুর্কমান এবং সিরীয় ও মিসরীয় অধিনায়কদেরকে তাদের অধীনস্থ সেনাবাহিনী নিয়ে তাইমূরের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য জরুরী নির্দেশ প্রদান করা। যদি অনুরূপ করা হতো এবং তাইমূরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে তার সেনাবাহিনীর রসদ বন্ধ করে দেওয়া হতো তাহলে তাইমূর ও বায়াযীদের ইতিহাসের এই অধ্যায় নিশ্চয় অন্যভাবে লেখা হতো। তখন তাইমূর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে শহরের পর শহর ধ্বংস করতে থাকলেও তাতে বায়াযীদের খুব একটা ক্ষতি হতো না। কেননা তাঁর চতুর্দিকে তখন ঐ সমস্ত এলাকা পড়ত যেখানে প্রচুর সংখ্যক উসমানীয় জায়গীরদার এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের স্বেচ্ছাসেবী তুর্ক বসবাস করছিল। এমতাবস্থায় চতুর্দিক থেকে তাঁরই অনুসারী বহু সংখ্যক সেনাবাহিনী অনায়াসে তাইমূরের বাহিনীকে ঘিরে ফেলতে পারত। তখন তাইমূরকে তারই স্বরচিত ফাঁদে ফেলে বন্দী করাটাও বায়াযীদের জন্য কোন কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু তাইমূর বায়াযীদের মেযাজ সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর প্রতিপক্ষ কখনো অনুরূপ বিচক্ষণতার সাথে উপস্থিত পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে পারবেন না। বাস্তবেও ঘটল তাই।

বায়াযীদ যেখানে অতি সহজে সিভাসের প্রান্তরে চার লক্ষ সৈন্য একত্র করতে পেরেছিলেন এবং যেখানে তাইমূরের হাতে পরাজিত হওয়ার মত কোনরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি মোটেই পতিত হননি, সেখানে তিনি কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করেই দুই মনযিল তিন মনযিল করে এত দ্রুত বেগে সিভাস থেকে আংকারা অভিমুখে ছুটতে থাকেন যে, রাস্তায় এক মুহূর্তও বিশ্রাম গ্রহণ করেননি। ফলে শুধু এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য তাঁর

সাথে আংকারা গিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়। বাকি সৈন্যরা পশ্চাতে পড়ে থাকে। বায়াযীদের এটা ছিল সবচেয়ে বড় ভুল। তিনি যখন তাঁর শ্রান্ত-ক্লান্ত এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আংকারার সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছেন তখন তাইমূর তার সজীব সতেজ পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিয়ে একটি পছন্দসই স্থানে তাঁবু গেঁড়ে বায়াযীদের মুকাবিলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আছেন। তাইমূর তাঁর বাহিনীর জন্য আংকারা শহরের উত্তর-পশ্চিমাংশের একটি সুন্দর স্থান নির্বাচন করেছিলেন। প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি এখানে সেখানে পরিখা খনন করেও রেখেছিলেন। বায়াযীদ সেখানে পৌঁছেই তাইমূরী বাহিনীকে একথা বুঝাতে গিয়ে যে, তিনি তাদেরকে মোটেই পাত্তা দেন না, তাদের অবস্থান স্থলের উত্তর দিকের একটি সুউচ্চ পাহাড়ী এলাকায় নিজের সমগ্র সেনাবাহিনী নিয়ে বন্য পশু শিকারে মত্ত হন। সমগ্র জঙ্গল বেষ্টন করে তারপর চেঙ্গিযী পদ্ধতিতে বেষ্টনীর আয়তন ক্রমশ হ্রাস করে বন্য পশুগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো করার জন্য তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেন। যেখানে তার শ্রান্ত-ক্লান্ত সৈন্যদের পানাহার ও বিশ্রাম গ্রহণের প্রয়োজন ছিল সেখানে তারা শিকারের পিছনে ছুটতে থাকে। ফলে তাদের অবস্থা এমন কাহিল হয়ে পড়ে যে, শুধু তৃষ্ণার কারণে পাঁচ হাজার সৈন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। শিকার অভিযান শেষ করে যখন বায়াযীদ আপন ক্যাম্প অভিমুখে রওয়ানা হন তখন জানতে পারেন যে, ইতিমধ্যে শত্রুরা তার মূল ক্যাম্পই দখল করে নিয়েছে। তিনি আরো দেখতে পান যে, যে ঝরনার মাধ্যমে তাঁর সৈন্যদের পানীয় জলের অভাব মিটত, ইতিমধ্যে একটি বাঁধ তৈরি করে তাইমূর সে ঝরনার প্রবাহও বন্ধ করে দিয়েছেন। বায়াযীদ তাইমূরের মুকাবিলায় আর সময় ক্ষেপণ করতে চাইতেন না সত্য, তবে ক্যাম্পে পৌঁছে এবং কমপক্ষে নিজের সৈন্যদেরকে পানি পানের অবকাশ দিয়ে তবেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করা তাঁর জন্য ছিল একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু তাইমূরের বিচক্ষণতা ও কৌশলের কারণে সে সুযোগ থেকেও তিনি বঞ্চিত হন এবং বাধ্য হন এই শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থায়ই একটি অতি শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে।

আংকারা যুদ্ধ

৮০৪ হিজরীর ১৯ যিলহাজ্জ মুতাবিক ১৪০২ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই বায়াযীদ ও তাইমূরের মধ্যে এ ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঠিক ভোর বেলা সংঘর্ষ শুরু হয় এবং সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। বায়াযীদের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। আর তাইমূরের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষের অধিক। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই সংখ্যা ছিল আট লক্ষ। মোটকথা তাইমূরের বাহিনীর সর্বনিম্ন সংখ্যাটি মেনে নিলেও অবশ্যই তা ছিল বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের বাহিনীর চারগুণ। যদি এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয় যে, তাইমূরের বাহিনী ছিল একদম সবল, সতেজ, আর বায়াযীদের বাহিনী ছিল শ্রান্ত-ক্লান্ত ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দারুণভাবে জর্জরিত তাহলে তো উভয় পক্ষের শক্তির মধ্যে আরো বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। উপরন্তু বায়াযীদের বাহিনীর মোঙ্গল খণ্ডবাহিনীগুলো ঠিক যুদ্ধ চলার সময় বিশ্বাসঘাতকতার যে পরিচয় দেয় এবং খ্রিস্টান অধিনায়কদের দিক থেকে যে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় সে দিকটিও যদি বিবেচনায় রাখা হয়

তাহলে বায়াযীদ ও তাইমূরের মুকাবিলা বাঘ ও ছাগলের মুকাবিলার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু এসব কিছুকেই বায়াযীদের অদূরদর্শিতার ফল মনে করতে হবে। একথা অনস্বীকার্য যে, আংকারা যুদ্ধে বায়াযীদের মূর্খতা ও অদূরদর্শিতার দিকটি বার বার ফুটে উঠেছে, আর প্রায় সর্বত্রই তাইমূর তাঁর অপূর্ব বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ পৃথক কথা যে, আমরা বায়াযীদের পরাজয় দেখে আক্ষেপ করি এবং তাইমূরকে এই যুদ্ধের কারণে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাই। এই যুদ্ধ মুসলিম বিশ্বের জন্য অভাবনীয় ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। কেননা যে ইউরোপ শীঘ্রই একটি ইসলামী মহাদেশ হতে যাচ্ছিল, এই যুদ্ধের কারণে তা খ্রিস্টান মহাদেশ হিসাবে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে।

আমীর তাইমূর যেভাবে তার গোটা বাহনীকে বিন্যস্ত করেছিলেন তা হলো, ডান পাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়েছিল শাহযাদা মির্যা শাহরুখকে। যে সব অধিনায়কের খণ্ডবাহিনী ডান পাশের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তারা হচ্ছেন আমীরযাদা খলীল সুলতান, আমীর সুলায়মান শাহ, আমীর রুস্তম বারলাস, সানজাক বাহাদুর, মূসা, তূইবুঘা, আমীর ইয়াদগার প্রমুখ। আমীর যাদা মির্যা সুলতান হুসাইনকে ডান পাশের বাহিনীর সাহায্যকারী পল্টনের অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়েছিল।

আমীর নূরুদ্দীন জালায়ির, আমীর বারামযাক, বারলাস, আলী কূজীন, আমীর মুবাশ্বির, সুলতান সাঞ্জার বারলাস, উমার ইব্ন তাবান প্রমুখ অধিনায়ককে তাদের নিজ নিজ বাহিনীসহ বাম পাশের বাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। বাম পাশের বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করা হয় শাহযাদা মীরান শাহকে। আমীর যাদা বারলূমের হাতে বাম পাশের বাহিনীর সাহায্যকারী পল্টনের নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়।

মধ্যবর্তী বাহিনীর ডান দিকের অংশে ছিলেন তাশ তিমুর আগলান উযবেক, আমীর যাদা আহমদ, জালাল বাভারচী ইউসুফ, বাবা হাজী সূজী, ইসকান্দারে হিন্দ ও বূঘা, খাজা আলী ঈরাবী, দুলান তিমূর, মুহাম্মাদ কূজীন, ইদরীস কূরচী প্রমুখ। এই অধিনায়কদের পৃষ্ঠদেশে সাহায্যকারী হিসাবে ছিলেন বেগ আলী, ইলচক দাঈ হারী মালিক, আরগূন মালিক, সূফী খলীল, আইসান তিমুর, শায়খ তায়ূর, নেকরূযের পুত্রত্রয় সাঞ্জার ও হুসাইন, উমার বেগ, জূন আর বানী, বেরী বেগ কূজীন, আমীর যীরাক বারলাস প্রমুখ।

মধ্যবর্তী বাহিনীর বাম অংশের নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়, আমীর তাওয়াককুল কারাকরো, আলী মাহমূদ, শাহ আলী, আমীর সানজাক তানকিরী, বেযিশ খাজা, মুহাম্মদ খলীল, আমীর লুকমান, সুনতার বারলাস, মীরক ইলচী, পীর মুহাম্মদ, সংকরম, শায়খ আসলান ইলইয়াস, কপকখানী, দাওলাত খাজা বারলাস, ইউসুফ বারলাস, আলী কিবচাক প্রমুখ অধিনায়কের হাতে। এই অধিনায়কদের সাহায্যকারী পল্টনে আমীরযাদা মুহাম্মদ সুলতান, আমীরযাদা পীর মুহাম্মদ, ইসকান্দার, শাহ মালিক, ইলইয়াস খাজা, আমীর শামসুদ্দীন প্রমুখ অধিনায়ককে তাদের নিজ নিজ বাহিনীসহ মোতায়েন করা হয়েছিল।

উপরোক্ত বিন্যাস ছাড়াও তাইমূর পৃথক পৃথক ভাবে চল্লিশ পল্টন সৈন্য নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাখেন, যাতে যুদ্ধ চলাকালে গোটা বাহিনীর যে অংশেই জরুরী সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয় সেখানেই এদেরকে পাঠানো যায়। এই পাঁচ লক্ষ, বরং আট লক্ষ সৈন্য ছাড়াও তাইমূরের হাতে ছিল পর্বতসদৃশ বিরাট বিরাট হাতির একটি বাহিনী। যুদ্ধের

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই হস্তী বাহিনীকে একেবারে প্রথম সারিতে দাঁড় করানো হয়। অপর দিকে বায়াযীদের কাছে কোন জঙ্গী হাতি ছিল না।

সুলতান বায়াযীদ বাম পাশের বাহিনীর অধিনায়কত্ব অর্পণ করেন সুলায়মান চিলপীর হাতে। আর ডান পাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন আপন খ্রিস্টান স্ত্রীর সহোদরকে। মধ্যবর্তী বাহিনীর অধিনায়কত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেন এবং তার পশ্চাৎভাগে মোতায়েন করেন আপন তিন পুত্র মূসা, ঈসা ও মুস্তফাকে।

উভয়পক্ষ থেকেই প্রায় এক সাথে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে এবং ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পশ্চাৎ দিকের সৈন্যদের সমবেত ধ্বনিতে পাহাড় জঙ্গল কেঁপে ওঠে, অশ্বের খুরের আঘাতে আকাশ ধূলি-ধূসরিত হয়ে সূর্যরশ্মির দীপ্তি কমিয়ে দেয়। কিন্তু তরবারি, বর্ম ও বর্শার আঘাত-প্রতিঘাতে অগ্নিস্ফুলিংগ উত্থিত হতে থাকে। পাহাড়ে-প্রান্তরে ছুটে চলে রক্তের স্রোতধারা। সম্মুখ সারির বীরসেনানীরা চোখের পলকে মূলোৎপাটিত বৃক্ষরাজির ন্যায় ভূমিতে আছড়ে পড়তে থাকে, আর পিছনের সৈন্যরা তাদের অগ্রবর্তী সহযোগীদের লাশ মাড়িয়ে দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং অন্যকে লাশ বানিয়ে বা নিজেই লাশে পরিণত হয়ে এক মর্মান্তিক কাহিনী রচনা করে চলে। তীরের শোঁ শোঁ, ধনূকের বোঁ বোঁ, তরবারির খচ খচ, বর্ম-বর্শার টুংটাং, তরবারি ও বর্শার বিদ্যুৎঝিলিক, জমির উপর রক্ত বন্যা, পলে পলে লাশ পতিত হওয়ার আওয়াজ, আহতদের হাহাকার, হস্তী বাহিনীর গগনবিদারী চিৎকার, অশ্বের হ্রেষা ধ্বনি— এসব কিছু মিলে সেদিন এমন এক লোমহর্ষক দৃশ্যের অবতারণা হয়, যার দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে বিরল।

আংকারার মাঠে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। আবূ বকর তাইমূরের বাহিনীর শাহযাদা আবূ বকর অগ্রসর হয়ে সুলায়মান চিলপীর উপর এক সাংঘাতিক আঘাত হানেন। ফলে তুর্কীদের সারিসমূহ ভেংগে খান খান হয়ে যায়। আবূ বকরের পর পরই সুলতান হুসাইন দ্বিতীয় হামলা চালান, তারপর তৃতীয় হামলা চালান মুহাম্মাদ সুলতান। ফলে সুলতান বায়াযীদের বাম পাশের বাহিনীর অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে। এটা লক্ষ্য করে বায়াযীদের অন্যতম অধিনায়ক মুহাম্মদ খান চিলপী সুলায়মানের সাহায্যে অগ্রসর হন। তাইমূরী বাহিনীর এই মর্মান্তিক হামলাসমূহ শেষ পর্যন্ত তুর্কী বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ করে। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় একটা ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয়। সুলতান বায়াযীদের বামপাশের বাহিনীর উপর যখন ঐ দুর্যোগ নেমে এসেছিল তখন তিনি তার মধ্যবর্তী বাহিনীর জঙ্গী হাতিরা বায়াযীদের উপর হামলা চালিয়েছিল। বায়াযীদ ঐ দিন তাঁর সীমাহীন উত্তেজনাবশত একথা ভুলে গিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। অতএব তাঁকে সম্মুখযুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিটি অংশের উপর সর্বক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বায়াযীদ তা না করে একজন দুঃসাহসী সাধারণ সৈন্যের আগে বেড়ে শত্রুদের সম্মুখ সারি চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলার উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ হামলা চালাতে থাকেন। তাঁর সৈন্যরাও নিজেদের অধিনায়কের অনুসরণে শত্রুসারি চূর্ণবিচূর্ণ করার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। শেষ পর্যন্ত বায়াযীদ মোঙ্গলদের মধ্যবর্তী বাহিনীকে তাঁর সামনে থেকে হটিয়ে দিতে

সক্ষম হন এবং তাইমূরী অধিনায়কদেরকেও পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন। এবার বায়াযীদের অবশ্যকরণীয় ছিল ডান ও বাম পাশের বাহিনীকে সুবিন্যস্ত করে মধ্যবর্তী বাহিনীকে শৃঙ্খলার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু তিনি তাঁর সম্মুখবর্তী বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে সোজা উচ্চভূমির উপর হামলা চালান, যেখানে আবূ বকর, সুলতান হুসাইন প্রমুখ ফিরে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাইমূরী শাহযাদা এবং অধিনায়কবৃন্দ বায়াযীদের এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেন নি। বায়াযীদ চোখের পলকে প্রতিপক্ষের ছয়জন অধিনায়ককে তার অবস্থান থেকে হটিয়ে দিয়ে ঐ টিলা দখল করেন। তাইমূর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিজে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যেক প্রান্তের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি একজন দক্ষ দাবাড়ুর মত অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে রণক্ষেত্রের দাবাবোর্ডে আপন গুটিগুলো কখনো ডানে, কখনো বামে, কখনো সামনে, আবার কখনো পিছনে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি অত্যন্ত সন্তর্পণে ও সুকৌশলে এমনভাবে চালের পর চাল দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফায়সালা তাঁরই অনুকূলে চলে আসে। বায়াযীদকে এভাবে বিজয়ী বেশে আগে বাড়তে দেখে তাইমূর তার সজীব সতেজ প্লাটুনগুলোর সাহায্যে বায়াযীদের ডান পাশ ও বাম পাশের বাহিনীর উপর আকস্মিক হামলা চালিয়ে বায়াযীদকে তাঁর সেনাবাহিনীর বিরাট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। কিন্তু ঠিক ঐ মুহূর্তে অনেকগুলো মোঙ্গল প্লাটুন, যেগুলো বায়াযীদের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাইমূরী বাহিনীতে এসে যোগ দেয়। এতে বায়াযীদের বাহিনী বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এবার তাইমূর তার বিরাট বাহিনী নিয়ে এক সাথে প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। বায়াযীদের ডান পাশের ও বাম পাশের বাহিনী মোঙ্গলদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে প্রথমেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রতিপক্ষের এই নতুন হামলায় এবার তারা একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। বায়াযীদের পুত্র মুস্তাফা নিহত হন এবং তার শ্যালক অর্থাৎ খ্রিস্টান অধিনায়ক বিপর্যস্ত অবস্থায় পলায়ন করেন। এতদসত্ত্বেও বায়াযীদ এবং তাঁর উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সৈন্যরা এমন অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন, যা একমাত্র তাঁদের পক্ষেই ছিল সম্ভব। বায়াযীদের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি যে দিকেই হামলা চালাতেন, মোঙ্গল সৈন্যরা সেদিক থেকে পিছনে হটে যেতে বাধ্য হতো। কয়েক বার তো এমন মুহূর্ত এসেছিল যে, বায়াযীদ মোঙ্গলবাহিনীর সারিসমূহ বিচূর্ণ করে সেই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন, যেখানে তাইমূর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন বাহিনীকে হামলার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন। এতকিছু সত্ত্বেও সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল তখন বায়াযীদের প্রায় সকল সৈন্যই শত্রুদের হাতে নিহত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আপন ঘোড়ার ঠোকর খাওয়ার কারণে বায়াযীদ তাঁর পিঠ থেকে পড়ে যান এবং অন্যান্য কিছু অধিনায়কের সাথে নিজেও মোঙ্গলদের হাতে বন্দী হন। এই আংকারা যুদ্ধ মুসলিম বিশ্বের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেয় যা ছিল বায়াযীদের সত্তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

যদি জন্মগত স্বভাব একেবারে বিগড়ে না যায় তাহলে মানুষের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা বীরত্বকে মর্যাদা দেয় এবং বীরপুরুষকে ভালবাসে। এ কারণেই বিশ্বের সর্বত্র মানুষের হত্যাকারী বাঘকেও সম্মানের চোখে দেখা হয় এবং যে কোন বীরপুরুষ আশা করে, যেন

তাকে বাঘের সাথে তুলনা করা হয়। অথচ গরু-ঘোড়া মানুষের অনেক উপকারে আসা সত্ত্বেও কেউ এটা পছন্দ করে না যে, তাকে গরু অথবা ঘোড়া নামে আখ্যায়িত করা হোক। বিশ্বে রুস্তম যে খ্যাতি এবং হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) যে কারণে মর্যাদা লাভ করেছেন তা তাঁদের বীরত্ব ছাড়া কিছু নয়। এই বীরত্বের কারণেই সুলতান সালাহুদ্দীন, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, উসমান পাশা প্রমুখ ব্যক্তিকে আজ সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও প্রতিটি জাতিই শ্রদ্ধার চোখে দেখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর 'এমডন' নামক একটি ক্ষুদ্র জাহাজ ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে মিত্র বাহিনীর উপর হামলা চালায় এবং তাতে মিত্র বাহিনী বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু যখন ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেনকে গ্রেফতার করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেখানকার অধিবাসীরা তাকে এক নজর দেখার জন্য দলে দলে ছুটে আসে। জনতা সেদিন তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে নয়, বরং শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই দেখেছিল। এভাবে বীরপুরুষদের বীরত্ব যেমন যুগে যুগে মানুষকে চমৎকৃত করেছে তেমনি তাদের ধ্বংস এবং পতন তাদের বিস্মিত ও মর্মাহত করেছে। আংকারা যুদ্ধে বায়াযীদের পরাজয়ও ছিল সে ধরনেরই একটি ঘটনা।

আংকারার যুদ্ধে তাইমূর পরাজিত হলে নিশ্চয়ই তিনি এবং তাঁর বংশধররা ক্ষতির সম্মুখীন হতেন। কিন্তু তাতে ইসলামী বিশ্বের কোনরূপ ক্ষতির আশংকা ছিল না। কেননা প্রাচ্যের দেশসমূহ, যেগুলো তাইমূরের দখলে ছিল, তিনি পরাজিত হলেও সেগুলো মুসলমানদেরই দখলে থাকত। ফলে তাইমূরের পরাজয়ে মুসলিম জাতি খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হতো না। কিন্তু বায়াযীদের পরাজয়ে মুসলিম জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়। কেননা, তাঁর পরাজয়ের কারণে ইউরোপ অভিমুখে মুসলিম অভিযান বন্ধ হয়ে যায় এবং মৃতপ্রায় ইউরোপ পুনরায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে। বায়াযীদ ও তাইমূরের মধ্যকার এই যুদ্ধে যদি বায়াযীদ বিজয় লাভ করতেন তাহলে তাঁর বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা যেহেতু প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও কম ছিল, সে প্রেক্ষিতে এ যুদ্ধকে ৪৬৩ হিজরীর (১০৭০-৭১ খ্রি) ঐ যুদ্ধের মতই মনে করা হতো, যে যুদ্ধ এশিয়া মাইনরেই সংঘটিত হয়েছিল এবং যাতে সুলতান আলপ-আরসালান সালজুকী শুধু বার হাজার সৈন্য দ্বারা খ্রিস্টানদের দুই-তিন লক্ষ সৈন্যকে পরাজিত করেছিলেন। কিংবা এই যুদ্ধের তুলনা করা হতো পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের সাথে যা ১১৭৪ হিজরীতে (১৭৬০-৬১ খ্রি) সংঘটিত হয়েছিল এবং যাতে মুসলমানদের আশি নব্বই হাজার সৈন্য হিন্দুদের পাঁচ-ছয় লক্ষ সৈন্যকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল। কিংবা এই যুদ্ধ স্থান পেত কসোভা যুদ্ধ ও নিকোপলিস যুদ্ধের তালিকায়। কেননা ঐ সমস্ত যুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী বিরাট বিরাট বাহিনীকে পরাজিত ও বিপর্যস্ত করেছিল। খুব সম্ভব নিকোপলিস যুদ্ধের উপর অনুমান করেই বায়াযীদ নিজের সংখ্যাল্পতার উপর তাইমূরের যে বিরাট সংখ্যাধিক্য ছিল সেই বিষয়টি ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি এটাও লক্ষ্য করেন নি যে, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই ছিল মুসলমান। যে সমস্ত যুদ্ধে বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য পরাজিত করেছিল সে সব যুদ্ধ তো মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল এবং তাতে কাফিরদের বিরাট বাহিনী

মুসলমানদের ক্ষুদ্র বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিল। কিন্তু আংকারা যুদ্ধে তো উভয়পক্ষই ছিল মুসলমান। এতে সংখ্যা গরিষ্ঠেরই বিজয় লাভের কথা। আর বাস্তবেও ঘটেছিল তাই।

তাইমূর যদিও চেঙ্গিযী জাতির সাথে রক্ত সম্পর্ক রাখতেন এবং দিগ্বিজয়ের ক্ষেত্রে তিনি চেঙ্গীয খানের মত, বরং তার চাইতেও অধিক সুখ্যাতির অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি যেহেতু মুসলমান ছিলেন, তাই তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর বিজয়গাথা, যদিও তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই লড়েছিলেন, খুব একটা নিন্দনীয় ছিল না। কেননা সে যুগে মুসলমানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো একটি বিরাট মুসলিম সাম্রাজ্যে পরিণত হতে যাচ্ছিল। তবে মুসলমানদের জন্য এর চাইতে অধিক আনন্দের ব্যাপার আর কিছুই হতো না, যদি তাদের একজন শাহানশাহ্ যিনি পশ্চিমাঞ্চলে এই বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, শুধু পাশ্চাত্যের দেশগুলো একের পর এক জয় করে একেবারে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে গিয়ে পৌঁছতেন। আর অপর শাহানশাহ্, যিনি পূর্বাঞ্চলে এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, দিগ্বিজয়ী বেশে একেবারে চীন ও জাপান উপকূলে গিয়ে পৌঁছতেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যেভাবে পূর্বাঞ্চলে তাইমূরের কোন জুড়ি ছিল না, তেমনি পশ্চিমাঞ্চলে কোন জুড়ি ছিল না বায়াযীদেরও। অতএব তখন সমগ্র বিশ্ব ইসলামের ছায়াতলে এসে যেত। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, আংকারার যুদ্ধক্ষেত্র ঐ দুই শাহানশাহকে একে অন্যের প্রতিপক্ষরূপে নিজের দিকে টেনে নিয়ে এল এবং তাদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হলো সেটাকে শুধু ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন উন্মুক্ত সমুদ্রের দ্রুত গতিসম্পন্ন দু'টি বিরাট জাহাজের সংঘর্ষের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কিংবা তুলনা করা যেতে পারে দ্রুতগতিসম্পন্ন দু'টি বিপরীতমুখী রেলগাড়ির সংঘর্ষের সাথে। দু'টি পাগলা হাতির মধ্যে কিংবা দু'টি হিংস্র বাঘের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হলে যেমন এক ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তার চাইতেও ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল আংকারার যুদ্ধে, যখন বিশ্বের প্রখ্যাত দুই মুসলিম শাহানশাহ্, দুই বিশ্ববিখ্যাত বীরপুরুষ সর্বশক্তি নিয়ে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেদিন দু'টি বিশালকায় পর্বত যেন পরস্পরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়ার জন্য অথবা দু'টি সমুদ্র পরস্পরকে গ্রাস করে ফেলার জন্য যেন আংকারা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হয়েছিল। মোটকথা, আংকারা যুদ্ধ হচ্ছে বিশ্বের একটি বিরাট ও অতুলনীয় ঘটনা।

এই যুদ্ধে বায়াযীদের পুত্র মূসাও পিতার সাথে বন্দী হয়েছিলেন। শাহযাদা মুহাম্মদ এবং শাহযাদা ঈসা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। তাইমূর সুলতান বায়াযীদকে একটি লোহার খাঁচায় আটকে রাখেন এবং যুদ্ধের পর এই আটক অবস্থায়ই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সফর করতে থাকেন। সুলতান বায়াযীদের মত একজন বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন শাহানশাহকে এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করাটা তাইমূরের ভদ্রতা ও মনুষ্যত্বের জন্য নিঃসন্দেহে একটি কলংকজনক ব্যাপার। বিশ্ব ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অভিজাত বীরপুরুষরা যখন নিজের শত্রুর উপর পুরোপুরি প্রাধান্য লাভ করেন তখন তারা সব সময় তাদের ঐ পরাজিত প্রতিপক্ষের সাথে ভদ্র ও শালীন ব্যবহার করেন। সুলতান আলপ-আরসালান সালজুকী যখন কনসটান্টিনোপলের কায়সারকে যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী করেন

তখন তিনি তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে মুক্ত করে দেন এবং কিছু শর্তাধীনে তাঁকে তাঁর সাম্রাজ্যও ফিরিয়ে দেন। মহান আলেকজান্ডারের কাছে যখন পাঞ্জাবের রাজা বন্দী হয়ে আসেন তখন তিনি তাকে শুধু তার পাঞ্জাব রাজ্যই ফিরিয়ে দেন নি, নিজের পক্ষ থেকে আরো কিছু দেশ ঐ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। স্বয়ং বায়াযীদও নিকোপোলিসের যুদ্ধক্ষেত্রে পঁচিশ জন খ্রিস্টান শাহ্যাদাকে বন্দী করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন এবং এই মর্মে চ্যালেঞ্জ দেন ঃ এখন তোমরা নিজ নিজ দেশে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে আরো ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আক্ষেপের বিষয়, এমন একজন অতুলনীয় বীরপুরুষ ও মুজাহিদ-ই-ইসলামের উপর জয়লাভ করে তাইমূর তাঁর সাথে যে দুর্ব্যবহার করেন তা তাঁর মত একজন দিগ্বিজয়ী বীর পুরুষের জন্য একটি কলংকজনক ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। তাইমূর বায়াযীদকে ঠিক সেইরকম লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, যেমন আবদ্ধ করে রাখা হয় একটি হিংস্র বাঘ অথবা সিংহকে। এ সম্পর্কে জনৈক কবির মন্তব্য, তাইমূর বায়াযীদকে সব সময় সিংহই মনে করতেন, তাই তাঁকে স্থায়িভাবে সিংহের খাঁচায় আবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

বায়াযীদ ইয়ালদিরিমকে আংকারা যুদ্ধে যে সাংঘাতিক লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে হয়েছিল তাতে তিনি আট মাসের বেশি বাঁচেন নি। মানুষ বায়াযীদকে সিংহের খাঁচায়ই মৃত্যুবরণ করতে হয়। অবশ্য বায়াযীদের মৃত্যুর পর, তাইমূর তার প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেন যে, তাঁর লাশটি তাঁর পুত্র মূসার হাতে অর্পণ করেন এবং বন্দী মূসাকে মুক্ত করে দিয়ে বলেন– তোমার পিতার লাশটি বারুসায় নিয়ে গিয়ে দাফন করার অনুমতি আমি তোমাকে দিলাম। প্রকৃতপক্ষে তাইমূরের যাবতীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বিজয় অভিযান মুসলমান সুলতানদেরকে পরাস্ত এবং মুসলিম শহরসমূহে গণহত্যা চালানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা কিংবা অমুসলিম এলাকাসমূহে ইসলাম প্রচারের সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের মৃত্যুর পর তাইমূরও বেশিদিন জীবিত থাকেন নি। তিনি চীনদেশ আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সমরকন্দ থেকে রওয়ানা হন। আর এটাই ছিল একমাত্র যুদ্ধাভিযান, যা তিনি অমুসলিম এলাকায় পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করার কারণে তাঁর এ অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

স্বয়ং তাইমূর তাঁর 'তুযুক'-এ আংকারা যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন, তবে তা অতি সংক্ষিপ্ত আকারে। এ থেকে অনুমান করা যায়, বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের মৃত্যুর পর তাইমূর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এই ভেবে যে, এভাবে উসমানীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করা তার পক্ষে উচিত হয় নি। 'তুযুকে তাইমূরী' গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এটাও বোঝা যায় যে, বায়াযীদ ইয়ালদিরিমকে বন্দী করার ব্যাপারটি ঐ যুগের সকল মুসলমানের কাছেই একটি অতি ঘৃণ্য ও দুঃখজনক ঘটনা বলে বিবেচিত হতো। মনে হয়, এ কারণেই তাইমূর আংকারা যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লিখেননি, কিংবা তার উপর কোন আনন্দ বা গর্ব প্রকাশও করেননি। খুব সম্ভব এই বিরাট অপরাধের ক্ষতি পূরণার্থে তিনি চীন দেশ জয় করার সংকল্প নিয়েছিলেন। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সুলতান বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের পুত্রদের আত্মকলহ

আংকারা যুদ্ধের পর মনে হচ্ছিল, উসমানীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হতে আর বাকি নেই। কেননা, তাইমূর এশিয়া মাইনরের অনেক এলাকাই ঐ সমস্ত সালজুকী বংশের নেতৃবৃন্দকে দান করেন, যারা উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই এশিয়া মাইনরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। কোন কোন এলাকায় তাইমূর নিজের পক্ষ থেকে নতুন নতুন রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করেন। বায়াযীদ ইয়ালদিরিম তাইমূরের মুকাবিলা করার জন্য যখন এশিয়া মাইনরের দিকে রওয়ানা হন তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলায়মানকে আদ্রিয়ানোপলে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে আসেন। আংকারা যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর খ্রিস্টানরা এই সুযোগে তাদের নিজ নিজ এলাকা পুনর্দখলের চেষ্টা চালায় এবং শুধু আদ্রিয়ানোপল এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ ছাড়া ইতিপূর্বে দখলকৃত সমগ্র ইউরোপীয় ভূভাগ উসমানীয় সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কনস্টান্টিনোপলের কায়সার, যিনি অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে এই যুদ্ধের ফলাফলের অপেক্ষা করছিলেন, সুযোগ বুঝে তিনিও তাঁর অধিকৃত এলাকার আয়তন বৃদ্ধি করেন। সবচেয়ে বড় কথা, এই যুদ্ধের কারণে ইউরোপের খ্রিস্টানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায়। কিন্তু বিগত কয়েক বছরের যুদ্ধে উসমানীয় সুলতানরা খ্রিস্টানদের মনে যে ভীতির সঞ্চার করেছিলেন তাতে তারা তখন পর্যন্ত উসমানীয়দের হাত থেকে আদ্রিয়ানোপল ছিনিয়ে নেওয়ার দুঃসাহস পায় নি। শেষ পর্যন্ত উসমানীয় সাম্রাজ্যের আয়তন এতই সীমিত ও সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে, শুধু ইউরোপ ও এশিয়ার কর্তৃত্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দু'টি ভূখণ্ডই তার কর্তৃত্বাধীনে রয়ে গিয়েছিল। তখন উসমানীয় সাম্রাজ্যের উপর সবচেয়ে বড় যে বিপদটি নেমে এসেছিল তা হলো বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের পুত্ররা অন্তর্ঘাতী বিবাদে জড়িয়ে পড়ে।

বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের সাত অথবা আটজন পুত্র ছিলেন। তাঁর মধ্যে পাঁচ অথবা ছয়জন আংকারা যুদ্ধের পরও জীবিত ছিলেন। তাদের নাম : (১) সুলায়মান খান, যিনি আদ্রিয়ানোপলে পিতার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। (২) মূসা, যিনি পিতার সাথে বন্দী ছিলেন। (৩) ঈসা, যিনি আংকারার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বারূসার দিকে পালিয়ে গিয়ে সেখানকার শাসনকর্তৃত্ব হস্তগত করেছিলেন। (৪) মুহাম্মাদ, যিনি বায়াযীদের সর্বকনিষ্ঠ ও সর্বাধিক যোগ্য পুত্র ছিলেন। তিনি এশিয়া মাইনরেরই অপর একটি শহরে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। (৫) কাসিম, যার কোন যোগ্যতা ছিল না। তিনি মুহাম্মাদ অথবা ঈসার সাথে বসবাস করছিলেন। যা হোক, বায়াযীদ বন্দী হওয়ার পর এশিয়া অবশিষ্ট উসমানীয় এলাকায় মুহাম্মাদ এবং ঈসা পৃথক পৃথকভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। আর ইউরোপীয় এলাকার উপর সুলায়মান তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এশিয়া মাইনরের উসমানীয় অধিকৃত এলাকা কার শাসনাধীনে থাকবে, এ নিয়ে ঈসা ও মুহাম্মাদের মধ্যে এক রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে মুহাম্মাদ ঈসাকে পরাজিত করে বারূসা দখল করেন। ঈসা এশিয়া মাইনর থেকে পলায়ন করে আপন ভাই সুলায়মানের কাছে আদ্রিয়ানোপলে চলে যান এবং এশিয়া মাইনরে মুহাম্মাদের উপর হামলা পরিচালনার জন্য তাকে অনুপ্রাণিত করেন। সুলায়মান তার বাহিনী নিয়ে এশিয়া মাইনরে আসেন এবং বারূসা ও আংকারা জয় করেন।

এর চেয়ে বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয় ঘটনা আর কী হতে পারে যে, একদিকে বায়াযীদ ইয়ালদিরিম তাইমূরের কয়েদখানায় অকথ্য জুলুম-নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করছেন, আর অপর দিকে তাঁর পুত্ররা অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটির উপর কার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে সে নিয়ে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করে চলেছে। তাদের মধ্যে যখন রক্তাক্ত সংঘর্ষ চলছিল তখন নিশ্চয়ই নিজেদের মহান পিতার দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনার কথা তারা একেবারেই ভুলে বসেছিল। অন্যথায় এ মুহূর্তে ক্ষমতা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করার মানসিকতা তাদের থাকত না। যখন সুলায়মান এশিয়া মাইনরে এসে আপন ভাই মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন ঠিক তখনই তাদের পিতা বায়াযীদ ইয়ালদিরিম তাইমূরের কয়েদখানায় মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাইমূর বায়াযীদের অপর পুত্র মূসাকে মুক্ত করে দেন এবং আপন পিতার লাশ নিয়ে আসার অনুমতিও তাকে প্রদান করেন। মূসা পিতার লাশ নিয়ে আসছিলেন এমন সময়ে কুরমানিয়ার সালজুক শাসক তাঁকে পথিমধ্যে বন্দী করেন। মুহাম্মাদ, যিনি সুলায়মানের কাছে পরাজিত হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করছিলেন এবং সুলায়মানের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছিলেন। মূসার বন্দী হওয়ার সংবাদ শুনে কুরমানিয়ার শাসককে লিখেন, আপনি অনুগ্রহ করে আমার ভাই মূসাকে মুক্ত করে দিন, যাতে সে এবং আমি উভয় মিলে সুলায়মানকে শায়েস্তা করতে পারি। কুরমানিয়ার শাসকও চাচ্ছিলেন সুলায়মান এবং তার ভাইদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে থাকুক, যাতে উসমানীয় সাম্রাজ্যের যে ক্ষমতাটুকু বাকি রয়েছে এর মাধ্যমে তারও পরিসমাপ্তি ঘটে। অতএব তিনি মুহাম্মাদের সুপারিশ অনুযায়ী মূসাকে অবিলম্বে মুক্ত করে দেন। মূসা পিতার দাফন-কাফন সম্পন্ন করেই আপন ভাই মুহাম্মাদের সাথে মিলিত হন। মূসা যেহেতু আপন পিতার সাথে বন্দী ছিলেন তাই স্বভাবতই উসমানী উমারা ও সাধারণ সৈন্যদের কাছে তিনি ছিলেন অধিকতর শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর অংশগ্রহণের সাথে সাথে মুহাম্মাদ খানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অত্যন্ত জোরেশোরে এশিয়া মাইনরের প্রান্তরে প্রান্তরে যুদ্ধাগ্নি জ্বলে ওঠে। এক পক্ষে ছিলেন মুহাম্মাদ ও মূসা এবং অন্যপক্ষে ছিলেন সুলায়মান ও ঈসা। শেষ পর্যন্ত ঈসা এক সংঘর্ষে নিহত হন। এতদসত্ত্বেও সুলায়মান আপন প্রতিপক্ষ দুই ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। কয়েকবার মুহাম্মাদ ও মূসা পরাজিতও হন। শেষ পর্যন্ত মূসা আপন ভাইকে বলেন ঃ আপনি আমাকে সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে ইউরোপীয় এলাকায় পাঠিয়ে দিন। আমি সেখানে গিয়ে নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করব। ফলে সুলায়মান বাধ্য হয়ে এশিয়া মাইনর ছেড়ে সেদিকে মনোনিবেশ করবে। মুহাম্মাদের কাছে এই প্রস্তাব খুবই পছন্দনীয় ছিল। অতএব মূসা একটি বাহিনী নিয়ে আড্রিয়ানোপল গিয়ে পৌঁছেন। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সুলায়মানও সেদিকে অগ্রসর হন। ফলে মূসা ও সুলায়মানের মধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুলায়মান যেহেতু আপন পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন এবং তিনি নিজেকে সমগ্র উসমানীয় সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক বলে মনে করতেন তাই সামরিক অধিনায়কদেরকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান কিংবা তাদেরকে সব সময় সন্তুষ্ট রাখার প্রতি তিনি খুব একটা মনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু মূসা ও মুহাম্মাদ যেহেতু সুলায়মানের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছিলেন এবং বয়সে ছোট হওয়ার কারণে তাঁরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল ছিলেন তাই

নিজেদের স্বার্থেই তাঁরা সেনাবাহিনীর সাথে অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করতেন। কিভাবে তাঁরা নিজেদের অধিনায়কদেরকে সন্তুষ্ট রাখবেন, কিভাবে তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন সেদিকে সব সময় তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ফলে সামরিক অধিনায়কবৃন্দ স্বভাবতই সুলায়মানের উপর মূসাকে প্রাধান্য দেন।

ফলে সুলায়মান মূসার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। পরাজিত ও পর্যুদস্ত সুলায়মান দেশ থেকে পালিয়ে কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের কাছে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে ৮১৩ হিজরীতে (১৪১০-১১ খ্রি) পথিমধ্যে বন্দী ও নিহত হন। তখন শুধু দু'ভাই মুহাম্মাদ ও মূসা অবশিষ্ট ছিলেন। মূসার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অংশের উপর, আর এশীয় অংশের উপর প্রতিষ্ঠিত হলো মুহাম্মাদের অধিকার।

মূসা এটা জানতেন যে, কনসটান্টিনোপলের শাসক কায়সার মিনুটাল প্লীলূগাস সুলায়মানের পক্ষপাতিত্ব করতেন বলেই সুলায়মান তাঁর কাছে পালিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। অতএব তিনি কনসটান্টিনোপলের কায়সারকেও শাস্তি প্রদানের সংকল্প নেন। কিন্তু এর আগেই সার্বিয়ার শাসককে শাস্তি প্রদান করা তাঁর জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কেননা সার্বিয়ার শাসক স্টিফেন প্রকাশ্যেই সুলায়মানের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। অতএব তিনি প্রথমে সার্বিয়া আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সার্বীয় বাহিনীকে এমনভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন যে, তারা সম্পূর্ণরূপে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ঘটনার পর সীমান্তবর্তী জেলাগুলাতে পুনরায় উসমানীয়দের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টানরাও তাদের সম্পর্কে সজাগ, এমন কি আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সার্বিয়ার উপর মূসার এই আক্রমণ উসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক প্রমাণিত হয়। কেননা, ইতিমধ্যে ইউরোপের খ্রিস্টানরা মুসলমানগণ অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে যে ধারণা করছিল তা তাদের অন্তর থেকে তিরোহিত হয়। তারপর মূসা কনসটান্টিনোপল আক্রমণ করেন এবং তা অবরোধ করে কায়সারকে শাস্তি প্রদানের সংকল্প নেন। কিন্তু কায়সার মিনুটালও অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি এই অবসরে মুহাম্মদ খানের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে নিয়েছিলেন। মুহাম্মদ তখন এশিয়া মাইনরের স্বাধীন শাসক ছিলেন এবং নিজের ক্ষমতাকে যথেষ্ট সুদৃঢ় করে নিয়েছিলেন। তিনি তখন ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করছিলেন, যেগুলো তাইমূর প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। বাহ্যত মনে হচ্ছিল, মূসা ও মুহাম্মাদ দুই ভাই এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে গিয়েছেন যে, উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় এলাকা মূসার দখলে থাকবে এবং এশীয় এলাকার উপর দখল থাকবে মুহাম্মাদের। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোন আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয় নি। আর এটাকে উপলক্ষ করেই সুচতুর কায়সার তাঁদের মধ্যে একটি ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেন। যখন মূসা কনসটান্টিনোপল অবরোধ করেন তখন কায়সার মুহাম্মাদ খানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুহাম্মাদ খান বিষয়টির অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই ঐ অবরোধ উঠিয়ে নেওয়ার জন্য ইউরোপ উপকূলে গিয়ে পৌঁছেন। ফলে কনসটান্টিনোপলের যুদ্ধক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও এশীয় তুর্করা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং এখানেই দুই ভাইয়ের মধ্যকার বিরোধ সাধারণ্যে প্রকাশ পায়। মূসার অবরোধ তখনো বহাল ছিল এমন সময় মুহাম্মাদ খানের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে,

এশীয় এলাকায় তার অধীনস্থ জনৈক রঈস বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র মুহাম্মাদ খান সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য এশিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। এই বিদ্রোহ মূসা খানের ইঙ্গিতেই হয়েছিল, যাতে মুহাম্মাদ খান একজন খ্রিস্টান বাদশাহর সাহায্য করতে না পারেন। যাহোক মুহাম্মাদ খান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন। ওদিকে মুহাম্মাদের অনুপস্থিতিতে মূসা অবরোধের ক্ষেত্রে আরো কঠোরতা অবলম্বন করেন। ফলে কনসটান্টিনোপলের কায়সারের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য মুহাম্মাদ খান বিদ্রোহ দমন করে পুনরায় কনসটান্টিনোপলে গিয়ে পৌঁছেন। উপরন্তু তিনি সার্বিয়ার সম্রাট স্টিফেনকেও লিখেন ঃ তুমি মূসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর, আমি তোমাকে সাহায্য করব। সার্বিয়ার সম্রাট প্রথম থেকেই মূসার মাধ্যমে নানা অসুবিধা ভোগ করছিলেন। এবার মুহাম্মাদ খানের প্রশ্রয় পেয়ে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মূসা যখন সার্বিয়া সম্রাটের বিদ্রোহের কথা জানতে পারেন তখন কনসটান্টিনোপলের অবরোধ উঠিয়ে সার্বিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। এদিক থেকে মুহাম্মাদ খানও আপন বাহিনী নিয়ে মূসার পিছনে পিছনে সার্বিয়ায় গিয়ে পৌঁছেন। সার্বিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে জারলী নামক প্রান্তরে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে মূসা নিহত হন। তারপর মুহাম্মাদ খান ইব্ন বায়াযীদ ইয়ালদিরিম বিজয়ী বেশে আড্রিয়ানোপল পৌঁছে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এবার তাকেই সমগ্র উসমানীয় সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। যেহেতু বায়াযীদের সন্তানদের মধ্যে হুকুমত পরিচালনার যোগ্য একমাত্র তিনিই রয়ে গিয়েছিলেন তাই এখন থেকে গৃহযুদ্ধেরও অবসান হয়। মুহাম্মাদ খান আড্রিয়ানোপলের সিংহাসনে আরোহণ করে আপন বাহিনী, বাহিনী অধিনায়ক এবং প্রজাসাধারণের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ নেন। তারপর তিনি বারুসায় অবস্থানরত আপন ভাই কাসিমকে আড্রিয়ানোপলে ডেকে পাঠান। সুলায়মানের পুত্রকেও ডেকে পাঠানো হয়। তারপর তারা যাতে ভবিষ্যতে কোনরূপ বিশৃংখলার সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য তাদের উভয়কেই অন্ধ করে ফেলা হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে এই অন্ধ অবস্থায়ই তাদেরকে অত্যন্ত আয়েশ-আরামের মধ্যে রাখা হয়েছিল। এ ঘটনা ঘটে ৮১৬ হিজরীতে (১৪১৩-১৪ খ্রি)। এভাবে আংকারা যুদ্ধের পর একাধারে এগারো বছর উসমানী বংশের মধ্যে গৃহযুদ্ধের পরও উসমানীয় সাম্রাজ্যের টিকে থাকা, তারপর একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে পুনরায় গড়ে ওঠা নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এত বিরাট ধাক্কা সহ্য করে এবং এত ভয়ংকর পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে কোন বংশের কোন জাতির পক্ষে নিজের অবস্থাকে পুনরায় শুধরিয়ে নেওয়ার অনুরূপ ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

সুলতান মুহাম্মাদ খান (প্রথম)

সুলতান মুহাম্মাদ খান ইব্ন বায়াযীদ ইয়ালদিরিম ৮১৬ হিজরীতে (১৪১৩-১৪ খ্রি) রাজধানীতে আড্রিয়ানোপলে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। কনসটান্টিনোপলের কায়সার এবং সার্বিয়ার সম্রাটের সাথে তাঁর পূর্ব থেকেই সন্ধি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে

উভয় সম্রাটই তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং অনেক মূল্যবান উপহার-উপঢৌকনও পাঠান। উত্তরে মুহাম্মাদ খান তাঁর বন্ধুত্বের যে প্রমাণ পেশ করেন তা হলো সার্বিয়া সম্রাটকে তিনি বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা দেন এবং কনসটান্টিনোপলের কায়সারকে থেসলীর ঐ দুর্গ, যা তুর্কদের দখলে চলে এসেছিল এবং কৃষ্ণসাগর উপকূলবর্তী কিছু কিছু জায়গা যেগুলো হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে কনসটান্টিনোপলের কায়সার অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন, সেগুলো উপহারস্বরূপ তাকে প্রদান করেন। ভেনিসের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যা একটি বিরাট নৌবাহিনীর অধিকারী ছিল এবং তুর্কদের মুকাবিলায় সদাপ্রস্তুত থাকত, সুলতান মুহাম্মাদ খানের শান্তিপ্রিয়তা ও আপোসকামিতার খ্যাতি শুনতে পেয়ে সেও সন্ধি স্থাপনের আবেদন জানায় এবং সুলতান মুহাম্মাদ খান নির্দ্বিধায় তার সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। আল্লাশিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়া প্রভৃতি তুর্কী প্রদেশ আংকারা যুদ্ধের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে স্বাধিকার ঘোষণা করেছিল। তাছাড়া প্রত্যেক দেশেই খ্রিস্টানরা নিজ নিজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। এদের প্রত্যেকেই এই ভেবে শংকিত ছিল যে, উসমানীয় সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করার পর ধীরে ধীরে একদা আপন পিতা কর্তৃক অধিকৃত প্রদেশসমূহ আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইবেন এবং আমাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করবেন। তারা যখন সুলতান মুহাম্মাদ খানের সাফল্যের সংবাদ পায় তখন ভয়ে ভয়ে নিজ নিজ দূত সুলতানের দরবারে পাঠিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানায়। সুলতান মুহাম্মাদ খান এতে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং ঐ দূতদেরকে বিদায় জানাতে গিয়ে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের শাসকদের কাছে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে একথা অবশ্যই বলবে যে, আমি তোমাদের সকলকে নিরাপত্তা প্রদান করেছি এবং সকলের শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করেছি।

আল্লাহ্ তা'আলা শান্তি ও নিরাপত্তা পছন্দ করেন এবং বিশৃঙ্খলা পছন্দ করেন না। সুলতান মুহাম্মাদ খানের এই কার্যধারার ফল দাঁড়াল এই যে, সমগ্র ইউরোপে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, উসমানীয় সাম্রাজ্য যে একটি ভয়ানক ব্যাধি থেকে অতি সম্প্রতি সেরে উঠেছিল, তার জন্য এই মুহূর্তে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি তথা শারীরিক কসরত ছিল খুবই ক্ষতিকারক। এখন তার প্রয়োজন ছিল পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও বাছাইকৃত খাদ্য গ্রহণের। এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটা বিশেষ অনুগ্রহ যে, শেষ পর্যন্ত একজন যোগ্য সুলতানই উসমানীয় সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর প্রতিটি কর্মধারাই সব দিক দিয়ে সাম্রাজ্যের জন্য মংগলজনক প্রমাণিত হয়।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে সুলতান মুহাম্মাদ খান ইউরোপীয় অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন বটে, তবে এশিয়া মাইনরে তখনও বিদ্রোহের স্রোতধারা অব্যাহত থাকে। অতএব বাধ্য হয়ে তাঁকে নিজ সেনাবাহিনীসহ এশিয়া মাইনর অভিমুখে যাত্রা করতে হয়। তিনি প্রথমে স্মার্নার বিদ্রোহ দমন করেন। তারপর কারমানিয়ার বিদ্রোহীদের পর্যুদস্ত করে তাদেরকেও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। তারপর তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এই কৌশল্ল অবলম্বন করেন যে, এশিয়া মাইনরে পূর্ব-সীমান্তের আশেপাশে তাইমূরের মৃত্যুর পর যে সমস্ত রাজ্য বা সালতানাত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তিনি তাদের সবগুলোর সাথেই

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সমগ্র এশিয়া মাইনরকে নিজের দখলে নিয়ে এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করেন যে, তারপর তাইমূরী আক্রমণের মত আর একটি আক্রমণ উসমানীয় সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দিতে পারবে না।

৮২০ হিজরীতে (১৪১৭ খ্রি) যখন সুলতান মুহাম্মাদ খান এশিয়া মাইনর থেকে আড্রিয়ানোপলে ফিরে এসেছেন, তখন দানিয়াল উপত্যকার নিকটবর্তী ঈজিয়ান সাগর বক্ষে ভেনিসের নৌবহরের সাথে সুলতানের নৌবহরের একটি ভয়ানক সংঘর্ষ বাঁধে এবং তাতে তুর্কী নৌবহর ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সংঘর্ষের কারণ ছিল এই যে, ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপসমূহে বসবাসকারীরা শুধু নামমাত্র ভেনিস গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীনস্থ ছিল। এই সমস্ত লোক সুলতানের উপকূলীয় এলাকা, যেমন গ্যালিপোলী প্রভৃতির উপর আকস্মিক আক্রমণ চালাত।

সুলতান তাদেরকে দমন করার জন্য আপন নৌবহরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ভেনিসের নৌবহরের সাথে তাদের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। যেহেতু ঐ নৌবহরটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী তাই স্বাভাবিকভাবেই সুলতানের নৌবাহিনীকে তাদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। অবশ্য এই সংঘর্ষের পরপরই পুনরায় ভেনিসের সাথে সুলতানের সন্ধি স্থাপিত হয়। ভেনিস ছিল একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, যা গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও রোম সাগরে ভেনিসের নৌশক্তি ছিল সবার উপরে। যা হোক, এরপর থেকে সুলতানের সামনে আর কোন যুদ্ধ বা সংঘর্ষের আশংকা ছিল না। প্রকৃত পক্ষে তিনি তখন আপন সাম্রাজ্যকে প্রশস্ত করার চাইতে তার আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে চাচ্ছিলেন। তিনি তখন শহর পল্লী সর্বত্রই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, উলামা ও পণ্ডিতবর্গের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ব্যবসায়ীদেরকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন, ফলে শত্রু-মিত্র সকলের কাছেই তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাঁর প্রজারা তাঁকে 'চিলপী' (ধীর মেজাজের বীরপুরুষ) উপাধি প্রদান করে এবং সব দেশেই তিনি আপোসকামী সুলতান হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর প্রশাসন ব্যবস্থায় একটি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং তার মূল হোতা ছিলেন সেনাবাহিনীর কাযী বদরুদ্দীন।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, একজন নওমুসলিম ইহুদী মুরতাদ হয়ে এই মর্মে একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করে যে, সুলতানকে পদচ্যুত করে সাম্রাজ্যের পরিবর্তে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কাযী বদরুদ্দীন তাকে সমর্থন করেন এবং তারা উভয়ে মিলে মুস্তাফা নামীয় জনৈক নিরক্ষর ব্যক্তিকে তাদের ধর্মীয় নেতা মনোনীত করে। তারা ইউরোপ-এশিয়ার সর্বত্র তাদের এই মতাদর্শ প্রচার করে জনসাধারণকে নিজেদের স্বমতে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন একটি ভয়ানক বিদ্রোহের আকার ধারণ করে এবং সুলতান মুহাম্মাদ খান অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। এই বিদ্রোহ ভিতরে ভিতরে প্রজাসাধারণকেও প্রভাবান্বিত করতে থাকে। এই বিদ্রোহ আর একটি বিশেষ কারণে দ্রুত সাফল্য লাভ করে। তা এই যে, সুলতান মুহাম্মাদ খান আপোস চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সাধারণভাবে খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করায় মুসলমান প্রজারা তাঁর উপর

অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারা একথা বুঝতে পারেনি যে, ঐ সময়ে খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন উসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্য ছিল খুবই উপকারী। যাহোক উল্লিখিত বিদ্রোহীরা যখন জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস পায় তখন সাধারণ মুসলমানরা তাদের সহজ শিকারে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত সুলতান মুহাম্মাদ খান ঐ বিদ্রোহ দমনের জন্য চরম পন্থা অবলম্বন করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তা দমন করতে সক্ষমও হন। মুরতাদ নওমুসলিম, কাযী বদরুদ্দীন, ধর্মীয় নেতা মুস্তাফা এই তিনজনই সুলতান মুহাম্মাদ খানের হাতে নিহত হয়। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার পর সুলতান মুহাম্মাদ খানকে আর একজন ভয়ংকর বিদ্রোহীর মুকাবিলা করতে হয়। আংকারা যুদ্ধে সুলতান বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের মুস্তাফা নামীয় একজন পুত্র নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পর তার লাশের কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তাইমূরও যুদ্ধশেষে মুস্তাফার লাশ উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালান, কিন্তু তাতে সফল হন নি। এ কারণে মুস্তাফার নিহত হওয়ার ব্যাপারটি সন্দেহজনকই রয়ে গিয়েছিল। এবার সুলতান মুহাম্মাদ খানের শাসনামলের শেষদিকে জনৈক ব্যক্তি এশিয়া মাইনরে এই দাবি উত্থাপন করে যে, আমিই বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের পুত্র মুস্তাফা। যেহেতু আকার আকৃতিতে মুস্তাফার সাথে তার অনেক মিল ছিল তাই অনেক তুর্কই তার দাবি স্বীকার করে নেয়। স্মার্ণার শাসনকর্তা জুনায়দ এবং ওয়াল্লাশিয়ার শাসনকর্তা তার এই দাবিকে আগে বেড়ে এজন্য সমর্থন করেন যে, তারা মুহাম্মাদ খানের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। অতএব উল্লিখিত মুস্তাফা এই প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাহায্যে গ্যালিপোলী পৌঁছে থেসলীর নিকটবর্তী এলাকাসমূহ দখল করেন। সুলতান মুহাম্মাদ খান এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আপন সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। স্যালোনিকার সন্নিকটে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে মুস্তাফা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং কনসটান্টিনোপলের কায়সারের দরবারে পৌঁছে তার আশ্রয়প্রার্থী হয়। সুলতান মুহাম্মাদ খান কায়সারকে লিখেন, মুস্তাফা হচ্ছে আমার বিদ্রোহী। অতএব তুমি তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। কায়সার তাকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেন এবং মুহাম্মাদ খানকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, আমি তাকে (মুস্তাফাকে) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নজরবন্দী করে রাখব। তবে এই শর্তে যে, আপনি তার থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য খরচাদি বাবদ কিছু অর্থ আমার কাছে পাঠাতে থাকবেন। যেহেতু ঐ সময়ে ক্রমাগত বিদ্রোহের ফলে সুলতান মুহাম্মাদ খান অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত ছিলেন তাই তিনি ঐ মুহূর্তে কায়সার কিংবা অন্য কোন খ্রিস্টান সম্রাটের সাথে আর একটি সংঘর্ষ বাঁধুক, তা চাচ্ছিলেন না। অতএব তিনি কায়সারের ঐ প্রস্তাব মেনে নেন এবং বিদ্রোহী মুস্তাফার খরচাদি বাবদ কিছু অর্থ কায়সারের কাছে পাঠাতে স্বীকৃত হন। এই বিদ্রোহ দমনের পরও বিদ্রোহী মুস্তাফার প্রতি সুলতান মুহাম্মাদ খানের সতর্ক দৃষ্টি ছিল এবং তিনি কনসটান্টিনোপলের কায়সারের সাথে আপন সম্পর্ক আরো সুন্দর, আরো মধুর করে তোলার উদ্দেশ্যে স্বয়ং কনসটান্টিনোপল গমনের সংকল্প নেন। যখন তিনি এশিয়া মাইনর থেকে দানিয়াল উপত্যকা অতিক্রম করে গ্যালিপোলী হয়ে আড্রিয়ানোপলের দিকে আসছিলেন তখন কায়সার তার আগমন সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত

জাঁকজমকের সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কনসটান্টিনোপলে নিয়ে আসেন। সেখানে সুলতান ও কায়সার পুনরায় তাঁদের আপোসচুক্তি নবায়ন করেন। তারপর সুলতান গ্যালিপোলির দিকে যাত্রা করেন এবং সেখানে ৮২৫ হিজরীতে (১৪২২ খ্রি) সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

সুলতান মুহাম্মাদ খানের শাসনামল : একটি পর্যালোচনা

আংকারা যুদ্ধের সময় সুলতান মুহাম্মাদ খানের বয়স ছিল সাতাইশ বছর। আংকারা যুদ্ধের পর তিনি এশিয়া মাইনরের আমাসিয়া এলাকার শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন। তারপর আপন ভাইদের সাথে তাঁর সংঘর্ষের ধারা অব্যাহত থাকে। একাধারে এগারো বছর শক্তি পরীক্ষার পর তিনি সবাইকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে উসমানীয় সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সুলতানে পরিণত হন। তিনি আট বছর সুলতান রূপে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। তিনি এমন মধ্যপন্থা এবং কৌশল অবলম্বন করেন, যার ফলে মৃতপ্রায় উসমানীয় সাম্রাজ্য পুনরায় সুস্থ-সবল ও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। এ কারণে কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে 'নূহ' উপাধি প্রদান করেছেন। কেননা তিনি উসমানীয় সাম্রাজ্যের ডুবন্ত তরীকে রক্ষা করে তীরে ভিড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সুলতান মুহাম্মাদ খান (প্রথম) হচ্ছেন সর্বপ্রথম উসমানীয় সুলতান, যিনি আপন রাজকীয় কোষাগার থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ কাবাঘর ও মক্কার অধিবাসীদের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন, যা প্রতি বছর নিয়মিত মক্কায় গিয়ে পৌঁছত এবং যার একটি অংশ অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হতো এবং অপর অংশ কা'বাঘরের হিফাযত ও তত্ত্বাবধানে ব্যয় করা হতো। এ কারণেই মিসরের আব্বাসীয় খলীফা মুতাদিদ বিল্লাহ্ সুলতান মুহাম্মাদ খানকে 'খাদিমুল হারামাইন শারীফাইন' উপাধি দান করেন। সুলতান এই উপাধিকে নিজের সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক মনে করেন। শেষ পর্যন্ত এই উপাধি ফলেফুলে সুশোভিত হয়ে একদিন উসমানীয়দেরকে 'খলীফাতুল মুসলিমীন'-এর আসনে অধিষ্ঠিত করে।

মৃত্যুকালে সুলতান মুহাম্মাদ খানের বয়স ছিল সাতচল্লিশ বছর। তখন আঠার বছর বয়স্ক তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুরাদ খান (দ্বিতীয়) ছিলেন এশিয়া মাইনরের একটি বাহিনীর অধিনায়কত্বে নিয়োজিত। সালতানাতের মন্ত্রীবর্গ চল্লিশ দিন পর্যন্ত সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুরাদ খানের কাছে এই মর্মে জরুরী সংবাদ পাঠান– আপনি অবিলম্বে রাজধানীতে এসে সিংহাসনে আরোহণ করুন। এভাবে পূর্ণ চল্লিশ দিন পর সুলতানের লাশ গ্যালিপোলী থেকে বারুসায় নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয়।

সুলতান মুরাদ খান (দ্বিতীয়)

সুলতান মুরাদ খান (দ্বিতীয়) ৮০৬ হিজরীতে (১৪০৩-০৪ খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আঠার বছর বয়সে রাজধানী আড্রিয়ানোপলে (এদিরনে) যথারীতি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করেন। এই যুবক সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথে নানারূপ কঠিন সমস্যায় সম্মুখীন হন।

সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র কনসটান্টিনোপলের খ্রিস্টান সম্রাট বন্দী মুস্তাফাকে নিজের সামনে ডেকে এনে এই মর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নেন যে, তিনি (মুস্তাফা) যদি উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধিকারী হন তাহলে অনেকগুলো সুদৃঢ় দুর্গ এবং অনেকগুলো প্রদেশ (অঙ্গীকার পত্রে যার বিস্তারিত বিবরণ ছিল) কায়সারের হাতে সমর্পণ করবেন এবং সর্বদা তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকবেন। তারপর কনসটান্টিনোপলের কায়সার মুস্তাফাকে একটি সেনাবাহিনী দেন এবং মুস্তাফা কায়সারেরই একটি নৌবহরে আরোহণ করে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের ইউরোপীয় এলাকায় গিয়ে পৌছেন। এবার তার কাজ হলো, সুলতান মুরাদের কাছ থেকে উসমানীয় সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া। যেহেতু মুস্তাফা নিজেকে সুলতান মুহাম্মাদ খানের ভাই এবং বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের পুত্র বলে পরিচয় দিত এবং তার এই দাবি সত্য না মিথ্যা সে ব্যাপারে তুর্করা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছিল না, তাই অনেক উসমানী সৈন্যই তার সাথে এসে যোগ দেয়। ফলে তার (মুস্তাফার) ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং তিনি একের পর এক শহর জয় করতে থাকেন। মুরাদ খান যে বাহিনীকে মুস্তাফার মুকাবিলায় পাঠিয়েছিলেন তার অধিকাংশই মুস্তাফার সাথে যোগ দেয় এবং অবশিষ্টরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসে। তারপর সুলতান মুরাদ ঐ বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করার জন্য নিজ সেনাপতি বায়াযীদ পাশার নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। কোন একটি যুদ্ধক্ষেত্রে বায়াযীদ পাশা নিহত হন এবং মুরাদের বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই বিজয় লাভের ফলে মুস্তাফার সাহস আরো বেড়ে যায়। তিনি এবার সিদ্ধান্ত নেন, প্রথমে সমগ্র এশিয়া মাইনর দখল করে নেবেন। কেননা ইউরোপীয় এলাকা সম্পর্কে তার এই ধারণা ছিল যে, কনসটান্টিনোপলের কায়সার এবং পশ্চিম সীমান্তের খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহরা তাকে মুরাদ খানের বিরুদ্ধে জরুরী সাহায্য প্রদান করবেন। তাই এশিয়া দখল করার পর ইউরোপীয় এলাকা থেকে মুরাদ খানকে তাড়িয়ে দেওয়া তার জন্য হবে খুবই সহজ। অতএব তিনি সমুদ্র খাড়ি অতিক্রম করে এশিয়া মাইনরে হামলা চালান। দ্বিতীয় মুরাদ খান এই ভয়ংকর অবস্থা প্রত্যক্ষ করে স্বয়ং মুস্তাফার মুকাবিলায় রওয়ানা হন এবং এশিয়া মাইনরে পৌছে তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। মুরাদ খান যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছার সাথে সাথে তুর্কী সিপাহীদের মনে মুস্তাফার দাবি সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তাই তারা মুস্তাফার দল ত্যাগ করে মুরাদ খানের দলে এসে যোগ দেয়। মুস্তাফা নিজের এই নাজুক অবস্থা লক্ষ্য করে এশিয়া মাইনর থেকে পালিয়ে যান এবং গ্যালিপোলীতে এসে থেসনী প্রভৃতি এলাকা দখল করে নেন। মুরাদ খানও মুস্তাফার পশ্চাদ্ধাবন করে গ্যালিপোলীতে এসে পৌছেন। সেখানেও উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে মুস্তাফা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে আড্রিয়ানোপলের দিকে পলায়ন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল আড্রিয়ানোপল দখল করা। কিন্তু সেখানে পৌছা মাত্র তাকে বন্দী করা হয় এবং ফাঁসি দিয়ে তার লাশ একটি টাওয়ারে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

তারপর সুলতান মুরাদ খান কনসটান্টিনোপলের কায়সারের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন জেনেভা রাষ্ট্রের সাথে একটি আপোস চুক্তি সম্পাদন করেন এবং কনসটান্টিনোপলের কায়সারই বিদ্রোহী মুস্তাফার মাধ্যমে উল্লিখিত ফিতনার সৃষ্টি করেছিলেন। কনসটান্টিনোপলের কায়সার

প্লিউলিগুস যখন শুনতে পান যে, সুলতান মুরাদ খান কনসটান্টিনোপল আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন এবং এই বিপদ কিভাবে টলানো যায়, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেন। ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া এবং কুটকৌশলের মাধ্যমে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়ানোর ক্ষেত্রে তাঁর চমৎকার দক্ষতা ছিল এবং এই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি উসমানীয় সাম্রাজ্যকে বার বার বিপদের মধ্যে ফেলে এ যাবত নিজের সাম্রাজ্যকে টিকিয়েও রেখেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি নিজের একদল প্রতিনিধি সুলতানের দরবারে পাঠানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না। যাতে তারা সুলতানের কাছে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতের জন্য একটি আপোস চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু সুলতান মুরাদ খান এবার ঐ প্রতিনিধি দলকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন, এমন কি তাদের আপন দরবারে প্রবেশের অনুমতি পর্যন্ত দেননি।

তারপর ১৪২২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের প্রথম দিকে ৮২৫ হিজরীতে বিশ হাজার বাছাইকৃত সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে সুলতান মুরাদ খান কনসটান্টিনোপলের সামনে এসে হাযির হন এবং অত্যন্ত কঠোরতার সাথে তা অবরোধ করেন। তিনি সমুদ্র খাড়ির উপর একটি কাঠের পুল নির্মাণ করে ঐ অবরোধকে পরিপূর্ণতা প্রদান করেন। কনসটান্টিনোপল শহর জয় করা কোন সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সুলতান মুরাদ খান এমনি দৃঢ়তা ও আস্থার সাথে ঐ কাজ শুরু করেন এবং অবরোধ কাজে মিনজানীক ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক অস্ত্রাদি এমনভাবে ব্যবহার করেন এবং চারপাশের মিনার ও টাওয়ারগুলোকে এমনি কৌশলে কাজে লাগান যে, শেষ পর্যন্ত কনসটান্টিনোপলের জয়ের ব্যাপারে মুসলমানদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে। অবরোধ চলাকালে কায়সারও নিষ্কর্মা হয়ে বসেছিলেন না। তিনি একদিকে প্রতিপক্ষের হামলা প্রতিরোধের এবং অপর দিকে এশিয়া মাইনরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মুরাদ খানের সামনে এর চাইতেও কঠিন সমস্যা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাস্তবেও দেখা গেল, মুরাদ খানের সামনে এর চাইতেও কঠিন সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেছে, যার কারণে কনসটান্টিনোপল জয় করতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি এমনি এক মুহূর্তে মুরাদ খান অবরোধ তুলে এশিয়া মাইনরের দিকে যাত্রা করেন, ঠিক যেমনি তার পিতামহ বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম কনসটান্টিনোপলের অবরোধ তুলে তাইমূরের মুকাবিলা করার জন্য একদা এশিয়া মাইনরের দিকে যাত্রা করেছিলেন।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সুলতান মুহাম্মাদ খান চার পুত্র সন্তান রেখে মারা যান। তাদের মধ্যে দু'জন ছিল একেবারে শিশু এবং দু'জন ছিল মোটামুটি যুবা বয়সী। মুরাদ খান ছিলেন সবার বড়। তাঁর বয়স তখন ছিল আঠারো বছর। দ্বিতীয় পুত্রের নাম মুস্তাফা। পিতার মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল পনেরো বছর। দ্বিতীয় মুরাদ খান সিংহাসনে আরোহণ করার পর আপন ছোট দুই ভাইকে তাদের সুষ্ঠু প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বারুসায় পাঠিয়ে দেন এবং তৃতীয় ভাই মুস্তাফাকে এশিয়া মাইনরের শাসনকর্তা ও সেনাপতি নিয়োগ করেন। তিন ভাইই বেশ আরাম-আয়েশ ও মর্যাদার সাথে কালাতিপাত করছিলেন। দ্বিতীয় মুরাদ খান তার তথাকথিত চাচা মুস্তাফার ফিতনা দমন করে ফেলেছেন এবং আড্রিয়ানোপলে মুস্তাফার ফাঁসিও হয়ে গেছে। তখন কায়সার প্লিলোগাস এই দ্বিতীয় মুস্তাফার উপরও তাঁর

ষড়যন্ত্র বিস্তারের প্রয়াস পান। তিনি তার গুপ্তচর ও সুযোগ্য দূতদের মাধ্যমে দ্বিতীয় মুরাদের ভাই মুস্তাফাকে এই বলে অনবরত উস্কানি দিতে থাকেন যে, আমি তোমাকেই সালতানাতের জন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করি। যদি তুমি সিংহাসনের দাবি কর তাহলে আমি তোমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করবো। এদিকে তিনি এশিয়া মাইনরের ঐ সমস্ত সর্দারকেও যারা এখন পর্যন্ত কুনিয়া ও অন্যান্য শহরে উসমানীয় সাম্রাজ্যের জায়গীরদার হিসাবে ছিল এবং শাহী পরিবারের সাথে আত্মীয়তা বন্ধনেও আবদ্ধ ছিল, দ্বিতীয় মুরাদ খানের বিরুদ্ধে এবং তার ভাই মুস্তাফা খানের পক্ষে টেনে আনার গোপন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তার প্রচেষ্টায় সফলও হন।

মুস্তাফা খান সালজুকী আমীরদের সাহায্য নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তা করেন ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন মুরাদ খানের কনসটান্টিনোপল জয় করতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। যা হোক মুস্তাফা খান এশিয়া মাইনরের অনেক শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ দখল করে বারুসা অবরোধ করে ফেলেন।

দ্বিতীয় মুরাদ খান সংবাদ পান যে, এশিয়া মাইনরের সৈন্যরা বিদ্রোহ করে মুস্তাফার সাথে যোগ দিয়েছে এবং এশিয়া মাইনর তার (মুরাদ খান) দখল থেকে চলে যাচ্ছে তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে কনসটান্টিনোপলের অবরোধ তুলে মুস্তাফা খানকে দমনের জন্য এশিয়া মাইনর অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি এশিয়া মাইনরে পৌঁছতেই বেশির ভাগ সৈন্য মুস্তাফাকে ত্যাগ করে মুরাদ খানের বাহিনীতে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত মুরাদ খান মুস্তাফা খানকে পরাজিত করে হত্যা করেন। এভাবে ভালোয় ভালোয় অতি শীঘ্রই এশিয়া মাইনরের কর্তৃত্ব মুরাদ খানের আয়ত্তে চলে আসে। তারপর আনুমানিক এক বছর মুরাদ খান এশিয়া মাইনরে অবস্থান করে সেখানকার অবিশ্বস্ত আমীরদের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করে নিজের সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করে তুলেন। ৮২৮ হিজরীতে (১৪২৫ খ্রি) সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ খান এশিয়া মাইনর থেকে ইউরোপের দিকে আসেন। তখন কনসটান্টিনোপলের সম্রাট কর হিসাবে বার্ষিক ত্রিশ হাজার ডাকেট প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের দখল ছেড়ে দিয়ে মুরাদ খানের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। ফলে মুরাদ খান পুনরায় কনসটান্টিনোপল আক্রমণ করেননি। তারপর মুরাদ খান আপন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা এবং প্রজাসাধারণের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাপৃত থাকেন। তাই কোন খ্রিস্টান বা অখ্রিস্টান রাজ্যের উপর তিনি আর হামলা চালাননি। তবে বিভিন্ন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র তার সাথে যে সমস্ত সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেছিল সেগুলো যাতে পুরোপুরিভাবে মেনে চলা হয় সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

সার্বিয়া সম্রাট স্টিফেন, যিনি উসমানীয় সাম্রাজ্যের করদাতা ও অনুগত ছিলেন, ৮৩১ হিজরীতে (১৪২৭-২৮ খ্রি) মারা যান। তার স্থলে সিংহাসনে আরোহণ করেন জর্জ বার্নিক ভিচ। যেহেতু এই নয়া সম্রাট তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাটের ন্যায় ততটা বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন না, তাই কনসটান্টিনোপলের কায়সার তাঁর উপর আপন ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করার সুযোগ পান। তিনি ভেতরে ভেতরে জর্জ ও হাঙ্গেরীবাসীদেরকে সুলতান মুরাদ খানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকেন। যেহেতু হাঙ্গেরীবাসীরাও এতদিন নিকোপোলিসের শোচনীয়

পরাজয়ের দৃশ্য বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁরাও উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে এবং তাদের এই প্রচেষ্টা কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ৮৩৪ হিজরীতে (১৪৩০-৩১ খ্রি) সুলতান মুরাদ খান যান্টি দ্বীপ, গ্রীসের দক্ষিণাংশ এবং স্যালূনিকা অঞ্চল জয় করে ভেনিসবাসীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। শেষ পর্যন্ত ভেনিসবাসীরা বাধ্য হয়ে অত্যন্ত অপমানকর শর্তের অধীনে সুলতানের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করে। ভেনিস যেহেতু কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের পক্ষে ছিল, তাই ভেনিসের অপমানে তিনি নিজেকে অপমানিতবোধ করেন এবং আগের চেয়ে দ্বিগুণ উদ্যমে আপন ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতে থাকেন। এদিকে সুলতান মুরাদ ইউরোপে ক্রমান্বয়ে আপন দখলীকৃত এলাকার আয়তন বৃদ্ধি করতে শুরু করেন। আলবেনিয়া এবং বোসনিয়াবাসীরাও সার্বিয়া ও হাঙ্গেরীর ন্যায় সুলতানের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে। সার্বিয়া ও রুমানিয়ার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ট্রান্সলোনিয়া প্রদেশের খ্রিস্টানরা ৮৪২ হিজরীতে (১৪৩৮-৩৯ খ্রি) বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সুলতান তাদের উপর হামলা চালিয়ে সত্তর হাজার খ্রিস্টানকে যুদ্ধক্ষেত্রেই বন্দী করেন এবং সেখানে আপন পরাক্রম ও ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে রাজধানীতে ফিরে আসেন। ওরা ছিল তুর্কদের বিরোধী এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। মুরাদ খান সিংহাসনে আরোহণ করার পর ঐ খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ঐ সময়েই 'জন হানী ডিজিয়া জন হানীদাস' নামক জনৈক ব্যক্তি পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জনের পর হাঙ্গেরী ফিরে আসে। সে ছিল সম্রাট সিজমান্ডের অবৈধ সন্তান। তার মা ছিল এলিজাবেথ মারসী নামীয় জনৈকা সুন্দরী বেশ্যা। হানীদাস হাঙ্গেরীতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয় এবং তুর্কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সে প্রথমে ট্রান্সলুনিয়া থেকে তুর্কদের বহিষ্কার করে। হানীদাসের সাথে সংঘর্ষে তুর্কী জেনারেল মুজীদ বেগ, যিনি ঐ অঞ্চলের কর্মকর্তা ছিলেন, আপন পুত্রসহ নিহত হন এবং ত্রিশ হাজার তুর্ক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারায়। যারা বন্দী হয় তাদের সাথে হানীদাস নির্মম আচরণ করেন। বিজয়ের খুশিতে হাঙ্গেরীতে যে সমস্ত ভোজসভার আয়োজন করা হতো সেখানে সমস্ত বন্দীর একটি দলকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হতো এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে তাদেরকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হতো। এভাবে আনন্দের জলসায় তুর্কী কয়েদীদের হত্যা করা যেন খ্রিস্টানদের একটি আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুলতান মুরাদ খানের কাছে একদিকে এই পরাজয়ের সংবাদ পৌছে। অপরদিকে এশিয়া মাইনর থেকে সংবাদ আসে কুনিয়ায় বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে। সুলতানের জন্য এই সমস্ত সংবাদ ছিল খুবই হতাশাব্যঞ্জক। যা হোক, তিনি হানীদাস ও হাঙ্গেরীবাসীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একজন অধিনায়কের নেতৃত্বে আশি হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং তিনি এশিয়া মাইনরের দিকে রওয়ানা হন। এটা হচ্ছে ৮৪৭ হিজরীর (১৪৪৩-৪৪ খ্রি) ঘটনা।

তুর্কীদের এই বাহিনীকে পরাজিত করা এবং সমস্ত তুর্ক জাতিকে ইউরোপ মহাদেশ থেকে বিতাড়নের জন্য এবার খ্রিস্টানদের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তা ইতিপূর্বে কখনো লক্ষ্য করা যায়নি। হাঙ্গেরী সম্রাট লেভ সেলস এবং হাঙ্গেরী সেনাপতি হানীদাস ইতিমধ্যে এতই বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাদের বাহাদুরি ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে

ইউরোপের প্রত্যেক দেশের খ্রিস্টান যোদ্ধারা তাদের বাহিনীতে যোগদানের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে এবং এটাকে তাদের জন্য একটি গর্বের বিষয় বলে মনে করে। রোমের পোপ জন এবং তার প্রতিনিধিরা ধর্মের দোহাই দিয়ে খ্রিস্টান যোদ্ধাদেরকে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হাঙ্গেরী, সার্বিয়া, ওয়াল্লেশিয়া, পোল্যান্ড, জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, বোসনিয়া, আলবেনিয়া প্রভৃতি দেশের খ্রিস্টান যোদ্ধারা দলে দলে এসে হানীদাসের পতাকাতলে সমবেত হয়। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যখন যুদ্ধ হয় তখন খ্রিস্টানদের বিরাট বাহিনীর কাছে উসমানীয় বাহিনী পরাজয়বরণ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে চার হাজার তুর্ক বন্দী হয় এবং অনেকেই শাহাদাতবরণ করেন। হানীদাস পরাজিত উসমানীয় বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে সোফিয়া নগরী দখল করে নেন। তারপর সমগ্র রুমানিয়া পর্যুদস্ত করে বিরাট সংখ্যক কয়েদী এবং পর্বতপ্রমাণ মালে গনীমত নিয়ে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ সময়ে আড্রিয়ানোপল দখল করা খুবই সহজ ছিল, কিন্তু তিনি সে দুঃসাহস করেননি। সুলতান মুরাদ খান এই পরাজয় এবং আপন অধিকৃত অঞ্চলসমূহ পর্যুদস্ত হওয়ার সংবাদ এশিয়া মাইনর থেকে পান। তিনি অতিশীঘ্রই এশিয়া মাইনরের বিদ্রোহ দমন করে আড্রিয়ানোপলে চলে আসেন এবং খ্রিস্টানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। এটা হচ্ছে ৮৪৭ হিজরীর (১৪৪৩-৪৪ খ্রি) ঘটনা। এই সময়েই সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলাউদ্দীন মৃত্যুবরণ করেন। এতে সুলতান এতই বিচলিত ও মর্মাহত হন যে, সালতানাত ও হুকুমতের প্রতি তাঁর আর কোন আগ্রহই বাকি থাকেনি। গত যুদ্ধে সুলতানের ভগ্নিপতি মুহাম্মাদ চিলপী হানীডেজ ওরফে হানীদাসের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তাঁর বোন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যেভাবে পারেন মুহাম্মাদ চিলপীকে মুক্ত করে নিয়ে আসার জন্য সুলতানের প্রতি চাপ সৃষ্টি করেন। উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুলতান হাঙ্গেরীবাসীদের সাথে পত্রালাপ শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে সার্বিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে সেখানকার সম্রাট জর্জের হাতে সাম্রাজ্যের যাবতীয় অধিকার অর্পণ করেন। তিনি ওয়াল্লেশিয়া প্রদেশ ও হাঙ্গেরীকে দিয়ে দেন এবং ফিদিয়া স্বরূপ দশ হাজার ডাকেট প্রেরণ করে মুহাম্মাদ চিলপীকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। এই অঙ্গীকারপত্র হাঙ্গেরী এবং তুর্কী উভয় ভাষায়ই লেখা হয়। তাতে সুলতান মুরাদ খান (দ্বিতীয়) এবং হাঙ্গেরীর সম্রাট লেভ সেলাস স্বাক্ষর প্রদান করেন। উভয় সম্রাটই এই মর্মে শপথ নেন যে, এই অঙ্গীকারপত্রকে ধর্মীয় নির্দেশাবলীর মতই মান্য করা হবে। এই অঙ্গীকার-পত্র অনুযায়ী দানিয়ূব নদীকে সুলতানের অধিকারভুক্ত এলাকার সীমানা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। এভাবে ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই (মুতাবিক ৮৪৮ হিজরীতে) দশ বছরের জন্য সুলতান মুরাদ খান (দ্বিতীয়) এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে এই আপোস চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই আপোস চুক্তি সম্পাদনের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সুলতান মুরাদ খান শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করার সংকল্প নেন। প্রধানত এর দু'টি কারণ ছিল। প্রথম কারণ, ধারণা করেছিলেন, চুক্তি সম্পাদনের পর অন্তত দশ বছর দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল থাকবে। দ্বিতীয় কারণ তাঁর পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তিনি অনেকটা ভেংগে পড়েছিলেন। যা হোক তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মাদ খানকে আড্রিয়ানোপল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। মুহাম্মাদ খান যেহেতু

অল্পবয়স্ক ছিলেন, তাই মুরাদ খান অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মন্ত্রী এবং অধিনায়কদেরকে তাঁর উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করেন এবং তিনি এশিয়া মাইনরে গিয়ে দরবেশ ও সংসারত্যাগীদের দলে ভর্তি হয়ে নির্জন জীবন যাপন করতে থাকেন।

সুলতান মুরাদ খানের সিংহাসন ত্যাগ এবং কিশোর মুহাম্মাদ খানের সিংহাসন আরোহণের কথা শুনে খ্রিস্টানদের লোভাতুর জিহ্বা পানিতে ভরে ওঠে। তারা এটাকে একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে মুরাদ খানের সাথে সম্পাদিত যাবতীয় চুক্তি ভেঙ্গে ফেলে তুর্ক বংশকে ইউরোপ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার সংকল্প নেয়। হাঙ্গেরীর সম্রাট লেভ সেলাস– যিনি এই কিছুদিন পূর্বে এই মর্মে শপথ নিয়েছিলেন যে, মুরাদ খানের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ধারাসমূহ ধর্মীয় নির্দেশাবলীর ন্যায়ই মান্য করবেন। তিনি চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু পোপ এবং তাঁর সহকারী কার্ডিনাল জুলিয়ান সম্রাটকে এই বলে অঙ্গীকার ভঙ্গে উদ্বুদ্ধ করেন যে, মুসলমানদের সাথে কৃত অঙ্গীকার মেনে চললে বরং পাপ হবে এবং তা ভেঙ্গে ফেললে পুণ্য হবে। অনুরূপভাবে হাঙ্গেরীর সেনাপতি হানীদাসও এত তাড়াতাড়ি এই চুক্তি ভঙ্গ করাকে নিজের জন্য অপমানকর মনে করতেন। কিন্তু তাকে হাঙ্গেরীর রাজদরবারের পক্ষ থেকে এই প্রলোভন দেখানো হয় যে,বুলগেরিয়া জয় করে তোমাকে সেখানকার বাদশাহ করা হবে। এতে তিনিও চুক্তি ভংগ করতে সম্মত হয়ে যান। মোটকথা, ঐ আপোস চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর এক মাস যেতে না যেতেই খ্রিস্টানরা তা ভেংগে ফেলতে ঐকমত্যে পৌঁছে। সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী তুর্ক সৈন্যরা সার্বিয়া ছেড়ে যাচ্ছিল। ফলে সমগ্র সার্বিয়া এলাকা তুর্কীশূন্য হয়ে পড়েছিল। খ্রিস্টানরা কিছুদিন এ জন্য অপেক্ষা করে। তারপর চুক্তি সম্পাদনের ঠিক পঞ্চাশ দিন পর, ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর, (৮৪৮ হিজরীতে) হাঙ্গেরী বাহিনী আগে বেড়ে তুর্কী সীমান্ত চৌকিতে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। তারপর বুলগেরিয়ার পথ ধরে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে পৌঁছে সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে দারনা শহর জয় করে। ইতিপূর্বে পথিমধ্যে যেখানেই তুর্কীবাহিনী অবরোধ সৃষ্টি করেছে সেখানেই তাদেরকে পরাজিত ও নিহত হতে হয়েছে। তাছাড়া খ্রিস্টান সৈন্যরা মুসলমানদেরকে যেখানেই পেয়েছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে তাদের সকলকেই পাইকারীভাবে হত্যা করেছে। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানদের এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও আকস্মিক আক্রমণের কথা সংসার ত্যাগী নির্জনবাসী সুলতান মুরাদের কাছে বর্ণনা করা হয় এবং তাঁর কাছে বিনীত অনুরোধ জানান হয়, যেন তিনি নির্জন খানকাহ থেকে বের হয়ে এসে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। এই অবস্থা জানার পর সুলতান মুরাদ খান সঙ্গে সঙ্গে আড্রিয়ানোপলে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে দারনা অভিমুখে রওয়ানা হন। বিজয়ী খ্রিস্টান বাহিনী দারনার নিকটবর্তী প্রান্তরে অবস্থান করছিল। এমনি সময়ে হানীদাসের গোয়েন্দারা এসে সংবাদ দেয় যে, সুলতান মুরাদ খান নির্জন বাস পরিত্যাগ করে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে স্বয়ং খ্রিস্টান বাহিনীর মুকাবিলায় এসেছেন এবং এখান থেকে মাত্র চার মাইল দূরে তাঁবু স্থাপন করেছেন। এই সংবাদ পেয়েই হানীদাস ও হাঙ্গেরী-সম্রাট একটি পরামর্শসভা আহ্বান করেন এবং সে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। খ্রিস্টান বাহিনীর বাম

পার্শ্বে ওয়াল্লেশিয়ার বাহিনী এবং ডান পার্শ্বে হাঙ্গেরীর বাছাইকৃত বাহিনী মোতায়েন করা হয়। কার্ডিনাল জুলিয়ানের অধীনেও খ্রিস্টানদের একটি বিরাট বাহিনী ছিল। হাঙ্গেরীর সম্রাট তার দেশের সর্দার ও বীর অশ্বারোহীদের নিয়ে মধ্যবর্তী বাহিনীতে অবস্থান নেন। পোল্যান্ডের সৈন্যরা একজন বিখ্যাত বিশপের অধিনায়কত্বে অবস্থান নেয় পশ্চাৎবর্তী বাহিনীতে। হানীদাস ছিলেন খ্রিস্টান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সুলতান মুরাদ খানও তাঁর ডান ও বাম পার্শ্বের বাহিনীর বিন্যাস সাধন করেন। তিনি ঐ সন্ধি চুক্তিকে নকল করে তাঁর বর্শার অগ্রভাগে স্থাপন করেন, যে চুক্তিটি স্বয়ং হাঙ্গেরীর সম্রাট সুলতান মুরাদ খানকে লিখে দিয়েছিলেন। ১০ নভেম্বর দারনার প্রান্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। খ্রিস্টানরা এর দু'মাস দশ দিন পূর্বেই সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং ইতিমধ্যে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অনেক শহরও ধ্বংস করেছে। যা হোক, হানীদাস খ্রিস্টান বাহিনীর ডান পার্শ্ব থেকে উসমানী বাহিনীর এশীয় প্লাটুনগুলোর উপর এত জোরদার হামলা চালান যে, তুর্কী সৈন্যরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। অপরদিক থেকে ওয়াল্লেশা বাহিনী তুর্কী বাহিনীর উপর জোরদার হামলা চালায়। ফলে উসমানীয় বাহিনীর অপর পার্শ্বের অবস্থাও টলটলায়মান হয়ে ওঠে।

সুলতান মুরাদ খান নিজ বাহিনীর এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। ঠিক ঐ মুহূর্তে হাঙ্গেরী সম্রাট লেভ সেলাস উসমানীয় বাহিনীর মধ্যবর্তী অংশের উপর অত্যন্ত জোরদার হামলা চালান এবং শত্রুব্যূহ ভেদ করে সেই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে যান, যেখানে সুলতান মুরাদ খান হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আপন বাহিনীর দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করছিলেন। সুলতান তার শোচনীয় পরাজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভাবছিলেন এবার ঘোড়া ছুটিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবেন, না শত্রুবাহিনীর উপর বেপরোয়া হামলা চালিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেবেন। ঠিক তখনি হাঙ্গেরী সম্রাট লেভ সেলাস চিৎকার দিয়ে অত্যন্ত দম্ভভরে সেখানে আবির্ভূত হন এবং সুলতানকে মুকাবিলার আহ্বান জানান। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে ধনুকে তীর জুড়ে সজোরে লেভ সেলাসের প্রতি নিক্ষেপ করেন এবং তা তার ঘোড়ার উপর গিয়ে পড়ে। এতে ঘোড়াটি ভীষণভাবে আহত হয় এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ঠিক তখনি নেগচারী বাহিনীর খাজা খায়রী নামীয় জনৈক বৃদ্ধ অধিনায়ক আগে বেড়ে লেভ সেলাসের দেহ থেকে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং একটি বর্শায় তা গেঁথে ঐ অঙ্গীকারপত্রসহ (যা সম্রাট ও সুলতানের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল এবং সম্রাট তা একতরফাভাবে ভঙ্গ করেছিলেন) উর্ধ্বে তুলে ধরেন। হাঙ্গেরী সম্রাটের এই ছিন্ন মস্তক দেখে খ্রিস্টান সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। এদিকে যে সমস্ত তুর্ক পশ্চাদপসরণ করছিল তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয় এবং তারা নব-উদ্যমে খ্রিস্টান বাহিনীর উপর হামলা চালায়। হানীদাস ঐ ছিন্ন মস্তকটি দেখার সাথে সাথে তা ছিনিয়ে আনার জন্য বেশ কয়েকবার চেষ্টা চালান। কিন্তু প্রতিবারই তিনি বিফল হন। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান বাহিনী পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে পোপের সহকারী এবং খ্রিস্টান বাহিনীর সেনাপতি কার্ডিনাল জুলিয়ান, বিশপ এবং অন্য সকল অধিনায়ক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হন। শুধু হানীদাস পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। হাঙ্গেরীর গোটা বাহিনীই তুর্কদের হাতে নিহত হয়।

এই বিরাট বিজয়ের পর উসমানীয় বাহিনী সার্বিয়া জয় করে সেটাকে নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। অনুরূপভাবে বোসনিয়াও বিজিত হয় এবং সেখানকার রাজপরিবারও ধ্বংস হয়ে যায়। কোন কোন খ্রিস্টান পরিবারের উপর খ্রিস্টান রাজরাজড়াদের এবারকার এই অঙ্গীকার ভঙ্গের এমনি প্রভাব পড়ে যে,সার্বিয়া ও বোসনিয়ার অনেক খ্রিস্টান নিজে থেকেই মুসলমান হয়ে যায়। সুলতান মুরাদ খান ধর্মের ব্যাপারে নিজের দিক থেকে কারো উপর কোন প্রকার বাধ্য-বাধকতা আরোপ করেননি, বরং তিনি তাঁর সমগ্র খ্রিস্টান প্রজাকে অন্যান্য সম্রাটের মত সেইসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রেখেছিলেন, যা মুসলমানরা ভোগ করত। কয়েক মাস অনবরত চেষ্টা চালিয়ে সুলতান মুরাদ খান খ্রিস্টান বিদ্রোহীদেরকে সমুচিত শাস্তি দেন এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যকে পূর্বের চাইতেও বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করেন। তারপর পুত্র মুহাম্মাদ খানকে পুনরায় সিংহাসনে বসিয়ে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর উদ্দেশ্যে নির্জনবাসে চলে যান। মুহাম্মাদ খান পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করার পর নেগচারী বাহিনী তাঁর কাছে তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানায় এবং যখন দেখে যে, সুলতান এ ব্যাপারে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন তখন তারা বিদ্রোহ ঘোষণার হুমকি দেয় ও এখানে-সেখানে লুটপাট করতে শুরু করে। এভাবে সেনাবাহিনীর মধ্যে স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা দেখা দেয়ায় উসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে পুনরায় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাবৃন্দ এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে পুনরায় সুলতান মুরাদ খানের খিদমতে হাযির হন এবং নিবেদন করেন : মহামান্য সুলতান! পুনরায় আপনি দৃষ্টি না দিলে এই বিশৃঙ্খলা দূর করা যাবে না। অতএব বাধ্য হয়ে সুলতান মুরাদ খানকে নির্জনবাস ছেড়ে এশিয়া মাইনর থেকে আদ্রিয়ানোপলে আসতে হলো। এটা হচ্ছে হিজরী ৮৪৯ সনের (১৪৪৫ খ্রি) ঘটনা। যখন সুলতান মুরাদ আদ্রিয়ানোপলে পৌঁছেন তখন সেনাবাহিনী ও প্রজাবৃন্দ তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায়। এবার সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করার পর আপন পুত্র মুহাম্মাদ খানকে, যিনি গত এক বছরে দু'বার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, এশিয়া মাইনরে পাঠিয়ে দেন, যাতে তিনি সেখানে অবস্থান করে শাসন পরিচালনা সম্পর্কে অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পর মুরাদ খান, যারা বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার নায়ক, তাদেরকে সমুচিত শাস্তি দেন এবং সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েন যে, তৃতীয়বারের মত সিংহাসন ত্যাগ করাকে আর সমীচীন মনে করেননি। এবার শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়ার পর দ্বিতীয় মুরাদ খ্রিস্টানদেরকে পুনরায় মাথা উঠাবার অবকাশ দেননি। অবশ্য বিনা কারণে তিনি কোন অমুসলিমকে কোন কষ্টও দেননি। কনসটান্টিনোপলের সম্রাট যদিও আপন দুষ্টামি ও ফিতনাবাজির কারণে উসমানীয়দের জঘন্যতম শত্রু ছিলেন এবং যদিও তাঁকে একেবারে শেষ করে দেওয়া মুরাদ খানের জন্য তেমন কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না, তবুও তিনি তাঁকে কোনভাবে বিরক্ত না করে আপন অবস্থার উপরই থাকতে দেন। ৮৫২ হিজরীতে (১৪৪৮ খ্রি) উল্লিখিত হানীদাস তুর্কদের মূলোৎপাটনের জন্য পুনরায় খ্রিস্টান বাহিনী পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং শীঘ্রই অন্যান্যবারের মত এবারও তুর্কদের মুকাবিলায় বিরাট খ্রিস্টান বাহিনী গড়ে তোলেন। এবার কসোভা নামক স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তিন দিন যুদ্ধ চলার পর সুলতান মুরাদ তার এই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং ইউরোপের আরো অনেক এলাকা দখল করে আপন সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন।

তারপর আলবেনিয়ার বিশৃঙ্খলা দমন করতে গিয়ে সুলতান মুরাদ খান তাঁর অনেক সময় ব্যয় করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি তার মৃত্যুকাল তথা হিজরী ৮৫৫ সন (১৪৫১ খ্রি) পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ঐ বিশৃঙ্খলার মূলোৎপাটন করতে পারেননি। তুর্করা যদিও অনেক পূর্বেই আলবেনিয়া জয় করেছিল, কিন্তু ঐ প্রদেশ শাসন করত সেখানকার প্রাচীন শাসকবংশ। তারা তুর্কী সুলতানকে কর দিত এবং সব ক্ষেত্রেই তাদের অধীনতা স্বীকার করত। আলবেনিয়ার শাসক জন কেসট্রাইট সুলতান মুরাদ খানের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁর কাছে আপন অল্প বয়স্ক পুত্রকেই পাঠিয়ে দেন এবং নিবেদন করেন, যেন সুলতান এদেরকে জামিনস্বরূপ তাঁর কাছে রেখে দেন এবং নেগচারী বাহিনীতে ভর্তি করার জন্য তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আড্রিয়ানোপলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবস্থানকালে এই চারটি ছেলের তিনটিই অসুস্থ হয়ে মারা যান। এই সংবাদ শুনে আলবেনিয়ার শাসক জন কেসট্রাইট আপন পুত্রদের মৃত্যুর ব্যাপারটি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি সুলতানকে লিখেন, আমার পুত্রদেরকে সম্ভবত আমার কোন শত্রুই বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে। এতে সুলতান মুরাদ খানও দুঃখিত হন এবং আলবেনিয়া শাসকের জীবিত পুত্র (এবং সর্বজ্যেষ্ঠও) জর্জ কেসট্রাইটকে অত্যন্ত যত্নের সাথে শাহী মহলেই প্রতিপালন করতে থাকেন। ঐ ছেলেটির প্রতি সুলতানের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যখন ঐ ছেলেটির বয়স আঠারো বছর হলো তখন সুলতান তাকে একটি সেনা প্লাটুনের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। ছেলেটিও অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে আপন দায়িত্ব পালন করতে থাকে।

সুলতান ছেলেটির নাম রাখেন সিকান্দার বেগ। শেষ পর্যন্ত ইনি লর্ড সিকান্দার বেগ নামে খ্যাতি লাভ করেন। ৮৩৬ হিজরীতে (১৪৩২-৩৩ খ্রি) যখন আলবেনিয়া শাসকের মৃত্যু হয় তখন সিকান্দার বেগ, উসমানীয় সাম্রাজ্যের কয়েকটি জেলার প্রশাসক। সুলতান সিকান্দারকে তার পিতার স্থলে আলবেনিয়ার শাসক নিযুক্ত করাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। প্রকৃতপক্ষে সিকান্দারের মধ্যে আলবেনিয়া শাসকের যোগ্যতা পুরামাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সুলতান তাকে নিজের পুত্র বলেই মনে করতেন এবং তার উপর বিরাট বিরাট প্রদেশের শাসন কর্তৃত্বও ন্যস্ত করতেন। এই সিকান্দার বেগ এক সময়ে বিদ্রোহ করতে পারে, এ চিন্তা মুরাদ খানের অন্তরে কখনো উদিত হয়নি। কিন্তু হিজরী ৮৪৭ সনে (১৪৪৩ খ্রি) তুর্কী বাহিনী যখন হানীদাসের কাছে পরাজিত হয় তখন সিকান্দার বেগ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আপন পৈতৃক রাজ্য আলবেনিয়া দখলের সংকল্প নেন। তিনি হঠাৎ একদিন সুলতানী মীর মুনশীর তাঁবুতে ঢুকে তার গলার উপর তরবারি ধরে আলবেনিয়ার সুবেদারের নামে একটি ফরমান লিখিয়ে নেন। উক্ত ফরমানে সুবেদারকে বলা হয়েছিল– সিকান্দার বেগ, যিনি সুলতানের পক্ষ থেকে ভাইসরয় হিসাবে তোমার কাছে যাচ্ছেন, তুমি তাকে আলবেনিয়ার রাজধানী এবং সমগ্র এলাকার দায়িত্বভার বুঝিয়ে দাও। এই ফরমান লেখা এবং তাতে সুলতানী মহর মারার পর সিকান্দার মীর মুনশীকে হত্যা করে ফেলেন। তারপর তিনি সোজা আলবেনিয়ার রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছেন। সুলতানী ফরমান পেয়ে আলবেনিয়ার সুবেদার সিকান্দারকে যাবতীয় দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেন। সেখানকার প্রজারাও সিকান্দারকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে। এভাবে আলবেনিয়া দখল করে নেওয়ার পর সিকান্দার আলবেনিয়াবাসীদের সামনে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন– আমি ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলাম এবং আমি ভবিষ্যতে যে

কোন মূল্যে আপন দেশকে তুর্কদের অধীনতা থেকে মুক্ত রাখব। এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে খ্রিস্টানদের মধ্যে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তারা আলবেনিয়ায় যে সমস্ত মুসলমান রয়েছে তাদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত সেখানকার সকল মুসলমানই খ্রিস্টানদের হাতে অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হয় এবং সিকান্দার বেগ আলবেনিয়ার স্বাধীন সম্রাট হয়ে বসেন। সিকান্দার বেগ সুলতানের খাসমহলে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। সুলতানের নৈকট্য তাকে এতই দুঃসাহসী করে দিয়েছিল যে, শাহযাদাদের ন্যায় জীবন যাপন করার ফলে তিনি তুর্কদেরকেও বড় একটা পরোয়া করতেন না। তিনি জন্মগতভাবে ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাশালী, ধীশক্তিসম্পন্ন ও সাহসী। উপরন্তু আলবেনিয়া একটি পার্বত্য দেশ হওয়ার কারণে সেখানকার রাস্তাঘাট ছিল দুর্গম। তাই বাইরের কোন হামলাকারীর সেখানে প্রবেশ করাটা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। উপরোক্ত পরিস্থিতি এবং পরিবেশই সিকান্দার বেগকে আলবেনিয়ার স্বাধীন শাসকে পরিণত করতে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। এদিকে সুলতান মুরাদ খান অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে সিকান্দার বেগের প্রতি মনোনিবেশ করার মত সময় ও সুযোগ পাচ্ছিলেন না। বেশ কয়েকবারই আলবেনিয়া আক্রমণ করা হলো। কিন্তু সিকান্দার বেগের অসাধারণ বীরত্ব ও সামরিক যোগ্যতার কাছে প্রতিবারই তুর্কীদের হার মানতে হলো। সিকান্দার বেগ আলবেনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতানী বাহিনীর মুকাবিলায় এমন অভূতপূর্ব বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করেন যে, খোদ তুর্কীরা একজন সুযোগ্য জেনারেল হিসাবে তাকে স্বীকৃতি দান করে। সুলতান মুরাদ খান তাঁর শাসনামলে সিকান্দার বেগকে পরাজিত বা বন্দী করতে পারেননি। অবশ্য আলবেনিয়ার পাহাড়ী পরিবেশও এ ব্যাপারে তাকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। কিন্তু ৮৭২ হিজরীতে (১৪৬৭-৬৮ খ্রি) তিনি ভেনিসের কোন একটি এলাকায় মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন। তার মৃত্যুর পর তুর্কী সিপাহীরা তার সমাধি খনন করে সেখান থেকে তার হাড়ের টুকরোগুলো খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালায় যাতে সেগুলো 'গলার তাবীয' হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তাদের ধারণা মতে, ঐ হাড়ের প্রভাবে তাদের ঘরেও সিকান্দার বেগের মত বীর বাহাদুর ও যুদ্ধবিশারদ সন্তান জন্ম নেবে। সুলতান মুরাদ খান যেহেতু সিকান্দার বেগকে আপন পুত্রের মত প্রতিপালন করেছিলেন, তাই তিনি কখনো সিকান্দার বেগের মৃত্যু বা ধ্বংস কামনা করতেন না। তাঁর আশা ছিল, সে কোন এক সময়ে সঠিক পথে চলে আসবে এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেবে। সুলতান মুরাদের মৃত্যুর পর সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও সিকান্দার বেগকে আপন ভাইয়ের মতই ভালবাসতেন এবং এ কারণেই তিনি সিকান্দার বেগের সাথে সন্ধি স্থাপন করে তাকে আলবেনিয়ার স্বাধীন শাসক হিসাবে স্বীকৃতি দেন। এতদসত্ত্বেও সিকান্দার বেগ যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তখন সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) হামলা চালিয়ে আলবেনিয়া দখল করে নেন। সিকান্দার নিরুপায় হয়ে ভেনিসের দিকে চলে যান এবং সেখানেই ৮৭২ হিজরীতে (১৪৬৭-৬৮ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর থেকে আলবেনিয়া উসমানীয় সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

সিকান্দার বেগ সম্পর্কিত আলোচনার ইতি এখানেই টানা হলো। সুলতান মুরাদ খান (দ্বিতীয়) ৮৫৫ হিজরীতে (১৪৫১ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর লাশ বারুসায় নিয়ে গিয়ে

দাফন করা হয়। এই সুলতান মোট ত্রিশ বছর সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁর শাসনামলে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তিনি উসমানীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি পূর্বের চাইতে অনেকখানি সুদৃঢ় করে তোলেন। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান, আল্লাহ্ভীরু ও হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন।

কনসটান্টিনোপল বিজয়ী সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)

সুলতান মুরাদ খানের মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ খান এশিয়া মাইনরে ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল একুশ বছর কয়েক মাস। পিতা জীবিত থাকাকালে মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) আরো দু'বার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন (পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)। তখন তাঁর বয়স ছিল পনের-ষোল বছর। মুরাদ খান (দ্বিতীয়)-এর মৃত্যুর পর শাহী কর্মকর্তারা এশিয়া মাইনরে মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-এর কাছে সংবাদ পাঠান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে রওয়ানা হন এবং দানিয়াল উপত্যকা পার হয়ে আদ্রিয়ানোপলে এসে পৌঁছেন। সেখানে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। সার্বিয়া-সম্রাটের কন্যার দিক থেকে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের আর একজন পুত্র ছিল। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আট মাস। যখন মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-এর সিংহাসন আরোহণের অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছিল এবং সাম্রাজ্যের কর্মকর্তা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আনুগত্যের বায়আত করছিলেন তখন নেগচারী বাহিনীর জনৈক অধিনায়ক এক অতি অমানুষিক আচরণ করে। সে সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-কে কোন কিছু না জানিয়ে ঐ আট মাসের শাহযাদাকে হাম্মাম খানায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। খুব সম্ভবত ঐ নওমুসলিম অধিনায়ক মুহাম্মাদ খানের স্বার্থেই উপরোক্ত কাজটি করেছিল এবং তার মতে এটা ছিল মুহাম্মাদ খানের জন্য একটি বিরাট খিদমত। কেননা এই শাহযাদা হয়ত তার যৌবনকালে আপন মা তথা সার্বীয় রাজকুমারীর কারণে সার্বিয়াবাসী ও অন্যান্য খ্রিস্টানের সাহায্য নিয়ে সুলতান মুহাম্মাদ খানের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু সুলতান মুহাম্মাদ খানের কাছে নেগচারী অধিনায়কের ঐ পৈশাচিক কাণ্ডটি মোটেই পছন্দ হয়নি। যেহেতু ছয় বছর পূর্বে মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) আপন পিতার জীবিতাবস্থায় অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দু'-দু'বার সিংহাসনে আরোহণ করে কোন যোগ্যতা বা দুঃসাহসিকতার প্রমাণ দিতে পারেন নি, তাই জনসাধারণের ধারণা ছিল, এবারও তিনি একজন দুর্বলমনা সুলতান হিসাবেই নিজেকে প্রমাণ করবেন। অথচ এ ধরনের অনুমান মোটেই যুক্তিভিত্তিক ছিল না। কেননা, ঐ সময়ে তিনি ছিলেন মাত্র পনের বছরের এক কিশোর এবং এখন একুশ-বাইশ বছরের এক মস্ত যুবক। তাছাড়া মধ্যবর্তী এ ছয় বছর তিনি খেলাধুলা করে কাটাননি, বরং নিজের প্রশাসনিক যোগ্যতা বৃদ্ধির কাজেই ব্যয় করেছেন এবং আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থেকে বরাবরই নিজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা সাধারণভাবে মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-কেই তাঁর সৎ ভাইয়ের হত্যাকারী আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের এ অভিযোগ কোন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যেহেতু মুহাম্মাদ খান পরবর্তীকালে কনসটান্টিনোপল জয় করেছিলেন, তাই গোটা খ্রিস্টান জাতি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। সুলতান মুহাম্মাদ খানের (দ্বিতীয়) উপর তাদের উপরোক্ত অভিযোগ উত্থাপনও এই বিদ্বেষেরই ফলশ্রুতি। কেননা এ

ব্যাপারে সকলেই একমত যে, নেগচারী বাহিনীর অধিনায়কই ঐ শিশুকে হত্যা করেছিল। আর এটাও সবাই স্বীকার করেন যে, সুলতান মুহাম্মাদ খান ঐ অধিনায়ককে এ অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও তারা বলছেন, আপন ভাইকে হত্যা করার জন্য মুহাম্মাদ খানই এই অধিনায়ককে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে ভেবে দেখার বিষয়, ঠিক ঐ মুহূর্তে যখন মুহাম্মাদ খান সিংহাসনে আরোহণ করছিলেন, ঐ ছোট্ট শিশুটির দিক থেকে কোনরূপ বিপদের আশংকা আদৌ ছিল না। সিংহাসন-আরোহণের অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালন করার পরও তিনি কোন না কোনভাবে ঐ শিশুটির প্রাণ হরণ করতে পারতেন। তাছাড়া তখন ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে সিংহাসনে বসাবার কথা কেউ চিন্তাও করেনি, বরং তখন সকলেই আড্রিয়ানোপলে মুহাম্মাদ খানের অপেক্ষা করছিলেন। এছাড়া অভিযুক্ত নেগচারী অধিনায়ক এশিয়া মাইনর থেকে সুলতান মুহাম্মাদ খানের সাথে আসে নি, বরং সে প্রথম থেকেই আড্রিয়ানোপলে ছিল। যদি সুলতান মুহাম্মাদ খান একান্তই ঐ কাজটি করাতে চাইতেন তা হলে তা ঐ সমস্ত অধিনায়কেরই কাউকে না কাউকে দিয়ে করাতেন, যারা এশিয়া মাইনর থেকে তাঁর সঙ্গে এসেছিল এবং যারা ছিল যে কোন ব্যাপারে তাঁর কাছে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। আড্রিয়ানোপল পৌঁছার সাথে সাথে এমন একজন অধিনায়কের উপর, যে তাঁর কাছে পরিচিত নয়, অনুরূপ ঝুঁকিপূর্ণ একটি বিরাট দায়িত্ব অর্পণ সাধারণভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া সুলতান মুহাম্মাদের হুকুমেই যদি নেগচারী অধিনায়ক এই পাশবিক কাজটি করত তাহলে যখন তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তখন সে নিশ্চয়ই এই গোমর ফাঁক করে দিত। এখানে লক্ষণীয় যে,সার্বীয় রাজকুমারী তথা মুহাম্মাদ খানের সৎ-মাও ঐ সব ব্যক্তিদের অন্যতম, যারা সুলতান মুহাম্মাদ খানের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য স্বয়ং রাজ দরবারে উপস্থিত ছিলেন। আরো লক্ষণীয় যে, সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-এর পরবর্তী জীবনে এ ধরনের অমানুষিক একটি ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মত বিজ্ঞ, করুণা হৃদয়, আল্লাহভীরু ও সৎসাহসী ব্যক্তি অনুরূপ মূর্খতাপূর্ণ ও অমানুষিক আচরণ করবেন এমনটি বিশ্বাস করা যায় না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, নেগচারী বাহিনীকে যেহেতু উসমানীয় সাম্রাজ্যের একটি অতি প্রিয় বাহিনী বলে মনে করা হতো, তাই সাধারণভাবে ঐ বাহিনীর অধিনায়কদের মনে এক ধরনের বেপরোয়া মানসিকতার উদ্ভব হতে চলেছিল। সুলতান মুরাদ খান (দ্বিতীয়)-এর যুগেও তাদের মধ্যে এ ধরনের আচরণ লক্ষ্য করা গেছে। খুব সম্ভবত এই যুবক সুলতানকে নিজের কবজায় রাখার অভিপ্রায়ে ঐ নেগচারী অধিনায়ক উক্ত দুষ্কর্মটি করেছিল। কনসটান্টিনোপলের কায়সার কনসটান্টিন এই ধোঁকায়ই পড়েছিলেন, যার কারণে তাকে একাধারে আপন রাষ্ট্র ও প্রাণ হারাতে হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আসছে।

সুলতান মুরাদ (দ্বিতীয়)-এর তিন বছর পূর্বে ৮৫২ হিজরীতে (১৪৪৮ খ্রি) কায়সার জন প্লিলোগিসের মৃত্যু হলে কায়সার কনসটান্টিন (দ্বাদশ) কনসটান্টিনোপলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কনসটান্টিনও তার পূর্ববর্তী সম্রাটের মত অত্যন্ত চালাক ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। সুলতান মুরাদের মৃত্যুর পর সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে তিনি সুলতানের প্রতি বিদ্রোহ ভাবাপন্ন এশিয়া মাইনরের কিছু সর্দার ও আমীরের

মাধ্যমে উসমানীয় সালতানাতের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেন। ফলে সুলতান মুহাম্মাদ খানকে এশিয়া মাইনরে গিয়ে উক্ত বিদ্রোহ দমন করত সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করতে হয়। সুলতান মুহাম্মাদ খান তখনও ঐ দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারেননি এমনি সময়ে কায়সার কনসটান্টিন তার কাছে একটি পয়গাম পাঠান। তাতে বলা হয় ঃ সুলতান মুরাদ খান (দ্বতীয়)-এর যুগ থেকে উসমানী বংশের আরখান নামীয় একজন শাহযাদা আমাদের এখানে নজরবন্দী অবস্থায় আছেন। তাঁর প্রয়োজনীয় খরচাদি নির্বাহের জন্য যে অর্থ সুলতানী কোষাগার থেকে আসে তার পরিমাণ আপনি বাড়িয়ে দিন। অন্যথায় আমরা ঐ শাহযাদাকে মুক্ত করে দেব এবং তিনি মুক্ত হয়ে আপনার কাছ থেকে সাম্রাজ্য কেড়ে নিবেন। কায়সার যেহেতু সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-কে একজন দুর্বলচিত্ত সুলতান বলে মনে করতেন, তাই তিনি এই হুমকি প্রদানের মাধ্যমে সুলতানের কাছ থেকে অর্থ আদায় এবং তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন। সুলতান মুহাম্মাদ খান যদি প্রকৃতই অনুরূপ দুর্বল ও ভীরু হৃদয়ের হতেন যেমনটি কায়সার ধারণা করেছিলেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এই হুমকিতে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়তেন এবং কায়সার কনসটান্টিনের শুধু এই দাবি নয় বরং ভবিষ্যতের দাবিসমূহও পূরণ করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আসল অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মূলত সুলতান মুহাম্মাদ খান ছিলেন গ্রীক-সম্রাট সিকান্দার (আলেকজান্ডার) এবং ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের চাইতেও অধিকতর শক্ত হৃদয় ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে,এভাবে কাজ হবে না বরং যতক্ষণ পর্যন্ত এই খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের বিষ দাঁত ভেংগে দেয়া না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত উসমানীয় সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধি বরাবর বিপন্নই থেকে যাবে। যাহোক, সুলতান উক্ত পয়গামের পরিষ্কার কোন জবাব না দিয়ে তখনকার মত কনসটান্টিনের দূতকে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

এশিয়া মাইনর থেকে ফিরে এসে সুলতান মুহাম্মাদ খান সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা হলো, তিনি হানীদাস বা হানী ডেজের সাথে তিন বছরের জন্য একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন। এই সন্ধি চুক্তির ফলে সুলতান আপন সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যান। এই সময়ে তিনি নেগচারী বাহিনীর যেসব সৈন্য ও সেনাধ্যক্ষের মধ্যে অশিষ্টতা ও বিদ্রোহের ভাব লক্ষ্য করেছিলেন তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে নেগচারী বাহিনীর সংস্কার সাধন করেন। কায়সার কনসটান্টিন দ্বিতীয়বারের মত সুলতানের কাছে আড্রিয়ানোপলে আপন দূত পাঠান এবং সুলতানকে শাহযাদা আরখানের খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে বলেন, অন্যথায় শাহযাদাকে মুক্ত করে দেবেন বলে হুমকি প্রদান করেন। কায়সারের ঐ পয়গামের ভাষা ছিল শিষ্টতা-বর্জিত। অতএব সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) ঐ পয়গামের উত্তর দেন এভাবে যে, তিনি আরখানের খরচাদি একদম বন্ধ করে দেন এবং কায়সারের দূতদেরকে অপমান করে আপন দরবার থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সেই মুহূর্ত থেকেই কনসটান্টিনোপল আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। এবার কায়সারের চোখ খুলে যায়। তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি যাকে শেয়াল মনে করেছিলেন সে আসলে সিংহ। অতএব তিনিও আর কোনরূপ ইতস্তত না করে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে দেন। এটাকে কনসটান্টিনের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতাই বলতে হবে যে, তিনি খ্রিস্টানদের দু'টি বিরাট বিরাট গ্রুপের মধ্যে

ঐক্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তখন পর্যন্ত খ্রিস্টানদের প্রটেস্ট্যান্ট ফিরকার সৃষ্টি হয়নি। প্রটেস্ট্যান্টদের সাথে খ্রিস্টানদের রোমান ক্যাথলিক ফিরকার ঘোরতর বিরোধ রয়েছে। যা হোক, ঐ যুগে সমগ্র খ্রিস্টান জগত আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে দু'দলে বিভক্ত ছিল। একদল রোম শহরের পোপকে ধর্মগুরু এবং নিজেদেরকে রোমান চার্চের অধীন বলে মনে করত। অপর দল ছিল গ্রীক চার্চের অনুসারী। তারা কনসটান্টিনোপলের মহান বিশপকে নিজেদের ধর্মগুরু মনে করত। কনসটান্টিনোপলের কায়সার ছিলেন শেষোক্ত দলের পৃষ্ঠপোষক। এই দুই দলের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। যে সামান্য পার্থক্য ছিল তা হলো, রোমান তরীকার অনুসারীরা তাদের ধর্মীয় উৎসবে মদের সাথে খামিরহীন রুটি ব্যবহার করত। আর কনসটান্টিনোপলের অনুসারীরা খামিরহীন রুটির পরিবর্তে খামিরযুক্ত রুটি ব্যবহার করাকে অপরিহার্য মনে করত। তবে এই খামিরহীন ও খামিরযুক্ত রুটি ব্যবহারকে কেন্দ্র করেই উভয় দলের পাদ্রীদের মধ্যে দা-কুমড়ার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, যেমন আজকাল নামাযে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা না বলা, রুকূর পর হাত উঠানো-না উঠানো প্রভৃতি ছোটখাট বিষয়কে কেন্দ্র করে এক ধরনের মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে ভীষণ তর্কবিতর্ক, এমন কি মারামারি, কাটাকাটি হতেও দেখা যায়। যা হোক, উপরোক্ত দু'টি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি অভিপ্রায়ে কনসটান্টিনোপলের কায়সার রোমের পোপকে লিখেন ঃ আমাদের ধর্মীয় মতভেদ ভুলে যাবার সময় এসে গেছে। আমাদের উচিত মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আমি সন্তুষ্টচিত্তে আপনার আকীদাসমূহ মেনে নিচ্ছি। ভবিষ্যতে কনসটান্টিনোপলের গির্জাও আপনার অধীনে থাকবে। অতএব যেভাবে বায়তুল মুকাদ্দাস ও সিরিয়া জয় করার জন্য আপনি সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে ধর্মীয় যুদ্ধের কথা ঘোষণা করেছিলেন এখনও তেমনি কনসটান্টিনোপলকে রক্ষা এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য ইউরোপের সর্বত্র ধর্মীয় যুদ্ধ ঘোষণা করুন। কনসটান্টিনোপলের কায়সারের এই প্রস্তাব অত্যন্ত ফলদায়ক প্রমাণিত হয়। পোপ, যার নাম ছিল নিকলসন (পঞ্চম), অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে খ্রিস্টানদেরকে ধর্মীয় যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে স্পেনের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ আরাগূন, কাস্তালা প্রভৃতি থেকে অভিজ্ঞ দুঃসাহসী খ্রিস্টান যোদ্ধাদের অনেকগুলো বাহিনী কনসটান্টিনোপল এসে পৌঁছে। অনুরূপভাবে স্বয়ং পোপ ডাম্বিল নামক তার একজন প্রতিনিধির অধিনায়কত্বে একটি বিরাট রোমকবাহিনী জাহাজযোগে কনসটান্টিনোপল অভিমুখে প্রেরণ করেন। ভেনিস এবং জেনেভার স্থল ও নৌবাহিনীসমূহও কনসটান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হয়। এদিকে কনসটান্টিন কনসটান্টিনোপলের নগর প্রচীর সুদৃঢ় করে সমুদ্র বন্দরে প্রতিরক্ষা সামগ্রী জড় করতে থাকেন। মূল কনসটান্টিনোপলের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষের চেয়েও বেশি। কায়সার তাদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন। তিনি সাধারভাবে খ্রিস্টানদেরকে উৎসাহিত করেন, যেন তারা ব্যক্তিগত আয়েশ-আরাম ত্যাগ করে শহর প্রতিরক্ষা এবং শত্রুদের হামলা প্রতিরোধের জন্য তাদের শক্তি নিয়োগ করে। ইউরোপের তাবৎ খ্রিস্টান ঐতিহাসিক এমনকি এডমন্ড উইলিয়াম এবং এ.সি. ক্রেসির মত নিরপেক্ষ ব্যক্তিরাও কনসটান্টিনোপল বিজয়ের অবস্থাদি বর্ণনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় তথা

খ্রিস্টানদের পক্ষপাতিত্ব করেছেন। এ ক্ষেত্রে সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-এর সত্তাকে কিভাবে কলুষিত করা যায় তারা আগাগোড়া সে চেষ্টাই করেছেন। পাছে সুলতান মুহাম্মাদ খানের অসাধারণ বীরত্ব ও বিস্ময়কর দৃঢ়তা সর্বত্র জানাজানি হয়ে যায় এ কারণে তারা কনসটান্টিনোপল বাহিনী এবং তাদের জোর প্রস্তুতির কথা বর্ণনা করতে ইতস্তত করেছেন। তবু ফাঁকফোঁকরে কখনো কখনো তাঁদের কলম থেকে এমন কথাও বেরিয়ে পড়েছে, যার দ্বারা সুলতান মুহাম্মাদ খানের অনেক কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলী দিব্যলোকের মত উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

সুলতান মুহাম্মাদ খান আরবান নামীয় একজন নওমুসলিম বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারকে নির্দেশ দেন, যেন সে অবিলম্বে বৃহৎ আকৃতির কামান তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উক্ত আরবান ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কনসটান্টিনের কর্মচারী হিসাবে কর্মরত ছিল। যা হোক আরবান বৃহদাকারের বেশ কয়েকটি কামান তৈরি করে। এর কোন কোনটির মাধ্যমে বরাট ওজনের গোলা নিক্ষেপ করা যেত। কয়েক বছর পূর্বেই অর্থাৎ সুলতান মুরাদ খান (দ্বিতীয়)-এর শাসনামলে উসমানীয় সাম্রাজ্য তাদের যুদ্ধাভিযানে কামান ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত তা খুব একটা কার্যকর যুদ্ধাস্ত্র ছিল না। যে সমস্ত কামান সুলতান মুহাম্মাদ খান আরবানের হাতে তৈরি করিয়েছিলেন সেগুলো স্থানান্তরের সময় খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। ঐ কামানগুলো এমনি ছিল যে, অবরোধ চলাকালীন সময়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেগুলো থেকে মাত্র সাত-আটবার গোলা নিক্ষেপ করা সম্ভব হতো, এই সমস্ত কারণে উপরোক্ত কামানগুলো কনসটান্টিনোপল অবরোধের সময় খুব একটা মোক্ষম প্রমাণিত হয়নি। এভাবে কনসটান্টিন তার তোপখানাটি মজবুত ও স্বয়ং সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলেছিলেন। কনসটান্টিনোপল জয়ের মাত্র কিছুদিন অতিক্রান্ত হতে না হতেই ইউরোপের খ্রিস্টান সম্রাটগণ এবং উসমানীয় সুলতানও যুদ্ধের মধ্যে কামান ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন, ফলে তা যুদ্ধের অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে পরিগণিত হয়।

সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) সর্বপ্রথম আপন সাম্রাজ্যের প্রতিটি অংশে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। যখন এ ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যান তখন কনসটান্টিনোপল আক্রমণের উদ্দেশ্যে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্যের একটি দুর্বার বাহিনী গড়ে তোলেন। ঐতিহাসিক ক্রেসির মতে, সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-এর ঐ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। তাঁর উক্তির মধ্যে যে বাড়াবাড়ি রয়েছে তা সুনিশ্চিত। কেননা ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল থেকে ২৯ মে পর্যন্ত এই সাত সপ্তাহ অবরোধ চলাকালে সত্তর হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীর জন্য রসদ সামগ্রীর যোগান দেওয়া উপরোক্ত অবস্থায় কোন সহজ ব্যাপার ছিল না।

৮৫৬ হিজরীতে (১৪৫২ খ্রি) উভয়পক্ষই প্রকাশ্য যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে। সম্রাট কনসটান্টিন কনসটান্টিনোপলের অভ্যন্তরে সীমাতিরিক্ত রসদ-সামগ্রী একত্র করেছিলেন। তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শুধু সৈন্যবাহী নৌবহরই আসছিল না, রসদ ও অস্ত্রসামগ্রী বোঝাই ছোট-বড় জাহাজসমূহও একের পর এক কনসটান্টিনোপলের সমুদ্র বন্দরে এসে ভিড়ছিল। ইতালী এবং অন্যান্য দেশের স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার এবং অভিজ্ঞ

সামরিক অধিনায়করা কনসটান্টিনোপল শহরকে সবদিক দিয়ে সুদৃঢ় করে তোলার জন্য সেখানে এসে হাযির হয়েছিলেন। সমুদ্র বন্দরের মোহনায় একটি বিরাট লৌহশিকল দুদিক থেকে এমন শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যে, যে কোন জাহাজের বন্দরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। শহরবাসীরা কোন জাহাজকে অভ্যন্তরে নিয়ে আসতে চাইলে ঐ শিকলটি ঢিলা করে সমুদ্রের গভীরে ছেড়ে দিত এবং জাহাজটি অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সাথে সাথে পুনরায় শিকলটি এমনভাবে টেনে দেওয়া হতো যে, তখন অন্য জাহাজের ভেতরে প্রবেশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। চৌদ্দ মাইল ব্যাসার্ধের নগর প্রাচীর অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ় করে গড়ে তোলা হয়েছিল। বন্দরের দিককার প্রাচীর কিছুটা নীচু এবং দুর্বল ছিল। কেননা এই দিক থেকে কোনরূপ হামলা বা অবরোধের আশংকা ছিল না। প্রাচীরের চারদিকে অনতিক্রম্য গভীর পরিখা খনন করা হয়েছিল। পরিখা ও প্রাচীর রক্ষার জন্য সুদৃঢ় টাওয়ারের মাধ্যমে প্রাচীরের বাইরে ও এখানে-সেখানে কামান ও তীরন্দাজ প্লাটুনসমূহ মোতায়েন করা হয়েছিল। পুরাতন টাওয়ার এবং প্রাচীরের ঐ সমস্ত অংশ যা কামান স্থাপন ও কামান থেকে গোলা নিক্ষেপের কারণে ভেংগে যাওয়ার আশংকা ছিল তা মেরামতের মাধ্যমে সুদৃঢ় করে তোলা হয়। এভাবে কনসটান্টিনোপলের হিফাজত ও নিরাপত্তার ব্যাপারে যা কিছু করা সম্ভব, তার সবই করা হয়েছিল।

সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিম বসফোরাস প্রণালীর সংকীর্ণতম স্থানের এশীয় উপকূলে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) যখন কনসটান্টিনোপল জয়ের সংকল্প নেন তখন উপরোক্ত দুর্গের বিপরীতে ইউরোপীয় উপকূলে একটি দুর্গ নির্মাণ করতে শুরু করেন। সম্ভবত এটাই হচ্ছে যুদ্ধের জন্য তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশ্য প্রস্তুতি। এই দুর্গটি রাতারাতি নির্মাণ করে তাতে কামানসমূহ স্থাপন করা হয়, যেমন এর বিপরীত দুর্গে কামানসমূহ স্থাপিত ছিল। এভাবে সুলতান মুহাম্মাদ খান বসফোরাস প্রণালীর প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেন। অন্য কথায়, তিনি কৃষ্ণসাগরকে মর্মূরা সাগর থেকে পৃথক করে কায়সারের জাহাজসমূহের কৃষ্ণসাগরে অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দেন। কিন্তু এতে কনসটান্টিনের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোন আশংকা ছিল না। কেননা দানিয়ালের পথ দিয়ে ইতালী, স্পেন প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ থেকে তার কাছে সাহায্য এসে পৌছেছিল। সুলতান মুহাম্মাদের কাছে সর্বমোট তিনশ'টি নৌকা ছিল এবং এর প্রায় সবটিই ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির। কনসটান্টিনের বৃহদাকারের চৌদ্দটি যুদ্ধ জাহাজের ক্ষুদ্রতমটির সমতুল্য একটি বড় নৌকাও সুলতান মুহাম্মাদ খানের কাছে ছিল না।

কনসটান্টিনোপল বিজয়

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল (৮৫৭ হিজরীর ২৬ রবিউল আউয়াল) সুলতান মুহাম্মাদ খান স্থলপথে নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে কনসটান্টিনোপলের নগর প্রাচীরের সামনে গিয়ে উপনীত হন। অপর দিকে উসমানীয় জাহাজসমূহ মর্মূরা সাগরে অবস্থান নিয়ে কনসটান্টি-নোপলের সমুদ্র বন্দর তথা গোল্ডেন হর্ণের সম্মুখে সামুদ্রিক অবরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে। সুলতানী নৌবহরের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন বালূত আগলান নামীয় জনৈক অধিনায়ক। সুলতান নগর প্রাচীর অবরোধ করে এখানে-সেখানে খণ্ডবাহিনী মোতায়েন করেন এবং অগ্রবর্তী

বাহিনীকে নির্দেশ দেন যেন তারা সুড়ঙ্গ তৈরি করতে শুরু করে এবং অতি শীঘ্রই সুড়ঙ্গসমূহ নগর প্রাচীরের সন্নিকটে নিয়ে যায়। তারপর বিভিন্ন স্থানে পরিখা খনন করা হয় এবং স্থানে স্থানে সুড়ঙ্গ পথের মাধ্যমে ঐ পরিখাসমূহে তীরন্দাজদের মোতায়েন করার নির্দেশ দেওয়া হয়, শত্রুবাহিনীর কাউকে নগর প্রাচীরের উপর দিয়ে উঁকি মারতে দেখা মাত্র তাকে সঙ্গে সঙ্গে তীরের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করত। এই অবরোধ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সুলতান মুহাম্মাদ খান আপন বিস্ময়কর যোগ্যতার পরিচয় দেন। অবরোধকারীরা যত শীঘ্র সম্ভব অবরোধ বেষ্টনী সংকীর্ণ করে শহর প্রাচীরের সন্নিকটে পৌঁছার চেষ্টা করে। মিনজানীক এবং কামান-সমূহ উপযুক্ত স্থানে বসিয়ে নগর প্রাচীরের এখানে-সেখানে গোলা ও প্রস্তর বর্ষণ করা হয়।

এদিকে অবরুদ্ধরা নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য সবদিক দিয়েই তৈরি ছিল। জেনেভার অধিনায়ক জন অগস্টাস এবং গ্রীক অধিনায়ক ডিউক নোতারিস অত্যন্ত যোগ্যতা ও দুঃসাহসিকতার সাথে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব আনজাম দেন। পোপ নিকলসন (পঞ্চম)-এর সহকারী কার্ডিনেল এ ক্ষেত্রে বিশেষ বীরত্ব ও বিজ্ঞতার পরিচয় দেন। এসব অধিনায়ক এবং সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্ব কায়সার কনসটান্টিন নিজহাতে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং রাতের বেলায়ও অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে খুব কমই অবতরণ করতেন। তিনি স্বয়ং প্রত্যেকটি সৈন্যকে উৎসাহ যোগাতেন এবং অধিনায়কদেরকে তাদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য বাহবা দিতেন। অবরোধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে নগরের বাসিন্দা এবং খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। বড় বড় পাদ্রী এবং বিশপরা ধর্মের বরাত দিয়ে যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করার প্রকৃষ্টতা বর্ণনা করে রাত-দিন মানুষকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং তাতে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করছিলেন। সুলতান মুহাম্মাদ খান নগরীর সেন্ট রুমানূস গেটের সামনে আপন তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। অবরোধকারীরা এই গেট দিয়েই অধিকতর তৎপরতা শুরু করেছিল। প্রথম প্রথম অবরুদ্ধরা নগর প্রাচীর এবং পরিখা থেকে বের হয়ে অবরোধকারীদের উপর হামলা চালাতে শুরু করে। কিন্তু এভাবে যখন তারা উসমানীয় বাহিনীর হাতে নিহত হতে থাকে তখন কনসটান্টিন নির্দেশ দেন, কোন ব্যক্তি যেন নগর প্রাচীরের বাইরে যাবার চেষ্টা না করে। এবার দুর্গ, নগর প্রাচীর এবং টাওয়ারসমূহ থেকে কামান ও মিনজানীকের সাহায্যে অবরুদ্ধরা অবরোধকারীদের হামলার প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করে। কয়েক দিন পর নগর প্রাচীরের জায়গায় জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অবরুদ্ধরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা ও বিচক্ষণতার সাথে সঙ্গে সঙ্গে গর্তগুলো মেরামত করে প্রাচীরকে পূর্বের চাইতেও অধিক মজবুত করে তোলে।

সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) আপন বাহিনীকে পরিখার নিকটে নিয়ে গিয়ে বেশ কয়েক জায়গায় খন্দর ভরাট করে নিজেদের পায়ে চলার পথ তৈরি করে নেন। এভাবে উসমানীয় বাহিনী প্রাচীর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু প্রাচীরের উপর আরোহণ করার কোন ক্ষমতা তাদের ছিল না। উপরন্তু খ্রিস্টানরা তেল গরম করে প্রাচীরের উপর থেকে সুলতানী বাহিনীর উপর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। অতএব বাধ্য হয়ে তাদেরকে সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়। এবার সুলতান আরেকটি নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি প্রাচীরের সমান উঁচু কাঠের অনেকগুলো মিনার তৈরি করে সেগুলোর নিচে চাকা সংযোজন করেন। তারপর

ঠেলতে ঠেলতে মিনারগুলোকে প্রাচীরের কাছে নিয়ে দাঁড় করান। মিনারগুলোর সাথে একটি করে দীর্ঘ সিঁড়ি শীর্ষ দিক থেকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। মিনারগুলো প্রাচীরের নিকটবর্তী হতেই সৈন্যরা সিঁড়িটির নিচের দিক উঠিয়ে লম্বালম্বিভাবে সে দিকটি দুর্গ-প্রাচীরে স্থাপন করে। ফলে খন্দকের উপর আপনা-আপনি একটি সেতু তৈরি হয়ে যায়। এবার উসমানীয় সৈন্যরা ঐ মিনারের উপর উঠে সিঁড়ি বেয়ে নগর প্রাচীরের উপর পৌঁছার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু অবরুদ্ধরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ঐ সমস্ত মিনারের উপর জ্বলন্ত রজনের গোলা নিক্ষেপ করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে মিনার এবং সিঁড়িসমূহ পুড়ে যাওয়ায় দুর্গ ধ্বংসের এই কৌশলও সফল হতে পারেনি।

১৫ এপ্রিল অর্থাৎ অবরোধ শুরু হওয়ার ৯ম দিনে এই সংবাদ এসে পৌঁছে যে, জেনেভার চারটি জাহাজ তুর্কী জাহাজসমূহের ব্যূহ ভেদ করে খাদ্য এবং সমরাস্ত্র নিয়ে গোল্ডেন হর্ণ অর্থাৎ কনসটান্টিনোপলের বন্দরে প্রবেশ করে শহরবাসীদের কাছে তা (খাদ্য) পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সুলতান স্বয়ং ঘোড়ায় চড়ে সমুদ্র তীরে পৌঁছেন এবং দেখেন, অনুরূপভাবে আরো পাঁচটি শত্রু জাহাজ মর্মূরা সাগরে আসছে। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে আপন নৌ-সেনাধ্যক্ষকে নির্দেশ দেন এ জাহাজগুলোকে বাধা প্রদান করতে এবং কোন মতেই বন্দরে প্রবেশ করতে না দিতে। একদিকে সুলতান এবং উসমানীয় স্থলবাহিনী সমুদ্র কিনারে দাঁড়িয়ে ঐ জাহাজগুলোর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন, অপর দিকে খ্রিস্টানরাও নগর প্রাচীরের উপর চড়ে ঐ তামাশা দেখছিল। উসমানীয় জাহাজগুলো অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে হামলা চালিয়ে ঐ জাহাজগুলোর দীর্ঘ লাইন ভেংগে দেয়। ফলে সেগুলো বাধ্য হয়ে আগে-পিছে এবং পাশাপাশি একত্রে জড়ো হয়ে যায়। এবার উসমানীয় জাহাজগুলো সেগুলোর চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং চড়াও হয়ে খ্রিস্টান মাল্লাদেরকে হত্যা ও জাহাজগুলোকে কবজা করার সব রকম প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ঐ জাহাজগুলো এত প্রকাণ্ড ও উঁচু ছিল যে, উসমানীয় সৈন্যরা নিজেদের ক্ষুদ্র ও নিচু জাহাজগুলো থেকে সেগুলোতে চড়তে পারেনি। প্রথমে যখন উসমানীয় জাহাজগুলো খ্রিস্টান জাহাজগুলোকে ঘেরাও করেছিল তখন দর্শকদের বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, ঐ পাঁচটি জাহাজ উসমানীয় সৈন্যদের হাতে অবশ্যই আটকা পড়বে। কিন্তু ঐ টানা-হেচড়ার মধ্যে কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যে, সেগুলো উসমানীয় নৌকাসমূহের ঘেরাও থেকে বের হয়ে বন্দরের দিকে চলে যাচ্ছে। বন্দরে পৌঁছতেই অবরুদ্ধরা সঙ্গে সঙ্গে লৌহশিকলটি নিচু করে দিল এবং জাহাজগুলো অনায়াসে গোল্ডেন হর্ণে ঢুকে পড়ল। তারপর লৌহশিকলটি পুনরায় টেনে দেওয়া হলো। ফলে উসমানীয় জাহাজ-সমূহের হামলার আর কোন আশংকা রইল না। সুলতান মুহাম্মাদ খান আপন নৌবাহিনীর এই ব্যর্থতা নিজ চোখে দেখে যারপরনাই দুঃখিত হন। তিনি আপন নৌ-সেনাধ্যক্ষকে ডেকে পাঠান এবং তাকে কঠোরভাবে শাসন করে আরো বেশি তৎপর থাকার নির্দেশ দেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নৌ-সেনাধ্যক্ষের কোন ত্রুটি ছিল না। সে তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজগুলো দিয়ে কী করেই বা দৈত্যরূপী শত্রু জাহাজগুলোকে কবজা করবে ? কিন্তু সুলতানের সতর্ক করে দেওয়ার কারণে এবং সে অনুযায়ী নৌ-সেনাধ্যক্ষের অত্যধিক তৎপরতার ফলে তারপর কোন শত্রু-জাহাজই দানিয়াল সমুদ্রপথ অতিক্রম করে মর্মূরা সাগরে প্রবেশ করার দুঃসাহস দেখায়নি। ঐ পাঁচটি জাহাজে চড়ে যে সেনাবাহিনী এসেছিল তারা যেন ছিল কনসটান্টিনোপলের জন্য

বাইরে থেকে আগত সর্বশেষ সাহায্যবাহিনী। সুলতান অবরোধের ক্ষেত্রে কল্পনাতীত তৎপরতা প্রদর্শন করেন। বার বার তিনি ক্ষতির সম্মুখীন হন। বার বার তাঁর আক্রমণ বিফল হয়। আর অবরুদ্ধরা তাদের সাফল্য প্রত্যক্ষ করে আরো বেশি সাহসী হয়ে ওঠে। শহরের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ সামগ্রী এবং খাদ্যদ্রব্যের কোনই ঘাটতি ছিল না। তারা বছরের পর বছর অবরুদ্ধ থেকেও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, হাঙ্গেরীর সম্রাট হানীদাস আপন সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে অবশ্যই উত্তর দিক থেকে সুলতানী বাহিনীর উপর হামলা চালাবেন। ফলে কনসটান্টিনোপলের অবরোধ আপনা-আপনি উঠে যাবে। সুলতান মুহাম্মাদ খানের স্থলে যদি অন্য কোন ব্যক্তি থাকত তাহলে এই সমস্ত অবস্থা লক্ষ্য করার পর নিশ্চয়ই সে অবরোধ তুলে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করত। কিন্তু সুলতান মুহাম্মাদ খান ছিলেন তাঁর সংকল্পে অটল এবং সাহসে সুদৃঢ়। এত সব ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর মনে কোনরূপ দুর্বলতা স্থান পায়নি বরং তাঁর প্রত্যেকটি ব্যর্থতা যেন তাঁর সংকল্পকে আরো মজবুত ও সুদৃঢ় করে দিচ্ছিল।

সুলতান মুহাম্মাদ খান যখন আপন বাহিনী নিয়ে কনসটান্টিনোপলের উদ্দেশে রওয়ানা হন তখন সাথে একদল আলিম, আবিদ ও যাহিদকেও নিয়ে যান। এই আল্লাহওয়ালাদের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার প্রবল বাসনা তাঁর প্রথম থেকেই ছিল। তিনি তাঁর পিতার জীবনের শেষ ছয় বছর ঐ সমস্ত লোকেরই সংসর্গে ছিলেন। আর ওদেরই ভালবাসার পরশে তাঁর সংকল্পের মধ্যে দৃঢ়তা এবং তাঁর কর্মতৎপরতার মধ্যে সুস্থতা ও পরিপূর্ণতা এসেছিল। কনসটান্টিনোপলের অবরোধ চলাকালেও তিনি এই সমস্ত আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তির পরামর্শকে নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন। ধীরে ধীরে যখন অবরোধের সময়কাল বৃদ্ধি পেল তখন এই যুবাবয়সী সুলতানের মনে এমন একটি বুদ্ধি খেলে গেল, যার কথা ইতিপূর্বে কেউ চিন্তাও করতে পারেনি। শহরের যে দিকে সমুদ্র ছিল (অর্থাৎ গোল্ডেন হর্ণ) সে দিকটিও সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় তা অবরোধের আওতায় আসত না। অবরোধকারীরা স্থলভাগের দিকেই তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছিল। বিশেষ করে সেন্ট রোমান্স গেটের দিকে বেশির ভাগ দুর্গবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছিল। অতএব শহরবাসীরাও অন্যান্য দিক থেকে নিশ্চিন্ত থেকে শুধু এদিকেই তাদের যাবতীয় প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়োজিত করে রেখেছিল। সুলতান ভাবলেন, যদি গোল্ডেন হর্ণের দিক থেকে অর্থাৎ সমুদ্রের দিক থেকে শহরের উপর হামলা চালানো যায় তাহলে শত্রুপক্ষের মনোযোগ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং তখনি নগর প্রাচীর ধ্বংস করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব হবে। কিন্তু সমুদ্রের দিক থেকে তখনি হামলা চালানো সম্ভব যখন গোল্ডেন হর্ণের মোহনায় লৌহশিকল থাকবে না। কেননা এটা না সরালে ভেতরে জাহাজ প্রবেশ করানো সম্ভব নয়। গোল্ডেন হর্ণের পূর্ব দিকে আনুমানিক দশ মাইল চওড়া একটি স্থলভূমি ছিল, যার অপর দিকে ছিল বসফোরাস প্রণালীর সমুদ্রভাগ, যেখানে সুলতানী জাহাজগুলো স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারত। সুলতান জমাদিউল আউয়ালের চৌদ্দ তারিখ রাত্রে, যখন চন্দ্র কিরণে আকাশ ঝলমল করছিল ঠিক তখনি বসফোরাস থেকে আরম্ভ করে গোল্ডেন হর্ণ সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত সর্বত্রই কাঠের তক্তা বিছিয়ে দেন। তারপর আশিটি জাহাজ বসফোরাসের কিনারে ভিড়িয়ে সেগুলোকে পাড়ে টেনে তুলেন। তারপর তাতে মাঝিমাল্লা ও সৈন্যদেরকে চড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ সেগুলোকে

ধাক্কাতে শুরু করে। ঐ সময়ে ঐ দিককার বায়ুও ছিল অনুকূল। তখন জাহাজগুলোতে পাল তুলে দেওয়া হয়। ফলে জনতা খুব একটা ধাক্কা না লাগানো সত্ত্বেও জাহাজগুলো পিচ্ছল কাঠের তক্তার উপর দিয়ে আপনা-আপনি চলতে শুরু করে। ঐ চাঁদনী রাতে শহরবাসীরা হাজার হাজার মানুষের হৈ চৈ, আনন্দ-উল্লাস, সমর-সঙ্গীত এবং নানা ধরনের বাজনার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু উসমানীয় বাহিনীর মধ্যে এটা কি হচ্ছে তা তারা বুঝতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত ভোর হওয়ার পূর্বেই দশ মাইল স্থলপথের দূরত্ব অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনীর লোকেরা ঐ জাহাজগুলোকে ঠেলে ঠেলে গোল্ডেন হর্ণ বন্দরের পানিতে নিয়ে ছাড়ে। কনসটান্টিনের যে সমস্ত জাহাজ গোল্ডেন হর্ণে ছিল সেগুলো মোহনার মধ্যে লৌহ শিকলের ধার ঘেঁষেই সারিবদ্ধভাবে বেঁধে রাখা হয়েছিল, যাতে তা বাইরের যে কোন জাহাজের অনুপ্রবেশ রুখে রাখে। শহরের ধার ঘেঁষে বন্দরের সম্মুখভাগে সেগুলো রাখার কোন প্রয়োজন ছিল না। ভোর হওয়ার সাথে সাথে শহরবাসীরা দেখতে পেল যে, উসমানীয় জাহাজসমূহ নগরীর নীচে একটি পুল তৈরি করে ফেলেছে এবং কামানসমূহ যথোপযুক্ত স্থানে রেখে এদিকের নগর প্রাচীরের দুর্বল অংশের উপর গোলা নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই অবস্থা দেখে খ্রিস্টানরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। তারা তাদের জাহাজগুলো গোল্ডেন হর্ণের মোহনার দিক থেকে অভ্যন্তর ভাগে নিয়ে এসে উসমানীয় জাহাজগুলোর উপর হামলা চালাতে চায়, কিন্তু সুলতান পূর্ব থেকে উভয় কিনারে যে সমস্ত কামান বসিয়ে রেখেছিলেন সেগুলো খ্রিস্টান জাহাজগুলোর উপর অনবরত গোলাবর্ষণ করতে শুরু করে। ফলে দেখা যায়, যে জাহাজই আগে বাড়ছে সেটাই গোলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত ঐ মুহূর্তে সুলতান মুহাম্মাদ খানের কামানগুলো সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবে হঠাৎ সমুদ্রের দিক থেকে হামলা পরিচালনা করায় খ্রিস্টানদের প্রতিরোধ ক্ষমতা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে শহরের অভ্যন্তর ভাগেও তাদেরকে একটি বিরাট বাহিনী মোতায়েন করতে হয়।

ঐ দিনই অর্থাৎ ২৪ মে সম্রাট কনসটান্টিন সুলতানের কাছে একটি পয়গাম পাঠান, তাতে বলা হয়েছিল ঃ আপনি আমার উপর যে পরিমাণ কর নির্ধারণ করবেন আমি তা পরিশোধ করতে রাযী আছি। আপনি আমাকে করদাতা করে কনসটান্টিনোপলের শাসন ক্ষমতা আমার হাতেই থাকতে দিন। শহর যখন পদানত হওয়ার উপক্রম হয়েছে ঠিক তখনি সুলতান উক্ত পয়গামের যে জবাব পাঠান তা হলো, 'যদি তুমি আমার আনুগত্য স্বীকার কর তাহলে তোমাকে গ্রীসের দক্ষিণাংশ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কনসটান্টিনোপলকে আমি আমার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না করে ছাড়ব না। সুলতান মুহাম্মাদ খান ভালভাবেই জানতেন, কনসটান্টিনোপলের এই খ্রিস্টান সাম্রাজ্য যতদিন পর্যন্ত ইসলামী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তর ভাগে টিকে থাকবে ততদিন পর্যন্ত অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার আশংকা থেকেই যাবে। তিনি এও জানতেন, কনসটান্টিনোপলের উসমানীয় সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম রাজধানী হতে পারে। তিনি কনসটান্টিন এবং তাঁর পূর্ববর্তী কায়সারদের দুষ্টামিপনা সম্পর্কেও ভালভাবে অবহিত ছিলেন। তাছাড়া দীর্ঘদিনের অবরোধ এবং অনেক কষ্ট সহ্য করার পর তিনি সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছেন, এমনি অবস্থায় কনসটান্টাইনের আবেদনক্রমে তাকে গ্রীসের দক্ষিণাংশ প্রদান করতে রাযী হওয়াও একটি রাজসিক বদান্যতা বটে। কিন্তু কনসটান্টিনের

ভাগ্যে এটাই লেখা ছিল যে, তিনি হবেন পূর্বরোমের এই বিরাট এবং সুপ্রাচীন খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের সর্বশেষ অধিপতি। তাই তিনি সুলতানের এই বদান্যতা থেকে উপকৃত হতে চাননি; বরং পূর্বের চাইতেও চতুর্গুণ ক্ষমতা নিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

৮৫৭ হিজরীর ১৯ জমাদিউল আউয়াল (১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মে) সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) আপন সেনাবাহিনীর মধ্যে এই ঘোষণা দেন যে, আগামীকাল ভোরবেলা চতুর্দিক থেকে শহরের উপর আক্রমণ চালানো হবে। তখন সৈন্যদেরকে শহরের অভ্যন্তরে লুটপাট চালানোর অনুমতিও দেওয়া হবে। কিন্তু এই শর্তে যে, তারা সরকারী ইমারতগুলোর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তাছাড়া যেসব নিরপেক্ষ প্রজা আনুগত্য স্বীকার করে নিরাপত্তা চাইবে তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে হবে এবং দুর্বল, শিশু, নারী ও বৃদ্ধদেরকে হত্যা করা হবে না। এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। এদিকে কনসটান্টিন শহরের অভ্যন্তরে তার শাহী মহলে সেনাবাহিনীর অধিনায়কবৃন্দ, উমারা ও সরকারী কর্মকর্তাদের একটি সভা আহ্বান করেন। তিনি জানতেন, ভোরবেলা শহরের উপর একটি চূড়ান্ত হামলা হতে যাচ্ছে। অতএব তিনি শহরবাসীদেরকে আমৃত্যু লড়ে যাবার আহ্বান জানান এবং নিজেও এই মর্মে শপথ নেন। সভা শেষে অধিনায়করা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে চলে যান এবং কায়সার সেন্ট আয়া সুফিয়া গির্জায় গিয়ে শেষবারের মত পূজা-অর্চণায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি গির্জা থেকে যখন প্রাসাদে ফিরে আসেন তখন সেখানে দারুণ হতাশা বিরাজ করছিল। তিনি সেখানে মাত্র কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সেন্ট রোমান্সের দিকে আসেন, যেখানে অবরোধকারীরা জোর আক্রমণ চালাচ্ছিল।

এদিকে সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) ফজরের সালাত সমাপনান্তে আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের কাছে দু'আর আবেদন জানান এবং আপন বিশেষ বাহিনীতে দশ হাজার বাছাইকৃত অশ্বারোহী নিয়ে নিজেও সরাসরি হামলা পরিচালনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সুলতানের পীর ও মুরশিদ, যিনি সুলতানের সঙ্গী উলামা দলের সাথেই ছিলেন, ঐ দিন নিজের জন্য একটি পৃথক তাঁবু স্থাপন করেন। তাঁবুর দরজায় তিনি একজন দারোয়ান বসিয়ে রাখেন, যাতে সে কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে না দেয়। তারপর তিনি অত্যন্ত একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করতে থাকেন। যাহোক চতুর্দিক থেকে হামলা শুরু হলো। কামান ও মিনজানীকগুলো নগর প্রাচীরের এখানে সেখানে গর্তের সৃষ্টি করল এবং সুলতানী বাহিনীর সৈন্যরা ঐ সমস্ত গর্ত দিয়ে শহরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ার প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু প্রত্যেক বারই তাদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা হলো। কয়েক বারই উসমানীয় বাহিনীর বীর সিপাহীরা টাওয়ার এবং প্রাচীরের ভগ্ন অংশের উপর আরোহণ করতে সক্ষম হলো। কিন্তু ভিতরের দিক থেকে খ্রিস্টান সৈন্য, সাধারণ অধিবাসী এবং তাদের মহিলা ও শিশুরা পর্যন্ত সর্বশক্তি দিয়ে সুলতানী সৈন্যদেরকে বাধা প্রদান করে যাচ্ছিল। প্রত্যেক দিকেই ছিল এই একই অবস্থা। স্থল, পানি সব দিকেই অত্যন্ত উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার সাথে হামলা অব্যাহত ছিল। চতুর্দিকে শুধু সংঘর্ষ আর সংঘর্ষ। যে দিকে চোখ যায় সেদিকেই লাশের

স্তূপ। কিন্তু অবরোধকারী বা অবরুদ্ধ কোন পক্ষই যেন হার মানতে রাযী ছিল না। দুপুর বেলা এই সংঘর্ষ এক ভয়ানক রূপ ধারণ করে। তখন সুলতান একজন মন্ত্রী ও সভাসদকে আপন পীর ও মুরশিদের কাছে পাঠিয়ে নিবেদন করেন : এই মুহূর্তে আমি আপনার বিশেষ দু'আর ও রূহানী সাহায্য কামনা করি। অবরুদ্ধদের সাহস ও অসাধারণ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে অবরোধকারীরা যেন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে সুলতান আশংকা করছিলেন, আজ এবং এখনি সম্ভব না হলে এই শহর দখল করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কেননা হামলাকারীরা তাদের পরিপূর্ণ সাহস ও ক্ষমতা ইতিমধ্যে প্রয়োগ করে ফেলেছে। বাদশাহের দূত যখন তার মুরশিদের তাঁবুর নিকটে গিয়ে পৌঁছে তখন দারোয়ান তাকে বাধা প্রদান করে। তখন ঐ দূত দারোয়ানকে শক্তভাবে এক ধমক দেয় এবং বলে, আমি হুযূরের কাছে বাদশাহের পয়গাম অবশ্যই পৌঁছাব। কেননা এটা হচ্ছে অত্যন্ত নাজুক ও বিপজ্জনক মুহূর্ত। এই বলে সুলতানের দূত দ্রুত দরবেশের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে। সে তখন দেখে যে, ঐ আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তি সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ্র দরবারে অবিরাম মুনাজাত করে চলেছেন। দূত ভিতরে প্রবেশ করার পর তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠান এবং বলেন, কনসটান্টিনোপল নগরী বিজিত হয়ে গেছে। দূত এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর সে দেখতে পেল, সত্যি সত্যি নগর প্রাচীরের উপর সুলতানী পতাকা উড়ছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যখন সুলতান দু'আর আবেদন জানিয়ে আপন মন্ত্রীকে তাঁর মুরশিদের খিদমতে পাঠিয়েছিলেন তখনকার মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ। আর ঠিক ঐ সময়েই সুলতানের সম্মুখবর্তী নগর প্রাচীরের অংশটি হঠাৎ আপনা-আপনি ভেংগে পড়ে এবং তা ভেংগে পড়ার সাথে সাথে গর্তের মোহনা প্রশস্ত আকার ধারণ করায় সুলতানী সৈন্যদের জন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করা অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়ে। এদিকে প্রাচীরের একটি অংশ ভেংগে পড়ল, অপর দিকে সুলতানের নৌবাহিনী ওদিককার একটি টাওয়ার দখল করে সেখানে সুলতানী পতাকা উড়িয়ে দিল। সুলতানের সাহায্যকারী রিজার্ভ বাহিনী যখন দেখতে পেল যে, টাওয়ারের উপর সুলতানী পতাকা উড়ছে এবং সম্মুখ ভাগের নগর-প্রাচীরও ভেংগে পড়েছে তখন তারাও নিজেদের অবস্থান ছেড়ে সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। খ্রিস্টানরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সুলতানী বাহিনীর মুকাবিলা করে। কিন্তু মুখোমুখি যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের সামনে টিকে থাকতে পারেনি। এবার আক্রমণকারীরা চতুর্দিক থেকে শহরে প্রবেশের সংকল্প নেয় এবং প্রাচীরের দরজাসমূহ ভেংগে চুরমার করে সাফল্য অর্জন করে। এরপর নিমিষের মধ্যে নগর-প্রাচীরের অভ্যন্তরে খ্রিস্টানদের লাশের স্তূপ জমে ওঠে। সুলতান আপন ঘোড়ায় চড়ে প্রাচীরের ঐ ভগ্ন অংশ দিয়েই সোজা সেন্ট আয়া সুফিয়া গির্জায় যান। গির্জায় পৌঁছেই তিনি আযান দেন। আর সেখানে এটাই হচ্ছে প্রথম বারের মত উত্থিত 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি। সুলতান এবং তাঁর সঙ্গীরা সেখানে যুহরের সালাত আদায় করে কায়মনো বাক্যে আল্লাহ্র শুকর আদায় করেন। এরপর সুলতান কনসটান্টিনের তালাশে লোক পাঠান। সেন্ট রোমান্সের নিকটে, যেখানে প্রাচীর ধ্বংস হয়েছিল সেখানে খ্রিস্টানরা অত্যন্ত নির্ভীকভাবে সুলতানী বাহিনীর

মুকাবিলা করে। ওখানকার সংঘর্ষেই সবচেয়ে বেশি রক্তপাত হয়েছিল। ওখানেই একটি লাশের স্তূপে কনসটান্টিনের লাশও পাওয়া যায়। তাঁর দেহের মধ্যে মাত্র দু'টি আঘাতের চিহ্ন ছিল। কনসটান্টিনের দেহ থেকে তাঁর মাথা বিচ্ছিন্ন করে সুলতানের খেদমতে পেশ করা হয়। এভাবেই কনসটান্টিনোপলের বিজয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর সুলতান রাজপ্রাসাদে যান। কিন্তু সেখানে তখন এক দারুণ নীরবতা বিরাজ করছিল।

এটা হচ্ছে হিজরী ৮৫৭ সনের ২০শে জমাদিউল আউয়াল, মুতাবিক ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মের ঘটনা। সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, সুলতানের পীর-মুরশিদের দু'আর ফলেই কনসটান্টিনোপলের প্রাচীর ধ্বংস হয়েছিল। এ কারণেই একটি বিষয় বহুলভাবে প্রচারিত যে, কনসটান্টিনোপল দু'আর মাধ্যমেই বিজিত হয়েছিল। যহোক ঐ দিন থেকে সুলতান মুহাম্মাদ খান 'সুলতানে ফাতিহ' (বিজয়ী সুলতান) উপাধিতে ভূষিত হন। মুসলমানদের হাতে চল্লিশ হাজার খ্রিস্টান নিহত এবং ষাট হাজার বন্দী হয়। অতি সামান্য সংখ্যক খ্রিস্টান যোদ্ধাই সেদিন স্থল অথবা জলপথে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। পলায়নকারীদের বেশির ভাগই ইতালীতে এবং অতি অল্প সংখ্যকই অন্যান্য স্থানে গিয়ে সাময়িকভাবে আশ্রয় নেয় অথবা স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকে। কায়সারের এক পৌত্র কিছুদিন পর ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এরপর অতি শীঘ্রই এই বংশের নাম-নিশানা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মুছে যায়।

বিজয়ী সুলতান কনসটান্টিনোপলের অধিবাসীদেরকে নিরাপত্তা দান করেন। যে সমস্ত লোক আপন ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পত্তির দখলদার থেকে সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করে তাদের ঘরবাড়ি কিংবা সহায়-সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা হয়নি। খ্রিস্টানদের উপাসনাগার এবং গির্জাসমূহকে (আয়া সুফিয়া ছাড়া) পূর্বাবস্থায়ই বহাল রাখা হয়।

কনসটান্টিনোপলের প্রধান বিশপকে সুলতান তাঁর দরবারে ডেকে পাঠিয়ে তাকে এই মর্মে সুসংবাদ দেন যে, তিনি (বিশপ) যথারীতি গ্রীক-চার্চের প্রধান পুরোহিত হিসাবেই বহাল থাকবেন এবং তাঁর ধর্মীয় অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। বিজয়ী সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) স্বয়ং গ্রীক চার্চের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেন। তিনি প্রধান বিশপ এবং পাদ্রীদেরকে সেই সমস্ত ধর্মীয় অধিকারও প্রদান করেন যা তারা খ্রিস্টান সাম্রাজ্যেও ভোগ করতে পারেনি। সাধারণ খ্রিস্টানদেরকেও পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। গির্জাসমূহ এবং চার্চের প্রয়োজনীয় খরচাদি নির্বাহের জন্য বিরাট বিরাট জায়গীর প্রদান করা হয়। যে সমস্ত বন্দীকে বিজয়ী সুলতানী বাহিনী নিজেদের দাসে পরিণত করেছিল, বিজয়ী সুলতান ব্যক্তিগতভাবে নিজের সিপাহীদের কাছ থেকে তাদেরকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন এবং তাদেরকে কনসটান্টিনোপল শহরের একটি নির্দিষ্ট মহল্লায় বসবাসের সুযোগ করে দেন। যুদ্ধশেষে সুলতান লক্ষ্য করেন যে, কনসটান্টিনোপল শহরের বেশির ভাগ ঘরবাড়ি হয় ধ্বংস, না হয় জনমানবহীন হয়ে পড়েছে। তখন সুলতান শহরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং এর অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এশিয়া মাইনর থেকে পাঁচ হাজার মুসলিম পরিবারকে কনসটান্টিনোপলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন এবং হিজরী ৮৫৭ সনের রমযান (অক্টোবর, ১৪৫৩ খ্রি) পর্যন্ত এই পাঁচ হাজার মুসলিম পরিবার কনসটান্টিনোপলে এসে বসবাস করতে শুরু করে। ফলে কনসটান্টিনোপল পূর্বের চাইতেও অধিক জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

কনসটান্টিনোপল শহরের ইতিহাস

উপরোক্ত কনসটান্টিনোপল বিজয়কে বিশ্বের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরাট ঘটনা বলে মনে করা হয়। এই বিজয়ের সাথে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এরপর শুরু হয়েছে আলোর তথা আধুনিক যুগ। এই সুযোগে কনসটান্টিনোপলের ইতিহাস সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সমীচীন মনে করি। যে জায়গায় কনসটান্টিনোপল শহর নির্মিত হয়েছে সেখানে খ্রিস্টপূর্ব ৬৬৭ অব্দে কোন একটি বেদুঈন বংশ বাইজেন্টাস নামক একটি শহর গড়ে তুলেছিল। ঐ শহরে নানা ধরনের বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে এবং তা ঐ এলাকার কেন্দ্রীয় শহর ও একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। গ্রীক আলেকজান্ডারের পিতা ফিলিপস এই শহরের উপর আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করে নিতে চান, ফিলিপস অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে আপন লক্ষ্য অর্জন করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু রাতের আঁধারে যখন তার বাহিনী নগর-প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল ঠিক তখনই উত্তর দিক থেকে একটি আলো প্রকাশিত হয় এবং সে আলোতে শহরবাসীরা আক্রমণকারীদের দেখে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফিলিপস শহরবাসীদেরকে যুদ্ধের জন্য এরূপ প্রস্তুত দেখতে পেয়ে যুদ্ধ না করেই দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে শহরটি রক্ষা পায়। শহরবাসীরা এই আকস্মিক ও অতর্কিত বিপদ চলে যাওয়াকে ডায়না দেবীর কৃপা বলে মনে করে এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ একটি মন্দির নির্মাণ করে। তারা অর্ধচন্দ্রকে নিজেদের শহরের প্রতীক হিসাবে নির্ধারণ করে।

এর কিছুদিন পরই আলেকজান্ডার এই শহর জয় করে আপন পিতার ব্যর্থতার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আলেকজান্ডারের পর আরো অনেক জাতি বাইজেন্টাইনকে তাদের লুটপাটের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে। এরপর কায়সার কনসটান্টিন (প্রথম) বাইজেন্টাস শহর দখল করেন। তিনি এর মনোরম প্রাসাদসমূহ ও চমৎকার অবস্থানস্থল লক্ষ্য করে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং এই শহর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ নিয়ে একটি বিরাট শহর গড়ে তোলেন। তিনি এই নতুন শহরকে নিজের রাজধানীতে রূপান্তর করেন এবং এর নাম দেন আধুনিক রোম। কিন্তু পরবর্তীকালে কনসটান্টিনের নাম থেকে ঐ শহরটিও কনসটান্টিনোপল নামে সর্বত্র পরিচিত হয়ে ওঠে।

কনসটান্টিন (প্রথম) হিজরী ৩২৭ সনে (৯৩৮ খ্রি) কনসটান্টিনোপল শহর নির্মাণ করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত কনসটান্টিন এবং তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন মূর্তিপূজারী। কিন্তু কনসটান্টিন নিজে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে কনসটান্টিনোপল নির্মাণের তিন বছর পর তা মেরীর নামে উৎসর্গ করেন। এ উপলক্ষে বিরাট আনন্দ-উৎসব পালন করা হয়। অতএব হিজরী ৩৩০ সন (৯৪১-৪২ খ্রি) থেকে কনসটান্টিনোপলকে খ্রিস্টানদের বিশেষ শহর বলে মনে করা হতে থাকে। এরপর রোমান সাম্রাজ্য যখন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন কনসটান্টিনোপল পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। এই পূর্বাঞ্চলীয় রোমান সাম্রাজ্য কায়সার হেস্টিনের শাসনামলে উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। তিনি কনসটান্টি-নোপলে অসংখ্য ইমারত নির্মাণ করে তার শ্রীবৃদ্ধি করেন। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে এই

শহরের উপর হামলা চালায়। এতদসত্ত্বেও তা ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। মুসলমানরা সর্বপ্রথম বনূ উমাইয়ার যুগে এই শহর আক্রমণ করে। সংঘর্ষ চলাকালে হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) শহীদ হন এবং তাঁকে নগর প্রাচীরের নিচেই দাফন করা হয়। সেবার মুসলমানরা সামান্যের জন্য শহরটি জয় করতে পারেনি। খ্রিস্টানরা বেশ কয়েকবারই হযরত আবূ আইয়ুব আনসারীর কবরটি নগর প্রাচীরের নিচে থেকে উঠিয়ে দূরে কোথাও নিক্ষেপ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু মুসলমানদের অসন্তুষ্টির ভয়ে তারা তাদের সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারেনি। বিজেতা মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) কনসটান্টিনোপল জয়ের পর হযরত আবূ আইয়ূব আনসারীর সমাধিপার্শ্বে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা 'জামি আইয়ূব' নামে খ্যাত।

আব্বাসীয় খলীফাদের শাসনামলে বেশ কয়েকবারই কনসটান্টিনোপল আক্রমণের প্রস্তুতি চলে, কিন্তু প্রতিবারই এমন কিছু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, যার ফলে শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এরপর হিজরী ৬০০ সনে (১২০৩-০৪ খ্রি) যখন অত্যন্ত জোরেশোরে সালীবী যুদ্ধ চলছিল তখন ভেনিসের একটি বাহিনী কনসটান্টিনোপাল জয় করে সেখানে ল্যাটিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ওরা রোমের পোপকে তাদের ধর্মীয় গুরু বলে মানত। ষাট বছর পর্যন্ত উক্ত সাম্রাজ্য বহাল থাকে। এরপর হিজরী ৬৬০ সনে(১২৬২ খ্রি) গ্রীক তথা পূর্বাঞ্চলীয় রোমানরা পুনরায় কনসটান্টিনোপল জয় করে সেখানে তাদের সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। তারা তাদের সেই চিরাচরিত আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রোমান পোপের আনুগত্য থেকে মুক্ত ছিল।

দু'শ' বছর পর বিজেতা সুলতান মুহাম্মাদ খান কনসটান্টিনোপল সাম্রাজ্যের ইতি টানেন এবং আড্রিয়ানোপলের পরিবর্তে কনসটান্টিনোপল উসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। পৌনে পাঁচশ বছরেরও অধিককাল ইসলামী হুকুমত ও খিলাফতের রাজধানী থাকার পর ঐ যুগে, যখন উসমানীয় সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তিতে আংকারা তুর্কীদের মুসলিম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজধানীতে পরিণত হয় তখন কনসটান্টিনোপল রাজধানী হিসাবে তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এতদসত্ত্বেও তা বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী এবং মুসলমানদের একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে সুপরিচিত।

বিজয়ী সুলতানের অন্যান্য কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলী

কনসটান্টিনোপল জয় করার পর সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) কয়েকদিন পর্যন্ত কনসটান্টিনোপলের নির্মাণ ও শোভা বর্ধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন। সাথে সাথে তিনি এ চিন্তাও করতে থাকেন, গ্রীসের দক্ষিণাংশ, যা একটি দ্বীপের আকারে রোম সাগরে চলে গেছে, তার পুরোটাই উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এরূপ হলে ভবিষ্যতে ইতালী ও অন্যান্য সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশসমূহের পক্ষ থেকে লুটতরাজ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির যে আশংকা রয়েছে তা অনেকাংশে লোপ পাবে। অতএব কনসটান্টিনোপল জয়ের পরবর্তী বছর সুলতান মুহাম্মাদ খান দক্ষিণ গ্রীসের ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যসমূহ জয় করে সেগুলোকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। কায়সার কনসটান্টিনের বংশধররা কনসটান্টিনোপল থেকে পালিয়ে আসার পর এই দক্ষিণ গ্রীসে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য

প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই জয়ের পর কায়সার কনসটান্টাইনের পরিবারের কিছু সদস্য, যারা এখানে বিদ্যমান ছিল, ইসলাম গ্রহণ করে। যখন মুসলিম বাহিনী কনসটান্টিনোপল জয় করেছিল এবং বিজয়ানন্দে মত্ত হয়ে মাল্লারা যখন নিজেদের নৌকা থেকে নেমে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল তখন ঐ শহরের যে সমস্ত খ্রিস্টান বাইরে বেরোতে পেরেছিল তারা বন্দরে গিয়ে সেখানে দণ্ডায়মান উসমানীয় নৌকাগুলোতে চড়ে দানিয়াল উপকূলের রাস্তা ধরে দক্ষিণ গ্রীস এবং ইতালীর দিকে পালিয়ে যায়। দক্ষিণ গ্রীস জয় করে সুলতান ভেনিস রাজ্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ঐ রাজ্যের লোকেরা সুলতানের কাছে নতি স্বীকার করে একটি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। হিজরী ৬০১ সনে (১২০৪-০৫ খ্রি) কনসটান্টি-নোপলের রাজ পরিবারের কূম নিনী নামক জনৈক ব্যক্তিকে ক্রুসেড যোদ্ধাদের হাঙ্গামার মধ্যে যখন কনসটান্টিনোপল থেকে বের করে দেওয়া হয় তখন তিনি কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণ তীরবর্তী তারাবুযুন্দ নামক স্থানে গমন করে সেখানে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপকূলীয় রাজ্যের দিকে কেউ বড় একটা লক্ষ্য দেয়নি। তাই আড়াই শ বছর পর্যন্ত সেখানে তা বহাল থাকে। যখন কোন একজন মুসলিম শাসক সেই রাজ্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন তখন সেখানকার খ্রিস্টান অধিপতি কোনরূপ ইতস্তত না করে সঙ্গে সঙ্গে ঐ মুসলিম শাসকের আনুগত্য স্বীকার করেন। পরবর্তীকালে মুসলমানরা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হলে সেখানকার শাসক করদানে অস্বীকৃতি স্থাপন করেন। এশিয়া মাইনরের উপর তুর্কীদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা তারাবুযুন্দকে তার অবস্থার উপরেই থাকতে দেয়, যার অবস্থান ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে। এবার কনসটান্টিনোপল জয়ের পর সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) এশিয়া মাইনর থেকে ঐ খ্রিস্টান রাষ্ট্রটিকে মুছে ফেলার সংকল্প নেন। কেননা কনসটান্টিনোপল বিজয় এমন ঘটনা ছিল না যে, তারাবুযুন্দের খ্রিস্টান শাসকের উপর তার কোন প্রভাব পড়বে না। কেননা, তিনি ছিলেন কায়সার কনসটান্টাইনের আত্মীয় এবং তার প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতিশীল। তারাবুযুন্দের এই খ্রিস্টান হাসান তাভীলের শ্বশুর ছিলেন। হাসান তাভীল সমগ্র ইরান ও আর্মেনিয়ার উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাকে একজন প্রতাপশালী সম্রাট বলে মনে করা হতো। অতএব ইরানের তুর্কমান সাম্রাজ্য কোন কোন সময়ে এশিয়া মাইনরের উসমানীয় সাম্রাজ্যের আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারত। তাছাড়া উসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্য যে কোন হুমকি সৃষ্টির পরিপূর্ণ সুযোগ তারাবুযুন্দ রাজ্যের ছিল। সুলতান মুহাম্মাদ খান খ্রিস্টান সম্রাটের চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি এখনি এ ঝামেলার সমাপ্তি টানতে চান। অতএব তিনি গ্রীস ও ভেনিস জয় করে হিজরী ৮৬০ সনে (১৪৫৬ খ্রি) তারাবুযুন্দর উপর হামলা চালান এবং তা দখল করে আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তারাবুযুন্দর রাজ্য যদিও স্বাধীন ছিল, কিন্তু সেটাকে ইরানেরই একটি অংশ মনে করা হতো। এ কারণে তারাবুযুন্দ রাজ্যের উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা ইরানের বাদশাহ হাসান তাভীলের কাছে খুব অপ্রীতিকর ঠেকে। কিন্তু সুলতান যেহেতু তারাবুযুন্দ রাজ্যকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পর ইরান-সম্রাট হাসান তাভীলের সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেননি, তাই তখন ইরান সাম্রাজ্যের সাথে তা কোন বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টিও হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে হাসান তাভীলের অন্তরের জ্বালা প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে।

মোট কথা, গ্রীস ও এশিয়া মাইনরের অভিযান শেষ করে সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) কনসটান্টিনোপলে ফিরে আসেন এবং এখানে পৌঁছেই সার্বিয়া, তারপর বোসনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এই এলাকা ইতিপূর্বেও উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজকাল ঐ সমস্ত এলাকার শাসকরা করদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে নিজেদের অবাধ্যতা প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। তাই সুলতান মুহাম্মাদ খান এই সমস্ত ঝামেলার একটি চূড়ান্ত মীমাংসা করতে চান। তিনি সার্বিয়া এবং বোসনিয়া জয় করে সেগুলোকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের এক একটি প্রদেশ ঘোষণা করে সেখানে আপন কর্মচারী নিয়োগ করেন। যেহেতু হাঙ্গেরীর সম্রাট হানীদাসের সাথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং হানীদাস উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন এবং ইউরোপের অন্যান্য খ্রিস্টান শক্তির কাছে এ জন্য সাহায্য প্রার্থনাও করেছিলেন তাই সুলতান মুহাম্মাদ খান স্বয়ং হাঙ্গেরীর উপর হামলা পরিচালনার সংকল্প নেন। হিজরী ৮৬১ সনে (১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই) উসমানী বাহিনী হাঙ্গেরী অভিমুখে রওয়ানা হয়। কনসটান্টিনোপল জয়ের পর সমগ্র খ্রিস্টান রাজন্য তথা সমগ্র খ্রিস্টান বিশ্ব উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া তাদের সকলেরই ধারণা ছিল, যদি সুলতান মুহাম্মাদ খান হাঙ্গেরীর রাজধানী বেলগ্রেডও কনসটান্টিনোপলের মত জয় করে ফেলেন তাহলে পশ্চিম ইউরোপের অবস্থা অত্যন্ত সংগীন হয়ে উঠবে। অতএব বেলগ্রেডকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক দেশ থেকেই খ্রিস্টান সৈন্যরা দলে দলে এসে সমবেত হতে থাকে। সুলতান মুহাম্মাদ খান বিভিন্ন শহর ও জনবসতি জয় করতে করতে আপন বাহিনী নিয়ে বেলগ্রেডে গিয়ে পৌঁছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শহরটি অবরোধ করে ফেলেন। ওদিকে হানীদাস বা হানীডেজও ছিলেন একজন অতি অভিজ্ঞ সেনাপতি। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা ও পারদর্শিতার সাথে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক সংঘর্ষ ও অনেক রক্তারক্তির পর উসমানীয় বাহিনী শহরের একটি অংশে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এটা ছিল শহরের নিম্নাংশ। এতদসত্ত্বেও খ্রিস্টান অধিনায়করা সাহস হারা না হয়ে শহরের উর্ধ্বাংশে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রভূত করে মুসলমানদের উপর হামলা চালায়। শহরে প্রবেশকারী ইসলামী খণ্ডবাহিনী শহরের অভ্যন্তরে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে খ্রিস্টানদের মুকাবিলা করে এবং অনবরত ছয় ঘণ্টা যুদ্ধ করার পর রাত ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে নিজেদেরকে শহরের অভ্যন্তরে বিপজ্জনক অবস্থায় দেখতে পেয়ে পশ্চাদপসরণ করে এবং শহরের বাইরে অবস্থিত নিজেদের ছাউনিতে ফিরে আসে। খ্রিস্টানরা সঙ্গে সঙ্গে শহরের ঐ অংশ (নিম্নাংশ) দখল করে সেখানে শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই ঘটনা ঘটে ২১শে জুলাই তারিখে। এরপর আরো বেশ কয়েকবার মুসলমানরা নগরপ্রাচীর ডিঙিয়ে শহরের বিভিন্ন মহল্লায় লুটপাট চালায়, কিন্তু অবরুদ্ধদের নিখুঁত ব্যবস্থাপনা ও বিজ্ঞতার কারণে মুসলমানরা শহরটিকে পরিপূর্ণভাবে দখল করতে পারেনি। তাদেরকে প্রত্যেকবারই শহরের দখলকৃত এলাকাসমূহ ছেড়ে আসতে হয়। শেষ পর্যন্ত ৬ই আগস্ট স্বয়ং সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) শহরের উপর চূড়ান্ত হামলা চালান। এই দিন শহরটি বিজিত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্বয়ং সুলতান মুহাম্মাদ তরবারি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে অনেক খ্রিস্টান অধিনায়কের মস্তক তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন, এমন কি হাঙ্গেরী-সম্রাট হানীদাসও তাঁর

তরবারির আঘাতে আহত হয়ে পিছন দিকে পালিয়ে গেছেন ঠিক সেই সময়ে সুলতান একজন খ্রিস্টান সৈন্যের হাতে আহত হন। তার উরুর উপর তরবারির ভীষণ আঘাত লাগে যে, ঘোড়ায় চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে চলাফেরা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। অতএব তাঁকে পালকিতে করে অকুস্থল থেকে নিয়ে আসা হয়। সুলতানের এভাবে আহত হয়ে পালকিতে চড়ে তাঁবুতে ফিরে আসার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়ে। সুলতান যে ভীষণভাবে আহত হয়েছেন সে কথা আর কারো কাছে অবিদিত থাকেনি। যে উসমানীয় সৈন্যরা খ্রিস্টানদের পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে শহরের অভ্যন্তরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এবার নিজেরাই পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে খ্রিস্টানদের সাহস বৃদ্ধি পায়। তারা এবার অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে হামলা চালাতে শুরু করে। খ্রিস্টান সম্রাট হানীদাস যদিও সুলতানের হাতে আহত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার আহত হওয়ার সংবাদ খ্রিস্টান বাহিনীর সকলে জানতে পারেনি। তাছাড়া হানীদাস ব্যতীত খ্রিস্টানদের মধ্যে আরো অনেক অভিজ্ঞ অধিনায়ক ছিলেন, যারা বহিরাগত সৈন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সত্য, তবে এই যুদ্ধের সামগ্রিক দায়িত্ব পালনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিলেন। এদিকে সুলতান মুহাম্মাদ খান ছিলেন তাঁর সমগ্র বাহিনীর একচ্ছত্র অধিনায়ক। অতএব তাঁর আহত হওয়ার সংবাদে সমগ্র বাহিনীর মধ্যে যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে তাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এবার খ্রিস্টানদের আক্রমণ এতই ভীষণ ছিল যে, মুসলমানরা শহর থেকে বের হয়েও নিজের তাঁবুতে টিকে থাকতে পারেনি। বাধ্য হয়ে আহত সুলতানকে নিয়ে তখন তখনই কনসটান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হতে হয়। তাই শেষ পর্যন্ত অনেক দূর এগিয়েও বেলগ্রেড শহর দখল করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উসমানীয় বাহিনীর এই পশ্চাদপসরণ বা পরাজয় ইউরোপকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। সমগ্র খ্রিস্টান দেশে এ উপলক্ষে আনন্দ উৎসব পালন করা হয়। কিন্তু এই ঘটনার বিশ দিন পর যুদ্ধাহত হানীদাস মৃত্যুমুখে পতিত হন। অপর দিকে যুদ্ধাহত সুলতানের ক্ষত শুকাতে থাকে এবং তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিকান্দার বেগ আলবেনিয়া দখল করে নিয়েছিলেন। সিকান্দার বেগ রাজপ্রাসাদে প্রতিপালিত হওয়ার কারণে তার সাথে সুলতান মুহাম্মাদ খানের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাই তিনি সিংহাসন আরোহণ করার পর সিকান্দার বেগের হুকুমতকে নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এরপর তাকে (সিকান্দার বেগকে) কোনরূপ কষ্ট দেওয়ার বা আলবেনিয়া থেকে তাকে বেদখল করার কোনরূপ চিন্তা সুলতান মুহাম্মাদ খানের অন্তরে উদিত হয়নি। কিন্তু বেলগ্রেডের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর যে কারণে অন্যান্য খ্রিস্টান রাজ-রাজড়াদের সাহস কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল ঠিক সে কারণে সিকান্দার বেগের মধ্যেও অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের চিহ্নাদি ফুটে উঠতে শুরু করেছিল। সুলতান মুহাম্মাদ খান প্রথম প্রথম তাকে কিছুটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতেই দেখেন। কিন্তু সিকান্দার বেগ যখন ভয়ানক আকারের বাড়াবাড়ি শুরু করে তখন সুলতান আলবেনিয়া অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন। সিকান্দার বেগ ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি। আর আলবেনিয়া যেহেতু একটি পার্বত্য দেশ ও সিকান্দার বেগের জন্মভূমি ছিল এবং সেখানকার

অধিবাসীরা ছিল তার জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, তাই উভয়পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলে এবং তখনকার মত আলবেনিয়া জয় করা সুলতানী সৈন্যদের জন্য সম্ভব হয়ে উঠেনি।

শেষ পর্যন্ত হিজরী ৮৬৬ সনে (১৪৬১-৬২ খ্রি) স্বয়ং সিকান্দার বেগ সন্ধি প্রস্তাব পেশ করেন এবং ভবিষ্যতে সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন বলেও অঙ্গীকার করেন। সুলতান, সিকান্দার বেগের আবেদনে সাড়া দিয়ে আলবেনিয়া থেকে আপন সেনাবাহিনী হটিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু এরপরই সিকান্দার বেগ পুনরায় বিরোধিতা করতে শুরু করেন। ফলে স্বয়ং সুলতানকে পুনরায় সেনাবাহিনী নিয়ে আলবেনিয়ায় যেতে হয়। এইবার কিন্তু সিকান্দার বেগ সুলতানী হামলার ধাক্কা সামলাতে পারেননি। তাই তাকে বাধ্য হয়ে সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র ভেনিসে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য সেখানে তাকে সাদরে গ্রহণ করা হয়। সিকান্দার বেগ ভেনিসেই মারা যান এবং আলবেনিয়া পরিপূর্ণভাবে সুলতানের অধিকারে চলে আসে। বেলগ্রেড হামলার বিফলতা এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত সিকান্দার বেগের মত একজন ক্ষুদ্র রাজার সাথে যুদ্ধরত থাকার কারণে খ্রিস্টানদের অন্তরে কনসটান্টিনোপল বিজয়ী সুলতানের যে ভয় ঢুকেছিল তা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং তারা পুনরায় সুলতানের সাথে মুকাবিলা করার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হতে থাকে। ভেনিস রাষ্ট্র, যা মাত্র কিছুদিন পূর্বে সুলতানের কাছে নতি স্বীকার করে সন্ধি প্রস্তাব পেশ করেছিল, সেও পুনরায় শক্তি প্রদর্শনে উদ্যত হয়। অতএব সুলতান ভেনিস রাষ্ট্র পদানত করাকেও নিজের জন্য জরুরী মনে করেন এবং একটি অভিযান চালিয়ে সমুদ্রের তীর ধরে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ভেনিসের অনেক শহর দখল করে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত ভেনিস রাষ্ট্র তার সাকুতরী নগরী স্বয়ং সুলতানের হাতে তুলে দিয়ে অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। ফলে আড্রিয়াটিক সাগরেও সুলতানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮৭৮ হিজরীতে (১৪৭৩-৭৪ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদ খান আপন সেনাপতি আহমদ কাইন্দুককে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং গ্রীক সাগরের দ্বীপসমূহ জয় করার কাজে নিয়োজিত থাকেন। এই অবকাশে ইরানের বাদশাহ হাসান তাভীল তুর্কমানও আপন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। তিনি ৮৭৩ হিজরীতে (১৪৬৮-৬৯ খ্রি) সুলতান আবূ সাঈদ মির্যা তাইমূরীকে হত্যা করেছিলেন। এবার তিনি এশিয়া মাইনরে সুলতান মুহাম্মাদ খানের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস পান এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের উপর তারাবুযুন্দ জয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প নেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় এশিয়া মাইনরে বেশ কয়েকটি বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং প্রত্যেক বারই সুলতান মুহাম্মদ খানের অধিনায়করা তা দমন করে। সুলতান মুহাম্মাদ খান ইরানের মুসলিম সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষে যেতে চাইতেন না। তাঁর যাবতীয় মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের ঐ মনোষ্কামনা পূরণে, যা তিনি ইতালীর রোম শহর জয় করার ব্যাপারে প্রকাশ করেছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত ধীরচিত্তে এবং দৃঢ়তার সাথে ইতালী সাম্রাজ্যের দিকে আপন সাম্রাজ্য সীমা বর্ধিত করতে থাকেন এবং অন্যান্য দিক সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় থাকেন। তিনি বেলগ্রেড অভিযানের পর দানিয়ুব সাগরের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং বেলগ্রেডের বিজয় অভিযান আপাতত মুলতবি রেখে গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ, ভেনিস প্রভৃতি এলাকা জয় করেন। এশিয়া মাইনর ও ইরানের দিকে সুলতান কখনো চোখ তুলে তাকাননি, কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে এর একটা কারণ

সৃষ্টি হয়ে যায়। হিজরী ৮৭৯ সনে (১৪৭৪-৭৫ খ্রি) সুলতান আপন প্রধানমন্ত্রী আহমদ কায়দূককে কারিমিয়া জয়ের জন্য কৃষ্ণসাগরের দিকে প্রেরণ করেন। কারিমিয়া উপদ্বীপ দীর্ঘদিন থেকে চেঙ্গিযী বংশের খানদের অধীন ছিল। কিছু দিন থেকে জেনেভাবাসীরা কারিমিয়ার দক্ষিণ উপকূলের ইয়াফা বন্দর নিজেদের দখলে রেখেছিল। ইয়াফার উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে তারা তাদের যুদ্ধ জাহাজের সাহায্যে কারিমিয়ার খানের উপর নানা ধরনের উৎপাত সৃষ্টি করছিল। তাই কারিমিয়ার খান বাধ্য হয়ে সুলতান মুহাম্মাদ খানের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। তিনি অনুরোধ করেন, যেন সুলতান জেনেভাবাসীদেরকে ইয়াফা থেকে বেদখল করে সেখানে নিজেরই অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান কারিমিয়ার খানের আবেদনে সাড়া দেন এবং আহমদ কায়দূককে একটি শক্তিশালী নৌবহর দিয়ে ইয়াফার দিকে প্রেরণ করেন। আহমদ কায়দূক চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সেখানে পৌঁছে চারদিন অবরোধ করে রাখার পর ইয়াফা জয় করেন এবং সেখান থেকে চল্লিশ হাজার জেনেভাবাসীকে বন্দী করেন। ইয়াফার বিরাট পরিমাণ মালে গনীমত এবং জেনেভাবাসীদের অনেকগুলো যুদ্ধজাহাজ আহমদ কায়দূকের হস্তগত হয়। কারামিয়ার খান উসমানীয় সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং ঐ তারিখ থেকে তিন বছর পর্যন্ত কারিমিয়ার খানেরা কনসটান্টিনোপলের সুলতানের কাছে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকে। ইয়াফা বন্দরকে দ্বিতীয় কনসটান্টিনোপল মনে করা হতো। পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ এবং কৃষ্ণসাগরের উপর উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রাধান্য বজায় রাখতে হলে ইয়াফা বন্দরের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা খুবই জরুরী ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঐ বছর অর্থাৎ হিজরী ৮৭৯ সনে (১৪৭৪-৭৫ খ্রি) রাশিয়ায় ঐ জার বংশই ক্ষমতাশীল ছিল, যারা আমাদের যুগের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অত্যন্ত দাপটের সাথে রাশিয়ার উপর নিজেদের শাসন পরিচালনা করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে সর্বশেষ জার ক্ষমতাচ্যুত এবং নিহত হন। তারপর রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কারিমিয়া এবং ইয়াফার উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা ইরানের বাদশাহ হাসান তাভীলের কাছে খুবই অপ্রীতিকর ঠেকে। এবার তিনি প্রকাশ্যে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠেন।

৮৮০ হিজরীতে (১৪৭৫-৭৬ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদ খান নিজ পুত্র বায়াযীদকে এশিয়া মাইনরের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করেন, যাতে তিনি ওদিককার যাবতীয় বিষয় দেখাশুনা করতে পারেন। সুলতান স্বয়ং ইউরোপীয় এলাকার প্রতি মনোনিবেশ করেন। আলবেনিয়া এবং হারযেগুভিনার উপর পূর্বেই সুলতানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এবার তিনি রোম সাগরের দ্বীপগুলো একের পর এক জেনেভা ও ভেনিসের দখল থেকে কেড়ে নিতে থাকেন। এরপর হিজরী ৮৮২ সনে (১৪৭৭ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদ খানের সেনাপতি উমর পাশা স্বীয় দিগ্বিজয়ী সেনাবাহিনী নিয়ে ভেনিসের রাজধানী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন। সেখানকার পার্লামেন্ট তুর্কী বাহিনীকে নিজেদের নগর প্রাচীরের নিচে অবস্থানরত দেখে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। তারা এই প্রতিশ্রুতিও দেয় যে, সুলতানের যখনই প্রয়োজন হবে তখন তারা তাদের সামরিক নৌবহর দিয়ে সুলতানী বাহিনীকে সাহায্য করবে। শেষ পর্যন্ত উমর পাশা নিজের ইচ্ছানুযায়ী শর্তের উপর ভেনিস-পার্লামেন্টের সাথে সন্ধি করে বিজয়ীর বেশে ভেনিস থেকে ফিরে আসেন।

৭১১ হিজরীতে (১৩১১-১২ খ্রি) ক্রুসেড যোদ্ধাদের একটি দল রোডস দ্বীপ দখল করে সেখানে একটি স্বাধীন হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে। আনুমানিক দেড়শ' বছর থেকে ঐ সমস্ত লোক উক্ত দ্বীপের উপর দখলদার ছিল। তারা আশেপাশের দ্বীপসমূহে এবং সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের বন্দরসমূহে ডাকাতি ও রাহাজানি করত। ভেনিস এবং জেনেভাবাসীরা এদেরকে কখনো ক্ষেপাত না বরং ক্রুসেড যোদ্ধা হিসাবে তাদেরকে সম্মানের নজরে দেখত। তাছাড়া ওরা খ্রিস্টানদের বাদ দিয়ে সাধারণত মুসলমানদের উপরই অত্যাচার-নিপীড়ন চালাত। এবার যখন সিরিয়া উপকূল থেকে শুরু করে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত সুলতানের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং প্রায় সব দ্বীপই সুলতানের দখলে এসে গেল তখন রোডসের খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব, মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য ভয়ানক অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াল। সুলতান ৮৮৫ হিজরীতে (১৪৮০ খ্রি) এই দ্বীপটি অধিকার করার জন্য একটি সামুদ্রিক নৌবহর প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। এরপর সুলতান মুহাম্মাদ খান দ্বিতীয় বারের মত সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ঐ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সমগ্র দ্বীপ এলাকা দখল করার পর রাজধানী অবরোধ করা হয়। শহর বিজিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে যখন সুলতানী বাহিনী শহরে প্রবেশ করে লুটপাট করতে চাচ্ছিল, সেনাপতি এই মর্মে কড়া নির্দেশ জারি করেন যে, কোন ব্যক্তি এক তিল পরিমাণ বস্তুর উপরও নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এই নির্দেশ শ্রবণ করার পর সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করে। এরই ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, সুলতানী বাহিনীকে প্রায় বিজিত দ্বীপটি ছেড়ে চলে আসতে হয়।

যখন রোডস অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল তখন সুলতান ইতালী বিজয়ের জন্যও আপন প্রধানমন্ত্রী আহমদ কায়দূকের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী জাহাজযোগে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করেছিলেন। আহমদ কায়দূক ইতালীতে অবতরণ করে সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চল জয় করেন এবং ইতালীর 'বিজয় দ্বার' বলে কথিত আরটিন্টো শহর অবরোধ করেন। এই শহর দখল করার পর ইতালী দেশ ও রোম সাম্রাজ্য জয় করা কোন কঠিন কাজ ছিল না। শেষ পর্যন্ত ৮৮৫ হিজরীতে (১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের ১১ই আগস্ট) আহমদ কাইদুক অস্ত্র বলে উক্ত শহর জয় করেন এবং প্রায় বিশ হাজার অবরুদ্ধ নগরবাসীকে হত্যা অথবা বন্দী করেন। এই সুদৃঢ় স্থানটি দখলে আসার পর রোম শহর জয় করা কোন কঠিন কাজ ছিল না। তাই সমগ্র ইতালী রাজ্যে এক মহা আতংকের সৃষ্টি হয়। এমনকি রোমের পোপও ইতালী থেকে পালাবার আয়োজন করতে থাকেন। আরটিন্টো (তখন টরেন্টো) জয় এবং রোডস অভিযান ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ যখন সুলতান মুহাম্মাদ খানের কাছে পৌঁছে তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য ও রসদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। বাহ্যত সুলতান ইয়ালদিরিমের সেই অন্তিম ইচ্ছা যে, উসমানীয় সুলতান বিজয়ী বেশে রোম শহরে প্রবেশ করে বৃহত্তম গির্জায় আপন ঘোড়াকে দানা খাওয়াবেন, পূরণের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতাই আর বাকি ছিল না। এবার সুলতান মুহাম্মাদ খান অত্যন্ত যত্নের সাথে সমর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং বসফোরাস প্রণালীর সমুদ্রের তীরে সামরিক পতাকা উড়িয়ে দেন। এটা ছিল সে কথারই ইঙ্গিত যে, সুলতান আপন দুর্দান্ত বাহিনী নিয়ে শীঘ্রই রওয়ানা হবেন।

ঐ সময় সুলতানের সামনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। এক. ইরানের বাদশাহ হাসান তাভীলকে শাস্তি প্রদান। কেননা তিনি শাহযাদা বায়াযীদের মুকাবিলায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, এমন কি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। দুই. রোডস দ্বীপ দখল করা। তিন. ইতালী দেশ পরিপূর্ণভাবে জয় করে রোম নগরীতে বিজয়ীবেশে প্রবেশ করা। সুলতান এগুলোর মধ্যে কোন্ কাজটি প্রথমে করবেন তা কাউকে বলেননি। সুলতান মুহাম্মাদ খানের স্বভাবই ছিল যখন তিনি স্বয়ং কোন অভিযানে বের হতেন তখন সেনাবাহিনীর কোন অধিনায়ক, এমনকি তাঁর প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত জানতে পারতেন না, তার আসল লক্ষ্যস্থল কোথায়। একদা কোন একজন অধিনায়ক সুলতানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কোনদিকে যাবেন এবং আপনার উদ্দেশ্য কি? তখন সুলতান এই বলে উত্তর দিয়েছিলেন, যদি আমি একথা জানতে পারি যে, আমাকে একটি দাড়িও আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেছে তাহলে আমি সেটাকেও সঙ্গে সঙ্গে উপড়ে ফেলে আগুনে নিক্ষেপ করব। সুলতান যুদ্ধ সম্পর্কিত ব্যাপারে কি পরিমাণ সতর্ক থাকতেন তা উপরোক্ত ঘটনা থেকে অনায়াসে বোঝা যায়। যা হোক, সব দিক থেকে সৈন্যরা কনসটান্টিনোপলে এসে জড় হচ্ছিল এবং সুলতান প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র ও রসদ-সামগ্রী রাতারাতি সংগ্রহ করে নিচ্ছিলেন। এই প্রস্তুতি এতই বিরাট ও অভূতপূর্ব ছিল যে, এর দ্বারা অনুমিত হচ্ছিল যে, অতি শীঘ্রই ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশে উসমানীয় সাম্রাজ্যের জয় জয়কার পড়ে যাবে। এই প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ৮৮৬ হিজরীতে (১৪৮১ খ্রি)। শেষ পর্যন্ত সুলতান কনসটান্টিনোপল থেকে রওয়ানা হন। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি প্রথমে ইরানের বাদশাহকে শাস্তি দিয়ে অতি শীঘ্রই সেখান থেকে ফিরে এসে রোডস দ্বীপ জয় করবেন। এরপর তিনি পরিপূর্ণ শক্তি নিয়ে ইতালীতে প্রবেশ করবেন। সেখানে তাঁর বীর সেনাপতি আহমদ কায়দূক টরেন্টো দখল করে আপন সুলতানের অপেক্ষায় ছিলেন। স্কাটস্ (চতুর্থ)ও পলায়নের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি মনস্থির করে রেখেছিলেন, সুলতানের ইতালীতে প্রবেশের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে রোম থেকে পলায়ন করবেন। কিন্তু বিধিলিপির উপর কারো হাত নেই। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এটা ছিল না যে, ইউরোপীয় দেশসমূহ থেকে খ্রিস্টানদের নাম-নিশানা মুছে যাক। তাই কনসটান্টিনোপল থেকে রওয়ানা হওয়ার সাথে সাথে মারাত্মক নুকরাস রোগে (গেঁটে বাতের কারণে পা তরঙ্গাকারে ফুলে ওঠা) আক্রান্ত হয়ে হিজরী ৮৮৬ সনের ৩রা রবিউল আউয়াল রোজ বৃহস্পতিবার (১৪৮১ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মে) মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফলে তাঁর ঐ বিরাট সামরিক অভিযান মুলতবি হয়ে যায়। সুলতানের লাশ কনসটান্টিনোপল নিয়ে এসে দাফন করা হয়। তিনি মোট বায়ান্ন অথবা তেপ্পান্ন বছর জীবিত ছিলেন এবং মোট একত্রিশ বছর সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যু উসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। সুলতান মুহাম্মাদ খান যে বছর আড্রিয়ানোপলে আপন পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন সে বছর হিন্দুস্থানে বাহলূল লোদী সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতএব বাহলূল লোদী এবং সুলতান মুহাম্মাদ খান ছিলেন সমসাময়িক। কিন্তু বাহলূল লোদী সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যুর পর বেশ কয়েক বছর হিন্দুস্থানে রাজত্ব করেন। কাশ্মীরের বিখ্যাত সম্রাট যায়নুল আবিদীনও ছিলেন সুলতান মুহাম্মাদ খানের সমসাময়িক। কিন্তু তিনিও কয়েক বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই বছরই অর্থাৎ ৮৮৬ হিজরীর ৫ই সফর (এপ্রিল ১৪৮১ খ্রি)

দাক্ষিণাত্যে সুলতান মুহাম্মাদ শাহ্ বাহমনির মন্ত্রী মালিকুত তুজ্জার খাজা জাহান মাহমুদ গাওয়ান নিহত হন। সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যুর ঠিক এগারো বছর পর অর্থাৎ ৮৯৭ হিজরীর ১লা রবিউল আউয়াল (জানুয়ারী ১৪৯২ খ্রি) স্পেনে ইসলামী হুকুমতের দীপ নির্বাপিত হয় এবং খ্রিস্টানরা সমগ্র গ্রানাডা দখল করে নেয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যখন সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যু হয় তখন স্পেনে ইসলামী হুকুমতের শেষ নিঃশ্বাস উঠানামা করছিল। সুলতান মুহাম্মাদ খান যদি আরো কয়েক বছর জীবিত থাকতেন এবং ইতালী বিজিত হয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত তাহলে খ্রিস্টানরা গ্রানাডা থেকে ইসলামী হুকুমতের নাম-নিশানা কখনো মুছে ফেলতে পারত না। বরং গ্রানাডার তৎকালীন দুর্বল ইসলামী সাম্রাজ্যটি উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাহায্য-সহানুভূতি লাভ করে দ্রুত সমগ্র স্পেন উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ত। এরপর সমগ্র ইউরোপই ইসলামী পতাকাতলে চলে আসত। মোটকথা, সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যু ইসলামী বিশ্বের জন্য একটি বিরাট বিপদ রূপে পরিগণিত হয়।

সুলতান মুহাম্মাদ খানের শাসনামল : একটি পর্যালোচনা

কনসটান্টিনোপল বিজেতা সুলতান মুহাম্মাদ খানের শাসনামল ছিল যুদ্ধবিগ্রহ এবং নানা ধরনের দাঙ্গাহাঙ্গামায় পূর্ণ। তিনি তাঁর শাসনামলে বারটি রাজ্য এবং দু'শ'র চাইতে বেশি শহর ও দুর্গ জয় করে সেগুলোকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সুলতান মুহাম্মাদ খানের শাসনামলে আট লক্ষ মুসলিম সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু তার বাহিনীর নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা সোয়া লাখের চাইতে বেশি ছিল না। তিনি নেগচারী (উৎসর্গীকৃত প্রাণ) সেনাবাহিনীর গঠন ও বিন্যাসের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন। ঐ নেগচারী বাহিনীকে গার্ড রেজিমেন্ট বলা হতো। ঐ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল বার হাজারের মত। তিনি এমন সব আইনকানুন জারি করেন, যার ফলে সর্বপ্রকার সামরিক ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা বিদূরিত হয় এবং দেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এমন একজন সুলতান, যিনি তাঁর সমগ্র শাসনামল যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তাক্ত সংঘর্ষের মধ্যে কাটিয়েছেন। তিনি একজন উঁচু ধরনের আইনপ্রণেতাও হবেন এমনটি কখনো আশা করা যায় না। কিন্তু সুলতান মুহাম্মাদ খানের ক্ষেত্রে তা-ই সম্ভব হয়েছিল। তিনি শুধু একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাটই ছিলেন না, সেই সাথে উঁচু ধরনের একজন আইনপ্রণেতাও ছিলেন। তিনি তাঁর দরবারে মন্ত্রীবর্গ, অধিনায়কবর্গ, পেশকার প্রভৃতি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাথে উলামায়ে দীনের একটি দলকেও স্থান দিয়েছিলেন এবং তাঁদেরকে সাম্রাজ্যের অন্যান্য কর্মকর্তার চাইতে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছিলেন।

তিনি তাঁর অধিকৃত সাম্রাজ্যের প্রতিটি শহরে এবং প্রতিটি গ্রাম ও পল্লীতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সমস্ত মাদ্রাসার যাবতীয় খরচাদি সরকারী কোষাগারই বহন করত। এই সমস্ত মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি স্বয়ং সুলতানই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক মাদ্রাসায় যথারীতি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে সনদ প্রদান করা হতো। এই সমস্ত সনদের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যেত এবং সে যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে চাকুরী কিংবা জায়গীর প্রদান করা হতো। দীন ও দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য প্রত্যেকটি বিদ্যাই মাদ্রাসার পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুলতান মুহাম্মাদ খান স্বয়ং

একজন যোগ্য আলিম ছিলেন। কুরআন, হাদীস, ইতিহাস, গণিত ও পদার্থ বিদ্যায় তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। এ জন্যই তিনি মাদ্রাসাসমূহে শ্রেষ্ঠতম পাঠ্যসূচি চালু করতে পেরেছিলেন। আরবী, ফারসী, তুর্কী, ল্যাটিন, গ্রীক, বুলগেরীয় প্রভৃতি অনেক ভাষায়ই সুলতান শুদ্ধভাবে অনর্গল কথা বলতে পারতেন।

সুলতান মুহাম্মাদ খান তাঁর সাম্রাজ্যে যে আইন জারি করেছিলেন তার সারাংশ হচ্ছে– সর্বপ্রথম কুরআন মজীদের উপর আমল করতে হবে। এরপর সহীহ ও প্রামাণিক হাদীসের অনুসরণ করতে হবে। এরপর চার ইমামের শরণাপন্ন হতে হবে। এই তিন স্তরের পর চতুর্থ স্তর হচ্ছে সুলতান কর্তৃক জারিকৃত হুকুম-আহ্কাম। সুলতান কর্তৃক জারিকৃত কোন হুকুম শরীয়ত বিরোধী হলে উলামাবৃন্দের এই অধিকার ছিল যে, তাঁরা ঐ হুকুম যে শরীয়ত বিরোধী তার প্রমাণ পেশ করবেন, যাতে সুলতান তা সঙ্গে সঙ্গে রহিত করে নিতে পারেন।

সুলতান মুহাম্মাদ খান তাঁর অধিকৃত সাম্রাজ্যকে প্রদেশ, বিভাগ এবং জেলায় বিভক্ত করে নিয়েছিলেন। জেলার কালেক্টরকে বেইলার বেগ, বিভাগীয় প্রধানকে সালজাক এবং সুবাদারকে পাশা উপাধি প্রদান করা হয়েছিল। এই সুলতানই কনসটান্টিনোপল তথা দরবারে সালতানাতকে 'বাবেআ-লী' নাম দিয়েছিলেন, যা আমাদের যুগ পর্যন্ত ঐ নামেই বিখ্যাত হয়ে আছে। বিস্মিত হতে হয় এই দেখে যে, এমন একজন সদা-যুদ্ধরত ও দিগ্বিজয়ী সুলতান কেমন করে এত দীর্ঘ সময় জ্ঞান চর্চার জন্য বের করে নিতে পারতেন। সুলতান মুহাম্মাদ খান আপন ব্যক্তিত্ব ও ভাবমূর্তি রক্ষার প্রতি এতই যত্নবান ছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রীর সাথেও কখনো রসালাপ করতেন না। একান্ত প্রয়োজন না হলে তিনি কখনো দরবার বা মজলিস আহবান করতেন না। তিনি তাঁর অবসর মুহূর্তগুলো নির্জনে কাটিয়ে দিতেই পছন্দ করতেন। তাঁর কোন কথাই অনর্থক বা অহেতুক ছিল না। তিনি যোগ্য উলামাবৃন্দকে যেমন অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন, তেমনি উলামা নামধারী মূর্খ ও কাঠমোল্লাদেরকে অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন। তিনি নামায-রোযার অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন এবং সব সময় জামাআতে নামায আদায় করতেন। কুরআন মজীদের প্রতি তার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। খ্রিস্টান এবং অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত নম্র ও বন্ধুসুলভ। শরীয়ত অনুসরণের ক্ষেত্রে তিনি অযথা বাড়াবাড়ি বা কঠোরতা পছন্দ করতেন না। তাঁর আকীদা-বিশ্বাসের মর্মকথা ছিল 'আদদীনু ইউসরুন' অর্থাৎ ধর্ম সহজ-সরল ও স্বাভাবিক।

এই রহস্য সম্পর্কে তিনি ভালভাবে অবহিত ছিলেন যে, কাঠমোল্লা তথা গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় নেতারা ধর্মের ব্যাপারে কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি করে অর্থাৎ ছোট-খাট বিষয়ের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করে দীন ইসলামকে মানুষের জন্য একটি আতংকের বস্তুতে পরিণত করেছে। তাই তিনি ইসলামের প্রত্যেকটি 'রুখসত' (ঔদার্য) থেকে উপকৃত হওয়াকে বৈধ মনে করতেন। একদা তাঁর দরবারে ভেনিসের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী আসেন এবং নিজের জ্ঞান-গরিমা প্রকাশের জন্য সুলতানের দরবারের বেশ কয়েকটি ছবি আঁকেন। সুলতান এ জন্য তাকে অনুমতিও প্রদান করেন। ছবি আঁকা শেষ হলে সুলতান প্রতিটি ছবি মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং তাতে কি কি ভুল-ত্রুটি রয়েছে তা শিল্পীকে দেখিয়ে দেন। সুলতানের এ ধরনের সাধারণ ঔদার্য ও মুক্তচিন্তাকে উপলক্ষ করে ঐ যুগের কিছু সংখ্যক

ফতওয়াবাজ গোড়া মোল্লা তাঁকে কাফির, ধর্মত্যাগী ও নাস্তিক বলে ফতওয়া দেয়। কিন্তু সুলতান তাতে ঘাবড়ে যাননি। তিনি জানতেন, এ ধরনের পেশাদার কিছু মৌলভী মাওলানা সব যুগেই ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এরা যত চেষ্টাই করুক, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং কালের অগ্রগতিকে কখনো রুখে রাখতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। সাম্রাজ্যের প্রতিটি বিভাগের প্রতি সুলতান মুহাম্মাদ খানের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি অপরাধীদের শাস্তি প্রদানে ছিলেন কঠোর এবং দক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্মকর্তাদের প্রতি উদার। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, সুলতান মুহাম্মাদ খান আপন ব্যক্তিত্ব ও ভাবমূর্তি রক্ষার প্রতি ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান এবং তিনি নির্জনে থাকতে খুবই পছন্দ করতেন। তবে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি তাঁর সাধারণ সৈন্যদের সাহায্যার্থে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের লক্ষ্যে, তাদের সাথে মিলেমিশে যে কোন কাজ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তখন মনে হতো, যেন তিনি সেই মহাপ্রতাপশালী দিগ্বিজয়ী সুলতান নন বরং একজন সাধারণ সিপাহী মাত্র। এ কারণেই তাঁর প্রত্যেকটি সৈন্য সুলতান মুহাম্মাদ খানকে নিজেদের স্নেহময় পিতা বলেই মনে করত। তারা যেকোন মুহূর্তে তাঁর জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে মোটেই দ্বিধান্বিত ছিল না।

সুলতান মুহাম্মাদ খানের দেহাকৃতি ছিল মাঝামাঝি ধরনের এবং রং ছিল কটা। তাঁর চেহারায় সাধারণভাবে উদাস উদাস ভাব পরিলক্ষিত হতো। রাগান্বিত হলে তাঁকে অত্যন্ত ভয়ংকর দেখাত। তাঁর কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিশ্বস্ততা ও ন্যায়নিষ্ঠার বিরোধী কোন আচরণ করলে তিনি তাকে শিক্ষামূলক শাস্তি প্রদান করতেন। অপরাধীদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। ফলে তাঁর অধিকৃত সাম্রাজ্যে চুরি,ডাকাতি ও রাহাজানির নাম-নিশানাও ছিল না। এত বিরাট একটি সাম্রাজ্যকে ফিতনা, ফাসাদ, বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখা দিগ্বিজয়ী সুলতান মুহাম্মাদ খানের প্রশাসনিক যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতারই প্রমাণ বহন করে। আর সবচেয়ে বেশি বিস্ময় লাগে, যখন জানা যায় যে, যুদ্ধক্ষেত্রের এই সুযোগ্য সেনাপতি কাব্যচর্চায়ও পারদর্শী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় অনায়াসে উচ্চাঙ্গের কবিতা রচনা করতে পারতেন।

একবিংশ অধ্যায়

সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যুর পর গৃহযুদ্ধ এবং জামশীদের বিস্ময়কর কাহিনী

সুলতান মুহাম্মাদ খান মৃত্যুকালে বায়াযীদ ও জামশীদ নামীয় দুই পুত্র রেখে যান। বায়াযীদ এশিয়া মাইনর প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। তিনি আমাসিয়া নামক স্থানে অবস্থান করতেন। আর জামশীদ ছিলেন কারিমিয়া প্রদেশের গভর্নর। সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যুকালে বায়াযীদের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর এবং জামশীদের বয়স ছিল বাইশ বছর। বায়াযীদের মেযাজ ছিল কিছুটা ভারী ও ঢিলেঢালা। অপর দিকে জামশীদ ছিলেন অত্যন্ত চালাক, কর্মঠ এবং পরিশ্রমী। সুলতানের মৃত্যুর সময় উভয় শাহযাদার কেউই কনসটান্টিনোপলে উপস্থিত ছিলেন না। সুলতান মুহাম্মাদ খান কারিমিয়া বিজয়ী ও আপন প্রধানমন্ত্রী আহমদ কায়দূককে ইতালী অভিযানে পাঠাবার পূর্বে সেনাপতি পদে নিয়োগ করে তার স্থলে মুহাম্মাদ পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ পাশা সুলতান মুহাম্মাদ খানের পর শাহযাদা জামশীদকে সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি সুলতানের মৃত্যু-সংবাদ গোপন রাখার চেষ্টা করেন এবং জামশীদের কাছে সংবাদ পাঠান ঃ তুমি শীঘ্রই কনসটান্টিনোপল চলে আস। কিন্তু এই সংবাদ গোপন থাকে নি। উৎসর্গীকৃত প্রাণ সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ করে প্রধানমন্ত্রী পাশাকে হত্যা করে এবং তার স্থলে ইসহাক পাশাকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসায়। তারা বায়াযীদের কাছে সংবাদ পাঠায়—সুলতান মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তুমি অবিলম্বে কনসটান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হও। এই নেগচারী তথা উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সৈন্যরা যথেচ্ছাচারিতার পথ বেছে নিয়ে কনসটান্টিনোপলে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তারা বণিক এবং সম্পদশালী লোকদের কাছ থেকে জবরদস্তিমূলক অর্থ আদায় করে এবং সবগুলো সরকারী দফতর নিজেদের কব্জায় নিয়ে যায়। এদিকে সেনাপতি আহমদ কায়দূক ইতালীর উট্রান্টো শহর দখল করে পরবর্তী বসন্ত মওসুমে রোমের উপর আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি উট্রান্টোকে সবদিক দিয়ে প্রাচীর বেষ্টিত ও সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন, যাতে পরবর্তী যুদ্ধাভিযান চলাকালে এই শহরটি একটি পৃথক ও সুদৃঢ় কেন্দ্রের কাজ দেয়। আহমদ কায়দূক সুলতানের মৃত্যু সংবাদ শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উট্রান্টোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে আপন অধীনস্থ একজন অধিনায়ককে সেখানকার শাসনকর্তা ও প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করে স্বয়ং কনসটান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নতুন সুলতানের খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর সামনে ইতালীর বিজয় অভিযান সম্পর্কিত তথ্যাদি তুলে ধরা এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে পুনরায় উট্রান্টোয় প্রত্যাবর্তন করা অথবা স্বয়ং সুলতানকে ইতালীতে নিয়ে আসা। সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যু সংবাদ বায়াযীদ পূর্বেই আমাসিয়াহ থেকে জানতে পেরেছিলেন। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি

সেখান থেকে চার হাজার সৈন্য নিয়ে দৈনিক দু-তিন মনযিল পথ অতিক্রম করে দ্রুত কনসটান্টিনোপল এসে পৌঁছেন। তিনি এখানে পৌঁছেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু নেগচারী বাহিনী তাঁর সামনেই নিজেদের শক্তির মহড়া চালায়। তাদের অধিনায়করা নতুন সুলতানের কাছে দাবি জানায় ঃ আমাদের বেতন-ভাতা এবং জায়গীরের পরিমাণ বৃদ্ধি করুন, আমাদেরকে বেশি করে উপহার-উপঢৌকন দিন, অন্যথায় আমরা আপনাকে হত্যা করে ফেলব। বায়াযীদ নেগচারী বাহিনীর এই স্বেচ্ছাচারিতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে এই নতুন রীতি প্রবর্তন করেন যে, যখনই কোন নতুন সুলতান সিংহাসন আরোহণ করবেন তখনি সেনাবাহিনীকে উপহার-উপঢৌকন প্রদান বাবদ শাহী কোষাগার থেকে একটি বিরাট অংকের অর্থ বরাদ্দ করা হবে। বায়াযীদের এই প্রথম দুর্বলতা একথাই প্রমাণ করে যে তিনি তাঁর পিতার মত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দৃঢ়চিত্তের অধিকারী কোন সুলতান নন। কিন্তু যেহেতু তিনি তার ভাই জামশীদের চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী ইসহাক পাশা এবং নেগচারী বাহিনীও তাঁকে সমর্থন করেছিল, তাই রাজকীয় কর্মকর্তারা একথা জানা সত্ত্বেও যে, তিনি দৃঢ়চিত্তের অধিকারী কোন সুলতান নন, তবুও তাঁর বিরুদ্ধাচরণের সাহস পায়নি। কিছুদিন পরই প্রধানমন্ত্রী আহমদ কায়দূকও ইতালী থেকে কনসটান্টিনোপলে এসে পৌঁছেন। যেহেতু তার প্রতিদ্বন্দ্বী আহমদ পাশা (প্রধানমন্ত্রী) বায়াযীদের বিরুদ্ধে এবং জামশীদের পক্ষে ছিলেন তাই আহমদ কায়দূকও কোনরূপ ইতস্তত না করে বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর হাতে বায়আত করেন।

জামশীদের কাছে তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ কিছুটা দেরিতে পৌঁছে। যখন তিনি এই সংবাদ পান তখন বায়াযীদ (দ্বিতীয়) কনসটান্টিনোপলে এসে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। তাই তিনি কনসটান্টিনোপলে না এসে এশিয়া মাইনরের শহরসমূহ দখল করতে শুরু করেন। বারূসা শহরের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তিনি আপন ভাই বায়াযীদকে লিখেন ঃ পিতা সুলতান মুহাম্মাদ খান আপনাকে তাঁর 'অলীআহদ' নিয়োগ করে যান নি। অতএব আপনি একাকী সমগ্র সালতানাতের মালিক ও শাসক হতে পারেন না। এটাই সমীচীন যে, এশিয়া অঞ্চল আমার অধীনে থাক এবং আপনি ইউরোপীয় অঞ্চল শাসন করুন। বায়াযীদ জামশীদের এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং উত্তরে বলেন, একটি খাপে দু'টি তরবারি থাকতে পারে না। কনসটান্টিনোপলে সুলতান মুহাম্মাদ খানের বোন তথা বায়াযীদ ও জামশীদের ফুফু অবস্থান করছিলেন। তিনি আপন ভাতিজা সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর কাছে গিয়ে বলেন ঃ তোমরা দুই ভাই পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়বে, এটা তোমাদের কারো জন্যই মঙ্গলজনক নয়। অতএব তোমার উচিত, জামশীদের হাতে এশিয়া মাইনরের সমগ্র এলাকা সমর্পণ করা। কিন্তু বায়াযীদ ফুফুর কথায় খুব একটা গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তবে এই মর্মে একটি প্রস্তাব দেন যে, জামশীদ যদি তার পরিবার-পরিজন নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে বসবাস করতে রাযী থাকে তাহলে আমি তাঁকে ক্রিমিয়া প্রদেশের আয়ের একটি অংশ তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য নিয়মিত প্রদান করবো। মোটকথা শেষ পর্যন্ত দুই ভাইয়ের মধ্যে কোন আপোস-মীমাংসা হয়নি। জামশীদ একথা ভালভাবে জানতেন যে, যদি তিনি সিংহাসন লাভ করতে না পারেন তাহলে বায়াযীদ তাকে জীবিত ছাড়বেন না। অতএব তিনি নিজের প্রাণ

রক্ষার খাতিরেই বায়াযীদের মুকাবিলায় দাঁড়ান এবং এজন্য সবরকমের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এদিকে সুলতান বায়াযীদ আপন সেনাপতি আহমদ কায়দূকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান এবং জামশীদের মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। ৮৮৬ হিজরী মুতাবিক ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে জুন উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে জামশীদের বাহিনীর বেশির ভাগ অধিনায়ক নিজ নিজ অধীনস্থ বাহিনীসহ বায়াযীদের পক্ষে চলে আসে। তাই জামশীদকে বাধ্য হয়েই বায়াযীদের কাছে পরাজয়বরণ করতে হয়।

এদিকে দুই ভাই এশিয়া মাইনর পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন আর অপরদিকে রোমের পোপ যিনি ইতিমধ্যে রোম থেকে পলায়নের সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিলেন, সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যু সংবাদ শুনে রোমেই থেকে যান এবং সমগ্র খ্রিস্টান জগতের ক্রুসেড যোদ্ধাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান ঃ তোমরা ইতালীকে বাঁচাও এবং এই সুযোগকে (সুলতানের মৃত্যু পরবর্তী বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে) কাজে লাগিয়ে অট্রান্টো থেকে তুর্কীদের বের করে দাও। পোপের এই আহ্বান খ্রিস্টান জগতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া পর্যন্ত প্রায় সবদেশের খ্রিস্টানরা একজোট হয়ে অট্রান্টো অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং তা অবরোধ করে ফেলে। এশিয়া মাইনরে যখন বায়াযীদ ও জামশীদের বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠিক তখনি খ্রিস্টানরা অট্রান্টো মুসলিম বাহিনী কনসটান্টিনোপল থেকে কোন সামরিক সাহায্য পায়নি। এতদসত্ত্বেও তুর্কীরা খুব দৃঢ়তার সাথে খ্রিস্টানদের মুকাবিলা করে। কিন্তু পরে যখন তারা কনসটান্টিনোপলের দিক থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে তখন খ্রিস্টানদের কাছে এই মর্মে প্রস্তাব পাঠায়, "যেহেতু প্রতিরোধের পরিপূর্ণ ক্ষমতা আমাদের রয়েছে, অতএব আমাদেরকে পরাজিত করা তোমাদের জন্য সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু দীর্ঘদিন যুদ্ধে লিপ্ত থেকে রক্তারক্তি করার ইচ্ছা আমাদের আর নেই। অতএব তোমরা যদি সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে এই শহরটি নিয়ে নিতে চাও তাহলে আমরা তা তোমাদের হাতে সমর্পণ করতে রাযী আছি। কিন্তু এই শর্তে যে, তোমরা আমাদেরকে সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে কনসটান্টিনোপলের দিকে চলে যাবার অনুমতি দেবে। খ্রিস্টানরা সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব মেনে নেয় এবং উল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে একটি সন্ধিপত্র লিখে তুর্কী অধিনায়কের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ফলে উসমানীয় বাহিনীর প্রতিটি সদস্য আপন জানমালের নিরাপত্তা লাভ করে। এভাবে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তুর্কীরা শহরের দরজা খুলে দেয় এবং খ্রিস্টানদের হাতে শহরের অধিকার অর্পণ করে সেখান থেকে যাবার প্রস্তুতি নিতে থাকে। কিন্তু খ্রিস্টান অধনায়করা বিশ্বাসঘাতকতা করে উসমানীয় বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে তাদেরকে হত্যা করতে শুরু করে। এবার শহরের প্রতিটি গলি এক একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানরা প্রায় সমগ্র তুর্কী সৈন্যকে হত্যা করে এবং অট্রান্টোর অলিগলি তুর্কীদের রক্তে লালে লাল হয়ে ওঠে।

বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর সিংহাসনে আরোহণের পর পরই উসমানীয় সাম্রাজ্যের যে মারাত্মক ক্ষতি হয় তা এই যে, দীর্ঘদিন অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে উসমানীয়রা ইতালী জয়ের যে দরজাটি উন্মুক্ত করে নিয়েছিল তা পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়, তাদের অগ্রাভিযানের কারণে

রোমের গির্জায় যে চরম হতাশা বিরাজ করছিল তা দূরীভূত হয়,— সর্বোপরি স্পেনের মুসলমানদের কাছে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে সামরিক সাহায্য পৌঁছার যে সম্ভাবনা ছিল তা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে। এমনকি, আহমদ কায়দূক খ্রিস্টানদের হাতে নির্মমভাবে নিহত আপন সৈন্যদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বায়াযীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইতালী অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার মত অবসরই পান নি।

জামশীদ আপন ভাইয়ের কাছে পরাজিত হওয়ার পর এশিয়া মাইনরে অবস্থান করাটা নিজের জন্য মোটেই নিরাপদ মনে করেননি। নিজের সঙ্গীদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করার পর কোন তুর্কী অধিনায়ক বা সুবেদারের উপর তিনি আর ভরসা করতে পারছিলেন না। তিনি তাঁর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আপাতত নিজের আত্মরক্ষা এবং ভবিষ্যতে প্রতিপক্ষের যথাযথ মুকাবিলার জন্য একমাত্র মিসর সাম্রাজ্যের উপরই ভরসা করা যেতে পারে। তখন মিসরে ছিল মামলূকীদের হুকুমত। সেখানকার বাদশাহ ছিলেন আবূ সাঈদ কায়িদ বেগ। যেহেতু মিসরে তখন আব্বাসীয় খলীফাও থাকতেন। তাই ইসলামী বিশ্ব স্বাভাবিকভাবেই মিসর সাম্রাজ্যকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখত। বায়াযীদের কাছে পরাজিত হয়ে জামশীদ মাত্র কয়েকজন আস্থাভাজন সঙ্গী, আপন মা এবং স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি তখনো উসমানীয় সাম্রাজ্যের চৌহদ্দি থেকে বের হতেই পারেন নি, এমনি সময়ে জনৈক তুর্কী অধিনায়ক আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের যাবতীয় মালপত্র ছিনিয়ে নিয়ে যায়। জামশীদ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে যতশীঘ্র সম্ভব উসমানীয় সাম্রাজ্য থেকে বের হয়ে যান। এদিকে ঐ তুর্কী অধিনায়ক জামশীদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত মালপত্রাদিসহ কনসটান্টিনোপলে গিয়ে বায়াযীদের সাথে দেখা করে। তার ধারণা ছিল, জামশীদকে হয়রানি করার কারণে বায়াযীদ তার উপর খুব সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু সে যখন বায়াযীদের সামনে উক্ত মালপত্র পেশ করে তখন বায়াযীদ একটি পরাজিত ও পর্যুদস্ত কাফেলার উপর লুটপাট চালানোর অপরাধে ঐ অধিনায়ককে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। মিসরের চারকাসী সুলতান যখন জামশীদের আগমন সংবাদ পান তখন তিনি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং অন্যান্য বাদশাহের ন্যায় একজন রাজকীয় মেহমান হিসাবে মিসরে দিন কাটান। এরপর হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে তিনি বায়তুল্লাহ্ অভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কায় হজ্জ পালন এবং মদীনাতুর রাসূল (সা)-এর পবিত্র মাযার যিয়ারত করে তিনি পুনরায় মিসরে ফিরে আসেন। ঐ সময়ে বায়াযীদ এবং মিসর সম্রাটের মধ্যে পত্রালাপ অব্যাহত ছিল। মিসর সম্রাট আপন সম্মানিত মেহমান শাহযাদা জামশীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মোটেই রাযী হননি বরং তিনি জামশীদকে তাঁর এই বিপদকালে সাহায্য প্রদান করাকেই নিজের একটি নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন। জামশীদ মক্কা থেকে মিসরে ফিরে গিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে দেন। মিসর তাঁকে সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। মোটামুটিভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের পর জামশীদ বায়াযীদের সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অবশ্য তিনি তার মা ও স্ত্রীকে মিসরেই রেখে যান। তিনি ফিলিস্তীন ও সিরিয়া হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করেন। বায়াযীদ এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপন অভিজ্ঞ সেনাপতি

আহমদ কায়দূককে সঙ্গে নিয়ে জামশীদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয় এবং এবারও জামশীদ পরাজিত হন। এটা হচ্ছে হিজরী ৮৮৭ সন, মুতাবিক ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের ঘটনা। এশিয়া মাইনরের কিছু সংখ্যক অধিনায়কের কারণে এবারও জামশীদকে পরাজিত হতে হয়। ঐ সমস্ত লোক বায়াযীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জামশীদকে মিসর থেকে ডেকে এনেছিল এবং তাঁর বাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেও এসেছিল। কিন্তু ঠিক যুদ্ধ চলাকালে তারা জামশীদকে ছেড়ে বায়াযীদের বাহিনীতে গিয়ে যোগ দেয়। ফলে জামশীদের বাকি সৈন্যদের মধ্যেও হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই পরাজিত হতে হয়। এবার পরাজয়ের পর জামশীদ মিসরের দিকে ফিরে যেতে লজ্জাবোধ করেন। এমন কি তিনি বলেন ঃ এই অবস্থায় আমি আমার স্ত্রী, মা বিশেষ করে মিসরের সুলতানকে মুখ দেখাতে পারবো না। অথচ তিনি যদি মিসরে চলে যেতেন তাহলে নিশ্চিতভাবে কিছুদিন পরই এমন অবস্থার সৃষ্টি হতো যে, উসমানীয় সাম্রাজ্যের সামরিক অধিনায়করা সর্বসম্মতিক্রমে তাকে মিসর থেকে কনসটান্টিনোপলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন এবং তাকেই সিংহাসনে বসাতেন। কিন্তু ভাগ্যের লিখন ছিল অন্যরকম। তাই জামশীদ মিসরের পরিবর্তে উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অংশে গিয়ে সেখানকার অধিনায়কবৃন্দ এবং সেই সাথে খ্রিস্টান সম্রাটদের সাহায্য নিয়ে বায়াযীদের মুকাবিলা করার সংকল্প নেন। এই পরাজয়ের পর জামশীদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছিল। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে এবার মাত্র ত্রিশ-চল্লিশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই তিনি চাচ্ছিলেন, কিছুদিন কোথাও বিশ্রাম নিয়ে নিজের অবস্থাকে সুসংহত করতে। এজন্য মিসরই ছিল উপযুক্ত স্থান। কেননা মিসর সম্রাট তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য দানে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু জামশীদ মিসরের দিকে না তাকিয়ে রোডসের খ্রিস্টান পার্লামেন্টকে লিখলেন ঃ

তোমরা কি আমাকে এই অনুমতি দেবে যে, আমি তোমাদের দ্বীপে কিছুদিন অবস্থান করব ? এরপর গ্রীক ও আলবেনিয়ার দিকে চলে যাব এবং নিজের সাম্রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাব। এই পয়গাম পাওয়ার সাথে সাথে রোডসের শাসকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। তারা জামশীদের এই সংকল্পকে কেন্দ্র করে একটি প্রতারণামূলক পরিকল্পনাও তৈরি করে নেয়। এটা সম্ভব ছিল যে, জামশীদ রোডস যাত্রার ব্যাপারে এত তাড়াহুড়া না করে কিছুদিন সিরিয়ায়ই অবস্থান করতেন এবং পূর্বাপর বিষয়টি আরো গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখতেন। ইত্যবসরে মিসর সম্রাট নিশ্চয়ই তাঁকে মিসরে ফিরে যাবার আহ্বান জানাতেন এবং আপন মা ও স্ত্রীর ভালবাসা নিশ্চয়ই তাঁকে সে আহ্বানে সাড়া দিতে বাধ্য করত। যাহোক উক্ত পয়গাম পেয়েই রোডস পার্লামেন্টের সভাপতি ডি. আবসান জামশীদকে লিখেন— আমরা আপনাকেই উসমানীয় সাম্রাজ্যের সুলতান বলে স্বীকার করি। যদি আপনি আমাদের এখানে আসেন তাহলে আমরা এটাকে নিজের জন্য একটি গর্বের বিষয় বলেই মনে করবো। আমি আপনাকে পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনি অবশ্যই রোডসে পদার্পণ করে আমাদেরকে ধন্য করুন। আমরা আমাদের সমগ্র শক্তি আপনার সেবা ও সাহায্যার্থে উৎসর্গ করলাম। আপনার যা কিছু প্রয়োজন তার সবই আমরা এখান থেকে সংগ্রহ করে দেব। এই

উত্তর পেয়ে তো জামশীদ আর ইতস্তত করতে পারেন না। সুতরাং তিনি মাত্র ত্রিশজন লোককে সঙ্গে নিয়ে রোডস অভিমুখে যাত্রা করেন। দ্বীপ-উপকূলে অবতরণ করার পর তিনি দেখতে পান যে, সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য একদল লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তারা অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাঁকে সেখান থেকে রাজধানীতে পৌঁছিয়ে দেয়। ডি. আবসান তথা ডাবসন, যিনি পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট ছিলেন একদল সেনাবাহিনী নিয়ে সেখানে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং একজন রাজকীয় মেহমান হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই শাহযাদা জামশীদ বুঝতে পারেন যে, তিনি সেখানে মেহমান নন বরং একজন বন্দী। সর্বপ্রথম ডাবসন জামশীদের কাছ থেকে এই মর্মে একটি প্রতিশ্রুতি পত্র লিখিয়ে নেন যে, যদি তিনি (জামশীদ) উসমানীয় সাম্রাজ্যের সুলতান হন তাহলে নাইটস্ সম্প্রদায় তথা রোডসের শাসকদেরকে সবরকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবেন। এরপর ডি. আবসান সুলতান বায়াযীদের কাছে লিখেন ঃ জামশীদ তো আমাদের কবজায় রয়েছে। যদি আপনি আমাদের সাথে সদ্ভাব রাখতে চান তাহলে আমাদেরকে আপনার সবগুলো বন্দরে যাতায়াত এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য করার স্বাধীনতা দিন এবং আমাদেরকে সব রকমের কর হতে অব্যাহতি দিন। এরপর আপনার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী আমাদের কাছে কোন রকমের কর বা মাশুল দাবি করতে পারবে না। আর হ্যাঁ, জামশীদকে বন্দী করে রাখার খরচাদি বাবদ আপনি অবশ্যই আমাদের কাছে বার্ষিক পঁয়তাল্লিশ হাজার করে উসমানী মুদ্রা পাঠাবেন। যদি আপনি এই সমস্ত শর্ত না মানেন তাহলে আমরা জামশীদকে মুক্ত করে দেব, যাতে সে আপনার কাছে থেকে উসমানীয় সিংহাসন ছিনিয়ে নেবার প্রচেষ্টা চালায়।

বায়াযীদ বিনা দ্বিধায় ডি. আবসানের সবগুলো শর্তই মেনে নেন। তিনি পঁয়তাল্লিশ হাজার ডাকেট (তিন লক্ষ টাকার বেশি) প্রতি বছর রোডসবাসীদের কাছে পাঠাতে থাকেন। এদিকে ডি. আবসান মিসরে জামশীদের দুঃখিনী মায়ের কাছে পয়গাম পাঠান ঃ যদি তুমি বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা করে আমাদের কাছে পাঠাতে থাক তাহলে আমরা তোমার পুত্র জামশীদকে বায়াযীদের হাতে তুলে দেব না, বরং তাঁকে পূর্ণ নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবো। অন্যথায় সুলতান বায়াযীদ আমাদেরকে এর চাইতেও অধিক অর্থ দিতে চাচ্ছেন। অতএব আপনি আমাদের শর্ত না মানলে আমরা জামশীদকে বায়াযীদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হব, যাতে তিনি তাকে হত্যা করে সুলতানের ব্যাপারে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারেন। এই পয়গাম পাওয়ার সাথে সাথে জামশীদের মা যে করে হোক দেড় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে ডি. আবসানের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তাকে লিখেন ঃ আমি সর্বদা এই পরিমাণ অর্থ পাঠাতে থাকবো। মোটকথা, রোডসবাসীরা জামশীদকে তাদের বহুমুখী মুনাফা অর্জনের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যমে পরিণত করে। এ ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় নিতে তাদের বিবেকে মোটেই বাঁধেনি। পরবর্তী সময়ে রোডসবাসীদের অন্তরে এই চিন্তার উদয় হয় যে, জামশীদকে হস্তগত করার জন্য সুলতান বায়াযীদ বা মিসর সম্রাট যে কোন সময়ে আমাদের দেশের উপর আক্রমণ চালাতে পারেন। সত্যি যদি তাই হয় তাহলে আমাদের মুনাফা অর্জনের মাধ্যম তথা জামশীদ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। অতএব তাকে রোডসে

রাখা ঠিক হবে না। এইসব ভেবে-চিন্তে তারা জামশীদকে ফ্রান্স সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী নাইস শহরে পাঠিয়ে দেয় এবং তাকে দেখাশুনার জন্য একদল পাহারাদার নিয়োগ করে। এরপর তারা জামশীদকে নাইস থেকে অন্যান্য শহরে স্থানান্তরিত করতে থাকে এবং এই সময়ে শাহযাদার সঙ্গীদেরকে একের পর এক তার থেকে পৃথক করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত জামশীদ একেবারে সঙ্গীহারা হয়ে যান। একটি শহরে যখন জামশীদকে রাখা হয় তখন ঘটনাক্রমে সেখানকার শাসনকর্তার কন্যা ফিল্‌পাইন হানলিয়া তার প্রেমে পড়ে। কিছুদিন পর ঐ শহর থেকেও তাকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়, যে ঘরটি তারই জন্য ফ্রান্সের সম্রাট বিশেষভাবে তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। হাবভাব দেখে মনে হলো এবার বুঝি শাহযাদা ফ্রান্সের সম্রাটের কবজায় চলে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তখন এমন একটি মহামূল্যবান বস্তুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন, যার উপর প্রতিটি লোক আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইত। যে ঘরটিতে শাহযাদাকে আটকে রাখা হয় তা ছিল বহুতল বিশিষ্ট। নীচের ও উপরের তলায় নিরাপত্তা ও চৌকিদাররা থাকত। আর মধ্যতলায় রাখা হতো শাহযাদাকে। ইত্যবসরে ফ্রান্সের সম্রাট রোমের পোপ এবং অন্যান্য খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহ ডি. আবসানের সাথে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেন। তাদের প্রত্যেকেই শাহযাদা জামশীদকে নিজেরই কবজায় নিয়ে যাবার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালান। শাহযাদা যেন একটি নিলামী বস্তুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে লক্ষ্য করে প্রত্যেকটি লোক যেন এক একটি প্রতিযোগিতামূলক দর হেঁকে যাচ্ছিল। ডি. আবসান যেহেতু শাহযাদার মাধ্যমে বিশেষভাবে লাভবান হচ্ছিলেন তাই তিনি শাহযাদাকে নিজের কবজায় রাখার গুরুত্ব খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু সবাইকে তো বিগড়ানো চলে না। অতএব তিনি এক্ষেত্রেও একটি কূটকৌশল অবলম্বন করে। কারো পত্রেরই কোন স্পষ্ট জবাব না দিয়ে অন্য কথায় জামশীদকে কারো হাতে তুলে দেবেন, কি দেবেন না সে ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু না বলে তিনি একটার পর একটা শর্ত আরোপের মাধ্যমে কালক্ষেপণ করতে থাকেন। হিজরী ৮৯৫ সন (১৪৯০ খ্রি) পর্যন্ত শাহযাদা জামশীদ ফ্রান্সে নজরবন্দী থাকেন এবং তাকে উপলক্ষ করে রোডসবাসীরা সুলতান বায়াযীদের কাছ থেকে যথারীতি অর্থ আদায় করতে থাকে। যখন ডি. আবসানের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মালো যে, খ্রিস্টান সম্রাটগণ বিশেষ করে ফ্রান্সের সম্রাট জামশীদকে পুরোপুরি নিজেরই কবজায় নিয়ে যাবেন (যেহেতু জামশীদ সেখানেই অবস্থান করছেন) তখন তিনি তাকে নিজেরই কাছে নিয়ে আসার কৌশল অবলম্বন করেন। অপর দিকে তিনি জামশীদের মাকে লিখেন ঃ যদি তুমি ভ্রমণ-খরচা বাবদ আমার কাছে দেড় লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দাও তাহলে আমি তোমার পুত্রকে ফ্রান্স থেকে ফেরত এনে তোমার কাছে মিসরে পাঠিয়ে দেব। অসহায় মা সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত অর্থ পাঠিয়ে দেন। এবার ডি. আবসান তার লোকদের কাছে লিখলেন, যেন তারা জামশীদকে এখনি ফ্রান্স থেকে ইতালীতে নিয়ে আসে। ফ্রান্সের সম্রাট চার্লস সপ্তম যখন এ বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি জামশীদকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করে বলেন, আমি জামশীদকে কখনো আমার প্রাসাদের চৌহদ্দি থেকে বের হতে দেব না। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা-তদবীরের পর চার্লস এই শর্তে জামশীদকে ইতালী যাবার অনুমতি দেন যে, পোপ তার কাছে দশ হাজার

টাকা জামানতস্বরূপ রাখবেন। এরপর যদি তার অনুমতি ছাড়া জামশীদকে ইতালী থেকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে এই দশ হাজার টাকা আপনা-আপনি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। এদিকে পোপ রোডসের শাসকদের কাছেও একটি জামানত রাখেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, জামশীদের মাধ্যমে রোডস সরকার যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে তা যদি জামশীদের ইতালী আসার কারণে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে স্বয়ং পোপ সে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন।

যা হোক, হিজরী ৮৯৫ সনে (১৪৯০ খ্রি) শাহযাদা জামশীদ রোম নগরীতে প্রবেশ করেন। এখানে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং শাহী মহলেই তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। ফরাসী রাষ্ট্রদূত শাহযাদার সাথে ছিলেন। যখন ফরাসী রাষ্ট্রদূত ও শাহযাদা পোপের সাথে দেখা করতে যান তখন ফরাসী রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য খ্রিস্টান সর্দারের ন্যায় মাথা নুইয়ে পোপের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দরবারের কর্মকর্তারা শাহযাদাকে বার বার আহ্বান জানান। কিন্তু দিগ্বিজয়ী সুলতান মুহাম্মাদ খানের পুত্র শাহযাদা জামশীদ তাদের সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বিজয়ী সুলভ ভঙ্গিতে মাথা উঁচু রেখেই সোজা পোপের কাছে গিয়ে বসেন এবং অত্যন্ত নির্ভীকচিত্তে তার সাথে কথা বলতে শুরু করেন। এক ফাঁকে তিনি তাকে বলেন, আমি আপনার সাথে নির্জনে কিছু কথা বলতে চাই। পোপ তাতে সম্মত হন। তিনি নির্জনে পোপের কাছে খ্রিস্টান সর্দারদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও বর্বর আচরণের একটি ফিরিস্তি দেন। তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে আপন দুঃখের কাহিনী এবং মা ও স্ত্রীর বিরহ ব্যথার একটি করুণ দৃশ্য পোপের সামনে তুলে ধরেন। এই সমস্ত হৃদয় বিদারক কাহিনী পোপকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে এবং তার চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। তবে তিনি কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে সহানুভূতির সুরেই শাহযাদাকে বলেন, এখন মিসরে যাওয়া তোমার জন্য লাভজনক হবে না এবং তুমি তোমার পিতার সিংহাসনও উদ্ধার করতে পারবে না। তোমাকে হাঙ্গেরী সম্রাটও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যদি তুমি সে অনুযায়ী হাঙ্গেরীতে চলে যাও তাহলে অতি সহজেই তোমার লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। আর এই মুহূর্তে তোমার জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক হবে দীন ইসলাম ছেড়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করা। কেননা এরূপ করলে সমগ্র ইউরোপ তোমার পক্ষে দাঁড়াবে এবং তুমি অতি সহজেই কনসটান্টিনোপলের সিংহাসন দখল করে নিতে পারবে। পোপ একথা বলার সাথে সাথে জামশীদ তাকে বাধা দিয়ে বলেন ঃ শুধু উসমানীয় সাম্রাজ্য কেন, সমগ্র বিশ্বের সাম্রাজ্যও যদি আমার পদচুম্বন করে তাহলেও আমি আপনার এই প্রস্তাবে লাথি মারব। আমি দীন ইসলাম ত্যাগ করার কথা চিন্তাও করতে পারি না। পোপ শাহযাদার একথা শুনে তার কথার প্রসঙ্গ বদলে ফেলেন এবং সাধারণভাবে কিছুটা সহানুভূতি দেখিয়ে জামশীদকে সেদিনকার মত আপন দরবার থেকে বিদায় দেন। শাহযাদা ফ্রান্সে যেমন ছিলেন, এখানেও (রোমেও) তেমনি বন্দী জীবনযাপন করতে থাকেন। জামশীদ রোমে এসেছেন শুনে মিসর সম্রাট রোমে নিজের একজন দূত পাঠান। তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, এখন জামশীদকে রোম থেকে মিসরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। সেজন্য জামশীদকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্যই তিনি ঐ দূতকে রোমে পাঠিয়েছিলেন। এদিকে সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়) যখন শুনতে পেলেন যে, জামশীদ ইতালীতে এসেছেন তখন তিনি অনেক উপহার

উপঢৌকনসহ নিজের একজন দূতকে পোপের কাছে প্রেরণ করেন, যাতে সে পূর্বাপর বিষয়টি পোপের সাথেই মীমাংসা করে নিতে পারেন। কেননা পোপ সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা ছিল যে, তিনি (পোপ) নিজের ইচ্ছানুযায়ী জামশীদকে যেখানে ইচ্ছা পাঠাতে পারেন।

তাছাড়া রোড্সবাসীদের ইচ্ছা পূরণ করা পোপের জন্য জরুরী নয়। মিসরের সম্রাটের দূত রোমে প্রবেশ করে প্রথমে জামশীদকে অনুসন্ধান করে এবং যখন তার সামনে গিয়ে পৌঁছে তখন তার প্রতি ঠিক সেরূপ সম্মানই প্রদর্শন করে যেরূপ কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের প্রতি করা হয়। ঐ দূত জামশীদকে এও বলে যে, ডি. আবসান কিছু পরিমাণ অর্থ আপনার মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছেন, যাতে আপনি তা খরচ করে ইতালী থেকে মিসরে গিয়ে পৌঁছতে পারেন। একথা শুনে জামশীদ ঐ দূতসহ পোপের খিদমতে গিয়ে হাযির হন এবং তার কাছে এই প্রতারণার সুবিচার প্রার্থনা করেন। পোপ সামান্য কিছু অর্থ ডি. আবসানের উকিলের কাছ থেকে নিয়ে জামশীদকে দিয়ে এখানেই ঐ কাহিনীর ইতি টানেন। শেষ পর্যন্ত মিসরের দূত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মিসরে ফিরে যায়। বায়াযীদের দূত পোপের সাথে সাক্ষাত করে প্রায় সেই পরিমাণ অর্থ দিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি করে ফেলে, যে পরিমাণ অর্থ বায়াযীদ ডি. আবিসানকে প্রদান করতেন। এরপর এদিক থেকে মোটামুটি আশ্বস্ত হয়ে বায়াযীদের দূত কনসটান্টিনোপলে ফিরে যায়। এবার পোপ জামশীদের দেখাশুনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং রোমেই বন্দী অবস্থায় জামশীদ তাঁর দিনগুলো অতিবাহিত করতে থাকেন। এর তিন বছর পর পোপ (যার নাম ছিল শানিয়ূস) মারা যান এবং আলেকজাণ্ডার নামীয় জনৈক পুরোহিত তার স্থলাভিষিক্ত হন। এই নতুন পোপ দুষ্টামির ক্ষেত্রে পূর্বেকার পোপের চাইতেও অগ্রণী ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই সুলতান বায়াযীদের দরবারে দূত পাঠিয়ে একটি পয়গাম পাঠান। তাতে তিনি বলেন ঃ চল্লিশ হাজার ডাকেট, যা পূর্ব থেকে নির্ধারিত আছে, তা আপনি আমার কাছে নিয়মিত পাঠাতে থাকুন। আর হ্যাঁ, অতিরিক্ত তিন লাখ ডাকেটও যদি একই কিস্তিতে পাঠিয়ে দেন তাহলে আমি চিরদিনের জন্য জামশীদের আশংকা থেকে আপনাকে রেহাই দিতে পারি অর্থাৎ তাকে হত্যা করে ফেলতে পারি। পোপ আলেকজাণ্ডারের ঐ দূতের নাম ছিল জর্জ। সে কনসটান্টিনোপলের রাজ দরবারে হাযির হয়ে এমন যোগ্যতার সাথে ও এমন সুন্দরভাবে আপন বক্তব্য পেশ করে যে, সুলতান বায়াযীদ তাতে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং পোপের কাছে এই মর্মে সুপারিশ করেন যে, আপনি এই সুযোগ্য দূতকে আপনার সহকারী পদে নিয়োগ করুন। পোপের দূত তখনো কনসটান্টিনোপলেই ছিল, এমনি সময়ে অর্থাৎ হিজরী ৯০১ সনে (১৪৯৫-৯৬ খ্রি) ফ্রান্স সম্রাট চার্লস (সপ্তম) ইতালী আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের কারণ এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, ফ্রান্স সম্রাট শাহযাদা জামশীদকে এই নতুন পোপের কাছ থেকে নিজের কাছেই নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। সপ্তম চার্লসের ইতালী আক্রমণের সাথে সাথে পোপ আলেকজান্ডার রোম থেকে পালিয়ে গিয়ে সেন্ট এঞ্জেলো দুর্গে আশ্রয় নেন। যাওয়ার সময় তিনি শাহযাদা জামশীদের মত অতি মূল্যবান সম্পদটিও সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলেন নি। এগারো দিন পর পোপ এবং ফ্রান্স সম্রাটের মধ্যে একটি আপোসচুক্তি সম্পাদনের শর্তাদি নিরূপণের জন্য এক বৈঠক বসে। তখন

সর্বপ্রথম যে শর্তটি চার্লস পেশ করেন তা হলো, শাহযাদা জামশীদ আমার কবজায় থাকবেন। শেষ পর্যন্ত পোপ, চার্লস এবং জামশীদ এই তিন ব্যক্তি একটি একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। তখন পোপ জামশীদকে সম্বোধন করে বলেন ঃ শাহযাদা, আপনি কি এখানে থাকতে চান, না ফ্রান্স সম্রাটের কাছে? তখন জামশীদ বলেন, আমি তো এখন শাহযাদা নই, বরং একজন বন্দী মাত্র। আপনারা আমাকে যেখানে চান সেখানেই রাখুন। এ ব্যাপারে আমার বলার কিছুই নেই। যা হোক শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স-সম্রাট জামশীদকে নেপলসে এনে রাখেন এবং সেখানে তাঁকে দেখাশুনার জন্য জনৈক সরদারের নেতৃত্বে একদল পাহারাদার নিয়োগ করেন। এখন থেকে জামশীদকে উপলক্ষ করে বায়াযীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের যে পরিকল্পনা পোপ করেছিলেন তা মাঠে মারা যায়। অথচ সুলতান বায়াযীদ তাকে তিন লক্ষ ডাকেট প্রদান করতে ইতিমধ্যে তৈরিই হয়ে গিয়েছিলেন এবং পোপের দূতের সাথে বিষয়টির একটি নিষ্পত্তিও হয়ে গিয়েছিল। পোপ যেহেতু অত্যন্ত অর্থলোভী ছিলেন তাই তিনি সুলতান বায়াযীদকে লিখেন ঃ জামশীদ যদিও এখান থেকে চলে গেছেন, তবু আমি যে করে হোক তাকে খতম করে আপনার কাছ থেকে সে অর্থ অবশ্যই লাভ করবো, যার প্রতিশ্রুতি আপনি আমাকে দিয়েছেন। এরপর পোপ আলেকজাণ্ডার এই কাজের জন্য একজন গ্রীক নাপিতকে মনোনীত করেন। ইতিপূর্বে ঐ গ্রীক নাপিত ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তখন তার নাম রাখা হয়েছিল মুস্তাফা। পরবর্তী সময়ে সে মুরতাদ হয়ে যায় এবং ইতালীতে এসে বসবাস করতে থাকে। সে আপন পেশার সুবাদেই পোপের সংসর্গে আসার সুযোগ পায়। যাহোক পোপ ঐ নাপিতকে নেপলসে পাঠান এবং তার সাথে একটি বিষের বড়ি দিয়ে বলেন, তুমি যে করে হোক, জামশীদকে এটা খাওয়াবার ব্যবস্থা করবে। ঐ বিষের প্রভাব এরূপ ছিল যে, তা খেলে কোন মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত না, বরং একটার পর একটা অসুখে ভুগতে থাকত এবং কোন ওষুধেই কাজ দিত না। ফলে কিছুদিন পরই সে মারা যেত। নাপিতটি নেপলসে যায় এবং নিজের পেশার সুবাদে আস্তে আস্তে শাহযাদা জামশীদের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়। শাহযাদার মত একজন ভদ্র কয়েদীর কাছে নাপিতকে একাকী যেতে রক্ষীরা কোন আপত্তি করত না। কেননা এর দিক থেকে তো আশংকার কোন কারণ ছিল না এবং থাকতেও পারে না। শেষ পর্যন্ত নাপিত কোন এক সুযোগে জামশীদকে বিষের বড়িটি খাইয়ে দেয়। ফলে শাহযাদা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং ক্রমে ক্রমে দেহের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তখন তিনি তার মায়ের কাছ থেকে একটি পত্র পান। কিন্তু সে পত্রটি খুলে পড়ার মত শক্তিও তাঁর দেহে ছিল না। তখন আপনা-আপনি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ঃ প্রভো, যদি এই কাফিররা আমাকে উপলক্ষ করে মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় তাহলে আমাকে এখনি উঠিয়ে নিন এবং মুসলমানদেরকে এই ক্ষতি থেকে বাঁচান। নাপিতটি যদিও অজ্ঞাত পন্থায় শাহযাদাকে বিষ খাইয়েছিল, কিন্তু সে এটাকে যথেষ্ট মনে না করে ঐ বিষে সিক্ত ক্ষুর দ্বারা জামশীদের মাথাও কামিয়ে দিয়েছিল। যার ফলে জামশীদের চামড়ার মধ্যেও বিষক্রিয়া দেখা দেয়।

যাহোক, যেদিন জামশীদ উপরোক্ত দু'আ করেন সেদিনই তাঁর প্রাণপাখী দেহ ছেড়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। এটা হচ্ছে হিজরী ৯০১ সনের (১৪৯৫-৯৬ খ্রি) ঘটনা। জামশীদ মোট তের

বছর খ্রিস্টানদের বন্দীশালায় অমানষিক নির্যাতন ভোগ করে ছত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বায়াযীদের আবেদনক্রমে খ্রিস্টানরা তাঁর লাশটি বায়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং বায়াযীদ সেটিকে বারসায় দাফন করেন। সুলতান বায়াযীদ আপন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পোপ ইস্কান্দয়ের প্রাপ্যও পরিশোধ করে দেন। তিনি মুস্তাফা নামীয় ঐ নাপিতকেও নিজের কাছে ডেকে পাঠান এবং উপহার স্বরূপ তাকে নিজের মন্ত্রী পদ দান করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যে বায়াযীদ তাঁর প্রাথমিক দিনগুলোতে একজন তুর্কী অধিনায়ককে হত্যা করেছিলেন এই অপরাধে যে, সে পথিমধ্যে জামশীদের মালপত্র লুটপাট করেছিল,— সেই বায়াযীদই বারো-তের বছর একজন নাপিতকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করেন এই প্রেক্ষাপটে যে, সে জামশীদকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল এবং ঐ তুর্কী অধিনায়কের অনুপাতে অনেক গুণ বেশি অপরাধ করেছিল। উসমানীয় সুলতানদের আলোচনা প্রসংগে শাহযাদা জামশীদের ঐ হৃদয়বিদারক কাহিনী এখানে সবিস্তারে এজন্য তুলে ধরা হলো, যাতে পাঠক ঐ যুগের খ্রিস্টান সম্রাটদের চরিত্র সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারেন। ঐ খ্রিস্টান শাসকরা কিভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সুলতান জামশীদকে নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিভাবে তাঁকে উপলক্ষ করে নানা ধরনের ফায়দা লুটেছিলেন, কিভাবে তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন এবং নিজেদের উপর থেকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিজয় অভিযান ঠেকাবার জন্য তারা শাহযাদা জামশীদকে 'টাই' বানিয়ে কিভাবে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চক্রান্ত করেছিলেন পাঠক ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন।

সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়)

সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়) তাঁর পিতা সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-এর মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৮৮৬ হিজরীতে ((১৪৮১ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করে হিজরী ৯১৮ সন (১৫১২ খ্রি) পর্যন্ত মোট বত্রিশ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পর পরই তাঁকে আপন ভাই জামশীদের মুকাবিলায় নামতে হয়। তাদের মধ্যে দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং উভয় যুদ্ধেই বায়াযীদ জয়লাভ করেন। কিন্তু তাঁর এই বিজয় উসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। জামশীদ খ্রিস্টানদের হাতে বন্দী হওয়ার কারণে বায়াযীদ (দ্বিতীয়) ইতালী ও রোডসের উপর হামলা চালানোর সাহস পাননি। এদিকে মিসরের মামলূকী সাম্রাজ্যের সাথে তাঁর সম্বন্ধ তিক্ত হয়ে ওঠে। শাহযাদা জামশীদ যেহেতু প্রথমে মিসরেই আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং জামশীদের পরিবার ও সঙ্গী-সাথীরা যেহেতু মিসরেই বিদ্যমান ছিলেন তাই মামলূকী সুলতানরা এশিয়া মাইনর দক্ষিণ ও পূর্বাংশে অনবরত আক্রমণ চালাতে থাকে এবং ৮৯০ হিজরীতে (১৪৮৫ খ্রি) বায়াযীদের বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সীমান্তবর্তী বেশ কিছু জায়গা দখল করে নেয়। মামলূকীদের হাতে বার বার পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বায়াযীদ তাদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন। সন্ধির শর্তানুযায়ী এ পর্যন্ত মামলূকীরা যে সমস্ত শহর দখল করেছিল সেগুলো তাদেরই অধীনে দিয়ে দেওয়া হয়। তবে তারা এই মর্মে স্বীকৃতি প্রদান করে যে, এই নব অধিকৃত এলাকাসমূহের সমগ্র আয় শুধু মক্কা-মদীনার সেবা কার্যে ব্যয় করা হবে। বায়াযীদের প্রধানমন্ত্রী

অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আপনার স্থল ও নৌবাহিনী দিয়ে সাহায্য করুন। বায়াযীদ তখন ইচ্ছা করলে স্পেনের মুসলমানদের আবেদন অনুযায়ী তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি শুধু এই আশংকায় যে, হয়ত এই সুযোগে পোপ ও অন্যান্য খ্রিস্টান সম্রাট জামশীদকে মুক্ত করে দিয়ে তার মুকাবিলায় পাঠিয়ে দিবে। আপন দায়িত্ব পালনে বায়াযীদের এই অবহেলা প্রদর্শন আক্ষেপজনক ছিল বটে; তবে একথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ক্ষুদ্রাকার হলেও তিনি তার নৌসেনাধ্যক্ষ কামালের নেতৃত্বে একটি নৌবহর স্পেন অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। এই নৌবহর স্পেন উপকূলে পৌঁছে খ্রিস্টানদের কম-বেশি ক্ষতিসাধন করেছিল বটে, কিন্তু এমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে নি যার দ্বারা স্পেনের মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে কিছুটা উপকৃত হতে পারত। যখন শাহযাদা জামশীদকে খতম করে দেওয়া হলো এবং তার দিক থেকে বায়াযীদের আর কোন আশংকা বাকি থাকল না তখন তিনি ঐ সমস্ত দ্বীপ ও উপকূলীয় এলাকা অধিকার করার প্রচেষ্টা চালান, যা গ্রীক ও ইতালীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভেনিসের দখলে ছিল। অতএব ভেনিসের সাথে তার নৌযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। হিজরী ৯০৫ সনে (১৪৯৯-১৫০০ খ্রি) তুর্কী নৌবহর ভেনিসের নৌবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এবং যে সমস্ত দ্বীপ ভেনিসের দখলে ছিল তার সবগুলোই ছিনিয়ে নিয়ে আসে। হিজরী ৯০৬ (১৫০০-০১ খ্রি) সনে ভেনিস, রোমের পোপ এবং স্পেন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত নৌবহর উসমানীয় নৌবহরের সাথে মুকাবিলা করে। ঐ সমস্ত খ্রিস্টান শক্তি ক্রমোন্নতিশীল তুর্কী তথা উসমানীয় নৌশক্তিকে বিধ্বস্ত করে রোম সাগর থেকে তার প্রভাব চিরদিনের জন্য খতম করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর সলাপরামর্শ করে সম্মিলিতভাবে ঐ যুদ্ধে নেমেছিল। তুর্কী নৌবহরের অধিনায়ক ছিলেন কামাল। তিনি প্রথমে বায়াযীদের ক্রীতদাস ছিলেন। যা হোক কামাল ঐ যুদ্ধে এমনি অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন যে, সম্মিলিত খ্রিস্টান নৌবহরের অনেক জাহাজ ডুবিয়ে দেন এবং কিছু জাহাজ আটকও করেন। বাকি জাহাজগুলো পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই নৌ অভিযানের ফলে কামাল খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেন এবং রোম সাগরে তুর্কী নৌবহরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তুর্কী নৌবহরের এই বিরাট বিজয় লাভের কয়েক বছর পূর্বেই অর্থাৎ হিজরী ৮৯৭ সনে (১৪৯২ খ্রি) স্পেন থেকে ইসলামী সাম্রাজ্যের নাম-নিশানা মুছে গিয়েছিল। হাঙ্গেরী এবং পোল্যান্ডবাসীদের সাথেও বায়াযীদের কয়েকটি যুদ্ধ হয়। কিন্তু সেগুলো খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। তবে হ্যাঁ, ঐ সমস্ত যুদ্ধের কারণেই পোল্যান্ডবাসীরা সুলতানের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। তাছাড়া পোল্যান্ডের সীমান্তবর্তী কিছু শহরও তুর্কীদের দখলে এসেগিয়েছিল। যেহেতু সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়) স্বভাবত আপোসকামী ছিলেন তাই তাঁর আমলে উসমানী সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি বা আয়তন ততটা বৃদ্ধি পায়নি। সুলতান মুহাম্মাদ খানের যুগে খ্রিস্টানদের মনে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভয়ভীতি এমনভাবে ঢুকে পড়েছিল যে, তারা বায়াযীদের এই আপোসমূলক আচরণকে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক বলে মনে করে। কেননা নিজেদের দিক থেকে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহস তারা তখনো সঞ্চয় করতে পারেনি। সুলতান বায়াযীদকে আমরা খুব একটা দোষারোপও করতে পারি না।

অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আপনার স্থল ও নৌবাহিনী দিয়ে সাহায্য করুন। বায়াযীদ তখন ইচ্ছা করলে স্পেনের মুসলমানদের আবেদন অনুযায়ী তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি শুধু এই আশংকায় যে, হয়ত এই সুযোগে পোপ ও অন্যান্য খ্রিস্টান সম্রাট জামশীদকে মুক্ত করে দিয়ে তার মুকাবিলায় পাঠিয়ে দিবে। আপন দায়িত্ব পালনে বায়াযীদের এই অবহেলা প্রদর্শন আক্ষেপজনক ছিল বটে; তবে একথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ক্ষুদ্রাকার হলেও তিনি তার নৌসেনাধ্যক্ষ কামালের নেতৃত্বে একটি নৌবহর স্পেন অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। এই নৌবহর স্পেন উপকূলে পৌঁছে খ্রিস্টানদের কম-বেশি ক্ষতিসাধন করেছিল বটে, কিন্তু এমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে নি যার দ্বারা স্পেনের মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে কিছুটা উপকৃত হতে পারত। যখন শাহযাদা জামশীদকে খতম করে দেওয়া হলো এবং তার দিক থেকে বায়াযীদের আর কোন আশংকা বাকি থাকল না তখন তিনি ঐ সমস্ত দ্বীপ ও উপকূলীয় এলাকা অধিকার করার প্রচেষ্টা চালান, যা গ্রীক ও ইতালীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভেনিসের দখলে ছিল। অতএব ভেনিসের সাথে তার নৌযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। হিজরী ৯০৫ সনে (১৪৯৯-১৫০০ খ্রি) তুর্কী নৌবহর ভেনিসের নৌবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এবং যে সমস্ত দ্বীপ ভেনিসের দখলে ছিল তার সবগুলোই ছিনিয়ে নিয়ে আসে। হিজরী ৯০৬ (১৫০০-০১ খ্রি) সনে ভেনিস, রোমের পোপ এবং স্পেন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত নৌবহর উসমানীয় নৌবহরের সাথে মুকাবিলা করে। ঐ সমস্ত খ্রিস্টান শক্তি ক্রমোন্নতিশীল তুর্কী তথা উসমানীয় নৌশক্তিকে বিধ্বস্ত করে রোম সাগর থেকে তার প্রভাব চিরদিনের জন্য খতম করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর সলাপরামর্শ করে সম্মিলিতভাবে ঐ যুদ্ধে নেমেছিল। তুর্কী নৌবহরের অধিনায়ক ছিলেন কামাল। তিনি প্রথমে বায়াযীদের ক্রীতদাস ছিলেন। যা হোক কামাল ঐ যুদ্ধে এমনি অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন যে, সম্মিলিত খ্রিস্টান নৌবহরের অনেক জাহাজ ডুবিয়ে দেন এবং কিছু জাহাজ আটকও করেন। বাকি জাহাজগুলো পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই নৌ অভিযানের ফলে কামাল খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেন এবং রোম সাগরে তুর্কী নৌবহরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তুর্কী নৌবহরের এই বিরাট বিজয় লাভের কয়েক বছর পূর্বেই অর্থাৎ হিজরী ৮৯৭ সনে (১৪৯২ খ্রি) স্পেন থেকে ইসলামী সাম্রাজ্যের নাম-নিশানা মুছে গিয়েছিল। হাঙ্গেরী এবং পোল্যান্ডবাসীদের সাথেও বায়াযীদের কয়েকটি যুদ্ধ হয়। কিন্তু সেগুলো খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। তবে হ্যাঁ, ঐ সমস্ত যুদ্ধের কারণেই পোল্যান্ডবাসীরা সুলতানের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। তাছাড়া পোল্যান্ডের সীমান্তবর্তী কিছু শহরও তুর্কীদের দখলে এসেগিয়েছিল। যেহেতু সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়) স্বভাবত আপোসকামী ছিলেন তাই তাঁর আমলে উসমানী সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি বা আয়তন ততটা বৃদ্ধি পায়নি। সুলতান মুহাম্মাদ খানের যুগে খ্রিস্টানদের মনে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভয়ভীতি এমনভাবে ঢুকে পড়েছিল যে, তারা বায়াযীদের এই আপোসমূলক আচরণকে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক বলে মনে করে। কেননা নিজেদের দিক থেকে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহস তারা তখনো সঞ্চয় করতে পারেনি। সুলতান বায়াযীদকে আমরা খুব একটা দোষারোপও করতে পারি না।

কেননা তাঁর আমলে উসমানীয় সাম্রাজ্যের নৌশক্তি অনেক উন্নতি লাভ করেছিল এবং কিছু কিছু দ্বীপ ও উপকূলীয় এলাকা তিনি দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটাকে তাঁর স্থল বাহিনীর অকর্মণ্যতা ও বিফলতার 'কিছুটা ক্ষতিপূরণ' বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

যে বছর সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করেন সে বছরই মাওলানা আবদুর রহমান জামী তাঁর 'সিলসিলাতুয্ যাহ্ব' গ্রন্থটি প্রণয়ন করে সুলতান বায়াযীদের নামে তা উৎসর্গ করেন। মাওলানা জামী এই বাদশাহ্র যুগেই হিজরী ৮৯৮ সনের ১৮ই মুহাররম (৯ নভেম্বর ১৪৯২ খ্রি) ইন্তিকাল করেন। তাঁকে হিরাতে সমাধিস্থ করেন। ঐ বছরই কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। অথচ এর পূর্বেই স্পেনের মুসলমানরা আমেরিকায় পৌঁছে গিয়েছিল। এটাকে ভাগ্যেরই পরিহাস বলতে হবে যে, আজ কলম্বাসই আমেরিকা আবিষ্কারের যাবতীয় কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে বসেছেন। ৯০২ হিজরীতে (১৪৯৬-৯৭ খ্রি) বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর যুগে পর্তুগালের সম্রাট ভাস্কো ডা গামাকে তিনটি জাহাজ দিয়ে ভারত অনুসন্ধানের জন্য পাঠান। ভাস্কো ডা গামা ৯০৩ হিজরীর ২০শে রমযান (মে ১৪৯৮ খ্রি) মালাবার উপকূলের কান্দরীনা এলাকার কালিকটে এসে পৌঁছেন। এই সুলতানেরই শাসনামলে অর্থাৎ ৯০৬ হিজরীতে (১৫০০-০১ খ্রি) সাফাভী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইমাঈল সাফাভী চৌদ্দ বছর বয়সে ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। হিন্দুস্থানের সিকান্দার লোদী ছিলেন সুলতান বায়াযীদ খানের সমসাময়িক। কিন্তু সুলতান সিকান্দার লোদী বায়াযীদের তিন বছর পূর্বে অর্থাৎ ৯১৫ হিজরীতে (১৫০৯ খ্রি) ইনতিকাল করেন। ৯১৬ হিজরীর ২৯শে শাবান (ডিসেম্বর ১৫১০ খ্রি) তুর্কিস্তানের বাদশাহ শায়বানী খান ইরানের বাদশাহ্ ইসমাঈল সাফাভীর সাথে এক সংঘর্ষে মারা যান। আর এর এক মাস পর গুজরাটের বাদশাহ সুলতান মাহমূদ বেকর আহমদাবাদে মারা যান। সুলতান বায়াযীদ খান (দ্বিতীয়)-এর শাসনামল যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহল উদ্দীপক কোন ঘটনা ঘটেনি, তাই পাঠকদের আকৃষ্ট করার জন্য ঐ সমস্ত ঘটনা এখানে সংযোজিত করা হয়েছে, যা তাঁর সাম্রাজ্যে বা তার জীবনে না ঘটলেও তাঁরই শাসনামলে অন্যান্য দেশে বা অন্যান্য সাম্রাজ্যে ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর যুগের আর একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনা দ্বারা ঐ যুগের খ্রিস্টানদের নির্দয়তা ও কাপুরুষতার একটি পরিষ্কার ছবি ভেসে ওঠে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাঙ্গেরীর সাথেও বায়াযীদের বাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছিল। এই সংঘর্ষ চলাকালে সুলতান বায়াযীদের গাযী মুস্তাফা নামক জনৈক সেনানায়ক এবং তাঁর সহোদর হাঙ্গেরী বাহিনীর হাতে বন্দী হন। হাঙ্গেরীর সেনানায়ক এই দুই তুর্কী বীর যোদ্ধার সাথে যে অমানুষিক আচরণ করেছিলেন তা হলো, গাযী মুস্তাফার ভাইকে জীবন্ত অবস্থায়ই লোহার শিকে গেঁথে আগুনে কাবাবের ন্যায় ভাজা করে এবং এই কাজে অর্থাৎ আপন সহোদরকে ভাজা করার কাজে প্রত্যক্ষ সাহায্য করার জন্য গাযী মুস্তাফাকে বাধ্য করে। তারপর এক এক করে গাযী মুস্তাফার সবগুলো দাঁতই উপড়ে ফেলে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর নির্যাতন চালিয়ে শেষ পর্যন্ত ফিদিয়ার (মুক্তি মূল্যের) বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে দেয়। এর কয়েক বছর পর সেই হাঙ্গেরী সেনানায়কই গাযী মুস্তাফার হাতে বন্দী হয়। গাযী মুস্তাফা তাকে হত্যা করেন বটে,

কিন্তু তার উপর অন্য কোন ধরনের নির্যাতন চালান নি। এর দ্বারা অনায়াসে বোঝা যায়, খ্রিস্টানরা কি পরিমাণ নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয় ছিল, আর তুর্কীরা ছিল কি পরিমাণ ভদ্র ও উদার হৃদয়।

সুলতান বায়াযীদের শাসনামলের শেষ দিকে কিছুটা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোল দেখা দেয় এবং এটা দেখা দিয়েছিল 'অলীআহ্‌দী' (স্থলাভিষিক্ত মনোনয়ন)-কে কেন্দ্র করে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সুলতান বায়াযীদের ছিল আট পুত্র। তন্মধ্যে পাঁচজনই অল্প বয়সে মারা যায়। যে তিনজন যুবা বয়সে উপনীত হয় তাদের নাম ছিল আহমদ, কারকূদ এবং সালীম। কারকূদ ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ এবং সালীম সর্বকনিষ্ঠ। সুলতান বায়াযীদের ঝোঁক ছিল মধ্যম পুত্র আহমদের প্রতি। তিনি তাকেই 'অলীআহদ' করতে চাচ্ছিলেন। আহমদ, কারকূদ এবং তাদের পুত্ররা এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা বা কর্মকর্তা ছিলেন। তারাবুযূন্দ এলাকার শাসনক্ষমতা ছিল সালীমের হাতে। সালীম তাঁর অন্য দুই ভাইয়ের চাইতে অধিক সাহসী, কষ্ট-সহিষ্ণু ও ধীরস্থির স্বভাবের ছিলেন। তাঁর এই বীরত্ব ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার কারণে সমগ্র বাহিনী ও বাহিনী অধিনায়করা তাঁকে অন্য দুই ভাইয়ের উপর প্রাধান্য দিতেন। ইরানের সম্রাট ইসমাঈল সাফাভী ইরানের উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এশিয়া মাইনরের সর্বত্র শীআদেরকে দলে দলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, জনসাধারণকে শীআ মতবাদে দীক্ষিত করে তাদেরকে ইরান-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি-শীল করে তোলা। কিছুদিনের মধ্যেই এর যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা হলো, সুযোগ সন্ধানী লোকেরা ইরানের সম্রাটের দিক থেকে প্রশ্রয় পেয়ে এখানে-সেখানে ডাকাতি ও লুটপাট শুরু করে দেয়। এই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দূর করার জন্য কারকূদ ও আহমদ যারা এশিয়া মাইনরের বেশির ভাগ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন, নিজেদের সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেন।

দষ্কৃতিকারীদের সাথে তাদের বার বার সংঘর্ষ হয়। ক্রমে ক্রমে উসমানীয় সুলতানের অন্যমনস্কতা এবং শাহযাদাদের অকর্মণ্যতা ও ভ্রান্তনীতির সুযোগ গ্রহণ করে শাহকুলী নামক জনৈক ব্যক্তি এই সমস্ত ডাকাত ও বিদ্রোহীদের একত্রিত ও সংগঠিত করে একটি বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তোলে। শাহকুলী ছিল ইরান-সম্রাট ইসমাঈল সাফাভীর মুরীদ ও শুভাকাঙ্ক্ষী। সে উসমানীয় সাম্রাজ্য বিপন্ন করে তুলতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। শেষ পর্যন্ত এই বিশৃঙ্খলার সংবাদ যখন কনসটান্টিনোপলে গিয়ে পৌঁছল তখন সুলতান বায়াযীদ বাধ্য হয়ে এর প্রতিবিধানের জন্য আপন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী সেখানে পৌঁছে শ্রী মাশ্‌ক নামক স্থানে শাহকুলীর (যাকে তুর্কীরা শয়তান কুলী বলত) মুকাবিলা করেন। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে তুর্কী প্রধানমন্ত্রী এবং শাহকুলী উভয়েই নিহত হন। এটা হচ্ছে ৯১৭ হিজরীর (১৫১১ খ্রি) ঘটনা। কারকূদ ও আহমদের অধীনস্থ এলাকায় এই বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা অধিক মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

সালীম যে প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন সেই তারাবুযূন্দ প্রদেশে বিদ্রোহীরা বিশৃঙ্খলা ছড়াবার কোন সুযোগ পায়নি। এ থেকে সালীমের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ মিলে। সালীম আপন এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর বাহিনীতে বিপুল সংখ্যক সৈন্য ভর্তি

করে নিয়েছিলেন। যখন তিনি বিদ্রোহীদের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যান তখন তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে সারকিশিয়া এলাকার উপর হামলা চালান এবং বিজয় লাভ করেন। এই সংবাদ পেয়ে বায়াযীদ (দ্বিতীয়) কনসটান্টিনোপল থেকে সালীমের উপর একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তাতে বলা হয় তুমি অন্য এলাকায় হামলা চালিয়ে আপন হুকুমতের আয়তন বৃদ্ধি করতে পারবে না। সালীম উত্তরে লিখেন ঃ যদি এই দিকে আমাকে বিজয় অভিযান পরিচালনায় অনুমতি না দেন তাহলে অনুগ্রহপূর্বক এখান থেকে বদলী করে কোন ইউরোপীয় প্রদেশে পাঠিয়ে দিন যাতে আমি সেখানে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সুযোগ লাভ করতে পারি। যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পৃথক হয়ে চুপচাপ বসে থাকাকে আমি পছন্দ করি না। এটা হলো সেই মুহূর্ত যখন বায়াযীদ (দ্বিতীয়) আহমদকে আপন 'অলীআহদ' তথা স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুলতানের ঐ সংকল্পের কথা শুনে নেগচারী বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর অধিনায়কদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। তাদের কেউ কেউ কারকূদকে এ জন্য প্রাধান্য দেয়। কেননা তিনি হচ্ছেন সুলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র। কেউ কেউ সালীমকে অলীআহদীর যোগ্য মনে করে। কেননা তিনি একজন বীরপুরুষ ও দূরদর্শী। আহমদ ও কারকূদ যখন এই রশি টানাটানির ব্যাপারটি জানতে পারেন তখন তারা নিজেরা কিভাবে সিংহাসনটি করায়ত্ত করবেন সে চিন্তায় নিমগ্ন হন। এর ফলে দাঁড়ায় এই যে, এবার তিন ভাইই পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের শক্তি বর্ধনে এবং পরস্পর বিরোধিতায় নিমগ্ন হন।

এদিকে এশিয়া মাইনরে আহমদ সৈন্য সংগ্রহ করত কনসটান্টিনোপল দখল এবং সুলতান বায়াযীদকে সভাসদদের সাথে পরামর্শক্রমে এবং খোদ সালীমের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তাঁকে সুমাত্রা নামক একটি ইউরোপীয় প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। যেহেতু সিংহাসনকে কেন্দ্র করে সুলতান বায়াযীদের পুত্রদের মধ্যে ইতিমধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই সুলতান সালীমও এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকাকে সমীচীন মনে করেন নি। তিনি রাজকীয় কর্মকর্তা ও সামরিক অধিনায়কের ইংগিতে ইউরোপে প্রবেশ করে আড্রিয়ানোপল দখল করে নেন। সালীম আড্রিয়ানোপলে এসেছেন শুনে বায়াযীদ তার মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যখন সুলতান বায়াযীদ সালীমের মুখোমুখি হন তখন সালীমের পক্ষের অনেক সৈন্য তার পক্ষ ত্যাগ করে সুলতানের বাহিনীতে যোগ দেয়। অতএব বায়াযীদ অতি সহজেই সালীমকে পরাজিত করেন। সালীম কোন মতে প্রাণ বাঁচিয়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে পৌছেন এবং একটি জাহাজে করে আপন শ্বশুর ক্রিমিয়ার খানের কাছে চলে যান এবং সেখানে পৌছেই তাতারী ও তুর্কীদের নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

সুলতান বায়াযীদকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রস্তুতি নেন। সুলতান বায়াযীদ আপন কনিষ্ঠ পুত্র সালীমকে আড্রিয়ানোপল থেকে তাড়িয়ে কনসটান্টিনোপল এসে জানতে পারেন যে, আহমদ তাঁর উপর হামলা পরিচালনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই অবস্থা লক্ষ্য করে বায়াযীদ অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এতে রাজকীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে এই কানাঘুষা শুরু হয় যে, সুলতান প্রকৃতই সিংহাসনে টিকে থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। এবার রাজকীয় কর্মকর্তাদের পরামর্শ হোক কিংবা নিজে থেকেই হোক, বায়াযীদ সালীমের কাছে একটি পয়গাম পাঠান। তাতে তিনি বলেন, তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে কনসটান্টিনোপলে চলে আস এবং আহমদের

হামলা প্রতিরোধের জন্য সুলতানী বাহিনীতে যোগ দাও। সালীম এই পয়গাম পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তিন হাজার লোক সঙ্গে নিয়ে পাহাড়-প্রান্তরের অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করে (কৃষ্ণ) সাগরের তীর ধরে আড্রিয়ানোপলে পৌছেন। তারপর সেখান থেকে কনসটান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হন। সালীমের এভাবে পৌছার সংবাদ শুনে বায়াযীদ তাকে বলে পাঠান : এখন তোমার আসার আর প্রয়োজন নেই। তুমি যে পর্যন্ত এসেছ সেখান থেকে সোজা সুমাত্রা প্রদেশে ফিরে যাও। তোমাকে সেখানকারই শাসনকর্তা নিয়োগ করা হলো। এদিকে রাজকীয় কর্মকর্তা এবং সামরিক অধিনায়কদের কাছ থেকে সালীমের কাছে অপর একটি পয়গাম পৌছে। তাতে বলা হয় ঃ আপনি কখনো ফিরে যাবেন না,বরং সোজা কনসটান্টিনোপলে চলে আসুন। কেননা এর চাইতে ভাল সুযোগ আপনি কখনো পাবেন না। অতএব সালীম সোজা কনসটান্টিনোপল এসে পৌছেন। এখানে পৌছতেই তাঁকে সমগ্র প্রজা, রাজকীয় কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সামরিক অধিনায়কবৃন্দ সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং সুলতানী প্রাসাদের সিংহদ্বারে পৌছে সকলে সম্মিলিতভাবে বায়াযীদের কাছে একটি পয়গাম পাঠান। তাতে বলা হয়, আপনি সাধারণ দরবার আহ্বান করে আমাদের আবেদন শ্রবণ করুন। বায়াযীদ অনন্যোপায় হয়ে আম দরবার আহ্বান করেন। তখন রাজকীয় কর্মকর্তাবৃন্দ, উলামা, ফুকাহা ও সাধারণ প্রজাদের উকীলবৃন্দ সম্মিলিতভাবে নিবেদন করেন ঃ আমাদের সুলতান এখন বৃদ্ধ, দুর্বল এবং শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। এই প্রেক্ষিতে আমাদের সকলের ইচ্ছা এই যে, সুলতান আপন পুত্র সালীমের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করুন। বায়াযীদ এই আবেদন শ্রবণ করার সাথে সাথে নির্দ্বিধায় বলে উঠেন : আমি তোমাদের সকলের আবেদন মনজুর করে সালীমের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করলাম। এ কথা বলেই তিনি সিংহাসন থেকে নেমে আসেন। এবার সালীম দ্রুত আগে বেড়ে সুলতানের কাঁধে চুমো খান। বায়াযীদ তাঁকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে পালকীতে চড়ে রওয়ানা হন। সালীম পালকীর পায়া ধরে কিছুক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করেন। এবার বায়াযীদ তাঁর বাকি জীবন নির্জনে ও ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করার উদ্দেশ্যে কনসটান্টিনোপল ছেড়ে ডেমোটিকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সালীম শহরের সিংহদ্বার পর্যন্ত পিতার অনুগমন করেন এবং তাঁকে বিদায় জানিয়ে প্রাসাদে ফিরে এসে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বায়াযীদ ডেমোটিকা শহরে পৌছার আগেই মৃত্যুবরণ করেন। সুলতান বায়াযীদ মৃত্যুকালে তিন পুত্র ও নয় পৌত্র রেখে যান। সালীমের একমাত্র পুত্র সুলায়মান ছিল এই পৌত্রদের অন্যতম। বায়াযীদ ১৫১২ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল মুতাবিক ৯১০ হিজরীতে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং ১৫১২ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল মৃত্যুমুখে পতিত হন। এবার কনসটান্টিনোপলের সুলতানী সিংহাসনে আরোহণ করেন সুলতান সালীম ইব্ন বায়াযীদ (দ্বিতীয়)।

সুলতান সালীম উসমানী

সুলতান সালীম (সেনাবাহিনী ও প্রজাসাধারণের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী) কনসটান্টি-নোপলের উসমানী সিংহাসনে আরোহণ করার কারণে তাঁর দুই ভাই, যারা এশিয়া মাইনরে ক্ষমতাসীন ছিল, বিরোধিতার আর সাহস পাননি। তারা বাহ্যত সালীমকে সমর্থন এবং তাঁর

আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু আড়ালে আবডালে তাঁর বিরোধিতা তথা তাঁর সাথে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সালীমও তেমন বোকা ছিলেন না যে, আপন ভাইদের মনোবৃত্তি ও চিন্তাধারা আঁচ করতে পারেননি। তবে তিনি আগেভাগে তাদের বিরুদ্ধে কোন সামরিক ব্যবস্থা নেননি। এদিকে আহমদ আমাসায় নিজের সেনাবাহিনী ঢেলে সাজান এবং প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করে একটি বিরাট তহবিলও সংগ্রহ করেন। অপর দিকে তার পুত্র আলাউদ্দীন আপন পিতার ইঙ্গিতে বারুসায়ও একটি বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুলতান সালীম এই অবস্থা জানতে পেরে উল্লিখিত অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী নিয়ে বসফোরাস প্রণালী অতিক্রম করে এশিয়া মাইনরে উপনীত হন। সামুদ্রিক তীর ধরে কিছু সংখ্যক জাহাজও তাকে অনুসরণ করে। বারুসায় পৌঁছে তিনি আলাউদ্দীনকে পরাজিত ও বন্দী করে বারুসা দখল করে নেন এবং আলাউদ্দীন ও তার ভাইকে হত্যা করেন। এখানে আরো কয়েকজন শাহযাদা (সুলতান সালীমের ভাতিজা) অবস্থান করছিল। তিনি ওদেরকে বন্দী করে হত্যা করেন। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আহমদ তাঁর বাহিনী নিয়ে সালীমের মুকাবিলায় আসেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং আহমদ সালীমের কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। এই পরাজয়ের পর আহমদ আপন দুই পুত্রকে ইরানের বাদশাহ ইসমাঈল সাফাভীর কাছে পাঠিয়ে দেন যাতে তারা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে। তারপর নিজে এশিয়া মাইনরের এখানে-সেখানে উদভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করতে থাকেন। আহমদ এবং তাঁর পুত্রদের এই পরিণাম লক্ষ্য করে তার বড় ভাই কারকূদও, যিনি এশিয়া মাইনরের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, বেশ সতর্ক হয়ে যান। এদিকে সুলতান সালীমও আহমদকে পরাজিত করার পর দশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে কারকূদের উপর আকস্মিক হামলা চালান। এক মামুলী সংঘর্ষের পর কারকূদ বন্দী হন। সুলতান সালীম সিংহাসনের এ দাবিদারকে জীবন্ত রাখা সমীচীন মনে করেন নি। তাই তাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করে ফেলেন। কিন্তু আপন ভাইয়ের এই ধরনের মৃত্যুতে তিনি অন্তরে খুব আঘাত পান। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তিনি এমনভাবে শোকাভিভূত থাকেন যে, পানাহার পর্যন্ত করেন নি।

উসমানীয় শাহযাদাদের এভাবে নিহত হওয়ার কারণে লোকেরা তাদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে এবং সেই সুযোগে আহমদ একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে সালীমের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন ও বেশ কয়েকবার তাঁকে পরাজিত করেন। কিন্তু সালীম তো তাঁর ভাইদের মত এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। তিনি তাঁর বাহিনীতে নতুনভাবে সৈন্য ভর্তি করেন, নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিজয় লাভের সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করে আহমদের উপর জোর হামলা চালিয়ে তাঁকে বন্দী করেন। যে চূড়ান্ত যুদ্ধে আহমদ পরাজিত ও বন্দী হন তা সালীমের সিংহাসন-আরোহণের এক বছর পর অর্থাৎ ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল, মুতাবিক ৯১৯ হিজরীতে হয়। আহমদকেও বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়।

সুলতান সালীমের স্বভাব চরিত্র এবং কর্মপদ্ধতি দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর পিতার চাইতেও অধিকতর বীরত্বের অধিকারী এবং আপন পিতামহের ন্যায় একজন

দুঃসাহসী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বীর পুরুষ ছিলেন। খ্রিস্টান সম্রাটগণ প্রথম প্রথম একেবারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে যে, না জানি এই নতুন সুলতান আবার তাদের উপরও কোন বিপদ ডেকে নিয়ে আসেন। কিন্তু যখন তারা দেখলেন যে, সুলতান সালীম খ্রিস্টানদের অনুপাতে আপন স্বজাতি মুসলমানদের প্রতিই অধিক মনোযোগী, তখন তারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আপন সন্ধিচুক্তির শর্তাবলী পালন করে যেতে থাকেন। ফলে সুলতান সালীমের সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে কোনরূপ অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা আর দেখা দেয়নি। আপন ভাইদের প্রতিহত করার পর সুলতান সালীমকে ইরান সাম্রাজ্য এবং এশিয়া মাইনরের বিদ্রোহীদের প্রতি মনোনিবেশ করতে হয়। আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সুলতান সালীম যদি ইরান সাম্রাজ্যের প্রতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন না করতেন তাহলে উসমানীয় সাম্রাজ্য নির্ঘাত ধ্বংস হয়ে যেত। ইসমাঈল সাফাভী নিজেকে হযরত ইমাম জা'ফর সাদিকের বংশধর বলে পরিচয় দিতেন। তাই ইরানের জনসাধারণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল। সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনরে ইতিমধ্যে অনেক শীআ-সুন্নী দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষিতে সেখানেও শীআ মাযহাব গ্রহণের একটা পটভূমি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া অনেক শীআও ঐ সমস্ত দেশে বসবাস করত। ইসমাঈল সাফাভীর মাতামহী তারাবুযূন্দের খ্রিস্টান সম্রাটের কন্যা এবং হাসান তাভীলের স্ত্রী ছিলেন। তাই ইসমাঈল সাফাভীর আকঙ্ক্ষা ছিল, যেন তারাবুযূন্দ তারই অধিকারে চলে আসে। অথচ দীর্ঘদিন থেকে সেটা ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্যেরই একটি প্রদেশ। যেহেতু ইসমাঈল সাফাভী এই শীআ মাযহাবেরই বাহানায় একটি সাম্রাজ্যের অধিকারী হতে পেরেছিলেন এবং তিনি জানতেন, কিভাবে শীআরা বাগদান সাম্রাজ্যকে মুঘলদের মাধ্যমে ধ্বংস করিয়েছে, তাই তার মত একজন বিদ্যোৎসাহী ও পরাক্রমশালী বাদশাহর উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করাটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না। তিনি ইরানের সিংহাসন লাভ করার পর বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর শাসনামলে এশিয়া মাইনরের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং শীআ মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। বায়াযীদ এই সমস্ত অপতৎপরতা পুরোপুরি বন্ধ করতে পারেননি। তাঁর দুই পুত্রও, যারা এশিয়া মাইনরের শাসনকর্তা ছিলেন, এই গোপন প্রচারণায় যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে তা আদৌ বুঝে উঠতে পারেননি। কিন্তু সালীম তারাবুযূন্দের শাসনকর্তা থাকাকালে ইসমাঈল সাফাভীর এই সমস্ত অপতৎপরতার গূঢ় রহস্য খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাঁর অধীনস্থ প্রদেশে ইসমাঈল সাফাভীর ঐ সমস্ত অপতৎপরতা সফল হতে দেননি। ইসমাঈল সাফাভী সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর শাসনামলে কিছু সীমান্ত এলাকা নিজের দখলে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক কর্মকর্তারা যখন ঐ সমস্ত এলাকা ফেরত নিতে পারেনি তখন বায়াযীদও আর এ বিষয়টির উপর খুব একটা গুরুত্ব দেননি। যখন সুলতান সালীম আপন ভাই ও ভাতিজাদের সাথে এশিয়া মাইনরে যুদ্ধরত ছিলেন তখন শাহ ইসমাঈল সাফাভী অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে ঐ গৃহযুদ্ধের প্রতি তাকিয়েছিলেন। তিনি তখন সুলতান সালীমের বিরুদ্ধে আপন 'দাঈ' ও প্রচারকদের মাধ্যমে শাহযাদা আহমদকে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করেছিলেন। এ

কারণেই আহমদ সুলতান সালীমকে কয়েকবার পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবার সুলতান দেখলেন, সুলতান সাফাভীর কাছে শাহযাদা আহমদের পুত্র তথা তাঁর ভাতিজা মুরাদ অবস্থান করছে এবং ইসমাঈল মুরাদকে একটি বিরাট বাহিনী দিয়ে এশিয়া মাইনরে আক্রমণ পরিচালনা এবং স্বয়ং তার সাথে যোগ দিয়ে তাকে (মুরাদকে) কনসটান্টিনোপলের সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্র করছেন তখন তিনি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি আরো দেখলেন, এশিয়া মাইনরের গ্রাম শহর সর্বত্র শীআ ও সুন্নীদের মধ্যে অবিরাম ঝগড়া-বিবাদ চলছে, যার প্রধান হোতা হচ্ছেন ইসমাঈল সাফাভী। যা হোক তিনি (সালীম) আপন ভাইদের হত্যা করার পর কনসটান্টিনোপলে ফিরে সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা হলো, এশিয়া মাইনরে একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা বাহিনী গড়ে তোলেন এবং তাদেরকে ঐ সমস্ত লোকের একটি সঠিক ও পরিপূর্ণ তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দেন, যারা ইসমাঈল সাফাভীর প্রচারকদের খপ্পরে পড়ে নিজেদের পুরাতন আকীদা ত্যাগ করে শীআ মাযহাবের অনুসারী হয়ে পড়েছে, ইসমাঈল সাফাভীকে নিজেদের ধর্মগুরু বলে মানছে এবং তার জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে তৈরি হয়ে রয়েছে। অতি শীঘ্র এই তালিকা তৈরি করে যখন সুলতানের খিদমতে পেশ করা হয় তখন এ কথা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, এশিয়া মাইনরের সত্তর হাজার লোক রয়েছে, যারা ইসমাঈল সাফাভীর হামলা পরিচালনার সাথে সাথে উসমানীয় সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে মোটেই দ্বিধা করবে না। যখন সুলতান সালীম এই বিরাট ষড়যন্ত্র এবং এর ভয়ংকর পরিণতির কথা গভীরভাবে চিন্তা করেন তখন তাঁর পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে যায়। তবু তিনি নিজেকে সামলে নেন এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সাথে ঐ সমস্ত অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় তালিকাভুক্ত বিদ্রোহীদের সমসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন যেখানে তাদের প্রাধান্য রয়েছে। তিনি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিদ্রোহীদের এক একটি তালিকা দিয়ে তাঁর অধিনায়কদের নির্দেশ দেন : অমুক তারিখে প্রত্যেকটি বিদ্রোহীর জন্য এক একজন সৈন্য মোতায়েন কর এবং তাদেরকে বুঝিয়ে দাও, যেন তারা নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্রোহীকে অবশ্যই হত্যা করে। এ নির্দেশ পালন করা তাদের জন্য অপরিহার্য। এই সাথে তিনি তাঁর অধিনায়কদেরকে কঠোর নির্দেশ দেন যে, এ পরিকল্পনার কথা পূর্বাহ্নে প্রকাশিত হয়ে না পড়ে এবং সে দিকে সকলেই যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখে। শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর এ নির্দেশ পালন করা হয়। ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এশিয়া মাইনরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ জুড়ে চল্লিশ হাজারের মত বিদ্রোহীকে এমনভাবে হত্যা করা হয় যে, তা করতে গিয়ে কোন উসমানী সৈন্যের নিহত হওয়া দূরের কথা, তাদের কারো চোখেও একটি আঘাত পর্যন্ত লাগেনি। এতগুলো লোকের একই সময়ে এভাবে ধ্বংস হওয়াটা শীআদের জন্য ছিল একটি অতি ভয়ংকর ঘটনা। ঘটনার পর যে সমস্ত বিদ্রোহী অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল তারাও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বাতিল বিশ্বাস থেকে আপনা-আপনি তাওবা করে ফেলে। ইসমাঈল সাফাভীর ষড়যন্ত্রকে এভাবে ব্যর্থ করে দেওয়া সুলতান সালীমের জন্য ছিল একটি বিরাট বিজয়। ইসমাঈল সাফাভী এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন, কিন্তু বাহ্যত তিনি সালীমকে এ জন্য কোন দোষারোপ করেননি। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে

পারেননি। তাই সেনাবাহিনী ও রসদ সামগ্রী সংগ্রহের ব্যাপারে একটি সাধারণ নির্দেশ জারি করেন। তিনি ঘোষণা দেন, এখন এশিয়া মাইনরে আমাদের হামলা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শাহযাদা মুরাদ আহমদ উসমানীকে তার পৈতৃক সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া এবং সালীম উসমানীকে বন্দী করে পদচ্যুত করা। এই সংবাদ শুনে সালীম উসমানী একটি আম দরবার আহবান করে রাজকীয় কর্মকর্তা এবং সামরিক অধিনায়কদের সামনে ঘোষণা দেন ঃ আমরা ইরান আক্রমণ করতে চাই। অতএব সবাই তৈরি হয়ে যাও। ঐ সময়ে যেহেতু ইসমাঈল সাফাভীর শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি রূপকথায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং খোদ তুর্কী বাহিনী তার কাছে একদা পরাজয়বরণ করেছিল, তাছাড়া তুর্কিস্তানের বাদশাহ শায়বানী খানকে ইসমাঈল সাফাভীই হত্যা করেছিলেন, তাই উপস্থিত সবাই সালীমের ঐ ঘোষণাকে একটি মারাত্মক পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করে এবং সালীমের আহবানে কোনরূপ সাড়া না দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। সুলতান সালীম পর পর তিন বার ঐ একই ঘোষণা দেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই শ্রোতারা নীরব থাকে। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ নামক জনৈক দারওয়ান যে সুলতান সালীমের খিদমতে নিয়োজিত ছিল এবং তাঁর সামনেই হাযির ছিল, এই নীরবতা ভঙ্গ করে। সে আগে বেড়ে ঠিক সুলতান সালীমের সামনে গিয়ে হাঁটু গেঁড়ে দাঁড়ায় এবং অত্যন্ত শিষ্টতার সাথে নিবেদন করে ঃ আমি এবং আমার সঙ্গীরা সুলতানী পতাকা তলে ইরান সম্রাটের বিরুদ্ধে লড়ব এবং অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে হয় ইরানীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করব, নয়ত প্রাণ বিসর্জন দেব। সুলতান আবদুল্লাহর এই কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তৎক্ষণাৎ তাকে দারোয়ানের পদ থেকে একটি জেলার কালেক্টর পদে উন্নীত করেন। এতে অন্য অধিনায়কের মনেও সাহসের সঞ্চার হয় এবং তারাও যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে। শাহ ইসমাঈল সাফাভী এবং সুলতান সালীম উসমানীর যুদ্ধের বিবরণ পেশ করার পূর্বে ইসমাঈল সাফাভী কিভাবে একটি বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হচ্ছে।

ইসমাঈল সাফাভী

ইসমাঈল সাফাভীর বংশ তালিকা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ ইসমাঈল ইব্‌ন জুনায়দ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন খাজা আলী ইব্‌ন সদরুদ্দীন ইব্‌ন শায়খ সফীউদ্দীন ইব্‌ন জিবরাঈল। এই বংশে যিনি সর্বপ্রথম খ্যাতি লাভ করেন তিনি হচ্ছেন শায়খ সফীউদ্দীন। তিনি আরদাবীলে বসবাস করতেন এবং তাঁর পেশা ছিল পীর-মুরীদী। তাঁর নাম থেকেই এই বংশ সাফাভী বংশ নামে পরিচিত। যখন শায়খ সফীউদ্দীনের মৃত্যু হয় তখন তাঁর পুত্র সদরুদ্দীন পিতার 'খিরকা' (ফকীরী বেশ) পরিধান করেন। ফলে তাঁর পিতার মুরীদ ও ভক্তরা তাঁকেই পীর বলে মেনে নেয়। শায়খ সদরুদ্দীন ছিলেন বায়াযীদ ইয়ালদিরিম এবং তাইমূরের সমসাময়িক। তাইমূর হিজরী ৮০ সনে (৬৯৯ খ্রি) যখন সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিমকে পরাজিত ও বন্দী করেন তখন তার সাথে আরো অনেক তুর্কী সৈন্য বন্দী হয়। তাইমূর এই বিজয় লাভের পর যখন আরদাবীলে গিয়ে পৌঁছেন তখন ভক্তির সাথে হোক অথবা কূটনীতির কারণে হোক,

সদরুদ্দীনের খানকায় যান এবং শায়খকে বলেন, 'যদি আপনার কোন জিনিসের প্রয়োজন হয় কিংবা আমার মাধ্যমে কোন কাজ করাতে চান তাহলে বলুন, আমি অবশ্যই তা করে দেব।' তখন শায়খ সদরুদ্দীন বলেন, তুমি আংকারা যুদ্ধে যে সমস্ত তুর্কী সৈন্য বন্দী করেছ তাদেরকে মুক্ত করে দাও। ঐ তুর্কী বন্দীরা মুক্তি লাভ করার সাথে সাথে শায়খের অন্ধ ভক্তে পরিণত হয় এবং আরদাবীলেই বসবাস স্থাপন করে পীরের খিদমতে নিজেদের নিয়োজিত করে। শায়খ সদরুদ্দীন তাদের মুক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন বলেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তারা তারই সেবায় বাকি জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারপর সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে ঐ তুর্কিদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চললো। সেই সাথে শায়খ এবং শায়খের বংশধরদের সাথে তাদের ভক্তি ও আনুগত্যও বৃদ্ধি পেল। তাইমুরের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য আপন সন্তানদের মধ্যে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল। কাযভীন ও কৃষ্ণ-সাগরের মধ্যবর্তী এলাকা অর্থাৎ আযারবায়জানে, তাইমূরের মৃত্যুর পর পরই কারাকোয়ুনলূ নামক তুর্কমান গোত্র পুনরায় নিজেদের হুকুমত প্রতিষ্ঠা করল। এভাবে কুর্দিস্তান তথা ইরাকের উত্তরাঞ্চল আককোয়ুনলূ নামক অপর তুর্কমান গোত্রের অধীনে চলে গেল। আককোয়ুনলূ নামক তুর্কমান গোত্র তাইমুরের যুগ থেকেই কুর্দিস্তানের করদাতা শাসক ছিল। কারাকোয়ুনলূ গোত্রের সর্দার ইউসুফ তুর্কমান তাইমূরের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি তাইমূরের শাসনামলে মিসর প্রভৃতি অঞ্চলে পলায়নরত থাকেন। তাইমূরের মৃত্যুর পর পর তিনিও মিসর থেকে ফিরে এসে অতি সহজেই আযারবায়জানের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করে নেন। আরদাবীল ছিল আযারবায়জানের শাসনকর্তার অবস্থান স্থল। আর কুর্দিস্তানের রাজধানী ছিল দিয়ারেবকর। শায়খ সদরুদ্দীনের প্রপৌত্র ছিলেন শায়খ জুনায়দ। শায়খ জুনায়দের যুগে তাদের মুরীদের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পায় যে, তা লক্ষ্য করে নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার খাতিরে আযারবায়জানের তুর্কমান বাদশাহ জাহানশাহ ইব্‌ন কারা ইউসূফ শায়খ জুনায়দকে বলেন, আপনি অবিলম্বে আরদাবীল ছেড়ে চলে যান। এই হুকুম পালনার্থে শায়খ জুনায়দ আপন ভক্ত ও মুরীদদের নিয়ে, যারা প্রধানত ঐ তুর্কী বন্দীদেরই বংশধর ছিল, আরদাবীল থেকে বিদায় নিয়ে দিয়ারেবকর অভিমুখে যাত্রা করেন। তখন দিয়ারেবকর তথা কুর্দিস্তানের বাদশাহ ছিলেন হাসান তাভীল আককোয়ুনলূ। তিনি শায়খ জুনায়দের এভাবে আগমনের সংবাদ শুনে খুবই সন্তুষ্ট হন। তিনি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে শায়খকে অভ্যর্থনা জানান এবং সেখানে তাঁর ও তাঁর মুরীদদের বসবাসের সুব্যবস্থাও করে দেন।

কিছুদিন পর হাসান তাভীল শায়খ জুনায়দের সাথে আপন বোনের বিবাহ দেন। তখন আককোয়ুনলূ এবং কারাকোয়ুনলূ এই দুই তুর্কমান গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে শত্রুতা চলে আসছিল। যেহেতু শায়খ জুনায়দ নির্জনবাসী দরবেশ থেকে শাহীবংশের একজন নিকটাত্মীয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই সূত্র ধরে তাঁর ঘরে হুকুমতের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তাই তিনি আপন মুরীদদেরকে, যারা তুর্কী সৈন্যদের বংশধর ছিল, দরবেশ থেকে সিপাহীতে রূপান্তর করেন এবং তাদের দ্বারা একটি বাহিনী গঠন করে হাসান তাভীলের পরামর্শ অনুযায়ী আরদাবীলের সম্রাট, যিনি শায়খকে আরদাবীল থেকে বের করে দিয়েছিলেন, তাই এই

হামলাকে সাধারণভাবে তারই 'প্রতিশোধ' বলে মনে করা হলো এবং এই প্রেক্ষাপটে দরবেশের এই হামলা তার মুরীদ বা অন্যান্য লোকের চোখে খুব একটা বিস্ময়কর ঠেকল না। শায়খের বাহিনী গঠিত হয়েছিল নতুন লোকদের নিয়ে এবং বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে শায়খও ছিলেন একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাই জাহানশাহের সাথে মুকাবিলায় তিনি টিকতে পারেননি। তবে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি শেরওয়ান শাসকের ওপর চড়াও হয়। শেরওয়ানের শাসক ছিলেন জাহানশাহের মিত্র। শায়খকে শেরওয়ান শাহের কাছেও পরাজয়বরণ করতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি পালাবার ফিকিরে ছিলেন এমন সময় তার গায়ে একটি তীর বিদ্ধ হয় এবং তাতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন।

শায়খ জুনায়দের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হায়দার, যিনি সুলতান হাসান তাভীলের ভাগ্নে ছিলেন, পিতার গদীতে বসেন এবং একজন দরবেশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। হায়দার মাতার দিক থেকে শাহযাদা এবং পিতার দিক থেকে দরবেশ ছিলেন। তাই তাঁর মধ্যে আমীরী ফকিরী উভয় গুণেরই সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর খানকায় জুনায়দের চাইতেও অধিক লোকের আনাগোনা ছিল। শায়খ জুনায়দের মৃত্যুর পর আমীর হাসান তাভীল জাহানশাহের সাথে সাময়িকভাবে আপোস করে নেন এবং মির্যা আবূ সাঈদ তাইমূরীকে হত্যা করে খুরাসানকেও নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এর পরপরই তিনি জাহান শাহের কাছ থেকেও আযারবায়জান ছিনিয়ে নেন এবং সমগ্র ইরান সাম্রাজ্যের একজন প্রতাপশালী বাদশাহ হয়ে বসেন। তারপর তিনি আপন কন্যাকে আপন ভাগ্নে শায়ক হায়দারের সাথে বিবাহ দেন। ফলে শায়খ হায়দার ইরানের শাহানশাহের ভাগ্নে থেকে জামাইয়ে পরিণত হন। হাসান তাভীল তারাবুযুন্দের খ্রিস্টান সম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তারাবুযুন্দ সাম্রাজ্যের কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কনসটান্টিনোপল বিজেতা সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) হিজরী ৮৬৬ সনে (১৪৬১-৬২ খ্রি) এই সাম্রাজ্যটি জয় করে নিজের অধীনে নিয়ে গিয়েছিলেন। হাসান তাভীল তারাবুযুন্দের খ্রিস্টান স্ত্রীর গর্ভে ঐ কন্যাটি (শায়খ হায়দারের স্ত্রী) জন্মগ্রহণ করেছিল। তার নাম রাখা হয়েছিল পারসা এবং কারো কারো মতে শাহ বেগম। এই পারসা বেগমের গর্ভে শায়খ হায়দারের তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাদের নাম ছিল আলী, ইবরাহীম ও ইসমাঈল। হাসান তাভীল জীবিত থাকাকালে শায়খ হায়দার সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। কিন্তু হাসান তাভীলের মৃত্যুর পর যখন তার পুত্র আমীর ইয়াকূব ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন শায়খ হায়দার আপন শিষ্যদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন। অন্য লোকদেরকেও এই বাহিনীতে যোগদানের জন্য তিনি উৎসাহিত করেন, যাতে শেরওয়ানের শাহের উপর থেকে আপন পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। হাসান তাভীলের জীবনকালে শায়খ হায়দারের নীরবতা পালনের কারণ ছিল এই যে, শায়খ জুনায়দ নিহত হওয়ার পর হাসান তাভীল যেভাবে জাহান শাহের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন ঠিক সেভাবে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন শেরওয়ানের শাসকের সাথেও। শেরওয়ানের শাসক আবূ সাঈদ মির্যা তাইমূরীকে হত্যার ব্যাপারে হাসান তাভীলকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। তাই হাসান তাভীল জীবিত থাকা পর্যন্ত শেরওয়ানের বাদশাহর সাথে তাঁর সন্ধি অটুট থাকে। আর এ কারণেই শায়খ

হায়দার শেরওয়ান শাহের বিরুদ্ধে কোনরূপ তৎপরতা চালাবার সুযোগ পাননি। এবার শায়খ হায়দার শেরওয়ান আক্রমণ করে বসেন। শেরওয়ানে কয়েকশ' বছর ধরে একটি ইরানী বংশের হুকুমত চলে আসছিল। এই বংশের লোকেরা নিজেদেরকে বাহরাম চুবীনের বংশধর বলত। শেরওয়ানের বাদশাহর নাম ছিল ফাররুখ ইয়াসার। ফাররুখ ইয়াসার যখন শুনতে পান যে, শায়খ হায়দার আপন পিতার খুনের প্রতিশোধ নিতে আসছেন তখন তিনি মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। ৮৯৩ হিজরীতে (১৪৮৮ খ্রি) উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে শায়খ হায়দারও আপন পিতার ন্যায় লাঞ্ছিত অবস্থায় মারা যান। লোকেরা তাঁর লাশ আরদাবীলে নিয়ে গিয়ে দাফন করেন।

শায়খ হায়দারের মৃত্যুর পর তাঁর মুরীদরা তার পুত্র আলীকে নিজেদের পীর মনোনীত করে। আলী তখন যুবক। তার আশেপাশেও মুরীদদের ভিড় জমে ওঠে। আমীর ইয়াকূব, যিনি হাসান তাভীলের পর ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, যখন বুঝতে পারলেন যে, আলী ও তার পিতা ও পিতামহের ন্যায় শেরওয়ানের উপর হামলা চালাবার প্রস্তুতি নেবেন এবং এতে করে দেশের মধ্যে অযথা একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে (অথচ তিনি শেরওয়ানের শাহ ফাররুখ ইয়াসারের শাহে হাসান তাভীলের যুগে সম্পাদিত সন্ধিযুক্তি বহাল রাখাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করতেন) তখন তিনি আলী এবং তার ভাইদেরকে আসতাখার এলাকার একটি দুর্গে নজরবন্দী করে ফেলেন। এই তিন ভাই চার বছরের চাইতেও অধিককাল ঐ দুর্গে আটক থাকেন। যখন ইরানের শাসক আমীর ইয়াকূব বেগ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তার স্থলে তার পুত্র আলূন্দ বেগ সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন আলী আপন ভাইদের নিয়ে কয়েদখানা থেকে পলায়ন করেন এবং আরদাবীলে গিয়ে মুরীদদেরকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আলূন্দ বেগ এই সংবাদ শুনে এবং আলীর বিদ্রোহী তৎপরতা লক্ষ্য করে তাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। আলী ঐ বাহিনীর মুকাবিলা করেন এবং পিতা ও পিতামহের ন্যায় তিনিও পরাজিত ও নিহত হন।

আলীর দুই ভাই ইবরাহীম ও ইসমাঈল ছদ্মবেশ ধারণ করে আরদাবীল থেকে গীলানের দিকে পলায়ন করেন। গীলানে পৌঁছার পর ইবরাহীম মৃত্যুমুখে পতিত হন। এখন শুধু সর্বকনিষ্ঠ ভাই ইসমাঈলই জীবিত থাকেন। তখন তিনি ছিলেন একজন শিশু। আলূন্দ বেগ ইসমাঈলের বয়সের স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য করে তাকে তার অবস্থার উপরই ছেড়ে দেন। এবার ইসমাঈলের চারপাশেও তার বংশের বিশ্বস্ত মুরীদরা পুনরায় এসে ভিড় জমায়। হিজরী ৯০৬ (১৫০০-০১ খ্রি) পর্যন্ত যখন ইসমাঈলের বয়স ছিল চৌদ্দ বছর, তখন তিনি তার মুরীদদের নিয়ে, যারা সব সময় সশস্ত্র অবস্থায় তাকে ঘিরে রাখত, একটি সংগঠিত বাহিনী গড়ে তোলেন এবং ঐ বাহিনী নিয়ে তিনি অতর্কিতে শেরওয়ানের উপর হামলা চালান। ঘটনাচক্রে ঐ হামলায় শেরওয়ানের শাসক ফাররুখ ইয়াসার নিহত হন। ইসমাঈল এবং তার সঙ্গীদের সাহস এবার দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আলূন্দ বেগ যখন ইসমাঈলের এই বিজয় সংবাদ পান তখন একেবারে চমকে ওঠেন এবং ইসমাঈলের দিককার এই আশঙ্কা যত শীঘ্র সম্ভব দূর করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করে সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়েই

রওয়ানা হন। তখন আলূন্দ বেগের দিক থেকে একটি বিরাট ভুল হয়ে গিয়েছিল এই যে, তিনি ইসমাঈলের শক্তির পরিমাপ করে নিজের শক্তিকে সুসংগঠিত করার দিকে মোটেই দৃকপাত করেননি। তার এই তাড়াহুড়ার ফল এই দাঁড়ায় যে, ইসমাঈলের সাথে তার মুকাবিলা হয় এবং তাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। তারপর আককোয়ুনলূর মুরাদ বেগ নামক অপর একজন অধিনায়ক হামাদানের নিকটে ইসমাঈলের সাথে মুকাবিলা করেন এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এই অনবরত বিজয় লাভের ফলে সমগ্র ইরাক, ইরান, আযারবায়জান প্রভৃতি অঞ্চল ইসমাঈলের দখলে চলে আসে। চার বছর পূর্বে, হিজরী ৯০৩ সনে (১৪৯৭-৯৮ খ্রি) যে ব্যক্তি গীলানে একজন সর্বহারা ফকীরের জীবন-যাপন করছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজ বিরাট সাম্রাজ্য ও একটি প্রবল পরাক্রমশালী সেনাবাহিনীর অধিকারী হয়ে বসেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তুর্কী সৈন্যদের সন্তানরা বিরাট ভূমিকা পালন করে। তারা তাদের পূর্ব পুরুষের ত্রাণকর্তা সদরুদ্দীন আরদাবীলীর সন্তানদেরকে বাদশাহ বানিয়ে তবে ছাড়ে। এটা একটা বিস্ময়েরই ব্যাপার যে, যে সমস্ত লোকের অনবরত চেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকারের ফলে ইসমাঈল বিন হায়দার সাফাভী ইরানের সিংহাসন লাভ করেন তাদেরই উসমানীয় সাম্রাজ্যের স্বজাতীয়দের বিনা কারণে শত্রুতে পরিণত হন। ইসমাঈল সাফাভী যেহেতু প্রথম থেকেই একটার পর একটা বিজয় অর্জন করছিলেন তাই পরবর্তী বিজয় অভিযান এবং যুদ্ধসমূহে তার এই খ্যাতি অত্যন্ত কাজে লাগে। কেননা সাধারণভাবে সকলেই তার সম্পর্কে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। যদি ইসমাঈল সাফাভী সুলতান সালীম (দ্বিতীয়)-এর দেশে আপন গোপন ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার না করতেন এবং সুলতান উসমান (দ্বিতীয়)-এর সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক বজায় রাখাকে জরুরী মনে করতেন তাহলে সালীম নিশ্চিতভাবেই ইউরোপের প্রতি মনোনিবেশ করতেন এবং মধ্যবর্তীকালীন এই দীর্ঘ সময়ে সমগ্র ইউরোপ জয় করে একেবারে স্পেন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতেন। কিন্তু ইসমাঈল সাফাভী, সালীমকে ইউরোপবাসীদের প্রতি মনোনিবেশ করতে দেননি। ফলে সালীম খ্রিস্টান সম্রাটদের সাথে তাঁর সন্ধিচুক্তি নবায়ন করে তাদের দিক থেকে আশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেন। ফলে ইউরোপবাসীরা আরো আট-দশ বছরের অবকাশ পায় এবং এই সুযোগে তারা নিজেদেরকে আরো শক্তিশালী এবং আরো সংগঠিত করে তোলে।

খালদারান যুদ্ধ

ইসমাঈল সাফাভীর যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ শুনে সুলতান সালীম ৯২০ হিজরীর রবিউল আউয়াল, মুতাবিক ১৫১২ খ্রিস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার এনী শহর থেকে, যেখানে তাঁর সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল, রওয়ানা হন। এনী শহর দানিয়াল উপত্যকার ইউরোপীয় উপকূলে অবস্থিত। এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করার এক সপ্তাহ পর অর্থাৎ ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল সুলতান সালীমের গুপ্ত পুলিশ শাহ ইসমাঈল সাফাভীর একজন গুপ্তচরকে গ্রেফতার করে। ঐ গুপ্তচরকে সালীমের খিদমতে পেশ করা হলে তিনি তাকে কোনরূপ শাস্তি দেননি, বরং শাহ ইসমাঈলের নামে একটি চিঠি লিখে তার হাতে দিয়ে বলেন, তুমি এই চিঠিটি তোমার বাদশাহের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। সেই সাথে তিনি নিজের একজন দূতকেও শাহ

ইসমাঈলের কাছে প্রেরণ করেন। সুলতান সালীম উল্লিখিত চিঠিটি আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের প্রশস্তির পর লিখেন ঃ

"আমি, উসমানীয় সাম্রাজ্যের সুলতান, বীরপুরুষদের নেতা, পৌত্তলিক ও সত্যধর্মের শত্রুদের ধ্বংসকারী সালীম খান ইব্ন সুলতান বায়াযীদ খান ইব্ন সুলতান মুহাম্মাদ খান ইব্ন সুলতান মুরাদ খান, তুমি ইরানী বাহিনীর অধিনায়ক আমীর ইসমাঈলকে বলছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কালাম পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং যাবতীয় মূঢ়তা থেকে মুক্ত। তবে এর মধ্যে এমন অনেক ভেদের কথাও রয়েছে, যা মানুষের বুদ্ধি আয়ত্ত করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন। কেননা মানুষের মধ্যেই আত্মিক ও দৈহিক শক্তির সমাবেশ ঘটেছে। মানুষই হচ্ছে সেই প্রাণী, যে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী উপলব্ধি করতে পারে এবং সেগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সৌন্দর্য লক্ষ্য করে তাঁর উপাসনা করে। এখন মানুষ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম থেকে সত্য ও সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে না। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া কখনো সাফল্যের পথ পাওয়া যায় না। হে আমীর ইসমাঈল! জেনে রেখ, তুমি কখনো সাফল্য লাভ করতে পারবে না। কেননা তুমি নাজাতের পথ ছেড়ে এবং শরীয়তের আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করে ইসলামের পবিত্র আদর্শকে অপবিত্র করে দিয়েছ। তুমি ইবাদতগাহসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছ। তুমি অবৈধ ও শরীয়ত বিরোধী পন্থায় পূর্বাঞ্চলে সিংহাসন লাভ করেছ। তুমি শুধু প্রতারণা ও চালাকির মাধ্যমে অত্যন্ত হেয় অবস্থা থেকে এই উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হয়েছ। তুমি মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও নির্দয়তার দরজা খুলে দিয়েছ। তুমি শুধু একজন মিথ্যাবাদী, নির্দয় ও মুরতাদ নও, বরং একজন অবিবেচক বিদআতী এবং আল্লাহর কালামের অমর্যাদাকারীও বটে। তুমি আল্লাহ্র কালামের অপব্যাখ্যা করে ইসলামের মধ্যে কপটতা ও দলাদলির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছ। তুমি রিয়াকারীর (লোক দেখানো কাজকর্মের) আড়ালে চারদিকে ফিতনা-ফাসাদ ও বিপদের বীজ বপন করেছ এবং অধর্মের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছ। তুমি ইন্দ্রিয়পরায়ণতার বশবর্তী হয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করেছ এবং অনেক দূষণীয় কথা বলেছ। তুমি মহান খলীফাবৃন্দ হযরত আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-কে তিরস্কার করার অনুমতি দিয়েছ। আমাদের দীনী উলামাবৃন্দ তোমাকে হত্যার ব্যাপারে ফতওয়া দিয়েছেন। কেননা তুমি কুফরী কথাবার্তা বল এবং কুফরী কাজকর্ম কর। উলামাবৃন্দ এ ফতওয়াও দিয়েছেন যে, দীনের হিফাযতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং তোমার ভক্ত অনুসারীদের নাপাকী ও অপবিত্রতার মূলোৎপাটন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। কুরআন অনুযায়ী উলামায়ে দীনের এই নির্দেশ পালন, দীন ইসলামকে সুদৃঢ়করণ এবং যে সমস্ত লোক তোমাদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে তাদেরকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে আমি এই সংকল্প নিয়েছি যে, শাহী পোশাক ছেড়ে বর্ম ও অন্যান্য যুদ্ধপোশাক পরব, যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সেই পতাকা উত্তোলন করব, যা কোনদিন পরাজয়ের মুখ দেখেনি, ক্রোধ ও উষ্মার খাপ থেকে আমার প্রতিশোধ গ্রহণকারী তরবারি টেনে বের করব এবং বের হব আমার সেই সৈন্যদের নিয়ে, যাদের তরবারি শত্রুর দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে এবং যাদের বর্শা শত্রুর কলিজা বিদীর্ণ করে এপার ওপার হয়ে যায়, তারপর তোমার উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমি সমুদ্র প্রণালী অতিক্রম করে এসেছি এবং দৃঢ় আশা রাখছি যে, আল্লাহ্র সাহায্য নিয়ে শীঘ্রই তোমার জুলুম অত্যাচারের মূলোৎপাটন করব এবং গর্ব ও দাম্ভিকতার যে গন্ধ তোমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে এবং যার কারণে তুমি লক্ষ্যহীনতায় ভুগছ ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছ, তা বের করে দেব। আমি তোমার ভীত-সন্ত্রস্ত প্রজাকুলকে তোমার জুলুম থেকে রক্ষা করব এবং তোমারই সৃষ্ট ফিতনা-ফাসাদের ধূম্রকুণ্ডে তোমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবো। কিন্তু যেহেতু আমরা আহকামে শরীআর বাধ্য, অনুগত, তাই যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তোমার সামনে কুরআন মজীদ পেশ করতে চাই এবং সত্যধর্ম গ্রহণের জন্য তোমাকে উপদেশ দিতে চাই। একমাত্র সে উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে এ চিঠি লিখছি। পাপাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো, মানুষ নিজ থেকে তার কাজকর্মের পর্যালোচনা করে আন্তরিকভাবে তাওবা করবে এবং ভবিষ্যতে যাবতীয় দুষ্কর্ম থেকে দূরে থাকবে। অতএব যে সমস্ত অঞ্চল তুমি আমার সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোমার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছ তা আমার সুবাদারদের হাতে প্রত্যর্পণ কর। যদি তুমি নিজেকে রক্ষা করতে চাও, যদি আয়েশ-আরামে জীবন-যাপন করতে চাও তাহলে আমার এ নির্দেশগুলো মেনে নিতে মোটেই গড়িমসি করবে না। যদি তুমি তোমার অপরাধ প্রবণতার কারণে আপন পিতা ও পিতামহের মত আপন দুষ্কর্ম ও ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ না কর, আপন বাহাদুরী ও ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে জুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত না হও তাহলে তুমি দেখতে পাবে, কিছু দিনের মধ্যেই তোমার দেশের প্রান্তরসমূহ আমাদের তাঁবুতে ছেয়ে গেছে। তারপর আমরা তোমাকে আমাদের বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার কিছু নমুনা দেখাব। তখন দেখা যাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক আল্লাহ্ তা'আলা কি ফায়সালা করেন।"

যেমন সুলতান সালীমের উপরোক্ত চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, শাহ ইসমাঈল এই অতি গর্হিত কাজটিও করেছিলেন যে, তিনি তার সুন্নী প্রজাদের কবর ও মসজিদসমূহ ধ্বংস করে তাদেরকে যারপর নাই বিচলিত ও উত্ত্যক্ত করে তুলেছিলেন। খোদ ইসমাঈলের বাপ-দাদারা শীআ ছিলেন না বরং তারা ছিলেন উসমানীয়দের মতই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতপন্থী এবং সূফী মতবাদের অনুসারী। তারা শায়খ জুনায়দের যুগ থেকে, যখন তাদের মধ্যে সামরিক তৎপরতার সূচনা হয়, জনসাধারণকে আহলে বায়তের মুহাব্বত ও ভালবাসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন। কেননা এর মাধ্যমেই তাদের ক্ষমতা লাভের সুযোগ ছিল অধিক। তারপর তারা ধীরে ধীরে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেই শীআ পন্থা অনুসরণ করেন যেটাকে তাদের পূর্ববর্তী শীআরা নিজেদের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ইসমাঈল সাফাভী এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করেন। তিনি বাদশাহ হয়ে তার যাবতীয় রাষ্ট্রযন্ত্র শীআ মাযহাবের প্রচারকার্যে নিয়োজিত করেন। যেহেতু ইরানীদের মধ্যে প্রথম থেকেই শীআ মাযহাব গ্রহণের প্রবণতা বিদ্যমান ছিল তাই ইসমাঈল সাফাভী আপন লক্ষ্য অর্জনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। তখন যে সমস্ত দৃঢ় বিশ্বাসী মুসলিম শী'আ মাযহাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। তারপর শীআ মাযহাবের প্রচারাভিযান উসমানীয় সাম্রাজ্যেও প্রসারিত হয়। সুলতান বায়াযীদ এর কোন প্রতিবিধান না করলেও সুলতান সালীম

ত্বরিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে এই ফিতনার মূলোৎপাটন করে দিয়েছিলেন, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুলতান সালীম উসমানী উপরোক্ত পত্রের সাথে নিজের একজন দূতকেও পাঠান এবং তাকে বুঝিয়ে দেন, যদি শাহ ইসমাঈল সোজাপথে চলে আসেন এবং আমার কথাগুলো মেনে নেন তাহলে তাকে বলবে, তিনি যেন শাহযাদা মুরাদকে, যে তারই আশ্রয়ে রয়েছে, আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। ইসমাঈল সাফাভী এই চিঠি পড়ে সুলতান সালীমের দূতকে তৎক্ষণাৎই শাহযাদা মুরাদের হাতে তুলে দেন এবং সে (ইসমাঈল সাফাভীরই ইঙ্গিতে) তাকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে ফেলে। ইসমাঈল সাফাভীর এই কাজটি ছিল অত্যন্ত অত্যাচারমূলক এবং রাজকীয় নিয়মনীতি বিরুদ্ধ। তারপর ইসমাঈল নিজের একজন দূত মারফত সুলতান সালীমের চিঠির উত্তর দেন। তাতে ইসমাঈল সাফাভী লিখেছিলেন ঃ

"আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কেন এত নাখোশ ও অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছেন। মনে হচ্ছে, আপনি আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে এই পত্র লিখেছেন। যদি আপনার লড়বার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমিও সে জন্য সবদিক দিয়ে তৈরি আছি। আল্লাহ্র ইচ্ছা কি, তা শীঘ্রই বোঝা যাবে। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে মুকাবিলা হবে তখনই আপনার সামনে ভেসে উঠবে আপনার এই বাগাড়ম্বরতার আসল চেহারা।"

এই চিঠির সাথে ইসমাঈল সাফাভী সুলতান সালীমের কাছে আফিমের একটি কৌটাও পাঠিয়ে দেন। এতে ইঙ্গিত ছিল, তুমি যেহেতু আফিম সেবনে অভ্যস্ত তাই এ ধরনের উল্টাসিধা কথা বলছ। অতএব উপঢৌকন হিসেবে আফিমের এই কৌটাটিই তোমার প্রাপ্য। সালীম এই চিঠি এবং সেই সাথে আফিমের কৌটাটি পেয়ে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেন। তিনি আপন দূতের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে ইসমাঈল সাফাভীর এই দূতকে হত্যা করেন। তারপর আপন বাহিনীকে খুব সুবিন্যস্ত করে তাবরীয (ইসমাঈল সাফাভীর রাজধানী) অভিমুখে রওয়ানা হন। সিওয়াস নগরীতে পৌঁছে সালীম যখন আপন বাহিনীর সৈন্যদের গণনা করেন তখন দেখা যায়, তাতে আশি হাজার অশ্বারোহী এবং চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্য রয়েছে। তিনি চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্যকে বিভিন্ন পল্টনে বিভক্ত করে সিওয়াম থেকে কায়সারিয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি মনযিলে এক একটি পল্টন মোতায়েন করেন এবং নির্দেশ দেন : যখন সুলতানী বাহিনী কায়সারিয়া থেকে এক মনযিল অগ্রসর হবে তখন প্রত্যেকটি মনযিলে মোতায়েন সৈন্যরা যেন এক মনযিল করে সামনে অগ্রসর হয় এবং সর্বপশ্চাতে যে প্লাটুনটি মোতায়েন আছে তারা যেন সিওয়াস ত্যাগ করে সম্মুখবর্তী মনযিলে গিয়ে অবস্থান নেন। এই ব্যবস্থা তিনি এ জন্য করেছিলেন যাতে রসদসামগ্রী পৌঁছাতে সুবিধা হয়। কিন্তু সালীম ইরানী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করার পর দেখতে পান যে, ইসমাঈল সাফাভীর নির্দেশে ইরানীরা সমগ্র এলাকার শস্যক্ষেত একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। ইসমাঈল সাফাভী অত্যন্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনাধীন আপন এলাকার যাবতীয় শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করতে শুরু করেছিলেন যাতে উসমানীয় বাহিনী ঘাসের একটি টুকরা কিংবা খাদ্যশস্যের একটি দানাও সেখানে না পায়। সবুজ গাছপালা এবং সব রকমের শস্যগুল্ম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার জন্য তিনি একটি বিরাট বাহিনী মোতায়েন করেছিলেন। ঐ বাহিনীর একমাত্র কাজ ছিল উসমানীয়

বাহিনীর অগ্রভাগ থেকে সমস্ত দেশকে ধ্বংস করে ফেলা। সংশ্লিষ্ট এলাকায় পূর্ব থেকেই এই নির্দেশ জারি করা হয়েছিল যে, সেখানকার সমস্ত অধিবাসী যেন নিজ নিজ মালপত্র ও খাদ্যসামগ্রী যে পরিমাণ বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব, তা নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে চলে যায় এবং বাকি যা পড়ে থাকে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। অন্যথায় শাহীফৌজ শাস্তি হিসাবে তাদেরকে জবরদস্তিমূলকভাবে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে এবং তাদের যাবতীয় আসবাবও পুড়িয়ে দেবে। ইসমাঈল সাফাভীর উপরোক্ত ব্যবস্থাপনার ফল এই দেখা দেয় যে, সুলতান সালীম উসমানীয় সাম্রাজ্যে প্রবেশ করার সাথে সাথে সাময়িকভাবে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হন। অবশ্য তিনি প্রথম থেকেই এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যে, শত শত জাহাজ কনসটান্টিনোপল এবং ইউরোপীয় প্রদেশসমূহ থেকে প্রচুর পরিমাণ রসদসামগ্রী নিয়ে এসে তারাবুযূন্দ বন্দরে ভিড়বে এবং সেখান থেকে খচ্চর ও উটের কাফেলা ঐসব সামগ্রী বয়ে এনে সুলতানী বাহিনীর হাতে পৌঁছিয়ে দেবে। এ কাজের জন্য তিনি পাঁচ হাজার সৈন্য এবং অনেকগুলো উট ও খচ্চর মোতায়েন করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও যে সব এলাকা দিয়ে তিনি সফর করছেন সে এলাকায় যদি কোন জিনিসই না মিলে তাহলে তো ভয়ানক অসুবিধার কথা। শাহ ইসমাঈল সাফাভী সেনাবাহিনীর সাথে সাথে নিজেও ঐ ধ্বংসকার্যে লিপ্ত ছিলেন। সালীম উসমানী ভেবেছিলেন যে, ইসমাঈল সাফাভী আপন সাম্রাজ্য সীমান্তেই তাকে (সালীমকে) বাধা প্রদান করবেন। কিন্তু ইসমাঈল সাফাভী ধরে নিয়েছিলেন যে, অনুরূপ অসুবিধার মধ্যে সালীম উসমানী আপন বিরাট বাহিনী নিয়ে এতদূর আসতে না পেরে আপনা-আপনি দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসমাঈল সাফাভীর উপরোক্ত অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হয়। অবশ্য সুলতান সালীমের বাহিনী এক পর্যায়ে আগে বাড়তে অস্বীকার করেছিল। বাহিনীর অধিনায়করা সুলতানের কাছে এই অভিমত প্রকাশ করেছিল যে, যেহেতু ইসমাঈল সাফাভী মুকাবিলায় না এসে পিছন দিকে পালিয়ে যাচ্ছেন এমতাবস্থায় আমাদেরও দেশে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। কিন্তু সুলতান সালীম কারো কথায় কর্ণপাত না করে অনবরত সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। অবশ্য এই অবস্থায় সেনাবাহিনীর রসদ-সামগ্রী সরবরাহের ব্যাপারে সুলতান অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। যাহোক, সুলতান সালীম দিয়ারে বকর হয়ে আযারবায়জান এলাকায় প্রবেশ করেন। কোন একটি মনযিলে পৌঁছার পর সুলতানের সেনাপতি হামাদান পাশা, যিনি সুলতানের বাল্যবন্ধু ও সতীর্থ ছিলেন, অন্যান্য অধিনায়কের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই, সুলতানের খিদমতে নিবেদন করেন, 'জাঁহাপনা'! আপনি আপনার সেনাবাহিনীকে আর অধিক রুষ্ট করবেন না। এই যুদ্ধাভিযানের যে অবস্থা দেখা দিয়েছে তাতে আমাদের এখান থেকেই দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। এক মনযিলে তো নেগচারী বাহিনী যাদেরকে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ বাহিনী মনে করা হতো, সম্মিলিতভাবে স্লোগান তুলে ঃ আমরা এক পাও অগ্রসর হব না। এখান থেকেই আমরা দেশে ফিরে যেতে চাই। সুলতান সালীম যখন দেখলেন, সমগ্র বাহিনীই তাঁর অবাধ্য হয়ে উঠেছে তখন তিনি পরের দিন ভোর বেলা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে নেগচারী বাহিনীর একেবারে মাঝখানে এসে দাঁড়ান এবং সমগ্র বাহিনীকে নিজের চারপাশে রেখে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

"আমি বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাবার জন্য এখানে আসিনি। যারা সত্যিকার বীর, যারা ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে নিজেদের জন্য লজ্জাজনক বস্তু বলে মনে করে, যারা তীর ও তরবারির আঘাতকে ভয় পায় না তারা অবশ্যই আমার সঙ্গ দেবে। কিন্তু যারা ভীরু, যারা নিজেদের প্রাণকে নিজের সম্মান ও মর্যাদার চাইতেও অধিকতর মূল্যবান মনে করে, যারা শুধু নিজেদের ঘরে ফিরে যেতেই অভ্যস্ত, যারা বিজয়ের পথে কষ্ট-যাতনা সহ্য করার সাহস রাখে না– আমি অনুমতি দিচ্ছি তারা এখনই যেন বীর বাহাদুরদের সারি থেকে পৃথক হয়ে নিজ ঘরে ফিরে যায়। তোমাদের একটি লোকও যদি আমার সঙ্গে না থাকে এবং সকলেই কাপুরুষদের দলে ভিড়ে যাও তাহলে আমি একাই সম্মুখে অগ্রসর হব এবং যুদ্ধ না করে কখনো ফিরবো না।"

এই পর্যন্ত বক্তৃতা দিয়ে সুলতান সালীম উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠেন ঃ যারা কাপুরুষ তারা অবিলম্বে আমার সঙ্গ ত্যাগ কর এবং যারা বীরপুরুষ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তারা এখনি আমার সাথে রওয়ানা হও। তারপর দেখা গেল সমগ্র বাহিনীই সুলতানের পিছনে পিছনে চলতে শুরু করেছে। এটা ছিল সুলতানের পৌরুষোচিত দুঃসাহসিকতারই প্রতিদান যে, তাঁর বাহিনী যখন পরবর্তী মনযিলে গিয়ে পৌঁছে তখন গার্জিস্তান তথা ককেশিয়ার একজন খ্রিস্টান সরদারের পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ রসদসামগ্রী তাঁর কাছে এসে পৌঁছে। সুলতানের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আতিথ্যের নিদর্শন স্বরূপ ঐ রসদসামগ্রী জনৈক খ্রিস্টান সরদার তার কাছে পাঠিয়েছিলেন। ইসমাঈল সাফাভীর রাজধানী তাবরীয আর বেশি দূরে ছিল না। সুলতান সালীম অনবরত সফর করে খালদারান উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছান। ঐ উপত্যকার পশ্চিম দিকের একটি টিলায় চড়ে তিনি দেখতে পান, একেবারে সম্মুখেই ইরানী বাহিনী অবস্থান করছে। এতে তিনি আনন্দ ধ্বনি দিয়ে উঠেন। তাঁর এই দীর্ঘ সফরকালীন সময়ে সুলতান সালীম গদ্যে অথবা পদ্যে বেশ কয়েকটি পত্র ইসমাঈল নাফাভীর নামে পাঠিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি পত্রেই তিনি এমন ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, যাতে ইসমাঈল লজ্জায় পড়ে হলেও তার মুকাবিলায় এগিয়ে আসেন এতদসত্ত্বেও শাহ সাফাভী তার মুকাবিলায় না আসায় সুলতান সালীম অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েন এবং সে নৈরাশ্য কাটাতে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুতবেগে একটির পর একটি মনযিল অতিক্রম করে এগোতে থাকেন, যাতে ইসমাঈল সাফাভীর রাজধানীতে পৌঁছে হলেও তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাতে পারেন। এমতাবস্থায় ইসমাঈল সাফাভী যদি আপন রাজধানী ছেড়ে পিছনে চলে যেতেন তাহলে তার সে কূটচাল হয়তো সফল হয়ে যেত। কেননা সুলতান সালীম সম্ভবত তাবরীয থেকে আর সম্মুখে অগ্রসর হতেন না। কিন্তু শাহ সাফাভী সুলতান সালীমের অগ্রযাত্রাকে আর বরদাশত করতে পারেননি। খালদারান উপত্যকা ছিল তাবরীয থেকে বিশ ক্রোশ দূরে। আর ইসমাঈল সাফাভী সালীমের সাথে মুকাবিলার জন্য এই স্থানটিকেই নিজের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। যাহোক ইসমাঈল সাফাভীর সৈন্যসংখ্যা সুলতান সালীমেরই অনুরূপ ছিল। তবে একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে, মাইলের পর মাইল অনবরত সফর করার ফলে সুলতান সালীমের সৈন্যরা ছিল শ্রান্তক্লান্ত। অপর দিকে ইসমাঈল সাফাভীর সৈন্যরা ছিল সুস্থ, সতেজ এবং হরেক রকম যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত। ইসমাঈল সাফাভী এবং তার বাহিনীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তারা সালীম উসমানী

এবং তাঁর বাহিনীকে অবশ্যই পরাজিত করবেন। ইসমাঈল সাফাভী মুকাবিলায় আসতে দেরি করাটা তার একটি সামরিক চাল ছাড়া কিছু ছিল না। এই চালের মাধ্যমে তিনি উসমানীয় বাহিনীকে সফরের পর সফর করিয়ে একেবারে দুর্বল ও নিঃশক্তি বানিয়ে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছিলেন, যেখানে সাফাভী বাহিনীর হাতে সর্বতোভাবে ধ্বংস হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। এখানে পৌঁছার পর সুলতান সালীমের কর্তব্য ছিল অন্তত একদিন কিংবা কয়েকটি ঘণ্টাই আপন বাহিনীর বিশ্রামের জন্য বরাদ্দ করা। কিন্তু তিনি যেহেতু ইসমাঈল সাফাভীর সাথে মুকাবিলা করার জন্য একেবারে অধীর হয়ে উঠেছিলেন, তাই খালদারানের প্রান্তরে পৌঁছে যখন ইসমাঈল সাফাভী এবং তার বাহিনীকে একেবারে সামনেই দেখতে পেলেন তখন আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। এদিকে ইসমাঈল সাফাভী তার গুপ্তচরদের মাধ্যমে জেনে নিয়েছিলেন যে, শীঘ্রই উসমানীয় বাহিনী খালদারানের দিকে এগিয়ে আসছে। অতএব, তিনি আগেভাগেই প্রতিপক্ষের উপর হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। তার পরিকল্পনা ছিল ক্লান্ত-শ্রান্ত উসমানীয় বাহিনীকে বিশ্রাম গ্রহণের কোন সুযোগ না দিয়েই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। ইসমাঈল সাফাভী এটাও জেনে নিয়েছিলেন যে, সুলতান সালীমের সাথে একটি হাল্কা তোপখানাও রয়েছে। সুলতানী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কত এবং তার কোন্ অংশের অবস্থা কিরূপ সে তথ্যাদিও ছিল তার নখদর্পণে। ইমাঈল সাফাভী আপন আশি হাজার অশ্বারোহী সৈন্যকে দুভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগকে নিজের অধীনে রাখেন এবং অন্য ভাগকে আপন সেনাপতির অধীনে ন্যস্ত করেন। তার পরিকল্পনা ছিল, উসমানীয় বাহিনী যখন যুদ্ধ শুরু করবে তখন ইরানের সম্মুখবর্তী বাহিনী তাদের মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকবে। আর এই সুযোগে চল্লিশ হাজার সৈন্যের দু'টি অশ্বারোহী বাহিনী ডান ও বাম দিক থেকে এগিয়ে গিয়ে তারপর যথাক্রমে বাম ও ডান দিকে মোড় ঘুরিয়ে উসমানীয় বাহিনীর একেবারে পিছনে পৌঁছে যাবে এবং পিছন দিক থেকে একসাথে হামলা চালিয়ে উসমানীয় বাহিনীকে তুলোধোনা করে ছাড়বে। এদিকে সুলতান সালীম ইরানী বাহিনীকে সামনে একেবারে প্রস্তুত দেখতে পেয়ে এশিয়া মাইনরের সমগ্র বাহিনীকে আপন সেনাপতি সিনান পাশার অধীনে ন্যস্ত করেন এবং ইউরোপীয় অঞ্চলের বাহিনীকে ন্যস্ত করেন হুসাইন পাশার অধীনে। তিনি সিনান পাশাকে ডানপাশে এবং হুসাইন পাশাকে বাম পাশে মোতায়েন করেন। তিনি স্বয়ং নেগচারী বাহিনী নিয়ে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নেন। তারপর জায়গীরদের এবং স্বেচ্ছাসেবকদের খণ্ড বাহিনীগুলোকে সম্মুখভাগে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যথাযোগ্য স্থানে তোপখানাও স্থাপন করা হয়। ইসমাঈল সাফাভী যেহেতু তোপখানার কথা জানতেন এবং তিনি এও জানতেন যে, লড়াই শুরু হওয়ার পর কামানের মুখ সহজে ঘোরানো যায় না তাই তিনি তুর্কীদের কামানগুলোকে বেকার করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার আশি হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মাধ্যমে পিছন দিক থেকেই হামলা চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছিলেন (যেমন উপরে উল্লিখিত হয়েছে)। ইসমাঈল সাফাভীর এই যুদ্ধকৌশল অত্যন্ত বুদ্ধিসম্মত ও প্রশংসনীয় ছিল। যাহোক দুই বাহিনীর মধ্যে মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে ইসমাঈল সাফাভী তার চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে ডান দিকে এগিয়ে গিয়ে তারপর বাম দিকে মোড় ঘুরিয়ে

পিছন দিক থেকে উসামানীয় বাহিনীর উপর হামলা চালান। অপরদিকে আবূ আলী বাম পাশের পিছন থেকে অনুরূপভাবে উসমানীয় বাহিনীর উপর আক্রমণ চালান। লড়াই শুরু হওয়ার সাথে সাথে উসমানীয় বাহিনী থেকে তাকবীর ধ্বনি উত্থিত হয়। অপরদিকে ইরানী বাহিনী থেকে উঠে 'শাহ শাহ' ধ্বনি। অর্থাৎ ইরানীদের যুদ্ধের স্লোগানে বাদশাহ সাফাভীর নাম উচ্চারিত হচ্ছিল আর উসমানীয় বাহিনীর স্লোগানে উচ্চারিত হচ্ছিল শুধু 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি। উভয় বাহিনীর এই স্লোগান থেকেই যে কেউ বলে দিতে পারত, এদের মধ্যে কে তাওহীদ পন্থী আর কে মুশরিক। যাহোক ইসমাঈল সাফাভী কামানের লক্ষ্যস্থল থেকে বেঁচে গিয়ে আপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাফল্য লাভ করেন– অর্থাৎ তিনি পিছন থেকে হুসায়ন পাশার বাহিনীর উপর শক্ত হামলা চালান। ফলে ইউরোপীয় পল্টুনগুলোর বেশির ভাগ অধিনায়ক ও সৈন্য নিহত হয়। অপর দিকে আবূ আলী সিনান পাশার বাহিনীর উপর হামলা চালান, কিন্তু পুরোপুরি সফল হতে পারেননি। বরং তার বাহিনীর একটি অংশ তোপখানার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয় এবং সে কারণে স্বয়ং আবূ আলীও নিহত হন। এবার মিযান পাশা অতি সহজেই আবূ আলীর বাহিনীকে পরাস্ত করেন। কিন্তু হুসাইন পাশার অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। কেননা এ দিকে ইরানীরা খুব জোর হামলা চালাচ্ছিল। সুলতান সালীম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যুদ্ধক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। তিনি সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের মত আপন অধিনায়কত্বের কথা ভুলে গিয়ে একজন সক্রিয় তরবারি চালনাকারী যোদ্ধায় নিজেকে রূপান্তরিত করেননি। যখন সুলতান সালীমের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মালো যে, সিনান পাশাকে সাহায্য করার কোন প্রয়োজনই আর নেই, কেননা সে আপন প্রতিপক্ষকে ইতিমধ্যে কাবু করে ফেলেছে তখন তিনি আপন সংরক্ষিত বাহিনী নিয়ে বিদ্যুৎবেগে হুসাইন পাশার সাহায্যে এগিয়ে যান এবং ইরানীদের উপর এমন ভয়ানক হামলা চালান যে, তারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত ইসমাঈল সাফাভীও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে ঊর্ধ্বমুখে পালাতে শুরু করেন।

ইসমাঈল সাফাভীকে উসমানীয় সৈন্যরা বন্দী করে ফেলেছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে মির্যা সুলতান আলী নামক ইসমাঈলের জনৈক সঙ্গী বলে ওঠে, আমিই শাহ ইসমাঈল। তখন উসমানীয় সৈন্যরা আসল ইসমাঈলের পরিবর্তে নকল ইসমাঈল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এই সুযোগে আসল ইসমাঈল প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। যাহোক কিছুক্ষণের মধ্যেই সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র ইরানী শূন্য হয়ে পড়ে। সুলতান সালীম যখন আগে বেড়ে ইসমাঈল সাফাভীর সেনাছাউনি দখল করেন তখন জানতে পারেন যে, ইসমাঈল এমনি হতবুদ্ধি হয়ে পলায়ন করেছেন যে, ছাউনির মধ্যে নিজের যাবতীয় অর্থকড়ি, এমনকি নিজের প্রিয়তমা স্ত্রীকে রেখে চলে গেছেন। সুলতান সালীম স্ত্রীলোক এবং শিশুদেরকে বন্দী করে রাখেন এবং সকল যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করে ফেলেন। যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনের পর জানা যায়, এই যুদ্ধে চৌদ্দজন উসমানীয় এবং চৌদ্দজন ইরানী পতাকাবাহী অধিনায়ক নিহত হয়েছেন। নিজের অধিনায়কদের মৃত্যুতে সুলতান সালীম অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা সহকারে তাদের দাফনের ব্যবস্থা করে তাবরীয অভিমুখে রওয়ানা হন। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় খালদারান নামক স্থানে ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের ২১শে আগস্ট, মুতাবিক ৯২০ হিজরীর ২০শে রজব। যুদ্ধের তের দিন

পর সুলতান সালীম ইরানের রাজধানী তাবরীযে প্রবেশ করেন। ইসমাঈল সাফাভী খালদারান থেকে পলায়ন করে তাবরীযে এসে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারেন যে, সুলতান সালীম তারবীযের দিকে এগিয়ে আসছেন তখন তিনি তাবরীয থেকে খুরাসানের দিকে পালিয়ে যান এবং সাম্রাজ্যের পূর্বাংশেই নিজের দখল কায়েম রাখেন।

সুলতান সালীম তাবরীযে আটদিন অবস্থান করেন। তারপর কুররা বাগের দিকে অগ্রসর হন। সুলতান সালীম যখন তাবরীযে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর সাথে মির্যা বদীউযযামান সাক্ষাত করতে আসেন। তিনি ছিলেন তাইমূরী বংশের একজন শাহযাদা। সুলতান তার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। সুলতান সালীমের ইচ্ছা ছিল কুররাবাগ থেকে আগে বেড়ে আযারবায়জানেরই প্রান্তরে শীতকাল কাটিয়ে দেবেন এবং বসন্ত ঋতু শুরু হওয়ার সাথে সাথে পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে বিজয়াভিযান পরিচালনা করবেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যরা পুনরায় অবাধ্যতার মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। ফলে তিনি দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এখন থেকে সুলতানের প্রত্যাবর্তন ছিল ঠিক সেরূপ, যেরূপ প্রত্যাবর্তন ছিল আলেকজান্ডারের শতদ্রু নদীর তীর থেকে। কেননা আলেকজান্ডারকেও তাঁর বাহিনী সেখান থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। তবে সুলতান সালীম কুররাবাগ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেও সোজা কনসটান্টিনোপলে ফিরে যাননি, বরং সেখান থেকে এশিয়া মাইনরের আসাসিয়া শহরে উপনীত হন এবং সমগ্র শীতকাল সেখানেই কাটিয়ে দেন। তারপর বসন্ত ঋতু শুরু হওয়ার সাথে সাথে বিজয়াভিযান চালিয়ে আর্মেনিয়া, জর্জিয়া ও কুহেকাফ এলাকা আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আযারবায়জান প্রদেশ তো ইতিপূর্বেই তাঁর দখলে এসে গিয়েছিল। সুলতানের ইচ্ছা ছিল কুর্দিস্তান এবং ইরাক অর্থাৎ দজলা ও ফোরাতের দুআব অঞ্চলও আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। কেননা ঐ সমস্ত অঞ্চলের উপর তখনো ইসমাঈল সাফাভীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তখন সুলতান সংবাদ পান যে, কনসটান্টিনোপলের বাহিনীর মধ্যে এমনি বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে যে,সেখানকার ভাইসরয়ও তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। অতএব সুলতান সালীম বাধ্য হয়ে আপন রাজধানী কনসটান্টিনোপলের উদ্দেশে রওয়ানা হন। তবে রওয়ানা হওয়ার আগে আপন পরিকল্পিত বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখার জন্য কয়েকজন অধিনায়ক নিয়োগ করে যান। ঐ অধিনায়করা কিছুদিনের মধ্যেই কুর্দিস্তান, ইরাক এবং পারস্য উপসাগরের উপকূল অঞ্চল দখল করে নিতে সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে ইসমাঈল সাফাভীর প্রায় অর্ধেক সাম্রাজ্য উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইসমাঈল সাফাভী বার বার তাঁর হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালান। কিন্তু প্রতিবারই তাঁকে সুলতান সালীমের অধিনায়কদের কাছে পরাজয়বরণ করতে হয়।

খালদারান বিজয়ের পর সুলতান সালীম যখন তাবরীযে অবস্থান করছিলেন তখন সেখানকার এক হাজার স্থপতি ও কারিগরকে প্রচুর পারিশ্রমিক এবং জায়গীরের বিনিময়ে স্থায়িভাবে কনসটান্টিনোপলে চলে আসতে রাযী করান। ঐ যুগে তাবরীযের স্থপতিরা ছিল বিশ্ববিখ্যাত। স্থাপত্যবিদ্যায় তারা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব সুলতান সালীম তাদেরকে কনসটান্টিনোপলে পাঠিয়ে সেখানকার একটি বিরাট অভাব পূরণ করেন। উল্লিখিত পরাজয়ের

পর শাহ ইসমাঈল সাফাভী বেশ কয়েকবারই সুলতান সালীমের কাছে সন্ধি প্রস্তাব পেশ করেন এবং কোন না কোনভাবে সুলতান সালীমের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কিন্তু সুলতান সালীম ইসমাঈল সাফাভীর প্রতি এতই রুষ্ট ছিলেন যে, তাঁর এই সমস্ত প্রস্তাবে মোটেই সাড়া দেননি, বরং তাঁর সাথে যুদ্ধাবস্থা অব্যাহত রাখাকেই সমীচীন মনে করেন। তারপর সুলতান সালীমকে যদি সিরিয়া ও মিসরের দিকে মনোনিবেশ করতে না হতো তাহলে তিনি অবশ্যই আর একবার ইরান আক্রমণ করে ইসমাঈল সাফাভীর হাত থেকে তাঁর বাকি সাম্রাজ্যটুকুও ছিনিয়ে নিয়ে আসতেন এবং তাঁর বিজয়াভিযান তুর্কিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছত। কিন্তু সালীম পুনরায় ইরানে আসার অবকাশ পাননি। তবে তাঁর অধিনায়করা অধিকৃত অঞ্চলগুলো নিজেদের কবজায় ধরে রাখে। এই আক্রমণ ও যুদ্ধের ফলশ্রুতি দাঁড়ায় এই যে, ধীরে ধীরে পূর্বদিকেও উসমানীয় সাম্রাজ্যের আয়তন বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। অনেক উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চল উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে। এ কারণে পূর্বদিক থেকে কোনরূপ হামলার আশঙ্কাও আর বাকি থাকেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খালদারান যুদ্ধে ইসমাঈল সাফাভীর স্ত্রী সুলতান সালীমের কবজায় চলে আসার পর শাহ ইসমাঈল সাফাভী সুলতান সালীমের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে এই মর্মে অনুরোধ করেন যে, তাঁর স্ত্রীকে যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এটা ছিল ঐ সময় যখন শাহ সালীম এশিয়া মাইনরের আসাসিয়া শহরে অবস্থান করছিলেন। ধারণা করা হচ্ছিল যে, সুলতান সালীম শাহ সাফাভীর স্ত্রীকে তাঁর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু শাহ সাফাভী যেহেতু মুতরাদ, ধর্মদ্রোহী ও অনেক দুষ্কর্মের হোতা ছিলেন তাই সুলতান তার সাথে কোনরূপ সদয় আচরণ করতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তখন পর্যন্ত শাহ সাফাভীর স্ত্রী অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথেই নজরবন্দী ছিলেন। সুলতান তাকে ফেরত পাঠাতে পরিষ্কার অস্বীকার করেন। অবশ্য খালদারান যুদ্ধের পাঁচ-ছয় মাস পর শাহ সাফাভীর স্ত্রী জাফর চিলপী নামক সুলতান সালীমের জনৈক সিপাহীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইসমাঈল সাফাভী এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তার প্রিয়তমা স্ত্রী একজন তুর্কী সিপাহীর সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে বেশ আনন্দের মধ্য দিয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহ করবে এটা ছিল তার ধারণারও অতীত। তাই যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন এই মানসিক যন্ত্রণা তাঁকে জর্জরিত করে রাখে।

মিসর ও সিরিয়া বিজয়

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, আইয়ূবী বংশের সপ্তম বাদশাহ মালিক সালিহ মিসরে মামলূকী বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐ বাহিনীকে 'দাস বাহিনী' বলাই অধিক সঙ্গত। শীঘ্রই ঐ দাসরা মিসরের সিংহাসন দখল করে নেয়। ঐ যুগেরই নিকটবর্তী সময়ে হিন্দুস্থানের দাস বংশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু হিন্দুস্থানে দাস বংশের শুধু দুজন বাদশাহ দাস ছিলেন। অবশিষ্টরা ছিলেন ঐ সমস্ত দাসেরই পরম্পরাগত বংশধর, কিন্তু মিসরের অবস্থা ছিল এর বিপরীত। সেখানে একজন শাসকের মৃত্যু হওয়ার পর নির্বাচনের মাধ্যমে দাসদের মধ্য থেকেই অপর কাউকে সিংহাসনে বসানো হতো। আর নির্বাচিত ঐ ব্যক্তিকে বলা হতো মামলূক

বাদশাহ। সালীমের যুগ পর্যন্ত মিসরে ঐ সমস্ত দাস সম্রাটেরই হিফাযতে আব্বাসীয় খলীফারা মিসরের অভ্যন্তরে বসবাস করতেন। মিসরের ঐ মামলূকী সাম্রাজ্যও ছিল বেশ শক্তিশালী ও জাঁকজমকপূর্ণ। ঐ সমস্ত মামলূকী ইসলামী বিশ্বের দু'টি অত্যন্ত বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আনজাম দেন। এক. তারা ফিলিস্তীন ও সিরিয়াকে ইসলাম বিরোধী হামলাসমূহ থেকে রক্ষা করেন এবং সেখান থেকে চিরদিনের জন্য ক্রুসেড আক্রমণের মূলোৎপাটন করেন। দুই. তারা মুঘলদের দুর্বার আক্রমণকেও প্রতিহত করেন এবং চেঙ্গীয, হালাকূ প্রমুখের বাহিনীসমূহকে পরাজিত করে মিসর থেকে তাড়িয়ে দেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, দিগ্বিজয়ী মুঘলরা মিসরের দাসবংশ তথা মামলূকীদের হাতে যেভাবে মার খেয়েছিল ঠিক সেভাবে মার খেয়েছিল হিন্দুস্থানের দাসবংশের হাতেও। তাদের ভাগ্যেই এটা লেখা ছিল যে,তারা মুসলমানদের অতি সম্মানিত ও উচ্চ বংশসমূহ ধ্বংস করে দেবে, কিন্তু দাসবংশীয় মুসলমানদের হাতে তাড়া খেয়ে পলায়ন করবে।

মিসরের মামলূকী সাম্রাজ্যের সাথে মিসর, সিরিয়া ও হিজাযের শাসকবর্গের কোন বিরোধ বা শত্রুতা ছিল না। সুলতান মুহাম্মদ খানের মৃত্যুর পর যখন সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শাহযাদা জামশীদ তার কাছে পরাজিত হয়ে মিসরে গিয়ে পৌঁছেন তখন প্রথমবারের মত কনসটান্টিনোপলের দরবারের সাথে কায়রো দরবারের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি ঐ তিক্ততা যুদ্ধের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে এবং তাতে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে মামলূকীদের হাতে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এ সম্পর্কেও ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সুলতান সালীম সিংহাসনে আরোহণ করার পর অন্যান্য সম্রাটের মত মামলূকীরাও এই নতুন সুলতানের গতিবিধি মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করতে থাকেন। তারা যখন ইসমাঈল সাফাভীর পরাজয় ও সালীমের জয়লাভের কথা জানতে পারেন তখন এই ভেবে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন যে,সালীম এবার তাদেরকে হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না। কেননা দিয়ারে বকর ইত্যাদি প্রদেশ উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় মামলূকীদের দখলকৃত দেশ সিরিয়া উসমানীয় সাম্রাজ্যের আরো নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। তারা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে,সুলতান সালীম অবশ্যই ঐ সমস্ত শহর ও দুর্গ ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করবেন,যা মামলূকীরা সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। এদিকে শাহ ইসমাঈল সাফাভী সুলতান সালীমের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করার পর মিসরের সুলতান কালয্‌ গাযীর কাছে দূত পাঠিয়ে তার সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চান। মামলূকী আমীর ইসমাঈল সাফাভীর দূতকে সাদরে গ্রহণ করতে এবং তার সাথে সন্ধিচুক্তি স্থাপন করতে মোটেই ইতস্তত করেননি। ইসমাঈলের দূত কালয্‌ গাযীর দৃষ্টি ঐ সমস্ত সম্ভাব্য বিপদের দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে, যা সুলতান সালীমের দিক থেকে মিসর সাম্রাজ্যের উপর আপতিত হতে পারে। উল্লিখিত অজুহাতের প্রেক্ষিতে হোক অথবা অন্য কোন কারণে হোক, আমীর কবীর কালয্‌ গাযী তথা মিসরের সুলতান স্বয়ং হলব শহরে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সিরিয়া সীমান্তে প্রয়োজনীয় বাহিনী মোতায়েন করেন। এর পিছনে সম্ভবত দুটি লক্ষ্য ছিল। এক. সুলতান সালীম যাতে সিরিয়া আক্রমণ না করতে পারেন তার

প্রতিবিধান করা। দুই. এশিয়া মাইনরের পূর্বাংশে আক্রমণ চালানো। খুব সম্ভব মামলূকী সাম্রাজ্যের উপর হামলা পরিচালনার ইচ্ছা সুলতান সালীমের ছিল না। কেননা মামলূকীরা ছিল শরীয়তের খাঁটি অনুসারী এবং সুলতান সালীমের স্বধর্মী ও স্বমাযহাবী, কিন্তু ইসমাঈল সাফাভীর গোপন কূটকৌশল পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে ফেলে এবং বেচারা মামলূকীরা ইরান সম্রাটের প্ররোচনায় পড়ে শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বকিছু খুইয়ে বসে।

সুলতান সালীম ইরান থেকে ফিরে এসে কনসটান্টিনোপলে অবস্থান করছিলেন এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তখন তাঁর দৃষ্টি পশ্চিম সীমান্ত এবং খ্রিস্টান সাম্রাজ্যসমূহ ছাড়া অন্য কোন দিকে ছিল না। তাঁর পিতা ও পিতামহরা দীর্ঘদিন থেকে ইউরোপের খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করে আসছিলেন। তাই ইউরোপীয় দেশসমূহ ছাড়া আর কোন দেশের প্রতিই সালীমের লোভ ছিল না। হিজরী ৯২২ সনে (১৫১৬ খ্রি) সুলতান সালীমের নিকট তাঁর এশিয়া মাইনরের পশ্চিম এলাকার প্রশাসক ও সেনাপতির কাছ থেকে হঠাৎ একটি চিঠি আসে। তাতে বলা হয়, আমি আপনার নির্দেশ পালনার্থে ফোরাত উপত্যকার দিকে সেনাবাহিনী নিয়ে যেতে পারছি না। কেননা সিরিয়া সীমান্তে মামলূকীরা সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে এবং আমি আশঙ্কা করছি, আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার সাথে সাথে ওরা হয়তো এশিয়া মাইনরের পূর্বাংশে হামলা চালাবে। এই চিঠি পড়ে সুলতান সালীম আপন সমগ্র অধিনায়ক, উলামা ও মন্ত্রীদের একটি পরামর্শসভা আহ্বান করেন। মামলূকীদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে এই ছিল ঐ সভার আলোচ্য বিষয়। বিষয়টির উপর দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর মীর মুনশী মুহাম্মাদ পাশা একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। তিনি তার বক্তৃতায়—তার ক্ষমতা প্রদর্শন করতে হবে। তাছাড়া উসমানীয় সুলতান বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মামলূকীরা কখনো হারমাইন শরীফাইন (মক্কা মদীনা)-এর খাদিম হতে পারে না। মূলকে হিজায উসমানীয় সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত এবং উপরোক্ত দায়িত্ব উসমানীয় সুলতানেরই গ্রহণ করা উচিত। এটাকে ইসলামেরই একটি খিদমত বলে গণ্য করতে হবে এবং এই প্রেক্ষিতে মামলূকীদের সাথে যুদ্ধ করা শুধু বৈধ নয় বরং প্রশংসার্হ। সুলতান মীর মুনশীর এই অভিমতকে এতই পছন্দ করেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মীর মুনশী পদ থেকে প্রধানমন্ত্রীর পদে উন্নীত করেন।

সুলতান সালীম মিসরের মামলূকী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দৃঢ় সংকল্প নেন। তবে তিনি প্রথমে আমীর কালযূ গাযীর কাছে দূত মারফত একটি পয়গাম পাঠান। তাতে তিনি বলেন ঃ তুমি আমার আনুগত্য স্বীকার করে তার নিদর্শন স্বরূপ আমার কাছে কর প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দাও, অন্যথায় আমি হামলা চালিয়ে তোমার সাম্রাজ্য দখল করে নেব। সুলতানের দূতেরা যখন হলবে কালযূ খানের কাছে গিয়ে পৌঁছে তখন তিনি অত্যন্ত রেগে যান এবং তাদেরকে বন্দী করে ফেলেন। ব্যস, এতটুকু ঘটনাই সুলতানের সৈন্য সমাবেশ ঘটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী নিয়ে কনসটান্টিনোপল থেকে রওয়ানা হন। উসমানীয় বাহিনী যখন নিকটবর্তী হয় তখন মামলূকী সুলতান ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং এই অবস্থায় আপোস মীমাংসাকেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। তিনি উসমানীয় দূতদেরকে সঙ্গে

সঙ্গে মুক্ত করে দিয়ে তাদের মাধ্যমেই সুলতান সালীমের কাছে সন্ধির পয়গাম পাঠান। কিন্তু সুলতান সে পয়গাম প্রত্যাখ্যান করে অনবরত সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। হলবের নিকটস্থ 'মারজে ওয়াবিক' প্রান্তরে, যেখানে হযরত দাউদ (আ)-এর কবর রয়েছে, উভয় পক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট, মুতাবিক ৯২২ হিজরীতে খালদারান যুদ্ধের পুরো দু'বছর পর। মামলূকীরা বীরত্ব ও সাহসিকতায় উসমানীয়দের চাইতে মোটেও কম ছিল না। কিন্তু ঐ সময়ে তারা আত্মকলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকায় আশানুরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি। ফলে সুলতান সালীমের বিরাট বাহিনীর সামনে মামলূকীদের পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে উঠতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মামলূকী সুলতান, যিনি তখন অতিবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে লড়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারান। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মামলূকী সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করতে থাকে এবং সুলতান সালীম আগে বেড়ে সহজেই হলব দখল করে নেন।

এই পরাজয় মামলূকীদেরকে মোটেই দমাতে পারেনি। কেননা তারা নিজেদেরকে উসমানীয়দের সমতুল্য বীর বলেই মনে করত। কালযূ গাযীর নিহত হওয়ার পর বাহিনীর সমগ্র অধিনায়ক একজন নতুন সুলতান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কায়রোর দিকে চলে যায়। মামলূকীদের মধ্যে চব্বিশজন সর্দার ছিলেন। একজন সুলতানের মৃত্যু হলে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন করে সুলতান নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করতেন ঐ চব্বিশ জন সর্দারই। আর ঐ নির্বাচনে চব্বিশ জনের সকলেরই উপস্থিত থাকা ছিল অপরিহার্য। অতএব যত শীঘ্র সম্ভব নতুন সুলতান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মামলূকীদের ঐ পর্যায়ের বড় বড় সর্দারকে অবিলম্বে কায়রোয় পৌঁছার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ঐ মুহূর্তে সিরিয়ার শীর্ষ পর্যায়ের কোন সর্দার ছিলেন না। বরং সকলেই কায়রো চলে গিয়েছিলেন। ঠিক সে সময়ই সুলতান সালীম সিরিয়া জয়ের একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান। ফলে অতি সহজেই দামেশক ও বায়তুল মুকাদ্দাসসহ সমগ্র সিরিয়া তার দখলে চলে আসে। হলব যুদ্ধের পর সিরিয়ায় মামলূকীরা বিরাট আকারের আর কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারেনি।

এদিকে কায়রোয় মামলূকী সর্দাররা সর্বসম্মতিক্রমে তূমান বেকে তাদের সুলতান নির্বাচন করে। তূমান বে সিংহাসনে আরোহণ করেই সালীমের মিসর অভিমুখী অগ্রাভিযানে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক বিরাট বাহিনী মিসর ও সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত গাযা দুর্গ অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং বাকি বাহিনীকে ঢেলে সাজাবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সুলতান সালীমের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, ঐ সময়ে দামেশক মিসরীয় সাম্রাজ্যের যে বিরাট ধনভাণ্ডার ছিল তা তার হস্তগত হয়। তাতে পাওয়া যায় সত্তর লক্ষ টাকা। এ ছাড়া অন্যান্য শহর থেকেও প্রচুর মালে গনীমত তাঁর হস্তগত হয়। সুলতানের ভবিষ্যৎ বিজয় অভিযানে এই অর্থ এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। এই অর্থ দ্বারা সুলতান সিরিয়াবাসীদের মন জয়েরও একটা সুবর্ণ সুযোগ পান। তিনি সেখানকার আলিম, খতীব, দরবেশ এবং কারীদেরকে অনেক আকর্ষণীয় উপহার-উপঢৌকন দেন, মসজিদ, মাদ্রাসা ও পুল মেরামত করেন, জনসাধারণের মঙ্গলার্থে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন এবং মিসরের উপর হামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে পরিবহন

কাজে ব্যবহারের জন্য অনেক উট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করেন। মিসরীয় বাহিনী মিসরের সীমান্তবর্তী গাযার দুর্গে এসে পৌঁছে। এদিকে সুলতান সালীম তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার সবুজ সতেজ অঞ্চলসমূহ অতিক্রম করে যখন মরু অঞ্চলে প্রবেশ করেন তখন অত্যন্ত সতর্কতা ও দূরদর্শিতার সাথে উষ্ট্রকাফেলার মাধ্যমে প্রচুর পানি সঙ্গে নিয়ে আসেন। তিনি ঐ সময়ে সৈন্যদেরকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা আরো বাড়িয়ে দেন। তিনি বাহিনীর একটি বিরাট অংশ এবং তোপখানাটি সিনান পাশার অধীনে ন্যস্ত করে তাকে অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন এবং স্বয়ং তিনি বাকি বাহিনী নিয়ে অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে সিনান পাশাকে অনুসরণ করতে থাকেন। ঐ মরু এলাকা অতিক্রম করতে তার দশ দিন লাগে। সিনান পাশা গাযাহ নামক স্থানে পৌঁছেই অধিনায়ক গায্‌যালীর অধীনে সেখানে মামলূকীদের যে বাহিনী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল তাদের মুকাবিলা করেন। মামলূকী সৈন্যরা অত্যন্ত নির্ভীকভাবে উসমানীয় বাহিনীর উপর হামলা চালায়, কিন্তু সিনান পাশা আপন তোপখানা থেকে তাদের উপর এমন মারাত্মকভাবে গোলাবর্ষণ করেন যে, উসমানীয় বাহিনীর ধারেকাছে পৌঁছার আগেই সমগ্র মামলূক বাহিনী বলতে গেলে, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মামলূকীদের কোন তোপখানা ছিল না। তাই দেখা গেল, শেষ পর্যন্ত উসমানীয়দের বারুদের ক্ষমতা, মামলূকীদের হৃদয়ের ক্ষমতা তথা মনোবল একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে। কাজে কাজেই উসমানীয়রা অতি সহজেই জয়লাভ করে। এতে শুধু তাদের সাহসই বৃদ্ধি পায়নি, বরং এতদিন যাবত তাদের অন্তরে মামলূকী বাহিনীর যে ভয়ভীতি বিরাজ করছিল তাও দূর হয়ে যায়।

মিসরে মামলূকী ও উসমানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ

গাযার সংঘর্ষে গায্‌যালী পরাজিত হয়ে কায়রোর দিকে ফিরে আসেন। তূমান বে যখন তুর্কী তোপখানার ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের সংবাদ পান তখন তাঁর সাহস ও বীরত্ব হ্রাস না পেয়ে বরং আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি কায়রো সংলগ্ন সিরিয়ামুখী রাস্তার পার্শ্ববর্তী রেযওয়ানিয়া নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ ঘটান এবং সালীমের বাহিনীর অপেক্ষা করতে থাকেন। সুলতান তূমান বে ছিলেন একজন উচ্চস্তরের বীর ও অভিজাত পুরুষ। তবে কোন কোন সময় অত্যন্ত ভদ্র ও পুণ্যবান ব্যক্তির বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করা হয় আর ভাললোকের পিছনে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পোষণকারী দুষ্ট লোকদের একটি দল তো সব সময়ই লেগে থাকে। তূমান বে একজন অতি যোগ্য, পবিত্রমনা ও সব দিক দিয়ে প্রশংসনীয় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও যখন মিসরের সুলতান নির্বাচিত হন তখন মামলূকী সর্দারের মধ্য থেকেই কিছু লোকের সে নির্বাচন মনঃপূত হয়নি। কিন্তু তূমান বে-র পক্ষে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার কারণে তারা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি, তবে মনে মনে ফুঁসতে থাকে। যদি তূমান বে নির্বাচিত হওয়ার পর কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেতেন তাহলে তিনি তাঁর সুন্দর চরিত্র ও আচার-আচরণ দ্বারা ধীরে ধীরে ঐ সমস্ত লোকের অন্তরের জ্বালা নিবারণ করতে পারতেন। কিন্তু সে অবকাশ তিনি পাননি। কেননা ক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে সাথে তাঁকে যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়তে হয়।

ঐ বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে দু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের একজন হচ্ছেন গায্যালী বে এবং অপরজন হচ্ছে খায়রী বে। তারা যখন দেখলেন যে, তূমান বে মিসরকে রক্ষা এবং উসমানীয় বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তখন তারা এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য না করে বরং তার প্রচেষ্টা যাতে বিফল হয় সে ব্যাপারে গোপন তৎপরতা শুরু করে দেয়। ঐ বিশ্বাসঘাতকরা সুলতান সালীমের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাকে তূমান বের যাবতীয় যুদ্ধ-প্রস্তুতি ও কৌশলাদি সম্পর্কেও অবহিত করে। তূমান বে সালীমের তোপখানাকে বেকার করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা নিয়েছিলেন যে, যখন সালীমের বাহিনী মার্চ করে মিসরীয় বাহিনীর আওতায় এসে যাবে তখন তাদেরকে বিশ্রামের কোন অবকাশ দেওয়া হবে না। বরং তাৎক্ষণিকভাবে ডান ও বাম পার্শ্ব থেকে তাদের উপর আক্রমণ চালানো হবে এবং সুলতানের তোপখানাকে বেকার করে দিয়ে তার বাহিনীর সাথে তরবারি ও বর্শার সাহায্যে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করা হবে। ঐ বিশ্বাসঘাতকরা তূমান বের এই পরিকল্পনা সম্পর্কেও সালীমকে পূর্বাহ্ণে অবহিত করে দেয়ার ফলে এ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়ে যায়। এটাও সুলতান সালীম উসমানীর একটি সৌভাগ্য যে, একেবারে উপযুক্ত সময়ে খোদ মামলূকীদের শীর্ষস্থানীয় কিছু সর্দার তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাহায্যকারীতে পরিণত হয়েছিল।

১৫১৭ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি, (মুতাবিক ৯২২ হিজরীতে) রিযওয়ানিয়ার সন্নিকটে, যেখানে মিসরীয় বাহিনী অবস্থান করছিল, উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যেহেতু সুলতান সালীম তূমান বে-র পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্বাহ্ণে অবহিত হয়ে গিয়েছিলেন তাই তূমান বে সে পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ করার সুযোগ পাননি, বরং তাকে তোপখানার মুখোমুখি হয়েই যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে খায়রী বে, গাযযালী বে— এই দুই মামলূকী বিশ্বাসঘাতক সুলতান সালীমের কাছে চলে আসে। উসমানীয়দের কামান ও বন্দুকের অবিরাম গুলিবর্ষণের মধ্যে মামলূকীরা যেভাবে তাদের প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করে এবং নিজেদের অসমসাহসিক বীরত্বের পরিচয় দেয়, যুদ্ধের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত কমই পাওয়া যাবে। তূমান বে আপন মামলূক অশ্বারোহীদের এক বাহিনী নিয়ে, যারা আপাদমস্তক বর্ম, ঢাল ইত্যাদি লৌহ পোশাকে সজ্জিত ছিল, উসমানীয় বাহিনীর একেবারে মাঝখানে ঢুকে পড়ল। সুলতান তূমান বের সাথে আরো দু'জন দুঃসাহসী মামলূকী সর্দার ছিলেন। তাদের নাম ছিল আলান বে ও কুরত বে। ঐ দুই সর্দার এই মর্মে শপথ নিয়েছিলেন যে, হয় তারা সুলতান সালীমকে জীবন্ত বন্দী করবেন, নয়তো হত্যা করবেন।

মামলূকীদের এই খণ্ড বাহিনীর হামলা ছিল ভূমিকম্প সদৃশ, যা সমগ্র উসমানীয় বাহিনীকে কাঁপিয়ে তোলে। সুলতান তুমান বে এবং তার সামান্য সংখ্যক সঙ্গীরা যেন ছিল ঐ সমস্ত ব্যাঘ্রসদৃশ, যারা একটি মেষ পালের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। উসমানীয় বাহিনীর একেবারে মধ্যস্থলে ঢোকা পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কোন শক্তিই তাদেরকে রুখে রাখতে পারেনি। তারা শত্রুব্যূহ ভেদ করে সারির পর সারি বিদীর্ণ করে ঝড়ের বেগে ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছে, যেখানে সালীম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন বাহিনীর বিভিন্ন প্লাটুনের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তূমান বে সিনান পাশাকে, যিনি সুলতান সালীমের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, সালীম মনে করে তাকেই মুকাবিলার জন্য আহ্বান জানান এবং তাকে লক্ষ্য করে এমন জোরে বর্শা নিক্ষেপ করেন যে, তা সিনান পাশার দেহ ভেদ করে একেবারে বেরিয়ে

যায়। ফলে তিনি অসার হয়ে চিরদিনের জন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ ভাবে আলান বে এবং কুরাত বেও দুজন উসমানী অধিনায়ককে হত্যা করেন। কিন্তু সুলতান সালীমকে তারা কেউই চিনতে পারেননি। এভাবে এই তিনজন মামলূকী সর্দার সুলতান সালীমের একেবারে চোখের সামনে তিনজন উসমানী অধিনায়ককে হত্যা করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। তাদেরকে বাধা দেয় এমন দুঃসাহস কারো হয়নি। তূমান বে-র ধারণা অনুযায়ী তিনি সুলতান সালীমকে খতম করে ফেলেছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত সুলতান সালীম বেঁচেছিলেন। তাই উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধও পুরোদমে অব্যাহত ছিল। এই হামলায় আলান বের পায়ের মধ্যে বন্দুকের একটি গুলী লেগেছিল এবং এতে তিনি সামান্য আহত হয়েছিলেন।

সুলতান সালীম মামলূকীদের এই পৌরুষ ও বীরত্ব লক্ষ্য করে একেবারে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মনে মনে বলছিলেন, যদি আজ আমার কাছে তোপখানা ও বন্দুকসজ্জিত প্লাটুন না থাকত তাহলে মামলূকীদের মুকাবিলায় আমার এই বিরাট বাহিনী কোন কাজেই আসত না। সুলতান সালীম অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার সাথে আপন বরকন্দায প্লাটুন এবং কামানসমূহ সক্রিয় রাখেন। মামলূকীদের অবস্থা ছিল এই যে,তাদের এক একজন সর্দার তার অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালাত এবং গোলাগুলি অবিরাম বর্ষণ ভেদ করে উসমানীয় বাহিনীর প্রথম সারিতে পৌঁছার আগে তাদের সকলেই শেষ হয়ে যেত। বিশ্ব ইতিহাসে এই যুদ্ধ অতুলনীয় ছিল এ জন্য যে, এতে মামলূকীরা শুধু নিজেদের বাহাদুরীর পরিচয় দিতে গিয়ে একেবারে জেনেশুনে নিজেদেরকে তোপ ও বন্দুক তথা আজরাঈলের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পঁচিশ হাজার মামলূকী সৈন্য রেযওয়ানিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারায়। তাদের মাত্র কয়েকজনই জীবিত ছিল, যারা তূমান বে-কে বলতে গেলে, জোর করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আয়ূবিয়ার দিকে নিয়ে যায়। এই যুদ্ধে মামলূকী সৈন্যরা শুধু গোলা-বারুদের আঘাতেই নিহত হয়েছিল। অপর দিকে উসমানীয় সৈন্যরা নিহত হয়েছিল শুধু তরবারি ও বর্শার আঘাতে। কেননা মামলূকীদের কাছে বন্দুক ছিল না। তাছাড়া বন্দুক হাতে নেওয়াকে তারা কাপুরুষতার লক্ষণ বলেই মনে করত। যেহেতু সুলতান তূমান বে রেযওয়ানিয়া থেকে আয়ূবিয়ার দিকে চলে গিয়েছিলেন এবং কায়রো শূন্য হয়ে পড়েছিল তাই রেযওয়ানিয়া যুদ্ধের সপ্তম দিবসে সুলতান সালীম কায়রো দখল করেন। এই অবকাশে যে সমস্ত মামলূকী সৈন্য এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়েছিল তারা তূমান বের কাছে আয়ূবিয়ায় এসে সমবেত হয়। ফলে তূমান বে-এর অধীনে একটি ছোটখাট বাহিনী গড়ে ওঠে।

তূমান বে যখন শুনতে পেলেন যে, সুলতান সালীম কায়রো দখল করে নিয়েছেন তখন তিনি তাঁর ঐ সংক্ষিপ্ত বাহিনী নিয়েই কায়রো আক্রমণ করেন। সালীম তখন সতর্কতামূলকভাবে শহরের বাইরে আপন সেনাছাউনিতে অবস্থান করছিলেন। তূমান বে অপর দিক থেকে হঠাৎ শহরে প্রবেশ করে বিজয়ী তুর্কীদেরকে হত্যা করতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে যে সমস্ত তুর্কী শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল একে একে তাদের সকলেই তূমান বের হাতে নিহত হয়। তূমান বে শহর পুনর্দখল করে অলিগলি ও বাসগৃহের মাধ্যমে মোর্চা তৈরি করে নেন। কায়রো শহরে কোন প্রাচীর ছিল না যে, তার মাধ্যমে শত্রুকে প্রতিরোধ করা যেত। সুলতান সালীম যখন যান তখন দেখতে পান যে, এর প্রতিটি অলি-গলিতে মোর্চা তৈরি করে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে। সালীম এবার বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হন। তাছাড়া এমন একটি শহর, যার কোন প্রাচীর নেই, সেটা জয় করতে না পারাটা তার জন্য

একটি বিরাট অপমানের বিষয়ই বটে। অপরদিকে কায়রোকে এই অবস্থায় রেখে চলে গেলে তার সুখ্যাতিতে বিরাট আঘাত হানবে। সালীমের জন্য এটা ছিল সেই গরম দুধতুল্য, যা তিনি গিলতেও পারছিলেন না, আবার উগলে ফেলতেও পারছিলেন না। তিনদিন পর্যন্ত কায়রোর অলি-গলিতে তথা বাইরের দালান-কোঠার মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ চলতে থাকে। এতদসত্ত্বেও সালীম কায়রোর কোন একটি মহল্লায়ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না। সুলতান সালীম যখন দেখলেন, তূমান বে-কে কায়রো থেকে বেদখল করা কঠিন এবং দিন দিন তার অসুবিধা বেড়েই চলেছে তখন তিনি মামলূকী সর্দার খায়রী বে-কে যিনি রেযওয়ানা যুদ্ধ চলাকালেই তার কাছে চলে গিয়েছিলেন, ডেকে পাঠান এবং বলেন, এখন তুমিই আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটা কৌশল বাতলে দাও। খায়রী বেগ তখন বলেন, আপনি এখন ঘোষণা প্রদান করুন যে, যে মামলূকী হাতিয়ার রেখে দেবে এবং আমার কাছে চলে আসবে তার জানমালের কোন ক্ষতি করা হবে না এবং তার সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করা হবে। এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় এবং সালীমও আপন বাহিনীকে শহরের আশপাশ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কোন কোন মামলূকী এই ক্ষমার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে নিজ থেকে সালীমের সেনাবাহিনীর সামনে এসে হাযির হয়। আবার কাউকে কাউকে শহরবাসীরা জবরদস্তিমূলকভাবে সুলতানী সেনাবাহিনীর সামনে হাযির হতে বাধ্য করে। এভাবে আটশ' মামলূকী যোদ্ধা সুলতান সালীমের সেনাদলের সামনে হাযির হয়ে আপনা থেকে বন্দীত্ববরণ করে। তাদের আশা ছিল যে, সুলতান তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবেন। কিন্তু যখন জানা গেল যে, গত যুদ্ধে এই আটশ মামলূকী সর্দারই ছিল কায়রোর সবচেয়ে বড় শক্তি, তখন খায়রীর পরামর্শ অনুযায়ী সুলতান সালীম তাদেরকে হত্যা করে ফেলেন। তারপর তিনি কায়রো শহরে পাইকারী হত্যা চালাবার নির্দেশ দেন।

তূমান বে যখন দেখলেন যে, এখন আর শত্রুকে প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতা তার নেই তখন তিনি কায়রো থেকে বের হয়ে মরু অঞ্চলের আরব বেদুঈনদের কাছে চলে যান। এদিকে সুলতানী সৈন্য সমগ্র শহরে পাইকারী হত্যা শুরু করে। এতে পঞ্চাশ হাজার লোক নিহত হয়। কুরত বে, যিনি তূমান-বের ডান হাত এবং অত্যন্ত বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন, কায়রোর অভ্যন্তরে কোন একটি ঘরে লুকিয়ে থাকেন। শহরবাসীদেরকে দুর্বল এবং ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার পর সুলতান সালীম পাইকারী হত্যা বন্ধ করেন এবং তূমান বে ও কুরত-বেকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন। শেষ পর্যন্ত জানা গেল, তূমান বে কায়রো থেকে বেরিয়ে গেছেন, তবে কুরত বে এখনো কায়রোর অভ্যন্তরে কোন একটি জায়গায় লুকিয়ে রয়েছেন। সুলতান সালীম তখন কুরত বের কাছে একটি পয়গাম পাঠান। তাতে বলা হয়, তুমি আমার কাছে নির্দ্বিধায় চলে আস। আমি তোমার প্রাণের নিরাপত্তা দিচ্ছি। কুরত বে ভেবে দেখলেন,এবার যদি সালীমের এই প্রতিশ্রুতির সুযোগ তিনি গ্রহণ না করেন তাহলে শেষ পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় তার সামনে তাকে হাযির হতে হবে। অতএব তিনি আর দ্বিধা না করে সোজা সালীমের দরবারে গিয়ে হাযির হন।

সালীম তাকে দেখে বললেন, রেযওয়ানিয়ার যুদ্ধের দিন তো দেখেছিলাম, তুমি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে অত্যন্ত বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করছ, কিন্তু আজ তোমাকে বড় চুপচাপ দেখাচ্ছে। কুরত বে উত্তরে বলেন, আমি এখনো সে রকম বাহাদুরই আছি। কিন্তু

তোমরা উসমানীয়রা অত্যন্ত ভীরু এবং কাপুরুষ। তোমাদের যাবতীয় বীরত্ব ও বিজয়াভিযান শুধু তোমাদের বন্দুকের কারণেই। আমাদের সুলতান কালযূ গাযীর যুগে জনৈক ফিরিঙ্গি একটি বন্দুক নিয়ে তার দরবারে হাযির হয়ে নিবেদন করেছিল, আপনি চাইলে আমি সমগ্র মামলূকী বাহিনীকে বন্দুক সরবরাহ করতে পারি। তখন আমাদের সুলতান এবং রাজকীয় কর্মকর্তারা বলেছিলেন, যুদ্ধে বন্দুক ব্যবহার করা একটি কাপুরুষতার লক্ষণ। অতএব আমরা এটাকে স্পর্শ করতে চাই না। তখন ঐ ফিরিঙ্গি ভরা দরবারেই বলেছিল, 'দেখবে, একদিন এই বন্দুকের কারণেই মিসর সাম্রাজ্য তোমাদের কবজা থেকে চলে গেছে। আজ আমরা তাই স্বচক্ষে দেখলাম। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, পৌরুষ ও বীরত্বের মাধ্যমে নয় বরং শুধু এই বন্দুকের সাহায্যেই তুমি আমাদের উপর জয়লাভ করেছ। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, বন্দুক কখনো জয়-পরাজয়ের আসল কারণ হতে পারে না। আমরা পরাজিত হয়েছি এ জন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সাম্রাজ্যকে আর অধিক দিন টিকিয়ে রাখতে চান না। এভাবে তোমাদের সাম্রাজ্যও একদিন অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়ায় যেভাবে মানুষের আয়ু সীমিত, ঠিক সেভাবে সালতানাত ও হুকুমতের সময়কালও সীমিত। একদিন না একদিন তা অবশ্যই শেষ হয়ে যায়। তুমি কখনো এ কথা ভাববে না যে,আমাদের চাইতে অধিকতর বাহাদুর হওয়ার কারণে তুমি বিজয় লাভ করেছ। সুলতান সালীম বলেন, তুমি যদি এতই বাহাদুর হয়ে থাক তাহলে এখন আমার সামনে এভাবে বন্দীদশায় হাযির হয়েছ কেন ? কুরত বে উত্তরে বলেন, খোদার কসম, আমি নিজেকে তোমার বন্দী মনে করি না। আমি তো তোমার প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস করে এখানে স্বেচ্ছায় এসে হাযির হয়েছি। অতএব আমি নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনই মনে করছি। সুলতান সালীম এবং কুরত বের কথোপকথন এ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎ কুরত বে-র দৃষ্টি খায়রী বে-র উপরে পড়ে। খায়রী বে তখন রীতিমত সুলতান সালীমের সভাসদদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। কুরত বে তখন খায়রী বে-র দিকে মুখ করে তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। এতে খায়রী-বে ভরা মজলিসে খুব অসম্মান বোধ করেন। তারপর কুরত বে সুলতান সালীমকে সম্বোধন করে বলেন, তোমার উচিত এই প্রতারক ধোঁকাবাজের (খায়রী বে-র) মাথা উড়িয়ে দেয়া এবং এই প্রতারণার জন্য তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা। অন্যথায় সে তোমাকেও জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এ কথা শুনে সুলতান সালীম অত্যন্ত রাগত ভিঙ্গতে উত্তর দেন, আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে মুক্তি দিয়ে একটি বড় সামরিক পদে নিয়োগ করব। কিন্তু তুমি এখন পর্যন্ত আমার সাথে অত্যন্ত অভদ্রের মত কথা বলছ এবং সুলতানী দরবারের আদব-কায়দা মোটেই মানছ না। সুলতানী দরবারে যে বেআদবী করে তাকে যে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয় তা কি তুমি জান না? কুরত বে অত্যন্ত নির্ভীকভাবে জবাব দেন, খোদা এমন না করুন যে, আমিও তোমার নওকর ও মুসাহিবদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ি। এ কথা শোনার সাথে সাথে সুলতান যারপর নাই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং জল্লাদদেরকে ডাকেন। কুরত-বে তখন বলেন, আমার একার মাথা কাটিয়ে তোমার কি লাভ হবে ? আমার মত আরো হাজার হাজার বীর বাহাদুর যে তোমার মাথার সন্ধানে রয়েছে। তুমান-বে ও তো এখনো জীবিত আছেন এবং তোমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রচেষ্টায়ই নিয়োজিত রয়েছেন। যা হোক জল্লাদরা কুরত বে-র দেহ থেকে তার মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্য উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে হামলা চালায়। তখন কুরত-বে খায়রী বে-কে

সম্বোধন করে বলেন, লও, এবার আমার ছিন্ন মস্তকটি তোমার স্ত্রীর কোলে নিয়ে রাখ। এ কথা বলতে না বলতেই জল্লাদরা কুরত-বের দেহ থেকে তাঁর মস্তকটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

কায়রো দ্বিতীয় বারের মত বিজিত হওয়ার পর তূমান বে কায়রো থেকে বের হয়ে যান এবং আরব গোত্রের লোকদেরকে আপন সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে শুরু করেন। এভাবে মোটামুটি একটি বাহিনী গঠিত হওয়ার পর তিনি সালীমের বাহিনীর উপর হামলা চালাতে শুরু করেন। সালীম তার মুকাবিলার জন্য যে সমস্ত খণ্ডবাহিনী পাঠান তূমান বে একের পর এক তাদের সকলকেই পরাজিত করে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন। তূমান বের বাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি হচ্ছে মামলূকী বাহিনীর অবশিষ্টাংশ এবং অপরটি হচ্ছে নতুনভাবে ভর্তিকৃত আরব গোত্রসমূহের লোকজন। মামলূকী এবং আরব উভয়েই তাদের নতুন বিজেতাদেরকে সমভাবে ঘৃণা করত। আর এ কারণেই তারা সম্মিলিতভাবে উসমানী খণ্ড বাহিনীসমূহকে বার বার পরাজিতও করে। তবে খোদ আরব এবং মামলূকীদের মধ্যেও পরস্পর শত্রুতা ছিল। আর এটা ছিল তূমান বের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ।

তূমান বের ঘন ঘন আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে সুলতান সালীম তার কাছে পয়গাম পাঠান ঃ যদি তুমি আমার আনুগত্য স্বীকার কর তাহলে আমি তোমাকে মিসরের বাদশাহ হিসাবে মেনে নিয়ে এখান থেকে চলে যাব এবং এ দেশের শাসন ক্ষমতা তোমার হাতেই থাকবে। কিন্তু সুলতান সালীম যেহেতু মামলূকীদের অত্যন্ত প্রিয় সরদার কুরত বেকে হত্যা করিয়েছিলেন এবং কায়রো শহরেও পাইকারী হত্যা চালিয়েছিলেন তাই সুলতান সালীমের দূত মুস্তাফা পাশা উপরোক্ত পয়গাম নিয়ে তূমান বে-র কাছে পৌছা মাত্র মামলূকীরা ক্রোধান্ধ হয়ে তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। সুলতানের কাছে যখন এই খবর পৌছে তখন তিনি এর বদলে তিন হাজার মামলূকী বন্দীকে হত্যা করেন এবং তূমান বে-র মুকাবিলায় তোপখানাসহ একটি দুর্বার বাহিনী প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে মিসরের পিরামিডের নিকটে এক রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধ চলাকালেই মামলূকী এবং আরব সৈন্যরা পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অতএব অবস্থা দাঁড়ায় এই যে, একদিকে মামলূকীরা আরবদেরকে এবং আরবরা মামলূকীদেরকে হত্যা করছিল, আর অপরদিকে উসমানী তোপখানা তাদের উভয়কে একই সাথে নিধন করছিল। এমতাবস্থায় তূমান বে-র বাহিনী নির্মূল হতে আর বেশি সময় লাগেনি। এভাবে তার সমগ্র বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেলে পর তূমান বে সেখান থেকে তার একজন সর্দারের কাছে চলে যান। তূমান বে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্নভাবে ঐ আরব সর্দারের অনেক উপকার করেছিলেন। কিন্তু সে কৃতঘ্ন সরদার এই বীর-শ্রেষ্ঠ বদান্য সুলতানকে সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করে সোজা সুলতান সালীমের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

যখন সুলতান সালীম জানতে পারেন যে, তূমান বে-কে বন্দী করা হয়েছে তখন তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, এবার মিসর বিজিত হলো। যখন তূমান বে সুলতান সালীমের নিকটবর্তী হন তখন তিনি তাকে একজন বাদশাহর ন্যায়ই অভ্যর্থনা জানান এবং তাকে একজন অতি মর্যাদাশীল অতিথি হিসাবেও গ্রহণ করেন। তূমান বের প্রতি সুলতান সালীমের এই মার্জিত ব্যবহার লক্ষ্য করে খায়রী বে ও গায্যালী বে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। এই দুইজন গাদ্দার তূমান-বের প্রাণের শত্রু ছিল। এদিকে সুলতান সালীমের ইচ্ছা ছিল, তূমান বে-কে মিসরের নিয়মিত সম্রাট বানিয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবেন এবং ঐ দেশের শাসন ক্ষমতা তার হাতে অর্পণ করে স্বয়ং কনসটান্টিনোপলে ফিরে যাবেন। এই পরিস্থিতিতে গায্যালী বে এবং

খায়রী বে নিষ্কর্মা বসে থাকেনি। তারা অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে সুলতানের কানে এ জাতীয় তথ্যাদি পৌঁছাতে শুরু করে যে, তূমান বেকে মুক্ত করে পুনরায় মিসরের সুলতান বানানোর জন্য অবিরাম ষড়যন্ত্র চলছে। ফলে তূমান বে শীঘ্রই মুক্ত হয়ে সুলতান সালীমের ভয়ানক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। সুলতান সালীম এ যাবত তূমান বে-র কারণে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই প্রেক্ষিতে উপরোক্ত গুজব তূমান বে-র বিরুদ্ধে তাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে উত্তপ্ত বারুদের ন্যায় কাজ করে। তিনি আর কাল-বিলম্ব না করে তূমান বে-কে হত্যার নির্দেশ দেন। এ ভাবে ১৫১৭ সনের ১৭ই এপ্রিল মুতাবিক ৯২২ হিজরীতে মামলূকীদের এই সর্বশেষ সুলতান অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হন।

তূমান বে নিহত হওয়ার পর মিসর সাম্রাজ্যের দিক থেকে সুলতান সালীমের আর কোন আশঙ্কা বাকি রইল না। কিন্তু তিনি জানতেন, মিসর জয় করার পর সেটাকে দখলে রাখা সহজ ব্যাপার নয়। কয়েকশ' বছর যাবত মামলূকীরা মিসর শাসন করে আসছিল। তারা মিসরের মূল অধিবাসী ছিল না। তবে শাসক জাতি হিসাবে মিসরে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। তারা প্রায়ই সার্কেশিয়া ও কূহেকাফ অঞ্চল থেকে গোলামদের খরিদ করে নিয়ে আসত এবং ওদের দ্বারাই নিজেদের জনসংখ্যার ঘাটতি পূরণ করত। অবশ্য মিসরে তাদের বংশধররাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মিসরে বিপুল সংখ্যক আরব বাস করত। সে কারণে মিসরকে একটি আরব দেশ বলেই মনে হতো। ধর্মীয় দিক দিয়ে আরবদের সম্মান ও নেতৃত্ব সাধারভাবে স্বীকৃত ছিল। আর মিসরের অধিবাসীরা সিরিয়া ও হিজাযের আরবদের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে একটি বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্বের অধিকারী ছিল। মিসরের প্রাচীন অধিবাসী তথা কিবতী জাতি এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরাও একাধারে কৃষি এবং সরকারী দফতরের হিসাব-নিকাশের কাজে নিয়োজিত থাকার দরুন মিসরের সমাজ জীবনে তাদেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। অপরদিকে মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রদেশ ও এলাকাসমূহের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাও মিসর আক্রমণ ও তা দখল করার ক্ষমতা রাখত। এমতাবস্থায় সুলতান সালীম যদি মিসরে কোন গভর্নর নিয়োগ করতেন তাহলে এই আশঙ্কা ছিল যে, সে সিরিয়া, হিজায এবং পশ্চিম এলাকার গোত্রসমূহকে সংগঠিত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসত। আর যদি এমন শাসক নিয়োগ করতেন, যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিদ্যোৎসাহী নয় এবং বিদ্রোহের মনোবৃত্তিও পোষণ করে না তাহলে তার দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব হতো না। সুলতান সালীম যদি মিসর বিজয়ের পর অবিলম্বে আপন রাজধানীতে ফিরে যেতেন তাহলে এখানে সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হতো এবং পুনরায় সুলতানকে আগের মতই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। সুলতান সালীম মিসর জয় করার পর দীর্ঘদিন মিসরে অবস্থান করেন এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এখানকার অবস্থাদি পর্যালোচনা করতে থাকেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, ত্রিপোলী অভিমুখে অগ্রসর হয়ে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকা জয় করেন। যদি তিনি তাই করতেন তাহলে খুবই ভাল হতো। কেননা এই অবস্থায় স্পেন জয় করা তার জন্য কঠিন হতো না। কিন্তু তাঁর বাহিনী আর সম্মুখে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। অতএব সুলতান সালীমকে বাধ্য হয়ে কনসটান্টিনোপলের দিকে ফিরে যেতে হয়।

মামলূকীদের কাছ থেকে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার পর মিসর থেকে চিরতরে তাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলাটা সুলতান সালীমের জন্য অত্যন্ত সহজ ছিল। কিন্তু তিনি বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে

মামলূকীদের ক্ষমতা ও অস্তিত্ব বজায় রাখেন এবং নিজের পক্ষ থেকে মামলূকীদের সর্দার তথা বিশ্বাসঘাতক খায়রী বেকে মিসরের গভর্নর পদে নিয়োগ করেন এবং চব্বিশ সদস্যবিশিষ্ট মামলূকী সর্দারদের যে কাউন্সিল বা পার্লামেন্ট ছিল তাও পুনর্গঠনের অনুমতি দেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মামলূকীদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, মিসরের কোন সুলতান মৃত্যুবরণ করলে কিংবা নিহত বা পদচ্যুত হলে তাদের শীর্ষস্থানীয় চৌদ্দজন সর্দার সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরই মধ্যকার কোন একজন সর্দারকে সুলতান পদে নির্বাচন করতেন। সুলতান সালীম ঐ সর্দারদের সংখ্যা এবং ক্ষমতা যথারীতি বহাল রাখেন। তবে এই নীতি নির্ধারণ করলেন যে,নতুন সর্দার নিয়োগের ক্ষেত্রে উসমানীয় সর্দারের অনুমোদন অবশ্যই নিতে হবে। সেই সাথে তিনি এই রীতিও প্রবর্তন করলেন যে, এখন থেকে প্রধান বিচারপতি, মুফতী প্রভৃতি ধর্মীয় পদে শুধু আরব সর্দারদেরকে নিয়োগ করা হবে। আর অর্থ সংক্রান্ত পদসমূহ নিয়োগ করা হবে কিবতী এবং ইহুদীদেরকে। এভাবে দ্বিকক্ষ, বরং ত্রিকক্ষ বিশিষ্ট শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে সুলতান সালীম নিজস্ব বাহিনী থেকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচশ' পদাতিক সৈন্যের এক বাহিনী কায়রোয় মোতায়েন করেন এবং খায়রুদ্দীন নামীয় জনৈক সর্দারকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে নির্দেশ দেন ঃ কায়রো নগরী এবং কেন্দ্রীয় দুর্গসমূহের উপর তোমার দখল বহাল রাখবে এবং তুমি কোন অবস্থায়ই শহর কিংবা দুর্গ থেকে বাইরে যেতে পারবে না।

কায়রো জয় করার পর যখন জুমুআর দিন এল তখন সুলতান সালীম মিসরের জামি মসজিদে গিয়ে জুমুআর নামায আদায় করেন। সুলতানের জন্য প্রথম থেকেই অত্যন্ত মূল্যবান একটি কার্পেট বিছানো হয়েছিল। কিন্তু সুলতান সালীম মসজিদে প্রবেশ করেই অসাম্য সৃষ্টিকারী ঐ বিশেষ মুসাল্লাটি মসজিদ থেকে উঠিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন এবং সাধারণ মুসল্লীদের সারিতে দাঁড়িয়েই তিনি তাঁর নামায আদায় করেন। নামাযরত অবস্থায় সুলতানের মনে এমনি বিনয়ের ভাব জাগ্রত হয় যে, তাঁর চোখের পানিতে যমীন সিক্ত হয়ে ওঠে। মিসর জয়ের পর সুলতান মিসরের শ্রেষ্ঠতম স্থপতি ও কারিগরদের একটি দলকে জাহাজযোগে কনসটান্টিনোপল অভিমুখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে,তাবরীয জয়ের পর তিনি সেখান থেকেও বহু সংখ্যক সুদক্ষ স্থপতি ও কারিগর কনসটান্টিনোপল অভিমুখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ থেকে অনায়াসে বোঝা যায়, সুলতানের মানসিকতা কত উচ্চ ছিল এবং তিনি তাঁর রাজধানীর সৌন্দর্য ও জাঁকজমক বৃদ্ধির জন্য কতই না উদগ্রীব ছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এত দীর্ঘ সময় মিসরে অবস্থান করা সত্ত্বেও সুলতান সালীম মিসরের পিরামিডগুলোর দিকে একবার ফিরেও তাকাননি। তবে হ্যাঁ, মিসরের মসজিদ ও মাদ্রাসাসমূহের প্রতি তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন এবং সেখানকার আলিমদের মর্যাদা ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করেন। মিসরে অবস্থানকালে সুলতান এ কথাও চিন্তা করেছিলেন যে, আরব দেশসমূহের উপরও তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত জরুরী। আরবদের পবিত্র শহরসমূহ– যেমন, মক্কা, মদীনা প্রভৃতির উপর আরব সর্দারদেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ সমস্ত শহরে কোন সামরিক প্রদর্শনী কিংবা যুদ্ধ তৎপরতার কোনই প্রয়োজন ছিল না। বরং সেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল ঐ সমস্ত শহরের অধিবাসীদেরকে সন্তুষ্ট রাখা এবং তাদের মন জয় করা। সুলতান সালীম তাঁর ঐ লক্ষ্য অর্জনেও সফলকাম হন। তিনি তাঁর বদান্যতা ও প্রচুর দান-দক্ষিণার মাধ্যমে আরব সর্দারদের অন্তর, বলতে গেলে আপন হাতের

মুঠোয় নিয়ে নেন। এতদিন পর্যন্ত মামলূকীদেরকেই আরব তথা হিজাযের বাদশাহ মনে করা হতো। এখন তাদের সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটায় সুলতান সালীমকেই হিজাযের বাদশাহ মনে করা হতে থাকে। অবশ্য আরব সর্দাররা যদি চাইত তাহলে তাকে নিজেদের বাদশাহ বলে স্বীকার করত না, বরং তাঁর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু সুলতান সালীমকে নিজেদের প্রতি অতিশয় সদয় দেখে আরব-সর্দাররা আপনা-আপনি তাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে পয়গাম পাঠায় এবং তাকে 'খাদিমুল হারমাইন আশ্‌-শারীফাইন' উপাধিতে ভূষিত করে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, আব্বাসীয় খলীফা মামলূকীদের কাছে মিসরে ঠিক সেরূপ শানশওকত ও মর্যাদার সাথে থাকতেন যেরূপ রোমে থাকতেন পোপ কিংবা দিল্লীতে থাকতেন মুঘল বংশের শেষ সুলতান দ্বিতীয় আকবর এবং বাহাদুর শাহ। ঐ সমস্ত আব্বাসীয় খলীফার না কোন হুকুমত ছিল, আর না ছিল কোন দেশের উপর দখলাধিকার। কোন সেনাবাহিনীও তাদের অধীনে ছিল না। এতদসত্ত্বেও শুধু মিসরের মামলূকী সুলতানরাই নয়, বরং অন্যান্য ইসলামী সাম্রাজ্যের শাসকরাও তাদের কাছে 'হুকুমতের সনদ' ও খেতাবাদি লাভ করাকে নিজেদের জন্য গৌরবজনক বলে মনে করতেন। ঐ আব্বাসীয় খলীফাদেরকে ধর্মীয় পেশওয়া তথা ইমাম বলেও মনে করা হতো।

সুলতান সালীম আব্বাসীয় খলীফাদের এই গুরুত্ব এবং তাদের খিলাফত পদের 'আছর' তথা কার্যকারিতা খুব ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি মিসরে অবস্থানকারী শেষ আব্বাসীয় খলীফাকে এ ব্যাপারে রাযী করিয়ে নিতে সক্ষম হন যে, তিনি (আব্বাসীয় খলীফা) নিজে থেকেই 'খিলাফত' পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন এবং ঐ সমস্ত 'তাবাররুকাত' (কল্যাণ প্রতীক), যা খিলাফতের চিহ্ন হিসাবে উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর দখলে রয়েছে, তা সুলতান সালীমের হাতে অর্পণ করবেন। উপরন্তু সুলতান সালীমকে তিনিও খলীফা হিসাবে স্বীকৃতি দেবেন। আব্বাসীয় খলীফা ঐ সমস্ত জিনিস সুলতান সালীমকে দিয়ে স্বয়ং তাঁর হাতে বায়আত করেন। এ ভাবে মুসলিম জগতে শুধু 'নাম কা ওয়াস্তে' খলীফার পরিবর্তে প্রকৃত খলীফারই আবির্ভাব ঘটলো। 'খলীফা' অর্থ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় বাদশাহ তথা রাষ্ট্রপ্রধান। এই অর্থে সুলতান সালীম ছাড়া তখনকার বিশ্বে খলীফা হবার যোগ্য অন্য কোন ব্যক্তি ছিলেন না। ৯২৩ হিজরীর (১৫১৭ খ্রি) শেষের দিকে সুলতান সালীম এক হাজার উটভর্তি স্বর্ণরৌপ্য নিয়ে কনসটান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হয়। সর্বশেষ আব্বাসীয় খলীফাকেও তিনি সাথে করে নিয়ে যান। কায়রো থেকে রওয়ানা হয়ে মাত্র কয়েক মাইল অতিক্রম করার পর সুলতান সালীম আপন প্রধানমন্ত্রী ইউনুসকে যিনি তখন ঘোড়ায় চড়ে সুলতানের সাথে আলাপ করতে করতে যাচ্ছিলেন— বলেন, 'আমরা শীঘ্রই সিরিয়া সীমান্তে পৌঁছে যাচ্ছি।' মন্ত্রী তখন কথায় কথায় বলে ফেললেন, আমরা এই সফরে আমাদের অর্ধেক বাহিনীই শেষ করে রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি। যাদের কাছ থেকে অনেক কষ্ট ও ত্যাগের বিনিময়ে মিসর জয় করলাম তাদের হাতেই পুনরায় তা ছেড়ে দিয়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারছি না, মিসর আক্রমণ করে প্রকৃতপক্ষে আমাদের কি লাভ হলো। এ কথা শোনার সাথে সাথে সুলতান তাঁর সঙ্গী অশ্বারোহীদের নির্দেশ দেন ঃ এখনি এর মাথা উড়িয়ে দাও। অতএব সাথে সাথে ইউনুস পাশার মাথা উড়িয়ে দেওয়া হলো। এভাবে সুলতান সালীম আপন মন্ত্রী ও মুসাহিবদের প্রতি

অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কিন্তু তিনি আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের ভুল-ভ্রান্তি, এমনকি কঠোর ব্যবহারকেও হাসিমুখে সহ্য করে নিতেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইউনুস প্রথম থেকেই মিসর জয়ের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তার অভিমতও ব্যক্ত করছিলেন। এতকিছু ঘটে যাওয়ার পরও তিনি তার পূর্বের সেই গোঁ-ই ধরে রেখেছিলেন। অথচ সুলতান সালীম মিসর জয় করে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিজয় অভিযান পরিচালনা এবং মিসর থেকে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সুলতানের প্রায় দু'বছর সময় অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু দু'বছরের মধ্যেই তিনি সিরিয়া, আরব, মিসর এই তিনটি দেশকেই উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া আর একটি বিরাট লাভ এই হয়েছিল যে, সুলতান সালীম মিসরে আক্রমণ পরিচালনার সময় শুধু 'সুলতান সালীম' ছিলেন, অথচ এখন তিনি আপন রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছেন 'খলীফাতুল মুসলিমীন সুলতান সালীম'রূপে। এর চেয়ে বড় গৌরবের কথা আর কি হতে পারে যে, খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়ার কারণে তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ইমাম ও পেশওয়ায় পরিণত হয়েছিলেন। মিসর থেকে ফিরে এসে সুলতান সালীম কয়েক মাস দামেশকে অবস্থান করেন। কোন কোন বর্ণনা মতে, তিনি দামেশ্ক থেকে হজ্জে বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হিজাযে যান। কিন্তু সাধারণভাবে এই খ্যাতি রয়েছে যে, সুলতান সালীম কিংবা অন্য কোন উসমানীয় সুলতান হজ্জে বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে কখনো হিজাযে যাননি। দামেশকে অবস্থান করে সুলতান সালীম আরব সর্দারদের কাছ থেকে আনুগত্যের স্বীকৃতি নেন এবং তাদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি দামেশক থেকে রওয়ানা হয়ে হলবে আসেন এবং সেখানেও কিছুদিন অবস্থান করেন। এই সফরকালে তিনি আপন সাম্রাজ্যের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হিজায ও সিরিয়ার প্রশাসনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি কমিশনারী বা জেলায় পৃথক পৃথক কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। ফলে কোথাও ভয়ানক কোন বিদ্রোহের আশঙ্কা বাকি থাকেনি। এই সমস্ত কাজ সেরে সুলতান সালীম হিজরী ৯২৪ সনে (১৫১৮ খ্রি) কনসটান্টিনোপলে প্রত্যাবর্তন করেন।

সুলতান সালীম কনসটান্টিনোপল ফিরে এসে ভেনিস রাষ্ট্রের কাছ থেকে জাযীরা-ই-কাররাস তথা সাইপ্রাসের কর আদায় করেন। ভেনিসবাসীরা ইতিপূর্বে মামলূকী সুলতানদেরকে এই কর প্রদান করত। এবার যখন মিসর উসমানীয় সুলতানের অধীনে এসে গেল তখন মিসরের সব প্রাপ্যেরও তিনি অধিকারী হয়ে গেলেন। ভেনিসবাসীরাও প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা সব সময়ই উসমানীয় সুলতানের দরবারে এই কর পাঠাতে থাকবে।

স্পেনের খ্রিস্টান সাম্রাজ্য, সুলতানের কাছে দূত পাঠিয়ে এই মর্মে আবেদন করেন যে, যে সমস্ত খ্রিস্টান সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের পবিত্র স্থানসমূহ যিয়ারত করতে যাবে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা যেন করা হয়। সুলতান সালীম সঙ্গে সঙ্গে ঐ আবেদন মঞ্জুর করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, তার সাম্রাজ্য সীমার মধ্যে কোন খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীকে কেউ কোনরূপ কষ্ট দিতে পারবে না। হাঙ্গেরী-সম্রাটের সাথে যে চুক্তি হয়েছিল তার মেয়াদ শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় হাঙ্গেরী-সম্রাট তা নবায়নের আবেদন জানান এবং সুলতান সালীম নির্দ্বিধায় সে আবেদন মঞ্জুর করেন। সুলতান সালীম এশিয়া ও আফ্রিকায় যে বিজয় অর্জন করেছিলেন তার প্রভাব

প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই ইউরোপবাসীদের উপর পড়েছিল। সুলতান সালীম একদিকে আপন সাম্রাজ্য-সীমা বর্ধিত করেন এবং অন্য দিকে খলীফাতুল মুসলিমীন পদ লাভ করার কারণে তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ইউরোপের সকল সম্রাটই কম্পবান ছিলেন এই ভয়ে যে, না জানি সুলতান সালীম হয়তো তাদের দেশ আক্রমণ করে বসবেন। সুলতান সালীম মিসর থেকে ফিরে আসার পরই খ্রিস্টান সম্রাটরা তাঁর কাছে সন্ধির পয়গাম পাঠাতে শুরু করেন। সুলতান অত্যন্ত কঠোর মেযাজের লোক ছিলেন বটে, তবে সেই সাথে অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং দূরদর্শীও ছিলেন। তিনি এমন বেকুব ছিলেন না যে, মানুষের তোষামোদে পড়ে নিজের কাজকর্মের পরিণামের দিকটি ভুলে বসবেন। তিনি খ্রিস্টানদের দুষ্টামি ও দুরভিসন্ধি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজায, ইরাক এবং পশ্চিম ইরানকে আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করে এমন একটি বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন, যে সাম্রাজ্য এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এ তিনটি মহাদেশেই বিস্তৃত ছিল। এখন তার জন্য শুধু বাকি রয়ে গিয়েছিল ইউরোপীয় খ্রিস্টান দেশসমূহ, যেগুলো জয় করার জন্য তার পূর্ব পুরুষরা অনবরত চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। স্বভাবত তিনিও এ ব্যাপারে গাফিল থাকতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে সুলতান সালীমের পূর্বপুরুষরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খ্রিস্টান সম্রাটদের সাথেই শক্তি পরীক্ষায় নেমেছেন। সকল ঐতিহাসিকই এ ব্যাপারে একমত যে, সুলতান সালীম একজন উচ্চস্তরের ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অন্তর ছিল ধর্মীয় ভাবাবেগে পূর্ণ। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এখন পর্যন্ত তিনি শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধেই লড়েছেন এবং মুসলমানদের দেশই দখল করেছেন। সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে, সালীম এ কথা ভালভাবে বুঝে নিয়েছিলেন— মুসলমানদের মধ্যে বিশুদ্ধ ধর্মীয় ভাবাবেগ একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং সাধারণভাবে তাদের চরিত্রের মধ্যে অধঃপতন দেখা দিয়েছে। তাইমূর ও বায়াযীদের মধ্যকার যুদ্ধও ছিল এ কথারই স্পষ্ট স্বাক্ষর। কনসটান্টিনোপল জয় করে এবং সেখান থেকে খ্রিস্টান সাম্রাজ্য মুছে ফেলে বেশ কিছুটা স্বস্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও এশিয়া মাইনরের পর পর বিদ্রোহ উসমানীয় সুলতানদেরকে বিচলিত করে রাখত। ইসমাঈল সাফাভীর কূটচাল এবং দুষ্টামিপনা সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথেই সুলতান সালীম উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাই তিনি সর্বপ্রথম ইরানের ঐ শীআ সাম্রাজ্যকে শায়েস্তা করে সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগুলো নিজের দখলে নিয়ে আসেন। ইরানীদের আক্রমণের কোন আশংকা আর বাকি থাকেনি। এশিয়া মাইনর থেকে শীআদের হত্যা করার ফলে তাদের দিক থেকে ভয়ংকর ষড়যন্ত্রেরও আর কোন সম্ভাবনা বাকি থাকেনি। মিসরের ইসলামী সালতানাত যেহেতু শাহযাদা মুস্তফার ব্যাপারে উসমানীয় সালতানাতের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষমতা ব্যবহার করেছিল তাই সুলতান সালীমের কাছে মিসরের আশঙ্কাও ইরানী আশঙ্কার চাইতে খুব একটা খাটো ছিল না। অতএব সুলতান সালীম মিসরীয়দেরকে পর্যুদস্ত না করে খ্রিস্টান দেশসমূহের উপর হামলা চালানোকে যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। কেননা অনুরূপ ক্ষেত্রে খ্রিস্টান সম্রাটরা মিসরের সুলতানদেরকে উসমানীয় সালতানাতের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার চেষ্টা চালাতে পারত। মিসর জয়ের পর এবার সুলতান সালীমের আসল যে কাজটি বাকি ছিল তা হলো ইউরোপ জয় করা। সুলতান সালীমের

বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা যারপর নাই প্রশংসাযোগ্য এ জন্য যে, তিনি মিসর থেকে ফিরে এসে খ্রিস্টান দেশসমূহের উপর হামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করেননি বরং সালতানাতের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজানোর সাথে সাথে সামরিক প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে থাকেন। এই অবস্থায় যে সমস্ত খ্রিস্টান সম্রাট সন্ধি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। কিন্তু তাঁর যুদ্ধ প্রস্তুতি তলে তলে পুরোদমেই জারি ছিল। এমনভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে তাঁকে ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। মিসর থেকে ফিরে এসে তিনি যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের নির্দেশ দেন। জাহাজ তৈরির জন্য বেশ কয়েকটি কারখানা স্থাপন করা হয়। এগুলোতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেড়শ যুদ্ধ জাহাজ তৈরি হয়ে যায়। এ জাহাজগুলোর প্রতিটির ওজন ছিল সাতশ' টন। এ ছাড়াও অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ তৈরি করা হয়। সুলতান তাঁর এই যুদ্ধ প্রস্তুতির তথ্যাদি গোপন রাখার জন্য জাহাজগুলো তৈরি হওয়ার পর তা সমুদ্রে না ভাসিয়ে কারখানার মধ্যেই বন্ধ করে রাখার নির্দেশ দেন। একদা সুলতান কনসটান্টিনোপলের নিকটবর্তী সমুদ্রে তাঁর একটি যুদ্ধ জাহাজের আনাগোনা দেখতে পান। এতে তিনি এতই রাগান্বিত হন যে, সে অপরাধে আপন নৌ-সেনাধ্যক্ষকে হত্যার নির্দেশ দেন আর কি। কিন্তু অন্যান্য অধিনায়ক এবং মন্ত্রীরা অনেক চেষ্টা চালানোর পর এই বলে সুলতানের রাগ দমনে সক্ষম হন যে, এই জাহাজ এই মাত্র তৈরি হয়েছে এবং যে কোন জাহাজ তৈরি হওয়ার পর রীতি অনুযায়ী সেটাকে পানিতে ভাসিয়ে তার গতি ও ভারবহন ক্ষমতা নির্ধারণ করা খুবই জরুরী।

জাহাজ নির্মাণ ছাড়াও সুলতান সালীম কামান-বন্দুক তৈরির অনেকগুলো কারখানা স্থাপন করেন। বারুদ তৈরির কারখানাগুলোও রাতদিন কর্মব্যস্ত থাকে। সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তির কাজও অব্যাহত রাখা হয়। এশিয়া মাইনরে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি বাহিনীও সর্বক্ষণ তৈরি থাকে, যাতে নির্দেশ পাওয়া মাত্র মুহূর্তও বিলম্ব না করে যুদ্ধাভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারে। সুলতান সালীমের মন্ত্রীবর্গ নৌ ও স্থলশক্তির এই রাতারাতি উন্নয়ন লক্ষ্য করে শীঘ্রই কোন একটি বিরাট অভিযান যে শুরু হবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন, কিন্তু কি ধরনের এই অভিযান, কি জন্য এই প্রস্তুতি তা কারোরই জানা ছিল না। সুলতান সালীম আপন মন্ত্রী এবং উপদেষ্টাদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে সলাপরামর্শ করতেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁর অতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাউকে পরিষ্কার কিছু বলতেন না। তিনি তাড়াহুড়া করে কখনো কোন পদক্ষেপ নিতেন না। কিন্তু যখন তিনি কোন ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতেন তখন আর কিছুতেই পিছনে হঠতেন না। তিনি তাঁর সংকল্পে ছিলেন অটল এবং সাহসিকতায় দুর্বার। যদি কেউ তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করত তিনি তার প্রাণ সংহারেও দ্বিধাবোধ করতেন না। এই বিদ্যোৎসাহী বীরপুরুষ মুসলমান সম্রাটদেরকে পর্যুদস্ত এবং তাদের দিককার যাবতীয় আশঙ্কা মুছে ফেলার পর নিশ্চয়ই খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন এবং তাঁর মতে এই প্রস্তুতি তখনো অসম্পূর্ণ ছিল। কেননা তিনি ইউরোপের উপর এমন একটি হামলা চালাতে যাচ্ছিলেন যার মধ্যে পরাজয় ও ব্যর্থতার নামগন্ধও থাকবে না।

সুলতান সালীম অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত ছিলেন, এমনি সময়ে ৯২৬ হিজরীর ৬ই শাওয়াল মুতাবিক ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর জুমুআর দিন তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি হিজরী ৯২৬ সনের ১লা শাওয়াল কনসটান্টিনোপল থেকে আড্রিয়ানোপলের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। তিনি তখনো আড্রিয়ানোপলে পৌঁছেননি, বরং পথিমধ্যে এক জায়গায় তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন (ঐ জায়গায়ই একদা তিনি তাঁর পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন) এমনি সময়ে এমনভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন যে, সেখান থেকে আর অগ্রসর হতে পারেননি, বরং ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সুলতান সালীমের উরুতে একটি ফোঁড়া হয়েছিল, যার কারণে চিকিৎসকরা তাঁকে ঘোড়ায় চড়তে নিষেধ করেছিল কিন্তু তিনি সে নিষেধ অমান্য করে নিয়মিত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন। ফলে ঐ ফোঁড়া দিন দিন ভয়ানক আকার ধারণ করে এবং সুলতানের মৃত্যুর কারণে পরিণত হয়।

সুলতান সালীমের শাসনামল ঃ একটি পর্যালোচনা

সুলতান সালীম মাত্র আট বছর আট মাস আট দিন শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সামান্য সময়কালে তিনি যে পরিমাণ বিজয় অর্জন করেন, তা অনেক বড় বড় সুলতান দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও করতে পারেননি। সুলতান সালীমের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, অত্যন্ত ক্রোধান্বিত বা বিচলিত অবস্থায়ও উলামা-ই-দীনের মর্যাদা রক্ষার প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে তিনি তাঁর মন্ত্রী এবং অধিনায়কদেরকে অনায়াসে হত্যা করতে পারতেন। তাই রাজকীয় কর্মকর্তারা তাঁর ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকত। কিন্তু দীনী উলামাবৃন্দ ছিলেন এ ব্যাপারে একেবারে নিঃশংক। সুলতান সালীমের ধারণা ছিল, একমাত্র কঠোরতা ও কূটকৌশলের মাধ্যমেই দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা যায়। একদিক দিয়ে তাঁর ধারণা সঠিকই ছিল। তবে যেহেতু তিনি ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, তাই উলামায়ে দীনের প্রতি তিনি কখনো কঠোর হতে পারতেন না। একবার সুলতান সালীম তাঁর অর্থ বিভাগের দেড় শ' কর্মচারীকে গ্রেফতার করেন এবং তাদের সকলের দেহ থেকে মস্ত ক বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দেন। কনসটান্টিনোপলের কাযী জামালী এই হুকুমের কথা জানতে পেরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুলতানকে বলেন, আপনি ভুলবশত এই নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব অবিলম্বে আপনার নির্দেশ রহিত করুন। কেননা ঐ লোকেরা হত্যাযোগ্য কোন অপরাধ করেনি। সুলতান তখন বলেন, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ না করাই উচিত। কাযী তখন বলেন, আপনি শুধু এই পার্থিব রাষ্ট্রের কল্যাণের প্রতি নজর রাখেন, কিন্তু আমি আপনার পারলৌকিক জগতের কল্যাণও চাই। মনে রাখবেন, আল্লাহ তা'আলা দয়াশীলকে পুরস্কৃত করেন এবং অত্যাচারীকে কঠোর শাস্তি দেন। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, কাযী জামালীর পরামর্শ অনুযায়ী সুলতান উল্লিখিত সকল কর্মচারীর মৃত্যুদণ্ড রহিত করে তাদেরকে মুক্তি দেন এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ পদে পুনর্বহালও করেন।

অনুরূপভাবে একবার সুলতান ঘোষণা দেন, আমাদের দেশ থেকে ইরানে রেশম রফতানি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হলো। ঐ ঘোষণার পর পরই তিনি ঐ সমস্ত বণিককে গ্রেফতার করে

ফেলেন যারা ইরানে রেশম নিয়ে যাওয়ার জন্য কনসটান্টিনোপলে অবস্থান করছিল। ঐ বণিকদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক চারশ'। সুলতান তাদের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আটক এবং তাদেরকে হত্যা করারও নির্দেশ দেন। এটা ছিল সেই মুহূর্ত, যখন সুলতান সালীম আদ্রিয়ানোপলের দিকে রওয়ানা হচ্ছিলেন এবং কাযী জামালীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কাযী জামালী ঐ বণিকদের সম্পর্কে সুলতানের কাছে সুপারিশ করেন। সুলতান তখন বলেন, দুনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ লোকের মঙ্গলের জন্য এর এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করা বৈধ। কাযী বলেন, এটা তখন যখন ঐ এক-তৃতীয়াংশ লোক দুনিয়ায় ফিতনা-ফাসাদের কারণ হয়। সুলতান বলেন, এর চাইতে বড় ফাসাদ আর কী হতে পারে যে, তারা (বণিকরা) তাদের সুলতানের হুকুম অমান্য করেছে ? কাযী বলেন, তাদের কাছে সুলতানী হুকুম পৌঁছেনি, তাই তারা অপরাধী সাব্যস্ত হতে পারে না। যা হোক, কোন প্রধানমন্ত্রী যদি সুলতান সালীমের সাথে অনুরূপ কথা কাটাকাটি করতেন তাহলে তিনি নির্ঘাত তাকে হত্যার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু সুলতান এ ক্ষেত্রে তা করলেন না। শুধু কিছুটা রাগত স্বরে বললেন, তুমি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্ত ক্ষেপ করবে না। কাযী এই জবাব শুনে অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং সুলতানের প্রতি কোনরূপ শিষ্টতা না দেখিয়ে এমন কি তাঁর কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই সেখান থেকে উঠে চলে যান। সুলতান সালীম আশ্চর্যান্বিত হয়ে চুপচাপ নিজের ঘোড়ার উপর বসে থাকেন। তারপর মাথা নত করে কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে নির্দেশ দেন ঃ হ্যাঁ, বণিকদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক এবং তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হোক। তারপর তিনি কাযীর কাছে পয়গাম পাঠান ঃ আমি তোমাকে সমগ্র রাষ্ট্রের তথা এশিয়া ও ইউরোপ এলাকার প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ করলাম। কিন্তু কাযী সে পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এতদসত্ত্বেও সুলতান তাঁর সাথে সব সময়ই নম্র ব্যবহার করতেন।

সুলতান সালীমের যুগ ছিল মাযহাবসমূহের জন্যও একটি বিশেষ যুগ। এই যুগে ইসলামী খিলাফত আব্বাসী বংশ থেকে উসমানী বংশে চলে আসে এবং ভাগ্যাহত দুর্বল খলীফাদের স্থান গ্রহণ করেন বিরাট সাম্রাজ্য ও বিরাট বাহিনীর অধিকারী সুলতানগণ। এই যুগেই মার্টিন লুথার খ্রিস্ট ধর্মের সংস্কার কাজ শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল উসমানীয়দের ইউরোপে প্রবেশেরই ফলশ্রুতি। ঐ যুগে হিন্দুস্থানে কবীর নামক জনৈক ব্যক্তিও নতুন একটি ধর্মমতের প্রচলন করেন। কবীর গোরক্ষপুরের নিকটবর্তী মঘর নামক স্থানে ৯২৪ হিজরীতে (১৫১৮ খ্রি) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন সুলতান সিকান্দর লোধীর সমসাময়িক। এই সুলতানের যুগেই অর্থাৎ হিজরী ৯২২ সনে (১৫১৬ খ্রি) পকেট ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়।

সুলতান সালীম সংকল্প নিয়েছিলেন, খ্রিস্টানদের দেশসমূহের উপর হামলা পরিচালনার পূর্বে নিজের সাম্রাজ্যের চৌহদ্দির মধ্যে যে সমস্ত খ্রিস্টান রয়েছে তাদেরকে প্রথমে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে সমগ্র দেশ ভিনদেশীদের সব রকমের প্রভাব থেকে পুরোপুরি পবিত্র করে নেবেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে খ্রিস্টানদের গির্জাসমূহ মসজিদে রূপান্তর করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। যখন খ্রিস্টানরা এই সংবাদ পায় তখন সুলতানের খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করে ঃ সুলতান মুহাম্মাদ খান যখন কনসটান্টিনোপল জয় করেন তখন আমাদেরকে সর্বপ্রথম ধর্মীয়

স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন এবং এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমাদের গির্জাসমূহ সংরক্ষণ করা হবে এবং আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। খ্রিস্টানদের এই কথাকে রাজকীয় দরবারের উলামাবৃন্দ সমর্থন করেন এবং কাযী জামালীও তাদের সুপারিশকারী হন। কাজেই সুলতানকে বাধ্য হয়ে ঐ সংকল্প ত্যাগ করতে হয়। তবু খ্রিস্টান ঐতিহাসিকদেরকে সুলতান সালীমের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট দেখা যায়। তারা সুলতানের নিজস্ব ধর্মীয় উদ্দীপনাকে পর্যন্ত দূষণীয় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এটা তাদের একদেশদর্শিতা এবং হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক। সুলতান সালীম যে একজন খোদাভীরু ও পুণ্যমনা লোক ছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, সুলতান সালীম যে সমস্ত দেশ দখল করে নিয়েছিলেন তা একেবারে শেষ পর্যন্ত তুর্কীদের দখলে কিংবা অন্ততপক্ষে তাদেরই নেতৃত্বাধীনে থাকে। কিন্তু এই সুলতান বেশি দিন হুকুমত করার সুযোগ পাননি। মাত্র ৫০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি যদি আরো কিছুদিন জীবিত থাকতেন তবে নিশ্চিতভাবে সমগ্র ইউরোপ জয় করে তবে ছাড়তেন। 'খলিফাতুল মুসলিমীন' উপাধি লাভ করায় সুলতান সালীম হচ্ছেন উসমানিয়া বংশের সর্বপ্রথম খলীফা।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উন্নয়ন)/২০০৭-২০০৮/অঃসঃ/৫০১০-৩২৫০

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ